গজেন্দ্রকুমার মিত্র রচনাবলী

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

অষ্টম খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

অষ্টম খণ্ড

প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৩

সম্পাদক

সবিতেন্দ্রনাথ রায়
মণীশ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদপট
অংকণঃ পূর্ণেন্দু রায়
মুদ্রণঃ সিল্ক স্ক্রীন

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীপ্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মানসী প্রেস,
৭৩, মানিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত

সূচীপত্র

উপন্যাস

রাখাল ও রাজকন্যা

এই উপন্যাসটি প্রথমে "একদা কী করিয়া" এই নামে প্রকাশিত হয়েছিল। বহু অনুরাগী পাঠক আপত্তি করায় নব নামাঙ্কিত করা হ'ল।

অক্ষিতত্ত্বপারঙ্গম

ডাঃ নীহারকুমার মুন্সী

ও

শ্রীমতী অরুণা মুন্সীর

যুগল করকমলে

এই উপন্যাসটি ঐতিহাসিক পৃষ্ঠপটে রচিত হ'লেও এর মূল কাহিনী সম্পূর্ণ কাল্পনিক। ইতিহাস যেখানে সুপ্রত্যক্ষ—সেখানে অবশ্যই ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও একে ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা সঙ্গত হবে না। এক বিখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেতার প্রস্তাব-ক্রমে একটি চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান আমাকে সিপাহীবিদ্রোহের পটভূমিকায় চিত্রোপযোগী একটি কাহিনী লিখতে অনুরোধ করেন—এ উপন্যাস সেই অনুরোধেরই ফল। সেই অভিনেতারও এ ব্যাপারে কতকগুলি প্রস্তাব ও কল্পনা ছিল, তার ফলে এর রচনা সম্পূর্ণ আমার কল্পনার বা ধারণার পথে যায় নি। প্রধানত চলচ্চিত্রের তাগিদে ও প্রয়োজনেই এই কাহিনী লেখা—পাঠকগণ এ গ্রন্থ পাঠের সময় সে কথাটা স্মরণ রাখলে বাধিত হবো। ইতি—

॥ এক ॥

সেদিন সকাল থেকেই দিল মহম্মদের দিনটা ভাল যাচ্ছিল না। কে জানে কার মুখ দেখে উঠেছিল সে, সারা দিন-রাতটাই দিকদারিতে কাটল।

মেজাজটা তারও আগে থেকে বিগড়ে ছিল অবশ্য। মা গালাগালি করছে কদিন ধ'রেই। সে নাকি বিশ্বকুঁড়ে, বিশ্ববকাটে, বিশ্বভবঘুরে—তার দ্বারা নাকি পৃথিবীতে কারও কোন দিন কোন উপকার হয় নি, কোন দিন হবেও না। তা না হোক, নিজের পেটটা যদি নিজে চালিয়ে নিতে পারত, নিজের পাওনাগণ্ডা বুঝে নেবার মতোও সাংসারিক বুদ্ধি একটু থাকত, তাহলেও যে মায়ের প্রাণে শান্তি থাকত একটু। তাও যে সে পারবে না। মা মাটিতে গেলে সে ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়েই মরে পড়ে থাকবে এক দিন—এ যে দিব্যচক্ষেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। একটু নড়ে বাইরে গিয়ে খাবারটা কিনে খাবারও হিম্মৎ নেই তার। ইত্যাদি ইত্যাদি। একই কথা একশো বার শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়েই পরশুদিন বেরিয়ে পড়েছিল দিল মহম্মদ। প্রাণ রাখা দুদিন একটু ফুর্তি আনন্দ করার জন্যে, তা যদি সেইগুলোকেই এমন নির্মমভাবে জীবন থেকে বাদ দিতে হয়, তা হলে আর প্রাণ ধারণের জন্যে এত কাণ্ড ক'রে লাভ কি? এইটেই যে মা কেন বোঝে না—

অবশ্য মার যে খুব একটা দোষ নেই—তা দিল মহম্মদও মানতে বাধ্য। এই যে গমগুলো এখন নিয়ে আসছে—এগুলো মাস কতক আগেই সে আনতে পারত। বস্তুত, এ ফসল তো কাটা হয়েছে বেশ কিছুদিন আগেই। এটা ওদের ভাগে দেওয়া জমি; বাড়ি থেকে অনেকখানি পথ, প্রায় দেড় দিন লাগে পৌঁছতেই, তাই দিল মহম্মদ ভাগে ধরিয়ে দিয়েছে। অপরে চাষ ক'রে, ফসলের দশ আনা ছ আনা ব্যবস্থা। তারাই খাজনা দেয় সার দেয় বলে তাদের প্রাপ্য দশ আনা। এ ব্যবস্থাও সে-ই ক'রে গেছে একবার—ক'রে গিয়ে মার কাছে বকুনি খেয়েছে। তারাই জমির খাজনা দেয়, জমির সার দেয় বলে তাদের কিছু বেশী পাওয়া উচিত—এই ব্যবস্থাই ন্যায্য বলে মনে হয়েছে তার, কিন্তু মা ওকে গাল দিয়েছে বুদ্ধু বলে, এত খরচ ক'রে এবং পুরো মেহনত ক'রেও নাকি তাদের ছ আনার বেশী প্রাপ্য হয় না। কারণ শস্যের ডাঁটাগুলো তারা ভোগ করে, তাতেই তাদের বয়েল এবং ভৈঁসা বারো মাস খেয়ে বাঁচে—বরং কিছু উদ্বৃত্ত হয়।—একে তো এই ব্যবস্থা, তার ওপর শস্য কাটবার সময়ও যায় নি সে। যা তারা দয়া ক'রে মেপে রেখেছে তা-ই। ওর মার বিশ্বাস পাওনার সিকিও রাখে নি তারা। কেন রাখবে! মানুষ মানুষই—পীর পয়গম্বর কিছু নয়। অথবা সবাই তার মতো পাঁড় বে-অকুফ হয়ে এমনও আশা করা যায় না তো!

তাও—তখন তখনই, দু-চার দিনের মধ্যে নিয়ে এলেও তবু কিছুটা আদায় হ'ত। ছেলে মোটে সে দিক দিয়েই গেল না। ভাবগতিক দেখে যদি তারা মনে ক'রে থাকে যে মালিক বেপাত্তা কিংবা ফৌৎ হয়ে গেছে তো তাদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় কি? আর হাতের কাছে খাওয়ার জিনিস মজুত থাকতে তারা কিছু বেচবে না কি খরচ করবে না—এও আশা করা অন্যায়। বিশেষ ক'রে প্রায় নতুন ফসল ওঠার সময় হ'তে চলল—এখন চাষীদের অভাবের সময়। এখন যদি তারা

টানের মুখে মালিকের মাল থেকে দু-চার মণ খরচ ক'রে ফেলে থাকে তো আশ্চর্য হবার কিছু নেই। দিল মহম্মদের মা হ'লেও তা-ই করত। ফসল ওঠার সময় যদি তারা দয়াধর্ম ক'রে পাঁচ বয়েল-গাড়ি মাল রেখে থাকে—এখন তিন গাড়ি দিয়ে বলবে, ওই ছিল, নিয়ে যাও। মুখের মধ্যে মিঠাই দিয়ে কি লোককে বলা যায়, চিবিও না, মুখে ক'রে বসে থাকো, আমার ফুরসৎ আর মর্জি-মতো আমি বার ক'রে খাব?

এই খ্যাচ্‌খ্যাচানি অবিরত শুনতে শুনতে প্রায় পাগল হয়েই বেরিয়ে পড়েছিল পরশু। একটা বয়েল গাড়ি নিয়েই গিয়েছিল অবশ্য। তা-ই যায় সে, বাকী গাড়ি সেখান থেকে যোগাড় হয়, তারাই দেয় ভাড়া ঠিক ক'রে—ভাড়া বাবদ কিছু গম কি বাজরা রেখে আসে সে। যা জমি ওখানে আছে তাতে—এ বছর যে পরিমাণ ফসল হয়েছে সে মাপে—অন্তত ছ গাড়ি মাল তার পাবার কথা। কিন্তু ভাগীদারদের ওখানে পেঁাছে শুনল যে তার মার আশঙ্কাই ঠিক, অথবা মাও অতটা আশঙ্কা করতে পারে নি—এক গাড়ির সামান্য কিছু বেশী গম আর বস্তা-কতক চানা প'ড়ে আছে। সেটুকু মালের জন্যে আর একটা গাড়ির ভাড়া দেওয়া পোষাবে না।

প্রথমটা তার মতো উদাসীন মানুষেরও মাথায় রক্ত চ'ড়ে গিয়েছিল অবশ্য, খুব চেঁচামেচি হাঁকডাকও করেছিল, কিন্তু তারা যখন হাতজোড় ক'রে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করল, স্বীকার করল যে তারা সত্যিই বস্তা কতক গম আর বস্তা দুই বাজরা ভেঙ্গে ফেলেছে, তবে আসছে বারের ফসল থেকে অবশ্যই শোধ দিয়ে দেবে —তখন আর দিল মহম্মদ বেশী কিছু বলতে পারে নি। যদিও সে নিঃসন্দেহে জানে যে বস্তা-কতক নয়, গাড়ি কতক মালই পাচার হয়েছে—এর জন্যে মার কাছ থেকে কম ফৈজৎ আর লাঞ্ছনা সইতে হ'বে না তাকে এটাও ঠিক, তবু মানুষ হাতজোড় করলে আর তাকে কী বলা যায়?

সুতরাং—ভোরে যখন এই সবেধন এক গাড়ি গম নিয়ে রওনা দেয় সে, তখন অনেকখানি বিরক্তি, চাপা ক্ষোভ (ক্ষোভ নিজের অক্ষমতা বা অকর্মণ্যতার প্রত্যক্ষ ফলটা মার ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে এমনভাবে মিলে যাওয়ায়—প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবার জন্যে ঠিক নয়।) এবং বকুনি খাবার আশঙ্কা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু খোদা যখন নারাজ হন তখন একদিক দিয়ে মারেন না তো, অনেক দিক দিয়েই জব্দ করেন।

প্রথম থেকেই তার সাদা বলদটা বেগড়াতে শুরু করেছে। অথচ তার এই 'বল বাহাদুর' অন্য সময় তার ইশারা বুঝে চলে ফেরে, গতি বাড়ায় কমায় কখনও মারধোর করতে হয় না। অথচ আজ সে কেবলই, গোড়া থেকেই বেঁকে বেঁকে দাঁড়াচ্ছে, পথে শুয়ে পড়তে চাইছে—কিছুতেই এগোবে না। প্রথমটা দিল মহম্মদ ভেবেছিল অসুখ-বিসুখ করেছে কিছু, কিন্তু অনেক দেখেশুনে লক্ষ্য ক'রেও অসুখের কোন লক্ষণ ধরতে পারল না সে। তখন রেগে গিয়ে দু'একটা বেত-লাথিও চালিয়েছে—তাতে ফলও হয়তো কিছু ফলেছে তখনকার মতো কিন্তু সে নেহাৎই সাময়িক। দু-এক পা গিয়েই আবার দাঁড়িয়ে গেছে, একেবারে ঘুরে 'রঙ বাহাদুরের' দিকে মুখ ক'রে। এমন ভাবে কাঁহাতক যাওয়া যায়! তার পর যদি-বা বিকেলের দিকে তাকে কতকটা শায়েস্তা ক'রে খানিকটা চলনসই ক'রে নিয়েছে তো এই নতুন বিপত্তি। এখন প্রথম হেমন্তের দিন, চারিদিক শুকনো ঝাঁ ঝাঁ করারই কথা। করছিলও তাই। হঠাৎ এই তিন চার দিন আগের মাথা-পাগল বাদলটার জন্যেই এই হাল। সড়ক, বর্ষার পর অনবরত গাড়ি গিয়ে গিয়ে শুকনো কাদার ডেলা ভেঙে গুঁড়িয়ে আটার মতো মিহি

আর নরম ধুলোয় বোঝাই হয়ে ছিল। তার ওপর সেদিন যেমন জল পড়েছে সবটা কাদা হয়ে গেছে। এখানটায় আবার খুব বেশী গাড্ডা হয়েছিল বোধ হয়, কোন কারণে হয়তো এখানটা এমনিও একটু নিচু—প্রবল জলের তোড়ে তাই দুনিয়ার তামাম ধুলো আর কাদা ধুয়ে এসে এইখানটায় হাবড়ের সৃষ্টি করেছে।

দিল মহম্মদ অতটা বুঝতে পারে নি, বুঝতে পারার কথাও নয়, কারণ ওপর থেকে সবটাই সমান দেখাচ্ছে, অন্য জায়গার কাদার সঙ্গে এখানকার সুগভীর দ'কের কিছুমাত্র তফাৎ নেই। গাড়ি এর মধ্যে বসে যেতে তবে বুঝতে পেরেছে তফাৎটা। ততক্ষণে চাকা দুটোই নাভির ওপর পর্যন্ত পুঁতে গেছে—বলবাহাদুর রঙবাহাদুরের সাধ্য নেই যে সে দ'কের মধ্যে থেকে সেই ত্রিশমণ বোঝাসুদ্ধ গাড়িকে ঠেলে তোলে।

অবশ্য চেষ্টা দিল মহম্মদ বড় কম করে নি। নিজে খানিকটা পাঁকে নেমেও তোলবার চেষ্টা করেছে ওদের সঙ্গে—কিন্তু এতটা তারও হিম্মতে কুলোয় নি। আর সেখানটায় এমনই কাদা চারিদিকে যে, গমগুলো ফেলে ফেলে গাড়ি খালি ক'রে পাঁক থেকে টেনে তুলবে সে উপায়ও নেই। বস্তা-করা গমও নয়, উঁচু পাড়তোলা গাড়ির চারদিকে চ্যাটাই ঘিরে নৌকোর মতো ক'রে তাতেই গম বোঝাই করা হয়েছে। এখন সে গম ঢালবেই বা কিসে ক'রে, আবার বোঝাই করবেই বা কী দিয়ে—একা মানুষ!

রাগটা তার নিজের ওপরই বেশী হচ্ছিল। দোষটা যে তারই—সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই! সে যদি অসময়ে অমন ঘুমিয়ে না পড়ত গাড়িতে বসে বসেই—তাহলে এই কাণ্ডটি ঘটত না। কখন যে উল্লুর বাচ্ছা এই বয়েল দুটো এই হাবড়ের মধ্যে নেমেছে তা সে টেরও পায় নি। জেগে থাকলে খানিকটা আগেই হয়তো সতর্ক হ'তে পারত।

যেখানটায় এসে পড়েছে সে জায়গাটাও খুব নির্জন। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, ভাল ঠাওর হচ্ছে না ঠিকই, তবু কাছাকাছি বসতি থাকলে এক-আধটা—চেরাগের আলো না হোক—রসুই করার আগুনও কি দেখতে পেত না? আশেপাশে যতদূর দৃষ্টি যায়, কোথাও কোন আলোর চেহারা চোখে পড়ে নি তার। অর্থাৎ কাউকে ডেকে এনে একটু হাত লাগাতে বলবে তেমন লোকজনও কাছাকাছি আছে বলে মনে হয় না! অগত্যা হাল ছেড়ে দিতে হয়েছে। ওর কাছে তামাক খাবার চকমকি আছে বটে—কিন্তু আলো জ্বালাবার কোন সরঞ্জাম নেই। আশপাশ থেকে শুকনো পাতা সংগ্রহ ক'রে আগুন জ্বালা যায় কিন্তু সে আলো নিয়ে লোকালয় খুঁজতে যাওয়া যায় না। একবার ভেবেছিল যে আগুন জেবলেই বসে থাকবে সারারাত, কারণ ওর বেশ একটু ভয়-ভয়ও করছিল। অন্ধকারে পথ-ঘাট-মাঠ সব একাকার হয়ে গেছে—বড় বড় গাছগুলো যেন দৈত্যদানার মতো দাঁড়িয়ে আছে চারিদিকে, তার ফলে অন্ধকার যেন আরও ভয়াবহ হয়ে উঠছে। নীরন্ধ্র ছায়াচ্ছন্ন পত্রপল্লবের মধ্যে শুধু কতকগুলো জোনাকি জ্বলছে দপ দপ ক'রে। সেদিকে চাইলে আরও যেন গা ছমছম করে, মনে হয় অশরীরী মামদোদের চোখ ওগুলো।

তবুও আগুন জ্বালাতেও সাহস হয় নি। কোম্পানীর রাজত্ব হয়ে আগের মতো অবাধ লুঠতরাজ আর নেই বটে—তবে এখনও দু-চারজন লুটেরা-বাটপাড় কি আর পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়ায় না রাহাজানির মতলবে? অন্ধকারে হয়তো এ কাদার মধ্যে কেউ আসবে না, কিন্তু আগুন দেখলেই কৌতূহলী হয়ে কাছে আসবে। আর একা লোকের সঙ্গে একগাড়ি গম দেখলে লুটে নিয়ে চলে যেতেও দেরি হবে না। তার চেয়ে গমের ওপর উঠে চোখ বুজে শুয়ে থাকা ঢের ভাল। যদি একবার ঘুমিয়ে পড়তে

পারে তো কথাই নেই—অত ভয়ের তোয়াক্কা থাকে না। জেগে থাকলেই ভয়, চোখ খুলে থাকলেই ভয়—নইলে আর ভয়টা কিসের?

শেষ পর্যন্ত গাড়ির ওপর উঠেই শুয়েছিল দিল মহম্মদ। নরম গমের গদিতে নিজের 'আঙোছা'খানা বিছিয়ে তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে শুয়ে পড়েছিল। কিন্তু ঘুমটা ভাল হয় নি তবু। ঐ গা-ছমছমে ভাবটাই তাকে ঘুমোতে দেয় নি। আশ্চর্য, অন্যদিন প্রাণপণে জেগে থাকার চেষ্টা করলেও চোখ দুটো খুলে রাখতে পারে না। আর আজ প্রাণপণে ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা ক'রেও চোখ বুজতে পরল না। যতবারই ঘুমোবার চেষ্টা করে সে, চোখ বুজে চারিদিকের জগৎ-সংসার ভুলে যাবার চেষ্টা করে—ততবারই নানা কারণে সে সম্বন্ধে সচেতন হতে হয়। নানা রকমের উদ্ভট-উদ্ভট শব্দ কানে যায়, মনে হয় কাছেই কে নড়ছে বুঝি, কারা বুঝি ফিসফিস ক'রে কথা কইছে, কে বুঝি বিপুল পাখা দুলিয়ে বাতাস জাগিয়ে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। জিন কি হুরী নিশ্চয়ই। নইলে হঠাৎ এমন দমকা বাতাস তার গায়ে এসে লাগল কেন? একবার তো স্পষ্ট মনে হ'ল কাছে কে হাসল খিল-খিল ক'রে, চাপা হাসি। আবার একবার মনে হ'ল কারা যেন কথা কইছে। ধারেকাছে কোথাও। অথচ এখানে কাছাকাছি যে কোন জনপ্রাণী নেই সে বিষয়ে সে নিশ্চিত।...এ অবস্থায় কোন ভদ্রসন্তানের ঘুম আসে?

না, মানুষের ভয় সে করে না। আল্লার কুদরতে দেহে তার শক্তির অভাব নেই। যে কোন লোকের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে রাজী আছে সে। মানুষ তো মানুষ, দরকার হলে জীয়ন্ত শেরের সামনে দাঁড়াতেও সাহসের অভাব হবে না তার। হবে না—তার কারণ তারা প্রত্যক্ষ, ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে। কিন্তু যাদের দেখা যায় না, হাতে ক'রে ছোঁয়া যায় না—তাদের সঙ্গে লড়বে কী ক'রে?

এমনি ভাবে নানাবিধ নাম-না-জানা অকারণ ভয়ে রোমাঞ্চিত হ'তে হ'তে আধো-ঘুম আধো-জাগরণে রাতটা কেটে গেল তার। ঘুম হয় নি বলেই ঘুম ভাঙতেও দেরি হয় নি। পুবের আকাশ ফরসা হবার আগেই দূরে কোথায় মুরগী ডাকার আওয়াজ কানে গেছে তার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠে বসেছে সে। প্রভাত আসছে জেনে ভয়টা কমে গেছে, তন্দ্রায় দুই চোখের পাতা ভারী হয়ে এসেছে এবার। কিন্তু এখন ঘুমিয়ে পড়লেই মুশকিল। বেলা দুপুরের আগে আর সে ঘুম ভাঙবে না হয়তো, সুতরাং সে বসেই রইল, বসে বসেই অপেক্ষা করতে লাগল আর একটু ফরসা হবার। আর বসে বসে এদিক-ওদিক চাইতে গিয়েই নজরে পড়ল ব্যাপারটা।

একটু-আধটু নজর চলবার মতো ঝাপ্‌সা আলো ফুটেছে তখন। তাতেই মনে হ'ল রাস্তা থেকে কিছু দূরে একটা বড় গাছতলায় কী যেন নড়ছে একটা। আর একটু ভাল ক'রে চেয়ে দেখবার পর বুঝল—মানুষ। এক নয়—একাধিক মানুষ। অন্তত তিন জন। কাল সন্ধ্যায় কি রাত্রে গাছতলায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল বোধ হয়, ঐখানেই ঘুমিয়েছে।...সঙ্গে সঙ্গেই মনে হ'ল এরাই কাল হয়তো ফিসফিস ক'রে কথা বলেছে নিজেদের মধ্যে আপসে—তারই শব্দ ওর কাছে ভয়াবহ, অনৈসর্গিক মনে হয়েছে।

আরও খানিকক্ষণ চেয়ে থাকবার পর, চোখ সেই অস্পষ্ট আলোতে আর একটু অভ্যস্ত হ'তে দেখতে পেল—তিন জনের মধ্যে দুটি স্ত্রীলোক একটি পুরুষ! মেয়ে-ছেলে দুটির গায়ে বোরখা। বোরখা পরেই ঘুমিয়েছে তারা। ভুল হবার কোনও সম্ভাবনা নেই। পুরুষটিকে তো দেখাই যাচ্ছে। ঐ মেয়েদের মধ্যেই একজনের বোধ

হয় একটু আগে ঘুম ভেঙেছে, সে আস্তে আস্তে উঠে বসল এবার। ওকেই বোধ হয় নড়তে দেখেছে দিল মহম্মদ একটু আগে। কারণ বাকী দুজন তখনও ঘুমে অচেতন।

যে মেয়েটি উঠে বসেছিল, সে খানিকক্ষণ সেখানেই নিথর হয়ে বসে রইল। সম্ভবত সেইভাবে সে তার সঙ্গীদেরই লক্ষ্য করল, তাদের ঘুম ভেঙেছে কিনা দেখে নিল ভাল ক'রে। তার পর খুব আস্তে আস্তে, যাতে সঙ্গী-সঙ্গিনীদের ঘুম না ভাঙে —এমন সন্তর্পণে উঠে দাঁড়াল। উঠেও যেন কী ভেবে ইতস্তত করল একটু, তার পর বোরখাটা খুলে সেখানেই রেখে যতদূর সম্ভব নিঃশব্দেই ওদিকে চলল, মাঠের দিকে।

এইবার তার গতি অনুসরণ ক'রে দিল মহম্মদও দেখল, সেদিকে—একটু দূরেই —বেশ একটা বড় জলাশয় আছে। রাত্রে অন্ধকারে সেটা নজরে পড়ে নি—কিন্তু এখন বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। প্রথম হেমন্তের পাতলা একটা কুয়াশা হালকা পেঁজা তুলোর মতো মাঝে মাঝে যেন এক-একটা ডেলা পাকিয়ে জলের ওপর স্থির হয়ে রয়েছে, তবু তার মধ্যে দিয়েই যতটা দেখা যায়—বেশ স্বচ্ছ জল, অর্থাৎ পুষ্করিণীটি শুধু আয়তনেই বড় নয়—জলও আছে বেশ। গভীর না হ'লে এত স্বচ্ছ কালো দেখাত না জলটা।

প্রথমটা দিল মহম্মদ ভাবল মেয়েটি প্রাতঃকৃত্য সারবার জন্যেই জলের দিকে যাচ্ছে। সেইটেই স্বাভাবিক। সে সসঙ্কোচে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এদিক ফিরে বসল। বস্তুত এ চিন্তা তারও ছিল—খোদা যে এমন ভাবে হাতের কাছেই এত বড় জলাশয় রেখে দিয়েছেন তা সে ভাবতে পারে নি। মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে নিল একবার।

কিন্তু সামান্য একটুক্ষণ এইভাবে বসে থাকবার পরই মনে হ'ল—আচ্ছা, মেয়েটি সোজা যেন পুকুরের দিকেই যাচ্ছে না?...আগেই পুকুরের দিকে—?

চাওয়া অন্যায়, নিশ্চয় তার দিকে কেউ চেয়ে নেই জেনেই নিশ্চিন্ত হয়ে আছে মেয়েটি। তবুও, মনে মনে এই গুনাগারির জন্যে খোদাতালার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে একবার ওদিকে ফিরে চেয়ে দেখল। সর্বনাশ—যা ভেবেছে তাই। আরে, মেয়েটা যে নিঃশব্দে জলেই নামছে—পাজামা, কামিজ সুদ্ধ। এটা প্রাতঃকৃত্যের ব্যবস্থা তো নয়ই—স্নানেরও নয়। এই প্রথম হিমের সময়, সারারাতে ঠান্ডা কনকন করছে নিশ্চয় পুকুরের জল—জামাকাপড় সুদ্ধ নেমে স্নান ক'রে সারাক্ষণ ভিজে কাপড়ে থাকবে, এ আবার কি উদ্ভট শখ!...আড়ে একবার গাছতলাটা দেখে নিল দিল মহম্মদ। না, সঙ্গে তো তেমন কোন জামাকাপড়ের পুঁটুলিও নেই ওদের। সামান্য কী একটু থলির মতো মাথায় দিয়ে শুয়ে আছে পুরুষটা। ভিজে জামাকাপড় ছেড়ে এখনই এক প্রস্থ শুকনো পোশাক পরবে—তেমন ব্যবস্থাও তো নেই দেখা যাচ্ছে।

না, মতলব ভাল নয় মেয়েটার।

সমস্ত চিন্তাটা মাথায় খেলে গিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে খুব সময় লাগল না দিল মহম্মদের, বড় জোর কয়েক লহমা। কিন্তু ততক্ষণে আরও অনেকটা জলে নেমে গেছে সে আওরৎ। বুক অবধি, আরও নিচে—গলা অবধি ডুবেছে তার। এও একটা কথা, যে স্নান করবে সে সোজাসুজি খানিকটা নেমেই ডুব দেবে—এমন আস্তে আস্তে, নিঃশব্দে—জল নাড়ার শব্দ না ক'রে নামবে না। আর এমন মধ্যে মধ্যে থমকে দাঁড়িয়ে ইতস্ততও করবে না বার বার। ঐ তো গলা অবধি নেমে গিয়েও একটু ফিরে এল, গাছতলাটার দিকে যেন একবার সতৃষ্ণ উৎসুক নয়নে চাইবার চেষ্টা করল। ওখন

থেকে অবশ্য দেখা সম্ভব নয়, দেখা গেলও না—তাই দু-এক মুহূর্ত পরে সে চেষ্টা বৃথা বুঝে আবার জলের দিকে ফিরল, আবার নামল গলা পর্যন্ত।

না, মতলব খারাপই, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এদিক দিয়ে নিঃশব্দে লাফিয়ে নেমে পড়তে দিল মহম্মদের বিশেষ দেরি হ'ল না। চোখের পলক পড়তে যেটুকু সময় লাগে তার মধ্যেই নেমে পড়ল সে। নরম কাদায় নামা—শব্দও হ'ল না কিছু। তারপর খরগোশের মতো লঘুপায়ে, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে যেন গুঁড়ি মারবার মতো ক'রে খরগোশের মতোই নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল সে। এই সময় মাঠে গিয়ে খরগোশ ধরা তার প্রায় নিত্য-কর্ম, জাল না পেতে সোজাসুজি ধরে সে—তাই গতিটা তার চিরকালই শশকতর দ্রুত।

দিল মহম্মদ যখন জলের ধারে গিয়ে পেঁছিল, তখনও মেয়েটি ডুব দেয় নি—তখনও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই গলা-জলেই।

দিল মহম্মদ অতটা লক্ষ্য করে নি—মেয়েটি ইতস্তত করছে অনেকক্ষণ থেকেই।

প্রথমটা এসেছিল খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই, পুকুরের ঢালু পথে নামবার সময়ও কোন দ্বিধা ছিল না মনে। কিন্তু একেবারে জলের ধারে গিয়ে থেমেছিল একবার। থামতে হয়েছিল। বোধহয় পায়ে ঠাণ্ডা জলটা লাগতে এতক্ষণকার স্বপ্নাবিষ্ট অভিভূত ভাবটা কেটে গিয়েছিল খানিক। ঠাণ্ডা দেশেরই লোক সে, তবে এ সব দেশে অঘ্রাণ পৌষ মাসের ঠাণ্ডাও খুব কম নয়, জলে কামড় আছে যথেষ্টই। জলটা পায়ে লাগতেই থমকে থেমেছিল একবার, পাড়ের দিকে চেয়েছিল। এখান থেকে ওপরের সে গাছ-তলাটা দেখা যায় না—সঙ্গের লোকদের দেখতে পায়ও নি। না পাক, দেখলেই মায়া বাড়বে, দেখতে না পাওয়াই ভাল, হয়তো মনে মনে বলেছিল মেয়েটি—তারপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভঙ্গীতে দুই ঠোঁট চেপে যতখানি সম্ভব নিঃশব্দে সন্তর্পণেই জলে নেমে-ছিল। প্রথম হাঁটু-সমান জলে পেঁছে আবার একমুহূর্ত থেমেছিল—কোমর-সমান জলে আর একবার। তারপর আর থামে নি, ধীরে ধীরে—জলেরও কোন শব্দ না ওঠে এইভাবে—বুক গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে নেমে গিয়েছিল সে।

এইবার স্থির হয়ে রইল কিছুক্ষণ, বৃথা জেনেও আর একটু উঠে এসে গাছ-তলাটা দেখবার চেষ্টা করল। তারপর আবার ফিরল গলাজলে। কিছুক্ষণ চোখ বুজে স্থির হয়ে রইল। তারপর একবার—যেন শেষবারের মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে, বোধ করি ভগবানের কাছে কোন অন্তিম প্রার্থনা জানিয়ে—মাথাটাও ডুবিয়ে দিল সে। হাত-পা ছেড়ে ডুব দিল।

আঃ, তলিয়ে যেতে এত আরাম! এত শান্তি এই হিম-শীতল রহস্যময় কালো জলে! কে বলে খোদা তোমার দয়া নেই!

কিন্তু সে আরাম সে শান্তি বিধাতা বোধ করি ওর অদৃষ্টে লেখেন নি। ঠিক তলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পূর্ব-মুহূর্তে কে একজন ঝপ ক'রে লাফ দিয়ে পড়ল জলে এবং বকে মাছ ধরার মতো ছোঁ মেরে জলের মধ্যেই ওর চুলের ঝুঁটিটা চেপে ধরল, তারপর সেইটে টেনেই সবল দৃঢ়হস্তে ওর মাথাটাও তুলে আনল জল থেকে।

চমকে উঠল মেয়েটি, ভয়ও পেল খুব। জলের মধ্যেই ঝটপট আঁকুপাঁকু ক'রে উঠেছিল। মাথাটা ওপরে আসবার পরও জলে দৃষ্টি ঝাপ্সা হয়ে থাকার কথা—রইলও তাই, কে টানছে তা ভাল ক'রে ঠাওর হ'ল না, শুধু মানুষটা যে পুরুষ মানুষ বুঝতে পেরে প্রায় আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, 'ভাইয়া!'

'উঁহু!' বেশ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, দিল মহম্মদ, 'মনে হচ্ছে তোমার ভাইয়া এখনও সেই গাছতলায় শুয়ে শুয়ে বেহেস্তের খোয়াব দেখছে।...এ বান্দা তোমার খাদেম—দিল মহম্মদ!'

বলছে আর ওপরের দিকে টানছে সে মেয়েটিকে।

খোঁপাটা তখনও ছাড়ে নি বা শিথিল করে নি হাত।

কিন্তু মেয়েটি ততক্ষণে ওকে দেখেছে। অপরিচিত চাষী গোছের তরুণ ছেলে দেখে বিষম ভয় হয়ে গেছে তার। সে প্রায় চেঁচিয়েই উঠল, 'এ কি—কে তুমি? তুমি তো আমার ভাইয়া নও, কেন আমার গায়ে হাত দিয়েছ তুমি? এ কী স্পর্ধা! ছাড়, ছাড় বলছি!'

কিন্তু তার চেঁচামেচি বা ধস্তাধস্তি কোনটাতেই বিচলিত হ'ল না দিল মহম্মদ! বরং মুখে একটা প্রশংসাসূচক চু-চু শব্দ ক'রে বলে উঠল, 'বাহবা, বা! নওজোয়ান লৌণ্ডীদের কথাই আলাদা!—হ্যাঁ, অল্প বয়সের জওয়ানীর একটা গরম আছে শুনেছি —লোকে বলে বটে, তা আমারও তো ধরো কিছু এমন বেশী বয়স হয় নি—কাঁচা বয়স বলেই যে এতটা গরম হতে হবে তা তো জানি না!—এই শীতে এই শেষরাত্রে ডুব দিয়ে চান করতে হ'ল সেইজন্যে! বলিহারি, বলিহারি!'

তখনও ওপরের দিকে আকর্ষণ কিন্তু ক'রেই চলেছে সে মেয়েটিকে।

ততক্ষণে পাড়ের ওপর উঠে এসেছে ওরা। গাছতলাটা পরিষ্কারই দেখা যায়। তবে ঘুমন্ত বাকী মানুষ দুটি তখন আর গাছতলায় নেই। দিল মহম্মদের জলে লাফিয়ে পড়ার শব্দে আর মেয়েটির চেঁচামেচিতে ওদের ঘুম ভেঙ্গে গেছে। তারাও আসছিল এই দিকেই, শব্দ অনুসরণ ক'রে। ওদের এ অবস্থায় দেখে পুরুষটি—সেও দিল মহম্মদেরই বয়সী ছেলে, কী হয়তো এক-আধ বছরের ছোটই হবে, কুড়ি-একুশ বছর বয়স হবে হয়তো খুব বেশী হ'লেও, এগিয়ে এসে বেশ একটু রূঢ় কণ্ঠেই বলল, 'এ কী—এসব কী ব্যাপার! কে তুমি, আমার বোনের মাথাতেই বা হাত দিয়েছ কেন! ছাড়, ছাড় শিগ্‌গির। আর গুল...এসব কি, তোর জামাকাপড় মাথা সমস্ত ভিজল কী ক'রে—কি করছিলি কি? এ কে, কোথায় পেলি একে?'

এবার দিল মহম্মদ মেয়েটির চুলের গোছা ছেড়ে দিল। ঈষৎ একটু অভিবাদনের ভঙ্গী ক'রে ছেলেটিকে বলল, 'আদাব ভাই সাহেব, বান্দার নাম দিল মহম্মদ, তোমার দোস্ত্‌।—আমি কাল এই পথ দিয়ে আমার পাওনা গম নিয়ে বাড়ি ফিরছিলুম— অন্ধকারে একটা গাড্ডায় পড়ে গিয়ে গাড়ি আটকে যায়, একা মানুষ সে গাড়ি তুলতে পারি নি রাত্রে। সারারাত গাড়ির ওপরেই কাটিয়েছি। এই একটু আগে ফরসা হ'তে এদিকে চেয়ে নজরে পড়ল এই নওজোয়ান লেড়কী এই ঠাণ্ডায় ঘুম থেকে উঠেই তোমাদের কাউকে না ডেকে সরাসরি গিয়ে জলে নামছ। খুব ভাল মনে হ'ল না— অথচ আমি গাড়ি থেকে নামতে নামতে এ লৌণ্ডীও ডুব দিয়ে ফেলেছে, তখন গিয়ে তোমাদের ডাকব, তোমরা এসে তুলবে—সে সময় ছিল না। তাই সোজাসুজি গিয়ে টেনে তুলেছি, চুলের ঝুঁটি ছাড়া কোথাও হাত দিই নি—খোদা সাক্ষী। একে জিজ্ঞাসা করতে পার—যদিও ওর শির একটু বেশী রকম গরম মনে হচ্ছে—শির ঠাণ্ডা করতেই সাতসকালে জলে নেমেছিল, এতক্ষণে তবু কি আর সে শির একটু ঠাণ্ডা হয় নি? মনে হয় সত্যি কথাই বলবে!'

দিল মহম্মদের মুখে চোখে এমনই একটা সহজ সারল্য, কথা বলবার এমন একটা অকপট ভঙ্গী যে—সে যে আগাগোড়া সত্যি কথাই বলেছে তা বুঝতে ঐ

ছেলেটির কোন অসুবিধা হ'ল না। যেন স্বচ্ছ স্ফটিক খণ্ডের মতোই তার মনের মধ্যে পর্যন্ত দেখতে পেল ও। বুঝল—সত্য কথা বলাই এর স্বভাব, মিথ্যাতে এখনও পর্যন্ত অভ্যস্ত হয় নি।

সে দুই হাত বাড়িয়ে দিল। দিল মহম্মদের ডান হাতখানা চেপে ধরে বলল, 'তুমি নিজে থেকে দোস্ত্ বলেছ ভাই, সে কথা যেন ফিরিয়ে নিও না। আমার নাম আগা, আমি জাতে পাঠান। এটি আমার বোন গুল্ আর ইনি আম্র মা-জান।...বহুদূরে থেকে আসছি আমরা, গরীব লোক—কাজকর্মের ফিকিরে দিল্লী চলেছি।...তুমি, তুমি ভাই আমার মহৎ উপকার করেছ, তুমি আমার পরিবারের বন্ধু হ'লে আজ থেকে। তোমার এ উপকার আমাদের কেউ কখনও ভুলতে পারবে না।'

'আরে ছো! ওসব কথা মুখেও এনো না ভাই আগা, যখন দোস্তি স্বীকার ক'রে নিয়েছ তখন আবার উপকারের কথা তুলছ কেন? দোস্তির মতো সাচ্চা জিনিস এ ঝুটা দুনিয়ায় আর কিছু আছে কি? দোস্ত্ নিজের ভায়ের চেয়েও আপন।...কিন্তু সে কথা থাক, তোমার বোনটি তো এখনই কাঁপতে শুরু করেছে—এ অবস্থায় থাকলে তো বুখার এসে যাবে একটু পরে। সঙ্গে বাড়তি কাপড়-জামা কিছু আছে কি? নইলে না-হয় ওপাশের জঙ্গলে গিয়ে ওগুলো একটু নিংড়ে নিক অন্তত, তাতে তবু জল্‌দি শুকিয়ে যাবে।

সত্যিই গুল কাঁপছিল ঠক্ ঠক্ ক'রে। আগা এতক্ষণ সেটা লক্ষ্য করে নি। তবে সে কাঁপুনি কতটা শীতে আর কতটা লজ্জায়, ভয়ে, উত্তেজনায় তা বলা কঠিন। আগা দিল মহম্মদের হাতটা ছেড়ে দিয়ে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সে কেঁদে ফেলল এবার। কাঁদতে কাঁদতেই অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'কেন কেন এভাবে আমাকে তোমরা দিনরাত পাহারা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছ! আমাকে বাঁচিয়ে রেখে কী লাভ তোমাদের! এ লোকটা কে, কোথা থেকে এসে আমাকে বাধা দিল এমন ক'রে! খোদা সুদ্ধ এমন দুশমনি করছেন কেন আমার সঙ্গে! আমার—আমার কি নিজের ইচ্ছে-মতো মরবারও স্বাধীনতা নেই?'

সে-কথা যেন শুনতেই পেল না আগা। ওর চোখের জলও বোধ হয় নজরে পড়ল না তার। সে একটা কৃত্রিম তর্জনের ভঙ্গীতে বলল, 'ঢের ঢের বেঅকুফ দেখেছি গুল্ কিন্তু তোর মতো বুদ্ধু যদি আর একটি দেখেছি!...আরে, তুই কে শাহ্‌জাদী না সুলতানা,—না সঙ্গে বিশটা দাসী-চাকর, মালপত্র, ঘোড়া-উটের রেশালা চলেছে?—বলি ক-গণ্ডা পোশাক আছে তোর সঙ্গে শুনি? কী আক্কেলে এই ভোররাতে পোশাকটা ভিজিয়ে বসে রইলি বল্ তো! এতই যদি গোসল করার ইচ্ছা হয়েছিল, পোশাকটা খুলে জলে নামতে পারতিস!'

বলতে বলতেই দিল মহম্মদের দিকে নজর পড়ল ওর। বলল, 'দ্যাখ্ দিকি—শুধু কি নিজের বেকুফিতে নিজেই কষ্ট পাচ্ছিস, তোর দুর্বুদ্ধির জন্যে আমার দোস্তের হালখানা কি দাঁড়িয়েছে চেয়ে দ্যাখ! সত্যি সত্যি, ওই বা কী ক'রে জানবে যে তুই গোসল করতে নামছিস! ওর তো ভয় হ'তেই পারে। তোর এ কাণ্ড-কারখানা দেখলে কার না ভয় হ'ত! তোর সঙ্গে সঙ্গে ওরও পোশাকটা যে গোটা জলে ভিজল, ও এখন কী পরে! রোদ যে কখন উঠবে তার তো ঠিকই নেই!...তুই নেহাৎ একটা গাধা একেবারে!'

ওর বলবার ভঙ্গীতে দিল মহম্মদ হেসে উঠল হা-হা ক'রে। কিন্তু সে হাসির ছোঁয়াচ গুল্‌কে স্পর্শ করতে পারল না।

সে মুখ গোঁজ ক'রে জবাব দিল, 'তামাশা করছ কেন? এ তামাশার কথা নয় আমার কাছে। স্নান করতে তো জলে নামি নি—মরতেই নেমেছিলাম। দয়া ক'রে আমাকে সেটুকু স্বাধীনতা দিলে আর পোশাকের দরকার থাকত না। আর কিছুরই দরকার থাকত না। অনর্থক এত কষ্ট পেতে হ'ত না তোমাদের।...আমাকে বাঁচাতে গেলে কেন তোমরা? আমার বেঁচে লাভ কি? আমি যতক্ষণ থাকব—না আমার না তোমাদের—কারুর ভাল হবে না।'

'এই তো! দু নম্বরের বেকুফি! মরতেই যদি যাচ্ছিলি তো পোশাকটা নষ্ট করছিলি কেন সেই সঙ্গে? আরও তো পোশাকটা খুলে রাখা উচিত ছিল তোর! তোর না-হয় কোন কিম্মৎ নেই—পোশাকটার তো আছে! অন্য লোকে পরলে উপকার, বেচলেও চাই কি দু-চার দামড়ি পাওয়া যাবে!—ওটা নষ্ট করতে যাচ্ছিলি কী আস্পর্ধায়? ওটা কি তোর শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি?'

তারপর একটু যেন গম্ভীর হয়ে গিয়ে বোনের কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'আচ্ছা, এ কী পাগলামি শুরু করলি বল্ তো? এখন তুই মরলে আমাদের কী উপকার হবে বলতে পারিস? আমাদের পিছনে পিছনে এই যে দুশমনের দল তাড়া ক'রে ফিরছে সে কি আর তোর জন্যে? তাদের লক্ষ্য এখন তো আমি। তুই ম'লে কি তারা আমাকে রেহাই দিয়ে যাবে ভাবছিস? না, আমার খুনের দায়টা আপনা-আপনি নেমে যাবে ঘাড় থেকে? মাঝখান থেকে এইসব ক'রে আমাকে কেন দুর্বল ক'রে দিস্ বল্ তো? তোর ভাবনায় আমি যে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতেও পারি না!'

তার পর আবার একটু হাল্‌কা সুরে বলল, 'তুই আর একটা কি বলছিলি না—তোর মরবার স্বাধীনতা! সত্যিই সে স্বাধীনতা এখানে নেই। এ তোদের পাঠান মুলুক নয়—এ ইংরেজ কোম্পানীর রাজত্ব, এখানে আত্মহত্যা করতে গেলে সাজা হয়।'

'মরে গেলে আর কী সাজা হবে? মরা মানুষকে ধরবে কে?'

বোনটি বলে ওঠে।

'হ্যাঁ—অলবৎ। মরতে পারো তো কথা নেই। কিন্তু যদি বেঁচে যাও তো, উল্‌টো বিপত্তি—তখন আবার থানা-পুলিস করতে হবে! বেঁচে গেলেই বাঁচবে না...জেল খাটতে হবে হয়তো!'

বলে আবারও হেসে উঠল সে খুব একচোট। কিছুক্ষণ আগের মেঘটা ইতিমধ্যেই কেটে গেছে ওর মন থেকে। ওর মন যেন শরতের আকাশ—ওর বোন ভাবে, কোন মেঘই জমতে পারে না বেশীক্ষণ। সত্যিই, এ লোককে ছেড়ে যেতেও কষ্ট হয় যে!

এর মধ্যে ওদের মা কাছে এসে পড়েছিলেন, তিনি এদের কাণ্ডকারখানা কিছু বুঝতে না পেরে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'এ কী ব্যাপার—আগা, এসব কী কাণ্ড? গুল্-এর পোশাক ভিজে কেন? এত ভোরে—এ, এসব কি?'

'কিছু না, কিছু না বুড্‌ঢী, ওসব নও-জওয়ানদের ব্যাপার, তুমি জানতে চেও না। ও তুমি বুঝবেও না কিছু। আসলে তোমার মেয়ের মাথাগরমের ধাত তো, মাঝে মাঝে যখন খুব গরম হয়ে ওঠে, তখন উৎকট কিছু না করলে ঠাণ্ডা হয় না!...বহিন্‌জী আমার জলের মধ্যে খোদাতালার সঙ্গে মোকাবিলা করতে গেছল একটু—এই আর কি!'

মাও খুব খানিকটা বকাবকি করলেন মেয়েকে। ছেলেকেও বকলেন কিছু. বিলাপ করলেন নিজের দুরদৃষ্টের জন্যে। তাঁরই নসীব, নইলে ছেলের সামান্য হঠকারিতার জন্যে এমন শাস্তি আজ তাঁকে ভোগ করতে হয় কেন! খোদা যে কেন তাঁকে কাছে টেনে নিয়ে অব্যাহতি দিচ্ছেন না, তাও জানতে চাইলেন বার বার আকাশের দিকে চেয়ে।

ইতিমধ্যে আগা দ্রুতহস্তে ওদের পোঁটলা-পুঁটলি গুছিয়ে নিয়েছে। সে এতক্ষণ মাকে একটা কথাও বলে নি, ওঁর বিলাপ বন্ধ করারও চেষ্টা করে নি, বরং প্রশান্ত মুখে নিজের হাতের কাজ ক'রে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে তাদের ছোট্ট পুঁটুলিটা খুলে সে একটা কামিজ বার ক'রে নিয়েছিল, ঐ একটা বাড়তি জামাই অবশিষ্ট ছিল তাদের। সে কামিজটা এবার গুলের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'ঐ জঙ্গলের ধারে গিয়ে জামাটা বদলে নে, পাজামা তো আর নেই—তবু জামাটা শুকনো পরলে শীত কম লাগবে। তোরা তৈরী হয়ে থাক—আমি ততক্ষণ দেখে আসি দোস্তের গাড়িটা কি অবস্থায় পড়ে আছে।'

ওর কথাটা ওর মার তত পছন্দ হ'ল না বোধ হয়। তিনি একটু অপ্রসন্ন সুরে বললেন, 'কিন্তু ঐসব গাড়ি-টাড়ি দেখলেই চলবে! ফরসা হয়ে গেল চারিদিক, তুমি তো এখনই হাঁটবার জন্যে তাড়া লাগাবে! হাঁটতে গেলে কিছু তো পেটে পড়া দরকার—সে ব্যবস্থার কী হচ্ছে? সেটা আগে দেখলে হ'ত না—রুটি দু-চারখানা, কি অন্তত একটু দুধ? আমার না-হয় কিছু না খেলেও চলে—খাবার আর সাধও নেই—কিন্তু ঐ বাচ্চা মেয়েটা, তুই—তোরা তো কালও কিছু খাস নি। পাশেই তো গ্রাম ছিল।—একটু দেখলি না কেন, কিছু পাওয়া যায় কি না!'

গলা খাটো ক'রে আগা জবাব দিল, 'আরে বুড্ঢী, আমার মাথা তো তোমার মতো খারাপ হয়ে যায় নি! দেখছ না কত বড় গ্রাম, কত ঘর-বাড়ি দেখা যাচ্ছে এখান থেকেই—কমসে-কম পঞ্চাশ-ষাট ঘর লোকের বাস হবে। ওখানে রুটি মাগতে গিয়ে একটা রাও ওঠাই, জানাজানি হোক—পাঁচশো রকম জবাবদিহি দিই ওদের কাছে—তার পর আমাদের দুশমনের কানে পৌঁছে যাক খবরটা ঘোড়ার ডাকের মতো চটপট!...বাহবা বুদ্ধি তোমার! মনে হচ্ছে শহরের কাছে এসে পড়েছি, এবার পথে আরও ঢের গ্রাম পড়বে। একটা ছোটোখাটো গ্রাম কি পথের ধারে এক-আধখানা বাড়ি দেখলেই গিয়ে হাত পাতব। ভয় নেই। এখনও তো তবু একটু আঁধেরার ভাব আছে, এই আলো-আঁধারি থাকতে থাকতে খানিকটা এগিয়ে যাই চলো!...দু-দিন না খেয়ে যদি পারি তো আরও দু-চার দণ্ড পারব।...চল দোস্ত্, দেখে আসি ব্যাপারটা কি হয়েছে তোমার বয়েল গাড়ির!'

সে আর মা-বোনকে দ্বিরুক্তি করবার অবকাশ না দিয়েই দিল মহম্মদকে টানতে টানতে নিয়ে গেল সেই হাবড়ের দিকে।

॥ দুই ॥

শাহী সড়ক নামটা যত গালভরা, রাস্তাটা আসলে তত ভয়ানক কিছু নয়। কোন্ এককালে খোয়া পিটিয়ে হয়তো পাকা করা হয়েছিল, কিন্তু তার পর বহুকাল হাত

না পড়ার সে-সব খোয়ার চিহ্ন পর্যন্ত এক-এক জায়গায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অনবরত লোহা-বাঁধানো বয়েল গাড়ি ও টাঙ্গার চাকা চ'লে পাকা রাস্তা কাঁচা রাস্তায় পরিণত হয়েছে, ফলে এক-এক জায়গায় গর্ত হয়ে গাড্ডার সৃষ্টি করেছে কাঁচা মেঠো রাস্তার মতোই। এমনি একটা গাড্ডাতেই গাড়িটার একপাশের চাকা প'ড়ে অমন অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। নইলে শুধু রাস্তার কাদা হ'লে রঙবাহাদুররা চাকা টেনে তুলতে পারত। তা ছাড়া মাল বোঝাই ভারী গাড়ি, বিরাট নৌকোর মতো উঁচু পাড়-তোলা-গাড়ি বোঝাই গম, খুব কম হ'লেও পাঁচিশ-ত্রিশ মণ মাল হবে। সেই বোঝা ঐ গাড্ডা থেকে টেনে তোলার সাধ্য কোনো বয়েলেরই নেই।

আগা এসে চারিদিক দিয়ে ঘুরে ব্যাপারটা দেখল। বয়েলকে আরাম দেবার জন্যে দিল মহম্মদ দুটো বাঁশের খোঁটার ওপর গাড়ির ভারটা রেখে বয়েলকে আলগা ক'রে দিয়েছিল। এরকম খোঁটা এখানকার সব গাড়িতেই থাকে—মজবুতই হয় সেগুলো, গাড়ির ওজনে সে দুটোও অনেকটা প'তে গেছে পাঁকের মধ্যে। আগা নিজের পাজামাটা যতদূর সম্ভব হাঁটুর ওপর তুলে আগে গিয়ে সেই ঠেকনোর খোঁটা দুটো তুলে আবার বয়েল জুড়ল গাড়িতে, তার পর দিল মহম্মদকে একদিকের চাকায় কাঁধ লাগাতে বলে নিজে আর এক চাকায় কাঁধ দিয়ে ঠেলতে লাগল।

প্রথমটা মনে হয়েছিল অসম্ভব, কারণ সারারাতে এতখানি বোঝার ভারে বেশ ভালরকমই বসেছে চাকা দুটো। প্রাণপণ চেষ্টার ফলে সেই ঠাণ্ডার দিনেও আগার কপালে ঘাম দেখা দিল। হাত আর কাঁধের পেশীগুলো অস্বাভাবিকরকম ফুলে উঠল। তবু অনেকক্ষণ পর্যন্ত চাকা দুটো নড়ানো গেল না একচুলও। বরং এমন মচমচ শব্দ করতে লাগল যে মনে হ'ল, চাকা ভেঙ্গে ঐ গাড়িসুদ্ধ গামের নিচে বুঝি তখনই ওদের সমাধি হয়ে যাবে। তবে দুজনেই তরুণ এবং বলিষ্ঠ খেটে-খাওয়া লোক বলে অসম্ভবও সম্ভব হ'ল শেষ পর্যন্ত। নানাবিধ ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ ক'রে গাড়িটা আবার একসময় রাস্তার ওপর উঠে পড়ল।

'সাবাস ভাই জোয়ান! সাবাস!—হ্যাঁ, মরদের বাচ্চা বটে! পাঠান মুলুকের ইজ্জৎ রাখলে আজ!' সরব প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল দিল মহম্মদ। শুধু প্রশংসাই নয়—তার চোখে আন্তরিক কৃতজ্ঞতাও ফুটে উঠল।

ততক্ষণে চারিদিক বেশ ফরসা হয়ে গেছে, পুবের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে রীতিমতো—অর্থাৎ সূর্যোদয়ের সূচনা। আর অপেক্ষা করার সময় নেই। আগা জামার আস্তিনে কপালের ঘাম মুছে তাড়াতাড়ি আবার মাঠের দিকে ফিরল। ইচ্ছা পা দুটোর কাদা ধুয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি রওনা দেবে।

'আরে আরে—এ কী তাজ্জব কাণ্ড! কথা নেই বার্তা নেই, চললে কোথায়?'

দিল একটু বিস্মিত হয়েই ওর পিছু-পিছু চলতে থাকে।

'আপাতত ভাই এই কাদাটা ধুয়ে আসি—'

'সে তো আমিও ধোব। তারপর?'

'তারপর এখনই হাঁটা শুরু করতে হবে ভাই, আর একটুও দেরি করা চলবে না। খোদা পথের মধ্যে এমন বন্ধু মিলিয়ে দিলেন বটে কিন্তু দু-দণ্ড বসে দোস্তি কায়েম করব সে সময় নেই।'

'আরে, সময় নেই তা তো বুঝলুম। কিন্তু যাবে কোথায়, এত তাড়া কিসের?'

'যাব দিল্লী শহরে। বললুম তো তোমাকে। সুদূর পাঠান মুলুক থেকে আসছি রুজি-রোজগারের ধান্দায়। শুনেছি দিল্লী খুব ভারী শহর—সেখানে

রোজগারের অনেক পথ খোলা। তাই সেখানে যাচ্ছি। আসলে এই এতটা পথ আসতে পয়সা-কড়ি যা ছিল সব শেষ হয়ে গেছে—এখন বলতে গেলে ভিখ মেগে খাচ্ছি। তাই যত তাড়াতাড়ি সেখানে পেঁছতে পারি ততই ভাল—সেখানে গেলে কি চটপট কাজকর্ম কিছু মিলবে না?'

'তা মিলবে। অবিশ্যি মিলবে। তবে দোস্ত্, তুমি এই গরীব চাষীকে দোস্ত্ বলে স্বীকার করেছ বলেই দোস্ত্ বলে ডাকতে সাহস করছি—অপরাধ নিও না—আর সেই দোস্তির ভরসাতেই কথাটা বলছি—তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে গোটা পথটাই তোমরা পায়দলে আসছ, আর সে পথ চলছও অনেকদিন ধরে। অন্তত চেহারা দেখে তাই মনে হচ্ছে আমার। পাঠান মুলুকটা ঠিক কোথায় তা জানি না—তবে শুনেছি বহুৎ দূর! সেখান থেকে পায়দলে আসার মেহনৎ আছে, আর যাই হোক—জেনানার কাজ নয়।...তা যদি কিছু মনে না করো তো বলি—তোমরা আমার এই গাড়িতেই চড়ে বসো না কেন! তবু তো কিছুটা আসান হবে। আমার বাড়ি হ'ল গাজীমণ্ডিতে—দিল্লীর পথেই পড়বে, সামান্য দূর—আমারও বুড়ো মা আছে বাড়িতে—দুটো একটা দিন থেকে যদি বিশ্রাম ক'রে যাও তো বুঝব সত্যিই দোস্ত্ বলে মেনে নিয়েছ মনে মনে, শুধুই মুখের কথা নয়!'

ততক্ষণে ওদের পা ধোওয়া শেষ হয়ে গেছে, আবার পাড়ে উঠে এসেছে ওরা। দিল মহম্মদ প্রশ্ন শেষ ক'রে প্রায় ওর পথ আগলে দাঁড়াল।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল আগা, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রইল দিল মহম্মদের মুখের দিকে। কোথাও কোন কপটতার ছায়া নেই সে মুখে—নেই কোন দুশমনির কালো চেহারা।...মার দিকেও চাইল একবার। হাঁটবার শক্তি আর নেই তাঁর একদম। কদিনই খানিকটা ক'রে কাঁধে করতে হচ্ছে তাঁকে—অথচ সে-ই বা কতক্ষণ চলতে পারবে অত বড় বোঝা কাঁধে চাপিয়ে? তার দেহেও ক্লান্তি নেমেছে—দেহে ও মনে দুই-ই। পর পর দীর্ঘকাল উপবাস এবং এই অবিশ্রান্ত হাঁটা—এর ফলে ওর আগের সে শক্তির আর কিছুই অবশিষ্ট নেই বলতে গেলে। এ অবস্থায় এই—হয়তো বা দৈবপ্রেরিত—প্রস্তাব মেনে নেওয়াই ভাল। সে মন স্থির ক'রে ফেলল—হেসে বলল, 'কিন্তু ভাই দিলু মিয়া, তোমার গাড়িতে উঠব কোথায় শুনি? গমে তো গাড়ি বোঝাই, মানুষ বসবার জায়গা কোথায়?'

ওর অজ্ঞতায় ওর জন্য যেন দুঃখ বোধ করে দিল মহম্মদ। বলে, 'আরে ভাইয়া, সেই তো সুবিধে। গমের ওপরই চড়ে বসো, তোফা গদীর মতো আরাম লাগবে। নাও, নাও—আর দেরি করো না, উঠে পড় চটপট। তিন দিন বাড়ি ছাড়া, দুপুরের মধ্যে বাড়ি না পেঁছুলে মা বুড়ী ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদতে বসবে।...বরং এক কাজ করো, আগে তোমার—মানে আমাদের মাকে তুলে দাও, তারপর ও লেড়কী—তোমার বহিন না কে, ওকেও উঠিয়ে দাও। ওদের সরম লাগে তো বলো আমি ওদিকে মুখ ক'রে দাঁড়াচ্ছি!'

'হ্যাঁ, ও আমার বোন গুলে—ওকে গুল্লু মিয়া বলে ডাকি আমি। ও আমার ভাই-বোন দুই-ই। ও নিজেই উঠতে পারবে। তবে তুমি একটু পিছন ফিরেই দাঁড়াও না হয়, অমন গাছে চড়ার মতো চড়তে ওদের একটু সময় লাগবে বলেই মনে হচ্ছে।'

পিছন ফিরে দাঁড়াতে গিয়েও কী যেন মনে পড়ে যায় দিলুর, সে আবার এদিকে ফিরে বলে, 'র'সো র'সো, আর একটা কথা সেরে নিই। কিছু মনে ক'রো

না যেন, তুমি আমাকে দোস্ত্‌ বলেছ, আমি তোমাকে রিস্‌সাদার বলেই মনে করি। তা ছাড়া আমরা মুখ্যু-সুখ্যু লোক, অত রেখে-ঢেকেও কথা বলতে শিখি নি...আমার যেন কেমন মনে হচ্ছে তোমাদের মুখ দেখে—অনেকক্ষণ বোধ হয় কিছু দানাপানি পেটে যায় নি তোমাদের, হয়তো বা কাল রাত থেকেই ভুখা আছ। ঠিক কি না?' আসলে বুড়ীর কথাগুলো সে শুনেছিল, সেটা চেপে গিয়ে ঘুরিয়েই বলল একটু।

আগাও প্রাণপণে ভুরু কুঁচকে আকাশের দিকে চেয়ে যেন কী একটা মনে করবার চেষ্টা করে, তারপর বলে, 'তা সত্যি কথা বলতে কি, আমারও এখন কতকটা সেই রকমই ঠাওর হচ্ছে। মনে ছিল না ঠিক—তুমি মনে করিয়ে দিলে বলেই মনে পড়ল।...ঠিকই ধরেছ তুমি।...বা, তোমার কী সাফ্‌ মাথা আর কী সাফ্‌ চোখ! তোমার এসব চাষবাস না ক'রে উজীরী করাই উচিত ছিল। আমাদের মুখ দেখেই ধরলে আমরা ভুখা আছি! আশ্চর্য তো!'

আগার কণ্ঠের প্রচ্ছন্ন কৌতুকটা দিলু মহম্মদ ধরতে পারে না। সে এটাকে তার প্রাপ্য প্রশংসা মনে ক'রে আরও উৎসাহিত হয়ে ওঠে! বলে, 'আরে চাষার ঘরের ছেলে চাষ ক'রে খাই—তাই ব'লে তো উল্লুও নই, গাধাও নই। ভগবান চোখ দুটো দিয়েছেন কী করতে? তা শোন ভাইয়া, আমি বলি কি, এক কাজ করো—আমার এই গামছাতে কমসে কম চোদ্দ-পনেরো খানা রুটি আছে—ভারী ভারী বেজোরের রুটি, আধা চানা আর আধা গেঁহুর আটা—খুব মিঠা, রুটি করার সময়ই মা বুড়ি বুদ্ধি ক'রে নিমক আর মির্চা লাগিয়ে দিয়েছিল—তোফা খেতে হয়েছে—সব্‌জী-উব্‌জী কিছু লাগবে না। এস আমরা সকলে ভাগ ক'রে খেয়ে নিই। আর এই লোটাতে বাঁধা দুধও আছে—যেখান থেকে কাল রাত্রে রওনা দিয়েছি সেখান থেকে টাটকা দুধ দুয়ে সঙ্গে দিয়েছে—আমার ফুফুর নানাশ্বশুর—একেবারে খেয়ে রওনা দিই আমরা!'

'সেধো ভাত খাবি—না হাত ধোব কোথায়?' আগারও তখন সেই অবস্থা। সে এক কথায় রাজী হয়ে যায়। শুধু একবার ক্ষীণকণ্ঠে বলে, 'আমরা সবাই খাব—তোমার যে বড্ড কম প'ড়ে যাবে ভাই! না-হয় একটা একটা ক'রে দাও আমাদের শুধু—'

'বাহ্‌, বাহ্‌!—বাঃ!!' মুখ-হাত নেড়ে দিলু মহম্মদ ব'লে ওঠে, 'তোমার তো খুব বুদ্ধি দেখছি, তারিফ না ক'রে থাকতে পারছি না। আম্মাজান আসবার সময় এক গাদা রুটি দিয়েছিল, তিন দিনের মতো। যেখান থেকে গেঁহু আনতে গেছি সেখানেও তো সব আপনার লোক, সবাই রিস্‌সাদার, কেউ দূর-সম্পর্কের, কেউ বা নিকটের—তারা তাজা রুটি বানিয়ে দিয়েছে—বেঁচেছিল কি কম? তবু তো পথে আসতে আসতে কত রুটি বান্দর-কুত্তাকে খাইয়েছি। এতই বা খাবে কে?...আমি কি রাক্ষস? তোমরা না খেলে ফেলাই যেত। আর এই তো—দুপুরের মধ্যে ঘরই পৌঁছে যাব!'

দিলু আর ওদের কথা বলার অবকাশ দিল না। গাড়ির একটা বাঁশে ঝোলানো দুধের লোটা আর গামছায় বাঁধা রুটির গোছা এনে গাড়িরই পাশে এক জায়গায় পাথের ওপর বসে পড়ল। ওদের অবশ্য বেশী কথা বলার শক্তিও ছিল না। সকলেই নিঃশব্দে খেতে শুরু ক'রে দিল, মেয়েরা একটু ওদিক ফিরে বসে— দিলুর সেদিকেও নজর খুব সাফ্‌। রুটি ফুরিয়ে আসছে সেদিকে বুঝে—যথাসময়ে আবার দুখানা ক'রে রুটি আগার হাতে এগিয়ে দিচ্ছে, 'ভাইয়া, ওধারেও দাও, অমন স্বার্থপরের মতো একা কি খেতে আছে?' বলছে আর হাসছে হা-হা ক'রে।

রুটি শেষ হতে একই লোটা থেকে সকলে একটু ক'রে দুধ খেয়ে নিল। তার পর দিল মহম্মদ ওধারে গিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়াল চোখ বুজে—অর্থাৎ এবার ওদের উঠিয়ে দাও।

আগা মা আর বোনকে কাঁধে ক'রে গমের ওপর তুলে দিল, ইশারা করল মুখ ঢেকে শুয়ে পড়তে গমের শয্যায়— কিন্তু নিজে সেখানে উঠল না, দিলুর পাশে চালকের সেই সামান্য জায়গাতেই ভাগাভাগি ক'রে বসল। বলল, 'বেশ গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে—ও টঙের ওপর জেনানা মহলে কী করব, মুখ বুজে যাওয়া বৈ তো নয়!'

ওর আসল উদ্দেশ্য ছিল অন্য। এই ছেলেটি অনেক উপকার করল তাদের, তার অপকারের কারণ হ'তে সে পারবে না। একেবারে অপরিচিত মানুষকে একদণ্ডে আপনার ক'রে নিয়েছে, পরমাত্মীয়ের মতোই ব্যবহার করেছে। কিছু না জেনে, কিছু না জানতে চেয়ে সরল বিশ্বাসে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে। এতখানি সহৃদয়তা ও আন্তরিকতার বদলে সব কথা গোপন ক'রে নিজের সুবিধা নিতে আগা রাজী নয়। ওর মনে হ'ল, এ আতিথেয়তা যেন ওকে ঠকিয়ে আদায় করা হচ্ছে। যদি তাকে বা তাদের উপলক্ষ ক'রে পরে ওর ওপর কোন বিপদ এসে পড়ে তো আগা তার সৃষ্টি-কর্তার কাছে কী জবাবদিহি করবে?

গাড়ি ছাড়বার পরও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল আগা, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'দ্যাখো ভাই দিলু—তুমি খাঁটি সত্যি কথাটাই ধরেছ। আজ আট-ন' মাস ক্রমাগত আমরা হাঁটছি। তার ভেতর অর্ধেক দিন আমাদের খাওয়া জোটে নি। ভরসা ক'রে কোন বড় গ্রামে ঢুকে খাবার কি আশ্রয় চাইতে পারি নি, ভয় ছিল জানাজানি হয়ে গেলে কোন্ পথে গেছি সে খোঁজ পেয়ে যাবে আমাদের দুশ্‌মনরা। বড় রাস্তাতেই হাঁটতে সাহস করি নি আমরা—দিনমানে তো নয়ই। আর তাইতেই আমাদের এত দেরি লেগেছে। আজ নেহাৎ নাচার হযেই এ পথে আসছিলুম। তুমি দু-এক দিনের জন্যে আশ্রয় দিতে চাইছ—সেটা যে কতখানি দরকার আমাদের তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। সে আশ্রয় আমাদের কাছে খোদার আশ্রয়ের মতোই। কিন্তু তবু মিথ্যে কথা বলেও সে আশ্রয় নিতে পারব না। তোমাকে 'আমাদের সব কথা খুলে বলব, তারপরেও যদি বাড়িতে নিয়ে যেতে চাও তো ভাল, নইলে সাফ্ বলে দিও, পথেই আবার নেমে চলে যাব। তাতে তোমার কোন দোষ লাগবে না, খোদার কাছে তোমার জন্য দোয়া মানাতে মানাতেই চলে যাব আমরা।'

দিল মহম্মদ বেচারী নেহাৎই ভাল মানুষ, সে এসব কথার গূঢ়ার্থ কিছু বুঝল না। খানিকটা বোকার মতো শূন্যে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'দ্যাখো ভাই আগা, তোমাকে দোস্ত্ বলেছি, ভাইয়া বলেছি—এই ঢের। তুমি বলতে চাও তোমার কথা—বলো। সে তোমার মর্জি। আমি কিন্তু কিছু জানতে চাই না। আর তাতে আসবে-যাবেনাও কিছু। এখন থেকে তোমার বিপদ আমার বিপদ এক, তোমাকে ঘরে নিয়ে গেলে যদি আমার যথাসর্বস্বও যায় তো বুঝব সে খোদার ইচ্ছা, তার জন্যে তোমাকে দায়ী করব না—কি নারাজ হব না।'

আগা ঠিক ওর পেছনে বসে ছিল, সে মনের আবেগে আর আনন্দে জড়িয়ে ধরল দিলুকে।

'তোমার মতো দিল্‌দার লোকই খুঁজছিলাম দোস্ত্, তোমাকে দোস্ত্ বলা আমার সার্থক হয়েছে!'

॥ তিন ॥

তবু আগা ওর পূর্ব ইতিহাস সব খুলেই বলল দিল মহম্মদকে। দীর্ঘ পথ—যেতে যেতেই বলা শেষ হয়ে গেল। কিছুই না, এতখানি কষ্টের জন্য দায়ী ওদের মন্দ ভাগ্যই, না হলে এক মুহূর্তের একটা কাজের পরিণাম এই দীর্ঘদিন ধরে, হয়তো বা জীবন-ভোরই টেনে বেড়াতে হবে কেন?

না, দেশ সম্বন্ধে মিথ্যে কিছু বলে নি। বর্তমান কোম্পানীর রাজত্বের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পাঠান মুলুকের রাজমাকেই বাড়ি ওদের। সামান্য জায়গা—দু-চার ঘর লোকের বাস। কিছু চাষবাস হয়, আপেল আঙুর আখরোটের ফসলও হয় কিছু—এ ছাড়া আছে ভেড়া চড়ানোর কাজ, পশম কাটা, পশমের সুতো তৈরী; এবং আর একটা কাজ অবসর সময় ওরা সকলেই কিছু কিছু করে, লুঠতরাজ। সে সামান্যই অবশ্য। তাতে মুনাফার চেয়ে আনন্দটাই বড় কথা। কিন্তু কতকটা সেই জন্যই ওদের মুলুকে চাষীই হোক আর গুজারই হোক, সবাই ছেলেবেলা থেকে বন্দুক ছুঁড়তে, ঘোড়ায় চড়তে আর তলোয়ার চালাতে শেখে। আগা যদিও গরীব চাষীর ছেলে, তবু সে অনায়াসে গুলি ছুঁড়ে কি তীর চালিয়ে একটা ঘাসের ডগা চিরে দিতে পারে।

তবে আগা ওসব লুঠতরাজের দলে থাকত না কখনই। তার বাবা ছিলেন ধর্মভীরু লোক, তিনি সেইরকম শিক্ষাই দিয়ে গিছলেন। চাষী গৃহস্থের ছেলে সে, নিজের চাষ-বাস নিয়েই থাকত। এক বিঘের ওপর ওদের আখরোট আর আঙুরের বাগান ছিল, বাদামও হ'ত কিছু কিছু। আগে ওসবের বিশেষ দাম ছিল না, কিন্তু ইদানীং কোম্পানীর আমলে একবার হিন্দুস্তানে এনে ফেলতে পারলে মারা যাওয়ার ভয় থাকে না—দামও পাওয়া যায় ভাল। এক কথায় ওর বাবার আমলের চেয়ে ওদের আমলে সচ্ছলতা এসেছিল, সুখ ও শান্তির মধ্যে থাকবার আশা জেগেছিল ওদের মনে।

এমন সময়ে—যাকে বলে বিনা মেঘে—এই বজ্রপাত!

ওর আর ওর বোন গুল্লুর বিয়ের সম্বন্ধ আসছিল অনেক জায়গা থেকেই। মোটামুটি একটা ঠিকও হয়ে গিয়েছিল। ইদুজ্জোহার পরব শেষ হলেই বিয়ে হবে দুজনের একেসঙ্গে, ওর মা এই ঠিক ক'রে রেখেছিলেন। এমন সময় ওদের সর্দারের ছেলে ওর বোনকে বিয়ে করতে চেয়ে লোক পাঠাল।

এমনিতে এটা সৌভাগ্যের কথাই। কারণ আমাদের মুলুকের মালিক কে তা আমরা জানি না', আগা বলল, 'কাবুলের আমীর বলেন তিনি মালিক, ইংরেজ কোম্পানী বলে তারা মালিক। আমরা কিন্তু কাউকেই জানি না, আমাদের কাছ থেকে কেউ খাজনাও আদায় করতে পারে নি আজ পর্যন্ত। ইংরেজরাও গোলাগুলি ছুঁড়েছে, আমীরও লুঠপাট ঘর-জ্বালানো সব রকম চেষ্টা ক'রে দেখেছেন, সুবিধে হয় নি। তার কারণ আমাদের মুলুকটাই এমন দুর্গম আর মানুষগুলো এমন শক্ত যে ওখানে গিয়ে বাগ মানানো কঠিন। সুতরাং রাজা বলো, মালিক বলো আমাদের কাছে ঐ সর্দারই। এক-এক ঘাঁটির এক-এক সর্দার, সে-ই সেখানকার দণ্ডমুণ্ডের

কর্তা। কাজেই তার ছেলের সঙ্গে বিয়ে মানে রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে—হয়তো কাল সে-ই ছেলেই সর্দার হবে—তখন তো সে-ই রাজা!...কিন্তু তবু মা রাজী হ'ল না। ও ছেলেটা নাকি ভারী বদ, এর মধ্যেই আরো দুটো বিবি বিয়ে করেছে...ভাল ভাল ঘরের মেয়ে তারা—আবার একটা বিয়ে করতে চাইছে। মা বলল, ও-ঘরে গেলে গুল্লু আমার সুখী হবে না। তার চেয়ে আমাদের গরিব-গুরবোর ঘরই ভাল। তা ছাড়া লোকটা নেশা করে খুব শুনেছি, লুঠ করতে যায় খালি সরাবের লোভে, নেশা ক'রে হয়তো মেয়েটাকে কেটেই ফেলবে কোন দিন।—মা ওর লোককে বলে, মেয়ের বিয়ে অপর জায়গায় পাকা হয়ে গেছে, দিন পর্যন্ত ঠিক—এখন আর নড়চড় করা যায় না। নইলে এ তো সৌভাগ্যের কথাই—। এই সব পট্টি দিয়ে মা তাকে বিদায় ক'রে দিল।

ওরা সকলেই সরল, সংসারানভিজ্ঞ। ওরা ভাবল এ প্রশ্নের এইখানেই শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তা যে হ'ল না বোঝা গেল দিন কয়েক পরেই।

ফসল কাটার সময় সেটা। ওরা নিত্যই মাঠে যায়। ওদের দেশে এত মজদুর মেলে না হিন্দুস্তানের মতো, নিজেদের কাজ নিজেরাই করে। মেয়ে-পুরুষে মাঠে কাজ করতে ওরা অভ্যস্ত। সেদিনও ও আর ওর বোন গুল্লু ক্ষেতে গিয়েছিল, মা যান নি তখনও, কথা ছিল রুটি তৈরি করে নিয়ে তিনি বেলায় যাবেন। ওরা এক মনে ফসল কাটছে হঠাৎ একটা সামান্য চাপা আর্তনাদের মতো কী শব্দ উঠল। সামান্য হ'লেও শব্দটা আগার কানে গিয়েছিল। সে মুখ তুলে দেখেই ব্যাপারটা বুঝতে পারল। শিক্ষিত খচ্চরে চেপে ওদের সর্দারের ছেলে হবিবুল্লা ওপর থেকে প্রায় নিঃশব্দ নেমে এসেছিল, ওরা কেউই টের পায় নি। তেমনি নিঃশব্দেই এসে পেছন থেকে গুল্লুর মুখ চেপে ধরেছে, হয়তো মুখে হাতটা পড়বার সময়ই একটু শব্দ করতে পেরেছিল গুল, কারণ তারপর আর একবারও মুখটা ছাড়াতে পারে নি। আশ্চর্য কৌশলে গুলের মুখটা চেপে রেখেই ঘোড়ায় তুলে নিয়েছে হবিবুল্লা। এ কৌশল ওদের দেশের লোক ছাড়া বোধ হয় আর কেউ জানে না।...আগা সেই দুঃখের কাহিনীর মধ্যেও সগর্বে জানাল দিলুকে।

আগা যখন মুখ তুলল তখন হবিবুল্লা খচ্চরের ওপর টেনে তুলেছে গুলকে। এখনই নিমেষের মধ্যে শিক্ষিত খচ্চর চোখের আড়াল হয়ে যাবে, নিরস্ত্র নিঃসওয়ার আগা কিছুতেই ধরতে পারবে না ওকে। হয়তো কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে টেরই পাবে না এরা। কিংবা যখন জানতে পারবে তখন আর ওর মান সম্ভ্রম কুমারীত্ব কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

সময় ছিল না মোটে। এ সব-কথাই এক লহমার মধ্যে খেলে গিয়েছিল মাথায়। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনারও সময় ছিল না। হাতে ছিল হেঁসো—সাধারণ জিনিস, কিন্তু তীক্ষ্ণধার। আগা বাঘের মতো একটা পাথর থেকে আর একটায় লাফিয়ে পড়ে হবিবুল্লার কাছাকাছি এল—এবং প্রাণপণে সেই হেঁসোটা ছুঁড়ল ওর গলা লক্ষ্য ক'রে।

অব্যর্থ লক্ষ্য—পাশ থেকেই সে হেঁসো গভীর ভাবে গলায় বসে গেল।

এ রকম আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না হবিবুল্লা, নইলে তার কোমরে পিস্তল, হাতে খোলা তলোয়ার—সামনা-সামনি লড়াই হ'লে আগা পেরে উঠত না কিছুতেই। তাও, ঐভাবে লাফিয়ে পড়বে বা হেঁসো ছুঁড়বে কল্পনাও করতে পারে নি বদমাশটা—তা'হলে সাবধান হ'ত। শুধু হাতের তাগ, বন্দুকের লক্ষ্যই

শেখানো হয় না ওদের, যেমন ক্ষিপ্রবেগে আক্রমণ করতে শেখানো হয়—তেমনি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আত্মরক্ষা করতেও। কিছুমাত্র প্রস্তুতি থাকলে বা অনুমান করতে পারলে নিজেকে বাঁচাতে পারত হবিবুল্লা।

যাই হোক কাণ্ডটা ঘটে গেল এক নিমেষে। টুঁ শব্দও করতে পারল না লোকটা। কিন্তু সেই খোলা জায়গায়—আলো-ঝলমল উজ্জ্বল প্রভাতে, আশপাশ ওপর-নিচে থেকে বহু লোকই দেখল ঘটনাটা! এর ফল কী হবে তা আগার অজানা নেই। ছেলে যা-ই হোক বা যা-ই ক'রে থাকুক—সর্দার তা বিচার করবেন না। তা ছাড়া জোর ক'রে মেয়ে ধরে নিয়ে যাওয়া এখনও ওদের দেশে এমন কোন অপরাধ বলে গণ্য হয় না—বিশেষ ক'রে সর্দারদের তো এটা অধিকারের মধ্যেই পড়ে। আগার এ কাজটা চরম গুস্তাকী বলেই ধরা হবে এবং সে গুস্তাকীর শাস্তি কি তাও সে জানে। আগেও যেমন চোখের নিমেষে কথাটা মাথায় খেলে গিয়েছিল, এখনও তেমনি খেলে গেল। পর পর সবটার যেন ছবি দেখতে পেল সে চোখের সামনে। যদি বাঁচতে হয় আর মা-বোনের ইজ্জৎ বাঁচাতে হয়—আর এক মুহূর্ত দেরি করা চলবে না।

বোনের হাত ধরে টানতে টানতে তখনই বাড়ি গেল আগা, কে জানে হয়তো এতক্ষণে রওনা দিয়েছে সর্দারের লোক। জিনিসপত্র কিছু গুছিয়ে নেওয়ারও অবসর হ'ল না। মাকে সংক্ষেপে ঘটনাটা জানিয়ে তাঁকেও একরকম টানতে টানতেই নিয়ে বেরিয়ে পড়ল তখনই। দ্বিতীয় বস্ত্রও নিতে পারে নি বিশেষ, একটা ক'রে বাড়তি পাজামা—এ-ই নিয়েছিল। আর নিয়েছিল কিছু নগদ টাকা—হাতের কাছে যা ছিল।

তারপর থেকেই শুরু হয়েছে এই অসম অভিযান। ওরা বহু লোক, সশস্ত্র। ওরা আসছে ঘোড়ায়, আগার দুটি পা ভরসা। সে বলতে গেলে একা—কারণ সঙ্গে আছে দুটি স্ত্রীলোক, তারা সহায় নয়—বরং দায়।

সর্দার ওদের সত্যিই ক্ষমা করেন নি। সেদিনই সূর্যাস্তের আগে ওদের বাড়ি ভেঙে সমভূমি ক'রে শস্য বুনিয়ে দিয়েছেন। ওদের যা কিছু বিলিয়ে দিয়েছেন নিজের চাকর-বাকরদের মধ্যে। তারপর আর এক ছেলে আফজল আর শালা কাইয়ুম খাঁকে রওনা ক'রে দিয়েছেন সেই দিনই, সঙ্গে চার-পাঁচজন লোক এবং প্রচুর টাকা দিয়ে। এখানে বড় ধনী কারবারীদের নামে চিঠিও দিয়ে দিয়েছেন—অভাব হ'লেই টাকা নিতে পারবে। শুধু একটি শর্ত ক'রে দিয়েছেন—আগাদের মৃত্যু বা সাজা না হওয়া পর্যন্ত ওরা ফিরতে পারবে না, ফিরলে তিনি তাদের মুখ দর্শন করবেন না, তাদেরও যা-কিছু সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। সর্দার এক কথার মানুষ তা ওরা জানে, কা'জেই—নিজেদের প্রাণের দায়েই আগাকে খুঁজতে বেরিয়েছে তারা। এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এ সব খবরই আগা পেয়েছিল। ওখানে বন্ধুও ছিল কেউ কেউ, তারা সাহায্যও করেছে অনেক—কিন্তু তবু এক দিনের জন্যও, এক ঘণ্টার জন্যও তার পর থেকে নিজেদের নিরাপদ ভাবতে পারে নি আগা। শত্রুরা সংখ্যায় অনেক, তাদের পিছনে অগাধ ধনবল, সহায়-সম্পদের অভাব নেই, এখনও যে তারা ধরতে পারে নি সে শুধু খোদার অসীম অনুগ্রহ।

এর মধ্যে বহুবার দুই দল কাছাকাছি এসে পড়েছে, বহুবার মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছে—কিন্তু একেবারে তাদের কবলে পড়ে নি। কোনমতে পিছলে

বেরিয়ে এসেছে—প্রত্যেকবারই।

এই পর্যন্ত বলে ম্লান একটু হেসে আগা আবার বলল, 'শুনেছি এই আংরেজদের দেশে একটা জবর খেলা আছে—খ্যাঁকশিয়াল তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ানো। ওরা বলে শিকার। খ্যাঁকশিয়ালগুলো প্রাণের ভয়ে একটা ক'রে গর্তে লুকোয়, আর এরা সেখান থেকে খুঁচিয়ে বার করে। আবার তারা দৌড়য়, এরাও পিছন পিছন যায় হৈ হৈ করতে করতে—এই নাকি খেলা। ক্রমশ দৌড়তে দৌড়তে শিয়ালগুলো যখন নির্জীব হয়ে পড়ে তখন কাছে পেয়ে মারে। এ গল্প অবশ্য শুনেছি পথে আসতে আসতে অপর এক রাহীর মুখে, সে বিলায়ৎ মুলুকে গিয়েছিল নাকি—সত্যি-মিথ্যে বলতে পারি না। তা আমাদেরও কতকটা হয়েছে তাই। এবার আমরাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, ওদের হাতে মরবার পালা এবার।'

'আরে ছোঃ!' দিলু উড়িয়ে দেয় কথাটা, 'এতবার আল্লা বাঁচালেন কি শেষ পর্যন্ত ওদের হাতেই মারবেন বলে? ওসব কথা ছেড়ে দাও, একদিন ওরাই না মরে তোমার হাতে দ্যাখো গে!'

'তা সত্যি ভাই, খোদা যে ভাবে বাঁচিয়েছেন এক একবার! তা এখন আমারই যেন বিশ্বাস হ'তে চায় না। মনে হয় ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছি।'

আগা দিলুর কথায় যেন উৎসাহিত হয়ে ওঠে। কাহিনীর মূলসূত্রটা ধরে আবার।

সবচেয়ে বিপদ হয়েছিল ওদের দেশের সীমানা পেরোবার সময়। সব ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে দুশমনের লোক, চারিদিকে যেন জাল ফেলে রেখেছে। তিনটে প্রাণী বেরোয় কোথা দিয়ে, মশাও নয় মাছিও নয়—হৃদ্দমুদ্দ তিনটে মানুষ। অনেক রকম চেষ্টা করল আগা, অনেক কসরৎ করল ওদের এড়িয়ে বেরিয়ে যাবার, কিন্তু পারল না। শেষে যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে, তখন দৈব অনুগ্রহ করলেন। তুর্কীস্তান থেকে একদল স্বার্থবাহ আসছিল ঐ পথে, তাদের একজনের একটা খচ্চর পা পিছলে পড়ে যায় নিচে খাদের মধ্যে। দামী মাল ছিল তাতে—কিন্তু পথও দুর্গম, সঙ্গের কেউ সেখানে নেমে তা উদ্ধার করতে রাজী হ'ল না। আগা দূরে থেকে বসে দেখছিল, সে স্বেচ্ছায় ঝুঁকি নিল,—অনেক কষ্টে, বার বার জীবন বিপন্ন ক'রে, দু-তিনবারে মালটা সব তুলেও দিল। যাঁর মাল তিনি মোটা বকশিশ দিতে গেলেন আগাকে, আগা নিল না। সে হাতজোড় ক'রে নিজের প্রার্থনা জানাল, এই বিপদ,—যদি কোনমতে সীমানাটা পার ক'রে দিতে পারেন ভদ্রলোক।

তিনি একটু চুপ ক'রে ভাবলেন। তারপর বললেন, 'উটের পিঠে আমার মালের বস্তার মধ্যে ঢুকে তোমার মা-বোন যদি যেতে রাজী থাকে তো আমি নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু তোমার দায় ঘাড়ে করতে রাজী নই। তুমি অন্য উপায়ে যেমন ক'রে পার এস। আমি ওপারে গিয়ে, ক্রোশ দুই দূরে যে সরাই আছে, সেইখানে অপেক্ষা করব দুদিন একদিন তোমার জন্যে।'

অগত্যা তাতেই রাজী হল আগা। না হয়ে উপায় কি, তবু যতটা সুবিধা হয়। মা গুলে চলে গেলে অন্তত তাদের দুশ্চিন্তাটা থাকবে না।

কিন্তু সেই ভদ্রলোকই শেষ পর্যন্ত তারও একটা উপায় বাতলে দিলেন। হয়তো অতটা উপকারের বদলে একটা মানুষের জীবনরক্ষা করতে অস্বীকার ক'রে মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি বোধ করছিলেন।

এ'দের দলের পিছনে আসছিল একদল ইরাণী বেদে-বেদেনী। জাদু ভেল্‌কীর খেলা দেখায় এরা, জড়ি-বুটি বেচে। তাদের সর্দারকে ডেকে বলে দিলেন ভদ্রলোক, দিলেন কিছু আগাম বকশিশ। ওদের মাথায় অনেক রকম মতলব খেলে, যদি কোন বুদ্ধি ক'রে বার ক'রে দিতে পারে। ভেল্‌কী লাগানোই তো ওদের পেশা।

তা লাগালও তারা ভেল্‌কী। আগাকে রংচং মাখিয়ে ভাঁড় সাজাল সর্দার, বলল—'ডিগবাজী খেতে খেতে মুখ খিঁচোতে খিঁচোতে সে যেন ওদের চোখের সামনে দিয়ে চলে যায়, কেউ সন্দেহ করবে না, বরং বাহবা দেবে।' এদের দলে এমন ভাঁড় থাকেই দু-চারজন, লোক হাসিয়ে ওরা ভুলিয়ে রাখে, ভেল্‌কীর হাত-সাফাই দেখতে দেয় না।

ভয় হয় বৈকি। হয়েও ছিল আগার—কিন্তু দেখল যে কাইয়ুম খাঁ আর তার ভগ্নীপতি গোলাম কাদেরের সামনে দিয়ে চলে এল—একদম ধরতে পারল না তারা। উপরন্তু গোলাম কাদের একটা তামার পয়সাও ছুঁড়ে দিয়েছিল, সেটা কুড়িয়ে নিয়ে জিভ ভেঙিয়ে চ'লে এসেছে আগা।

আর একবার খুব বিপদে পড়েছিল, মুলতান ছাড়িয়ে এসে!

মা-বোনকে জঙ্গলের মধ্যে একটা গাছতলায় বসিয়ে রেখে ও গ্রামে ঢুকেছিল কিছু খাবার কিনতে। হঠাৎ একেবারে সামনা-সামনি পড়ে গেল আফজলদের। চার চোখে চাওয়া-চাওয়ি যাকে বলে—কোন পক্ষেই ভুল চেনবার কোন অবকাশ নেই।

এক লহমা ছিল হাতে—ব্যবধান এতই সামান্য। সেই লহমাটিরই সদ্ব্যবহার করেছিল ও। প্রাণপণে ছুটে আঁকাবাঁকা গলি দিয়ে এসে পড়ল একটা মসজিদের ধারে। মসজিদেই ঢুকে পড়ল, কিছুমাত্র দ্বিধা না ক'রে। তবু কিছু সময় পাওয়া যাবে অন্তত, হয়তো মসজিদ ঘিরে থাকবে—কিন্তু ভগবানের আরাধনার স্থানে মানুষ মেরে কলঙ্কিত করতে সাহস করবে না।

গ্রামের ছোট মসজিদ, লোকজন কেউ বিশেষ নেই তখন, সামান্য দু-একটি গ্রাম্য চাষী ভদ্রলোক মাদুর বিছিয়ে অপেক্ষা করছেন ইমামের জন্য, নামাজ শুরু করার আশায়। ইমাম তখন পাশে একটা জলের চৌবাচ্চার ধারে ওজু করছিলেন। আগা গিয়ে একেবারে পায়ের ওপর পড়ল তাঁর, 'খোদার দোহাই, বাঁচান আমাকে, চার-পাঁচজন দুশমন হাতিয়ার নিয়ে আসছে আমাকে খুন করবে বলে!'

ইমাম একমুহূর্ত দ্বিধা করলেন না। বললেন, 'তুমি কে, কোথা থেকে আসছ, কেন ওরা তোমাকে মারতে চাইছে তা আমি জানি না। হয়তো কোন গর্হিত কাজই করেছ। কিন্তু এ ঈশ্বরের মন্দির, আমি তাঁর দাসানুদাস, তুমি আশ্রয় চেয়েছ আমি দিতে বাধ্য। আমার শক্তি কিন্তু সামান্যই—হয়তো কৌশলের সাহায্য নিতে হবে। তুমি নামাজ চালাতে পারবে আমার জায়গায় গিয়ে? পিছন ফিরে নামাজ পড়াবে, তোমার মুখ কেউ দেখতে পাবে না, দ্যাখো পারবে?'

'পারব।' আগা সাগ্রহে বলে।

ইমাম বিনা বাক্যে নিজের টুপিটি ওর মাথায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'যাও, নামাজ শুরু ক'রে দাও—' তার পর নিজে আগার টুপিটি মাথায় দিয়ে প্রশান্ত মুখে এসে অন্য ভক্ত মুসলমানদের পাশে বসে পড়ে নামাজ পড়তে লাগলেন।

তারা অবশ্যই ইমামের ব্যবহারে বিস্মিত হ'ল—কিন্তু তখন আর প্রশ্ন কি

জবাবের সময় নেই, নামাজ শুরু হয়েছে, প্রার্থনার সময় সেটা, কথা কওয়া সম্ভব নয়।

সময় যে আদৌ ছিল না—সেটা বোঝা গেল তখনই। রাজমার্কের দল এসে মসজিদের দোরে দাঁড়াল। শিকারকে ভেতরে ঢুকতে তারা দেখেছে নিজের চোখেই, আর চোখও এমন কিছু খারাপ হয় নি তাদের— অথচ সে গেল কোথায়? ইমাম ইমামই, তাঁর দিকে ভাল ক'রে দেখবার দরকার আছে তা তাদের একবারও মাথায় গেল না—প্রার্থনাকারীদেরই মুখের দিকে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল তারা।

নাঃ—এদের মধ্যে সে নেই। আবারও তাদের চোখে ধুলো দিল ছেলেটা। তারা হতাশ ও বিরক্ত হয়ে চলে গেল সেখান থেকে। এখানে সময় নষ্ট না ক'রে আশপাশে খুঁজে দেখাই উচিত—এই হ'ল তাদের অভিমত।

দীর্ঘ কাহিনী বিবৃত ক'রে থামল আগা। উপসংহার টেনে বলল, 'এই যে বড় রাস্তা ধরে যাচ্ছি এ হয়তো চরম মূর্খতা—কিন্তু আর শক্তি ছিল না বলেই জঙ্গলে যেতে পারি নি। এখন কী করবে ভেবে দ্যাখো, এর পরেও কি আমাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে রাজী আছ? যদি মনে কোন দ্বিধা থাকে তো বলো—এখানে নেমে যাই, পেটে খাবার পড়েছে, এতক্ষণ জিরোতে পেরেছি—এবার বেশ হেঁটে যেতে পারব।'

'পাগল আর কি!' দিলু হেসে ওঠে, 'হে-হে, হো-হো! তোমার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে দোস্ত্। নইলে এমন কথা তুলতেই পারতে না। আরে, এর পর তো ছেড়ে দেবার কথাই ওঠে না। তুমি আমার ভাইয়া, তোমার যে মা আমারও সে মা—ঠিক কিনা? তাহ'লে? বিপদ জেনে কেউ মা-ভাইকে ত্যাগ করে না—বরং আরও আঁকড়ে ধরে! ওসব বাহানা ছাড়, ও কথার ফয়শালা তো হয়েই গেছে—এখন আমি যা বলি তাই করো। জেনানী নিয়ে এভাবে ঘুরলে তুমি কাজ-কর্ম কিছুই খুঁজতে পারবে না, গা-ঢাকা দিয়ে থাকাও মুশকিল হবে। দু-দিন তুমি আমার বাড়ি থেকে ঘুমিয়ে নাও, এমন ঢেকে রাখব যে তোমার ও সর্দারের বাবাও খুঁজে পাবে না। তার পর তুমি মা-বহিনকে আমার মার জিম্মায় রেখে একা দিল্লী যাও। বেশী দূর তো নয়—ভোরে বেরোলে দুপহর বেলার মধ্যেই পৌঁছে যাবে। ওখানে যা-হয় একটা আস্তানা ঠিক করো, কাজ-কর্ম খুঁজে নাও—তার পর ওদের নিয়ে যেও। কিংবা খবর পাঠালে আমিই একদিন পৌঁছে দিয়ে আসব। কেমন? তাহলে ঐ কথাই ঠিক রইল।...হেট্ হেট্ টা টা—হেঃ শালা বয়েল রে, নড়তে চায় না শালারা! আর কত দেরি করবি এইটুকু পথ যেতে!—যত দেরি করবি তত তোদেরই খেতে দেরি হবে, এই সাফ্ বলে দিচ্ছি—এর ওপর পথে দাঁড় করিয়ে তোমাদের খাওয়াব—দিল মহম্মদ তেমন বান্দা নয়!'

দিলু অকারণেই বয়েলদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আগা কোন রকম কৃতজ্ঞতা জানাবার অবকাশও পায় না।

॥ চার ॥

মুলতানের সেই ইমাম, পরে ওর মুখে সব শুনে বলে দিয়েছিলেন আগাকে—'তুমি দিল্লীতেই যাও। ভারী শহর, লক্ষ লক্ষ লোক, তার মধ্যে থেকে কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। আর তোমার পক্ষে দিল্লী শহরের মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হ'ল লালকিল্লা। বাদশার কোন ক্ষমতাই নেই আর, তবু কিল্লার ঐ চৌহদ্দীটুকুর মধ্যে আজও তিনিই মালিক। আংরেজ পল্টনও থাকে কিল্লার ভেতরে, কিন্তু তারা বাদশার লোকদের ওপর কোন জুলুম চালায় না। অন্তত এখনও চালায় নি কোনদিন। যদি কোনমতে বাদশা কিংবা বাদশার পেয়ারের হাকিম আহসান উল্লা—এদের কারুর শরণ নিতে পার, তো কেল্লাতেই থেকে যেও, ওখানেই যাহোক কাজ-কর্মের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

দিলু বলেছিল অন্য কথা। বলেছিল, 'বাদশা বুড়্ঢা হয়ে গিয়েছেন, তাঁকে কেউ মানে না। আংরেজরাই হ'ল আসল বাদশা—বাদশার বাদশা বলতে পার। একটা আংরেজকে ধরে কোনমতে কোন নোক্‌রী বাগিয়ে নিতে পার? তাহলে আর কোন ভাবনা থাকবে না। অদ্ভুত জাত এরা, একবার যদি তোমাকে নোকর বলে মেনে নেয়, আর তুমি যদি কোন অন্যায় মানে বড় রকমের কিছু চুরি-চামারি না করো তো—সে নিজে বকুক-ঝকুক গাল দিক যাই করুক—অপরকে একটা কথাও বলতে দেবে না, তোমার জন্যে জান দিয়ে দেবে। একটা আংরেজ অফ্‌সার যদি তোমার সহায় হয়, গোটা রাজমাক এসে হাজির হ'লেও তোমার কিছু করতে পারবে না।'

দুটো উপদেশই মনে ছিল আগার। শেষেরটাই যে বেশী মূল্যবান—তা কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলেও কেমন ক'রে যেন বুঝতে পেরেছিল মনে মনে। কিন্তু লালকিল্লা নামটার যেন একটা নেশা আছে—ঐ নামটাই তাকে টানছে অপ্রতিহত আকর্ষণে। ছোটবেলা থেকে বাবার মুখে, নানীর মুখে বহু কিস্‌সা শুনে এসেছে লাল কিল্লার—সেখানকার ধনদৌলত বিলাস-অড়ম্বরের বিশ্বাস্য-অবিশ্বাস্য নানা কাহিনী। সবই গেছে হয়তো—তবু সব গিয়েও কত থাকে তা প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন মালিক-এ-মুলুক নাদির শা—কত শো উট আর খচ্চর বোঝাই দিয়ে এদের দেশের মধ্যে দিয়েই গিয়েছিলেন—বেহেস্তেও-বোধ-করি-দুর্লভ এমন সব জিনিস নিয়ে। তক্‌ৎ-এ-তাউস আর কোহ্-ই-নূর এ নাকি তামাম দুনিয়াতেই কোথাও নেই। সে সবই ঐ লালকিল্লায় ছিল। এত কাছে যখন এসে পড়েছে তখন লালকিল্লাটা না দেখে, সেখানে একবার ভাগ্য পরীক্ষা না ক'রেই চলে যাবে?...তা হয় না। কিল্লাতেও তো অনেক অফ্‌সার আছে দিলু বলেছে—সেখানেই না-হয় দেখবে ভাগ্য ফেরাতে পারে কিনা।

তাই লালকিল্লাতেই চলেছিল আগা।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সোজাসুজি কিল্লাতে ঢুকতে চাইলে কি তাকে ঢুকতে দেবে? আর কোন কৌশলে যদি ঢুকতে পায়, বাদশার সঙ্গে দেখা হবে কি ক'রে?...কীই বা বলবে সে, তিনি যদি বলে বসেন, এখানে কোন কাজকর্ম নেই, তুমি কিল্লা থেকে বেরিয়ে যাও! তখন কি করবে? কিল্লার মধ্যে তাদের মুলুকের অনেক লোক আছে শুনেছে সে—হয়তো কাজকর্মও কিছু জুটবে না, মাঝখান থেকে

জানাজানি হয়ে যাবে—কিল্লার বাইরে বেরোবামাত্র ওদের হাতে পড়বে।...

এসব সমস্যা নিয়ে মনে মনে তোলাপাড়াই করছিল শুধু—কোন মীমাংসাতেই আসতে পারে নি। অথচ হাঁটতে হাঁটতে একসময় দিল্লীর ধারে এসে পড়ল; লালকিল্লার শোণিতবর্ণ পাথরের ফটকগুলোও দৃষ্টিগোচর হ'ল। আর দেরি নেই—এবার যা হয় কিছু ঠিক করতে হবে।

দিলুর পরামর্শ-মতো প্রথম রাতটা ঘুমিয়ে নিয়ে দুপ্রহর আন্দাজ থাকতে রওনা দিয়েছিল সে গাজীমণ্ডী থেকে। দিলু বলেছিল, 'কেন মিছিমিছি মাঠঘাট ভাঙবে, পথ চেনো না—তার চেয়ে সোজা সড়ক ধরে চলে যাও, রাত্রিবেলা আর কে দেখছে তোমাকে?...পথের ভয় আর তোমার কি, কী আছে যে নেবে! বলে ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়! এখন কোম্পানীর রাজত্বে ঠগী ফাঁসুড়েও নেই যে এক দামড়ির জন্যে জান নিয়ে নেবে!'

মতলবটা ভালই দিয়েছিল বলতে হবে। সত্যিই—ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে গেল সে। ও যখন সেলিমগড়ের কাছে এসে পড়ল তখন সবে প্রভাতী আকাশের ঘুমভাঙানো আলো লাহোরী দরওয়াজার মাথা ছুঁয়েছে। ঘুমন্ত দিল্লী শহরের কুয়াশাঢাকা আবছা চেহারাটা দাঁড়িয়ে দেখল কিছুক্ষণ। দূরে ওটা একটা কী ইমারৎ—তিনটে বড় বড় গম্বুজ আর দুটো উঁচু মিনার দেখা যাচ্ছে? ঐটেই বোধ হয় জামী মসজিদ, যেখানে ইদের দিন এক লাখের ওপর লোক একসঙ্গে নামাজ পড়ে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শহরের শোভা নিরীক্ষণ করার মতো ভাগ্য তার নয়—প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল আগার। এখনই যা হয় কিছু ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করতে হবে, হয় বাজারের দিকে যেতে হবে—নয় তো কিল্লার দিকে। কিল্লায় যেতে গেলে কোন্ পথে যেতে হবে তা জানে না। দিলু ব'লে দিয়েছে লাহোরী দরওয়াজা আর দিল্লী দরওয়াজা—এই দুটো ফটকই খোলা থাকে। বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে এইটেই তো লাহোরী দরওয়াজা বলে মনে হচ্ছে তার। কিন্তু ঢুকবে কি ক'রে? কিল্লার ফটক যখন—পাহারা আছে নিশ্চয়, আংরেজের সিপাইরাই পাহারা দেয় হয়ত, তারা ওকে ঢুকতে দেবে কি? কেনই বা ঢুকছে, কি অজুহাত দেবে? যদি বলে কী দরকার—কাকে চাই? সঙ্গে কোন সওদা বা সব্জী থাকলেও না-হয় বলতে পারত যে ভেতরে বেচতে যাচ্ছে! এমনি কী কৈফিয়ৎ দেবে?...

কিছুই স্থির হয় না, অনেক ভেবেও ঠিক করতে পারে না কী করবে। এদিকে বেলা বেড়ে যাচ্ছে, মুঘলদের শাহী দুর্গে শীতের কুয়াশা ভেদ ক'রে প্রভাতের আলো নামছে দ্রুত। আর একটু ফরসা হ'লে এখানেও দাঁড়িয়ে থাকা চলবে না। এখনই সব্জীওয়ালারা শহরে আসতে আরম্ভ করেছে—সকলেরই শহরে ঢোকার পথ এটা।...

হঠাৎ ওর নজরে পড়ল—সেলিমগড়ের নিচের দিকটায় ঘন জঙ্গল একটা। ঠিক তো, এ জঙ্গলের কথাও সে শুনেছে। জাহান্‌নুমা নাম এ বনের। শাজাহান বাদশা অনেক শখ ক'রে এই জঙ্গল বসিয়েছিলেন—বাদশাজাদাদের শিকার খেলার জন্যে। পরে নাকি জাহান্দার শার নাচওয়ালী বিবি লালকুঁয়ারের হুকুমে সে জঙ্গল নষ্ট করে দেওয়া হয়, বড় বড় গাছ কাটিয়ে। তাঁর নাকি অত বড় বড় গাছ দেখে ভয় করেছিল এক দিন। যাই হোক—সেও তো হ'ল প্রায় একশ বছরের কথা—সেই জঙ্গলই বোধ হয় আবার গজিয়েছে।

এটা মন্দ নয় অবশ্য। আপাতত ঐ জঙ্গলে গিয়েই বিশ্রাম নিতে পারে, তার পর সুযোগের অপেক্ষা করবে। সুযোগ মানে প্রধানত রাত্রির। তা ছাড়াও কিছু সুবিধা মিলে যেতে পারে হয়তো। ও দিকে কি আর কোন পথ নেই কিল্লা থেকে বেরোবার? নিশ্চয় আছে। আগা সেদিকেই পা চালিয়ে দিলে।

কিন্তু বনের মধ্যে পড়ে কোথাও বসতে ইচ্ছে হ'ল না। অনেকটা হেঁটে এসেছে বটে,—তবে গত ক-মাস ধরে ক্রমাগত হাঁটার ফলে ওটার দরুন কোন ক্লান্তি আজকাল বুঝতেও পারে না। বরং এতক্ষণের পরিশ্রমে সামান্য ঘাম হয়েছিল ভেতরে ভেতরে—এখন এই ছায়ায় ঢাকা অরণ্যের হিম-স্নিগ্ধতায় শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। বেশ একটা ঝিরঝিরে বাতাসও বইছে, অন্তত তার সেইরকম মনে হ'ল—দু-একটি প্রভাতী পাখিও ডাকতে শুরু করেছে—বেশ ভালো লাগছে লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে এই গাছের তলায় তলায়।

ঘুম নয়, তন্দ্রাও নয়—কিন্তু ঘুরে বেড়াতে বেড়াতেই একটা আচ্ছন্ন ভাব এসে পড়েছিল, প্রকৃতি যেন একটা স্নিগ্ধতার প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছিল তার অনুভূতিতে —হঠাৎ একটা অতি পরিচিত শব্দে চমকে—মুহূর্তে সজাগ ও সতর্ক হয়ে উঠল। ভয়ই পেল সে, অস্বীকার ক'রে লাভ নেই। এই নির্জন রাজকীয় অরণ্যে এত ভোরে ঘোড়ায় চেপে কে আসবে দুশমন ছাড়া? ভয়ে শুধু চমকেই ওঠে নি, কিছুক্ষণের জন্য অনড়ও হ'য়ে পড়েছিল। কী করবে, কী করা উচিত, কোন দিকে পালাবে অথবা পালাবে কিনা—এসব চিন্তা কি বিবেচনা করার শক্তিও লোপ পেয়ে গিয়েছিল। তবে সে মুহূর্ত কয়েকের জন্যই। শব্দটা কোনদিক থেকে আসছে একটু স্থির হয়ে শুনে নিয়েই, আগন্তুকের সম্ভাব্য পথ থেকে সরে গেল আগে— যথাসাধ্য নিঃশব্দে ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে। ততক্ষণে একটা আচ্ছাদনও নজরে প'ড়ছে, একটা বড় সেগুন গাছে একটা কী পত্রবহুল লতা উঠে ঝোপের মতো সৃষ্টি করেছে —তারই আড়ালে গিয়ে লুকোল সে।

একটু পরেই ঘোড়াটাকে দেখা গেল। এবার পরিষ্কার দেখতে পেল আগা— ঘোড়াকেও বটে, তার সোয়ারীকেও। দেখে আবারও চমকে উঠল, তবে সে ভয়ে নয়— বিস্ময়ে। কারণ সেই তেজী আরবী ঘোড়ার ওপর যিনি চড়ে আছেন তিনি আরোহী নন কেউ,—আরোহিণী। স্ত্রীলোক!

একে তো দৃশ্যটা অভিনব, মেয়েছেলেকে এভাবে একা ঘোড়ায় চড়ে আসতে এর আগে আর কখনও দেখে নি সে—তার ওপর এই নবীনা অশ্বারোহিণীর ঘোড়ার পিঠে বসবার অপরূপ ভঙ্গী ও সে ঘোড়াকে চালনা করার সহজ ও অনায়াস শক্তি—দুটো মিলিয়ে এমনই একটা সুষম মহিমার সৃষ্টি হয়েছিল যে চোখের পলক মুগ্ধ হয়ে গেল আগা। নবীনা যে সেটা তার অনুমান অবশ্য, তবে অনুমানটা খুব কষ্ট-কল্পিতও কিছু নয়। কারণ মেয়েটির মুখে একটা পাতলা ওড়নার মতো রেশমের আবরণ থাকলেও সুডৌল একটি মুখের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল ঠিকই। তা ছাড়া জামার মধ্যে থেকে যে দুটি হাত বেরিয়ে লাগাম ধরে ছিল এবং রেকাবের ওপর জুতোর মধ্যে দিয়ে পা দুটির সামান্য যে অংশটুকু দেখা যাচ্ছিল, তাতেই বোঝা যায় এই হাত-পাগুলির অধিকারিণী নবীনা শুধু নয়—রূপসীও বটে।

ঘোড়াটা আসছিল দুলকি চালে। মেয়েটিও, ঠিক অন্যমনস্কভাব না হ'লেও, চারিদিকের এই শান্ত সৌন্দর্য, প্রকৃতির এই অপরূপ স্নিগ্ধতা—এখনও এই অরণ্য বা কাননের অগণিত শাখা-প্রশাখায় লেগে থাকা কুয়াশার আভাস, পত্রপল্লবে

দোলায়িত শিশির-কণাগুলি—প্রত্যেকটি জিনিস যেন দেখতে দেখতে আর উপভোগ করতে করতে আসছিল। হয়তো বা সেইজন্যেই হাতের লাগাম কখন আলগা হয়ে গেছে টের পায় নি।

আগা নিঃশব্দেই দাঁড়িয়েছিল। হয়তো এমন ভাবে আড়াল থেকে কোন মেয়েকে দেখা অন্যায়—কিন্তু সে বোঝাল মনকে—মুখে যখন আচ্ছাদন আছে, বেশভূষা যখন কোন কিছু অসম্বৃত নয়—তখন আর দোষের কি? বরং আর একটু কাছে এলে অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে মুখখানা আরও ভাল ক'রে দেখা যাবে—এই আশাতেই সে উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল।

কিন্তু ওর কাছাকাছি আসতেই এক অঘটন ঘটল।

ঠিক মেয়েটির মাথার ওপরে যে বিরাট গাছটা, তার ডালে বড় গোছের কোন পাখি বসে ছিল চুপ ক'রে। হয়তো এতক্ষণ তার ঘুমই ভাঙ্গে নি। কী পাখি তা দেখতে পেল না আগা, এদিককার সব পাখি সে চেনেও না, ওদের দেশে এত রকম পাখি নেইও হিন্দুস্তানের মতো—তবে পাখিটা যে বড় এবং বীভৎস রকমের বড় তা দেখতে পেল। হয়তো ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজেই পক্ষী-প্রবরের ঘুম ভেঙ্গে গেল—সে অকস্মাৎ কর্কশ গম্ভীর স্বরে চিৎকার করতে করতে উড়ে গেল ওদের মাথার ওপর দিয়ে।

ওরা সকলেই চমকে উঠল। আগা প্রাণপণ সতর্কতা সত্ত্বেও অস্ফুট শব্দই করে ফেলল একটা। কিন্তু এই অখণ্ড স্তব্ধতার মধ্যে এই আকস্মিক আর বিকট শব্দে ঘোড়াটাই ভয় পেল সবচেয়ে বেশী। সে লাফিয়ে সামনের পা তুলে এক ঝটকায় আরোহিণীকে ফেলে দিয়ে ওদিকে ছুটে পালিয়ে গেল। মেয়েটিও খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল, তার ওপর একটু অসতর্ক তো ছিল—সে সামলাবার কি ঘোড়াটাকে কায়দা করার অবসরই পেল না, খানিকটা দূরে একটা গাছের তলায় গিয়ে ছিটকে পড়ল—এবং পড়েই রইল।

সমস্ত ঘটনাটা এমন অকস্মাৎ আর দ্রুত ঘটে গেল যে—ঠিক কি হ'ল সেইটে বুঝতেই একটু সময় লাগল আগার। তার পরই তার গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সে, ছুটে মেয়েটির কাছে গেল। চোট পেয়েছে তো বটেই তবে কতখানি সেইটাই দেখা দরকার। কিন্তু দেখবে কি ক'রে—গায়ে হাত দেবে? যদি কেউ কিছু বলে? কোন বড় ঘরানার মেয়ে নিশ্চয়ই—গায়ে হাত দিলে পরে ও-ই রাগ করবে হয়তো, অথচ হাত না দিয়ে কী ক'রেই বা দেখা যায়!!

মরে নি যে সেটা বুঝতে পারল একটু তাকিয়ে দেখেই। নিশ্বাস পড়ছে এখনও। নিশ্বাসের তালে তালে কামিজের মধ্যেই বুকটা উঠছে পড়ছে। অজ্ঞান হয়ে গেছে। তবে সে কতটা আঘাতে আর কতটা ভয়ে—সেইটেই যে বোঝা যাচ্ছে না।

অনেক ইতস্তত ক'রে, অনেক সঙ্কোচ সরিয়ে একটা কাজ করে বসল আগা। আস্তে আস্তে দুটো আঙুলে ক'রে মুখের ওড়নাটা সরিয়ে দিল। খুব সহজে হ'ল না অবশ্য সে কাজটুকুও, কারণ ওড়নাটা গলার পিছন দিয়ে ঘোরানো ছিল, যাতে বাতাসে না সহজে উড়তে পারে। তবু কিছুটা টানাটানি ক'রে একসময় সরানো গেল সেটা। কিন্তু সরাবার পর যে দৃশ্য তার চোখে পড়ল তার জন্য সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না।

অস্ফুট স্বরে 'অয় আল্লাহ্!' বলে মাটির ওপরই বসে পড়ল সে।

দূরে থেকে এবং অবগুণ্ঠনের মধ্য থেকেও সুন্দরী বলে মনে হয়েছিল কিন্তু সে

সৌন্দর্য যে এইরকম অনির্বচনীয়, সেদিকে চাইলে যে এইরকম নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে—তা সে কল্পনাও করতে পারে নি। এ রকম এর আগে আর কখনও দেখে নি সে, এ রকম যে কোন মেয়ের মুখ হ'তে পারে তাও ভাবে নি। সুন্দরী মেয়ে তাদের দেশেও ঢের আছে, তার বোন গুল্রুও কম সুন্দরী নয়—কিন্তু এর সঙ্গে তাদের কোন তুলনাই চলে না। এ একেবারে আলাদা। একেই বোধ হয় হুরী বলে, তাকে ছলনা করার জন্যে বেহেস্ত্ থেকে নেমে এসেছে। কিংবা এ কোনও খোয়াব দেখছে সে : হয়তো গাছতলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে, এখনও ঘুমুচ্ছে।

সেই নবোদ্ভিন্ন-যৌবনা মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে যেন ওর শরীরের মধ্যে কেমন করতে লাগল। এ ধরনের অস্বস্তি আর কখনও অনুভব করে নি সে এর আগে। এমন ঠাণ্ডার দিনেও কপালে ঘাম দেখা দিল, গলার কাছে কুর্তাটা ভিজে সপসপ করতে লাগল। শেষে, আর থাকতে না পেরে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে—ছিটকে খানিকটা দূরে চলে গেল। ওদিকে আর চাইবে না—এই প্রতিজ্ঞা। হয়তো কোন মায়াবিনী, তাকে নতুন কোন বিপদে ফেলতে এসেছে। কিন্তু এটুকু দূরে গিয়ে কোন লাভ নেই, আরও দূরে যাওয়া উচিত ছিল তার। তবে তা সে পারল না। কী যেন একটা অমোঘ অদৃশ্য শক্তি তাকে অপ্রতিহত গতিতে টানতে লাগল ঐ মূর্ছিতা কিশোরীটির দিকে। কিশোরীই—বয়স বেশী নয়—তা একবার মুখের দিকে চাইলেই বোঝা যায়। আরও বেশী মমতা বোধ হয় সেই জন্যই।

সে আবারও কাছে এল। আবারও হাঁটু গেড়ে বসল পাশে, আবারও একবার অস্ফুটকণ্ঠে উচ্চারণ করল, 'অয় আল্লাহ্!'

কিন্তু এইবার ওর খেয়াল হ'ল যে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়াও কিছু করণীয় আছে। মনুষ্যত্বের কর্তব্য যেটা—সেটাই ভুলে বেকুফের মতো দাঁড়িয়ে আছে এতক্ষণ। সর্বাগ্রে ওর শুশ্রূষা করা দরকার, সুস্থ ক'রে তোলা দরকার! প্রয়োজন হ'লে বাড়ি কোথায় জেনে সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।

সে শুনেছে—শুনেছে কেন দেখেওছে যে—এইরকম হঠাৎ মূর্ছাটুর্ছা হ'লে মূর্ছিতের মুখে চোখে জল দিতে হয়, মাথায় বাতাস করতে হয়।...তাই উঠে দাঁড়িয়ে একটু এদিক ওদিক অসহায় ভাবে চেয়ে দেখল—কাছাকাছি কোথাও জল আছে কিনা—কিন্তু কোন ইঁদারা কি পুষ্করিণীর চিহ্নও দেখতে পেল না। যমুনা আছে বটে—খুব দূরে হবে না তাও সে আন্দাজ করতে পারে—কিন্তু তাই বলে এত নিকটেও নয় যে ছুটে গিয়ে জল আনা যায়। যত দ্রুতই যাক্, জল এনে পৌঁছতে পৌঁছতে একে হয়তো শেয়ালে টানবে—নয়তো শকুনে ঠোকরাবে।

না—সে কোন কাজের কথা নয়।

কিন্তু কাজের কথা যা—তাও কিছু নজরে পড়ে না। এদিক ওদিক তাকিয়ে—জলটা বাদ দিয়ে শুধুই বাতাস করবে কিনা এই যখন ভাবছে, তখন হঠাৎ নজরে পড়ল পাশের সেগুন গাছটার বড় বড় পাতায় তখনও রাত্রের শিশির জমে আছে। বেশ বড় বড় ফোঁটায় জমে আছে। খোঁজ করলে আশপাশের বড় গাছগুলোর পাতা থেকেও কিছু পাওয়া যাবে নিশ্চয়।...সে বাঁহাতে পাতাগুলো ধরে ডান হাতের তালুতে ঢেলে ঢেলে খানিকটা শিশির জমা করল, তার পর হিমস্পর্শ সে জল মেয়েটির কানে গালে দুই চোখের পাতায় কপালে মাখিয়ে ওরই ওড়নাটা তুলে নিয়ে

জোরে জোরে বাতাস করতে লাগল।

অবশ্য তাতে হাত যত নড়ে তত বাতাস হয় না। কিন্তু তাতেই আগার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল। একটু পরেই মেয়েটি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে একটা হাত একটু টান ক'রে—বিকচ রক্তকমলের মতো পা দুটি ছড়িয়ে—এক সময় চোখও খুলল। আর তাইতেই—এতক্ষণ আগার মরতে যেটুকু বাকী ছিল সেটুকুও সারা হয়ে গেল। সে চোখ আর সে-চোখের দৃষ্টি—এরকম আগা জীবনে কখনও দেখে নি, দেখার কল্পনাও করে নি। ফুল্ল ইন্দীবরের সঙ্গে তুলনা করলেও বোধ হয় সে চোখের অপমান করা হয়। সে চোখে যেন ওপরের ঐ নীল আশমানের স্বপ্ন, দুনিয়ার সমস্ত ইন্দীবরের সৌন্দর্য, সে চোখ শুধু যে ওর অন্তর পর্যন্ত এক পলকপাতে দেখে নিল তা-ই নয়—বিপুল ও আয়ত দুটি চোখের দৃষ্টি যেন ওর সর্বাঙ্গ প্লাবিত আচ্ছাদিত ক'রে ফেলল।

আরও দেখল আগা। মাকে দেখেছে, বোনকে দেখেছে—সুন্দরী ভাবীদের দেখেছে, পাড়ার মেয়েদের দেখেছে, যার সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়েছিল সেই তাহ্‌মিনাকও দেখেছে—বড় খুবসুরৎ মেয়ে তাহ্‌মিনা, তারও চোখের বাহার খুব, কিন্তু—এ আরও কিছু। একই চোখ একই সঙ্গে এমন দুর্বার আকর্ষণে টান'ত আর এমন কঠোর বিকর্ষণে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে, এমন নম্রতা এমন মাধুর্যের সঙ্গে এমন লৌহকঠিন ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেতে পারে একজোড়া চোখেই—একই দৃষ্টি একসঙ্গে এমন মোহ ও সমীহ জাগাতে পারে মনের মধ্যে, তা আগা ইতিপূর্বে আর কখনও দেখে নি।...

সে মেয়েটি চোখ খুলে মুহূর্তখানেক একটু বিহ্বলভাবে তাকিয়ে রইল—বোধ হয় ঘটনাটা ঠিক কী ঘটেছিল, সে এখানে কী ক'রে এল, এ ভূমিশয্যারই বা কারণ কি—মধ্যে খানিকটা যেন তন্দ্রার মতো এসেছিল, তাই বা কেন এল—কিছু মনেই বা করতে পারছে না কেন, এ লোকটাই বা কে, কোথা থেকে হাজির হ'ল এখানে—এমনি বহু প্রশ্নেরই কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না ওর তখনও-অর্ধ-সচেতন মন। কিন্তু তার পরই যেন চকিতে মনে প'ড়ে গেল কথাটা। সে ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছিল—হ্যাঁ এইখান দিয়ে! বাদশার খাশ ঘোড়া মকবুল—যা নাকি বাদশা স্বয়ং আর তাঁর পেয়ারের সহিস আতাউল্লা ছাড়া কেউ চড়তে পারে না, কাউকে পিঠে উঠতে দেয় না মকবুল—কেউ বাগ করতে পারে না তাকে, যে ঘোড়ায় কারও চড়বার হুকুমও নেই—বিশেষ কোন রেশেলা ছাড়া মকবুলকে বার করা নিষেধ—সেই ঘোড়া বাগিয়ে চড়ে এত দূরে এসেছিল—হয়তো নিরাপদেই ফি'রে যেতে পারত, যদি না সেই পাখিটা—ওঃ, ঠিক শয়তানের মতোই পাখিটার চেহারা—আর তেমনি ডাক—পাখিটা ডেকেই সর্বনাশ হয়ে গেল। ঘোড়াটা ভয় পেয়ে লাফিয়ে তাকে ফেলে দিল—

মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সবটা মনে পড়ল তার। যেন বিদ্যুতের মতো খেলে গেল মাথার মধ্যে। আর বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতোই চমকে ছিটকে খানিকটা দূরে সরে গেল সে—যেন অস্পৃশ্য কোন ছোঁয়াচ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে—তারপর দুই চোখে আভিজাত্যের অভ্যস্ত অবজ্ঞা ও ঔদ্ধত্যের বহ্নি বর্ষণ ক'রে যৎপরোনাস্তি রূঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কী আশ্চর্য! তুমি কে, কী ক'রে এলে এখানে! তোমার বেয়াদবী তো বড় কম নয়, তুমি আমার গায়ে হাত দিয়েছ—আমার মুখের ওড়না সরিয়েছ!'

আগা একটু আহত হ'ল। অনেকখানি মোহ ভঙ্গ হ'ল তার। সদ্য উপকারের বদলে কিছু একটু কৃতজ্ঞতা আশা করেই মানুষ। অন্তত এমন বিরূপতা বা তাচ্ছিল্য আশা করে না। সে ঈষৎ মাথা হেলিয়ে অভিবাদনের একটা ভঙ্গী ক'রে বলল, 'মাপ করবেন, কিন্তু একটা মানুষ ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল, চোট খেল কিনা—মরেও যেতে পারে, তা ছাড়া এমন চোট অনেকে খায় যা সময়ে চিকিৎসা বা শুশ্রূষা করলে মানুষ বাঁচে কিন্তু দেরি করলে চিকিৎসার বাইরে চলে যায়—সেক্ষেত্রে কতটা কি হয়েছে দেখবার জন্যে ওড়না খুলে দেখা খুব অন্যায় হয়েছে বলে মনে করি নি—তার জন্যে অনেকখানি দিলওয়ারীর দরকার বলেও ভাবি নি।'

আরও যেন জ্বলে উঠল মেয়েটি। কঠোর ভ্রূভঙ্গি ক'রে বলল, 'চুপ করো।... রাজধানীতে আসতে গেলে কিছু সহবৎ শিখে আসতে হয়। তোমাকে দেখছি কেউ কিছু শেখায় নি। নিহাৎ বিদেশী বলেই মাপ করলুম—গাঁ থেকে এসেছ তা তো বোঝাই যাচ্ছে—নইলে জিভকে কি ক'রে শায়েস্তা করতে হয় তা শিখিয়ে দিতে পারতুম...। তবু স্পর্ধারও একটা সীমা থাকা দরকার। তুমি এসব কথা কাকে বলছ তা জানো কি?'

'আজ্ঞে না। তবে জানবার জন্য খুব উৎসুক—বিশ্বাস করুন!'

'আশ্চর্য স্পর্ধা তো তোমার! শাহী দরবারের, খানদানী ঘরের রীতরেওয়াজ কিছু জানো না বলেই এত বেআদবি তোমার।...আর কোন্ সাহসেই বা তুমি আমাকে বাতাস করছিলে! পড়ে মরেই থাকতুম না-হয়—তোমার ঐ নোংরা হাতের বাতাস খাওয়ার চেয়ে মরাও তো ঢের ভাল।'

'গুস্তাকী মাপ করবেন মালেকান। অতটা বুঝতে পারি নি, অন্যায় হয়ে গেছে। আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমি একে বিদেশী তায় গাঁওয়ার চাষা—বাতাস করা কি সেবা করারও যে জাত আছে তা ঠিক জানতুম না। আমাদের দেশেও উজবুক লোকই তো বেশী—তারাও কেউ জানে না। একটা মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকলে তাকে সেবা করতে হয়, কেউ বিপদে পড়লে সাহায্য করতে হয়—এই সব আজগুবী কথা আমাদের বাবা-দাদারা এখনও শেখায় গ্রামদেশে।—তা না জেনে যা করেছি—আপনি তো জান-বুঝ-ওলা খানদানী ঘরের জেনানা, নিজগুণে ক্ষমা ক'রে নেবেন। —আমি হয়তো এখানে দাঁড়িয়ে আপনার দৃষ্টিতে আঘাত দিচ্ছি, হয়তো এই শাহী বাগিচার মাটিও কলঙ্কিত হচ্ছে—বিশেষ আপনি যখন মেহেরবানী ক'রে এই মাটিতে দাঁড়িয়ে আছেন তখন সে মাটিতে পা দেওয়া আমার কিছুতে উচিত নয়—তা এখন বেশ বুঝতে পারছি—আমি চললাম, আশা করছি আপনি সুস্থ হয়ে হেঁটেই যেতে পারবেন আপনার দৌলতখানায়। আদাব!'

প্রথম জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে অসহ উষ্মা দেখা দিয়েছিল মেয়েটির আশ্চর্য সুন্দর চোখে—তা একটু একটু ক'রে মিলিয়ে আসছিল কিছুক্ষণ থেকেই। বোধ হয় আগার সরল সুন্দর মুখ আর ক্ষুণ্ণ আহত চোখের দিকে চেয়েই কোমল হয়ে আসছিল তা। বরং এখন যেন ঈষৎ একটু—খুব প্রচ্ছন্নই—কৌতুক খেলে গেল সে চোখের উপান্তে।...কিন্তু তাই বলে মুখের গাম্ভীর্য বা গ্রীবার উদ্ধত ভঙ্গী একটুও নষ্ট হ'ল না, ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়িয়ে ওড়নাটা কুড়িয়ে মুখে জড়িয়ে নিয়ে বলল, 'দাঁড়াও। হেঁটে যাবো কি? তুমি পাগল তাই এমন কথা মুখে আনতে পারলে। শাহজাদীরা কখনও হাঁটে না।...আমার সে ঘোড়াটা কোথায়, তাকে ধরে

নিয়ে এসো জলদি—'

বেশ একটু অবাক হয়ে গেছে ততক্ষণে আগা। এ মেয়েটার মাথাই খারাপ নাকি? আর বেশ তাকে ফরমাশ করছে তো, তাকে নৌকর পেয়েছে নাকি?

সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বিরস কণ্ঠে বলল, 'ঘোড়া কোথায় তা আমি কেমন ক'রে জানব? দেখিয়ে দিলেও না হয় ধরে আনতে পারি। আমাদের তো বদ-স্বভাব আছেই পরের বেগার খাটা—'

'সে কি! ঘোড়া কোথায় গেল তা-ই জান না! আমাকে পড়তে দেখলে আর ঘোড়াটা কোন্ দিকে গেল দেখলে না!'

'কোন্ দিকে গেল তা দেখেছি বৈকি, এই দিকে ছুটে চলে গেল!'

'এই দিকে? জাহাননুমার দিকে? সর্বনাশ! ও দিকটা যে খোলা একেবারে। যদি যমুনার দিকে চলে যায়? কী হবে তা হলে?'

সব গাম্ভীর্য, সব উদ্ধত মহিমা কোথায় খসে পড়ে। সে জায়গায় একটি বিপন্ন কিশোরী মেয়ের কণ্ঠে অনুনয় প্রকাশ পায়। এক জোড়া আশ্চর্য সুন্দর চোখ অসহায় আর্তিতে অপরূপ হয়ে ওঠে।

'কী হবে তা তো বলতে পারব না। ওটা কোন্ দিক তাও জানি না। সত্যিই আমি নতুন লোক, দিল্লীতে এই প্রথম এসেছি। তবে জাহাননুমার নাম শুনেছি আমার দোস্তের কাছে। কিন্তু এটাই তো জাহাননুমা ভেবেছিলাম—'

'আঃ, বেকুফের মতো কথা কয়ো না। জাহাননুমা বাদশাদের শিকারের জন্যে বসানো হয়েছিল, সে আর নেই—গাছপালা নষ্ট হয়ে গেছে সব, জানোয়ারদের আংরেজ সিপাহ্সলাররা শিকার করে মেরে ফেলেছে। খানিকটা মাত্র আছে ঐদিকে। এটা শাহী বাগিচা—আমাদের, মানে মুঘল জেনানাদের খেলাধুলো করবার জন্যে বাদশা মুহম্মদ শার বেগম মালিকা-ই-জামানী সাহেবা তৈরী করিয়েছিলেন।...কিন্তু সে যাক্ গে, ঘোড়াটা যদি ফিরে না আসে, ও দিক দিয়ে যদি দরিয়া কিনারে গিয়ে পড়ে! কোনও আংরেজ অফসার যদি ধরে নেয়? ওদের ভারী লোভ শুনেছি ভালো ঘোড়ার ওপর!'

ছেলেমানুষের মতোই বলে সে। ছেলেমানুষের মতোই অনেকখানি আশা-ভরসা নিয়ে চায় আগার মুখের দিকে।

আগার মধ্যেকার পুরুষটা কিছু বিচলিত হয়ে পড়ে বৈকি!

তবু সে বিনয়ের সঙ্গে প্রশ্ন করে, 'আপনি কি আশা করেন আপনার ঘোড়া তার ভুল বুঝতে পেরে এসে মাপ চাইবে আর আপনাকে পিঠে তুলে নেবে নিজে নিজেই? অবিশ্যি—তাই উচিত বটে—তবে ঘোড়া তো, আসলে জানোয়ার ছাড়া তো আর কিছু নয়!'

মেয়েটি সহজ হয়ে আসাতেই তার সাহস বেড়েছে, তার কণ্ঠের প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ গোপন করারও চেষ্টা করে না সে।

সেটা বুঝে মেয়েটির দৃষ্টিতে আর একবার তার অভ্যস্ত অগ্নি যে জ্বলে না উঠেছিল তাও নয়। কিন্তু সে চকিতের জন্যেই। নিমেষমাত্র দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল আবার। আসলে ঘোড়াটা ধারে কাছে আছে বলেই এতক্ষণ নিশ্চিন্ত ছিল সে। কেমন ক'রে যেন নিজের সুবিধামতো কথাটাই বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল তার। সত্যি-সত্যিই সে যে বহুদূরে কোথাও, ওর আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে, তা একবারও মনে করে নি। এখন বেশ একটু ভয়ার্ত কণ্ঠেই বলল, 'কিন্তু তাকে পাওয়া না

গেলে যে সর্বনাশ হয়ে যাবে! ওটা যে খোদ বাদশার ঘোড়া, মকবুল ওর নাম! বাদশাও হামেশা চ'ড়েন না ওতে। যেদিন ইদের নমাজ পড়তে যান কিংবা কোন রেশালা বা জুলুস বেরোয় সেইদিনই শুধু ঐ ঘোড়া বেরোয় বাইরে। ওতে বাদশা ছাড়া কারুর চড়বার এক্তিয়ার নেই।...আমি—আমি ওটা কাউকে না বলেই নিয়ে চলে এসেছি। ভোরবেলা সবাই ঘুমোচ্ছে দেখে চুপি চুপি খুলে এনেছি, ভেবেছিলুম কেউ ওঠবার আগেই ফিরে যাব। হায়! হায়! যদি জানাজানি হ'য়ে যায়—কি ঘোড়া না পাওয়া যায়—কী জবাবদিহি করব আমি! বাদশা যদি বা মাফ করেন, বেগমসাহেবা কখনও করবেন না। ভীষণ বকুনি খেতে হবে—হাসাহাসিও করবে হয়ত—সে বড় বিশ্রী ব্যাপার হবে। তুমি, তুমি একবার দেখবে? ঘোড়াটা যদি ধরে আনতে পারো—কিন্তু পারবে কি? বড় বদমেজাজী ঘোড়া!'

'দেখা যাক্! কিন্তু যদি ধরে আনতে পারি—তাহ'লে?'

'তাহলে তোমাকে অনেক বকশিশ দেব। যত টাকা চাইবে তত দেব—'

'আমাকে লালকেল্লায় একটা চাকরি ক'রে দেবেন?'

ঠিক আশা করে নি—এমনিই বলে ফেলেছিল কথাটা। কিন্তু মেয়েটি খুব সহজেই বলল, 'নিশ্চয়ই দেব। এ তো সামান্য কথা, বাদশাকে বললেই রাজী হয়ে যাবেন। কিন্তু তুমি দ্যাখো আগে—যদি দূরে কোথাও চলে গিয়ে থাকে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে!'

'কোন ভয় নেই। কোথায় যাবে সে? আমি ঘোড়ার চেয়ে জোরে ছুটতে পারি। কিন্তু আপনি এখানেই থাকুন—আবার আপনাকে না খুঁজে বেড়াতে হয়!'

বলতে বলতেই ঠিক যাকে তীর-বেগে বলে—সেইভাবেই ছুটে চলে গেল সে দরিয়ার দিক লক্ষ্য করে।

সত্যিই মকবুলের চেয়ে জোরে ছোটে লোকটা—মনে মনে বলে মেয়েটা। নিজের অজ্ঞাতেই মুগ্ধ প্রশংসায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার চোখ।

॥ পাঁচ ॥

আগাকে অবশ্য বেশী দূর যেতে হ'ল না। মুখে যাই কেন না বলে আসুক সে—আর বিপন্না কিশোরীর কাতর অনুনয়ে কে-ই বা অত হিসাব ক'রে ক্ষমতা বুঝে আশা-ভরসা দেয়?—যুগ যুগ ধরে অল্পবয়সের পুরুষ তরুণী সুন্দরী মেয়েদের সুখের জন্য, মনোরঞ্জনের জন্য, তাদের নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ রাখতে যথাসর্বস্ব পণ ক'রেই তো ধন্য ও সার্থক হয়েছে—কিন্তু ঘোড়াটা সত্যিই নদীর ধারে কি বনের বাইরে ওধারের কোন বস্তীতে গিয়ে পড়লে আগার পক্ষে খোঁজ পাওয়া কঠিন হ'ত। সেদিক দিয়ে ভাগ্য ওর প্রতি অনুকূলই বুঝতে হবে। খানিকটা নদীর দিক লক্ষ্য ক'রে ছোটবার পরই কানে অতি পরিচিত একটা শব্দ গেল—মাটিতে ক্ষুর ঠোকার শব্দ। নাল-বাঁধানো ক্ষুর—অর্থাৎ লোকালয়ের পোষা ঘোড়া, জঙ্গলের স্বভাব-পালিত জীব নয়। মুহূর্ত-মধ্যে সজাগ ও সতর্ক হয়ে উঠল আগা, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে নিঃশব্দে একবার চারিদিকটা দেখে নিল। বেশী খুঁজতেও হ'ল না, কারণ মানুষের পরিচিত উপস্থিত টের পেয়ে সে ঘোড়াই শব্দ ক'রে উঠল—হ্রেষা-রবে অভ্যর্থনা জানাল।

শাহী দরবারের শিক্ষিত ঘোড়া, সম্ভবত সওয়ারীকে অমন ভাবে ফেলে আসবার জন্য অনুতপ্ত হয়েছিল, ভয় পাওয়াও অসম্ভব নয়, অনুরূপ কারণে ইতিপূর্বে যে শাস্তি মিলেছে সেই ভয়।...কিংবা সেই কিম্ভূতকিমাকার পাখিটার আর কোন আওয়াজ-টাওয়াজ না পেয়ে আতঙ্কের ভাবটা কেটে যেতে—দিশাহারা হয়ে ছোটবার প্রবৃত্তিটাও চলে গিয়েছিল। তাই যেখানে দুটো-তিনটে বড় বড় গাছের ফাঁকে কতকগুলো বেতসলতা জড়াজড়ি ক'রে একটা কাঁটাঝোপের মতো সৃষ্টি ক'রে রেখে-ছিল—সেইখানটায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। বোধ হয় অপেক্ষা করছিল তার সহিস বা সওয়ারীর—অথবা অন্য কোন পরিচিত প্রিয় মানুষের।

কিন্তু যত শান্ত ভাবেই দাঁড়িয়ে থাক—দেখা গেল ঘোড়াটা সত্যিই বড় বদমেজাজী। আগার দেশে এত বড় ঘোড়া হয় না—এইরকম বড় 'বিলায়তী' ঘোড়া তারা কখনও দেখে নি, এত বড় ঘোড়াকে বাগ মানানো তার অভ্যাসও নেই। তবু কথা দিয়ে এসেছে যখন, তখন ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে চলবে না। অথচ বেতনভুক সহিসের মতো লাগাম ধরে নিয়ে যেতেও তার পৌরুষে বাধল। সে মরীয়া হয়েই ঘোড়ায় সওয়ার হবার চেষ্টা করল। মনে ভরসা ছিল খোদা যখন এত শিগ্‌গির—প্রায় বিনা আয়াসে হারানিধি মিলিয়ে তার মান রক্ষা করেছেন, তখন এই শেষ-রক্ষাটুকুও করবেন।

কিন্তু মকবুল বাদশাহী সভার সভ্য-মানুষে অভ্যস্ত, বাদশাহী আস্তাবলে প্রতিপালিত। তার মেজাজটাও কিছু 'বড়-লোক-ঘেঁষা' হওয়াই স্বাভাবিক। এই সাধারণ মলিন বেশধারী 'মুলুকী' পাঠানকে পিঠে চড়াতে বোধ করি তার আভিজাত্যে বাধল। সে-চেষ্টামাত্রেই সে ঘোরতর আপত্তি ক'রে উঠল—ক্রমান্বয়ে সামনের পা ও পিছনের পা তুলে লাফিয়ে, চাট্ ছুঁড়ে তার প্রতিবাদ জানাতে লাগল। অত বড় ঘোড়া এমন বেয়াড়াভাবে লাফ-ঝাঁপ করলে খুব তাগড়াই জোয়ানেরও বিপন্ন বোধ করার কথা—আগা তো এমনিই অমানুষিক পথকষ্টে ও উপবাসে ক্লান্ত—সে খুবই অসুবিধায় পড়ল। দু-তিনবার আশপাশের বড় গাছ-গুলোয় আছাড় খেয়ে বা ধাক্কা লেগে যাবার মতো হ'ল, ছোটখাটো কত চোট যে খেল তার তো সীমাসংখ্যা নেই। সামান্য সামান্য রক্তপাতও হ'ল কয়েক জায়গায়।

তবু সে হাল ছাড়ল না। হাল ছাড়লে তার চলবে না। ঘোড়া না নিয়ে সে ফিরে যেতে পারবে না ঐ অপরিচিতার কাছে। কোনমতেই না। ঘোড়া নিয়ে যেতে হবে এবং ঘোড়ার পিঠে চড়ে তাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সে চেষ্টায় যদি তার জান চলে যায়—সেও ভাল।

তবে একটা সুরাহা ছিল—ঘোড়াটা যত কিছুই লাফ-ঝাঁপ করুক, সেই সামান্য ঘেরামতো জায়গাটুকুর বাইরে গিয়ে পড়ে নি, পালাবারও চেষ্টা করে নি। তার ভাবগতিক দেখে আগার বরং মনে হ'ল যে তাকে সওয়ারী করতে একেবারেই যে আপত্তি আছে ঘোড়াটার তা নয়, শুধু চড়তে দেবার আগে বাজিয়ে দেখে নিতে চায় তার যোগ্যতা।

যাই হোক—এইভাবে বার কয়েক ধস্তাধস্তি করার পর চকিতে একটা ফাঁক পেয়ে—ঘোড়াটার সামান্য একটু অসতর্কতার সুযোগে আগা এক লাফে তার পিঠে চড়ে বসল এবং প্রাণপণে বসেই রইল। মকবুল অবশ্য তার পরেও তাকে ফেলে দেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করল একটা—কিন্তু সুবিধা করতে পারল না। যে ঘোড়ায় চড়তে জানে এবং সাহসী, তাকে ফেলে দেওয়া যে-কোনো ঘোড়ার পক্ষেই

কঠিন।

তা ছাড়া, এই ধস্তাধস্তির মধ্যেই হঠাৎ একটা কথা মাথায় খেলে গেল আগার। সে এক হাতে লাগাম ধরে আর এক হাতে ওর গলায় মৃদু চাপড় মারতে মারতে বলল, 'এই মকবুল মকবুল—কী হচ্ছে কি? অসভ্যতা করছ কেন? চুপ করো!'

হয়তো এই পরিচিত নামটা শুনেই—কিংবা আগার যোগ্যতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়ে, আশ্চর্যরকম শান্ত হয়ে গেল মকবুল, তার সব বদমাইশী বন্ধ হয়ে গেল একেবারে। সে ভালমানুষের মতো লাগামের ইঙ্গিতে চলতে শুরু করল। আগা নিশ্চিন্ত হয়ে কুর্তার হাতায় কপালের ঘাম মুছে একটা আরামের নিশ্বাস ফেলল।

ঘোড়া বাগ মেনেছে বুঝেও আগা একটু সাবধানেই এগোচ্ছিল। বজ্জাত ঘোড়ার অনেক রকম খেয়াল সে দেখেছে এর আগে, গল্পও শুনেছে ঢের। সুতরাং একেবারে এখনই বিশ্বাস করা উচিত হবে না—এ কথাটা বুঝেছিল। তার সমস্ত মন এবং চোখ দুটো একাগ্র হয়ে ছিল ঘোড়াটার দিকেই। তাই কোন্ দিক থেকে যে কিল্লার পাহারাদাররা এসে পড়ল তা ও টেরও পায় নি—একেবারে সম্পূর্ণ ঘিরে ধরতে হুঁশ হ'ল ওর। চমকে মাথা তুলে দেখল—সাত-আটজন লোক তাকে ঘিরেছে, তাদের সকলেরই সিপাহীর পোশাক, লাঠিসোঁটা তো আছেই, একজনের হাতে একটা বন্দুকও আছে।

এরা বোধ হয় বাদশার আস্তাবলেরই লোক, হয়তো মকবুলেরও পরিচিত, কারণ একজন এগিয়ে এসে তার মুখের কাছের লাগামটা ধরে টান দেওয়া সত্ত্বেও সে কোন আপত্তি করল না, বরং খুব নিরীহ ভালমানুষের মতোই যেন তার কাছে আত্মসমর্পণ করল।

আর একজন এক হেঁচকায় আগাকে টেনে নামাল ঘোড়ার পিঠ থেকে, অতি মধুর আত্মীয় সম্ভাষণ ক'রে প্রচণ্ড একটা রদ্দা মারল তার ঘাড়ে, তারপর ব্যাপারটা কি ঘটছে তা ভাল ক'রে বোঝবার আগেই বাকী কজন পিছমোড়া ক'রে বেঁধে ফেলল।

অতর্কিতে সবটা ঘটলেও খুব সহজে যে হয় নি তা বলাই বাহুল্য। কারণ প্রথম বিহ্বলতাটা কাটতে যা দেরি—সে কয়েক লহমার বেশী নয়—তার পরই আগার তরুণ পাঠান রক্ত মাথায় চড়ে গিয়েছিল—একা, শুধুহাতেও, সে ওদের যথেষ্ট বেগ দিয়েছিল। কিন্তু তবু যতই হোক—ওরা আটজন, সশস্ত্র—আগা একা এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। অনেক লড়াই-হাঙ্গামা ক'রেও শেষ পর্যন্ত ওকে হার মানতেই হ'ল। মাঝখান থেকে ধস্তাধস্তিতে আর মার খেয়ে ওর চোখের কোলে, পিঠে, বুকের কাছে অসংখ্য কালসিটের দাগ পড়ল, ঠোঁট কেটে রক্ত পড়তে লাগল এবং একমাত্র কুর্তাটা ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে গেল।

যখন আর গায়ের জোর অবশিষ্ট রইল না, তখন মুখ ফুটল। হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তেজিত উচ্চস্বরে আগা বলল, 'আমাকে শুধু শুধু এমন চোর-ডাকাতের মতো বাঁধছ কেন তোমরা? অপরিচিত পরদেশীকে অকারণ বেইজ্জৎ করাই বুঝি তোমাদের রাজধানীর রীতি?'

হো-হো ক'রে হেসে উঠল ওরা।

একজন জবাব দিল, 'চোরের আবার ইজ্জত। বেশ বলেছ ভাই, বাহবা!'

'আমি কিছু চুরি করি নি—খোদা কশম!'

'থাক থাক—আর খোদার নামে মিছে বলে তাঁর নামটার অপমান ক'রো না।...তুমি চুরি করো নি—তোমাকে সৎপাত্র দেখে বুঝি বুড়ো বাদশা তোমাকে দান করেছেন ঘোড়াটা?'

সত্যি কথাটা বলা চলত। বললে হয়তো তখনই কেউ বিশ্বাস করত না—কারণ সত্যটা তার নিজের কাছেই আজগুবি অবিশ্বাস্য 'কিস্‌সা'র মতো শোনাচ্ছে—তবে সেই মেয়েটির কাছে নিয়ে যেতে পারত তখন। প্রমাণ ক'রে দিতে পারত যে এ ব্যাপারে তার কোনও অপরাধ নেই। বলতে যাচ্ছিলও একবার—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে গেল সেই অতিশয় ডাগর একজোড়া চোখের অপরিসীম ভীতি-কাতর দৃষ্টি! মনে পড়ে গেল এক মধু-ঝরা উদ্বেগকরুণ কণ্ঠের কথাগুলোও—'যদি জানা-জানি হয়ে যায়, কি ঘোড়া না পাওয়া যায়—কী জবাবদিহি করব আমি!...ভীষণ বকুনি খেতে হবে।...হাসাহাসিও করবে সকলে—সে বড় বিশ্রী ব্যাপার!

সুতরাং সত্য কথাটা আর বলা হ'ল না। সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে শুধু একবার দৃঢ়স্বরে বলল, 'আমি সত্যিই বলছি। আমরা গ্রামের লোক, খোদার নাম নিয়ে মিথ্যা কথা বলতে শিখি নি এখনও। আমি চুরি করি নি ঘোড়া। বেওয়ারিস ঘোড়া দেখে চড়তে শখ হয়েছিল—এটা আমি স্বীকার করছি। তার বেশী কসুর নেই আমার।'

'তবু ভাল!' একজন সিপাহী হেসে উঠল, 'কিছু কসুর স্বীকার করেছে। ভয় নেই, ক্রমে সবই করবে, কোতোয়ালীতে চল, পিঠে ঘাকতক লোহাবাঁধানো নাগরা পড়ুক—মানবে বৈকি। সব কসুরই মানবে!'

একজন মুসলমান সিপাহী বলে উঠল, 'আরে বেত্তমীজটা দেখছি এই বয়সেই পাকা ঝানু বদমাশ হয়ে উঠেছে। বেপরোয়া আল্লার নামে মিছে কথা বলে যাচ্ছে। চোট্টা কাঁহাকা! তোর কি দোজখের ভয়ও নেই? রোজকেয়ামতের দিন কি জবাব দিবি আল্লাকে?'

আর একজন প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'বেশ, ধরেই নিলুম যে তুমি চুরি করো নি এ ঘোড়া—খুবই সাধু-সজ্জন লোক তুমি—কিন্তু তাহ'লে এ ঘোড়াটা এখানে কী ক'রে এল আর তুমিই বা কী ক'রে সন্ধান পেয়ে এর পিঠে চড়ে বসলে—আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও দিকি দয়া ক'রে! আস্তাবলে বন্ধ ছিল ঘোড়া, লাগামটা পর্যন্ত পরানো ছিল না, যদি বা সে কোন রকমে দোর খোলা পেয়ে আপনিই বেরিয়ে আসে, লাগামটাও কি সে নিজে নিজে পরেছে? আর আসবেই বা কি ক'রে—আস্তাবলের দোর বাইরে থেকে বন্ধ থাকে, কাল রাত্রে আমি নিজে বন্ধ করেছি সে দোর—খুলবে কি ফুসমন্তরে?'

'আরে দূর দূর!' একজন ওকে ধিক্কার দিয়ে উঠল, 'তুইও তো দেখছি তেমনি! তোর কি মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি—না খুব অঢেল সময় আছে হাতে—কাজ খুঁজে পাচ্ছিস না? বোঝাই তো যাচ্ছে এটা চোর, ঝুটি বাত বলছে—মিছিমিছি তার সঙ্গে তকরার ক'রে লাভ কি? চোর আর কে কবে স্বীকার করে যে সে-ই চুরি করেছে...ফুঃ!'

'তাই না তাই!' সেই মুসলমান সিপাহীটি বলল, 'অত বাতিয়াতে আমাদের দরকারই বা কি—আমাদের কাজ আমরা ক'রে যাই—ব্যস ছুটি! চোর ধরলে কোতোয়ালীতে নিয়ে গিয়ে মামলা লিখিয়ে হাজতে পুরে দেওয়া পর্যন্ত আমাদের

কাজ, আমরা তাই করব। তার পর বুঝবে কোতোয়ালসাহেব আর তার চেলারা—আমাদের অত ঝামেলায় কাজ কি?'

মুখচোখ লাল হয়ে উঠল আগার, মাথা ও কানের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল—তবু বৃথা জেনেই আর কিছু বলল না সে। মাথা হেঁট ক'রে ওদের সঙ্গে সঙ্গেই চলল। তবে তার মনটা পাথরের মতোই ভারী আর অবশ হয়ে গিয়েছিল—দেহে মনে একটা হতাশা আর অবসাদ অনুভব করছিল। মা আর বোন পড়ে রইল কোথায়—দেশ-ঘাট থেকে হাজার ক্রোশ দূরে, অপরিচিত জায়গায়, ভিখিরীর মতো। যতই ভাল আর দরাজদিল লোক হোক দিল মহম্মদ—তবু সে পরই। পরের আশ্রয়ে ফেলে রেখে সে রাজধানীতে এল দুটো পয়সা রোজগারের জন্যে—সে জায়গায় এ কী ফ্যাসাদে জড়িয়ে ফেললেন খোদা তাকে। কয়েদ তো হবেই, বেশ একটু বেশী রকমই হবে—তাতেও সন্দেহ নেই। বাদশার খাস ঘোড়া চুরি—কেল্লার আস্তাবল থেকে—অপরাধ সামান্য নয়, তাকে সাংঘাতিক অপরাধীই ভাববে সকালে, এ সবে অভ্যস্ত মনে করবে। তার ওপর সে বিদেশী—এখানে চেনা লোক কাউকে দেখাতে পারবে না। সে চুরি করতেই দূর দেশ থেকে এখানে এসেছে, এই কথাই ভাববে সকলে!...

কয়েদ খতম হ'লেও রোজগারের আশা থাকবে না, অন্তত এ মুলুকে নয়। দাগী আসামীকে কে কাজ দেবে? তা ছাড়া তখন আর রোজগারের দরকারই থাকবে না বোধ হয়। তার মা-বোন এর মধ্যে একটা খবরও পাবে না। তারা অনেক কিছু অশুভ ভাববে নিশ্চয়। হয়তো ব্যস্ত হয়ে খুঁজতেই আসবে শহরে। আর তার ফলে হয়তো দুশমনদের হাতে পড়ে যাবে শেষ পর্যন্ত—যাদের হাত থেকে বাঁচাতে এত কাণ্ড করল সে। আর তা না পড়লেও, তারা যে ধরনের মানুষ—ভেবে ভেবে আর কেঁদে কেঁদেই ওর মা মরে যাবে নিশ্চয়। বোনটা হয়তো আত্মহত্যা করবে। সর্দারের মনোবাসনাই পূর্ণ হবে! খোদাই বিরূপ আসলে তার ওপর—খোদা ওদেরই দিকে। যেদিকে পয়সা, যেদিকে শক্তি—খোদাও বুঝি সেইদিকেই ঝুঁকে থাকেন।

আশ্চর্য! প্রথমেই তো তার মনে হয়েছিল কথাটা। তখনও যদি সাবধান হ'ত!...অন্তর্যামী মন ভাবী অশুভ বুঝেই বোধ করি কথাটা মনের মধ্যে জাগিয়েছিলেন, তা'কে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন।...ঠিকই ভেবেছিল সে, কোনও মায়াবিনী তাকে বিপদে ফেল'ত তাকে কুহকে জড়াতে এসেছে! ...তখন যদি শুনত অন্তরের সেই সত্য-সতর্ক বাণী, তাহলে আর এমন ভাবে সব দিক দিয়ে সর্বনাশ হ'ত না!

ঐ হুরীর মতো সর্বনাশিনী মেয়েটা যে সত্যিই কোন কুহকিনী—সে বিশ্বাস ওর আরও দৃঢ় হ'ল খানিকটা এগিয়ে এসে। দৈবক্রমে যেখানটায় সওয়ারীকে ফেলে দিয়েছিল মকবুল—আগাকে নিয়ে সেইখানেই এসে পড়ল সিপাহীরা। কিন্তু সে মেয়ের তো কোন চিহ্নও নেই, অথচ আগা বার বার বলে গেছে ঘোড়ার জন্যে এইখানেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে! যার এত দরকার এত ভয়—সে এইটুকু দাঁড়াতে পারল না! এক যদি এদের আসতে দেখে আশপাশে কোথাও কোন আড়ালে লুকিয়ে থাকে! কিন্তু সে রকম কোন আচ্ছাদনও নেই এদিকে, কোন লতাগুল্ম কি কাঁটাঝোপও নেই একটা, কোথায় লুকোবে?

না, আগার ভুল হয় নি। এই সেগুন গাছ আর এই দেবদারু গাছটা চিহ্ন আছে। দেবদারুর তলায় পড়েছিল সে—আর এই সেগুনের পাতা থেকে শিশির

নিয়ে ওর মুখে মাথায় মাখিয়েছিল আগা।

সে মেয়ে তার সর্বনাশ করতেই এসেছিল—কাজ শেষ ক'রে বাতাসে মিলিয়ে গেছে!

দুঃখে ক্ষোভে অপমানে—নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য আত্মধিক্কারে আগার চোখে জল এসে গেল। পাছে মরদের চোখে জল দেখে এরা উপহাস করে—তাই প্রাণপণে সে সে-অশ্রু গোপন করার চেষ্টা করতে লাগল।

॥ ছয় ॥

আগার খোয়াবে দেখা মেয়েটি—যাকে সে প্রথমে স্বর্গকন্যা এবং পরে কুহকিনী মায়াবিনী মনে করেছিল—আসলে সে হুরীও নয় বা কোন ভেলকীওয়ালীও নয়। নিতান্তই সহজ সাধারণ একটি মেয়ে—আর সহজ সাধারণ বলেই বোধ হয় তার অস্বাভাবিক আর অসাধারণ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে একেবারে বেমানান। মুঘল অন্তপুরের সোনার খাঁচায় পুষ্ট ও লালিত হ'লেও তার সহজাত বন্যতা এখনও সম্পূর্ণ মুছে যায় নি তার স্বভাব থেকে—এখনও জীবনকে সে ধূসর ঘষা কাচের মধ্যে দিয়ে দেখতে শেখে নি। অবশ্য সোনার খাঁচা এখন আর সোনার নেই—বিবর্ণ রংচটা গিল্‌টির খাঁচায় দাঁড়িয়েছে কিন্তু সেটা খাঁচা আছে এখনও। বরং তার ভিতরের পাখিগুলো যেন আরও বেশী ক'রে সেই খাঁচাকে আঁকড়ে ধরেছে—খাঁচার সঙ্গে মিলিয়ে একটা বিবর্ণ শুষ্ক পুরাতন জীবনধারায় অভ্যস্ত করেছে নিজেদের। যেন ঐ খাঁচার সঙ্গে জীবনকে খাপ খাইয়ে নেবারই আপ্রাণ সাধনা তাদের। অর্থাৎ আগেকার সে শিক্ষা সংস্কৃতি সভ্যতা সহবৎ কিছুই নেই—শুধু সেই ছায়াটাকে, ভব্যতার বদলে একটা অর্থহীন আদবকায়দাকে ধরে থাকার চেষ্টা আছে। সেগুলো যে এখন পুরাতন মহিমার ভেংচি কাটায় পরিণত হয়েছে মাত্র—পুরাতন শক্তি ও গৌরবকে অহরহ ব্যঙ্গই করছে—সেটুকু বোঝবার ক্ষমতা তাদের নেই।

এই মেয়েটি সে-পরিবেশের প্রচণ্ড ব্যতিক্রম। সেখানে সে অনন্ত বিদ্রোহিণী। তার সতেজ নবীন জীবন-অঙ্কুর ঐ শিলীভূত জীবন-অভ্যাসের চাপে বিবর্ণ হয়ে যায় নি এখনও, বুনো পাখি এখনও খাঁচার মধ্যেকার জীবনেই তৃপ্ত ও সমাহিত হ'তে শেখে নি। জীবন সম্বন্ধে এখনও তাই তার উদগ্র কৌতূহল, জীবন থেকে এখনও সে নিত্য নতুন কৌতুক ও আনন্দরস আহরণে উৎসুক। সেই কৌতূহল ও ঔৎসুক্যই সেদিন তাকে ঐ দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত করেছিল।

কিন্তু ওর স্বভাবে যেমন বুনো পাখির সরলতা ও অনভিজ্ঞতা ছিল—তেমনি তার ভয়ও ছিল। শাহী ঝরোকার দাঁড়ে-বসা হীরামণের অবিচলিত স্থৈর্য আয়ত্ত করার মতো পরিপক্কতা এখনও লাভ করে নি সে। লালকিল্লার প্রবীণা অন্তঃপুরিকাদের মতো ঝানু বা ঝুনো হ'তে এখনও তার বহু বিলম্ব। আগাকে যতই লম্বা-চওড়া কথা বলুক, দরবারী সহবৎ আর রীত-রেওয়াজের কথা শোনাক—লালকিল্লার জীবনে সে নিজে আজও অভ্যস্ত হ'তে পারে নি। সেখানে এখনও সে নবাগতা। শুধু বড় বেগম বা জিন্নৎমহল সাহেবাই নয়—যে কোনও প্রবীণা অন্তঃপুরিকাদের শাণিত স্থির দৃষ্টি এবং আপাত-মধুর সম্ভাষণের সামনে দাঁড়াতে বুক কাঁপে তার।

আজও—এই প্রত্যুষে শাহী অরণ্যের নির্জনতায় অকস্মাৎ অতগুলি লোকের পায়ের আওয়াজ পেয়ে—সেই ভয়েই দিশাহারা হয়ে উঠেছিল। নইলে ততক্ষণ পর্যন্ত আগার কথামতো স্থির হয়েই দাঁড়িয়ে ছিল সে সেগুন গাছটার তলায়, কান পেতে ছিল মকবুল বা আগার সম্ভাব্য এবং ঈপ্সিত পদধ্বনির দিকে। হয়তো বিলম্ব দেখে একটু উদ্বিগ্ন, একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল—কিন্তু বিচলিত হয় নি। নড়ে নি কোথাও। এখন বিপরীত অর্থাৎ লালকিল্লার দিক থেকে একসঙ্গে এতগুলি পায়ের শব্দ পেয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। তার পর চট্ ক'রে ওপাশে, যেখানে দুটো বড় গাছ জড়াজড়ি হয়ে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত অন্তরাল রচনা ক'রে রেখেছে, তারই আড়ালে লুকিয়ে উঁকি মেরে যখন পাহারাদার ও সহিসের দলকে দেখল তখন আর ওর কোন জ্ঞান-বিবেচনা রইল না, ভয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ল একেবারে।

এরা যখন বেরিয়েছে এমন ভাবে দল বেঁধে, তখন জানাজানি হ'তে কিছু বাকী নেই। তবু—কতটা জেনেছে সেইটেই এখন বড় প্রশ্ন। ঘোড়া নেই, ঘোড়া কেউ চুরি করেছে—হয়তো এখনও অবধি এইটুকুই জেনেছে, কে চুরি করেছে এখনও হয়তো টের পায় নি। কিন্তু তাকে এখানে এইভাবে দেখলে, এটা যে ওরই কীর্তি তা আর কারুরই বুঝতে বাকী থাকবে না। কথাটা প্রথমেই উঠবে ঘোড়াশালের চৌকিদারের কানে—কি যেন বেশ একটা গালভরা নাম আছে ও পদটার, আসলে মাইনে তো পায় ত্রিশ তংকা—তবু তার চাকরির কানুন আছে—সে তৎক্ষণাৎ পেঁছে দেবে শাহজাদা আবু-বকরের কানে, হয়তো কোতোয়ালীতে এত্তেলা দিয়ে আসবে ঐ সঙ্গে—আইন-মোতাবেক! কিন্তু কোতোয়ালকে তার ভয় নয়, যতটা ভয় হজরৎ বাদশাবেগম—জিন্নৎ-মহল সাহেবকে। তার ঐ নানীটি তাকে দু-চক্ষে দেখতে পারেন না—তিনি কি এ সুযোগ ছাড়বেন? ছোটখাটো মার—যেমন কানমলা, চড়মারা এসব তো আছেই—হয়তো তিন দিন চাবিবন্ধ ক'রে রাখবার হুকুম হবে। সে শাস্তির কথা ভাবতেই ওর শরীর এলিয়ে আসে। এর ওপর জেনানামহলের হাসি-টিটকিরি বাঁকা-কথা তো আছেই।...ছি ছি, খেয়ালের বশে কী বেকুবীই না করেছে সে! নিজের এই বেতরিবৎ বেয়াড়া স্বভাবটার জন্যে বার বার ওকে এই ধরনের লাঞ্ছনা সইতে হয়—তবু কি চৈতন্য হয় না ওর!

কথাগুলো চকিতের মধ্যেই খেলে গেল ওর মাথায়, বিদ্যুৎপ্রবাহের মতেই। ছবিগুলো পর পর দ্রুত সরে গেল। ধরা পড়লে সর্বনাশ, ধরা দেওয়া চলবে না কিছুতেই। এখনও হয়তো সময় আছে, এদিকে চায় নি ওরা এখনও, চাইবেও না বোধ হচ্ছে। কারণ ওদিকে কান খাড়া ক'রে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা, সম্ভবত ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনেছে! এখন যদি ও এদিক দিয়ে পালায়—ওরা টের না-ও পেতে পারে।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। তখন আর কিছু মনে পড়ে নি ওর। আগা সত্যিই যদি ঘোড়া ধরতে পারে, ধরে আনছেও হয়তো—সেক্ষেত্রে এদের হাতে ধরা পড়লে তাকেই চোর ভাববে এরা—আর তখন হয়তো নিজেকে বাঁচাবার জন্যে সে সত্যি কথাটাই বলে দেবে, এসব কিছুই মনে পড়ল না। সে পা থেকে জুতোটা খুলে হাতে নিয়ে ব্যাধভীতা হরিণীর মতোই পাহারাদারদের সঙ্গে যতদূর সম্ভব ব্যবধান বজায় রেখে ওদিক ঘেঁষে ত্রস্ত দ্রুত পদে ছুটে পালাল। ভাগ্যিস—এখনও, কিল্লার যাঁরা মালিক শ্রেণীর—শাহী মহলের অধিবাসীদের কারও ঘুম ভাঙ্গার সময় হয় নি—রেজাইয়ের তলায় গতরাত্রির মৌতাতের ঘোর কাটাচ্ছেন, তাই কেল্লায় ঢুকেও পরিচিত

কারও সঙ্গে দেখা হ'ল না, নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে নিজের ঘরে পেঁাছে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল!

কিন্তু, প্রায় সেই প্রথম নিশ্বাস ফেলবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে গেল কথাটা, যে পরদেশী মুলুকী ছেলেটা ওরই হুকুমে ছুটে ঘোড়া ধরতে গেল তার কথা। যদি সত্যিই সে ঘোড়া ধরতে পেরে থাকে—তাহ'লে?...আর যদি এমন হয় যে সেই ঘোড়ায় চেপেই সে আসছিল! তাকেই চোর বলে ধরবে এরা নিশ্চয়। এক ভরসা যদি সে ঘোড়াটাকে দেখতে না পেয়ে থাকে, হয়তো সে অন্যদিকে গেছে, এরা এমনিই ঘোড়াটা পেয়ে গেল। কিন্তু সে ভরসা নিজের কাছেই বড় ক্ষীণ বলে মনে হ'ল। যে রকম দ্রুত ছুটে গেল সে তাতে লালকিল্লার এই সব পেটমোটা পাহারাদারদের অনেক আগেই ঘোড়া খুঁজে পাবার কথা তার। হয়তো সে-ই ঘোড়াটা ধরে নিয়ে আসছিল, তারই পায়ের আওয়াজ পেয়েছে এরা। সেই জন্যেই অমন কান খাড়া ক'রে ছিল সবাই। বেচারা! পরের উপকার করতে গিয়ে গরীব মানুষটার জিন্দগীটাই নষ্ট হয়ে গেল হয়তো। চোর বলে দুর্নাম সইতে তো হবেই—যদি সঙ্গে টাকাকড়ি না থাকে, ঘুষ দিয়ে অব্যাহতি পেতে না পারে তো কোতোয়ালী পর্যন্ত যেতে হবে। এখন হাজত, পরে জেহেল। বাদশার ঘোড়া চুরি করেছে—জেহেল তো হবেই, ছ' মাস কি এক বছর হওয়াও আশ্চর্য নয়—উপরন্তু হয়তো দু-দশ ঘা বেতও খেতে হবে।

ওড়নাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ক্লান্তভাবে শুয়ে পড়ল মেয়েটি। চোখ দুটো ছলছল করছে তার, ভারী মন-কেমন করছে ঐ ছেলেটার জন্যে। অপরিচিত বিদেশী ছেলে—কত আশা লালকিল্লায় একটা চাকরি পাবে। হয়তো ঘরে মা-ভাই-বোন আছে, হয়তো বা বৌও আছে, দু পয়সা রোজগারের চেষ্টায় কোন্ দূরদেশ থেকে এসেছে। ...নিজের খামখেয়ালে শুধু নিজের বিপদই টেনে আনে নি, বোধ হয় ঐ ছেলেটারও সর্বনাশ ঘটাল!

প্রথমে আগার কথাটাই ভাবছিল, হঠাৎ মনে পড়ে গেল আর একটা সম্ভাবনার কথাও। যদি সে ছেলেটা ওর কথা বলে দেয়? আর নিজেকে বাঁচানোর জন্যে বলতেই তো পারে, ষোল আনা হক্ আছে তার।...অবশ্য সে ওর নাম জানে না, পরিচয় জানে না, তবে কিল্লায় থাকে, শাহী জেনানার একজন—এটা বুঝে গেছে। সেইটুকু যদি বলে আর বর্ণনা দেয়—কারুর কি আর বুঝতে বাকী থাকবে? অবশ্য তার কথা মিথ্যা মনে করাই স্বাভাবিক, উড়িয়েও দিতে পারে পাহারাদাররা, কিন্তু যদি খুব জোর ক'রে বলে ছেলেটি? যদি শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়? তাহলে হয়তো সিপাহী-সহিসরা কর্তৃপক্ষের কানে তুলতে বাধ্য হবে। আর তাহলেই সেই শোরগোল, যেটাকে ও ভয় করছিল সবচেয়ে বেশী। সে-ই বড় বেগমসাহেবার দরবারে ডাক পড়বে, শাস্তি লাঞ্ছনার কিছু বাকী থাকবে না।

অবশ্য একেবারে উড়িয়ে দিতে পারে বৈকি। আকাশ থেকে পড়বে একেবারে, 'কই না, আমি তো এখনও ঘরের বাইরেই যাই নি আজ! সে কি, এমন মিথ্যা কথা কে বললে!!' ইত্যাদি...পারে, খুবই পারে। তবে তার একটু বিপদও আছে। সে কাউকে দেখে নি বটে কিন্তু তাকে যে কেউ দেখে নি কোনও জানলা কি কোন ফাঁক দিয়ে—তার কিছু প্রমাণ নেই। যদি কোন বেইমান সত্যিই দেখে থাকে আর যথাসময়ে চুকলি খায়? তা ছাড়া—তাছাড়া মিথ্যা কথাটা বলতে তার কোথায় যেন বাধে আজও, এই—বলতে গেলে—মিথ্যা, শঠতা, ঈর্ষার সমুদ্রে বাস ক'রেও। শৈশবে মার মুখে

বার বার শুনেছে যে যারা যথার্থ খানদানী ঘরের ছেলেমেয়ে তারা বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু ক'রে বিপদের মুখোমুখি দাঁড়ায়, কখনও ছলনা বা মিথ্যার আড়ালে আত্মরক্ষা করে না। যত দূর সম্পর্কই হোক—মুঘল বাদশাহের রক্তই তার ধমনীতে বইছে—বাবর আকবর আলমগীরের রক্ত—সে রক্তের অমর্যাদা করতে পারবে না। নিজের তুচ্ছ বিপদ বাঁচাতে মিথ্যা কথা বলে একটা নির্দোষ লোককে শাস্তিভোগ করতে দেবে না।

ছট্‌ফট ক'রে উঠে পড়ল সে। একবার ঘরের বাইরে এল, আবার ভেতরে এসে ঝরোখার সামনে দাঁড়াল। কিছুতেই যেন স্বস্তি পায় না।

কিল্লার জেনানা-মহলে সবে ঘুম ভেঙেছে, কেউ বা খাটুলিতে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে দাঁতন করছেন, কেউ বা সবে ঘরের বাইরে এসে আরাম ক'রে হাই তুলছেন। খুব যে একটা মজাদার কান্ডকারখানা ঘটে গেছে কোথাও—তা এদের আচরণ দেখে বোঝা যায় না।

কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করলেও একেবারে নিশ্চিন্ত হ'তে পারল না। এখনও তাদের কোতোয়ালীতে পেঁছিবারই সময় হয় নি। আগে সেখানেই যাবে নিশ্চয়। তারা যদি মনে করে যে লোকটার কথা যাচিয়ে দেখা দরকার, তখন হয়তো এখানে খবর পেঁছিবে।...না, আরও কিছুক্ষণ না গেলে বোঝা যাচ্ছে না।...

অনেকক্ষণ ধরে ঘর-বার করল। কিছুতেই সুস্থির হ'তে পারছে না। ওর এত অস্বস্তি যে ঠিক কার জন্যে বেশী—নিজের না সেই পরদেশী গাঁওয়ার ছেলেটার বিপদের আশংকা ক'রে—তা সে নিজেই যেন ভেবে পাচ্ছে না। নিজের মনের চেহারাটা দেখে নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছে। যে পরিবেশে সে বাস করে, নির্লজ্জ উলংগ স্বার্থপরতাই সেখানের উপাস্য দেবতা। সে স্বার্থপরতা নির্মমও বটে। কারও জন্যে কেউ ভাবে না। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। যে যার নিজের অসুবিধাটুকু কাটিয়ে ফেলতে পারলেই খুশী—তার জন্য অপরের যত অসুবিধাই হোক। নিজের সামান্য স্বার্থের জন্য অপরের সর্বনাশ হ'তে দেখলেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না তারা। কিন্তু সে ঠিক সেভাবে ঘটনাটা দেখতে পারছে না কেন? বরং এক-একবার মনে হচ্ছে তার যত বিপদ হয় হোক—তেমন দরকার পড়লে সে সত্যি কথা বলে সব দোষ কবুল করবে।

আশ্চর্য, তার কথাটাই বা এমন ক'রে মনে পড়ছে কেন বার বার! ঐ তো মলিন সামান্য বেশভূষা, ক্লান্ত শুকে মুখ—নিতান্তই সাধারণ দরিদ্রঘরের ছেলে, চাষার ঘরের ছেলে তা তো সে নিজেই স্বীকার করেছে। দুজনের জীবনযাত্রায় বংশমর্যাদায় পদবীতে আকাশ-পাতাল ফারাক। পথে বেরোলে এ ধরনের মানুষের দিকে চেয়েই দেখে না তারা। লক্ষ দরিদ্র লোকের একজন, গ্রাম্য অশিক্ষিত কর্মপ্রার্থী। কিন্তু তবু লোকটার চেহারা, মুখ, তার সেই তীক্ষ্ন বিদ্রূপমেশানো কথা কিছুই ভুলতে পারছে না কেন? পারছে না কেন সম্পূর্ণ অবহেলা করতে, বিস্মৃত হ'তে, তার সম্বন্ধে নির্লিপ্ত থাকতে! কেন—সেই মাত্র, বোধ হয় সিকি দণ্ডের দেখাশুনা, দুটি তিনটি মাত্র কথার বিনিময় এমন গভীরভাবে দাগ কেটে বসল তার মনের মধ্যে! এ শুধু বিস্ময়কর নয়—অনভিপ্রেতও তো বটে।...

বেলা আটটা নাগাদ তার উস্তানী এল হাঁপাতে হাঁপাতে, 'এ কি কাণ্ড, আমার মেহের-উন্নিশা বিবি এখানে বসে আছে! আর আমি তোমায় দুনিয়া খুঁজে বেড়াচ্ছি!'

'মানুষকে খুঁজতে গেলে আগে তার ঘরে খোঁজাই নিয়ম। আর আমি যে ঘরে না থেকে তামাম দুনিয়ার অন্য যে কোন জায়গায় থাকব এমন ধারণাই বা হ'ল কী ক'রে?'

'ওমা, এমন মজাদার কাণ্ড হয়ে গেল কিল্লায়, তার কিস্‌সা নিয়ে হৈ-হৈ হচ্ছে—সারা জেনানামহলে অন্য কোন কথা নেই—আর তুমি সে মজার গন্ধ পেয়েও এমন শান্ত-শিষ্ট মেয়ের মতো ঘরে বসে থাকবে তা কেমন ক'রে জানব বলো?'

নিমেষে মেহেরের মুখ বিবর্ণ হয়ে ও'ঠ। সে তার বিছানায় বসে ছিল তাই রক্ষা, দাঁড়িয়ে থাকলে বোধ হয় উদ্বেগ উত্তেজনায় মাথা ঘুরে পড়েই যেত। চার-পাইয়ের কাজ-করা খুঁটিটা শক্ত ক'রে চেপে ধরে কোনমতে বলল, 'কৈ—আমি কিছু শুনি নি তো, কী হয়েছে? কিসের কাণ্ড?'

উস্তানী ওর অজ্ঞতায় করুণা বোধ করল, 'ওমা, তুমি ছিলে কোথায়! কিছুই শোন নি! কোন বাঁদী-টাঁদীও কি এদিকে আসে নি আজ? একথা যে এ কিল্লার আর কারুর জানতে বাকী নেই।'

'আঃ! কথাটা কি বলেই ফেল না ফাতিমা বিবি, দেখছই তো আমি আজ সারা সকাল ঘর থেকে বেরোই নি। আমার—আমার কাল শেষরাত থেকে মাথা ধরে আছে।'

'আহা রে, তাই বাছার মুখটা এমন শুকনো শুকনো! তা কোনো বাঁদীকে ডেকে পাঠাও নি কেন, একটু ডালচিনি ঘষে দুই রগে লাগিয়ে দিলে এতক্ষণে আরাম হয়ে যেত।'

রাগ ক'রে মেহের শুয়ে পড়ে বিছানায়। দেওয়ালের দিকে মুখ ক'রে শোয়।

'আমি শুনতে চাই না তোমার কিস্‌সা—তুমি এখন যাও দিকি। আজ আমি পড়বও না—মাথা ধরেছে। তুমিই বাইরে গিয়ে যত পার বকবক করো গে!'

'আরে আরে—এই দ্যাখো, মেয়ের একটু তর্ সইছে না দেখছি! কী বিপদ, কথাটা তো শুনেই নাও, তারপর দ্যাখো তোমার ঘুম ছাড়ে কিনা!'

'কথাটাই তো বলছ না! তা ছাড়া যত বাজে কথা সমস্তই বলছ!'

'আরে, এ কি এক কথায় বলবার মতো—তাজ্জব ব্যাপার শাহজাদী, তাজ্জব ব্যাপার! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা যাকে বলে। কে এক বেটা পাঠান এসে কিল্লার মধ্য থেকে বাদশার খাস ঘোড়া মকবুলকে চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছিল। শুনেছ এমন কথা কখনও!'

'সে কি, কে বললে!' গলা কেঁপে যায় মেহেরের, কিছুতেই যেন স্বাভাবিক ভাবে বলতে পারে না কথাগুলো।

'কে আবার বলবে, হাতে-নাতে ধরা পড়েছে যে! তাও বলি—কী বুকের পাটা! ওরা বলছে পুঁচকে ছোঁড়া নাকি একটা, বছর কুড়ি-বাইশের বেশী হবে না বয়েস। আমার তো বাপু বিশ্বাস হয় না। ঘাগী চোর না হ'লে এত সাহস হয় কখনও! নিশ্চয় কাল রাত্তিরে কিল্লার মধ্যে ঢুকে কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে ছিল, শেষ-রাতে বকাউল্লার মাথার গোড়া থেকে চাবি চুরি ক'রে আস্তাবলের ওদিককার দরজা খুলে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে গেছে, কেউ জানতে পারে নি। এধারে তো শুনছি সেই পাঠান মুল্লুকের লোক, জংলী দেহাতী—দিল্লীতে নতুন এসেছে—তাই যদি হবে এত সব সন্ধান সুলুক জানল কী ক'রে?...আসলে কী জান শাহ্‌জাদী, আমাদের এই-সব পাহারার চৌকিদাররা হয়েছে এক-একটি উদো, কেবল ডাল রুটি আর ঘিউ সাঁটে

আর নাকে তেল দিয়ে ঘুমোয়। বাদশার উচিত এদের সব তনখা বন্ধ ক'রে দেওয়া। আমি কসম খেয়ে বলতে পারি—কাল সব কটা ভাঙ খেয়ে কিংবা চরস টেনে বেহুঁশ হ'য়ে পড়ে ছিল। নইলে এত কাণ্ড হয়ে গেল—কেউ টের পেল না।'

কথাটা তাই—তা মেহেরও জানে। নইলে সেও ঘোড়া বার করতে পারত না এটা ঠিক। কিন্তু সে কথা নয়—অন্য কথা ভাবছে সে এখন, কী করবে সে, কী করা উচিত।

সে কথা বলার চেষ্টা করে—কিন্তু কিছুতেই যেন বেরোয় না গলা দিয়ে। অস্বাভাবিক জোর দিয়ে কথা বলতে হয় শেষ পর্যন্ত, তবু তার কণ্ঠস্বর নিজের কাছেই অত্যন্ত ক্ষীণ ঠেকে।

'কিন্তু মকবুল—মকবুল গেল কেন? সে তো শুনেছি তার পেয়ারের লোক ছাড়া অচেনা কাউকে গায়ে হাত দিতে দেয় না!'

'হা আমার কপাল! তুমি তাও জান না, ওরা যে নানান্ রকম মন্তর জানে! গেরস্ত-ঘরে চুরি করতে এলে নিঁদলি মন্তর পড়ে দেয়, শোন নি? তাই তো সব যেন মরণ ঘুম ঘুমোয় একেবারে, কোন জ্ঞান-চৈতন্য থাকে না। ঘোড়াকে নিশ্চয় কোন মন্তর-তন্তর প'ড়ে বশ করেছিল। এ পাকা চোর, এই তোমাকে বলে দিলুম!'

'কিন্তু...কিন্তু সেই লোকটাই যে এত সব করেছে তা ওরা জানল কী ক'রে? তুমি তো বলছ পুঁচকে ছোঁড়া একটা।...সঠিক প্রমাণ কিছু পেয়েছে?'

'আরে—হাতে-নাতে ধরেছে তার আবার প্রমাণ কি? সেই ঘোড়ায় চেপেই তো পালাচ্ছিল!'

'কিন্তু যার এত পাকা বুদ্ধি সে এ পাগলামিই বা করবে কেন, ও ঘোড়া তো সবাই চেনে, কত দূরই বা পালাত ও ঘোড়া নিয়ে?'

'কে জানে! বদমাইশ লোকেদের কত রকম মতলব খেলে মাথায়—তা তুমি আমি কি ঠাওর পাবো?'

অনেকক্ষণ—মেহেরের মনে হয় এক যুগ—পরে আবার প্রশ্ন করার মতো শক্তি খুঁজে পায় সে, 'তা সে লোকটা কি বলছে?'

'সে নাকি কেবল বলছে—আমি চুরি করি নি। খোদার নামে কসম খাচ্ছে, নবীদের নামে কসম খাচ্ছে, নিজের বাপ-মার নাম নিচ্ছে—ঐ এক কথা, আমি চুরি করি নি, ঘোড়া চরে বেড়াচ্ছিল, আমি চড়ে বসেছি, কিল্লার দিকেই আসছিলাম। চুরির মতলব থাকলে তো দরিয়ার দিকে গিয়ে পড়তাম।—এই সব বাজে কথা যত! কিন্তু ও যদি চুরি করে নি—করল কে? যে করল, ঘোড়া বনের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে কোথায় গেল? ছেড়েই যদি দেবে তো এত ঝুঁকি নিয়ে চুরি করবে কেন?—ও না করলেও কে করেছে তা জানে নিশ্চয়, বলছে তো চাকরির খোঁজে দিল্লী এসেছে—তা গরিবের ঘোড়া-রোগই বা কেন, ঘোড়া দেখলেই চড়ে বসতে হবে?—এসব কোন কথারই জবাব দিচ্ছে না। ও না করলেও কে করেছে তা জানে নিশ্চয়। বলে দে না বাপু, তাহ'লে তো আর এই চোরের মার খেতে হয় না। তা নয়—ওর সেই এক জবাব, আমি করি নি, ব্যস! সরকসী বজ্জাত ঘোড়ার মতো মাথা খাড়া ক'রে মার খাচ্ছে—তবু মুখ খুলবে না। আমাদের নবীবক্স সহিস বলছিল—কী কড়া জান ঐটুকু একরত্তি ছোঁড়ার! সিপাহীরা নাল-বাঁধানো নাগরা দিয়ে লাথির পর লাথি মারছে, পরনের কুর্তা পাজামা লোহুতে ভিজে উঠেছে, তবু একটা কথাও আর বার করতে পারছে না ওর মুখ দিয়ে। শুধু বলছে, আমি চুরি করি নি—তার বেশী

আমি কিছু বলতে পারব না, আমাকে মাপ করবেন।'

শিউরে, ছট্‌ফটিয়ে উঠে দাঁড়ায় মেহের। তার সর্বাঙ্গে যেন বিছার কামড়ের জ্বালার মতো অস্থিরতা। সেই নাল-বাঁধানো নাগরা জুতোর আঘাত যেন নিজেই অনুভব করছে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। মাথা ঘুরছে এখনও, পায়েও যেন জোর নেই, —অকস্মাৎ বুকের মধ্যেটায় কী একটা দুর্বলতা বোধ করছে—তবু যেতেই হবে ওকে। আর এখনই।

সে কোনমতে ওড়নাটা টেনে নিয়ে মুখে মাথায় জড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

উস্তানী তো অবাক! মেয়েটার হ'ল কি, পাগল হয়ে গেল নাকি? না ঐ অমানুষিক মারের কথা শুনেই মাথার যন্ত্রণা বেড়ে গেল?—হাজার হোক অল্পবয়সী মেয়ে তো!

সেও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল, 'আরে আরে, চললে কোথায়? কালকের সবকটা শেষ হয় নি যে—'

'কাল হবে উস্তানীজী, আজ—আজ আমার শরীরটা বড় খারাপ।'

'তা চললে কোথায়? এই মাথার যন্ত্রণা নিয়ে—এমন ভাবে ছুটে যাচ্ছ কোথায়?'

'বাদশার কাছে।'

বলতে বলতেই ওধারের দালানের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

ফাতিমাবিবি মুখটা বিকৃত ক'রে দু-হাতে একটা হতাশার ভঙ্গী করল।

'চললেন বাদশার পেয়ারের নাতনী, বাদশার কা'ছ মাথাধরার খবর দিয়ে আদর খেতে! বুড়ো আদর দিয়ে দিয়ে ওর পরকালটি ঝরঝরে ক'রে দিচ্ছেন। ওর লেখাপড়া হবে না কচু হবে!'

॥ সাত ॥

মহামান্য আবুল মুজাফ্‌ফর সিরাজুদ্দিন মুহম্মদ বাহাদুর শা পাদশাহ্‌-ই গাজী তখন দরবারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। আগেকার বাদশাহের সে শক্তিও নেই, ক্ষমতাও নেই—সে রাজত্বও নেই, তবু দরবারটা আছে। আগেকার দরবারের কঙ্কাল সেটা, মূর্তিমান পরিহাস—তবু আছে বৈ কি। ঠাট একটা বজায় আছে ঠিকই। এই ধরনের ঠাট দিয়েই বৃদ্ধ বাদশা নিজেকে ভুলিয়ে রেখেছেন—নইলে বাদশা উপাধি ধারণের আগে আত্মহত্যা করতেন।

এখনকার দরবার—দরবার-ই-আম-এ বসবার প্রয়োজন হয় না, এমন কি দরবার-ই-খাশের ছাদ-ভাঙা শ্রীহীন বড় ঘরটাও তার জন্য বাহুল্য—একটা ছোট ঘরই যথেষ্ট। অল্প দুজন চারজন লোক আসে; আগেকার দরবার অনুগ্রহপ্রার্থীতে ভরে থাকত, এখন বাদশার কোন অনুগ্রহ দেবার ক্ষমতা নেই, অধিকারও নেই—তাই তারা কেউ আসে না, আসল মালিক যিনি, সেই আংরেজ 'রিসিডিন্‌' সাহেবের কাছে গিয়ে ভিড় জমায়। আসে চাকর-বাকর আত্মীয় পরিজন; সামান্য আর্জি তাদের—ছোট ছোট ঝগড়া। আর কদাচিৎ আসেন কোন কোন রাজসভা থেকে প্রেরিত দূত বা কর্মচারী, নেহাতই সৌজন্যের খাতিরে এক আধ মোহর, এমন কি

পাঁচ তংকাও নজরানা দেন, সৌজন্যসূচক পত্রও দেন। তাতেই বাদশার বাদশাহী করার কণ্ডূয়ন তৃপ্ত হয়। খুশির সীমা থাকে না সেসব দিনগুলোয়। আগেকার দিনের বাদশারা খুব মহার্ঘ্য নজরও নিজে হাতে ক'রে নিতেন না, একবার স্পর্শ মাত্র ক'রে ইঙ্গিত করতেন কর্মচারীদের তোশাখানায় জমা করতে। এখন—গায়েব হয়ে যাবার ভয়ে রুমাল থেকে তুলে নিজের পাশে রেখে দেন, দাতা প্রস্থান করার সঙ্গে সঙ্গে জেব-এ ভরেন। সে লোলুপতা কারও চোখই এড়ায় না—কিন্তু এ নিয়ে কেউ আলোচনা করে না, বর্তমান বাদশার আয়ের কথা তারা জানে।

মেহের যখন ঘরে ঢুকল তখন বাদশা একটা বিবর্ণ পারা-উঠে-যাওয়া আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, খানসামা তাঁকে আঙরাখা পরাচ্ছে। এ আগেকার দিনের সহস্রাধিক মুদ্রা আয়ের খান-ই-সামান নয়, নিতান্তই বিশ তংকা বেতনের খানসামা—খাবাস। তবু সেই পুরাতন সংস্কারে—আর কেউ না হোক—বাদশা নিজে তাকে খাবাস না বলে খান-ই-সামান ব'লেই ডাকেন।

আয়নার মতোই অবস্থা আঙরাখাটারও। জরি ভেলভেট সল্‌মা চুমকি সবই আছে—কিন্তু সবই প্রাচীন, জরাজীর্ণ। তিন-চারটি দরবারী পোশাক আছে শাহান্‌শার, সব গুলিরই এই অবস্থা। এ নিয়ে মেহের প্রায় নিত্যই ধিক্কার দেয়, ঝগড়া করে, পোশাক ছিঁড়ে দেবার ভয় দেখায়—আর বাদশাও নিত্যই তাকে আশ্বাস দেন, 'দেব, দেব এবার নতুন পোশাক একটা করাতে দেব।...কী জানিস, গোনা গাঁথা টাকা পাই, ফী মাসেই ধার জমে যায়, এতগুলো লোকের খরচা বজায় দিয়ে, নফর-নোকর পুষে কি থাকে বল্‌! তোর নানীর কাছে টাকার কথা তুলতে গেলেই হিসেবের খাতা তলব করে। না, এ টাকাতে কি আর বাদশাহী ঠাট্‌ বজায় রাখা চলে—তা চলে না। তবে লিখেছি আমি, কোম্পানীকে লিখেছি—মহারাণীর কাছেও খৎ পাঠিয়েছি—উমীদ আছে যে কিছু একটু বাড়বেই। আর না বাড়লেও, এবার একটা ব্যবস্থা যা হোক করতেই হবে—নইলে সত্যিই আর মান-ইজ্জত থাকছে না!'

আজও পাছে ঘরে ঢুকেই মেহের সেই প্রসঙ্গ তোলে, তাই বাদশা ওকে দেখামাত্র একটা কৃত্রিম উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রে বললেন, 'আরে আরে, মেরে আঁখো কত রোশনী, দিল কী চিরাগ—এতক্ষণ তুমি ছিলে কোথায়? আজ সকালে উঠে তিন-তিনটে গজল লিখে ফেলেছি আর গোটা-আষ্টেক রুবাই। তোমাকে শোনাবার জন্যে প্রাণ ছটফট করছে আমার। তুমি ছাড়া আমার কাব্যের সমঝদার কই আর!'

হেসে আদর ক'রে গালটা ধ'রে নেড়ে দিলেন মেহেরের।

কিন্তু মেহেরের তখন আদর খাবার মতো বা কাব্য শোনবার মতো অবস্থা নয় মনের। সে খাবাসকে বলল, 'তুমি যাও পীর মহম্মদ, আমি শাহান্‌শার পিরান এঁটে দিচ্ছি। তুমি বরং চিলম্‌চিকে বল, ওঁর তামাক তৈরী করতে।'

পীর মহম্মদ তবু একটু ইতস্ততঃ করছিল, 'ওঁর চোখে সুর্মা লাগানো হয় নি এখনও, মাথা আঁচড়াতে হবে—'

'আঃ!' অসহিষ্ণু মেহের মাটিতে পা ঠুকে রুষ্ট কণ্ঠে বলে, 'তুমি বড় অবাধ্য পীর মহম্মদ। যা বলছি শোন গে। চোখে সুর্মা লাগানো কি চুল আঁচড়ানোর কাজটা কি তোমার চেয়ে আমি খারাপ করব? যাও বলছি—'

আর দাঁড়াতে সাহস হ'ল না খাবাসের। মেহেরের মেজাজ এদের সকলেরই জানা আছে।

বাদশা বিস্মিত হলেন, 'ব্যাপার কী বল তো পিয়ারী, এত সাত-সকালে এমন কি জরুরী কথার দরকার পড়ল—যার জন্যে খানসামাকে সরিয়ে দিলে? কি হয়েছে কি, নানী বকেছে বুঝি আবার?'

'আমি বুঝি কেবলই নানীর নামে নালিশ করতে আসি আপনার কাছে?' আঙরাখার ফিতে আঁটতে আঁটতে জবাব দিল মেহের। তার পর পিঠের দিকে সামান্য যে জায়গাতে জামাটা কুঁচকে ছিল সেটা টেনে সমান ক'রে দিয়ে বলল, 'হয়েছে এবার, আপনি এই বিলায়তী কুর্সিটাতে বসুন, আমি সুর্মাটা টেনে দিই চোখে!'

'তা বসছি। কিন্তু কথাটা কি?'

তবু যেন মেহের বলতে পারে না কথাটা। অথচ এটাও বোঝে যে এখন না বললে হয়তো আর সুযোগই পাবে না বলবার। এখনই হয়'তা অবাঞ্ছিত কেউ এসে পড়বে। ..সে কোনমতে, কান্নায়-বুজে আসা গলায় বলে ফেলে, 'আমি খুব—খুব একটা অন্যায় ক'রে ফেলেছি নানাজান। আর কখনও করব না। আমার ওপর রাগ করবেন না তো?'

'তুমি খুব একটা অন্যায় ক'রে ফেলেছ?' হেসে ওঠেন বাদশা, 'কী করেছ, কবুতরের ডিম পেড়ে এনেছ শাওন-ভাদোর কার্ণিশ থেকে, না আবার সামান-বুরুজের ছাদে উঠে ঘুড়ি উড়িয়েছিলে?'

'তা নয় নানাজান। আপনি বুঝতে পারছেন না কেন—সত্যিই খুব একটা গর্হিত কাজ করেছি। আমি—আমি মকবুলকে নিয়ে ভোরবেলা আস্তাবল খুলে বাইরের ঐ শালবনটাতে বেরিয়েছিলুম—'

এবার সত্যি-সত্যিই বিস্মিত হলেন বাহাদুর শা। এতটা তিনিও আশঙ্কা করেন নি। অপরের কথা শোনবার সময় বুড়ো মানুষদের মুখ আপনিই হাঁ হয়ে যায় একটু, বাদশারও যেত। সেই হাঁ-টা বুজল না আর মেহেরের কথা শেষ হতেও। স্তিমিতদৃষ্টি ঘোলাটে চোখ দুটো প্রাণপণে বিস্ফারিত ক'রে নাতনীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন সেইভাবেই।

তারপর—অনেকক্ষণ পরে বললেন, 'তুমি মকবুলকে নিয়ে গিয়েছিলে—তুমি? সে কি! তবে যে ওরা বলছিল—'

পরক্ষণেই কৌতূহলের চেয়ে উদ্বেগটা বড় হয়ে ওঠে, 'খুব অন্যায় করেছিলে—যদি ফেলে দিত? যা পাজী ঘোড়া!'

'ফেলে দিয়েছিল, নানাজান, তাইতেই তো এই গোলমাল হয়ে গেল!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—আহ্‌সানউল্লা বলছিল বটে, কে যেন একজন ধরা পড়েছে ঐ চুরির জন্যে। কে এক ছোকরা। তাকে কোতোয়ালীতে চালান করেছে। তোমাকে ফেলে দিয়ে পালিয়েছিল বুঝি, সে ছোকরা দেখতে পেয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল? লোভ সামলাতে পারে নি অমন ঘোড়া দেখে, হাজার হোক গরীব মানুষ তো। তায় খুব ছেলেমানুষ শুনলুম!'

'না নানাজান। তার কোন দোষ নেই—সব দায়িত্ব আমারই।'

ততক্ষণে চোখে সুরমা টানা মাথা আঁচড়ানো হয়ে গেছে। হেঁট হয়ে জুতো পরাতে পরাতে মেহের এবার সব কথা খুলে বলল। কিছুই গোপন করল না—মায় ফাতিমা বিবির কাছে মার খাবার কথা যা শুনেছে তাও।

আনুপূর্বিক সমস্ত কাহিনীটা শুনে বাদশা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর মুখে এক রকমের প্রশংসাসূচক শব্দ ক'রে বললেন, 'বাহবা বা। মরদের

বাচ্চা বটে। তাও শুনছি তো নিহাৎই ছেলেমানুষ—য়্যাঁ! খুব সহ্যগুণ তো—আর খুব মনের জোরও। আমাদের খানদানী ঘরেও এমন দিলাওয়ার ছেলে মেলে না... অজানা অপরিচিত মেয়ের ইজ্জৎ বাঁচাতে এতটা সহ্য করা—এসব কহানী-কিস্‌সার বইতেই তো পড়েছি, আজকাল তো আর দেখাই যায় না। বলিহারি—বাঃ!'

'সেই জন্যই তো বলছি নানাজান—' আকুল আগ্রহে বলে ওঠে মেহের, 'এমন একটা নেক ইমানদার কাবিল ছেলে পরের উপকার করতে গিয়ে মিছিমিছি নিজের জিন্দিগী নষ্ট করবে—আমরা চুপ ক'রে দেখব?—আপনি যাহোক একটা কিছু ব্যবস্থা করুন নানাজান, বাঁচান ওকে!'

'কিন্তু আমি আর এখন কি করতে পারি দিদি, কোতোয়ালীতে ধরে নিয়ে গেছে, তারা হাকিমের এজলাসে পাঠাবে বিচারের জন্যে—আমার হাতের মধ্যে আর কি আছে? এক তোমার কথা কোতোয়ালীতে লিখে পাঠাতে হয়—তাহ'লে কিন্তু জানা-জানির কিছু বাকী থাকবে না, এ কথাটা এমন ভাবে রটেছে, তার সঙ্গে তোমার নাম জড়িয়ে কিল্লা তো কিল্লা—সারা শহরে ছড়িয়ে পড়বে।'

'না না—তা কেন। মাগো, তাহলে আমাকে গলায় দড়ি দিতে হবে। কিন্তু আপনি পারবেন না কেন—এ তো শহরের কোতোয়ালী নয়, কিল্লার কোতোয়ালীতে ধরে নিয়ে গেছে। এখানে এই কিল্লার মধ্যে আপনিই মালিক এখনও। আপনি তলব ক'রে পাঠালে যে কোন আসামীকে দরবারে পাঠাতে কোতোয়ালী বাধ্য। আপনি যদি কারও কসুর মাপ করেন এ কিল্লার মধ্যে কার কি বলবার আছে? আর এ তো আপনার খাশ ঘোড়া চুরির ব্যাপার, মামলা চালানো না চালানো আপনার খুশি, এমন কোন খুন-জখমের ব্যাপার তো নয়—এ নিয়ে আংরেজরাও মাথা ঘামাবে না!'

'তা অবশ্য বটে। তবে আমি কখনও কোতোয়ালীর ওপর হুকুম চালাই নি আজ পর্যন্ত। বেগম সাহেবা আবার কি বলবেন কে জানে। মরুক গে যাক—তুমি বরং খাবাসকেই বলো—কোন লোককে দিয়ে খৎ পাঠিয়ে দিক কোতোয়ালীতে, আসামীকে আমার দরবারে হাজির করতে বলো। বরং তুমিই আমার হয়ে খৎ লিখে দাও, আমার মোহর দিয়ে দিচ্ছি।'

মেহেরকে আর দ্বিতীয়বার বলতে হ'ল না, সে ছুটে কাগজ কলম আনতে চলে গেল।

সেদিন দরবারে অন্য দিনের থেকেও কম জমায়েত হয়েছিল। এমনিতেই বাইরের লোক বড় একটা কেউ আসে না। কিছু কিছু বৃদ্ধ কর্মচারী আসে, বহুদিনের অভ্যাসবশত বাদশাকে বন্দেগী জানাতে আসে তারা। আর আসে কিছু নিম্নস্তরের কর্মচারী—বেতন বৃদ্ধি বা অন্য কোন সুবিধা-সুযোগের আর্জি নিয়ে। প্রায় সকলেই জানে যে বাদশার কিছুই করবার নেই—তবুও আর্জি পেশ ক'রে যায় তারা। এটাও একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। আশার অতীত কোন আশা যদি থাকে তো সেইটুকুর ভরসাতেই এটা করে তারা, কাল অনন্ত—তার মধ্যে থেকে দৈবাৎ যদি কোন একটি ফলবান মুহূর্ত খসে পড়ে এই আশায়। আর আসে আত্মীয়ের দল—এ পরিবারের অসংখ্য ছেলের—বৈধ অবৈধ দুইই—অসংখ্য স্ত্রীর অসংখ্য ছেলেমেয়ে—অতি দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে। সামান্য মাসোহারা বা সিধা পায় তারা। এ দারিদ্র্য তাদের আগেও ছিল, সালাতীন নামে কতকগুলো ব্যারাক নির্দিষ্ট ছিল তাদের জন্যে। ইংরেজ আমলে তাদের অনেককেই ছেঁটে ফেলতে

হয়েছে নির্মমভাবে—যাদের সেভাবে সরানো যায় নি তারা এখনও বৃদ্ধ বাদশার মুখাপেক্ষী হয়ে আছে। তাদেরও ভাতা, জায়গা প্রভৃতি নিয়ে নানাবিধ দাবি ও আবদার। কলহ কচকচি তো আছেই। এসব পারিবারিক কলহ কিছু আংরেজদের আদালতে নিয়ে যাওয়া যায় না। মুঘল পরিবারের আর কিছু না থাক মর্যাদা জ্ঞান আছে এখনও।

সাধারণত হেকিম আহ্‌সানউল্লাই এসবগুলো দেখেন, তিনিই বিচার ব্যবস্থা করেন, রায় দেন, আশ্বাস দেন—আর্জি দপ্তরজাত করার হুকুম দেন। অবশ্য নিজে কিছুই দেন না—সুকৌশলে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন, সুপারিশ করেন—বৃদ্ধ বাদশা ঘাড় নেড়ে সায় দেন, সেই কথাগুলোই বাদশাহী হুকুম হিসেবে পুনরাবৃত্তি করেন। হেকিম সাহেব শুধু চিকিৎসকই নন—বিশ্বাস-ভাজন বন্ধুও—বাদশার যত না হোক, শাহ্‌বেগম-সাহেবা জিন্নৎ মহলের। জিন্নৎ একদা প্রায়বৃদ্ধ বাদশাকে বিবাহ করেছিলেন এই ক্ষীণ আশায় যে তাঁর গর্ভের সন্তান ভবিষ্যতে বাদশা উপাধি লাভ করবে। বাদশাহী না থাক—এখনও হিন্দুস্তানের বাদশা নামটার কিছু কদর আছে। ইতিহাসে লেখা থাকবে সে নাম। কিন্তু বাদশার পিয়ারের বেগম হলেও কাজটা যে খুব সহজ হবে না তা শাহ্‌বেগম সাহেবা বুঝেছিলেন। সপত্নী-পুত্ররা আছে—তারা বয়স্ক, কূটকৌশলী, দুঃসাহসী, মায়ামমতাহীন। তাদের বিরুদ্ধে নিজের প্রায়-কিশোর পুত্রকে দাঁড় করাতে গেলে সহায় চাই একজনকে। হেকিম আহ্‌সানউল্লা সেই সহায়।

আজ লোক কম—আর্জি নালিশ দরখাস্তও কম। অল্পেই মিটে গেল। দরবার ঘরের ভিড় হালকা হয়ে গেল—যেটুকু ছিল সেটুকুও। এবার এগিয়ে এল কোতোয়ালীর সিপাহী দারোগার দল। সঙ্গে হাত-পা-বাঁধা কোমরে দড়ি পরানো রক্তাক্তকলেবর আগা। সর্বাঙ্গেই প্রহারের চিহ্ন তার। শুধু পোশাকই রক্তে রাঙা হয়ে ওঠে নি, তার সুগৌর মুখেরও বহু জায়গায় রক্তে আর ধুলোয় জট পাকিয়ে গেছে।

হঠাৎ বাদশার তলব পেঁছতে কোতোয়ালীর লোকদের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। এমন কাণ্ড কখনও হয় নি ইতিপূর্বে। এ রীতিমতো অঘটন। মশা মারতে কামান দাগা। তবে তাদের—এবং সেই সঙ্গে আগারও ধারণা, এটা বাদশার অতিরিক্ত ক্রোধেরই লক্ষণ। নিজের খাশ ঘোড়া চুরির কথা শুনেই রাগে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়েছেন, ফৌজদারী আদালতের বিচারের জন্য অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য আর নেই তাঁর। নিজেই কোন কঠোর শাস্তি দিতে চান।

বিস্মিত হয়েছেন আহ্‌সানউল্লাও। কিছু চিন্তিতও হয়েছেন। এ হুকুম বাদশা কখন দিলেন, কেন দিলেন—তা হেকিম সাহেব জানেন না। অথচ এমন ঘটনা বহুদিন ঘটে নি। বাদশার প্রতিটি ইচ্ছা প্রতিটি গতিবিধির খবর রাখাই তাঁর কাজ। এর জন্যে কৈফিয়ৎ দিতে হবে শাহবেগমকে। কোথা থেকে কী প্রভাব পড়ল বাদশার ওপর—যাতে আহ্‌সানউল্লাকে না জানিয়েই একটা হুকুম চালিয়ে দিলেন—সেটা না জানা পর্যন্ত দারুণ অস্বস্তিও বোধ করছিলেন একটা মনে মনে। সুতরাং তিনিও বিরক্তমুখে ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে চাইলেন এই অঘটনের জন্য মূল দায়ী পাঠান ছোকরাটির দিকে। ঔৎসুক্যও অবশ্য কম নয়—এখনই জানা যাবে রহস্যের মূল উৎসটা কোথায়।

উৎসুক সকলেই। যে দুজন সিপাহী এবং দারোগা আসামীকে ধরে এনেছিল

তারা সাগ্রহে এগিয়ে এল। কী না জানি হুকুম হয় এখনই। কোতল করতেই বলবেন নাকি বাদশা? কিন্তু সে তো রেসিডেন্ট সাহেবের বিনা হুকুমে হবার কানুন নেই।

বাদশা কিন্তু একবার আসামীর মুখের দিকে চেয়ে সংক্ষেপে বললেন শুধু, 'ওর বাঁধন খুলে দাও এখন!'

সকলেই অবাক। সিপাহীরা বিশেষ ক'রে। এ আবার কী হুকুম! আর যাই হোক—এ ধরণের কোন আদেশ আশা করে নি ওরা। বুড়্যার মাথা ঠিক থাকছে তো আজকাল?

কিন্তু সে চিন্তা পরে। বুড়া হলেও বাদশা বাদশাই। আগার হাত পা ও কোমরের বাঁধন খুলে দেওয়া হ'ল। প্রচণ্ড প্রহারের পর মোটা শক্ত রশির বাঁধন—সর্বাঙ্গে কেটে বসেছে। রশি খোলার পর সেই জায়গাগুলো দ্বিগুণ তেজে জ্বালা ক'রে উঠল। যন্ত্রণা সইতে না পেরে চোখ বুজল আগা।

বাদশা তা লক্ষ্য করলেন। তাঁর ঘোলাটে চোখও কোমল হয়ে উঠল। বললেন, 'এই কে আছিস, একে শিগগির এক বদনা ঠাণ্ডা পানি এনে দে।'

তার পর দারোগার দিকে ফিরে বললেন, 'তোমরা যেতে পারো। এখন আর কিছু দরকার নেই।'

তারা স্তম্ভিত। দারোগা সিপাহীদের মুখের দিকে চাইল, সিপাহীরা দারোগার মুখের দিকে। তার পর সকলেই বিপন্নমুখে চাইল হেকিম সাহেবের মুখের দিকে। সে দৃষ্টিতে বহু প্রশ্ন, অর্থাৎ তারা ঠিক শুনেছে তো? এটা মতিচ্ছন্ন বৃদ্ধের প্রলাপ নয় তো? তাদের করণীয়ই বা কি?

হেকিম সাহেবের বিস্ময়ও তাদের চেয়ে কম নয়। তবে তিনি দরবারী সহবৎ জানেন, চুপ ক'রেই রইলেন।

কিন্তু অসহিষ্ণু হয়ে পড়লেন বাদশাই।

'আরে—এরা কি আমার হুকুম শুনতে পায় নি? আমার গলা কি এমনই ঝিমিয়ে গেছে নাকি আজকাল? আহ্সানউল্লা, ওদের বলে দাও কোতোয়ালীতে ফিরে যেতে। ওদের কেরদানী কেরামতি ঢের দেখিয়েছে ওরা—এক ফোঁটা একটা ছেলেকে সবাই মিলে বেদম মেরেছে আবার সাত-সাতটা লোক ঘিরে নিয়ে এসেছে, তাও এমনি ধরে আনতে সাহস হয় নি—বেঁধে এনেছে। দূর হয়ে যাক ওরা আমার সামনে থেকে, যত সব অপদার্থের দল!'

গলা বেশ চড়িয়েই বলেছেন বাদশা, শুনতে অসুবিধা হবার কথা নয়। দেরি করারও কোন যুক্তি নেই আর। বাদশার মেজাজ, কখন কী হুকুম হয় আবার—হয়তো তাদেরই বাঁধতে হুকুম দিয়ে বসবেন। তারা ব্যস্তত্রস্ত ভাবে কুর্ণিশ করতে করতে বেরিয়ে গেল।

এবার বাদশা আহ্সানউল্লার দিকে ফিরে অপ্রসন্ন মুখে বললেন, 'আর শোন—অমনি খাজাঞ্চীখানায় হুকুম পাঠিয়ে দাও যে আমার আস্তাবলের সহিস আর চৌকিদার যে কজন আছে—সকলকে আমি পাঁচ টাকা ক'রে জরিমানা করলুম, সেই টাকা আগাম কেটে নিয়ে এই লোককে একটা ভাল পোশাক যেন করিয়ে দেওয়া হয়!'

শুধু আহ্সানউল্লা নয়, আগারও মনে হ'ল সে নিশ্চয় ভুল শুনছে। যার জেলখানা তো বটেই—হয়তো বা বধ্যভূমেই যাবার কথা—তার ওপর নতুন পোশাকের

হুকুম—এ আবার কি কথা! সে জেগে আছে তো, না সবটাই ঘুমিয়ে পড়ে খোয়াব দেখছে? সব চেয়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন আহ্সানউল্লা। বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল এখানে, বাহাদুর শার এ ধরণের মেজাজ তিনি আর কখনও দেখেছেন বলে মনে পড়ে না। বাবরশাহী বংশের রক্ত যেখানে আছে, বাদশাহী মেজাজ খানিকটা থাকবেই—কিন্তু তাঁকেও না জানিয়ে এ ধরনের হুকুম জারি, একটু চিন্তার কথা বৈ কি!

আর বেশীক্ষণ দরবারী সহবৎ বজায় রাখা তাঁর সম্ভব হ'ল না। তিনি মাথা চুলকে বললেন, 'কিন্তু আলিজা—আমি, আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না তো?'

ভারী খুশী হলেন বাহাদুর শা। হেকিম সাহেব যে তাঁর মর্জির তল না পেয়ে ফাঁপরে পড়ে গেছেন—এইটে বুঝতে পেরে ছেলেমানুষের মতোই খুশী হয়ে উঠলেন একেবারে। খুব ঠকিয়েছেন তিনি ওদের—তাঁকে মনে করে একেবারে অপদার্থ, ওদের সাহায্য না নিয়ে যেন কোন কাজ করার হিম্মত নেই তাঁর। বেশ হয়েছে, খুব জব্দ হয়েছে সব!

তিনি মুচকি হাসতে হাসতে মৃদু মৃদু মাথা নাড়তে লাগলেন, 'ঐ তো আহ্সান-উল্লা, তোমরা মনে করো—তোমাদের না জানিয়ে তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে পৃথিবীতে কোথাও কিছু ঘটা উচিত নয়। ভারী ভুল করেছিলেন খোদাতায়ালা, তোমার সঙ্গে সলা না ক'রেই এই দুনিয়াটা সৃষ্টি ক'রে ফেলেছিলেন! সেই জন্যেই এখানে এত গোলমাল, এত অশান্তি। তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যদি পয়দা করতেন তাহ'লে আর এইসব হিসেবের ভুল থাকত না! কী বল? আমার একটা ভারী মজার বয়েত্ এসে গেল মাথায়—খোদার ভুল। গিয়েই লিখে ফেলতে হবে।'

আহ্সানউল্লা আরও বিস্মিত আরও বিব্রত হয়ে উঠলেন। এখনও অল্প দু-চারজন যারা উপস্থিত আছে চাকর নফর আমলা গোমস্তা—তাদের কাছে অপমানিত বোধ করলেন দস্তুরমতো। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন—রও বুড়ো, এর শোধ আমি তুলব—তবে আমার নাম আহ্সানউল্লা। বুড়ীকে দিয়ে যখন ধাঁতানি খাওয়াব তখন বুঝবে!

বাদশার কিন্তু অত লক্ষ্য করার সময় নেই। কবিতার কলি মাথার মধ্যে গুন-গুনিয়ে উঠেছে তখন—এসব ঝামেলা শেষ ক'রে উঠতে পারলে বাঁচেন। তামাকুর তৃষ্ণাও পেয়েছে অসম্ভব। তিনি আগার দিকে ফিরে বললেন, 'এই ছোকরা—শোন, কী নাম তোমার?'

আগা মাথা হেঁট ক'রে পাথরের মতো দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। তার মামলার নিষ্পত্তি হ'ল কি হ'ল না—সেইটেই বুঝে উঠতে পারছিল না—সবটাই যেন চরম বিভ্রান্তিকর ঠেকছিল তার কাছে। সে চমকে উঠে আভূমি নত হয়ে অভিবাদন ক'রে বলল, 'বান্দার নাম আগা—আগা হোসেন রাজমাকী। আপনার নফরের নফর!'

'দেশ কোথায় তোমার? তুমি পাঠান?'

'জী জনাব। রাজমাকে আমার ঘর।'

ইতিমধ্যে আহ্সানউল্লা সামলে নিয়েছেন নিজেকে, তিনি কপট বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'বান্দার অপরাধ ক্ষমা করবেন—কিন্তু কোতোয়ালীর লোকেরা বাইরে অপেক্ষা করছে, কাছারী খুললে আসামীকে হাজির করার কথা। কী করবেন তা কিছু সাফ্ সাফ্ বলেন নি তো—'

'আরে, ওরা তো আচ্ছা বেঅকুফ! ঘোড়া আমার চুরি গেছে, আমার জিনিস। মামলাও সে হিসেবে আমার। আমি মামলা তুলে নিলুম। ব্যস! এইটেই ঐ সব গাদ্ধেকে বাচ্ছাদের বুঝিয়ে দাও গে!'

আগার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এর পর আর সংশয়ের কোন প্রশ্নই ওঠে না। সত্যের জয় হয় তাহলে এখনও! বৃথাই সে আল্লার নাম নেয় নি!

বাদশা আবারও তার দিকে ফিরে বললেন, 'শোন, কাছে এস, এখানে এসে দাঁড়াও।'

আজ সকাল থেকে এ কী শুরু হয়েছে! অঘটনের কি শেষ হবে না আজ আর! কার মুখ দেখে উঠেছিল সে!

সে কাছে এসে আর একবার অভিবাদন করল।

বাদশা খুব নিচু গলায়, প্রায় চুপি চুপি বললেন, আমি সব শুনেছি বেটা, খুব খুশী হয়েছি শুনে। এই তো চাই। এই তো মরদের বাচ্চার মতো কাজ। বড় নেক্ লেড়কা তুমি। তা তোমারও আত্মত্যাগ বৃথা হয় নি। সে আমাকে বলেছে সব। তুমি নাকি এখানে চাকরি করতে চাও?'

ওহো! তাই!

আগা এতক্ষণে বুঝতে পারল ব্যাপারটা। ঠিকই আঁচ করেছিল সে। এ সবই সেই জাদুকরী ভেল্কীওয়ালীর কাজ,—জাদু যে জানে তাতে কোন সন্দেহই রইল না আর। সব ভেল্কীর খেলা। হ্যাঁ—শুনেছে যে ছেলে-ছোকরাদের ভোলাতে ওরা সুন্দরী মেয়ের বেশ ধরেই আসে। তাকে নালায়েক পরদেশী পেয়ে ভেল্কীর খেলাটা দেখিয়ে দিলে খুব। একই দিনে একই প্রহর বেলার মধ্যে একই সঙ্গে বেহেস্ত্ আর দোজখ—দুটোরই স্বাদ পাইয়ে দিলে। কিন্তু বেহেস্ত্ তো এখনও কল্পনা—সুদূর, কী পাবে আব কী না পাবে তার কোন ঠিক নেই, দোজখের জ্বালাটা পুরোপুরিই টের পাচ্ছে। সর্বাঙ্গে লঙ্কাবাটা লাগার মতো জ্বলছে, সর্বশরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে—কে জানে কত দিনে এ ব্যথা সারবে, এ ঘা শুকোবে।

সবটাই তার কাজ, মারতেও সে আবার শেষ মুহূর্তে অভাবনীয় ভাবে রক্ষা করতেও সে—তবু তার প্রতি দারুণ অভিমানে মন ভরে উঠল আগার। কেন সে দাঁড়াল না, একটু দুর্নামের ভয়ে সরে পড়ল! কেন বলল না ওদের সামনে যে তারই কাজ! ভাবগতিক দেখে তো মনে হচ্ছে সে শাহজাদী শ্রেণীরই কেউ হবে, তাই যদি হয় তো—তাকে কি আর ঐ নৌকরগুলো অপমান করতে বা অমান্য করতে সাহস করত?

মুহূর্তকালের আত্মবিস্মৃতি থেকে জোর ক'রে জাগিয়ে তোলে নিজেকে। যতই গাঁওয়ার হোক—এটা সে জানে যে বাদশা প্রশ্ন করলে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর না দেওয়া চরম গুস্তাকী। সে আর একবার অভিবাদন ক'রে বলল, 'জাঁহাপনার অসীম অনুগ্রহ। একটা কাজ পেলে সত্যিই আমি বেঁচে যাই। আমি একেবারেই নিঃস্ব, তা ছাড়া এখানে নতুনও—জানাশোনা কেউ নেই।'

বাদশা তাঁর ছাঁটা শৌখীন দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'বেশ তোমাকে আমার কাজেই বহাল করলাম। কোন ছোট কাজ করতে হবে না। দিনে রাতে পালা ক'রে আর একজনের সঙ্গে তুমি আমার মহলের দরওয়াজায় হাজির থাকবে। দরওয়াজা বলে ডাকলেই যেন পাই। কোন খৎ কি পুর্জা পাঠানো, কাউকে ডাকতে পাঠানো কি খবর দেওয়া—এইসব ফাইফরমাশের খুচরো কাজ। তবে

হামেহাল হাজির থাকা চাই। একজন আছে, তাতে অসুবিধা হয়। দুজনে পালা ক'রে কাজ করো। কিন্তু তনখা বেশী দিতে পারব না—তা সাফ্ বলে দিচ্ছি। একটা শোবার জায়গা পাবে, লঙ্গরখানায় দুবেলা খেতে পাবে—আর মাসে আট টাকা মাইনে—দ্যাখো, রাজী আছ!'

রাজী! আনন্দে কৃতজ্ঞতায় আগার চোখে জল এসে গেল। এতটা যে তার সুদূর স্বপ্নেরও অতীত! এত সহজে কাজ পাবে—এ যে কল্পনা করতেও সাহস করে নি!...

হে আল্লা, তুমি কি এতদিনে মুখ তুলে চাইলে তাহ'লে?

বাদশার এই অকারণ ও আকস্মিক করুণা বর্ষণের আতিশয্যে আহ্সানউল্লা ভেতরে ভেতরে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন। প্রথমত তিনি এর যোগাযোগটা খুঁজে পাচ্ছিলেন না—কোথায় কে এই কলকাঠি নেড়েছে, কার মুখে কি শুনে এতটা গ'লে গেলেন সেটা না জানা পর্যন্ত স্বস্তি নেই তাঁর—দ্বিতীয়ত বাদশার এই নিজের ইচ্ছামতো কাজ করাটা তাঁর একেবারেই পছন্দ নয়, এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। এবং বলা বাহুল্য, সে বিরক্তি ও উষ্মার প্রায় সবটাই গিয়ে পড়েছিল এই সে-করুণার পাত্র বিদেশী ছোকরাটির ওপর। তিনি এমন সাংঘাতিক দৃষ্টিতে চাইছিলেন আগার দিকে যে, দৃষ্টিতে ভস্ম হ'য়ে যাওয়া সম্ভব হ'লে সে পুড়ে ছাই হয়ে মাটির তলায় চলে যেত এতক্ষণে।

কিন্তু তা সম্ভব নয় বলেই আগার কিছু হ'ল না—এমন কি এই কিল্লার ম'ধ্য তার যে একটি প্রবল শত্রু তৈরী হয়ে রইল, তাও সে বুঝতে পারল না।...

অনেকক্ষণ ধরেই আহ্সানউল্লা এ আদিখ্যেতার ওপর যবনিকাপাত ক'রে দরবার ভঙ্গ করার কথা ভাবছেন। এবার সেই কথাটাই বলবেন ব'লে মুখ খুলতে যাচ্ছেন এমন সময় একটি সান্ত্রী এসে তাঁর কানে কানে চুপি চুপি কি বলল। মনে হ'ল কারুর কোন অনুরোধ কি আর্জির কথা জানাল সে, কারণ শুনতে শুনতেই অসহিষ্ণু আহ্সানউল্লা 'না' বলার মতোই একটা ভঙ্গী করেছিলেন, তারপর শেষের কথাগুলো শুনে কী ভেবে একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আবার যেন কী প্রশ্ন ক'রে পাঠালেন। এবং বেশ একটু যেন উৎসুক ভাবেই লোকটির পুনরাগমনের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

বাহাদুর শা এত সব কিছু লক্ষ্য করেন নি, বহুক্ষণ কথা বলার ফলে তিনি একটু ঝিমিয়েই পড়েছিলেন। তা ছাড়া তামাক খান নি বহুক্ষণ, সেদিকে মন টানছে। তিনি প্রকাণ্ড একটা হাই তুলে বললেন, 'তাহ'লে এবার ওঠা যাক, কী বল আহ্সানউল্লা? দরবার খতম হ'ল জানিয়ে দিতে বল নকীবকে—না কি? আর তো কারুর কোন আর্জি নালিশ নেই?'

'আর একটুখানি মেহেরবানী করেন তো ভাল হয় শাহান্‌শা, কোন এক পাহাড়ী পাঠান সর্দারের দূত এসেছে, সে আপনার কাছে কী আর্জি পেশ করতে চায়।'

'পাঠান সর্দার! মেলা পাঠান যে এসে গেল দেখতে পাই শহর দিল্লীতে।' আবার প্রচণ্ড একটা হাই তুললেন বাদশা, 'কিন্তু আজ আর কাজ নেই আর্জি-মার্জিতে, ওদের কাল আসতে বল। আজ বেলা হয়ে গেছে ঢের, খিদে পেয়েছে। তা ছাড়া গিয়ে এখন কবিতাটা শেষ করতে হবে—'

'কিন্তু হুজরৎকুম, বিদেশী সর্দারের দূত, এত দূর থেকে এসেছে যখন, তখন

নিশ্চয়ই কিছু নজরানাও এনেছে, ছেড়ে দেওয়া কি ঠিক হবে?'

'নজরানা!' বৃদ্ধের স্তিমিত দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, 'তা বটে! তবে তেমন দরকার থাকলে কালও আসবে। যাবে কোথায়?'

'কিন্তু জাহাঁপনা—আপনার কাছে বিদেশী রাজদূতের আর কী এমন কাজ থাকতে পারে বলুন, আপনার কতটুকুই বা সাধ্য!—ইচ্ছে ক'রেই রূঢ় সত্যই বাদশার মুখের ওপর যেন ছুঁড়ে মারেন আহ্‌সানউল্লা, অনেকক্ষণের রাগ তাঁর—'এ হয়তো শুধুই সৌজন্য, সে সৌজন্য প্রদর্শনের এত গরজ কাল অবধি না-ও থাকতে পারে!'

'তা—তা ওরা কত নজর দেবে?' ছেলেমানুষের মতোই প্রশ্ন করেন বাদশা, ঈষৎ করুণও শোনায় তাঁর কণ্ঠ। আর দেরি করতে একটুও ইচ্ছে নেই তাঁর।

'সেইটেই জানতে পাঠিয়েছি। সামান্য কিছু হ'লে আর আপনাকে তকলিফ্‌ দেব না—'

বলতে বলতেই সান্ত্রীটি আবার ফিরে আসে, হেঁট হয়ে চুপি চুপি উত্তরটা জানায় হেকিম সাহেবকে। আহ্‌সানউল্লার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তিনি বলেন, 'যাও, ওদের নিয়ে এস গে পথ দেখিয়ে'—তার পর বাদশার দিকে ফিরে বলেন, 'ওদের সময় কম, আজই একবার দেখা করতে চায়। ওরা নাকি পাঁচ মোহর নজরানা দেবে।' শেষের দিকে গলাটা খুবই নিচু করেন। বাদশার অর্থলোভ থাকতে নেই।

কিন্তু শাহজাহান বাদশার বংশধরের কাছে অঙ্কটা অকল্পিত বলেই মনে হয়, তিনি প্রকাশ্যেই বিস্ময় প্রকাশ করেন, 'পাঁ-চ মোহর! তা-তাহ'লে ঠিকই করেছ আসতে বলে। কিন্তু কোথাকার লোক ওরা, কোন্‌ দেশ, একটু বুঝিয়ে দাও দিকি!'

'ছোট জায়গা—আমি নক্সায় দেখেছি, নামটা মনে আছে। রাজমাক নাম। সেই-খানকারই সর্দারের লোক।—জায়গাটা আইনত আংরেজদের—মানে আমাদের এলাকায় পড়ে—তবে ওরা খাজনাপত্র কাউকেই দেয় না, আমাদেরও না, কাবুলের আমীরকেও না।'

'রাজমাক! নামটা যেন এখনই কোথায় শুনলাম?'

শুনেছে আগাও, মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে উঠল সে। এই জন্যই ঈশ্বর এত কাণ্ড ক'রে তাকে বাঁচালেন—শেষ অবধি এদের হাতে ফেলবেন বলে?

প্রথম ভয়ের বিহ্বলতায় একবার ভাবল ছুটে পালিয়ে যায় সে—যেদিকে হোক, যেখানে হোক—তার পরই বুঝল, তা সম্ভব নয়। চারিদিকে লোক, সান্ত্রী পাহারা—আসবার পথে দেখে এসেছে সিপাহীদের ছাউনী এই কিল্লার মধ্যেই, গোরা অফসাররা ড্রিল করাচ্ছেন—এর মধ্যে কাউকে অমন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে দেখলে সবাই সন্দেহ করবে, ধরে ফেলবে তৎক্ষণাৎ। এরাই ধরবে এখনই—আর তার-পর, সে যে নির্দোষ এ কথাটা কাউকে বোঝাতে পারবে না।

কিন্তু বেশী কিছু ভাববার সময় নেই। যা হোক কিছু করতে হবে—আর যা করতে হবে এখনই।

সে মরীয়া হয়ে এক কাণ্ড করে বসল। কেউ কিছু বোঝবার কি বাধা দেবার আগেই ছুটে গিয়ে বাদশার পা রাখার ভেলভেটের পাদানীটা আঁকড়ে ধরল, 'শাহানশাহ্‌, আমি আপনার শরণ নিচ্ছি, আমাকে দয়া ক'রে একটা হাতিয়ার ভিক্ষা দিন। ওরা আমারই দেশের লোক, আমাদের সর্দারের ছেলে, আমার বোনকে বেইজ্জৎ করবার চেষ্টা করেছিল বলে আমি কাস্তে ছুঁড়ে মেরেছিলুম, তাইতেই সে মারা যায়।

সেই অপরাধে আমার বংশের সকলকে মেরেছে ওরা, যথাসর্বস্ব লুটে নিয়েছে, ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে ভেঙ্গে সমভূম ক'রে দিয়েছে। মা-বোনকে নিয়ে আমি শুধু অতিকষ্টে পালিয়ে আসতে পেরেছিলুম—কিন্তু কী কষ্টে যে এসেছি সে কেবল খোদাতায়ালাই জানেন, আপনারা কোনদিন ভাবতেও পারবেন না। ওরা সেই থেকে আমাদের পিছু নিয়েছে, আমাদের সন্ধান করছে—আমাকে না মারলে ওদের শান্তি নেই। মরতে আমি প্রস্তুত, কিন্তু জানোয়ারের মতো মরতে চাই না, দয়া ক'রে তলোয়ার দিন, যাতে লড়াই ক'রে মরতে পারি।'

আর বলা হ'ল না। আহ্‌সানউল্লার ইঙ্গিতে এক দরবাররক্ষী এসে এক ঝট্‌কায় টেনে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। আহ্‌সানউল্লা বজ্রগর্জন ক'রে উঠলেন, 'অসভ্য বদমাইশ ছোকরা, তুমি কোথায় এসেছ জান না। এটা শাহানশার দরবার, এখানে রীতি-নিয়ম মেনে চলতে হয়। তোমার মতো লোক বাদশাকে ছুঁতে পারে না—ছোঁওয়া নিষেধ—এটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধিও কি তোমার মগজে নেই? জানোয়ার কোথাকার!'

বাদশাও তিরস্কার ক'রে উঠলেন, 'নালায়েক ছোকরা, এটা শিখে রাখ—এটা দুনিয়ার বাদশার দরবার, বাদশার সামনে হাতিয়ার ধরা কি লড়াই করার এখ্‌তিয়ার কারও নেই। তাছাড়া—আমি অবিচার করব কি ভুল করব, এটা ভাবাও তোমার গুস্তাকী!'

ততক্ষণে রাজমাকীর দল দরবারে পৌঁছে গেছে। যথারীতি কুর্নিশ করতে করতে সামনে এসে, তাদের মধ্যে যে লোকটি বয়োবৃদ্ধ সে একটি রেশমী রুমালে পাঁচখানা মোহর রেখে বাদশার সামনে মেলে ধরল—তাদের নজরানা।

আর একবার বাহাদুর শার ঘোলাটে চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল সুবর্ণের দীপ্তিতে, তবু তিনি লোভ সংবরণই করলেন। আজ আর নিজে হাতে ক'রে তুলে নিলেন না সে পঞ্চ মোহর, একবার মাত্র হাত ঠেকিয়ে আহ্‌সানউল্লার দিকে দেখিয়ে দিলেন।

ততক্ষণে আগার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে ওদের। সকলেই পরিচিত। সর্দারের ছেলে আফজল আর তার শালা কায়য়ুম খাঁ। বাকী কজন এদেরই জ্ঞাতি। কায়য়ুম খাঁই এদের দলপতি, দুর্দান্ত লোক। প্রবাদ যে লোকটা বাঘের চেয়েও হিংস্র, সাপের চেয়েও ক্রুর। এখনও আগার দিকে দৃষ্টি পড়ামাত্র সেই কপিশচক্ষু বাঘের মতোই হিংস্র আর লোলুপ হয়ে উঠল। সে চোখের দিকে চাইলে অতি বড় দুঃসাহসীরও বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

আগা হতাশ হয়ে পড়েছে অবশ্য আগেই। নজরের জন্য এঁদের যে লোলুপতা—তাতে, পাঁচ মোহর নজর দিয়েছে যে তার অনুরোধ কি এড়াতে পারবেন? বিশেষ ক'রে বাদশার প্রিয়পাত্র এই লোকটি, যাকে অহ্‌সানউল্লা বলে সম্বোধন করছেন বাদশা-সালামৎ, সে যে ওর ওপর আদৌ প্রসন্ন নয়—তা ওর কণ্ঠস্বরের উষ্মাতেই বুঝেছে আগা।

নজরের মোহর হেকিম সাহেবের করায়ত্ত হ'লে বাদশা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন ওদের দিকে। কায়য়ুম খাঁ আর একবার অভিবাদন ক'রে বলল, 'আমাদের মহামান্য সর্দার দিনদুনিয়ার মালিক শাহনশাহ্ পাৎশা গাজী শাহ্ জাফর...বাহাদুর শাকে তাঁর হাজার হাজার আদাব আর মুবারক জানিয়েছেন। তিনি নিত্য খোদার কাছে আপনার নামে দোয়া মাগেন, আপনার কুশল ও দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করেন। যদিচ তিনি স্বাধীন রাজ্যের মালিক, তবু সর্বদা নিজেকে আপনার বান্দা বলে মনে করেন।'

ঝুট!' তার বক্তৃতার মধ্যপথে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন বাহাদুর শা, 'বিলকুল ঝুট!...সে স্বাধীন নয়, আমাদের সাম্রাজ্যের মধ্যেই তোমাদের দেশ, বহুদিন তোমরা খাজনা দাও নি শুনেছি—পত্রপাঠ বাকী খাজনা সব পাঠিয়ে দেবে।'

আর যাই হোক, এ ধরণের সম্ভাষণের জন্য ওরা কেউ প্রস্তুত ছিল না। এমন কি আহ্‌সানউল্লাও চমকে উঠলেন।

কিন্তু কায়য়ুম ধূর্ত ব্যক্তি, সামান্য একটা কথার জন্য মামলা নষ্ট করবার মানুষ নয়। বুড়োমানুষ ভীমরতি হয়েছে—কী বলতে কি বলে ফেলেছে। তাকে না চটিয়ে বরং তোয়াজ ক'রে কাজ বাগানোই বুদ্ধিমানের কাজ। সে আবারও ঘটা ক'রে অভিবাদন ক'রে বলল, 'যে আজ্ঞে, আমি ফিরে গিয়ে আপনার হুকুম নিশ্চয়ই জানাব। এখন তাঁর যে আর্জিটা নিয়ে এসেছি—যদি অনুমতি হয় তো পেশ করি!'

'বলো, বলে ফেল কী আর্জি। তবে একটু তাড়াতাড়ি। আমি উঠব এখন, বেলা হয়ে গেছে।'

'খুব সংক্ষেপেই বলছি খোদাবন্দ!—এই যে বত্‌তমিজ কুকুরের বাচ্চা আপনার সামনে দাঁড়িয়ে শাহান্‌শার দৃষ্টি এবং কিল্লার জমিন্ কলঙ্কিত করছে—পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ হয়, তবু উপায় নেই বলেই বলছি—এ লোকটা আমাদের দেশের লোক। এ আমাদের সর্দারের বড় ছেলে, আমার ভাগ্নেকে খুন ক'রে পালিয়ে এসেছে। আমরা বহু কষ্ট ক'রে ওর সন্ধানে এসেছি তার শোধ নেব ব'লে। আমরা পাঠান, আমাদের মন্ত্র হ'ল—রক্তের বদলে রক্ত, এই শিক্ষাই আমাদের বাপ-দাদারা দেয় আশৈশব! এখন শাহান্‌শা মেহেরবানি ক'রে একে আমাদের হাতে ছেড়ে দিন—এই প্রার্থনা। এই আর্জিটুকুই জানাতে এসেছি!'

বাহাদুর শা এতক্ষণ স্থিরভাবে ওদের বক্তব্য শুনছিলেন, এইবার নড়েচড়ে যেন সোজা হয়ে বসলেন। তার পর শান্ত অথচ কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'দেখছিলাম তোমার স্পর্ধা কত দূর যায়। তোমাদের হেকামৎ তো কম নয়!'

এই দরবার-গৃহের ছাদ ফুটো হয়ে একটা গোখরো সাপ সামনে লাফিয়ে পড়লেও বোধ হয় এরা অত চমকে উঠত না। কিছুক্ষণের জন্য যেন সকলে নির্বাক হয়ে গেল। তারপর কথাটার মর্মার্থ ঠিকমতো মাথায় যেতে, অপমানে আফজলের মুখ আরক্ত হয়ে উঠল, সে যেন কতকটা অজ্ঞাতসারেই একবার কোমরে বাঁধা তরবারিটার দিকে হাত বাড়াল। কাইয়ুম খাঁও অবাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভাগ্নের ভাবভঙ্গীটা নিমেষে উপলব্ধি ক'রে তাড়াতাড়ি তাকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে বলল, 'আজ্ঞে—আমি তো ঠিক—মানে, আমাদের অপরাধটা—?'

'তোমরা যদি আমার প্রজা বলে নিজেদের মনে না করো তো এখানে আমাদের মুলুকে এসে আমার আশ্রয়-প্রার্থীকে বধ করার কোন এখতিয়ার নেই, সেটা বিদেশী শত্রুর আক্রমণ বলে গণ্য হওয়া উচিত। সে কথা তোলাই চরম অপরাধ। আর যদি তোমরা এখানের প্রজা হও—আমি তাই মনে করি অন্তত—সেক্ষেত্রে এখানে এসে মাত্র নালিশ জানানোর অধিকার আছে তোমাদের—তার বেশী কিছু নয়। বিচারের ভার আমার, শাস্তি দিতে হ'লে আমিই দেব—তোমরা তোমাদের হাতে সে অধিকার তুলে নেবার কে? তাহ'লে তো তোমরা রাজদ্রোহী!'

'বেশ, তাহ'লে আপনিই শাস্তি দিন!' মুখ গোঁজ ক'রে বলে ওঠে আফজল, কাইয়ুম খাঁ ওর গা টিপে সতর্ক ক'রে দেবার আগেই।

'তোমার হুকুমে নাকি হে ছোকরা? দিল্লীশ্বরকে তোমার হুকুমে বিচার করতে

হবে?'

বলতে বলতেই বৃদ্ধ বাদশা উঠে দাঁড়ান। তাঁরও মুখ প্রবল ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করেছে, উত্তেজনায় সর্বাঙ্গ কাঁপছে থরথর ক'রে। হয়তো পড়েই যেতেন—যদি না সে অবস্থা অনুমান ক'রে হেকিম আহ্সানউল্লা এসে তাঁকে ধরে ফেলতেন তাড়াতাড়ি। সেই অবসরেই আহ্সানউল্লা তাঁর কানে কানে বললেন, 'জাঁহাপনা, অনেকগুলো টাকা নজর এনেছে ওরা—অতটা রূঢ় হওয়া উচিত হচ্ছে না।'

কিন্তু ততক্ষণে শাহ্ জাফরের বাবরশাহী তৈমুরশাহী রক্ত টগবগিয়ে ফুটে উঠেছে দেহের মধ্যে, 'ওটা নজর নয় আহ্সানউল্লা, ঘুষ। আলমগীর বাদশার বংশধরকে ওরা পাঁচ মোহর ঘুষ দিতে এসেছে!...ভেবেছে আমি ঐ তুচ্ছ কটা মোহরের লোভে একটা নিরপরাধ লোককে জবাই হবার জন্যে কসাই ব্যাটাদের হাতে ছেড়ে দেব! ওদের দূর ক'রে দাও কিল্লা থেকে আহ্সানউল্লা, আমি যাকে আশ্রয় দিয়েছি তার মাথার একগাছি চুলেও হাত দেবার দুঃসাহস ওদের না হয়!'

তবু কাইয়ুম খাঁ একটা ক্ষীণ চেষ্টা করতে যায়, 'আমরা সুবিচারই চাইছি আপনার কাছে শাহান্শা, ও লোকটা খুনী—ও আপনার আশ্রয় পাবার যোগ্য নয়।'

বাহাদুর শা ভিতরে যাবেন ব'লে পিছন ফিরেছিলেন। এইটুকু জোরে কথা বলার ফলে ইতিমধ্যেই তার গলা ভেঙেগ এসেছে—তবু তিনি তাঁর সামনের-দিকে-ঈষৎ-ঝুঁকে-পড়া দেহ প্রাণপণে সোজা ক'রে টান হয়ে দাঁড়িয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'বিচার এক-তরফা হয় না মুলুকী পাঠান। মামলার দুটো পক্ষ থাকে। কেন ও খুন করেছে তোমার ভাগ্নেকে বলতে পারবে এই দরবারে দাঁড়িয়ে?...বলতে পারবে না তা আমি জানি। তোমাদের মামলা তোমরাই খারিজ করিয়ে দিলে। তাহ'লে আর এখানে থাকার কোন দরকার নেই তোমাদের। তোমরা বিদায় হও, আর শোন, যাবার আগে তোমাদের ঐ ঘুষের অপবিত্র পাঁচটা মোহরও নিয়ে যাও, কাজে লাগবে। দেশে ফিরে গিয়ে তোমাদের সর্দারকে ব'লো শের বুড়ো হ'লেও শেরই—শিয়ালের সঙ্গে তার ঢের তফাৎ। টাকা দিয়ে হিন্দুস্তানের বাদশার ইমান্ কেনা যায় না।'

আর দাঁড়ালেন না বাদশা। আহ্সানউল্লার কাঁধে ভর দিয়ে অন্তঃপুরের পথে চলে গেলেন।

॥ আট ॥

বহুদিন পরে মাথার ওপর একটা আচ্ছাদন মিলেছে, ঘুমোবার জন্যে একটা চারপাই, দুবেলা নিয়মিত পেট-ভরা রুটিও পাওয়া যাচ্ছে—আবার বাদশার দয়াতে নতুন পোশাকও মিলেছে একটা। যাকে এক-বস্ত্রে প্রাণভয়ে ইঁদুরের মতো দিনমানে আত্মগোপন ক'রে, শৃগালের মতো আড়াল আবডাল ধরে জনপদ এড়িয়ে অবিরাম হাঁটতে হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে—তার কাছে এটা স্বর্গসুখ, রীতিমতো নবাবী। কিন্তু তবু আগা সুখী হ'তে পারছে কই? মা-বোনের একটা খবর না পাওয়া পর্যন্ত যে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না। একেবারে, বলতে গেলে পরের আশ্রয়ে, তার দয়ার ওপর নির্ভর ক'রে ফেলে এসেছে সে—ক-ঘণ্টারই বা চেনাশোনা দিল মহম্মদের সঙ্গে। হয়তো সে ফেলে নি—দিলদার ইমানদার লোক, দায় যা ঘাড়ে করেছে আজও বহন ক'রে যাচ্ছে কোন রকম ক'রে—কিন্তু তারা না জানি কী অবস্থায় আছে! প্রতিদিনের

রুটি কি ভিক্ষান্ন বলে মনে হচ্ছে না তাদের কাছে, অনুগ্রহের খাদ্য গলায় বাধছে না? দিল মহম্মদ কিছু না বলুক—তার মা হয়তো বাঁকা কথা শোনাচ্ছে।

তা না হ'লেও—আগার কোন খবর তারা পাচ্ছে না হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই পাচ্ছে না—সেই কি কম যন্ত্রণা তাদের, কম উৎকণ্ঠা ভোগ করছে! মা হয়তো দিনরাত কাঁদছেন—বিলাপ করছেন আর সেই কান্না ও বিলাপে অস্থির হয়ে বোন হয়তো আবার আত্মহত্যার ফিকির খুঁজছে। কে জানে, কোন খবর না পেয়ে হয়তো কোন দুঃসাহসিক কান্ডই ক'রে বসে আছে তারা। যদি পাগলের মতো দিল্লীতে চলে আসে! মনে করে দিল্লীতে এসে খুঁজে নেবে আগাকে—তাহলে তারা তো আগার খোঁজ পাবেই না, আগাই কি কোন কালে আর খুঁজে পাবে তাদের? এত বড় শহরে এত লোকের মাঝে এসে দিশাহারা হয়ে পড়বে, তখন হয়তো আর দিল মহম্মদের কাছেও ফিরতে পারবে না—অনাহারে শুকিয়ে মরবে এই শহরের রাজপথে। ভিক্ষা করা যার অভ্যাস নেই কোন কালে, সে কি সহজে হাত পাততে পারবে কারও কাছে! পাতলেই কি ভদ্র আশ্রয় মিলবে কোথাও? কে এখানে তাদের বিশ্বাস করবে? মাঝখান থেকে কোন কু-মতলবী ফেরেববাজ লোক হয়তো গুল্লুকে ভুলিয়ে নিয়ে চলে যাবে কোন অসৎ পাড়ায়। হয়তো ক্রীতদাসী হয়ে চালান হয়ে যাবে কোন দূর দেশেই।

দিনরাতই এই সব ভাবে আগা। কেবলই মন্দ সম্ভাবনাগুলো মনে আসে তার। মাঝে মাঝে মনে হয়, তারা নিশ্চয়ই বেঁচে নেই, আর সেই সঙ্গে মনে হয়, তাহলে তারই বা বেঁচে থেকে লাভ কি?

আরও কষ্ট হয় এই উপায়হীনতার জন্যে। সে যেন লালকিল্লায় বন্দী। যদি কাছারী-কোতোয়ালের বিচারে তার কয়েদের হুকুম হ'ত—তাতেও যে ফল হত এখনও তাই হয়েছে—অন্তত তার পক্ষে। এখান থেকে বেরোনোর উপায় নেই। কারণ সে শুনেছে রাজমাকীরা এখনও যায় নি দিল্লী থেকে। শুধু তাই নয়, তারা পালা ক'রে পাহারা বসিয়েছে লালকিল্লা থেকে নির্গমনের সব কটি পথে। যে লোকটির সঙ্গে তার কাজের পালা—রহমৎ, সে খুব তুখোড় লোক, চাঁদনী চৌকে তার ভগ্নিপতির দোকান আছে, মাঝে মাঝে অবসর পেলেই সেখানে যায় আর রাজ্যের খবর নিয়ে আসে। রহমৎই এসে বলেছে তাকে রাজমাকীদের খবর। তারা কিল্লাতে বাদশার কাছে ভর্ৎসিত হয়ে সটান্ গিয়েছিল শহরের বড় কোতোয়ালীতে। খোদ মেটকাফ সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে নালিশ জানিয়েছিল। সেখানেও কোন সুবিধা হয় নি। তিনি বলেছেন যে, প্রথমত ঘটনাটা ঘটেছে ওদের দেশে, কোম্পানীর হুদ্দার বাইরে, তার বিচার এখানে হ'তে পারে না। তিনি বলেছেন ওদের, ভাল মানুষের মতো খাজনা জমা দিয়ে কোম্পানীকে বাদশা বলে স্বীকার করলে এ নালিশ চলতে পারবে। দ্বিতীয়ত বলেছেন—কিল্লার মধ্যে এখনও বাদশা মালিক, তিনি যতক্ষণ না বলবেন, শহরের পুলিস আগাকে টেনে আনতে পারবে না। এই সব শুনে তারা আরও চটে গেছে—তারা নাকি কসম খেয়েছে আগার শির না নিয়ে দিল্লী ছাড়বে না। দিনরাত তাই পাহারা দিচ্ছে।

অবশ্য লড়তে ভয় পায় না আগা, পুরুষ মানুষ লড়াইতে তো আনন্দ পাবারই কথা। কিন্তু সে একা, ওরা অনেকে। ওদের অর্থবল আছে, ইচ্ছা করলে বহু মানুষ ওরা ভাড়া ক'রেও আনতে পারে। আগার সহায়ও নেই, সম্বলও নেই। তা ছাড়া তার মাথার ওপর দায়িত্ব আছে। মা-বোনের কোন ব্যবস্থা না ক'রে তার

মরবারও অধিকার নেই। তারই হঠকারিতায় আজ এ অবস্থা তাদের—অবশ্য ওরকম ক্ষেত্রে আর কীই বা করা যেত তা সে জানে না—তবু দায়িত্ব আছে বৈকি! না মরলেও, যদি গুরুতর জখম হয়ে পড়ে, তা হ'লেও সেই একই ক্ষতি, ওদের খবর নেওয়া, ওদের কোন সুব্যবস্থা করা সুদূরপরাহত হয়ে পড়বে। রহমৎ বহুদর্শী লোক, সেও সেই কথা বলে, 'ভাই, এতে কিছু সরমের কথা নেই। নাচারে পড়লে শেরকেও ঘাপ্‌টি মেরে থাকতে হয়, যে শের কমসে-কম শও দুশও আদমী ঘায়েল করেছে সেই আদমখোর শেরও শিকারী দেখলে ঝোপের আড়ালে লুকোয়। কি করবে, তোমার নসীবটাই এখন খারাপ চলছে, এখন মরদ হয়েও আওরতের মতো ঘরে বন্ধ হয়ে থাকতে হবে—উপায় কি? দিন কিনে নাও, তার পর শোধ তুলতে কতক্ষণ!'

অগত্যা ঘাপ্‌টি মেরেই থাকে আগা, কিন্তু মন শান্ত হয় না কিছুতেই। সুযোগের অপেক্ষা করে কিন্তু সুযোগ কি অদূর ভবিষ্যতে কোন দিন আসবে? কে জানে। এক একবার যেন হতাশায় মন ভরে যায় তার।

আরও একটা অস্বস্তির কারণ জুটেছে। বড় কারণ। তবে সেটা রহমৎকে বলা যায় না। কাউকেই বলা যায় না। কারও কাছ থেকে পরামর্শ চাই'তে পারে না—সেই হয়েছে আরও মুশকিল। একা বহন করতে হয় বলে চিন্তাটা আরও পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে।

সেই জাদুকরী ভেলকীওয়ালীর চিন্তা।

মনকে অবশ্য খুবই বোঝায় সে যে, তার কথা ভাবা উচিত নয় ওর—কারণ যতদূর জানা এবং বোঝা যাচ্ছে সে শাহ্‌জাদী শ্রেণীরই কেউ হবে : ওর জীবনে আর তার জীবনে আশমান-জমিন ফারাক—তবু না ভেবেও পারে না। প্রথম প্রথম একটা দারুণ অভিমান, একটা বীতরাগ ছিল—গায়ের ব্যথা এবং ক্ষতগুলোর জ্বালা যতদিন কমে নি, ততদিন একটা ভয়ও ছিল। মনে হ'ত তার কথা ভাবলে হয়তো আরও কি অশুভ হবে। সে কখনও সাধারণ মেয়ে নয়—কোন কুহকিনী কি শয়তানী, ওর মতো ছেলেমানুষ দেখে'ল রূপসী অল্পবয়সী মেয়ের চেহারা ধরে এমনি খেলা করে তাদের নিয়ে। কিন্তু গায়ের ব্যথা মরবার সঙ্গে সঙ্গেই কিংবা হয়তো খানিকটা সময় কাটবার ফলেই—অন্য বিবেচনা এল। মনে হ'ল শুধু তো অমঙ্গল ক'রে নি, মঙ্গলও কিছু করেছে। বস্তুত তার জন্যই তো আগার প্রাণরক্ষা হয়েছে। সব দিক দিয়েই প্রাণরক্ষার কারণ সে। দুশমনদের হাত থেকে তো বেঁচে গেছেই, চাকরি পাওয়াটাও কম বড় প্রাণরক্ষা নয়। এই অপরিচিত নির্বান্ধব দেশে, ঐ দুশমনদের মধ্যে কোথায় ঘুরে ঘুরে চাকরি যোগাড় করত সে, কে বিশ্বাস ক'রে কাজ দিত?

হয়তো এমন ভাবে যোগাযোগ না ঘটলে, ওর কিল্লাতে ঢোকাই হ'ত না। হয়তো এই মার খাওয়াটাই শাপে বর হ'লে ওর কাছে। ও এমন ভাবে অকারণে নির্যাতিত না হ'লে সে-মেয়ের টনক নড়ত না, ওর কথা সুপারিশ করত না। আর সে না বললে বাদশাও এক কথায় চাকরি দিতেন না।

এই কথাটাই ভাবতে ভালো লাগে ওর। সেই মেয়েটিকে কুহকিনী মায়াবিনী সর্বনাশিনী রূপে নয়, মঙ্গলময়ী জীবনদাত্রী রূপে কল্পনা করতে চায় সে। সেই ভাবে চিন্তা করলেই মনটা খুশী হয়—আর সেই সঙ্গে তার এবং মেয়েটির মধ্যে একটা যোগাযাগ কল্পনা ক'রে অনির্বচনীয় আনন্দে মন ভরে ওঠে। সে যোগাযোগ সহানুভূতির। সে অনুতপ্ত হয়েছিল, ওর জন্যে দুঃখিত হয়েছিল—তাই বাদশাকে সব কথা

খুলে বলে ওর জন্যে করুণা ভিক্ষা করেছে। দরিদ্র ব'ল, মূর্খ বলে, গ্রাম্য চাষী বলে ওকে বিবেচনার অযোগ্য মনে করে নি, অবহেলা ক'রে নি—ওর কথা ভুলে যায় নি। কে জানে, হয়তো আজও তার মনের কোন নিভৃত অনাদৃত কোণে ওর একটু স্থান আছে। কোন কোন দিন রাজহর্ম্যের সুখ-শয্যায় হয়তো অকস্মাৎ মনে পড়ে যায় ওর কথা—সেদিনের ঘটনাগুলো।

এ চিত্র কল্পনায় যেমন আনন্দ পায়—তেমনি দুঃখও মনটা আকুলি-বিকুলি ক'রে ওঠে, তাকে আর একটিবার দেখবার জন্যে। যদি পরিচয়টাও জানত তার! নাম পর্যন্ত জানে না যে!

এক-একবার—যখন মনে শুভবুদ্ধির উদয় হয়—জোর ক'রে এ চিন্তা ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে। কীই বা হবে দেখে, কীই বা হবে পরিচয় জেনে। বামন সে—চাঁদ চিরদিনই তার কাছ থেকে দূরে থাকবে—বহুদূরে।

আবার ভাবে নাই বা পেলাম হাত বাড়িয়ে ধরতে, দূরে থেকে দেখতে তার কথা ভাবতে দোষ কি?

কিন্তু দূর থেকে তো দূরের কথা, পরিচয় জানার সম্ভাবনাই যে সুদূরপরাহত মনে হয়!

জেনানা মহলের সঙ্গে তার যোগাযোগই নেই। যদিও তাকে যে কুটুরীটা দেওয়া হয়েছে সেটা সে মহল থেকে খুব দূরে নয়—কিন্তু বাহ্যিক দূরত্বের চেয়েও ঢের বেশী দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আছে এখানে। তাদের ও মহলে ঢোকাই নিষিদ্ধ। দু-চার জন অতিবৃদ্ধ পুরাতন ভৃত্য ছাড়া কোন পুরুষ কর্মচারীরই প্রবেশাধিকার নেই সেখানে। নামমাত্র রক্ষী আছে দু-চারজন, তারাও জেনানামহলের বাইরে থেকে পাহারা দেয়। কয়েকটি জবরদস্ত গোছের মেয়ে-মর্দানা দাসী আছে—তারাই ওখানকার আসল রক্ষী বা রক্ষিণী। যা কিছু দরকার হয়—তারাই এসে বাইরে পুরুষ ভৃত্যদের জানিয়ে যায়। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা কওয়া যায়—কিন্তু তাদের যা চেহারা এবং চালচলনের কর্কশ ভঙ্গী—তাদের সঙ্গে যেচে গিয়ে আলাপ করতে সাহস কুলায় না আগার। রহমৎ বলে আগে তাতার থেকে মেয়ে প্রহরিণী আনা হ'ত হারেমের জন্যে—তারা খোলা তলোয়ার নিয়ে পাহারা দিত হারেমের দরজায় কিংবা বড় বড় বেগমদের মহলে ঢোকবার পথে। তাদের দেখে অতি-বড় দুঃসাহসী যোদ্ধারও বুকের রক্ত শুকিয়ে যেত। তা ছাড়া খোজা প্রহরীও থাকত। এখন আর সেসব পোষবার পয়সাও নেই, জরুরৎও নেই,—তাই বেছে বেছে এইসব মেয়ে-মর্দাদের রাখা হয়েছে। এরাও যতটা পারে লোকের মুখে গল্প শুনে শুনে সেইসব তাতারী মেয়েদের নকল করার চেষ্টা করে চালচলনে।

আগা রক্ষী হ'লেও অন্তত জেনানামহলের দরজা পর্যন্ত যেতে পারত কিন্তু মুশকিল হয়েছে যে সে রক্ষীও নয়। সে যে কী তা সেও জানে না, বোধ হয় এখানকার অন্য লোকও নয়। বাদশার খাশ মহলের বাইরে তাকে খাড়া থাকতে হয়, রাত্রি হ'লে বসার একটা টুল পায়। দরবারের সময় দরবারের বাইরে হাজির থাকে। কাজ খুবই কম। কদাচিৎ কোন দরকার পড়লে বাদশা বা শাহাজাদারা ডেকে পাঠান—কাজের মধ্যে এঁর খৎ ওঁকে পৌঁছে দেওয়া, কি কোন মৌখিক প্রশ্ন নিয়ে যাওয়া—আবার তার উত্তর এনে এঁকে পৌঁছে বা জানিয়ে দেওয়া। আজকাল কিছু কিছু বাজারের ভারও পড়ে আগার ওপর। কী ক'রে যেন জানাজানি হয়ে গেছে যে আগা চুরি করে না, অথবা (একেবারে কেউ চুরি করে না এটা বিশ্বাস করা শক্ত

বৈকি ওঁদের পক্ষে) করলেও নামমাত্র করে, তাই অনেকেই ব্যক্তিগত জিনিসপত্র কেনা-কাটার ভার দেন ওর ওপর। জেনানামহলের থেকেও যে সে হুকুম আসে না তা নয়—তবে সে এলেও অপরের মারফৎ আসে, সে উপলক্ষেও কোন যোগাযোগ করা যায় না।

বাজার অবশ্য কিল্লার মধ্যেই। কিল্লার বাইরে যাওয়া যে ওর নিরাপদ নয় তা কোন বিচিত্র কারণে এখনও বাদশার মনে আছে। একদিন এক শাহ্‌জাদা ওকে শহরে পাঠাচ্ছিলেন কী একটা কাজে, বাদশার সামনেই কথাটা বলায় তিনিই শাহ্‌জাদীকে নিরস্ত করলেন।

বাদশা নিজে একদিন রেসিডেণ্ট সাহেবের কাছে পাঠিয়েছিলেন জরুরী চিঠি দিয়ে—সঙ্গে দুজন সশস্ত্র সিপাহী দিয়েছিলেন। শুধু সিপাহীদের হাতে কেন দিলেন না চিঠি, অনর্থক তার যাবার প্রয়োজন কি, আগে এতটা বুঝতে পারে নি আগা, কিল্লার বাইরে যেতেই কারণটা পরিষ্কার হয়ে গেল। সিপাহীরা দুজনেই চেপে ধরল তাকে, কী খৎ—বাদশা কি লিখেছেন দেখাতে হবে তাদের। আগা তো অবাক! সে অবশ্যই দেখায় নি বা দেখতে দেয় নি—কিন্তু তার ফলে সিপাহীরা প্রথমে বিস্মিত পরে বিরক্ত ও রুষ্ট হয়ে উঠল তার ওপর। সেই দিনই বুঝেছিল আগা যে বাদশা তাঁর অপর ভৃত্যদের থেকে তাকে বেশী বিশ্বাসী, বেশী ইমানদার বলে মনে করেন।

কিন্তু তবু—তিনি যত বিশ্বাসই করুন, জেনানামহল বহুদূর সেখানে যে কোন দিন প্রবেশাধিকার মিলবে তা মনে হয় না।

মনে হয় সেই একদিন-চকিতে-দেখা সে মেয়ে বাস্তবে নেই, রক্তমাংসের মানুষ নয়। স্বপ্নেগড়া সে, স্বপ্নেই দেখা দিয়েছিল। স্বপ্নকে হাত বাড়িয়ে ধরতে যাওয়াই মূর্খতা।

অবশেষে বিধাতা একদিন তার ওপর প্রসন্ন হলেন।

দৈবাৎ মিলে গেল একটা সুযোগ।

কী কারণে যেন জেনানামহলের বাইরে কোন রক্ষী ছিল না তখন। সে সময়টা বিশেষ লোকের প্রয়োজনও ছিল না অবশ্য। ঠিক অপরাহ্ন নয়, মধ্যাহ্ন পার হয়ে গেছে—এমনি সময় সেটা, সকলেই ঘুমে অচেতন। তখনও শীত আছে, রেজাই জড়িয়ে ঘুমোচ্ছে সব। কেউ সামান্য-সামান্য রোদ যেখানে আছে সেখানে বিছানসুদ্ধ পড়েছে। আগার বিশেষ কোন কাজ ছিল না তখন—ঘুমও আসে নি, অচেতন মনের আকর্ষণে ঘুরতে ঘুরতে কখন জেনানামহলের সামনে এসে পড়েছে তা আগে বুঝতেও পারে নি। হঠাৎ দেখল, একটি বৃদ্ধা দাসী, অথচ খান্ডারণী ধরণের নয়—বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। বোধ হয় একটা লোক কাউকে প্রয়োজন —কিছু আনতে হবে বা কোনও খবর পাঠাতে হবে—কাউকে দেখতে পাচ্ছে না।

কে যেন ওর মনের মধ্যে বলে উঠল, এই সুযোগ, এখন না উপায় হলে আর কোনদিনই হবে না।

কাছে এগিয়ে এসে খুব মিষ্টি গলায় বলল, 'কাউকে খুঁজছ নানী?'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝল চালে খুব ভুল হয়ে গেছে। কারণ সম্বোধনটা শুনেই ভীষণ একটা ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এল নানীর ললাটে। সে রুষ্ট কণ্ঠে বলে উঠল, 'কে রে অসভ্য ছোঁড়া, জানা নেই শোনা নেই মরদ হয়ে জেনানার সঙ্গে গায়ে

পড়ে কথা কইতে আসিস।

আগার অবশ্য ভুলটা শুধরে নিতে দেরি হ'ল না। সে বড় ক'রে জিভ কেটে প্রায় আভূমি নত হয়ে প্রকাণ্ড এক সেলাম ঠুকে বলল, 'মাপ করবেন বেগম সাহেবা, আমি ঠিক চিনতে পারি নি আপনাকে, মানে মুখের দিকে চেয়ে দেখি নি তো। আর আপনারা তো আসেন না কোনদিন বাইরের দিকে—আমি ভেবেছিলাম কোন চাকরানী কি মজুরনী—'

বৃদ্ধা প্রসন্ন হ'ল। গম্ভীর মুখে বলল, 'আমি বেগম সাহেবা কেউ নই বাছা, তবে একেবারে বাঁদী মজুরনীও নই। আমি অন্য অন্য কাজ করি—বাঁদীরা যা করে তার ওপরের কাজ। মরদদের সঙ্গে কথা বলার রেওয়াজ নেই আমাদের।'

'গুস্তাকী মাপ করবেন বেগম সাহেবা—আমাদের কাছে আপনি বেগম সাহেবাই—তবে আমি ভেবেছিলুম কোন ফরমাশ টরমাশ আছে, হয়তো লোক খুঁজে পাচ্ছেন না, তাই ভরসা ক'রে—'

'না, ফরমাশ আর এমন কি—' বুড়ী বুঝি একটু অপ্রতিভই হয়ে পড়ে, 'তামাকু পাতা ফুরিয়ে গেছে তাই ভাবছিলুম কাউকে দিয়ে আনাব—সামান্যই, দু-চার দামড়ির ব্যাপার। তা থাক এখন—'

'না, না, থাকবে কেন, আপনি এক লহমা এখানে তস্‌রীফ রাখুন আমি ছুটে গিয়ে এনে দিচ্ছি!'

'আবার অত তকলীফ করবে? তা তাই না হয় এনে দাও।...এই যে পয়সা—আরে পয়সা নিলে না?'

'পয়সা? আপনাকে একটু তামুক এনে দিতে পারব এর চেয়ে ভাগ্য আমার আর কি হ'তে পারে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনই নিয়ে আসছি।'

সে প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে সত্যিসত্যিই পাঁচ মিনিটের মধ্যে এনে হাজির করল একরাশ দোক্তাপাতা।

'এই নিন বেগম সাহেবা। দেখে নিন—ভালো তো?'

'তুমি আমাকে বরং চাচী বলেই ডেকো বাছা, বেগম বেগম ক'রো না, কে শুনলে আবার কি ভাববে, দরকার কি?'

'এত যখন মেহেরবানী করলেন তখন আমি বরং আপনাকে বহিনজী বলেই ডাকব। চাচী বড় দূরের সম্পর্ক, হাজার হোক পরের মেয়ে। আর এমন কিছু বয়সে বড়ও হবেন না আপনি আমার চেয়ে—'

'তা তাই ব'লো, যা খুশি!' বুড়ীর মুখে আর হাসি ধরে না, অপাঙ্গে একবার আগার তাজা কচি মুখের দিকেও চেয়ে নেয়, 'কিন্তু এ কী করেছ ভাই, এ যে অনেক তামাকু, এত পয়সা খরচ করেছ কেন? না না, তুমি বলো কত দাম আমি দিয়ে দিচ্ছি—'

'বহিনজী, যখন মেহেরবানি ক'রে ভাইয়ার সম্মান দিয়েছেন তখন আর এসব কথা মুখে আনবেন না। আমার আজ নসীব ভাল যে আপনার এই সামান্য সেবায় লাগতে পারলুম।'

'তোমাকে এখানে নতুন দেখছি যেন? বেশ মিষ্টি কথাবার্তা তোমার বাপু, তা মানতেই হবে, শুনলে কান জুড়িয়ে যায়। আমাদের এখানের এই বাঁদরগুলো না জানে কথা কইতে আর না জানে কোন সহবৎ। বুড়ী ছাড়া কোন বাক্যি নেই বজ্জাতগুলোর মুখে।'

'হ্যাঁ বহিনজী, আমি নতুনই। সবে এই মাস দুই কাজে লেগেছি। আমার নাম আগা, আমি পাঠান মুলুকের লোক, মূর্খ পাহাড়ী—শহরের হালচাল এখনও কিছু শিখে উঠতে পারি নি।'

'পার নি সেই ভাল! আহা এদের যা হালচালের ছিরি! আর ব'লো না—। এদের হাওয়া যেন তোমার গায়ে কখনও না লাগে।'

তার পরই বুঝি মনে পড়ে যায় কথাটা, 'ও, তুমিই বুঝি সেই পাঠান ছোকরা, ঘোড়া চুরি ক'রে ধরা পড়েছিলে? তোমাকেই নাকি আমাদের নতুন শাহ্‌জাদী সুপারিশ ক'রে চাকরি দিইয়েছেন? শাহ্‌বেগম-সাহেবার মুখে শুনেছিলুম বটে কথাটা। তা তোমাকে তো কই তেমন বদমাইশ ফন্দীবাজ বলে মনে হচ্ছে না!'

'কেন—শাহ্‌বেগম সাহেবা বুঝি আমাকে খুব বদমাইশ লোক বলে ধরে নিয়েছেন?' আগা সাগ্রহে প্রশ্ন করে।

'না, তা ঠিক নয়—তবে তাঁর কথাবার্তা থেকে—মরুক গে, বড়দের কথা বড়দেরই ভাল, ওসব নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে নেই।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুড়ীর কৌতূহলই প্রবল হয়ে ওঠে, 'আচ্ছা, নতুন শাহ্‌জাদীরই বা অত মাথা-ব্যথা কেন তোমার জন্যে? তোমার সঙ্গে তাঁর মোলাকাৎ হ'ল কবে?'

'আমার সঙ্গে তো কই কোন শাহ্‌জাদীর কখনও মোলাকাৎ হয় নি। আমার মতো লোকের সঙ্গে শাহ্‌জাদীর মোলাকাৎ! আপনি যে কথা কয়েছেন এই কত ভাগ্য আমার! তা ছাড়া হবেই বা কি ক'রে, আমি তো সবে সেইদিনই দিল্লীতে এসেছি। কারুর সঙ্গে তো কোন পরিচয় ছিল না আমার!'

'তা, তবে ও কথাটা রটল কেন?'

'সে কী ক'রে বলব বহিনজী? আমার মতো তুচ্ছ একটা বান্দার কথা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় বা কেউ কিছু রটাতে পারে—এটা তো জানা ছিল না আমার। কিন্তু সে কথা যাক, যার যা ইচ্ছা রটাক গে—কিন্তু বহিনজী, নতুন শাহ্‌জাদী বলছ কেন, শাহ্‌জাদী আবার নতুন পুরনো হয় নাকি?'

'না সেজন্যে নয়, মানে মেহের শাহ্‌জাদী তো এখানে ছিলেন না—এখানে পয়দাও হন নি—উনি ছ-সাত বছর বয়সের সময় এখানে এসেছেন। উনি শাহানশান আপন নাতনী নন—ওঁর এক ভাইঝির মেয়ে। সে ভাইঝি জায়েব্‌উন্নিসা বেগম বাহেবা জিদ ক'রে তাঁর মামার ছেলেকে শাদী ক'রে চলে যান দিল্লী ছেড়ে। ওঁদের অবস্থা খুব ভালো ছিল না, যে রাজার কাছে কাজ করতেন তাঁর শ্বশুর—আংরেজ কোম্পানী সে রাজার গদী কেড়ে নেয়, তাতে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ে। তার ওপর তাঁরা দুই স্বামী-স্ত্রীই একদিনে মারা যান হৈজার বেমারীতে। সেই খবর পেয়ে বাদশা নাতনীকে আনিয়ে নেন। ঐ ভাইঝিক খুব ভালবাসতেন কিনা—সেই মায়াটা আরও বেশী ক'রে গিয়ে পড়ছে মা-মরা নাতনীর ওপর। আর সেই জন্যেই আমাদের বড় বেগমসাহেবা ওকে দুটি চক্ষু পেড়—অয় খোদা, দ্যাখো কি বলতে কী বলে ফেলছিলুম। আমরা দাসী বাঁদী লোক, আমাদের ওসব কথায় থাকতে নেই।'

প্রায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনছিল আগা, বরং বলা যায়, গিলছিল ওর কথাগুলো। এই মেহেরই যে সেই মেয়ে তার কোন প্রমাণই নেই, কিন্তু ওর সমস্ত মন বলছে এ সে-ই। সে ছাড়া আর কেউ নয়।

মেহের! ভারী মিষ্টি নাম কিন্তু। এ নাম নইলে যেন আর কিছু মানাত না তাকে। এই, মাত্র সেদিন, রহমতের কাছে গল্প শুনছিল, হিন্দুস্তানের তামাম

বেগমের মধ্যে সব চেয়ে রূপসী ছিলেন নূরজাহাঁ বেগম সাহেবা, তাঁকে পাবার জন্যে জাহাঙ্গীর বাদশা না করেছেন এমন কোন কাণ্ড নেই—সেই নূরজাহাঁরও আসল নাম ছিল মেহের। মেহের উন্নিসা।

আগা যেন সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে, সাগ্রহে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা শাহ্‌জাদী মেহের কি খুব সুন্দর দেখতে—হুরীর মতো?'

'কে জানে বাপু কাকে যে তোমরা খুব সুন্দর বলো', নাকটা একটু সিঁটকে জবাব দেয় বুড়ী, 'এমন কি সুন্দর তা তো বুঝি না। মদ্দাটে মদ্দাটে ধরণ, কেবল বলে ঘোড়ায় চড়ব, বল খেলব—এই সব। তবে হ্যাঁ—রঙ্‌টার জেল্লা আছে, তা মানতে হবে!'

'খুব ফরসা বহিনজী—তোমার মতো চড়া রঙ্ হবে?'

'কী যে বলো ভাইজান, আমার আবার চড়া রঙ্! তবে হ্যাঁ—ছিল একদিন বটে, সেটা ঠিক। তবে কি জানো, আমার ছিল হলদেটে রঙ্—এর একেবারে গোলাপী, দুধে-আলতা মেশালে যেমন হয় তেমনি।'

'ও রঙ্ তো আমাদের মুলুকের জমাদারনীদেরও আছে। ওর খুব বাহার আছে বলে মনে হয় না আমার কাছে। একটু হলদে রঙেরই আসল বাহার!'

'তা অবিশ্যি অনেকে বলে বটে। আমাকেও বয়সকালে ঐ জন্যেই অনেকে তারিফ করত। তা তুমি ভাই বেশ সমঝদার লোক, তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলে সুখ আছে। যাই আজ, বেলা হয়ে যাচ্ছে, বিবিসাহেবাদের ওঠবার সময় হ'ল। উঠেই নানারকম দরকার পড়বে—আর হাতের কাছে তা না পেলে—। এ সব বিবিদের বিষ নেই, কিন্তু কুলো-পানা চক্র ঠিক আছে। হুঁ!'

'তা বহিনজী তোমার নামটাই জানা হ'ল না তো?'

'আমার আবার নাম! আমাকে এখানে রাবেয়া ব'লে ডাকে সবাই।'

আগা তার সঙ্গে জেনানামহলের মুখ পর্যন্ত এগিয়ে আসে, 'নতুন ভাইয়াকে যেন ভুলে যেও না দিদি, মাঝে মাঝে খবর নিও কিন্তু। আর এমনি কোন ছোট-খাটো ফরমাশ থাকল বে-ফিকির আমাকে জানিয়ে দিও, কোন সঙ্কোচ ক'রো না।'

'নিশ্চয়ই নেব। খবর নেব বৈকি। কিন্তু ঐ দ্যাখো, পোড়া কপাল আমার, তোমার নামটা তো জানলুম, থাকো কোথায় তা তো জানলুম না!'

'এই যে, কাছেই থাকি বহিনজী, এই বাঁকটা ঘুরলেই সিঁড়ির নিচে যে একটা চোরা কুটুরী মতো আছে, আগে যেখানে পুরনো পর্দাটর্দাগুলো থাকত জেনানা মহলের—সেই ঘরটা খালি ক'রে আমাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে।...বাইরে না দেখতে পেলে, যদি তেমন কোন দরকার থাকে, সটান ঘরে চলে যেও!'

রাবেয়া খুশী হয়ে দোক্তাপাতাগুলোর কত দাম হ'তে পারে, আন্দাজ করতে করতে ভেতরে চলে গেল।

তখনও অবশ্য জেনানামহলে দিবানিদ্রার পালা চোকে নি। একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে আশ্বস্ত হয়ে তামাকুপাতাগুলো নিজের ঘরে রেখে আসবার জন্য যেমন সেদিকে ফিরেছে—একেবারে মুখোমুখি হয়ে গেল মেহেরের সঙ্গেই।

মনটা খুশী ছিল বলেই মুখের লাগামটা হয়ে গিয়েছিল আলগা, হেসে তামাকুতে কালো হয়ে যাওয়া দাঁত বার ক'রে রাবেয়া বলে উঠল, 'এই যে নতুন শাহ্‌জাদী,

এই মাত্তর তোমার কথা হচ্ছিল, বাঁচবে অনেকদিন।'

'আমার কথা? আমার কথা আবার কি হচ্ছিল, কার সঙ্গে হচ্ছিল? গাল দিচ্ছিল কেউ?'

'ওমা, সে কি কথা! গাল দেবে কেন? আমাকে জিজ্ঞেস করছিল তুমি কেমন দেখতে, কতটা সুন্দর দেখতে—সত্যিই খুব সুন্দর কি না—এই সব!'

'সে আবার কে? কার এত মাথা-ব্যথা পড়ে গেল আমার রূপের ব্যাখ্যানায়?'

'ঐ যে এক ছোকরা নতুন এসেছে এখানে চাকরি করতে—আগা নাম, জাতে বোধ হয় পাঠান বলছিল—সেই যে, যাকে নাকি তুমিই সুপারিশ ক'রে এখানে চাকরি দিইয়েছ, সেই আগাই বলছিল—'

নিমেষে যেন জ্বলে ওঠে মেহের, তার মুখ একেবারে অঙ্গারবর্ণ ধারণ করে। কঠিন কণ্ঠে বলে, 'আমি সুপারিশ ক'রে চাকরি দিইয়েছি? কে বলেছে এসব আজগুবী কথা? সে বলেছে?'

তার সে উগ্রমূর্তি দেখে ভয় পেয়ে যায় রাবেয়া, মনে মনে নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য একশবার নিজের কান মলে। তাড়াতাড়ি বলে, 'না না, সে বলবে কেন? এটা এখানকার একটা বাজে গুজব। তাকে বলতে তো সে বললে, তোমাকে কখনও দেখেও নি, নামও শোনে নি। নামটা আমার মুখে শুনেই তো জিজ্ঞেস করছিল—কেমন দেখতে, কী বিত্তান্ত!'

আরও আরক্ত হয়ে ওঠে মেহেরের মুখ, 'তা তুইই বা জেননামহলের বাইরে আমার কথা গল্প করতে গিয়েছিলি কেন—কে না কে এক নতুন নফরের সঙ্গে!'

'হেই শাহজাদী, দোহাই তোমার, আল্লার কিরে খেয়ে বলছি—আমি এমনি গিয়েছিলুম বাইরে, কাউকে দিয়ে তামাকুর পাতা আনাব বলে—কেউ ছিল না, কাউকে দেখতে না পেয়ে ফিরে আসছি, ঐ ছোকরাই সেধে এগিয়ে এসে কী চাই জিজ্ঞেস ক'রে ছুটে গিয়ে কিনে এনে দিলে। শুধু কি তাই—কিছুতে দাম নিলে না।...বড় ভাল ছেলে শাহজাদী, আর কী মিষ্টি কথা—আমার সঙ্গে ভাই-বোন সম্পর্ক পাতিয়ে যেন এক লহমায় আপন ক'রে নিল।...এই কথায় কথায় কথা উঠল কিনা, আমি আবাগীই বলে ফেলেছিলুম কথাটা, মিছে কেন বলব, তার জন্যে এই—এই তোমার সামনে নিজের কান নিজে মলছি—আমি বললুম, তোমাকে কি আমাদের নতুন শাহজাদী চাকরি করে দিয়েছিল? তা তাতেই বললে, কই কে নতন শাহজাদী জানি না তো—আমার সঙ্গে দেখাই হবে কি ক'রে, আর আমার কথা তিনি জানবেনই বা কী ক'রে যে চাকরি ক'রে দেবেন! আমি নতুন লোক, বাইরে থাকি সামান্য নোকর বই তো নই—'

তার সুদীর্ঘ বক্তৃতায় বাধা দিয়ে অসহিষ্ণু মেহের বলে ওঠে, 'খুব হয়েছে। তা আর কেউ ছিল না বাইরে, দারোয়ানগুলো কি করছিল? আর সে ছোকরাই বা কেমন লোক—জেনানামহলের সামনে ঘুরঘুর করছিল।'

'না না শাহজাদী, ঘুরঘুর করবে কেন! আমি কোন দরকারে লোক খুঁজছি দেখেই এগিয়ে এসেছিল! ঐখানেই তো ওর কুটুরি, কাছেই!'

'তাই নাকি? ওকে এইখানে ঘর দিয়েছে? এই জেনানামহলের পাশে?'

'হ্যাঁ গো। ঘর আর পাবে কোথায়? অর্ধেক ঘরই তো নোংরা আবর্জনায় ভরে আছে। আর কাছেও তো রাখা দরকার, তাই বোধ হয় বড় শাহজাদার হুকুম হয়েছে ঐ ঘরটা। ঐ যে গো বেরিয়েই যে সিঁড়িটা তারই নিচের কুটুরিতে থাকে।

ঐ যেটায় পুরনো পর্দা থাকত আমাদের এ মহলের।...এই দরজা থেকেই দেখা যায়। আমাদের বাঁদী মহলের ওপাশের দরজা দিয়ে বেরোলেও কাছে হয় খুব—'

'আচ্ছা আচ্ছা, যা, কোথা দিয়ে জেনানামহলের বাইরে যাওয়া যায় সে হিসেবে খুব ওস্তাদ তুমি। ফের যেদিন দেখব ফটফট ক'রে বাইরে গিয়ে মরদদের সঙ্গে খোশগল্প করছ—বড় বেগমসাহেবাকে বলে দেব।'

মেহের ওপরে উঠে চলে যায়। রাবেয়া দুই হাতের একটা ভঙ্গী ক'রে আপন মনেই বলে, 'তবেই তো আমার ঘাড়ের ওপর থেকে মুণ্ডুটা খসে পড়ল একেবারে! বড় বেগমসাহেবা ওঁকে কত পেয়ার করেন তা আমার জানা আছে!...অল্প বয়সের গরমে ধরাকে সরা দেখছেন একেবারে!'

গজগজ করতে থাকে সে বহুক্ষণ পর্যন্ত।

॥ নয় ॥

সেদিন দিনের বেলা হাজির থাকবার পালা ছিল আগার। সন্ধ্যাবেলা ছুটি হ'তে স্নান সেরে ও চলে গিয়েছিল ছাউনির দিকে। এমনি, সময় পেলেই বেশির ভাগ ঐদিকটায় যায়। দিনের বেলা ছুটি থাকলে তো কথাই নেই—কুচকাওয়াজের সময় সে যাবেই। আংরেজ 'অফসার'দের ড্রিল করানো দেখতে খুব ভাল লাগে ওর। এমন ওদের দেশে কখনও দেখে নি। এ ছাড়াও—বিকেলের দিকে সাহেবরা কত কি খেলাধুলো করে—সেও একটা প্রবল আকর্ষণ আগার। এক-একসময় ইচ্ছে করে সাহেবদের হাতে-পায়ে ধরে সেই খেলায় যোগ দেয়—নিতান্ত নতুন লোক বলেই সাহসে কুলোয় না শেষ পর্যন্ত। কী মনে করবেন সাহেবরা, হয়তো অপমান ক'রেই বসবেন। এদেশী লোকদের তো কাউকে কাউকে ওঁরা স্নেহ করেন, চাকরবাকরদের সঙ্গেও অনেকে বেশ সদয় ব্যবহার করেন—তবে তাদের কাউকেই মানুষ হিসেবে ওঁদের সমান ভাবেন না, এটা আগা দু-চার দিনেই ওঁদের আচার-ব্যবহার লক্ষ্য ক'রে বুঝতে পেরেছে।

কিন্তু সম্প্রতি এসব খেলাধুলো কুচকাওয়াজ দেখা ছাড়াও এদিকে আসার একটা বড় কারণ দেখা দিয়েছে। ছাউনীর এক মুসলমান হাবিলদারের সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়ে গেছে। সে মুলতানের লোক, অনেকটা ওর দেশী মানুষের মতো—তা ছাড়া প্রায় সমবয়সীও, সেই জন্যেই বন্ধুত্বটা দ্রুত জমে উঠেছে। এই হাবিলদার ছেলেটি কিছু কিছু লেখাপড়াও জানে। সেই জন্যেই এত অল্প বয়সে সিপাহী থেকে হাবিলদার হ'তে পেরেছে। আগা তাকে বলে কয়ে তার কাছ থেকে একটু একটু উর্দু আর ইংরেজী শিখছে। এদেশে উর্দুরই চল বেশী এখন, ফারসী শুধু ভদ্রলোকরা জানে, তাও তারা চিঠি-পত্রে বেশির ভাগই উর্দু ব্যবহার করে। উর্দু একটু জানা না থাকলে অসুবিধা। আর ইংরেজীও জেনে রাখা ভাল একটু, কারণ বাদশার বাদশাহী এই কিল্লাটুকুর মধ্যেই—সেটা বেশ বুঝে নিয়েছে আগা, এ মুল্লুক এখন আংরেজ কোম্পানীর। যারা রাজা, যারা মালিক—তাদের ভাষার অন্তত হরফগুলো জানা না থাকলে কাজকর্মে বড় অসুবিধা। উর্দুও—দীর্ঘদিন ধরে এই দেশের মধ্য দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে বুলিটা অনেকখানি রপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু লিখতে বা পড়তে পারে না। সেইটে শিখে নিচ্ছে এখন।

সেদিন অনেকক্ষণ অবধি পড়াশুনো ক'রে ওর খেয়াল হ'ল আর দেরি করলে লঙ্গরখানা বন্ধ হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে দেখল সত্যিই বন্ধ হবার তোড়-জোড় হচ্ছে। খানাও প্রায় খতম। দু-তিনখানা রুটি আর একটু ডাল পড়ে আছে। তাইতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি ক'রে ঘুমে প্রায় ঢুলতে ঢুলতে ঘরে ফিরল সে। রাত বিস্তর হয়ে গেছে। তার ওপর, বারো ঘণ্টা খাড়া দাঁড়িয়ে থাকার পর—মধ্যে একবার শুধু লঙ্গরখানায় গিয়ে বসতে পেরেছিল—এতক্ষণ বসে বসে উর্দুসবক্ মুখস্থ করা, ঘুমের বিশেষ অপরাধও নেই। ঘরে গিয়েই শুয়ে পড়বে, এই পোশাক-আশাক সুদ্ধ, এই কথাই ভাবতে ভাবতে আসছিল, জামা ছাড়বার যেটুকু দেরি সেটুকুও তর সইবে না তার—এমনই অবস্থা।...কিন্তু বিধাতা সেদিন ওর অদৃষ্টে ঘুম লেখেন নি অত সহজে—একটা বিরাট ষড়যন্ত্র ফেঁদে বসেছিলেন তার জন্যে।

আলো জ্বালবার সাজ-সরঞ্জাম সবই আছে, চেরাগ তেল চকমকি সোলা- সব, মায় হাবিলদার বন্ধুর দৌলতে সাহেবদের তৈরী গন্ধকের দেশলাইও দু-চার কাঠি আনা আছে। কিন্তু আলো প্রায়ই জ্বালে না আগা, অত হাঙ্গামা পোষায় না রাত্রে ফিরে। ঘরে তো শুধু শুতে আসা, এসেই শুয়ে পড়ে সে প্রায় প্রতি রাত্রেই, তার জন্য আবার এত মেহনৎ ক'রে আলো জেবলে লাভ কি, তখনই তো নিভিয়ে দিতে হবে। শুধু চারপাইটা দেখতে পাওয়া দরকার—তা সেটা দেখার অন্য একটা সুবিধা আছে। সিঁড়ির মুখে একটা দেওয়ালদানে সারারাত আলো জ্বলে, রেড়ির তেলের মিটমিটে আলো—তবু তারই সামান্য একটু আলোর আভাস ঘরের মধ্যেও এসে পড়ে। তাতে অন্তত চারপাইটা খুঁজে নেওয়া চলে।

সেদিন সেটুকুও দেখবার চেষ্টা করে নি, চোখ বুজেই এসেছিল প্রায়—এতদিন তার পা এই একফালি ঘরের সীমানায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে, চোখ না খুললেও চারপাই পর্যন্ত পৌঁছতে পারে সে—আর পৌঁছেও ছিল ঠিক ঠিক—কিন্তু শ্রান্তভাবে চার-পাইতে বসে দেহ এলিয়ে দিতে গিয়েই দারুণ ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল আবার, আর সঙ্গে সঙ্গে, এক নিমেষে, চোখ থেকে তন্দ্রার সব জড়তা ঘুচে গেল তার। নরম আর ঠাণ্ডা কী একটা তার গায়ে ঠেকেছে, সেই সঙ্গে মৃদু একটা কামড়ের মতোও অনুভব করেছে, হুলফোটানো বা দাঁত বসানোর মতো। কী এল তার বিছানায়—কোন সরীসৃপ জাতীয় কিছু নয় তো—বিছে বা সাপ? এত বছরের পুরনো ইমারৎ, সিঁড়ির নিচে দীর্ঘকালের অব্যবহৃত ঘর—সাপখোপ থাকা বিচিত্র নয় একটুও।

বাইরের সেই অতি ক্ষীণ আলোর আভাসে যতটা দেখা যায়—প্রাণপণে চেয়ে দেখল। হ্যাঁ—কালোমতোই তো কী একটা কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে। নড়ছে-চড়ছে না অবশ্য, তা না নড়ুক, কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে হয়তো। শীতের দিনে সাপরা ঘুমিয়েই থাকে বেশির ভাগ সময়—অনেকের মুখে শুনেছে সে, বিছানার গরমে আরামেই ঘুমোচ্ছে হয়তো। সাপই হোক আর বিছেই হোক—আলো জেবলে দেখা দরকার। কাছে যেতে সাহসে কুলোল না আর, কোনমতে দেওয়ালের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে কুলুঙ্গীর কাছে গিয়ে সেই আংরেজী ম্যাচিসের একটা কাঠি দেওয়ালে ঘষে জেবলে চেরাগটা জ্বালিয়ে ফেলল।

এবার আর একবার চমকের পালা। আলো নিয়ে কাছে এসে দেখল—সাপও নয় বিছেও নয়—ফুটন্ত এক থোকা গাঢ় লাল গোলাপ একটি রেশমের সুতো দিয়ে বাঁধা। অত গাঢ় লাল বলেই অন্ধকারে কালো দেখিয়েছিল।

এতক্ষণে তার মনে পড়ল, ঘরে ঢোকবার সময় একটা মিষ্টি গন্ধও পেয়েছিল—

ঘুমের ঘোরে অত মাথা ঘামায় নি। কেউ হয়তো দামী আতর মেখে এদিক দিয়ে গেছে একটু আগেই—তারই গন্ধ মনে করেছিল।

প্রথম বিস্ময়ের চমকটা কাটতে মাথায় হাত দিয়ে বসল সে।

এ কী ব্যাপার? এ কে করল?

প্রথমে মনে হল, রহমৎ—?

কিন্তু রহমতের এখন তো নড়বার উপায় নেই। তাছাড়া তার অতশত শখও নেই। শখ থাকলেই বা—এমন ফুল পাবে কোথায়?

তবে কি রাবেয়া? কিন্তু রাবেয়াই বা তাকে এত দামী ফুল দিতে যাবে কেন? না না, সে অসম্ভব।

তবে কি ভুল ক'রে কেউ রেখে গেছে? অন্য কারও ঘর মনে ক'রে? কোন মেয়ে তার কোন রক্ষী কি সিপাহী প্রণয়ীকে—সাধারণত এই শ্রেণীর মরদই থাকে এ লাইনটাতে—এ ফুল দিতে চেয়েছিল, তাড়াতাড়িতে ঘর বুঝতে পারে নি? কিন্তু এত ভুল কি ক'রে হবে, সিঁড়ির নিচের ঘর তো এই একটাই—!

তবে কি—

ক্রমশ কেমন একটা ভয় দেখা দিল তার মনে।

একটা অজ্ঞাত আকারহীন ভয়। কেউ তাকে কোনরকম ফাঁসাবার চেষ্টা করছে না তো? কোন একটা দুর্নাম তুলে দেবে—তারই কি ভূমিকা এটা? নিশ্চয়ই তাই। একটা কিছু সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র চলেছে নিশ্চয় তাকে নিয়ে। হয়তো জেনানা-মহলের কোন মেয়ের সঙ্গে বদনাম তুলে বাদশাকে শোনাবে, বাদশা চটে গিয়ে তাকে দূর ক'রে দেবেন—কিংবা অপর কোন শাস্তিও।

আবার ভাবে, তার মতো সামান্য প্রাণীকে তাড়াবার জন্য এত মাথাব্যথা কার? তার ওপর এত রাগ কার হ'তে পারে?

আছে অবশ্য একজন। হেকিম সাহেব তার ওপর খুব প্রসন্ন নন তা সে বুঝতে পেরেছে এই ক'দিনেই। যদিও কারণটা কি খুঁজে পায় নি। বাদশা তাকে একটু স্নেহ করেন বলেই কি? কিন্তু কতটুকুই বা স্নেহ করেছেন তাকে বাদশা। সেই প্রথম দিনটির পর তার অস্তিত্বের কথাই তাঁর মনে আছে ব'লে মনে হয় নি কখনও। বিশেষ স্নেহ বা অনুগ্রহের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি কোন দিন। তবে ওঁর মতো প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোক, বাদশার বন্ধু মন্ত্রী পরামর্শদাতা আহ্‌সানউল্লার বিদ্বেষের কি কারণ থাকতে পারে?—কে জানে, বুঝতে পারে না অত! তবে তাঁর যে একটা বিষদৃষ্টি আছে তার প্রতি—এটা টের পায় সে।

তা হ'লে তিনিই কি?

তিনি ছাড়া আর কারোও কথাও তো মনে পড়ে না—যে তার সঙ্গে এমন শত্রুতা করতে পারে। এতকাল এত কষ্টের পর এই সামান্য আশ্রয়টুকু পেয়েছে—তাও সহ্য হচ্ছে না এদের? আসলে খোদাই নারাজ, তারই প্রমাণ এসব।...

একবার মনে হ'ল গোলাপের তোড়াটা আস্তে আস্তে তুলে ফেলে দিয়ে আসে কোথাও—চুপি চুপি। ওদিকে দারোয়ানদের ঘর আছে, তারই একটাতে রেখে আসবে? সেই ভাল।

কিন্তু ফুলগুলো হাতে নিয়ে আর ইচ্ছা হ'ল না যে ফেলে দেয়। বড় সুন্দর গোলাপ—বাছাই করা। অনেক দিন এমন সুন্দর ফুল দেখে নি সে।...সে সযত্নে এবং সস্নেহে ফুলগুলো আবার বিছানাতেই নামিয়ে রাখল। যদি কারও দুশমনী করবার

মতলব থাকে—ফুলটা সরিয়ে দিলেই কি নিস্তার পাবে ?

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও মনে হ'ল এতক্ষণে—আচ্ছা, দুশমনী করার এত জিনিস থাকতে ফুলই বা রেখে যাবে কেন ? তাকে ফাঁসাবার তো আরও কত উপায় আছে। এ ঘরের দরজা সে দিনে-রাতে কখনই বন্ধ করে না—যে-কেউ যে-কোন সময়ে এসে যা-খুশি লুকিয়ে রেখে যেতে পারে। কোন দামী জিনিস—টাকা-কড়ি জেবর বা ঐ শ্রেণীর কোন কিছু এনে লুকিয়ে রেখে পরে চোর বলেই তো ধরিয়ে দিতে পারত—বিছানার ওপর না রেখে কোণে খাঁজে কোথাও রেখে গেলে তো টেরও পেত না আগা। ফুল রেখে যাবার দরকারটা কি ?

কিন্তু তা হলে ? সেই মৌলিক প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে যে। এ ফুল কে রেখে গেল এবং কেন ?...

মন যার নামটা করতে চাইছে বার বার, যার কাজ এটা ভাবতে পারলে সবচেয়ে সুখী হয় সে—নিজেকে দুনিয়ার বাদশার মতো ভাগ্যবান মনে করে—তার নামটা বার বার, আভাসে মনে আসামাত্র, প্রাণপণে সরিয়ে দিচ্ছে মন থেকে ! পাগল ! তা কখনও সম্ভব ! অত আশা রাখতে নেই মনে, অত বড় খোয়াব দেখতে নেই। উচ্চাভিলাষের একটা সীমা থাকা দরকার। চাঁদ তার অমৃত পাঠিয়েছে বেছে বেছে পৃথিবীর একটা ক্ষুদ্রতম পতঙ্গের জন্য—সেও যেমন অবাস্তব, এও তেমনি। না, এত পাগল সে হয় নি এখনও যে অমন অসম্ভব উদ্ভট কিছু কল্পনা করবে। তার কাছে সে মেয়ে আশমানের চাঁদের চেয়েও বেশী, আয়ত্তের বাইরে। এ দুখানা হাতে সে চাঁদ কোন দিনও ধরা যাবে না।

তবু, রাত যত গভীর হয়, লালকিল্লার পেটা ঘড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেজে যায়—অতন্দ্র আগা কখন ধীরে ধীরে সেই অসম্ভব অবিশ্বাস্য কল্পনার কাছেই আত্মসমর্পণ করে। আস্তে আস্তে ফুলের গুচ্ছটা টেনে নিয়ে বুকে রাখে, গালে চেপে ধরে—এক সময় তাকে চুমো খেতে শুরু করে। ভাবতে ভাল লাগে সেই পদ্মের কলির মতো সুন্দর দুটি হাত এই ফুল স্পর্শ করেছে, সে ফুল পাঠাবার আগে নিজেই রেশমী সুতো দিয়ে গুচ্ছটা বেঁধেছে—কোন বাঁদী কি মালীকে বাঁধতে দেয় নি।

একেবারে শেষ রাত্রে, যখন নিছক শারীরিক ক্লান্তিতেই তার চোখের পাতায় তন্দ্রা নেমে আসে শেষ পর্যন্ত—তখন সেই আধো-ঘুম আধো-জাগরণের মধ্যে কখন যে সে গোলাপফুল গোলাপের চেয়েও সুন্দর, গোলাপের চেয়েও উজ্জ্বল অপার্থিব একটা মুখে রূপান্তরিত হয়ে যায় তা বুঝতেও পারে না।...

সকালে উঠে সমস্তটাই স্বপ্ন বলে মনে হয়েছিল—কিন্তু বুকের মধ্যে চেপে ধরা ফুলগুলোকে ঠিক স্বপ্নে দেখা মায়া বলে মনে হ'ল না। বিশেষত সজোরে চেপে ধরার ফলে কয়েকটি কাঁটা বুকে বিঁধে যে কয়েকবিন্দু রক্তপাত হয়েছিল—সেটা ঘোরতর বাস্তব। তবে সেটা দেখেও আগা কিছুমাত্র দুঃখিত হ'ল না, প্রিয়ার দেওয়া প্রথম উপহার তার বুকের রক্তে মিশল—নিজের রক্ত দিয়ে রক্তগোলাপের দান গ্রহণ করল—ভাবতে ভালই লাগল তার।

কিন্তু সত্যি সত্যিই প্রিয়ার উপহার কি ?

সত্যিই কি সেই দেবদুহিতার মতো রূপসী—হয়তো বিদুষীও—বাদশাজাদীর পক্ষে তার মতো একজন সামান্য সেবকের কাছে কুসুমোপহার পাঠানো সম্ভব ?

আশা-নিরাশায় বিশ্বাসে-অবিশ্বাসে অন্তরে অন্তরে ক্ষতবিক্ষত হ'তে হ'তে তাড়াহুড়ো ক'রে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়ে সে। উঠতে আজ অনেক বেলা হয়ে গেছে —রহমৎ নিশ্চয় রাগ করছে! সে না গেলে রহমৎ ছুটি পাবে না।......

রহমৎ মনে মনে রাগ করলেও সেটা প্রকাশ করল না, বরং একটু অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'ব্যাপারটা কি বল তো দোস্ত—উঠতে আজ এত দেরি, তার ওপর এমন খুশি-খুশি ভাব—কাউকে ঘরে পেয়েছিলে নাকি রাত্রে?'

'ঠিক ধরেছ দোস্ত।' অকারণেই রহমতের একটা হাত ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে বলে, 'সত্যিই পেয়েছিলুম!'

'তা হলে তো জোর খবর দেখছি। তা এ হতভাগাদের কিছু বকশিশ মিলবে না?—এত যখন খুশির কারণ ঘটল?'

'ভাই, দিল আর টাকা এ দুটো জিনিস ছাড়া যা চাইবে আজ সব দিয়ে দেব। ও-দুটো দিতে পারব না, কারণ টাকাটা নেই, আর দিল দিয়ে বসে আছি অপরকে।'

'দিল আবার এর মধ্যে কাকে দিয়ে বসে রইলে বন্ধু—কাল রাত্রে যে ঘরে এসেছিল তাকে?'

'ঠিক। বিলকুল ঠিক। আবারও ঠিক। আজ তোমার হ'ল কি বন্ধু—যা বলছ সব ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে!'

'তা সে গোপনচারিণী মনোহারিণীটি কে—জানতে পারি কি?' রহমতের কণ্ঠে ঈষৎ ইচ্ছাতুর ঈর্ষার সুর।

'আলবৎ! তোমাকে না জানানোর কি আছে! তিনি হলেন শ্রীমতী চাঁদ!'

'চাঁদ? কৈ চাঁদ বলে তো কাউকে—মানে নাচওয়ালী-টোয়ালী কেউ? নাকি বেগম-মহলের কোন বাঁদী!'

'ছোঃ! তোমার দোস্তর কি এত ছোট নজর! এইটে বন্ধু তোমার যোগ্য কথা হ'ল না। এটা তোমার কাছ থেকে আশা করি নি। আমি একটা সামান্য বাঁদী কি নাচওয়ালীকে দিল দেব?'

'তার মানে আরও বড় দরের কেউ এসেছিল তোমার ঘরে! বল কি হে, তা সে মানুষটি কে তবে?'

'চাঁদ জানো না? আশমানের চাঁদ—রাতে যিনি আশমানে উঠে তোমাদের দিল বিগড়ে দেন?'

'ও তাই বল—খোয়াব দেখেছ!'

'খোয়াব নয় বন্ধু। আশমানের চাঁদ তাঁর বেহেস্তী বাগিচা থেকে ফুল পেড়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন চন্দ্রলোকের দূতীকে দিয়ে!'

'এই সেরেছে! গরীবের ছেলে নোকরি ক'রে খেতে এসেছ—তার মধ্যে আবার এসব কাব্যি কেন বাবা! জানো হিন্দু জ্যোতিষীরা কি বলে? তারা বলে যাদের চাঁদে ভর করে তাদের মাথার গোলমাল হয়। উনি নাকি আগেই মাথাটি খেয়ে বসে থাকেন মানুষের!'

'রহমৎ ভাই, অনেক সময় জেনেশুনেই মাথা খারাপ করতে ইচ্ছে করে। আর আশমানের চাঁদ যদি মাটিতে নেমে আসে তার জন্যে মাথাটা দিয়ে দেওয়াও কি সুখের নয়?'

'বুঝেছি। মাথাটা বিগড়েই গেছে তোমার। একটু হেকিমী ঠান্ডা তেলের ব্যবস্থা করতে হবে।'

রহমৎ চিন্তিত ভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে চলে যায়। তার ভাবগতিক দেখে অনেকদিন পরে আগা হেসে ওঠে হ-হা ক'রে।

আশমানের চাঁদ সেদিনই আবার এক কলসী অমৃত কি বেহেস্তী ফুল পাঠাবেন —তা অবশ্য ঠিক আশা করে নি আগা। তবে সেদিন তার একটুও পড়াতে মন বসল না, বার বার অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে লাগল। বারকতক সেজন্যে বন্ধু হাবিলদারের কাছে বকুনি খেয়ে শেষে একটু সকাল ক'রেই উঠে পড়ল। ঘরে এসে চিরাগ জেবুলে ভাল ক'রে দেখল—চারপাইয়ের নিচে ওপরে, ঘরের চারকোণ, কুলুঙ্গী সব। না, কোথাও কিছু নেই। থাকবে না—তা তো জানা কথাই! মনে মনে নিজেকে বিদ্রূপ করল, তিরস্কার করল, 'লোভ বড্ড বেড়ে গেছে, না? দুরাশার আর শেষ নেই! ঐ জন্যেই কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখানো নিষেধ!'...

রাত্রে ঘুম হয় নি ভাল ক'রে, দিনমানেও একটু বিশ্রামের অবসর মেলে নি। সেদিন তাই শুতে না শুতে চোখের পাতা বুজে এল আগার।

পরের দিন ভোরেই ঘুম ভেঙেছিল তার, যেমন সময়ে ওঠে অন্যদিন তেমনি সময়েই। সুতরাং খুব একটা তাড়া ছিল না। অভ্যাসমতো স্নান ইত্যাদি সেরে ধীরে-সুস্থেই পোশাক আঁটছিল—হঠাৎ কুর্তাটা পরতে গিয়ে একদিকের জেবটা সামান্য একটু ভারী ঠেকল। কী আবার ঢুকল জেব্‌এ, এই ভেবে দেখতে গিয়েই আর এক প্রবল ধাক্কা খেল। একটা ফুকো কাচের শিশি—শিশিভর্তি আতর। বেশ ভাল আতর, দামী জিনিস—মালেও অনেকখানি। উৎকৃষ্ট মৃগনাভির আতর-- এখানে এসে আতরের দাম সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে গেছে, আতর-ওয়ালীরা বেচতে আসে, কিল্লার মধ্যেও তিন চারটে দোকান আছে, আতর আর সুগন্ধি তেলের—আতরটা যে ভাল জাতের তাতে কোন সন্দেহ নেই। কম-সে-কম পাঁচ টাকা দাম হবে এই আতরটুকুর! প্রায় তার কুড়ি দিনের মাইনে। এত দামী আতর সে কখনও ভরসা ক'রে মাখতে পারবে না। মাখলে লোকে নানারকম সন্দেহ করবে।

কুর্তা আর পরা হ'ল না। দেরি হয়ে যাচ্ছে এদিকে তাও খেয়াল রইল না। আবারও মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল আগা।

অয় খোদা মেহেরবান! এ কী শুরু করলে তার জীবন নিয়ে! তাকে কি কোথাও একটু স্বস্তিতে থাকতে দেবে না, এই সামান্য আশ্রয়টুকুও কেড়ে নিতে চাও! এমন করলে এখানে তার নোক্‌রি আর কদিন থাকবে? নোক্‌রি কি করতেই পারবে সে ঠিক-মতো? মাথা যে তার সত্যিই বিগড়ে যাবে। এত চিন্তা, এত মানসিক দ্বন্দ্ব সে সইবে কেমন করে? একে তো নিজের যা দুশ্চিন্তা তা আছেই—মা-বোনের চিন্তা, নিজের এই বন্দীদশা থেকে মুক্তির চিন্তা—অহরহ তাকে পীড়িত করছে তার ওপর আবার এ কী বাজে একটা চিন্তা বাড়িয়ে দিলে তার!

আজও একবার মনে হ'ল—কোন দুশমনের খেল্‌ নয় তো? এমনি ক'রে সইয়ে সইয়ে একদিন কোন দামী জিনিস তার ঘরে রেখে যাবে—তার পর লোকজন এনে বমাল ধরিয়ে দেবে!...আবার, যেটা ভাবতে ইচ্ছে করে, যে ভাবনাটা নেশার মতোই পেয়ে বসেছে কাল থেকে, সেই দিকেই যুক্তি দিতে থাকে মনে মনে। নিজেই নিজের সঙ্গে তর্ক করে। এত সইয়ে নেবারই বা আছে কী, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন! একশিশি আতর না রেখে একছড়া সোনার হার রেখে এখনই তো কেউ ধরিয়ে দিতে

পারত। আর আশনাইয়ের দুর্নাম! সেটা তো একতরফা হয় না—সে যতক্ষণ জবাব না দিচ্ছে ততক্ষণ সে দোষ ধরা যাবে না।

আচ্ছা, যে-ই দিয়ে যাক—কখন দিল সে? কাল সন্ধ্যায় নিশ্চয় নয়—কারণ রাত্রে ফিরে তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেছে সে। আর কুর্তাটা তো তার গায়েই ছিল, কী আশ্চর্য! তা হ'লে কি কাল রাত্রে যখন সে ঘুমোচ্ছিল তখন কেউ ঘ'র এসে রেখে গেছে? দরজা অবশ্য বন্ধ থাকে না, তবে জাড়ার দিন বলে সে ভেজিয়ে রাখে খানিক—কপাট খুলে ভেতরে ঢুকল তবু তার ঘুম ভাঙ্গল না? তাকে মরণঘুমে পেয়েছিল নাকি? একটু টের পেলেই তো রহস্যটা পরিষ্কার হ'য়ে যেতে পারত। নাকি, এইমাত্র যখন সে বাইরে গিয়েছিল স্নান ইত্যাদি সারতে তখনই এসে রেখে গেছে? কিন্তু তখন তো বেশ ফরসা হয়ে গেছে। তখন কি কেউ সাহস করবে এভাবে চুপি চুপি ঘরে ঢুকতে? বহু লোকই তো যাতায়াত করে এ সময়টায়!...

বেলা হয়ে যাচ্ছে আরও। রহমৎ কি ভাবছে কে জানে! ওপরওলার কাছে ন্যালিশ না ক'রে দেয়!

অনিচ্ছাতেও দেহটা টেনে ওঠাতে হয়। একবার এমনও মনে হয়—টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় আতরের শিশিটা। চায় না এমন দান নিতে—সাহস থাকে সামনা-সামনি এসে দিক, না হয় তাকে জানিয়ে দিক। সে চোর নয় তো যে এমন ভাবে নেবে।...কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনের জোরে কুলোয় না। যদি তারই উপহার হয় এটা—কী ক'রে প্রকাশ্যে দেবে তাকে বেচারী! সে তো আরও বন্দী। এইটেই হয়তো কোন বাঁদীর বিস্তর তোষামোদ ক'রে পাঠাতে হয়েছে। ভাবতে সাহস হয় না, নিজের কাছেই চরম ধৃষ্টতা বলে মনে হয়—তবু চিন্তাটাকে একেবারে তাড়াতে পারে কৈ?

শেষ অবধি সযত্নে একটা কুলুঙ্গীতেই তুলে রেখে যায় শিশিটা। একটা কোণে—লোকচক্ষুর অন্তরালে।

সেদিন আর আগের মতো খুশী-খুশী ভাব নেই, বরং চিন্তাক্লিষ্ট, গম্ভীর মুখ দেখে রহমৎ ঠাট্টা ক'রে বলল, 'কী বন্ধু, আজই যেন মনে হচ্ছে আশমানের চাঁদ একটু ভার-ভার ঠেকছে? মাথাটা বিকিয়ে দেওয়া ঠিক অতখানি সুখের বলে বোধ হচ্ছে না যেন?'

আগা জোর ক'রে সহজ হবার চেষ্টা করল, হেসে উঠে বলল, 'তা নয় দোস্ত্‌, মাথা-মন বিকিয়ে দিয়ে এত ভাল লেগেছে যে সব কিছুকেই তার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছি আশমানে—এখানে দুনিয়ার ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে কিছু পড়ে নেই। এখানে শুধু দেখছ আমার দেহটাকে, বাকী সব সেখানে।'

কিন্তু ভাল লাগে না সত্যিই। সারাদিনই কেমন উন্মনা হয়ে থাকে সে। এ রহস্য ভেদ করতেই হবে, নইলে পাগল হয়ে যেতে বেশী দেরি লাগবে না। মনে মনে এতখানি আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব সইতে পারবে না সে। আশাটাই তো সহ্যাতীত। সে আশা যদি আবার ভাঙ্গে—বুক যে ভেঙ্গে যাবে তার। অথচ এটা যে অন্য কিছু, অন্য কারও দেওয়া—সেটা নিশ্চিত না জানা পর্যন্ত এই দুরাশাটাকে একেবারে দূরও যে করতে পরছে না।

আশা করতেও সাহস হচ্ছে না, অথচ না ক'রে থাকতে পারছে না—এ কী জ্বালা হ'ল!...

সেদিন সন্ধ্যায় আর ছাউনীর দিকে গেল না। লঙ্গরখানা খোলামাত্র কোনমতে

খাওয়াটা সেরে এসে সটান নিজের ঘরে ঢুকল সে। কিন্তু তাই বলে শুয়ে পড়ল না। এমন কি বিছানাতেও বসল না, ঘরের এক কোণে তখনও কয়েকখানা পর্দা জড়ো করা ছিল, তার ওপরই চুপ ক'রে ঘাপ্‌টি মেরে বসে রইল।

কিন্তু কেউই এল না। আকাঙ্ক্ষিত কোন পদধ্বনিই জাগল না তার দেহলি প্রান্তে। ক্রমে রাত গভীর হয়ে এল। দশটা, এগারটা—বারোটা বেজে গেল কিল্লার পেটা ঘড়িতে। আরও পরে—চারিদিক নির্জন নিস্তব্ধ হয়ে এলে বহুদূর থেকে কার একটা অস্ফুট নামাজের শব্দও পেল। বোধহয় কে চুপি চুপি তাহাজ্জতের নামাজ পড়ছে—চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ বলেই সেই সামান্য শব্দ এখান পর্যন্ত পেঁছিচ্ছে। তার মানে রাত এখন একটা দেড়টা হবে।

তবু তখনও নড়ল না সে, পিঠটা টনটন করছিল একভাবে বসে বসে, উঠে একবার পিঠটা ছাড়িয়ে নিল। আবার তিনটে বাজার শব্দ পেল, তখন আর থাকতে পারল না। আস্তে আস্তে এসে শুয়ে পড়ল বিছানায়। কিন্তু ঘুম এল না তখনও, একটা সুদুর্লভ অসম্ভব আশা অবলম্বন ক'রে প্রাণপণে জেগে রইল সে। শেষে এক সময় চারটেও বেজে গেল, তার পর কিল্লার মসজিদ থেকে 'ফজরে'র আজান শোনা গেল। তার এই অন্ধকার ঝুপ্‌সি ঘরে না নেমে এল আশমানের চাঁদ, না এল তার কোন বেহেস্তী দূত। একটা রাত একেবারে অকারণ বিনিদ্র কেটে গেল।

কিন্তু মানুষের মন। একটা ক্ষীণ—বরং ক্ষীণতম বলাই উচিত—আশা তবুও কোথায় যেন একটু থেকেই যায়। স্নান করার জন্য প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে এসে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে ঘেরা চলনটা যেখানে বেঁকে গেছে বাইরের গোসলখানার দিকে —সেইখানে লুকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ। সেখান থেকে ঘরের দরজাটা দেখা যায় তার —অথচ তাকে দেখার সম্ভাবনা কম। যদি সে স্নান করতে গেছে মনে ক'রে সেই সময় কেউ আসে। খুব সম্ভব কাল তা-ই এসেছিল। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা সত্ত্বেও কাউকে দেখা গেল না। মিছিমিছি সেদিনও দেরি হয়ে গেল খামকা। রহমৎ অত্যন্ত ভালমানুষ, একটা দোস্তির মতোও হয়ে গেছে, তাই কিছু বলে না। কিন্তু বিরাট শিলাখণ্ডও নিত্য আঘাতে শিখরচ্যুত হয়, রহমৎ তো মানুষ, তার ধৈর্যচ্যুতি হ'তে কতক্ষণ ?...

সেদিনও সন্ধ্যায় ফিরে পড়তে গেল না আগা। তবে ঘরেও রইল না। একটা সুবিধামতো জায়গা খুঁজে নিয়ে ওৎ পেতে বসে রইল। কিন্তু সেদিনও তার সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা বৃথা হ'ল, মাঝখান থেকে পর পর রাত্রিজাগরণে শরীরের অবস্থা হয়ে পড়ল শোচনীয়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঢুলতে লাগল সে।

পরের দিনও পড়তে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না আগার, ভেবেছিল সেদিন ঘরে ফিরে সন্ধ্যা থেকেই ঘুমোবে। কিন্তু পর পর দুদিন না যাওয়াতে উদ্বিগ্ন হয়ে সেদিন তার হাবিলদার বন্ধু নিজেই এসেছিল খবর নিতে, কতকটা জোর ক'রেই টেনে নিয়ে গেল। তবে বেশীক্ষণ সেদিন তাদের লেখাপড়া এগোল না, সারা শরীর ক্লান্তিতে ঘুমেতে অবশ হয়ে আসছে, আর সঙ্গে কোথায় একটা সূক্ষ্ম আশাভঙ্গের অবসাদও ছিল—তার পক্ষে মাথা তুলে চোখ চেয়ে কিতাবের দিকে দেখাই মুশকিল। সে শরীর খারাপের অজুহাত দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। তার শুষ্ক মুখ, আরক্ত চোখ এবং চোখের কোলে সুগভীর কালি দেখে তার হাবিলদার বন্ধু অন্যরকম সন্দেহ ক'রে মৃদু ভর্ৎসনাই করল একটু। কাঁচা বয়সে প্রায় সকলেরই মনে হয় স্বাস্থ্য আর যৌবন

অফুরন্ত। কিন্তু বেহিসেবী খরচ করলে বাদশার তোষাখানাও খালি হয়ে যায়—স্বাস্থ্য তো কোন ছার। প্রথম বয়সে একটু-আধটু আমোদ ফুর্তি করতে দোষ নেই—উচ্ছৃঙ্খলতা ক'রে এখন থেকেই শরীরটা মাটি করা ভাল নয়। ইত্যাদি...

এর প্রতিবাদ ক'রে উত্তর দিয়ে লাভ নেই। আদ্যোপান্ত সমস্ত ইতিহাস খুলে না বললে বিশ্বাসও করবে না কেউ যে, এ রাত্রি জাগরণ তার উচ্ছৃঙ্খলতার কারণে নয়, সম্পূর্ণ অন্য কারণে। রহমৎও বিশ্বাস করে নি, সেদিন সকালে তার ঘরে রোজ রোজ কে আসে নামটা জানবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছে—মজাটা একাই লুটছে আগা, বন্ধুবান্ধবরা একটু ভাগ পায় না? আগা সুবিধামতো জবাব না দিতে পারায় বেশ একটু রাগই করেছে। না—আসল ইতিহাস যখন শোনানো যাবেই না তখন মিছিমিছি জবাব দিতে গিয়ে সময় নষ্ট করবে কেন? কথা কইতেই ইচ্ছা করছে না তখন, সারা শরীর এলিয়ে আসছে।

সে তাড়াতাড়ি খাওয়ার পাট সেরে এসে কোনমতে কুর্তাটা ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। চিরাগ জেবলে ঘরটা দেখবারও চেষ্টা করল না। মিছিমিছি আর একটা আশাভঙ্গ—নিজের কাছে নিজেই চড় খাওয়া। দরকার নেই।...

দুদিনের অনিদ্রা, শোওয়ামাত্র গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। কতটা ঘুমিয়েছে কখন থেকে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে তা সে জানে না। তবে শেষের দিকে স্বপ্নই দেখেছিল—এটা মনে আছে। স্বপ্ন দেখছিল নিজের গাঁয়ের, নিজের মুলুকের। প্রায়ই এ স্বপ্নটা দেখে সে। যেন সে সর্বস্বান্ত হয় নি, যেন এই গত একটা বছর তার জীবনে আসে নি এখনও। সেই আগের সুখী পরিপূর্ণ জীবন। সেই বাড়ি তাদের—মাটির দেওয়াল মাটিরই ছাদ—তবু এখানকার এঁদোপড়া ঠাণ্ডা এই পুরনো পাকা ঘরের চেয়ে ঢের ভাল, ঢের বেশী আরামের। তাদের সেই অল্প একটু চাষের জমি, আঙুরের ক্ষেত। 'লুকাট' ফল আর আখরোটের গাছ। পনেরো-কুড়িটা ভেড়া, দুটো খচ্চর আর একপাল ছাগল। মা-ই দেখত সে সব। বোন পাহাড়ে ভেড়া ছাগল চরিয়ে আনত। সে দেখত ক্ষেত-খামার—সিন্ধী মেওয়াওলারা গেলে ফল ফসল বেচত দর-দস্তুর করে। তাদের বাগানও ছিল একটু—ভাইবোন যত্ন ক'রে জল দিয়ে বাঁচিয়েছিল কয়েকটা ফুলগাছ। নানারকম ঐদেশী ফুল। এখানে দেখা যায় না বড় একটা। সবচেয়ে প্রিয় ছিল তার নার্গিস ফুলটা। আঃ—কী মিষ্টি গন্ধ, স্বপ্নেও যেন গন্ধটা টের পায় সে।

সত্যিই কি স্বপ্নে গন্ধ পাওয়া যায়?

স্বপ্নের মধ্যেই যেন অবাক লাগে তার। এমন টাটকা উগ্র গন্ধ স্বপ্নে এত পরিষ্কার পাওয়া সম্ভব? যেন কোমল সে ফুলের স্পর্শটা পর্যন্ত অনুভব করছে সে।

অবশেষে ঘুমটাই পাতলা হয়ে আসে—স্বপ্নটা যেন আর সবটা স্বপ্ন থাকে না। সেই আধেক ঘুমের অবস্থায় মনে হয় গন্ধটা বড় বেশী স্পষ্ট, বড় বেশী বাস্তব। সেই সঙ্গে যেন স্পর্শটাও অনুভব করে। আরও হাল্কা হয়ে আসে ঘুমটা ক্রমশ; মনে হয় সত্যিই একটা নরম নরম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা জিনিস তার গালে ঠেকে রয়েছে—

সঙ্গে সঙ্গে চমকে পুরোপুরি সচেতন হয়ে ওঠে সে।

সত্যিই রয়েছে। ঘরে আলো নেই অবশ্য, তবে এ ফুল চেনবার পক্ষে এই আলোর আভাসটুকুই যথেষ্ট।

এক গুচ্ছ নার্গিস ফুল!

লাফিয়ে উঠে পড়ে সে বিছানা ছেড়ে। কত রাত তা বোঝা যাচ্ছে না, কতক্ষণ ঘুমিয়েছে সে—তাও না। এ ফুল কখন এসেছে কে রেখে গেছে কে জানি! স্বপ্ন কি মানুষের জীবনে এমন ভাবে সত্য হয়? না এখনও স্বপ্নই দেখছে সে, এখনও এটা বাস্তব নয়?

জেগে আছে কিনা দেখবার জন্যেই যেন ত্বরিত লঘুপদে বাইরে বেরিয়ে এল। যতদূর দেখা যায় কোন দিকে কেউ নেই। জেনানা-মহলে দেউড়ীতে পাহারা দিচ্ছে দুজন সান্ত্রী শুধু।

আর রাত খুব বেশীও হয় নি। ওধারে ছাউনীর দিক থেকে নাচগানের আওয়াজ ভেসে আসছে এখনও। সুরাজড়িত পুরুষকণ্ঠের গান—বোঝা যাচ্ছে স্পষ্ট। আজ বোধহয় সাহেবদের কি পরব আছে। তবু বারোটার বেশী হবে না নিশ্চয়। বেশী হ'লে নিস্তব্ধ হ'য়ে যেত ওদের হল্লাও।

সে আবার ফিরে বিছানায় এসে বসল। ফুলের গুচ্ছটা তুলে নিয়ে গালে গলায় ঠেকিয়ে অনুভব করল বারকতক। দীর্ঘ আঘ্রাণ নিল একটা। বড় প্রিয় এ ফুল তার। যেন তার মনের কথা টের পেয়েই কোন স্বপ্নসঞ্চারিণী এসে উপহার দিয়ে গেছে। কিন্তু এখনও একটা কথা তার মাথাতে যাচ্ছে না কিছুতেই। স্বপ্নের সঙ্গে এমন মিলে গেল কি ক'রে, স্বপ্নে দেখা আর বাস্তবের গন্ধ! তবে কি এই বাস্তব ফুলের গন্ধটা সুপ্ত স্মৃতিকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছে বলেই ফুলের স্বপ্ন দেখেছে সে? কে জানে!

আবার কেমন একটা ভয়ও হল। এমন নিঃশব্দে কে আসে, কখন আসে? সত্যিই জীন বা পরী-টরী কিছু নয় তো? কিংবা মামদো?...মনে মনে আল্লাকে স্মরণ করে সে। স্মরণ করে তাদের দেশের বড় পীরসাহেব মুবারিক শাকে।

কিন্তু জীনই হোক আর হুরীই হোক—বড় সুন্দর ফুলটা কিন্তু, বড় মিষ্টি গন্ধ।

আজ আর আসবে না কেউ, সে বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত। অথচ এখনও রাত ঢের বাকী। এই তো একটু আগে পেটা ঘড়িতে বারোটা বাজল। সান্ত্রী বদল হচ্ছে ফটকে ফটকে। কিল্লার বড় ফটকগুলোতে কোম্পানীর সান্ত্রী যাচ্ছে—চার-চারজন করে কদম ফেলে ফেলে। নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়ল আগা। বুকের জামাটা খুলে ফুলগুলো বুকের মধ্যে রেখে দিল। যদি 'সে' হাতে ক'রে ছুঁয়েও থাকে ফুলটা পাঠাবার আগে—তার হাতের স্পর্শটা লাগুক বুকে।...আর যদি অশুভ কিছু হয়—কোন অশরীরীর দান? ভয় কি—খোদার নাম নিয়েছে তো সে!

দেখতে দেখতে আবার চোখের পাতা বুজে এল তার। আবারও স্বপ্ন। নার্গিসের স্বপ্ন দেখল সে। দেখল তার বাড়ির বাগানে প্রতিটি ফুলের গুচ্ছে ফুল নয়—একটি ক'রে সুন্দর মুখ ফুটে রয়েছে যেন। কেমন মুখ তা যেন ভাল ক'রে দেখতে পেল না, শুধু খুব সুন্দর, ভারী খুবসুরৎ—এইটেই মনে হ'তে লাগল বার বার।

এর একটা হেস্তনেস্ত কিছু করা দরকার। নিশ্চয়ই করা দরকার। শুধু কি ক'রে করবে সেইটেই ভেবে পেল না। অপেক্ষা ক'রে ওৎ পেতে থেকে কোন লাভ নেই। এসব উপহার যে-ই পাঠাক সে যেন ওর মনের কথা খড়ি পেতে গুণতে পারে—কিংবা অলক্ষ্যে থেকে সব গতিবিধি লক্ষ্য করে। সে যখন ঘরে থাকবে না অথবা ঘুমে অচেতন থাকবে—জেনে হিসেব ক'রে আসে সে। এমন লোককে কি ঘাপটি মেরে বসে থেকে ধরা যায়?

যাই হোক, অনিষ্ট করতে বা দুশমনী করতে যে কেউ এগুলো দিয়ে যায় না—সে বিষয়ে আগা কতকটা নিশ্চিন্ত। তাহলে এতদিন জেবরের বাক্স কি মোহরের থলি বেরোত ঘরের মধ্য থেকে। নিছক ফুলে কাউকে ফাঁসানো যায় না। যারা আশনাইয়ের দুর্নামে ফাঁসাতে চাইবে তারা হাতেনাতে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। এক পক্ষ নিষ্ক্রিয় আর এক পক্ষ অদৃশ্য, এক্ষেত্রে হাতেনাতে ধরাবার প্রশ্নই ওঠে না। সে তো জেনানী মহলে কারও ঘরে যাবার চেষ্টা করছে না। সে কোনও পাল্টা উপহারও পাঠাচ্ছে না। তার দোষ দেবে কী ক'রে?

না, ফাঁসাবার মতলব থাকলে অন্য অনেক উপায় ছিল।

সেদিন আর এ নিয়ে মাথা ঘামাল না আগা। রহমৎ যখন ঠাট্টা ক'রে জিজ্ঞাসা করল, 'কী বন্ধু, আশমানের চাঁদ বিবি কি বলছেন? কাল বেশ ঘুম হয়েছিল দেখছি! কাল বুঝি আর তিনি দয়া ক'রে আশমান ছেড়ে দুনিয়ায় নামেন নি?' তখন আগা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ ভাই, তোমার হয়ে কাল একটু সুপারিশ করতে গিছলুম, তাতেই গোঁসা ক'রে আশমানে চলে গেছেন। তিনি এক আমি ছাড়া কাউকে ধরা দিতে চান না। তবে মাঝরাতে বুঝি আবার মন-কেমন করেছে, এক বাঁদীকে দিয়ে তাঁর বাগিচার ফুল পাঠিয়ে দিয়েছেন এক থোকা!'

সে জেব থেকে ফুলের গুচ্ছটা বার ক'রে দেখায়।

রহমৎ মুখ কালি ক'রে বলে, 'বেহেস্তে এ ফুল হয় কিনা জানি না, তবে শাহী বাগিচায় হয়। বোঝা গেল তোমার চাঁদ কোন্ আশমান থেকে নামেন!'

যে রহস্যময়ীই আসুক তার ঘরে—স্বয়ং চাঁদ বা তার কোন বাঁদী পর পর দুদিন যে আসবে না—এটা আগা বুঝে নিয়েছিল। যখন আশা করবে তখন আসবে না, যখন অসতর্ক থাকবে—তখনই এক ফাঁকে আসবে সে গোপনচারিণী। তাই সেদিন সে কাজ থেকে ফিরে যথারীতি পড়তে গেল। বেশ মন দিয়েই পড়ল সেদিন। আগের দিনের তিরস্কার যে ভিত্তিহীন সেইটেই প্রমাণ করার জন্য আরও বেশী ক'রে পড়ায় মন দিল। তার পর লঙ্গরখানায় গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে অনেকগুলো রুটি খেল। কদিনই খাওয়া হচ্ছে না ভাল ক'রে, সেইটে পুষিয়ে নিল সে। ওখান থেকে বেরিয়েও তখনই ঘরে গেল না, একটা পানের দোকানে গিয়ে এক ঢেবুয়া দিয়ে এক খিলি পান কিনে খেয়ে ধীরে-সুস্থে ঘরে ফিরল সে।

কিন্তু ভেতরে পা দিতে হ'ল না—তার অভ্যস্ত চক্ষু বাইরে থেকেই দেখতে পেল, বিছানার মাঝখানে কী একটা পড়ে রয়েছে!...তাড়াতাড়ি কম্পিত হাতে আলো জেলে দেখল—বেশ খানিকটা রেশমের কাপড়, ওর একটা কুর্তা বানাবার মতো—যেন মাপ ক'রে দিয়েছে কে।

আঃ! ক্ষোভে বিরক্তিতে অনুশোচনায় নিজের হাত নিজে কামড়ে রক্তাক্ত ক'রে তুলল সে। যদি আর একটু আগে আসত সে—খাওয়াটা দ্রুত সেরে কিংবা পান খাওয়ার ইচ্ছাটা দমন ক'রে—তাহ'লে নিশ্চয়ই ধরতে পারত। বেশীক্ষণ এখান থেকে যায় নি, কারণ সন্ধ্যারাত্রে এই চলনটা দিয়ে বহু লোক আসা-যাওয়া করে, তখন আসতে সাহস করবে না। তাছাড়া বাতাসে এখনও যেন একটা আতরের মৃদু সুগন্ধ লেগে রয়েছে। যে এসেছে সে-ই মেখে এসেছিল নিশ্চয়ই। দামী কোন আতর, সাধারণ পরিচিত কিছু—খস কি হেনা কি মৃগনাভি নয়।

ইস, আজই অনর্থক এত দেরি করল সে!

নিজে নিজে গালে মুখে চড়াতে ইচ্ছে করছে যে তার!

সেরাত্রে আগা এক দুঃসাহসিক কাণ্ড ক'রে বসল। সেদিনের মতো পালা চুকেই গেছে—তবু সে শুতে গেল না তখনই। চিরাগও নেভাল না। ওর হাবিলদার বন্ধু, ঘরে ফিরেও যাতে হাতের লেখা মক্স করতে পারে আগা, সেইজন্য কতক-গুলো কাগজ দিয়েছিল আর মাটির দোয়াত-ভর্তি 'সিয়াই'। কলম সে নিজেই একটা যোগাড় ক'রে নিয়েছিল হাঁসের পালক কেটে। কাগজগুলো সাফা নয় খুব, একটু বাদামী রঙের—ওদের জঙ্গী দপ্তরের কী সব ছাপা কাগজ, ওরা বলে 'ফরম'। তা সাদা না হোক, লেখা যায় বেশ। ঘরে ফিরে হাতের লেখা মক্স করা অবশ্য হয়ে ওঠে নি তেমন, একদিন দুদিন ছাড়া। কাগজগুলো তোলাই ছিল একটা কুলুঙ্গীতে! আজ সেই কাগজ কলম দোয়াত নিয়ে তোড়জোড় ক'রে চিরাগের আলোর সামনে এতকাল পরে লিখতে বসল।

না, হাতের লেখা নয়।

লিখতে বসল যা—তা ওর কোন পুরুষে কেউ কখনও লেখে নি—কবিতা। কবিতা লেখে নি, লেখার চেষ্টা করে নি, কোন দিন লিখবে তাও ভাবে নি। তবে ওর হাবিলদার বন্ধুর কৃপায় পড়েছে কিছু কিছু—শুনেছে ঢের। ছেলেটি কাব্যের ভক্ত। বিস্তর কবিতা তার মুখস্থ। গালিবের সব কবিতাই বোধ হয় সে গড়গড় ক'রে বলে যেতে পারে। ব'লে যায়ও সে—সময়ে-অসময়ে কারণে-অকারণে। সেই পুঁজি সম্বল ক'রেই আগা আজ কবিতা লিখতে বসল।

অনেকবার লিখে, অনেক কাটাকুটি ক'রে, অনেক বাদ দিয়ে, অনেক বদল ক'রে শেষ অবধি একরকম একটা দাঁড়াল। আগার মনে হ'ল কবিতার মতোই একটা দাঁড় করাতে পেরেছে সে। অত নিয়মকানুন ছন্দের আটঘাট বোঝে না, তবে আস্তে আস্তে আবৃত্তি করার মতো পড়ে নিজের কানে অন্তত মন্দ শোনাল না।

সে যা লিখল তার মর্মার্থ হ'ল এইঃ

"ওগো আমার মর্ত্যে-নেমে-আসা আশমানের চাঁদ, বেহেস্তের হুরী, ওগো বিদ্যুতে গড়া মেয়ে, আর কতকাল এমন দূরে থেকে শুধু পরশ পাঠিয়ে তোমার এ বান্দাকে বঞ্চিত রাখবে? যদি অনুগ্রহই করলে তবে আর একটু কাছে আসছ না কেন! তোমার অমন দেবদূতীর মতো দেহ—তোমার মনে কিন্তু দয়ামায়া নেই কেন? ধরা দেওয়া অসম্ভব জানি—অন্তত আর একবার দেখা দাও আমার মনের মালেকা। তোমার ঐ অমৃতে গড়া মুখের পানে কবে চাইতে পারব এই ভেবে আমি দিওয়ানা বাওরা হয়ে উঠেছি। কোন চকোর বোধ হয় কোনদিন চাঁদের জন্যে এত পিপাসার্ত হয় নি, যেমন আমি তোমার দেখা পাব ব'লে তৃষিত হয়েছি; কোন ভ্রমরও কোন মধুর জন্য এত উন্মত্ত হয়ে ওঠে নি—যেমন আমি তোমার মুখারবিন্দের মধুপানের জন্য হয়েছি। দোহাই তোমার দয়াময়ী, তোমার এই নীরবতার অবগুণ্ঠন দূর করো—দুই কান জুড়িয়ে যাক তোমার বীণা-নিন্দিত কণ্ঠে। আর যদি দেখা না দিতে পারো তবে তোমার পায়ে চলার পথটা জানিয়ে দিও, এটুকু মেহেরবানী ভিক্ষুককেও তো করে মানুষ—আমি নিজের হাতে এই দিল বুক থেকে উপড়ে তোমার সেই পথের ধুলোয় মিশিয়ে দেব, তুমি শুধু কোন একদিন তোমার রাতুল চরণ দুটি ফেলে একবার তার ওপর দিয়ে হেঁটে যেও!"

এতবার লিখল, এতবার কাটল, এতবার বদলাল, তবু মন খুঁৎখুঁৎ করতে লাগল তার। শেষে এক সময় যখন তার চিরাগের তেল ফুরিয়ে এল তখন সাব্যস্ত

করল, শেষরাত্রে উঠে একবার তার কাব্যরসিক হাবিলদার বন্ধুকে দেখিয়ে নিয়ে আসবে। ভুল-ত্রুটিগুলো শুধরে নেবে। এইটে ভেবে যেন আশ্বস্ত হ'ল খানিকটা। কবিতাটা বিছানার নিচে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

কবিতাটা কাকে দিয়ে কেমন ক'রে পাঠাবে তা তখনও ভাবে নি। একবার ভেবেছিল রাবেয়াকে কোন রকমে ডেকে পাঠিয়ে তাকে কিছু ঘুষ দিয়ে তার মারফৎ পাঠাবে। কিন্তু শেষ অবধি পছন্দ হয় নি মতবলটা! ঝি-চাকরের আলগা মুখ। জানাজানি হয়ে গেলেই বিপদ!

শেষে ভেবেছে—এর পর থেকে প্রতিদিন রাত্রে একটা ক'রে ফুল চাপা দিয়ে রেখে যাবে বিছানার ওপর—যদি আবার কেউ আসে—এতদিনে আশা হয়েছে হয়তো আসবে আবার—সে কি আর দেখে তুলে নেবে না?...

রাতের সঙ্কল্প সকালে উঠে আর পালন যোগ্য মনে হল না। বন্ধুকে দেখাতে লজ্জাবোধ করতে লাগল। কী ভাববে, নানান্ প্রশ্ন করবে হয়তো! সে অনেক ঝামেলা, অনেক জবাবদিহি, বিস্তর মিথ্যা বলতে হবে। তার চেয়ে নিজে যা পারে তাই ভাল। আজ রাত্রে ফিরে এসে বরং আর একবার দেখবে, পারে নিজেই আর কিছু অদল-বদল করবে। নয়তো যা আছে তাই রেখে দেবে। যদি 'সে'-ই হয়—সে তো জানেই আগা লেখাপড়া জানা শহরের লোক নয়, অশিক্ষিত মুলুকী চাষা, সে ক্ষমাঘেন্না ক'রে মানিয়ে নেবে নিশ্চয়।

কবিতাটা বার করেছিল বন্ধুর কাছে নিয়ে যাবে বলে, আবার সেটা সযত্নে বালিশ চাপা দিয়ে রেখে কাজে চলে গেল।......

সেদিন সারা বেলাটা কাটল যেন একটা ঘোরের মধ্যে দিয়ে। কারও সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছা করছে না তার, কারও কথা কানে গেলেও যেন বিষ মনে হচ্ছে। কারণ সে কেবলই মনে মনে সেই কবিতাটা আবৃত্তি করছে আর ভাবছে এর কোন্ শব্দ বা কোন্ পংক্তি বদলে নতুন কিছু দেওয়া যায়! কয়েকটা বেশ লাগসই কথা মনেও পড়ল তার। কাগজ কলম সঙ্গে আনে নি বলে আপসোস হতে লাগল। সন্ধ্যায় ঘরে যেতে যেতে না ভুলে যায়। কাগজ থাকলে এখনই লিখে নিত।...নতুন শব্দ আর পংক্তিগুলো বার বার মুখস্থ ক'রে নিল মনে মনে।

সন্ধ্যার একটু আগেই—দূর থেকে রহমৎকে দেখতে পেয়েই, এক ছুটে চলে এল সে। ঘরে ঢুকেই আগে বালিশের নিচে হাত ঢুকিয়ে কবিতাটা টেনে বার করল। কাল থেকে চিরাগে তেল ফুরিয়ে আছে, এখন গিয়ে তেল যোগাড় ক'রে জ্বালা অনেক হাঙ্গামা। তার চেয়ে এই দিনের সামান্য আলোটুকু থাকতে থাকতে যদি বদলি পংক্তিগুলো লিখে নিতে পারে—

কিন্তু কী সর্বনাশ—এ কোন্ কাগজ! তার সে কবিতা-লেখা কাগজ কোথায় গেল? সে তো বাদামী রঙের 'ফরম'-এর কাগজ ছিল—এ তো দিব্যি মোটা দামী, হাতে তৈরী ভাল কাগজ!

সে পাগলের মতো ছুটে গিয়ে বসে বিছানা উলটে হাঁটকে ছত্রাকার করে ফেলল। না, কোথাও নেই সেটা।...কে নিল সে কাগজ? ঠিক সেই জায়গায় এটাই বা এল কোথা থেকে?

তবে কি—?

এতক্ষণে খেয়াল হ'ল তার—সে কাগজের বদলি এ কাগজ কেউ রেখে যেতে

পারে। তাহলে সে কবিতার জবাব নয় তো? আশায় আশঙ্কায় হাত কাঁপে তার, কোনমতে কাগজের ভাঁজটা খুলে শেষ অবধি আলোর সামনে মেলে ধরে।

এও কবিতা, তবে ঠিক হয়তো কাব্য নয়, কবিতার ছাঁদে লেখা। গোটা গোটা মুক্তোর মতো লেখা। আগার কবিতারই জবাব—তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তার মানে আজ দিনের বেলায় কেউ এসেছিল! যে এসেছিল সে সব জানে, আগার নাড়ি-নক্ষত্র জানা আছে তার। এ কবিতা লেখা হয়েছে তা জানে, কোথায় রেখে গেছে তাও জানে। তার গতিবিধি, অভ্যাস, সব।

ভয় করছে আগার, সত্যিই ভয় করছে। এ কি হাত গুণতে জানে, নাকি সত্যিই অশরীরী কেউ? সে কি তাহ'লে অশরীরী কিছুর প্রেমে পড়ল? কিন্তু জবাব পড়ে তো তা মনে হয় না!

ভালই হ'ল অবশ্য। কেমন ক'রে পৌঁছে দেবে এ কবিতাটা—সেটা আর কোন সমস্যা রইল না।

জবাবটা প্রায়-অন্ধকার-হয়ে-যাওয়া আলোয় মেলে ধরে আবারও পড়ল আগা।

"ওহে বীর পুরুষ, খুব তো সেদিন লম্বা-চওড়া কথা বলেছিলে! গ্রামের সরল লোক—তোমরা এক একটি মহাপুরুষ। নিজের মিথ্যে পরিচয় দিয়েছিলে কেন? কেন বলেছিলে এ দেশে নতুন, কেন বলেছিলে লেখাপড়া জান না, গ্রাম্য চাষার ঘরের ছেলে? বেশ তো উর্দুতে কবিতা লিখেছ—আর বানিয়ে বানিয়ে মিছে কথা দিয়ে ভরিয়েছ সে কবিতা! 'দিল' যদি এতই পথের ধুলোয় মিশিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়ে থাকে —তোমার ঘরের সামনের চলনেই দিতে পারো। ওখান দিয়েও আমি চলে থাকি। কিন্তু সে তুমি পারবে না। দিল বিলিয়ে দেবার সাধ নয় তোমার, দিল দিয়ে দিল পেতে চাও। অমন নির্জলা মিথ্যা আর লিখো না।

কবিবর, এত অধৈর্য কেন? হিন্দুরা বলে আশমানের এক লাখ সিঁড়ি, চাঁদে পৌঁছতে গেলে বোধ হয়, আরও বেশী। পদ্মেরও এক হাজার পাপড়ি, একটি একটি ক'রে খুললে তবে তার ভেতরের মধু মেলে! ভ্রমরের উপমা দিয়েছ—সে বিস্তর গুনগুন করলে, বিস্তর তোষামোদ করলে তবে পঙ্কজিনী তার জন্য হৃদয়ের দ্বার খোলেন। সহজে কিছু মেলে না—বুঝেছ বোকারাম? অত অস্থির কেন? যা পাচ্ছ তাতেই খুশী থাকো।"

এ রীতিমতো তিরস্কারই করা হয়েছে আগাকে কিন্তু মধুর তিরস্কার। এর প্রতিটি ছত্র স্নেহ আর কৌতুকে মেশানো। দরদী মনের ভাষা এ।

আর নিরাশও তো করে নি একেবারে। বরং আশাই তো দিয়েছে।

ধৈর্য ধরতে বলেছে যখন—তখন আশাই দিয়েছে বৈকি।

আগার মনে হ'ল সে একটা বিরাট চিৎকার ক'রে ওঠে, লাফায়, ডিগবাজী খায়, গান গায়, নাচে—পাগলের মতো একটা কিছু করে। মনে হ'ল ঐ লাহোরী দরওয়াজার মাথার ওপর উঠে চিৎকার ক'রে খবরটা শুনিয়ে দেয় এই কিল্লার সমস্ত লোককে, দিল্লী শহরের তাবৎ অধিবাসীকে। এমন সৌভাগ্যের খবর সে একা নিজের মনে চেপে রাখবে কি ক'রে?

আনন্দে তার চোখে জল এসে গেল। সে চিঠিখানা গালে চেপে ধরে, বুকে রেখে, চুমো খেয়ে পাগলের মতোই কান্ডকারখানা বাধিয়ে তুলল।

ফলে সেদিন রাত্রে তার খাওয়াই হ'ল না। যখন হুঁশ হ'ল প্রথম—তখন কিল্লার ঘড়িতে এগারোটা বাজছে। তখন আর লঙ্গরখানা খোলা পাওয়া সম্ভব নয়।

মেহেরের মন-কেমন করতে লাগল। ও যে এমন কাণ্ড করবে তা ভাবে নি সে। খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে ঐ ছাই চিঠি নিয়ে বসে থাকবে—হাসবে কাঁদবে, চিঠিটাকে চুমো খাবে একশবার—এ জানলে মেহের হয়তো তখনই দিয়ে আসত না, খেতে যাবার ফাঁকে রেখে আসত। একবার মনে হ'ল নিজেই কিছু খাবার রেখে আসে ওর ঘরে, কিন্তু রাত বারোটা পর্যন্ত ঘুমোলই না লোকটা, রেখে আসে কখন? তাছাড়া খাবার দিতে গেলে নিজেরটাই দিয়ে আসতে হয়। ঘরে বাড়তি খাবার থাকে না। আতর রেশমী কাপড় নিজের ব্যবহারের জন্য বলে কিনে আনানো যায়। বাড়তি খাবার চেয়ে পাঠালে মেলা কৈফিয়ৎ। প্রথম বড় বাবুর্চিরই সন্দেহ হবে, সেও মহলের অন্য বাবুর্চিদের বলবে—তা থেকে কথাটা ছড়িয়ে পড়বে, শেষে হয়তো শাহ্‌বেগম সাহেবার কানে পৌঁছবে কথাটা—তিনি এ সুযোগ সহজে ছাড়বেন না, তৎক্ষণাৎ গিয়ে বাদশাকে শুনিয়ে আসবেন। মাগো, সে ভীষণ কেলেঙ্কারি। বাইরে যে কোথাও থেকে কিনিয়ে আনাবে—কেল্লার মধ্যেও দোকান আছে—লাড্ডু কি বাবুমশাই, কি হালুয়া সোহন—সেও কোন বাঁদীকে দিয়ে আনাতে হবে। ওদের কাউকে বিশ্বাস নেই। কথাটা এক লহমায় ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে।...

মেহেরও ছটফট করছে বহুদিন থেকে আগার খবরের জন্য। সেই প্রথম দিন থেকেই বলতে গেলে। ওর চাকরি পাওয়া, রাজমাকীদের নালিশ, সবই সে দেখেছে ঝরোখা ও চিকের মধ্য থেকে। বাদশা সেদিন মহিমার যে স্তরে উঠেছিলেন তা যে সম্ভব এখনও ওঠা—এখনকার এই নখদন্তহীন কোন বাদশার পক্ষেই—তা মেহের কল্পনা করতে পারে নি। সিংহ যে স্থবির বৃদ্ধ হলেও সিংহই—তা সেদিন প্রথম বুঝল সে। বিশেষত তিনি যে ঐ কুচক্রী পাজী শাহ্‌-বেগমের খয়ের খাঁ হেকিমটার কথাতেও টলেন নি—তাতে আরও আনন্দ হয়েছে তার। গর্বও বোধ করেছে তার 'নানা'র জন্য। গর্বে আনন্দে বুক ভরে গেছে তার। বাবরশাহী বংশের সম্মান রক্ষা করেছেন নানা, রক্তের মর্যাদা রেখেছেন। এই সিংহনাদের পুরস্কার স্বরূপ সে বাদশাকে নিজের হাতে একটা পশমের মোজা বুনে দিয়েছে। ভেলভেটের জুতোয় সলমা চুমকীর ফুল তুলে দিয়েছে। আরও বকশিশ দিয়েছে সে তার শিশু নানাকে, ভাল চামড়া বাঁধানো খাতায় সুন্দর ক'রে বাদশার লেখা কবিতা ও গান নকল করে দিয়েছে।

তবু ভরসা ক'রে জিজ্ঞাসা করতে পারে নি—আগা কোথায় থাকে, কেমন আছে। বিষম লজ্জা করেছে তার। কি ভাববেন বাদশা। হয়তো কিছু অন্য ধারণা ক'রে বসবেন। বাদশা হয়তো ঠিক বলতেও পারতেন না। তাঁর হুকুম দেওয়া কাজ তিনি হুকুম দিয়েছেন—তার বেশী তাঁর জানার গরজই বা কি? বাকীগুলো ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের দেখবার কথা, কতকটা তাদের মর্জিও। কোথায় থাকতে দিয়েছে তাকে, বিছানাপত্র কিছু দিয়েছে কিনা, এই শীতে একটু বিছানা কি একটা রেজাই মিলেছে কিনা বেচারার—এমনি হাজারো প্রশ্ন গলার কাছে ঠেলাঠেলি করলেও সে প্রশ্নগুলো মুখ ফুটে কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারে নি! এক বাদশার কাছেই তার যা কিছু

আবদার, তাঁর কাছেই জোর খাটে যেটুকু। জানে যে তিনি তার কোন অনিষ্ট করবেন না কখনই—দোষ করেছে জানলেও যথাসাধ্য ঢেকে নেবার চেষ্টা করবেন। আর কাউকে বিশ্বাস নেই। সব চেয়ে শয়তান ঐ মির্জা আবুবকরটা। শয়তানটা চেয়েছিল মেহেরকে হাত করতে—কিন্তু বাদশা স্বয়ং তাকে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন : আবুবকর দুশ্চরিত্র, বদমাইশ, মাতাল। মেহের সতর্ক হয়েছিল, ওর ধরাছোঁয়ার মধ্যে যায় নি। সেইজন্যই যেন বদমাশটার একটা আক্রোশ চেপে গেছে। মেহেরকে অপদস্থ লাঞ্ছিত করবার বিন্দুমাত্র সুযোগ পেলে সে ছাড়বে না একটুও।

সুতরাং কাউকেই কিছু বলতে পারে নি মেহের, শুধু ছটফট করেছে ভেতরে ভেতরে। দু-একবার ওপরের জানলা থেকে, ছাদ থেকে দেখেছে আগাকে, মোটামুটি ভালই আছে—এটা বুঝেছে। 'উনী' বা পশমী কাপড়ের নতুন পোশাক পেয়েছে, সেটা লক্ষ্য ক'রে আশ্বস্ত হয়েছে। বাদশাও দু-চারবার ডেকে পাঠিয়ে কী সব কাজকর্মে পাঠিয়েছেন তাও দেখেছে। তবে সে সবই দূর থেকে—আড়াল থেকে। আগার পক্ষে তো দেখা সম্ভবই নয়। কিন্তু মেহেরও দেখতে পাচ্ছে, কাছাকাছি কোথাও থাকে তাও বুঝতে পারছে, অথচ সঠিক কোন খবর পাচ্ছে না বা যোগাযোগ করতে পারছে না—এ একটা দারুণ যন্ত্রণা বোধ করছিল মনে মনে।

তার পর হয়তো অন্তর্যামী খোদারই মর্জি—হঠাৎ সেদিন রাবেয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আগার ঘরটা ঠিক কোনখানে—কোন্‌টা—তা বুঝে নেবার পর আর কোন অসুবিধা রইল না। মেহেরের ঘরের পাশেই একটা চোরাকুটুরী আছে, সেটা ঠিক ঐ নিচের চলনটার ওপরে। ওখানে খানিকটা জায়গা যেন দুটো অংশের মধ্যে পুলের মতো। এই ঘরটাতে আগে মেহেরের নিজস্ব বাঁদী থাকত। সে বাঁদী মরে গেছে—শাহ্‌বেগম আর খাশ বাঁদী দেন নি। বলছেন, 'খরচে কুলিয়ে উঠতে পারছি না, কোম্পানী খাজনার টাকা বাড়িয়ে না দিলে কোন দিকে পেরে উঠছি না। তা ছাড়া দরকারই বা কি? এত বাঁদী তো রয়েছে, যখন যা দরকার কাউকে ধরে করিয়ে নিও।'

কোম্পানী খাজনা বাড়াবে না আর, মেহের ভাল ক'রেই জানে। শাহ্‌বেগম যখন তখন খাজনা শব্দটা ব্যবহার করেন। অথচ যখনই শোনে হাসি পায় মেহেরের! খাজনা ব'ট! আংরেজ কোম্পানী দয়ার মতো, ভিক্ষার মতো ক'রে কিছু কিছু খরচের টাকা দেয় মাত্র—তাকে এ'রা কেউ বলেন নজরানা, কেউ বলেন সেলামী, কেউ বলেন খাজনা। এমনিই তো শুনেছে মেহের, ওরা এটুকু দয়ার দান—আংরেজরা বলে পিন্‌সিন—তাও বন্ধ করতে চায়। বর্তমান বাদশা মারা গেলে সম্ভবত বন্ধই ক'রে দেবে তারা। এখানে থাকতেই দেবে না হয়তো, আগের যে বড়লাট তিনি তো এই বাদশাকেই বলেছিলেন কুতুবে গিয়ে থাকতে। তাঁরা একটা বাড়ি ঠিক ক'রে দেবেন —এ'দের থাকার মতো। বাদশার বড় ছেলে, মেহেরের বড় মামা শাহ্‌জাদা ফকীরুদ্দিনকে দিয়ে গোপনে নাকি একটা না-দাবী নামাও লিখিয়ে নিয়েছিল কোম্পানী। ফকীরুদ্দিন এই বাদশাহীর ভ্যাংচানি, রাজত্ব করার এ পরিহাস দু' চোখে দেখতে পারতেন না—তাঁর পক্ষে লিখে দেওয়া সম্ভবও। কিন্তু সে খবর পেয়ে এই নানী—শাহ্‌বেগম জিন্নৎমহল সাহেবা ক্ষেপে উঠেছিলেন একেবারে। উঃ, সে কি দাপাদাপি বেগমসাহেবার, বাদশার বড় ছেলে—যার সিংহাসনে বসবার কথা একদিন—(সিংহাসন তো কত!) সে-ই যদি না-দাবী লিখে দেয়, কোম্পানী তো জোর পেয়ে যাবে! কী গালাগালটাই দিলেন সেজন্যে নানী—সতীনপোকে। কিন্তু

তাতেই কি থেমেছিলেন? লোকে বলে সেই জন্যেই উনি লুকিয়ে বিষ দিয়েছিলেন শাহ্‌জাদাকে—আর সে বিষ যুগিয়েছিল ঐ হেকিম সাহেব, সেই জন্যেই শাহ্‌বেগম ওর হাতের মুঠোর মধ্যে এখন—নইলে অমন জলজ্যান্ত সুস্থ লোকটা রাতারাতি ধড়ফড়িয়ে মরবে কেন? শাহ্‌বেগমের এখনও আশা যে তাঁর ঐ আদুরে-গোপাল বুদ্ধু ছেলে জওয়ানবখ্‌ৎ একদিন বাদশা হবে আর তিনি বাদশার মা হয়ে তাঁর প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখবেন—যেমন আগেকার দিনে রাজমাতারা প্রবল প্রতাপ রাজত্ব করতেন, তেমনি। এটা কিছুতে বোঝেন না উনি—যদি বাদশাহী থাকেও, দাদাদের ডিঙিয়ে জওয়ানবখ্‌ৎ বসবে কেন? নানী তা বোঝেন না, বুঝতে চান না, তিনি বলেন, 'সেই আশাতেই তো আমি কাঁচা বয়সে ঐ বুড়োকে বিয়ে করেছিলুম। বাদশা তো তখনই প্রায় বুড়ো।'

এই বাদশাহী—মাত্র ক-বিঘা জমিনের এই কিল্লার ভেতরে—তাও হয়তো থাকবে না, তার জন্যেও মানুষ এত কান্ড করে! আশ্চর্য!...

সে যাক গে, খাশ বাঁদী না পেলেও ও ছোট ঘরটার দখল ছাড়ে নি মেহের অন্য কারণে। ছোট্ট ঘর, একটি মাত্র দরজা আর ভেতরদিকে এই চলনের দিকে দু-তিনটি ঘুলঘুলি। জানলা নেই ঝরোখা নেই। কিন্তু দু-ঘরের মধ্যে যাতায়াতের দরজা আছে। দরজা বন্ধ থাকলেও আড়িপাতা যায়, ফুটো দিয়ে দেখাও যায় হয়তো।

অপরিচিত কোন মানুষ এলে বড় অসুবিধা। কানের কাছে উপদ্রবও বটে। আবার ঘরটা নিজের হাতে থাকলে এই দরজাটাই বড় সুবিধা। নিজের ঘর ভেতর থেকে বন্ধ করে চুপিচুপি এ-ঘর দিয়ে বেরিয়ে গেলে কেউ টের পায় না। বইখাতা, বাড়তি কাপড়চোপড় রাখবার নাম করে তাই ঘরটা আটকে রেখেছে মেহের। ঘরটা এতই ছোট যে তা নিয়ে আর কেউ মাথাও ঘামায় নি।

তবু, এটা যে এত কাজে লাগবে তা কোন দিন ভাবে নি সে। এই ঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে আগার ঘরের সামনের প্রায় পুরো চলনটা, ওর ঘরের দরজা, এমন কি দরজা খোলা থাকলে—আর সে তো খোলাই থাকে অষ্টপ্রহর—ঘরের মধ্যেও কোণাকুণি এক ফালি জায়গা—পরিষ্কার দেখা যায়। অথচ এ অন্ধকার ঘরের ঘুলঘুলিতে কেউ চোখ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিনা তা বাইরে থেকে কারও বোঝা সম্ভব নয়।

এ কদিন এখান থেকেই আগার সমস্ত গতিবিধি লক্ষ্য করেছে সে। আগার ওৎ পেতে দাঁড়ানো কি ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকার ছেলেমানুষি ধরণ দেখে খুব হেসেছে মনে মনে। প্রথম দিন গোলাপ ফুলগুলো দিয়ে এসেছিল হঠাৎ একটা ঝোঁকের মাথায়। কিন্তু তার ফলে আগার ভয় বিস্ময় দুশ্চিন্তা—ওর পাগলের মতো কান্ড-কারখানা দেখে আর একটু মজা করবার লোভ সামলাতে পারে নি। আতরটা তার ঘরেই ছিল—তার জন্মদিনে বাদশার উপহার—রেশমের কাপড়টা কিনিয়ে আনিয়েছিল উস্তানীকে দিয়ে একটা মিথ্যা অছিলায়, নার্গিস ভেতরের বাগান থেকে নিজে পেড়ে এনেছিল। কেমন মনে হয়েছিল এ তো ঐ দিকেরই ফুল, নিশ্চয় ওদের দেশেও হয়—খুব ভাল লাগবে ওর।

তার পর সেদিন কবিতা লেখাটাও লক্ষ্য করেছে বসে বসে। কবিতা বলে বুঝতে পারে নি, সারারাত ধরে কি লিখল—মেহেরের মনে হয়েছে সারারাতই—কারণ যখন সে আর বসে থাকতে পারে নি, বারোটা বেজে গেছে—তখনও তো লিখে চলেছে আগা—সেটা দেখবার কৌতূহল অসম্বরণীয় হয়ে উঠেছিল। কাগজটা যে বিছানার নিচে রেখে গেল তাও দেখেছিল। সারা সকালটা অতি কষ্টে ধৈর্য ধরে ছিল,

দুপুরের দিকে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে তখন এক সময় নেমে গিয়ে কাগজটা নিয়ে এসে পড়েছে। হেসেছে প্রথমটা খুব—ওর বাক্যবিন্যাস দেখে, কিন্তু পরে—কে জানে কেন, কী এক বিচিত্র কারণে ভালও লেগেছে। এমন অন্ধ ভক্ত একজন আছে জানতে পারলে সকলকারই ভাল লাগে বোধ হয়। তার পর কেউ ওঠবার আগেই আবার উত্তরটা লিখে রেখে এসেছে চুপিচুপি। বাঁদী মহলের পাশের চোরা দরজাটাও ভাগ্যিস দেখিয়ে দিয়েছিল রাবেয়া—মেহেরের ঘর থেকে খুবই কাছে হয়—একটা সংকীর্ণ সিঁড়িও আছে ওদিকে। সেটা সাধারণত কেউ ব্যবহার করে না, করার দরকার হয় না—অতএব নিরাপদ।

আজ যে ঐ কবিতাটার কোন সদ্‌গতি করার জন্য ছুটির পরই আগে ঘরে ছুটে আসবে আগা তা সে বুঝেছিল। তাই সন্ধ্যার আগে থেকেই বার বার ঘুলঘুলি দিয়ে দেখেছে। কিন্তু এমন কাণ্ড করতে থাকবে লোকটা, হেসে কেঁদে নেচে—চিঠিটা নিয়ে এমন মাতামাতি করবে—তা ভাবে নি। সবচেয়ে ওর দুঃখ—বেচারীর খাওয়াটা হ'ল না—এই দীর্ঘরাত উপবাসী থাকবে? ইস!

কিন্তু দেখা পাবার আকুলতা শুধুই কি আগার? মেহেরেরও কি কিছু নেই? ভক্তের পূজো দেবার যত আগ্রহ—দেবতার কি তা পাবার আগ্রহ কিছু কম? সুতরাং মেহের ছটফট করে, দুটো কথা বলার সাধ তারও, কাছে থেকে, সামনাসামনি থেকে দেখারও ইচ্ছা। কিন্তু সুযোগ সুবিধা সুদূর। সাহসও হয় না সে সুযোগ অন্বেষণ করবার। কোন ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি ভাল নয়, এটা আশৈশব দুর্ভাগ্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, এই বয়সেই বুঝে নিয়েছে সে। পুঁথি কিতাব পড়েও এ জ্ঞান হয়েছে তার। তা ছাড়া যতই হোক—সে শাহ্‌জাদী না হ'লেও এ বংশের মেয়ে, এই বাদশার দৌহিত্রী সে। তার একটা সম্মান আছে, মুখোমুখি সামান্য একজন নফরের সঙ্গে কথা বলা তার উচিত নয় কোনমতেই। কেউ টের পেলে স্বয়ং বাদশার মাথা হেঁট হবে, তার নিজেরও লজ্জার সীমা থাকবে না।...

অথচ যত দিন যায়, দুটো কথা বলার ও শোনার আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে। আগার ইতিহাস যতটা শুনেছে সে—বড় করুণ। বেচারী এখন তো প্রায় বন্দীর জীবনযাপন করছে, কিল্লা থেকে বেরোতে পায় না। যদি মেহের কথা কইতে পারত—সান্ত্বনা দিয়ে পরামর্শ দিয়ে নূতন উৎসাহে উদ্দীপিত ক'রে তুলত, বেদনা লাঘব করার চেষ্টা করত। পরামর্শ করারও তো কেউ নেই লোকটার। ওর বুদ্ধি-সুদ্ধিও খুব বেশী একটা আছে বলে মনে হয় না। যাদের হাত চলে, মাথা তাদের তত চলে না। যোদ্ধাদের কূটকচালে বুদ্ধি একটু কমই হয় সে শুনেছে। বড় বড় সেনাপতি যাঁরা—ইতিহাসে যাঁদের নাম অমর হয়ে আছে, ব্যক্তিগত জীবনে বোধ হয় একটা সামান্য সমস্যাও সমাধান করতে পারতেন না। অবশ্য আগা যে একটা বড় যোদ্ধা বা বীর সেরকম কোন প্রমাণ এখনও সে পায় নি, কিন্তু ওর ঐ বলিষ্ঠ দেহ, নির্ভীক সরল মুখ এবং সর্বোপরি সেদিন বাদশার কাছে একটা অস্ত্র ভিক্ষা করবার ভঙ্গী দেখে কেমন মনে হয়েছে তার যে, সামান্য সাধারণ কাজ করার শিক্ষা আগার তত নেই যত আছে হাতিয়ার ধরার নিপুণতা। তা ছাড়া ঐসব পাহাড়ী পাঠানদের কথা আগেও শুনেছে মেহের, ওদের আশৈশব তলোয়ার বন্দুক চালানো শেখায় ওদের বাপ-মা। কাজেই আগা মাথা খাটিয়ে তার সঙ্গে কথা বলার বা দেখা করবার চেষ্টা করবে—সে আশা নেই, যা করতে হবে মেহেরকেই।

মেহেরই একটা উপায় খুঁজে বার করল অবশ্য।

ওর আগের যে খাশ বাঁদী—তার একটা বুরখা পড়ে আছে এ ঘরে বহুদিন যাবৎ। সে মারা যাওয়ার সময় থেকেই আছে। অনেকবার ভেবেছে কাউকে ডেকে দান করবে, নিছক উদ্যমের অভাবেই হয়ে ওঠে নি। পুরনো পোশাকগুলো তখনই ফেলে দিয়েছিল, মানে বাইরে যা পড়েছিল, অপেক্ষাকৃত নতুন বলেই বুরখাটা ফেলে নি। বোধ হয় নতুন বা আস্ত পোশাকও দু-একটা মিলবে তার প্যাঁটরা খুললে।

সেদিনই দুপুরবেলা সে বাঁদীর প্যাঁটরা খুলে তার পোশাকগুলো বার করল। প্রায় দু বছর আলো বাতাসের মুখ দেখে নি, রং চটে বিবর্ণ হয়ে গেছে জামা-গুলো বাক্সয় পড়ে থেকে থেকে। খালি একটা সালোয়ার এখনও প্রায় নতুন আছে, আর গোটা দুই কামিজ—নতুন না হ'লেও, পরা যায় এখনও। একটা কামিজ তার মধ্যে দামী 'উনী' বা পশমী কাপড়ের, গাঢ় খয়েরী রঙ, অন্ধকারে কালোই মনে হবে, হঠাৎ কারও চোখে পড়ার ভয় নেই। পোশাকগুলো ঝেড়েঝুড়ে ঠিক ক'রে গুছিয়ে রাখল হাতের কাছে। বুরখাটা বাইরে পড়ে ছিল অযত্নে, দু-একটা জায়গায় পোকায় ফুটো করেছে কিন্তু তাহলেও এমন খারাপ হয় নি যে পরা চলে না। সে বাঁদী কতকটা ওর মতোই লম্বা ছিল, নেহাৎ বেমানানও হবে না।

সব আয়োজন যখন প্রস্তুত তখন আর যেন ধৈর্য মানে না। কখন সন্ধ্যা হবে, কখন রাত্রি আসবে—নির্জন হয়ে আসবে চলনটা—অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে মেহের। মনে হয় আজ আর সময় কাটছে না। ঘড়ির কাঁটা বড় ধীরে ধীরে চলছে। বার বার বিভিন্ন ঘরে গিয়ে ঘড়ি দেখে দেখে আসে, নিজের ঘরেরটা খারাপ হয়ে গেছে কিনা সন্দেহ হয় এক-এক সময়।

নিজে গিয়ে সামনে না দাঁড়ালে, নিজে থেকে ধরা না দিলে কবিবর যে কোন দিন ধরতে পারবেন সে ভরসা নেই। শুধুই হা-হুতাশ করতে জানে লোকটা। সুতরাং সেই ভাবেই মতলবটা ঠিক করতে হবে। যেচে সে যাচ্ছে, এটাও কোন মতে জানতে দেওয়া চলবে না।

অবশেষে এক সময় সন্ধ্যা হল। ক্রমশ রাতও হল। পেটা ঘড়িতে দশটা বেজে যাবারও অনেক পরে ফিরলেন বাবুসাহেব (রোজ রোজ ছুটির পর কোথায় যায়?—মনে মনে প্রশ্ন করে মেহের, রোজ এতক্ষণ আড্ডা দিতে ভাল লাগে মানুষের?)। ওর ঘুলঘুলি থেকে সবই দেখতে পাচ্ছে,—ঘরে ঢুকে বিছানাটা হাতড়ে দেখল একবার, তারপর চিরাগও জ্বালল। ওঃ, খুব যে লোভ বেড়ে গেছে দেখতে পাই! নিত্যই ভাল ভাল উপহার তোমার ঘরে পেঁছে দিয়ে আসতে হবে, না?...চিরাগ জেবলে ভাল ক'রে ঘরটা খুঁজে দেখল বোধ হয়। একটু পরেই আবার আলো নিভিয়ে দিল। খুব সম্ভব শুয়ে পড়ল এবার।

যেতে গেলে এখনই যেতে হয়। নইলে বাবুর যা ঘুম, হাতিতে মাড়ালেও এর পর ঘুম ভাঙ্গবে না। ঘরে ঢুকে জেব-এর মধ্যে আতরের শিশি রাখল, গালের পাশে ফুল রেখে এল, ঠান্ডা ঠান্ডা ফুল ঠেকল গায়ে—তবু সাহেবের ঘুম ভাঙ্গল না। মেহেরের উস্তানী ফাতিমা বিবি মজার গল্প করে একটা, হিন্দুদের পুরাণে নাকি কোন্ এক রাজার কিস্‌সা আছে, সে নাকি একদিন অন্তর ছ-মাস ক'রে ঘুমোত একটানা। আর যেদিন ঘুম ভাঙ্গবার কথা তার—সেদিন হাজার হাজার ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া এনে কানের কাছে পিটতে হত, তবে তার ঘুম ভাঙ্গত। তা এ বীর-পুরুষের ঘুমও কতকটা সেইরকম।

সুবিধের মধ্যে দরজা কখনও বন্ধ করে না ঘরের। একটু ভেজিয়েও দেয় না, খোলাই থাকে হাট হয়ে। নিঃশব্দে ঢোকা এবং বেরনো যায়। মেহের প্রস্তুত হয়েই ছিল, বাঁদীর পোশাক প'রে। সেদিন সন্ধ্যা না হ'তে হ'তেই ক্ষিদের অছিলায় খাবার আনিয়ে ঘরে রেখে দিয়েছে, এদিকে আর কেউ আসবে সে সম্ভাবনা কম। তবু আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিল, যদি কেউ আসেও তো ভাববে ঘুমিয়ে পড়েছে। এতক্ষণে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছেও। যারা এত সহজে ঘুমোয় না—দু-চার জন শাহ্‌জাদা আছেন সেরকম—তারা কেউ এদিকে এ মহলে আসবে না। সে বিষয়ে মেহের নিশ্চিন্ত।

বুরখাটা গলাতে বাকী ছিল শুধু। সেইটে গলিয়ে নিয়ে সাবধানে ও সন্তর্পণে ছোট ঘরটা দিয়ে বেরিয়ে এল, তার পর এদিক ওদিক চেয়ে সিঁড়ি বেয়ে একেবারে নিচে। আগার ঘরে যাবার অজুহাতটাও আগে থেকে ঠিক ক'রে রেখেছিল—বিকেলেই একটা বড় সাদা গোলাপ সংগ্রহ করেছিল।

আগা তখনও ঘুমোয় নি। সেদিনের সে চিঠিটা পাবার পর থেকে এমনিই ওর ঘুম যেন কমে গেছে। কোন রাত্রেই ভাল ঘুম হয় না। কিসের একটা আশা কিসের একটা উত্তেজনা তাকে সর্বদা উৎসুক-সজাগ ক'রে রাখে। তন্দ্রা এলেও মধ্যে মধ্যে চমকে জেগে ওঠে অকারণেই। যেন, মনের অবচেতনে যে আশাটা জেগেছে—সেই আশার লগ্নটি ইতিমধ্যে এসে ফিরে গেল—একটা মহা ক্ষতি হয়ে গেল ওর—এমনি মনে হয়।

অবশ্য তখন ঘুমোবার সময়ও হয় নি সেদিন। শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিছু ঘুমিয়ে পড়তে পারে না মানুষ। বাইরে কেউ একজন আসছে, খুব লঘু পদসঞ্চারে—শব্দ না করবার প্রাণপণ চেষ্টায়—সে টের পেল অনায়াসেই। ইচ্ছে ক'রেই এটুকু শব্দ করেছিল মেহের, যেন সে পায়ের আওয়াজ চাপবারই চেষ্টা করছে অথচ পারছে না—এই রকম একটা ধারণা হওয়াবার জন্যই। নইলে লঘু শরীর তার, খালিপায়ে আসছে—শব্দ হওয়ার কারণ নেই। সেই চাপা আওয়াজটুকু, বুরখার ঈষৎ খসখসানি—কানে যাওয়ামাত্র আগার বুকের মধ্যে ধক্ ক'রে উঠেছিল, ঢেঁকির পাড় পড়তে শুরু করেছিল যেন—তবু সে প্রাণপণে স্থির হয়ে পড়ে ছিল, মাথাটা পর্যন্ত নাড়ে নি। চোখের পাতা আধবোজা-অবস্থায় চেয়ে ছিল শুধু দরজার দিকে। তার কেবল ভয়, দেহের মধ্যে এই রক্ত উত্তাল হয়ে ওঠার শব্দ বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছে না তো? শুনলে সতর্ক হয়ে উঠে ফিরে যাবে না তো আবার?...

যে আসছে সে-ই যে তার গোপন-চারিণী সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না আগার। নইলে এমনি কোন লোক হলে এমন সন্তর্পণে পা টিপে টিপে আসবে কেন? এটা তো যাতায়াতের পথ, কত লোকই তো দিনে-রাতে যাচ্ছে—যার দরকার সে সহজভাবেই চলে যেত।...আর, কদিন হ'য়ও তো গেল, কত আর ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে সে আগার?...

একটু পরেই সে নিঃশব্দচারিণী দৃষ্টিগোচর হ'ল। কালো বুরখা পরা মেয়ে একটি। যা অনুমান করেছে সে তা-ই। কারণ যে এসেছে সে এদিক ওদিক দেখে চট্ ক'রে তার ঘরেই ঢুকে পড়ল, তার পর একটু ও-কোণে অন্ধকার আড়ালে সরে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। বোধ হয়, আগা ঠিক ঘুমোচ্ছে কিনা জেনে নিশ্চিন্ত হ'তে চায়।

তারপর যা আশা করেছিল আগা—মেয়েটি অতি ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে তার বিছানার কাছে এল, একটুখানি যেন ইতস্তত করল—একটা স্বাভাবিক সংকোচ—শেষ পর্যন্ত যেন প্রাণপণে সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে একটা কী ফুল তার বুকের ওপর রাখতে গেল—

আর বিদ্যুৎবেগে, যেন বজ্রমুষ্টিতে তার সেই হাতখানা চেপে ধরল আগা। ভাগ্যিস কাচের চুড়িগুলো খুলে এসেছিল মেহের, ছিল শুধু সোনার কঙ্কণজোড়াটা, নইলে, কাচের চুড়ি থাকলে ভেঙে গুঁড়িয়ে রক্তারক্তি হয়ে যেত এ হাতের চাপে।

কিছুক্ষণ ধরে চলল একটা নিঃশব্দ টানাটানি। মেহের বেঁকে-চুরে টেনে হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল (উঃ, কী সাংঘাতিক জোর লোকটার হাতে—ছাড়াবার ইচ্ছে অবশ্য নেই মেহেরের, তবে থাকলেও পারত না!), কিন্তু সুবিধে হল না।

'কে তুমি?' এতক্ষণে প্রশ্ন করল আগা! আসলে উত্তেজনায় আবেগে প্রত্যাশায় আশঙ্কায়—গলা দিয়ে স্বরই বেরোতে চায় নি এতক্ষণ। এখনও, কণ্ঠস্বর কঠিন করার চেষ্টায় কেমন একটা বিকৃতই শোনাল কথাটা।

মেহের তো প্রস্তুত হয়েই ছিল। যদি সেদিনের সেই আরণ্যপর্বের স্মৃতি এখনও আগার মনে থাকে, গলাটা চিনতে পারে—এ ভয় ছিলই তার পূর্বাপর, সে গলাটা একটু চেপে ফ্যাসফেসে আওয়াজে বলল, 'যে ই হই না, হাত ছাড়ো।...এ কী অসভ্যতা!'

'না, হাত ছাড়ব না। ঠিকমতো জবাব না পেলে তোমাকেও ছাড়ব না। রোজ রোজ আমার ঘরে এমন চোরের মতো আসো কেন বলো আগে—।'

'চোরের মতো আসি—কিন্তু কী তোমার চুরি করেছি শুনি? কী আছে কি তোমার এই দৌলতখানায়?'

'কিছু চুরি করেছ বৈকি। ভেবে দ্যাখো। গরীব মানুষ, দিলটা ছিল শুধু—সেটা খুঁজে পাচ্ছি না আজ কদিন থেকে।'

'গিয়ে থাকে আপদ গেছে। ভারি তো মানুষ, তার আবার দিল। কোন দিন ছিল কিনা, এত বয়স অবধি রাখতে পেরেছিলে কি না তাই বা কে জানে!'

'ভারী মানুষ তো নই-ই, তা আমিও মানছি—তবে এই তুচ্ছ মানুষটার ঘরে আসই বা কেন?'

'ভুল হয়েছে, আর আসব না।'

'কিন্তু তুমি কে? কোথায় থাকো? আমাকে চিনলে কী ক'রে?'

'তা বলব না।'

'বুরখাটা যদি টেনে খুলে দিই? যদি চিরাগ জ্বেলে দেখে নিই?'

'দেখলেও চিনতে পারবে না। আর আমি তাহ'লে এখনই চিৎকার ক'রে লোক জড়ো করব। দশ কদমের মধ্যেই দুজন সান্ত্রী আছে, ভুলে যেও না।...বলব, আমাকে ঘরের মধ্যে টেনে এনে বেইজ্জৎ করেছে লোকটা—'

'তাতে তোমার ইজ্জৎটা বজায় থাকবে কি? তুমি কি কৈফিয়ৎ দেবে? এ পথ দিয়ে এতরাতে এই সামান্য বুরখা পরে শাহ্‌জাদী কোথায় যাচ্ছিল—যখন প্রশ্ন করবে সকলে?'

'শাহজাদী হ'লে কৈফিয়ৎ দেওয়া শক্ত হ'ত হয়তো, কিন্তু আমার আর তাতে ভয় কি?' আমার তো এ পথ দিয়ে চলার নিষেধ নেই?'

'তুমি—তুমি শাহ্‌জাদী নও?'

এতক্ষণে ওর হাতটা ছেড়ে দিয়ে কেমন এক রকমের স্খলিত ভগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করে আগা। প্রশ্ন তো নয়—মেহেরের মনে হয় আর্তনাদ ক'রে ওঠে। একটি মাত্র প্রশ্নে যে এতটা হতাশা ফুটে উঠতে পারে, মানসিক এতটা যন্ত্রণা প্রকাশ পায়—তা মেহের জানত না। তারও গলাটা ঠিক রাখা কঠিন হয়ে পড়ল, গলার কাছে কী একটা যেন ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল কান্নার মতো। একটা প্রবল দুর্বার ইচ্ছা হ'তে লাগল—ছুটে গিয়ে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে ওকে অভয় দেয়, বলে—'ভয় নেই গো, ভয় নেই—আমিই তোমার সেই আশমানের চাঁদ, আমিই শাহ্‌জাদী।'

কিন্তু তা হবে না। এত শীঘ্র পরিচয় দেওয়া হবে না। ওর ঐকান্তিকতা কতখানি, কতক্ষণ স্থায়ী এ আবেগ, বাজিয়ে দেখে নেওয়া দরকার। তা ছাড়াও বাধা আছে। জীবনের চেয়েও মর্যাদা বড়, সম্মান বড়। এত সহজে তা বিলিয়ে দেওয়া যায় না। আর, এত তাড়াই বা কি?

সে প্রাণপণে নিজের সদ্য-উদ্বেলিত হৃদয়াবেগ সম্বরণ ক'রে কঠিন বিদ্রূপশাণিত ক'রে তোলে কণ্ঠ, 'তোমার আশাও তো কম নয় দেখছি। তুমি ভেবেছিলে এতদিন যে, কোন শাহ্‌জাদী তোমার প্রেমে পড়েছেন?—এক দীনতম দীন বান্দার? কেন গলায় দেবার মতো দড়িরও কি অভাব তাঁদের?'

অভিভূত, আচ্ছন্নের মতো আবারও প্রশ্ন করে আগা, 'তুমি—তুমি সত্যিই শাহ্‌জাদী নও?'

'তা তুমি আমাকে অনায়াসে শাহ্‌জাদী ভাবতে পারো—আমি তোমার কাছে শাহ্‌জাদীর মতোই। আমার দামটাই বা খুব কম ভাবছ কেন? তোমার তুলনায় অনেক বেশী!'

'তা হয়তো বেশী, তা আমিও মানছি। চিরাগের দামও কম নয়, আঁধার রাতে সে আমাদের অনেক কাজে লাগে—কিন্তু তবু, যে সূর্য দেখেছে তার কি আর চিরাগে মন ভরে?'

কণ্ঠে একটা তিক্ততা ফুটে ওঠে, চাপবার চেষ্টা সত্ত্বেও। এই নিদারুণ হতাশা, এতবড় মর্মান্তিক আঘাতের পর এই অকরুণ বিদ্রূপ আরও অসহ্য বোধ হয়।

কিন্তু মেহেরও কম যায় না। সে-ই কি ইচ্ছা করলে গলায় তিক্ত সুর আনতে পারে না? সে বলে, 'সূর্যের রোশনীতে চোখ ধেঁধে যায় বাবুসাহেব, মানুষের সেদিকে চাইতে নেই। বেশী চাইলে অন্ধ হয়ে যেতে হয়—নিজের জগতের বাইরে চোখ দেবার শাস্তি ওটা। মানুষের কাছে চিরাগই ভাল, স্নিগ্ধ আলোয় দৃষ্টি বিশ্রাম পায়, চোখের জোর বজায় থাকে!'

'তা হয়তো থাকে। কিন্তু সুরযই মানুষের প্রাণ, সুরয না থাকলে এ দুনিয়ায় কেউ বাঁচত না। সুরযের দিকে চেয়ে চোখ ধেঁধে গেলেও সেইদিকেই চাইতে ইচ্ছা করে মানুষের—সুরয যে দেখেছে, সে রোশনাইতে যে মজেছে—তার চোখে চিরাগ কি জোনাকীর আলো কোন দিনই আলো বলে মনে হবে না!'

বুরখাপরা মূর্তিটা যেন অপমানে জ্বলে ওঠে, সেই আবছায়া আলোতেই মনে হয় আগার—রাগে সে কাঁপছে। মেহের আরও তিক্ত আরও কঠিন কণ্ঠে বলে, 'হ্যাঁ, মানুষের চোখে হয়তো চিরাগের আলো তেমন আর লাগে না। কিন্তু সে মানুষের চোখেই। তার আগে মানুষটারও মানুষ হওয়া দরকার। তুমি কি তেমনি মানুষ? কী দরের মানুষ তুমি এমন যে চিরাগের আলোকে আলো বলেই গ্রাহ্য করো না—সূর্যকে এনে ঘরে পুরতে চাও? আমি নিতান্ত জোনাকী নই, সামান্য চিরাগও নই

—পরিচয় হ'লে জানতে পারবে। তোমার চেয়ে অনেক বেশী দাম আমার। নোকরিতেও তোমার থেকে বড়। ঢের বেশী তন্‌খা পাই তোমার থেকে। আসলে আমারই ভুল হয়েছে—এত নিচে নামা আমার ঠিক হয় নি। সেধে কোন জিনিস ঘরে এলে তার কিম্মৎ কমে যায়। যেমন সেধে দিল দিতে এসেছিলুম, তেমনি অপমান হয়েছি। ঠিকই হয়েছে! উপযুক্ত শিক্ষা হয়েছে। একটা কথা মনে রেখো বাবুসাহেব, শাহী জেনানার বাঁদীরাও ভদ্রঘরের মেয়ে হয়, অন্তত খাশ বাঁদী যারা —বেগম কি শাহ্‌জাদীদের—তাদের অনেক বেছে তবে নিয়ে আসা হয়। গ্রাম্য চাষার ঘরের মেয়েরা এখানে কাজ পায় না!'

এত বলেও যেন আক্রোশ যায় না। রাগে ফুলতে থাকে বুরখাপরা মেয়েটি।

নিমেষে অনুতপ্ত হয়ে ওঠে আগা, 'আমাকে মাপ করো বিবি, সত্যিই আমার অন্যায় হয়ে গেছে ওভাবে বলা। আমার মতো সামান্য প্রাণী, আট টাকা তনখার বান্দাকে কেউ সেধে দিল দিতে আসবে, তা সে যেমন মেয়েই হোক—সে তো বান্দার পক্ষে কল্পনাতীত সৌভাগ্য।'

'ঠিক আছে। মিষ্টি কথা যে তুমি ঢের বানিয়ে গুছিয়ে বলতে পারো—তা তো আমার জানাই আছে। যাক—আমি বিদায় হয়ে যাচ্ছি, হয়তো মিছিমিছি বিরক্ত করেছি, অন্য একটা আশা মনে জাগিয়ে কষ্টের কারণ হয়েছি—সেজন্য ক্ষমা চাইছি। পার তো মাপ ক'রো। আর কখনও এমন বিরক্ত করতে আসব না, তুমি তোমার শাহ্‌জাদীর খোয়াব নিয়ে সুখে থাকো, নিশ্চিন্ত থাকো।'

সে বেশ অভিমান-ভরেই ফিরে যাবার জন্য উদ্যত হয়। কিন্তু দরজার দিকে ঘুরতে একটু বেশীই সময় নেয়—তার আগেই আগা আবার তার হাত-দুটো চেপে ধরে। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়—এখন আরও ভাল ক'রে লক্ষ্য করে—এত কোমল এত ভঙ্গুর—এক মুঠো ফুলের মতো নরম হাত দাসীর? সে খুব নরম গলায় বলে, 'রাগ ক'রো না। আমিও তো মানুষ, আমাকে একটু সময় দাও, ভুল বোঝার ধাক্কাটা সামলে নিতে। কিন্তু তুমি কি—তুমি কি তাহ'লে সত্যিই মেহের—মানে শাহ্‌জাদী মেহের-উন্নিসা নও?'

'ও!' অদ্ভুত একটা ভঙ্গী ক'রে বলে ওঠে মেহর, 'আশা এতদূর পৌঁছেছে তোমার! শাহ্‌জাদী মেহের! মর্কট হয়ে চাঁদে হাত দেবার শখ! তা ভাল। তবে একটা কথা চুপি চুপি শুনিয়ে দিই, খোদ শাহ্‌জাদা আবুবকর তাঁর পাণিপ্রার্থী। এমন কি—এই সিংহাসনের ভাবী মালিক যে, সেও শাহ্‌জাদী মেহেরকে পেলে কৃতার্থ হবে।...বেশ, বেশ। খুবই উঁচু আশা তোমার দেখছি!'

'আশা একটু উঁচু রাখাই ভাল নয় কি বিবিসাহেবা?'

'নিশ্চয়। নিশ্চয়। রাখবে বৈকি। মরদ হয়ে উঁচু আশা রাখবে না!...অবশ্য সেই সঙ্গে আর একটা আশাও থাকা দরকার বোধ হয়—শাহ্‌জাদীকে পেলে তাঁকে যাতে পুষতে পারো—সেইরকম একটা সঙ্গতির আশা রাখাও উচিত নয় কি? যাক গে, অত কথায় আমার দরকার নেই। এখন দয়া ক'রে আমাকে ছাড়, আমি শাহ্‌জাদী মেহের নই, তাঁর চেয়ে কম দরেরও কোন শাহ্‌জাদী নই—নিতান্তই তুচ্ছ নগণ্য বাঁদী। শাহ্‌জাদী মেহেরেরই বাঁদী।'

'ও—তুমি শাহ্‌জাদী মেহেরের বাঁদী! তোমার—তোমার নামটা জানতে পারি না?'

'নাম? আমার নামে জেনে কি হবে বাবুসাহেব? যে নাম জপমালা করেছ সেই

একটি নামই থাক না মাথায় মনে উজ্জ্বল হয়ে। একসঙ্গে এক মালায় দুই নাম জপ করা চলে কি?'

আসলে এই নামের প্রশনটার জন্য প্রস্তুত ছিল না। কথা কইতে কইতে দ্রুত মনে করার চেষ্টা করে একটা জুৎসই নাম।

'মাথায় মনে তো আছেই বিবি, কানেও থাক না সে আর একটা।'

'এ বাঁদীর নাম শিরীণ্।'

'বা, বেশ মিষ্টি নামটি তো তোমার। শিরীণ্! ভারী মিষ্টি নাম। কোথায় যেন একটা কিস্‌সাও শুনেছিলুম—মার মুখেই বোধ হয়—এক রাজকন্যা না রাজার বেগম শিরীণ্, আর এক মিস্ত্রী ফরহাদের মুহব্বতের কিস্‌সা। সত্যিই বেশ নাম তোমার শিরীণ্, তোমার চেহারা তো দেখতে দিলে না, মনে হচ্ছে তোমার সুরতের সঙ্গে মিলিয়েই এমন মিষ্টি নাম রেখেছিলেন তোমার বাবা-মা।'

'থাক্। আমার নাম মিষ্টিই হোক আর তেতোই হোক্—তোমার কাছে তো সবই সমান। এখন ছাড়ো—শাহ্‌জাদীর যদি কিছু দরকার হয়—খুঁজে না পেলে রাগ করবেন। না বলে এসেছি—'

'আর একটু—কয়েক লহমা একটু দাঁড়িয়ে যাও শিরীণ্।...আচ্ছা একটা কথা আমি কিছুতে বুঝতে পারছি না। তুমি বলছ তুমি বাঁদী—সেদিনের সে চিঠি কি তুমিই লিখেছিলে? না তোমার মালেকান কিম্বা আর কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলে?'

'বলতে পারি—যদি তোমার ঐ পদ্যটা কাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলে আগে বলো!'

লাল হয়ে ওঠে আগার মুখ। লজ্জায় শুধু নয়—আনন্দেও। পদ্যটা তা হ'লে ভালই হয়েছে মনে হয় ওর। সে বলে, 'ওটা আমারই লেখা—বিশ্বাস করো।'

'তুমি তো শুনেছি পাহাড়ী চাষার ছেলে! পাঠানদের তো লেখার হরপই নেই, অন্তত বেশির ভাগ পাঠান লিখতে পড়তে শেখে না। তুমি অমন একটা কবিতা লিখতে পারো—আর আমি বাদশার ঘরের বাঁদী হয়ে তোমায় তার একটা জবাব লিখতে পারি না? একটু আগেই তো বলেছি শাহীমহলের বাঁদী ভিখিরীর ঘর থেকে ধরে আনা হয় না!'

'তা বটে। মাপ করো আমাকে। কিন্তু শিরীণ্, সত্যিই বলছি, তোমার কথা-বার্তা শুনে আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না তুমি বাঁদী।'

'বিশ্বাস করবার দরকার কি? আমি তো তোমাকে সাধছি না বিশ্বাস করতে। তোমার যা খুশি ভাবো না আমাকে। তুমি আমাকে শাহ্‌জাদী ভাবলেই বা দোষ কি?'

'শিরীণ্—তোমার বুরখাটা একবার খুলবে? একটি বার?'

'না।'

'দ্যাখো—ঘর তো অন্ধকার। এদিকেও কেউ নেই। এ অন্ধকারেও একবার ঐ আবরণটা সরাতে পারো না—একবার?'

'দ্যাখো বাঁদী হ'লেও আমার একটা ইজ্জৎ আছে। তোমার ঘরে আসাই আমার ভুল হয়ে গেছে, নইলে তোমার এতদূর স্পর্ধা হ'ত না। তুমি—তুমি আমাকে মিথ্যা-বাদী ভাবছ? আমি শাহ্‌জাদী বাঁদীর পোশাকে তোমার সঙ্গে আশনাই করতে এসেছি—এই তোমার ধারণা? বাঃ, খুব চমৎকার ধারণা তো শাহ্‌জাদীদের সম্বন্ধে!'

'না, আজ আমার বরাতটাই খারাপ পড়েছে শিরীণ্, বারবারই আমার অপরাধ ঘটে যাচ্ছে।...আচ্ছা যাও, মিছিমিছি তোমাকে আটকে রাখব না। আমার মনের অবস্থা বুঝে আমাকে মাপ করো!'

চলে যাওয়াই উচিত এবার, এর পর আর কোনমতেই থাকা চলে না। তবু যেন সামান্য একটু ইতস্তত করে মেহের, আরও যে কথা বাকী থেকে যাচ্ছে তা বোঝে।

'আচ্ছা শিরীণ্'—আগাই আবার বলে, 'তুমি তো ভালবেসেছ, ভালবাসার কী যন্ত্রণা তা তো তুমি জানো—আমি সেই মুহব্বতের দোহাই দিয়ে বলছি, একটি ভিক্ষা দেবে আমাকে?'

'আমার কাছে চাইতে পারছ—লজ্জা করছে না তোমার?' স্থির অনাসক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে মেহের।

'মুহব্বত কি লজ্জা-সরম মানে শিরীণ্, তাহ'লে কি তুমি নিজে থেকে একটা বান্দার বান্দা আমার ঘরে আসতে পারতে?'

'হ্যাঁ, সেইটেই আমার সবচেয়ে বড় অন্যায়, বড় ভুল হয়ে গেছে। কে জানে কতকাল ধরে এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। বেশ বল কি ভিক্ষা—সম্ভব হ'লে দেব।'

'একবার—একটিবার শাহ্‌জাদী মেহেরকে দেখাবে আমাকে? কোন রকম ক'রে? শুধু চোখের দেখা দেখব একবার—দূর থেকে দেখব!'

'বেশ, কথাটা বলি শাহ্‌বেগমকে। তিনি কি বলেন, তাঁকে না ব'লে এ কাজ করার সাহস আমার নেই।'

'সর্বনাশ! না-না, ছি-ছি, এমন সর্বনাশ ক'রো না—দোহাই তোমার!'

'এত উঁচুতে যখন নজর দিয়েছ তখন সর্বনাশের ভয় করলে চলবে কেন বাবু-সাহেব? সূর্যের দিকে চাইবে অথচ ধাঁধা লাগবে না—এ কখনও হয়?'

তীক্ষ্ন বিদ্রূপ তীরের মতো এসে বেঁধে। আগা মাথা হেঁট করে কিন্তু অপ্রতিভ হয় না, 'আমার সর্বনাশের ভয় করছি না শিরীণ্, সর্বস্ব হারিয়ে যে পথের ভিখিরী হয়েছে তার আর কত সর্বনাশ হবে? সেজন্য নয়—শাহ্‌বেগমের কানে একথা গেলে তিনি হয়তো শাহ্‌জাদীর ওপর নারাজ হবেন, হয়তো মিছিমিছি এর মধ্যে তাঁরও কোন হাত আছে মনে ক'রে তিরস্কার করবেন—সে আমি সহ্য করতে পারব না। আমার দ্বারা শাহ্‌জাদী মেহেরের কোন অনিষ্ট হবার আগে আমি যেন মরে যাই—সেও ভাল।'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে মেহের। আবারও কী যেন একটা গলার কাছে ঠেলে উঠেছিল, সেটাকে সামলে নেয়। তারপর যেন চুপি চুপি বেদনাহত কণ্ঠে বলে, 'বেশ—চেষ্টা ক'রে দেখব। যদি সম্ভব হয় কাল এই সময় এসে খবর দিয়ে যাব।'

এবার সে সত্যিই চ'লে যায়। সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে নিজের ঘরে পৌঁছে সেও আজ পাগলের মতো কাণ্ডকারখানা বাধিয়ে তোলে। হেসে কেঁদে, হাতের যেখানটা অনেকক্ষণ চেপে ধরেছিল আগা—তার হাতের চাপে ঘাম জমে গিয়েছিল এই ঠান্ডাতেও—সেইখানটায় বার বার চুমো খেয়ে নিজেকেই যেন নিজে অস্থির ক'রে তোলে। আগাকে পরীক্ষা করতে গিয়েছিল সে—কিন্তু মনে মনে আশঙ্কার অন্ত ছিল না। আগা যে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে তাতে যেন কৃতার্থ হয়ে গেছে পরীক্ষকই।

মেহেরেরও খাওয়া হয় না সেদিন। এর পর তুচ্ছ খাওয়ার কথা কে মনে রাখে?

॥ এগারো ॥

সে দিনটা যে কী ক'রে কাটে আগার, তা তার অন্তর্যামীই জানেন। মনে হ'তে থাকে যে সময়টা যদি কোনরকমে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া যেত তো—জান কবুল ক'রেও সে চেষ্টা করত সে। মনে হয় ঘড়ির কাঁটা থেকে শুরু ক'রে আকাশের সূর্য পর্যন্ত তার সঙ্গে শত্রুতা করছে আজ।

ছুটির পর পড়তে যায় সে নামমাত্র। না পড়ার কোন কারণ নেই, সময় এখনও যথেষ্ট হাতে আছে—তবু মাথা ধরার ছুতো ক'রে একটু পরেই উঠে পড়ে। হাবিলদার বন্ধু রাগ ক'রে বলে, 'এ তোমার মাথাধরা নয় বন্ধু, এ মনধরা! মনটাই ধরা পড়েছে কোথাও। অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য করছি, কোথাও একটা বড় গোল বাধিয়ে বসে আছ মনে হচ্ছে। তোমার আর পড়াশুনো হবে না—মিছিমিছি আর কেন সময় নষ্ট করা, এ ঠাট্ তুলে দাও!'

হাসিমুখে সব তিরস্কার সহ্য ক'রে চলে আসে আগা। যতই যা বলুক বন্ধু, আজ আর সে কিতাব-খাতা নিয়ে বসে থাকতে পারবে না।...

খাওয়াও হয় না ভাল ক'রে। তাড়াতাড়ি খেতে গিয়ে রুটির ডেলা গলায় বাধে। বার বার জল খেতে হয়। খানিক পরে বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ে। নিজেই বোঝে এটা নির্বুদ্ধিতা, রাত গভীর না হ'লে, ওর ঘরের সামনের চলন নির্জন না হ'লে আসতে পারবে না শিরীণ্, তবু যেন দেরি করতে পারে না কিছুতেই। কিসের একটা অস্থিরতা তাকে ক্রমাগত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়—

তারপর শুরু হয় ঘরে ফিরে সেই অন্তহীন সীমাহীন প্রতীক্ষা। একবার চারপাইতে গিয়ে বসে, আর একবার দোরের কাছে এসে দাঁড়ায়। শেষে অনেক রাত্রে যখন আর পাগল হয়ে ছুটোছুটি করতে মাত্র বাকী আছে, তখন শিরীণ্ এল। ধীর শান্ত ভাব তার, মনে হয়—দেখা সম্ভব হ'লে দেখতে পেত—মুখও গম্ভীর।

নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল সে। আগার বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। বুকের মধ্যে এক ঝলক রক্ত উঠল ছলাৎ ক'রে। তবে কি ব্যর্থ হয়েছে শিরীণ্?

সে ছুটে এসে ওর হাত ধরতে গেল—আজ শিরীণের হাত বুরখার মধ্যে, ধরতে পারল না। উদ্যত হাত দুটো পরস্পরের সঙ্গে চেপে ধরে ব্যাকুল হয়ে বলল, 'বলো বলো শিরীণ্—তোমার দুটি পায়ে পড়ি, বলো—'

'না, দেখা হবে না। শাহ্‌জাদীকে অনেক ক'রে বলেছি—তিনি কিছুতে রাজী নন। বেশী বলাতে আমাকে বরখাস্ত করার ভয় দেখালেন!'

'রাজী নন্? দেখা হবে না?' আস্তে আস্তে ভগ্নকণ্ঠে উচ্চারণ করে আগা কথাগুলো।

'দেখা হবে না মানে তুমি দেখতে পাবে না। তবে—'

'তবে? বল বল—তবে কি? কতটুকু দয়া করতে রাজী হয়েছেন তিনি?'

'তুমি যদি আমার সঙ্গে আমার ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করো—তাঁর সঙ্গে কথা কইতে পার দু-একটা—যদি চাও অবশ্য। মাঝের দরজা ভেজানো থাকবে—তিনি ওপার থেকে কথা কইবেন। এটুকু অনুগ্রহ করতে রাজী হয়েছেন তিনি।'

'শুধু কথা! একবার একটুখানির জন্যও দেখাতে পারো না তাঁকে?'

'না—সে সম্ভব নয়, বলেইছি তো।'

তারপরই ঈষৎ অসহিষ্ণু এবং যেন বিরক্তভাবে বলে ওঠে, 'তবে আমি গিয়ে বলি যে অত সামান্যতে তোমার মন উঠবে না—তাঁর আর এ ব্যাপার নিয়ে হাঙ্গামা করার দরকার নেই।'

'না না না, কে বললে তা? আমি ভিখিরী, ভিখিরীর কি আর বাছবিচারের অধিকার আছে?'

'বেশ। ভাল কথা। তবে কাল এই সময়ে তৈরী হয়ে থেকো। আমি এসে ডেকে নিয়ে যাব।'

সে ফিরে যেতে উদ্যত হয়।

স্থান কাল পাত্র সব ভুলে আগা বুরখার ওপর থেকে তার কাঁধ দুটোই চেপে ধরে, 'আর একটুখানি দাঁড়াও শিরীণ্, আমার যে সব কথা সারা হ'ল না এখনও!'

'তোমার ও কথা অনন্ত কালেও সারা হবে না জানি। কিন্তু যখন-তখন গায়ে হাত দাও কেন বল তো? আমরা তুচ্ছ বাঁদী হ'তে পারি তাই বলে বাজারের পচা সওদার মতো পথে পড়ে নেই!'

'ছি ছি! কি যে বলো!...তুমি বড় নিষ্ঠুর শিরীণ্!' তাড়াতাড়ি কাঁধ ছেড়ে দেয় সে।

'তা বটে। তোমার মুখেই কথাটা বড় সুন্দর মানায় আগা হোসেন!'

আগা লজ্জায় মাথা হেঁট করে। গাঢ় কণ্ঠে অনুতপ্ত ভাবে বলে, 'আমার অপরাধের শেষ নেই সত্যিই।...তোমার মতো মানুষ হয় না, এরকম আত্মত্যাগ যে করতে পারে, এরকম চিত্তদমন—তাকে পেলে যে কোন লোক—তা সে যত বড়ই হোক না কেন, ধন্য কৃতার্থ হয়ে যাবে। যদি, যদি তোমার সঙ্গে আমার আগে আলাপ হ'ত শিরীণ্—তা'হলে তোমার এ অনুগ্রহ আমি মাথায় তুলে নিতাম, কেনা গোলাম হয়ে থাকতাম তোমার! কিন্তু মুহব্বৎ অন্ধ তা তো তুমি জানই শিরীণ্—আর বড় স্বার্থপরও।'

'জানি, কিন্তু সকলকার সব মুহব্বৎই কি স্বার্থপর বাবুসাহেব? নিজে একটু ভেবে দেখো—'

এই বলে আর উত্তর প্রত্যুত্তরের অবকাশ না দিয়েই বেরিয়ে আসে শিরীণ্।

ওপরে নিজের ঘরে পেঁাছে শিরীণের খোলসটাকে খুলে ফেলতে ফেলতে বেচারী শিরীণের জন্য একটা বেদনাই অনুভব করে যেন মেহের। নিখুঁত অভিনয় করতে করতে শিরীণ্ যেন একটা সত্যকার স্বতন্ত্র সত্তাতে পরিণত হয়ে গেছে তার কাছে।

বেচারী শিরীণ্। যদি সত্যিই সে শিরীণ্ হ'ত—এমন ভাবে এতটা আত্মত্যাগ করতে পারত না সে কিছুতেই।

আবারও সেই প্রতীক্ষা। আজ আরও কণ্টকর, আরও দুর্বিষহ। এতদিনের আশা আজ হয়তো আংশিক ফলবতী হবে—আংশিক সিদ্ধি মিলবে সুদুশ্চর তপস্যার। দেখা না পাক, কাছে পাবে। সামান্য একটা কৃত্রিম ব্যবধানের এপার-ওপার। কথা শুনবে তার মানসী প্রিয়ার, তার আশমানের চাঁদ-এর। কথা শোনাতেও পারবে। নিবেদন করতে পারবে তার বুকভরা এই ঐকান্তিক প্রেম।

তার পর—যদি তার বুকের আগুন দিয়ে গলাতে পারে সে তুষার-কাঠিন্য, তার এই আকুতিতে যদি আসন টলে সে দেবতার, তার মর্মন্তুদ যন্ত্রণা দেখে যদি দয়া হয় তাঁর—তাহ'লে সামান্য ব্যবধান সরাতে কতক্ষণ?

তিনি নারাজ হবেন? রাগ করবেন? বোধ হয় না। তিনি ভালবাসতে না পারেন, ওর ভালবাসা ফিরিয়ে দিতে না পারেন—নারাজ হবেন কেন? পূজা পেলে কি কোন দেবতা বিরূপ হন?...

অবশেষে এক সময় সেদিনের সূর্য পাটে বসে সত্যি সত্যিই। কিল্লার প্রাঙ্গণে ছায়াকে দীর্ঘতর ক'রে দিনান্তের লাল আলো লাহোরী দরওয়াজার ওপরকার ছোট ছোট গম্বুজগুলোর মাথায় গিয়ে পৌঁছয়। আগা অধীর আগ্রহে চেয়ে থাকে রহমতের আসবার পথের দিকে। আজ থেকে দিনের পালা ফুরোল তার, কাল থেকে রাতে পাহারা দিতে হবে। তা হোক, কালকের কথা কাল। আজকের দিনটার কথাই সে শুধু ভাববে এখন। এই দিনই তার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কিন্তু রহমৎ এসে পৌঁছবার আগেই বাদশার খাবাস এসে পৌঁছয়।

বাদশা এখনই ডাকছেন তাকে! জলদি!

আজই এই অসময়ে বাদশার প্রয়োজন পড়ল তাকে! আর একটু পরে হ'লেই তো স'রে পড়তে পারত সে!

হয়তো সামান্য কিছু প্রয়োজন, এখনই কাজটা মিটিয়ে ফেলতে পারবে—হয়তো রহমতের এখনও হাজিরার সময় হয় নি ব'লেই তাকে ডেকেছেন—কিন্তু কে জানে কেন আগার মনটা ছাঁৎ ক'রে ওঠে। কে যেন বলে ওঠে তার মনের মধ্যে—সাধারণ ডাক এটা নয়, একটা কিছু বেশী রকমের প্রয়োজন আছে। আর তা খুব সহজে মিটবেও না।

ভেতরে গিয়ে দেখল বাদশা তাঁর অভ্যস্ত ভঙ্গীতে সেই হাতীর দাঁতের কাজ-করা কাঠের চারপাইটাতে স্তূপাকার কয়েকটা বালিশ ঠেস দিয়ে বসে আছেন। কাছে শুধু হেকিম সাহেব দাঁড়িয়ে—আর কেউ নেই। বাদশা এই সময়টাতে এমনিভাবেই বসে থাকেন, বহুদিন দেখল এর মধ্যে আগা, বিশ্রাম করেন কিম্বা কবিতার চরণ ভাবেন। হাতে ফরসীটাও তেমনি ধরা আছে—তবে টানেন নি অনেকক্ষণ, সেটা বুঝতে পারল চিলমটার দিকে চেয়ে—নিভে ছাই হয়ে গেছে, নইলে তাওয়ার পাশ দিয়ে ধোঁওয়া উঠত অল্প অল্প।

হাতে নল ধরা, অথচ বহুক্ষণ টান দেন নি বাদশা, তার মানে কিছু চিন্তার কারণ ঘটেছে। এটা নতুন, কারণ আগা শুনেছে, শাহ্জাদা ফকীরুদ্দীনের মৃত্যুর পর বাদশা একেবারে যেন সব ব্যাপারে নির্লিপ্ত হয়ে গেছেন, ঘুড়ি ওড়ানো আর কবিতা লেখা—এই নিয়েই থাকেন বেশির ভাগ।

চিন্তার কারণ আছে সেটা বুঝেছে আরও একটা ব্যাপারে।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে কানে গিয়েছিল বাদশা বলছেন, 'না আহ্সানউল্লা, এসব আমিও ভাল বুঝছি না। এ আগুন নিয়ে খেলা। যে খেলছে সেও মরবে—আমাদেরও মারবে। আর কটা দিনই বা বাকী আছে আমার মাটিতে যেতে—এই কটা দিন ধৈর্য ধ'রে থাকতে বলো। তার পর যা হবার হোক গে। সে তো আমি দেখতে আসব না!'

আগার ঘরে ঢোকাটা বোধহয় বাদশা লক্ষ্য করেন নি, আরও তিনি কি বলতে যাচ্ছিলেন, আহ্সানউল্লা একটু অর্থপূর্ণ মৃদু কেশে তাঁকে সতর্ক ক'রে দিলেন।

আগা অভিবাদন ক'রে নতমস্তকে দাঁড়াল আদেশের অপেক্ষায়। এই রীতি কেন ডাকছেন, কী কাজ—বাদশাকে প্রশ্ন করা চলে না। তাঁর মর্জি ও খুশির অপেক্ষা করতে হয়। অনেক সময় নবাব-বাদশারা ভুলেও যান কোন্ কর্মচারী বা কোন্ বান্দাকে কখন ডেকেছিলেন, কেন ডেকেছিলেন।

যাই হোক, হেকিমসাহেবের ইঙ্গিতে ওকে দেখেই আজ বাদশা জানালেন তাঁর খুশি, বললেন, 'তোমাকে একটা খুব জরুরী কাজে ডেকেছি আগা। খুব জরুরী আর গোপনীয়। বিশ্বাসী লোক, যাকে সত্যি-সত্যিই বিশ্বাসী বলে জানি, তাকে ছাড়া চলবে না। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি, হয়ত এ কিল্লার হাওয়া এখনো গায়ে লাগে নি তোমার। আমাদের হেকিমসাহেবও তোমার নাম করলেন, বললেন, ও সাচ্চা ছেলে, জান গেলেও বেইমানি করবে না।'

হেকিমসাহেব! হেকিমসাহেব তার নাম সুপারিশ করলেন। আগার বিস্ময়ের সীমা রইল না। অথচ তার কেমন একটা ধারণা ছিল এতদিন যে, হেকিমসাহেব তার উপর খুব প্রসন্ন নন।

মাথা হেঁট ক'রে আগা আবার অভিবাদন করল। এটা একই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং আদেশ প্রার্থনা।

বাদশা বললেন, 'তোমাকে একটি খৎ দেব। জরুরী খৎ। একজনকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। কী খৎ, কী লেখা আছে, কে পাঠাচ্ছে যেন কেউ না জানতে পারে। কেউ না—বুঝেছ? যাকে দেবার শুধু তার হাতেই পৌঁছে দেবে—তোমার জান থাকতে এ খৎ না আর কারও হাতে পড়ে। এটা নিয়ে তোমাকে এখনই রওনা দিতে হবে। ভাল ঘোড়া বেছে নিও আস্তাবল থেকে—যেটা খুশী, টেনে গেলে আশা করছি এক ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যেতে পারবে। এখন এই সাড়ে পাঁচটা বেলা, বেরোতে আধ ঘণ্টা। সাতটার মধ্যে সেখানে পৌঁছানো উচিত। সে লোক সাড়ে সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে সেখানে, মনে রেখো।'

'কিল্লার বাইরে?' বিস্মিত আগার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় প্রশ্নটা।

'হ্যাঁ—কিল্লার বাইরে। এখানে হ'লে তো আমিই হাতে ক'রে দিতে পারতাম।' এবারে কথা বলেন হেকিমসাহেব, 'বিশেষ প্রয়োজন অথচ বিশ্বাসী লোক চাই—তুমি ছাড়া এ ভার দেবার মতো কাউকে খুঁজে পেলাম না। আর তুমি এমন বন্দী হয়েই বা কতদিন থাকবে। তোমার দেশের লোকেরা কি আর এখনও বসে আছে তোমার জন্যে, ঘরের খেয়ে কতকাল এমন বনের মোষ তাড়াবে তারা? তাছাড়া—আমি, মানে বাদশাও তোমার কথা ভেবে রেখেছেন—তোমাকে এখানকার সান্ত্রীর পোশাক দিতে বলা হয়েছে, পাগড়ি সুদ্ধ। চাও তো একটা বন্দুকও নিয়ে যেতে পার—বন্দুক ছুঁড়তে জানো তো? কিম্বা তলোয়ার—যা খুশী!'

হাসি পেল আগার। হাসি পেল দু' কারণেই। ওর দেশের লোক যারা অতদূর থেকে এতদিন ধরে তার পিছু পিছু এসেছে—তারা দুমাসেই হতাশ হয়ে ফিরে যাবে—এমন কথা কি ক'রে ভাবতে পারলেন উনি! আর হাসি পেল বন্দুক ছোঁড়ার কথা শুনে। হেকিমসাহেবের গোঁফের মধ্য থেকে ঐ যে একগাছা পাকা চুল উঁচু হয়ে আছে, ওঁর গোঁফকে বিন্দুমাত্র বিপর্যস্ত না করে গুলি দিয়ে ঐ চুল উড়িয়ে দিতে পারে সে এখনই।

মনে মনে যত হাসিই পাক—মুখে সে হাসল না। নতমুখেই শুধু প্রশ্ন করল, 'কোথায় যেতে হবে?'

হেকিমসাহেব খুশী হলেন, 'এই তো, আমি জানতুম আগা কাজের ছেলে। শোন, তুমি লাহোরী ফটক দিয়ে বেরোবার চেষ্টা করবে না। ওদিকে বড় ভীড়, একেবারে বাজারের মধ্যে গিয়ে পড়বে। বেরোবে দিল্লী দরওয়াজা দিয়ে। নদীর ধারে গিয়ে পনটুন পুল পেরিয়ে দরিয়ার ওপারে পেঁছিবে। বরাবর নদীর ধার দিয়ে এগিয়ে এসে দেখবে আমাদের সেলিমগড়ের উলটো দিকে একটা রাস্তা সোজা চলে গিয়েছে উত্তর দিকে। মীরাটের পথ ওটা। ঐ পথে কিছুদূর গেলেই পাশাপাশি দুটো গাঁ পড়ে। একটা গাজীমণ্ডী আর একটা রজৌলি। দুটো গাঁয়ের মাঝে একটা হাটতলা আছে। আজ হাটবার নয়—বিশেষতঃ সন্ধ্যের সময়, ওখানটা খালিই থাকবে। হাটের সামনে-বরাবর একটা বড় 'পিপল' গাছ আছে। তার নিচে একটা লোক একটা ফুলের ডালা সামনে নিয়ে বসে থাকবে। দেখলে ফুলওয়ালা বলেই মনে হবে। যেন ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করছে। তাকে জিজ্ঞাসা করবে, পদ্মফুল আছে? সে উত্তর দেবে, আছে, তবে অসময়ের পদ্ম অনেক দাম লাগবে। তুমি বলবে, তাজা ফুল হ'লে দামের জন্য আটকাবে না—তখন সে বলবে, আমার এ পদ্ম চিরদিন তাজা। সে একটা সোলার পদ্ম বার ক'রে দেখাবে। তুমি তাকেই খৎটা দিয়ে চলে আসবে। এই নাও খৎ, বাদশা হাতে ক'রেই দিচ্ছেন। আর এই আস্তাবলের উপর হুকুমনামা ঘোড়ার, আর এই হুকুমনামা সান্ত্রীর পোশাকের। পোশাকের ঘরে দেখালেই যা খুশী বেছে নিতে দেবে। এতেই লিখে দেওয়া আছে—বন্দুক আর তলোয়ারের কথা।'

এসব কোন কথাই যেন মাথায় ঢুকছিল না আগার। একটি শব্দ কানের কাছে ঝন্‌ন্‌ ক'রে উঠেছিল। তারই রেশ কানের মধ্যে বেজেই চলেছে সেই তখন থেকে। গাজীমণ্ডী! গাজীমণ্ডীতেই যেতে হবে তাকে! সত্যি এ আল্লার অনুগ্রহ! এ সুযোগ ছেড়ে দেবে কে?

কলের পুতুলের মতো বাদশার হাত থেকে হুকুমনামা দুটো নেয় সে। তখনই চলে যাওয়া উচিত, কিন্তু তবু একটু ইতস্ততঃ করছে দেখে বাদশাই প্রশ্ন করলেন, 'আর কিছু বলবে?'

তাঁর সদয় কণ্ঠে ভরসা পেল আগা। প্রশ্ন করল, 'পেঁছিব আমি সাতটার মধ্যে যেমন ক'রেই হোক কিন্তু ফেরার সময় যদি এক আধ ঘণ্টা দেরি হয়, দোষ কিছু হবে?'

'কিছু না, সে তোমার মর্জি।'

কিন্তু হেকিমসাহেব ভ্রূকুটি করলেন, 'কেন বল তো? কোথায় যাবে তুমি?'

'গাজীমণ্ডীতে। ঐখানেই আমার মা-বোনকে একজনের বাড়িতে রেখে এসেছিলুম। তারপর আর এতদিন কোন খোঁজ পাই নি। যদি নারাজ না হন একটু খবর নিয়ে আসব।'

'গাজীমণ্ডীতে সেই মা-বোনকে ফেলে এসেছ, কোন খবর নিতে পার নি এতদিন?' বাদশা বলে ওঠেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয় যাবে। আমার কাজ করে দিয়েই তোমার ছুটি। কি কাজে এসেছে, সেইটুকু শুধু কাউকে না বললেই হল।'

হেকিমসাহেবও সতর্ক ক'রে দেন, 'হ্যাঁ, খুব সাবধান। এই খতের কথা কেউ না টের পায়। কাউকে বলবে না—যত বিশ্বাসী আর আপনজন হোক।'

মাথা হেলিয়ে আগা বলে, 'মনে থাকবে সে কথা।'

আগা চলে আসছে, হেকিমসাহেব বললেন, 'খৎটা কোথায় নিলে?'

যেন আকাশ থেকে পড়ে আগা, 'খৎ? কি খৎ? কোন্ খতের কথা বলছেন?'

অসহিষ্ণু হেকিমসাহেব বলেন, 'বাঃ, এইমাত্র তোমাকে যেটা দিলুম! এরই মধ্যে হারিয়ে ফেললে নাকি?'

আগা তেমনি নির্বিকার মুখে বলল, 'আপনি কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না জনাব।'

হেকিমসাহেবের মুখ অন্ধকার হয়ে উঠছিল কিন্তু বৃদ্ধ বাদশা হেসে উঠলেন হাঃ হাঃ ক'রে।

'বহুৎ আচ্ছা! সাবাস বেটা! এই তো চাই! কাউকে বলবে না ও, বুঝতে পারছ না আহ্সানউল্লা, এখান থেকেই মহড়া দিয়ে নিল তাই!'

আপন মনেই হাসতে থাকেন বাদশা। তারিফের হাসি। হেকিমসাহেব যে বোকা বনে গেছেন তাতে একটু মজাও বোধ হয়েছে হয়ত তাঁর। বুড়োকেই সকলে বোকা ভাবে, এখন বুঝুক আহ্সানউল্লা!

আগা আর একদফা অভিবাদন ক'রে বেরিয়ে আসে।

বাইরে বেরিয়ে এল আগা অভিভূত, আচ্ছন্নের মতো। এতক্ষণ অতিকষ্টে যেন নিজের অনুভূতিগুলোকে লাগাম টেনে বশে রেখেছিল, এবার তারা ওকে দিশাহারা ক'রে তুলল।

এতকাল পরে মুক্তি, এতকাল পরে বাইরের মুখ দেখতে পাবে।

এতকাল পরে খবর পাবে মা-বোনের। কী খবর পাবে তা কে জানে। তবু এই অসহনীয় নীরবতার থেকে, নিরন্তর নানা সংশয় এবং অমঙ্গল আশঙ্কায় ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার থেকে মন্দ সংবাদ পাওয়াও ভাল। তবু সেটা সংবাদ।

অধীর আগ্রহে ও উত্তেজনায় বুক কাঁপে আগার। তাড়াতাড়ি করা দরকার, খুব তাড়াতাড়ি, নইলে ঠিক সময়ে পেঁছিতে পারবে না। তার চেয়েও বড় কথা, ঠিক সময়ে ফিরতে পারবে না। কিন্তু হাত পা যেন অবশ হয়ে গেছে তার। ছুটোছুটি করবে কে? সমস্ত দেহে একটা কাঁপন অনুভব করছে—আগ্রহে আর আশঙ্কায়। কী দেখবে কে জানে। কী নিদারুণ দুঃসংবাদ অপেক্ষা ক'রে আছে সেখানে—

আশ্চর্য এই, নিজের বিপদের কথা বিশেষ ভাবল না সে। ঘোড়া আর হাতিয়ার পেয়েছে, এবার যে কোন বিপদের অন্ততঃ মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে। তাছাড়া বিপদে পড়লে তার যে চলবে না, মা-বোনের কাছে পেঁছিতে হবে--এখানে ফিরে আসতে হবে। দশটার মধ্যে ফিরতেই হবে তাকে।

শুধু যদি খবরটা একটু দিয়ে যেতে পারত!

কিন্তু কোন উপায়ই যে নেই দেবার। কোথায় কোন মহলে থাকে শিরীণ্—তার খোঁজ করতে গেলেও লোকে সন্দেহ করবে—জানাজানি গা-টেপাটেপি, ফিস্ফিস্। আর কাকে দিয়েই বা খোঁজ করাবে। জানে তো এক রাবেয়ার নাম—নতুন পাতানো বোন সে তার, মধ্যে দিন দুই এসে ভাইয়ার খবর নিয়েও গেছে, গোপনে দু'টো লাড্ডু খাইয়ে গেছে একদিন—সান্ত্রীদের বললে তাকে হয়ত ডাকিয়ে দিতে পারে, তাতে কেউ কিছু সন্দেহও করবে না। কিন্তু পেটে কথা থাকবে, সে মানুষ নয় রাবেয়া। বিশেষতঃ অপর একজন বাঁদীর প্রতি পক্ষপাতের প্রশ্ন যেখানে, সেখানে অতটা বিশ্বাস করা যায় না।

আর সময়ই বা কোথায়? এক জায়গায় পোশাক, এক জায়গায় হাতিয়ার আর এক জায়গায় ঘোড়া। এই সব নিতে নিতেই সময় চলে গেল তার—আধ-ঘণ্টায় হয়ে

উঠল না কিছুতেই। যখন সে শেষ পর্যন্ত দিল্লী দরওয়াজা দিয়ে বেরোল তখনই প্রায় সাড়ে ছ'টা বাজে। ফটক পার হ'তে হ'তে আড়ে দেখে নিল সে, এক অপরিচিত পাঠান উদাসীন ভাবে ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে যেন ফটকের কারুকার্য লক্ষ্য করছে। আর একবার হাসি পেল তার, হেকিমসাহেবের আশ্বাসের কথা মনে পড়ে। কিন্তু সে ইতস্ততঃ করল না একটিবারও, সোজা প্রায় পাঠানটার পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল। কিল্লার সিপাহী কি কাজে যাচ্ছে—দৃশ্যটা এতই সাধারণ যে পাঠান ভাল ক'রে দেখলও না ওর মুখের দিকে চেয়ে। ঐ জমকালো সিপাহীর পোশাকের মধ্যে নিতান্ত একজন নগণ্য নফর যাচ্ছে তা ভাববেই বা কি ক'রে সে! তাছাড়া তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। ফটকে ঝোলানো যে বড় তেলের আলোটা জ্বলছে তাতে বরং আলো-আঁধারি হয়, ভাল ক'রে কিছুই দেখা যায় না।

ওরা যখন কিল্লাতে পাহারা রেখেছে তখন বাইরে আর ভয় নেই। দেখতে দেখতে পন্‌টুন্* পুল পেরিয়ে ওপারে গিয়ে পড়ল আগা। ঘোড়া নিজে দেখে নিয়েছে, ছোটখাটো অথচ তেজী আরবী ঘোড়া, এক ঘণ্টার পথ আধঘণ্টাতেই মেরে দিতে পারবে। কাজ সেরে, ওদের খবর নিয়েও যথাসময়ে ফিরতে পারবে সে। তবু জোরে যাওয়াই ভাল। অপেক্ষাকৃত নির্জন পথে এসে সে প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

আসল অধীরতা তার অন্য কারণে। দু'টি আবেগের ভিন্নমুখী আকর্ষণে সে যেন একটু অপ্রকৃতিস্থও। ওদিকে মা-বোন—এদিকে তার স্বপ্নলোকবাসিনী শাহ্‌জাদী। কোন আকর্ষণই কম নয়। কতদিন মা-বোনের খবর পায় নি। তারা বেঁচে আছে তো? বেঁচে থাকলেও—ওখানে যদি না থাকে? ভরসা এক দিল মহম্মদ। যদি ওরা প্রাণে বেঁচে থাকে—সে দিল মহম্মদের দয়াতেই আছে। দিল মহম্মদের ঋণ জীবনে শোধ করতে পারবে না সে।

আর কতদূর? ঠিক পথে যাচ্ছে তো? সন্দেহ হয় একবার।

না, ঠিকই যাচ্ছে। অন্ধকার রাত কিন্তু পথ একেবারে অজানা নয়। এই পথেই একদিন এসেছে সে। তাছাড়াও যখন মা-বোনের চিন্তা অসহ্য হয়ে পড়ত, এক একদিন কিল্লার পাঁচিলে উঠে কিম্বা সেলিমগড়ের ঐ উঁচু গম্বুজটা থেকে এই পথের দিকে চেয়ে থাকত। মনে হ'ত এই পথেই খানিকটা গেলে তাদের দেখা পাবে।

আজ সেই পথের দিকে চেয়ে থাকাটা সার্থক হ'ল।

সোজা রাস্তা। নক্ষত্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সে।

মেহের কিন্তু এসবের বিন্দুবিসর্গও জানতে পারে নি। এত কাণ্ড হয়ে গেছে, আগা কিল্লার বাইরে চলে গেছে—কিছুই টের পায় নি সে। পাওয়া সম্ভবও নয়। কে আর তাকে সে খবর দেবে? বাদশার কাছে গেলে নানারকম টুকিটাকি খবর দেন তিনি, কিন্তু আজকাল তাঁকে নিরিবিলি পাওয়াই মুশকিল হয়ে উঠেছে। জেনানী মহলে থাকবে শাহ্‌বেগম আর বাদশার নিজের মহলে থাকবে হেকিমটা—দিনরাতই যেন তাঁকে ঘিরে থাকে আজকাল। দুটো কথাই বলা হয় না নানার সঙ্গে। ওরা কেউই মেহেরের উপর প্রসন্ন নয়, তা মেহের জানে, সেই জন্যই আরও যেতে ইচ্ছা করে না ওদের সামনে।

*পরপর নৌকো সাজিয়ে তার ওপর তৈরী সাময়িক পুল, যা বর্ষার জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নেওয়া হয়।

আরও একটা কারণ হয়েছে ইদানীং বাদশাকে এড়িয়ে যাবার। কিছুদিন ধরেই এটা হয়েছে। নির্জনে কাছে পেলেই বাদশা কেমন যেন ভ্রূ কুঁচকে তাকান ওর দিকে, যেন কী একটা ভাবান্তর লক্ষ্য করেন ওর মধ্যে। মেহেরের সেটা ভাল লাগে না। একটা অস্বস্তি বোধ করে। বৃদ্ধ বাদশাকে যতটা বোকা-বোকা উদাসীন ভাবে লোকে —ততটা আদৌ নয়। উনি অনেক কিছুই বোঝেন। মেহেরের মনে হয় ওর মনের রহস্যটাও আঁচ করতে পারেন কতকটা—আর সেই জন্যে চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন।

সেদিন অবশ্য কারও কাছে যাবার মতো মনের অবস্থাও ছিল না। কথাবার্তা—বিশেষত অর্থহীন বাজে কথা কওয়া তো আরও অসহ্য। কারও সঙ্গেই ভাল লাগছে না ওর। কারণ নিজেকে নিয়েই সে যথেষ্ট বিব্রত। নিজেরই সৃষ্ট দুঃসাহসিকতার উত্তেজনা তাকে একটা নেশার মতো পেয়ে বসেছে যেন। সে তাইতেই বুঁদ হয়ে থাকতে চায়। রাত্রে দেখা হ'লে আগা কি বলবে আর সে তার কি জবাব দেবে—এই কথাগুলো অবিরাম মনে মনে গড়ে আর ভাঙ্গে। সেই চিন্তাতেই থাকতে ভাল লাগে তার। যত সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে ততই উত্তেজনা বাড়ে। ক্রমশঃ অস্থির হয়ে ওঠে। ভয় করে বিষম। একই সঙ্গে শিরীণ ও মেহেরের ভূমিকায় কথা বলা—পারবে কি? যদি না পারে? যদি ধরা পড়ে যায়? ছি ছি, কি লজ্জা!

ঘোরতর অনুতাপ হয় সেই ভয়ের সময়গুলোয়। না, এতটা বাড়াবাড়ি এতটা দুঃসাহস প্রকাশ করতে যাওয়া ঠিক হয় নি। কথাবার্তার সময় যদি কেউ এসে যায়? অতরাত্রে কেউ আসে না এদিকে—কিন্তু যদিই আসে, কারও কোন প্রয়োজনে?

আবার ভাবে—এতটা এগিয়ে লাভই বা কি হ'ল? ওদের মিলন সম্ভব হবে কি কোনদিন? পদবী, সামাজিক মর্যাদা এবং আর্থিক অবস্থার দুস্তর ব্যবধান দু'-জনের মধ্যে। মিছিমিছি ও বেচারীর মনে একটা মিথ্যা আশা জাগিয়ে দুঃখকে দুঃসহ ক'রে তোলা—

এমনি এলোমেলো অসম্বন্ধ ভাবনার মধ্য দিয়ে পর পর ক'য়কটা ঘণ্টা বেজে যায় ঘড়িতে। সে ঘড়ির বাজনাগুলো বুঝি মেহেরের বুকের মধ্যেই বাজে।...

কিন্তু এ লোকটার আজ হ'ল কি? তারই তো চাড় বেশী—সে তো কালও বলতে গেলে সন্ধ্যা থেকে এসে বসে ছিল ঘরে—আজ যে বড় এখনও দেখা নেই বাবু-সাহেবের? নটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ, দশটা বাজে বোধহয়, কোথায় বসে আছে—বসে বসে আড্ডা দিচ্ছে?

বার বার ঘুলঘুলির সামনে এসে দাঁড়ায় সে—ঘুরে ফিরেই এসে উঁকি মারে। এমন তো কখনও হয় না। তবে কি, তবে কি অসুখ-বিসুখ করল কিছু? কিন্তু অসুখ করলে তো ঘরে এসে শুয়ে পড়াই উচিত।

অবশেষে একসময় ঢং ঢং ক'রে দশটাও বেজে যায়।

একটা দারুণ অভিমান হয় মেহেরের। চোখে জল এসে যায়। সে সময় আসন্ন বুঝে একটু আগেই শিরীণের পোশাক প'রে তৈরী হয়েছিল, এখন সেটা খুলে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এই তো, এই তো সব বাবুদের আন্তরিকতা, এর জন্যই আবার কত বড় বড় কথা বলেন তাঁরা। ওর বাঁদী নুরুন্নেসা জীবনে কখনও বিয়ে ক'রে নি—মেহের কারণ জিজ্ঞেস করলে বলত, 'কাকে বিয়ে করব শাহ্‌জাদী? সমস্ত পুরুষ জাতটাই বেইমান। কেউ ভালো নয়, কেউ ইমানদার নয়।' আজ সে কথাটা মনে পড়ে যায় তার।

মরুক গে, ওর আর কী। তারই মাথা-ব্যথা ছিল—তাই! ভালই হ'ল, এত বড়

একটা ঝুঁকি নেবার দায় থেকে বেঁচে গেল সে। আর তো নয়! এই শেষ। আর কোন সম্পর্ক রাখবে না তার সঙ্গে মেহের। যে লক্ষ্মীছাড়া আড্ডায় জমে সব ভুলে ব'সে থাকে, সেই আড্ডা নিয়ে থাক সে জীবন-ভোর। সেই আড্ডাই তাকে সব পরমার্থ দিক। ওর আর কি, ও তো এখনই শুয়ে পড়বে তোফা আরামে।...

তবু, প্রতিজ্ঞা যতই যা করুক, শুতে যাওয়া ওর হয় না। বিছানা পড়েই থাকে, রেজাই-ঢাকা-দেওয়া উষ্ণ-মধুর স্পর্শ নিয়ে—সেদিকে ফিরে তাকানো ঘটে ওঠে না। ঘুলঘুলি ছেড়ে যেন আসতে পারে না কিছুতেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা করে। আচ্ছা, লোকটার হ'লই বা কি? এত কথা বলল, এত আকিঞ্চন তার, এতটা সব মিথ্যা হ'তে পারে? সব অভিনয়? মেহের কি এতই অন্ধ যে এতটা মেকীও ধরতে পারল না?

তা ছাড়া এমনিও এত রাত তো ওর কোনদিন হয় না। নিত্যই তো দেখছে সে। তবে কি—তবে কি বাদশা তাকে কোন কাজে আটকে রেখেছেন? কিম্বা,—ঐ পাজী হেকিমটা কিছু টের পায় নি তো? সেজন্যে ওকে কোন সাজা দেয় নি তো ওরা? কয়েদে দিয়ে থাকে যদি? বাদশার পরিবারে নাকি এই রীতিই চলে আসছে আবহমান কাল থেকে—কোন অন্তঃপুরিকা কোন সাধারণ লোকের সঙ্গে প্রণয়াবদ্ধ হ'লে সেই সাধারণ লোকটিরই প্রাণ যায়।...ওরা—ওরা তার সে রকম সাংঘাতিক কোন অনিষ্ট করে নি তো?

নিজের মনেই সেই নির্জন ঘরে 'উঃ মাগো' বলে শব্দ ক'রে ওঠে ও!

এর পর আর কোন মতেই স্থির থাকতে পারে না সে। কোন খবর পাবে না জেনেও পাগলের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। খবর নেওয়া সম্ভব নয়। কার কাছেই বা যাবে সে, কাকে মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করবে খবর? একে পরপুরুষ—তায় সামান্য লোক, বান্দা, তার খবরে শাহ্‌জাদীর কি প্রয়োজন? তার মানে—সে লোকটার খবর রাখেন তিনি, এতদিন রেখেছেন? একথা যখন জিজ্ঞাসা করবে তারা—কী জবাব দেবে সে?...

তবু স্থির হয়ে অপেক্ষা করা আরও অসম্ভব। অকারণেই—কোন কিছু স্থির না ক'রেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে। আর ঠিক সিঁড়ির মুখটাতেই দেখা হয়ে যায় রাবেয়ার সঙ্গে। সেদিনের মতোই।

'এ কি, তুমি এখনও ঘুমোও নি শাহ্‌জাদী?'

'না রে, ঘুম আসছে না। তাই মাথায় একটু জল দেব বলে আসছিলাম। আমার সুরাইতে আজকে কেউ জল দেয় নি। তা তুই এত রাতে কি করছিলি?'

'না বাপু, খবরদার, খবরদার—ও কাজটি ক'রো না। মাথাতে এই অসময়ে জল দিলে এরপর ভুস ভুস ক'রে চুল উঠে যাবে। আমার বোনের ভাসুর-ঝি অমনি—'

'থাক থাক। ও কুলুজী আর শুনতে চাই না। এত রাতে বাইরে গিয়েছিলি কেন তাই বল্?' কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করে মেহের, একটু ক্ষীণ আশা যদি কোন খবর পেয়ে থাকে রাবেয়া।

'আমি—মানে, তা সত্যি কথাই বলছি বাপু, তুমি আবার রাগ করবে হয়ত। আমি ঐ নতুন ভাইয়ার খবর নিতে গিয়েছিলুম।'

বুকটার মধ্যে ধড়াস্ ক'রে ওঠে মেহেরের। অতিকষ্টে মৌখিক তাচ্ছিল্য বজায় রেখে বলে, 'কেন? এই দুপুর রাতে তার খবরে কি দরকার তোর? আর তার

খবর নেবার মতনই বা কি হয়েছে?'

'ওমা, তা জানো না বুঝি'—উৎসাহের প্রাবল্যে কণ্ঠস্বর ফ্যাস ফ্যাস ক'রে ওঠে রাবেয়ার, 'আজ থেকে সে তো সেপাই হয়ে গেল।'

'কী—কী হ'ল?' কোনমতেই বুঝি উৎকণ্ঠাটা মুছে ফেলা যায় না কণ্ঠ থেকে।

'সেপাই গো। সেপাই সান্ত্রী—শোনো নি? আমি স্বচক্ষে দেখলুম ঝক্‌ঝকে নতুন সেপাইয়ের পোশাক পরে তলোয়ার ঝুলিয়ে খটাখট করে দিল্লী দরওয়াজার দিকে চলে গেল।'

'সে কি?' আর সামলানো যায় না কোনমতে, 'তুই ভুল দেখেছিস নিশ্চয়!'

'কেন ভুল দেখব?' জোর দিয়ে বলে সে, 'আমার কি এই বয়সেই চোখে ছানি পড়েছে নাকি? আমার শত্তুরের ছানি পড়ুক চোখে। তখনও বেশ একটু দিনের আলো রয়েছে, আর একেবারে পাশ দিয়ে চলে গেল—আমি ভুল দেখব? স্পষ্ট দেখলুম তাকে—'

'তা তুই বা সেখানে গিছলি কেন? দিল্লী দরওয়াজায় তোর কি দরকার?'

ক্ষণ-পূর্বের হঠাৎ-ধরা-পড়ে-যাওয়ার উদ্বেগটা কি লক্ষ্য করল রাবেয়া? মনে মনে আঁচ করার চেষ্টা করে মেহের।

'আমি গেছলুম ঐ মেহেন্দী হোসেন আতরওয়ালার দোকানে—একটু জামনের সির্কা কিনব বলে। ঐ লোকটাই আসল 'সিরকা-ই-জামন' দেয়, বাকী সব চিনির রস মিশোয়। পেটটা কদিন ধরে বিগড়েছে কিনা বড্ড। তা আরক নিয়ে ফিরছি, পাশ দিয়ে চলে গেল ভাইয়া। কোথায় যাচ্ছে, হঠাৎ ও নতুন পোশাক কোথায় পেল, চাকরিটাই পাল্‌টে গিয়ে সেপাইয়ের কাজ পেল কিনা, কিছুই জানা হ'ল না, তড়বড় করে চলে গেল। শুধোতেও পারলুম না। বোধহয় বাদশাই কোন কাজে পাঠিয়েছেন।...তা তাই গিছলুম খবর নিতে। এই সত্যি কথাই বললুম, তা মারো কাটো আর যাই করো।'

'মানে ঐ খবরটা না নেওয়া পর্যন্ত পেট ফুলছিল, এই তো? তা খবর মিলল তো—এবার গিয়ে শুয়ে পড়গে, আর কেন!'

'না গো, খবর মিলল কোথায়? এখনও তো দেখলুম ঘর খালি। বোধহয় দূর পাল্লায় গেছে কোথাও।'

তারপর প্রচণ্ড একটা হাই তুলে বলল, 'মরুক গে, আর কত রাত করব। শুয়ে পড়ি গে। ঘুম পেয়ে গেছে। আবার তো সেই সাতসকালে উঠতে হবে। তোমরা তো যে যার উঠবে ইচ্ছামতো, বলি আমাদের সেই ভোরবেলা উঠে হাজিরা দিতে হবে তো গা!'

সে নিজের ঘরের দিকে চলে যায়। মেহেরও আবার উঠে আসে ওপরে। মাথায় জল দেওয়ার কথাটা মনেও থাকে না।

একটা পাষাণভার নেমে গেছে বুক থেকে। ইচ্ছে ক'রে অবহেলা করে নি সে। ভুলে যায় নি। কাজে গেছে বলেই—

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা দুশ্চিন্তাও বাড়ে। কোথায় গেল সে, এত রাত পর্যন্ত ফিরল না! আর এঁরাও তেমনি, একটা লোককে পাঠালেন কাজে—সে কেন ফিরছে না এখনও, তা একটা খবর নেওয়ার কথাও মনে পড়ে না! হুঁশই নেই কারো। যদি কোন বিপদ-আপদই হয়ে থাকে? ওর সেই দেশের গুণ্ডাগুলো তো নাকি ওৎ পেতে বসে থাকে দিন-রাত। তাদের পাল্লাতেই যদি পড়ে যায়?...

রাত এগারোটা বেজে যায় একসময়।

মেহের কিছুতেই নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে পারে না। কী হ'ল লোকটার—একটা খবর না পেলে নিশ্চিন্ত হয়ই বা কি ক'রে!

তেমনি ঘর-বার করে, ঘুলঘুলিতে দাঁড়ায় এসে বার বার।

শেষে এক সময় যখন বারোটাও বেজে যায়—তখন আবার অস্থির হয়ে বেরিয়ে পড়ে। বাদশার কাছেই না হয় যেত সে, লাজলজ্জার মাথা খেয়ে—কিন্তু তিনি এখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। অল্প একটু আফিমের মৌতাত ক'রে ঘুমোন বাদশা—সহজে ঘুম ভাঙগানাও যাবে না। তা ছাড়া যদি শাহ্‌বেগম সাহেবার ঘরে শুয়ে থাকেন তো কথাই নেই—

নাঃ, সে সম্ভব নয়।

নির্জন অলিন্দে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে এবার সে উলটো দিকের সিঁড়ি ধরল।

জেনানা মহলের ছাদ থেকে অনেকটা দেখা যায়। দিল্লী দরওয়াজা লাহোরী দরওয়াজা—দুটোরই ঢোকবার মুখটা দেখতে পাওয়া যায়। সে ছাদেই উঠে গেল। এতবড় জনহীন ছাদে সে একা—বহু হত্যার ইতিহাস বিজড়িত এই প্রাসাদ-দুর্গে আগে আগে রাত্রে বিষম ভয় করত তার—কিন্তু আজ আর সে সব কোন কিছুই মনে রইল না, দিল্লী দরওয়াজার দিকটায় আলসেতে বুক দিয়ে ঝুঁকে পড়ে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল ফটকের দিকে। নানার দুরবীনটা সেদিন পর্যন্ত ওর ঘরে ছিল—যদি আজ থাকত।

কিন্তু তার প্রয়োজন হ'ল না, বেশীক্ষণ অপেক্ষাও করতে হ'ল না ওকে। একটু পরেই ফটকের দিকে ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ উঠল। নিশীথ রাত্রের নিস্তব্ধতায় সে শব্দ পরিষ্কার শোনা গেল এখান থেকে। বিশেষ লোক ছাড়া ঘোড়ায় চেপে কিল্লায় ঢোকা নিষেধ, এক আসেন আংরেজ অফ্‌সর্‌রা—তাও তাঁরা এদিকটায়, বাদশার প্রাসাদের দিকটায় কখনও আসেন না। লাহোরী দরওয়াজা দিয়ে ঢুকে বাঁ দিকে নিজেদের ব্যারাকের দিকে চলে যান। তবে কি আগাই রাতারাতি একটা খুব ভারী জাঁদরেল লোক হয়ে গেল!

অবশ্য বেশী জল্পনাকল্পনারও অবকাশ পেল না সে। অশ্বারোহী শুধু ঘোড়া সুদ্ধই ঢোকে নি, খোলা তলোয়ার হাতে ঢুকেছে। চরম ধৃষ্টতা এটা। কিন্তু সে ঢুকেই তলোয়ারখানা ছুঁড়ে ফেলে দিল একদিকে, ঘোড়ার লাগামটাও তার হাতে নেই, ঘোড়া আপনিই থেমে গেল খানিকটা এসে। মনে হ'ল সওয়ারী ঘোড়ার পিঠে বসে বসে দুলছে, যেন টলছে মাতালের মতো। তবে কি আগা বাইরে থেকে নেশা করে এসেছে? হাতে তন্‌খার টাকা পেয়েছে, বাইরে যেতে পেরেছে—লোভ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু মদ তো কিল্লাতেও পাওয়া যায় শুনেছে মেহের।

সে আরও ঝুঁকে পড়ল, প্রাণপণে, নিজের নিরাপত্তার কথা না ভেবেই।

ততক্ষণে দেউড়ির সান্ত্রীরা ছুটে এসেছে। তারা সবাই মিলে ঘোড়া থেকে নামাল ওকে। দু'জন ধরাধরি ক'রে নিয়ে আসছে এদিকে। না, মাতাল নয়, তাহলে ধরে আনলেও হাঁটিয়ে আনত, এ অজ্ঞান হয়ে যাওয়া লোকের মতো ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে আনছে যে—

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছে এতক্ষণে, কিন্তু বড় ক্ষীণ, তাতে স্পষ্ট কিছু ঠাহর হয় না। তবু আর একটু কাছে আসতে মেহেরের চোখে পড়ল—টক্‌টকে লাল

রঙটা ওর পোশাকে, ছোপ-ছোপ তাজা রঙ্, রক্তের মতো লাল। তবে কি, তবে কি—ওটা রক্তই? তাহলে কি সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়েছে আগা?—আগা যে, সে সম্বন্ধে আর কোন সংশয়ই নেই ওর মনে—তাই অমন টলছিল, তাই ওরা ঝুলিয়ে নিয়ে আসছে ঐভাবে?

দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে নেমে এসে নিজের ঘুলঘুলিতে চোখ দিয়ে দাঁড়াল মেহের। তেমনি ভাবে ধ'রে এনে আগার ঘরে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চ'লে গেল ওরা। জামাটাও খোলবার চেষ্টা করল না কেউ। কতটা আঘাত, কতটা চোট লেগেছে তা তো দেখলই না। ওদের অত গরজই বা কি। কে কার কড়ি ধারে, সান্ত্রী—তাদের ফটকে পাহারা দেবার কাজ, তারা ফটকে ফিরে গেল আবার। সে-ই সকালে হয়ত ওপরওয়ালার কাছে এত্তেলা দেবার সময় ঘটনাটার উল্লেখ করবে। তিনি যদি জরুরী মনে করেন তো তাঁর ওপরওয়ালাকে জানাবেন, এইভাবে বাদশার কাছে খবর পৌঁছতে—যদি পৌঁছোয়ও—বেলা এগারোটা বারোটা। ততক্ষণ পড়ে থাকবে লোকটা ঐ ভাবে? তখনও কি বেঁচে থাকবে? কতটা চোট্ তাই যে দেখল না কেউ।...

নিজের উপায়হীনতায় যেন মাথা কুটে মরতে ইচ্ছে করে মেহেরের। বাদশার ঘরে মেয়ে হয়ে জন্মানোর মতো অভিশাপ—বুঝি আর কিছু নেই। এত অসহায় তারা, রীতিনিয়মের অষ্টবন্ধনে এমন ভাবে বাঁধা! কিছুই করবার উপায় নেই তার। নিতান্ত মানবতার দিক থেকে মানুষ মাত্রেরই যা কর্তব্য, তাও পালন করবার উপায় নেই।...

কিন্তু এমনভাবে ঐ আহত অচৈতন্য মানুষটাকে ভাগ্যের ওপর ফেলে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারবে না সে। তা সে ভাগ্যে যা হয় হোক!

মেহের তর্ তর্ ক'রে নেমে এল নিচে। রাবেয়ার ঘরটা দৈবাৎ একদিন দেখেছিল সে, অন্ততঃ একটা ঘর থেকে বেরোতে দেখেছিল, সম্ভবতঃ সেইটেই তার ঘর।

মনে মনে মেহেরবান খোদাকে স্মরণ ক'রে সে এসে সেই দরজাতে ধাক্কা দিল—খুব আস্তে ডাকলও একবার, 'রাবেয়া!'

রাবেয়া ধড়মড় ক'রে উঠে বেরিয়ে এল, 'এ কী শাহ্‌জাদী, তুমি এত রাত্রে, এখানে, কী হয়েছে?'

'তুই তো নিশ্চিন্তি হয়ে ঘুমোচ্ছিস, তোর ভাইয়ার কি বিপদ কিছু খবর রাখিস?'

'না তো, কি হয়েছে? তুমি কি ক'রে জানলে তার খবর?'

এই প্রশ্নটিই সর্বাগ্রে, কোন সময় কি এটা কেউ ভুলতে পারে না?

'বললুম না তোকে ঘুম আসছে না। তাই আবার খানিকটা পরে ছাদে উঠেছিলুম; ঠাণ্ডা হাওয়া লাগাব বলে মাথায়—সেইখান থেকে দেখতে পেলুম। খুব সাংঘাতিক জখম হয়ে ফিরল কোথা থেকে। পোশাক রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। ওরা তো ধরাধরি ক'রে রেখে গেল—কিন্তু চিকিৎসার ব্যবস্থা কিছু তো ওরা করবে না। অমন ভাবে পড়ে থাকলে লোকটা তো বাঁচবে না রাবেয়া।'

'ও মা, কী হবে! তা কোথায় রেখে গেল জানো?'

ভাগ্যিস ঘরে রাখার কথা বলে ফেলে নি। তাহলে প্রশ্ন উঠত, কি ক'রে দেখলে?

মেহের একটু অসহিষ্ণু ভাবেই বলল, 'তা আমি কি জানি—ঘরেই রেখেছে

নিশ্চয়। তুই দ্যাখ্ না গিয়ে। আমি সব খবর দেবো, তারপর তুমি তোমার ভাইয়ের খবর নেবে—না?'

'না-না, এই যাচ্ছি। তা হ'লে কি হেকিমসাহেবকে খবরটা দেব—না মীর বক্স সাহেবকে?'

'তাহলেই হয়েছে। ওদের ঠেলে তুলে খবর দিতেই রাত ভোর হয়ে যাবে—ততক্ষণে মরে কাঠ হয়ে থাকবে লোকটা। ওদের কি গরজ যে রাত দুপুরে ছুটো-ছুটি করবে? ওসব বাদ্ দে—শোন্, এক কাজ কর্, আস্তে আস্তে পাহারাদারকে বলে বেরিয়ে যা—আগে ওর ঘরে গিয়ে দ্যাখ কী অবস্থা, যদি দেখিস জখম খুব সাংঘাতিক, তাহ'লে হেকিম দাতাবক্সকে গিয়ে ডাকবি। সে যদি না আসতে চায় সোজা চলে যাস আংরেজদের ব্যারাকে। ওদের একজন ভাল ডাক্তার আছে শুনেছি। মেয়েছেলে বিপদে পড়েছে দেখলে—তুই তো খুব কান্নাকাটি করতে পারিস—তাহ'লে নিশ্চয়ই আসবে। না হয়, না হয় বলিস টাকা দেব। এই নে, এই চারটে টাকা রাখ, দরকার হয় আরো চেয়ে নিস। তুই বরং ঐ আংরেজ ডাক্তারের কাছেই যা, বুঝলি? ও লোকটার দাওয়াই খুব ভালো শুনেছি। আর দাঁড়াস নি, ছুটে যা।'

'তা যাচ্ছি। তা কেউ যদি কোন কথা শুধোয়, যদি বলে তোকে এত কত্তাত্তি করতে কে বললে?'

'বলিস আর কেউ জেগে ছিল না—শাহ্জাদীকে পেয়ে ওঁকেই জিগ্যেস করে-ছিলুম, উনিই যেতে বলেছেন। শুধু আমিই যে দেখে এসে খবরটা দিয়েছি সেটা বলিস নি।'

॥ বারো ॥

সেদিন সকাল থেকেই দিল মহম্মদের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছিল গুল। ঝগড়া অবশ্য ওদের নিত্যনৈমিত্তিকই হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল, বড়রা অর্থাৎ ওর মা এবং এর মা এ সব গ্রাহ্যও করেন না। কারণ ওদের মর্জির দিশে পান না ওঁরা—দেখেন ঝগড়াও যত, ভাবও তত। দিল মহম্মদের মা এতটা ঠিক পছন্দ করেন না, মনে হয় ছেলে যেন বড় বেশী অনুগত হয়ে পড়ছে, ছুঁড়িটার। অবশ্য এক দিক দিয়ে তাতে কিছু সুবিধাও হয়েছে তাঁর। ছেলে আগে বিষয়-কর্ম কিছুই দেখত না প্রায়, চাষবাস, ক্ষেত খামার সবই পরের ভরসায় ফেলে রেখেছিল। ফলে ফল ফসল বারো ভূতে লুটে খাচ্ছিল এতদিন। এখন সেটা অনেকখানি বন্ধ হয়েছে। গুল এক-বারেই আলস্য করতে দেয় না দিল মহম্মদকে। প্রথম কটা দিন মানুষটাকে চিনতেই যা দেরি, তারপর থেকেই কঠোর শাসন শুরু করেছে, জোর ক'রে টেনে বাইরে পাঠায়, বলতে গেলে ঘাড় ধরে কাজ করিয়ে নেয়। ঘরগুলোর খাপরা পালটানো হয় নি কতকাল তা মনেই পড়ে না সাকিনা বিবির। তাও মেয়েটার তাগাদাতেই হয়েছে। মায় দিল স্বয়ং মটকায় উঠে মজুরদের সঙ্গে খেটেছে ক'দিন।

আজকাল বরং দিল মহম্মদের কায়িক পরিশ্রমে উৎসাহ একটু বেড়েছে, আগে যেটায় বিষম অরুচি ছিল তার। কেন বেড়েছে সেটা তবু সাকিনা বিবি জানেন না, জানলে আরও বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠতেন মেয়েটার ওপর। প্রথম যেদিন কোথা থেকে প্রকাণ্ড একটা মোট ঘাড়ে ক'রে বাড়ি ফিরেছিল দিল মহম্মদ—এরা আসার পরু—

সেদিন এই শেষ হেমন্তের দিনেও সে ঘেমে নেয়ে উঠেছে দেখে (বলা নিষ্প্রয়োজন, গুলই তাকে জোর ক'রে পাঠিয়েছিল মালটা আনতে), এদিক ওদিক চেয়ে গুল নিজের কামিজের প্রান্ত দিয়ে তার কপালের ও গলার ঘাম মুছিয়ে নিয়েছিল। সেই থেকে অকারণেই ছুটোছুটি ক'রে, ভারী ভারী মাল তুলে গুলের কাছ থেকে এই সাদর স্পর্শটুকু আদায় ক'রে নেয় দিল মহম্মদ।

এরা দুই মা ও মেয়ে আসার পর সব দিক দিয়েই সংসারের শ্রী ফিরেছে, মেয়েটা নিজেও ক্ষেতখামারের কাজ জানে, অনেক সাহায্য করে সে। বাগানের শখও খুব, এর মধ্যে ফল-ফুলুরীর গাছ কত বসিয়েছে তার ঠিক নেই। আর নিত্য ইঁদারা থেকে ঘড়া ঘড়া জল তুলে ঢালে তাতে। খাটতে পারে মেয়েটা অসাধারণ—ভূতের মতো প্রায়। গুলের মার শরীর এই দীর্ঘকালব্যাপী অনশনে অর্ধাশনে এবং অমানুষিক পরিশ্রমে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। দৌড়-ঝাঁপের কাজ বা ভারী কোন কাজ আদৌ করতে পারেন না, তবে টুকটাক সংসারের কাজ ক'রে দেন বিস্তর। মায় নিত্য গম পেশাই করা, ঘর-দোর নিকনো, দুধ দোওয়া, গরুকে খাওয়ানো—সংসারের মোটা কাজ সবই ক'রে দেন। সেদিক দিয়ে সাকিনা বিবির সুখের দশাই বেড়েছে বলতে গেলে, পায়ের ওপর পা দিয়ে বসেই থাকেন আজকাল। দিল মহম্মদও সেটা যখন তখন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—কিন্তু তবু স্ত্রীলোকের মন, বিশেষ ক'রে তাঁর অসূয়া আর বিদ্বেষ বিচিত্র পথ ধরে যায়, অনেক সময় তাদের আচরণের কোন কারণ তারা নিজেরাই খুঁজে পায় না। সাকিনা বিবিও অন্তরে অন্তরে এদের ওপর খুশী ছিলেন না। দুটো লোক অনর্থক তাঁর ছেলের ঘাড়ে চেপে বসে আছে, এ আপদ বিদায় হ'লে বাঁচেন তাঁরা—এ ভাবটা তাঁর কথাবার্তার ভঙ্গীতে এবং নানা সময় নানা ইশারা-ইঙ্গিতে যখন তখন প্রকাশ হয়ে পড়ত। অবশ্য ইশারা-ইঙ্গিতেই—মৌখিক সৌজন্য খুবই ছিল তাঁর। বয়স্কা দুটি স্ত্রীলোক পা ছড়িয়ে বসে যখন গল্প করতেন, তখন মনে হ'ত—আজন্ম প্রিয় সখী এঁরা পরস্পরের।

অবশ্য আকার-ইঙ্গিতগুলো যে এরা না বুঝত তা নয়, গুলের মা সেজন্যে আড়ালে কান্নাকাটিও করতেন মধ্যে মধ্যে—কিন্তু গুল গ্রাহ্যও করত না। বলত, 'খাটছি, খাচ্ছি—যা খরচ হচ্ছে আমাদের জন্যে তার চারগুণ উশুল দিচ্ছি। ও কানী তাই দেখতে পায় না, আমরা তো বিবেকের কাছে খালাস আছি। আর দাদা যখন আসবে ওদের জিজ্ঞাসা করব আমাদের জন্যে কত খরচ করেছে—কড়াক্রান্তি শোধ দিয়ে দেব!'

এতখানি জোরের কারণও আছে। সেটা গুল বলতে পারে না মাকে। দিল মহম্মদ ওকে একদিন আড়ালে বলেছে, 'তোমাদের আসার পর আমাদের ঘর-দোরের শ্রী ফিরে গেছে, দুটো পয়সারও মুখ দেখছি। দোস্ত এলেই যেন ছাড়ছি তোমাদের—বয়ে গেছে! একেবারে সে যখন নিজের বাড়ি ঘরদোর ক'রে গুছিয়ে বসবে তখন যেন নিয়ে যায়। তার আগে আমি যেতে দিচ্ছি না।' তারপর গলা আরেকটু নামিয়ে চুপি চুপি বলেছে, 'মা একটু বাঁকা বাঁকা কথা বলে বোধ হয়, না? বুড়ির কথায় কান দিও না। দেখছই তো আমি ওর এক ছেলে—আমার জন্যেই টেবুয়া টেবুয়া ক'রে টাকা জমাচ্ছে—তবু আমাকেই অষ্টপ্রহর গাল দিচ্ছে। ওদের ধরনই এই।'

গুল বুঝেছে ; আরও বুঝেছে যে দিল মহম্মদের এ কথাটা আন্তরিক, এর

মধ্যে কোন ভেল-ভেজালে নেই। তাছাড়া তারও কেমন মন বসে গেছে এখানে। তারও যে অন্য কোথাও যেতে খুব ইচ্ছে আছে তা নেই।

তবে দাদার জন্যে মন কেমন করে বৈকি। মধ্যে মধ্যে খুবই মন খারাপ হয়ে যায় তার। চোখ ফেটে জল আসে। তাদের জন্যে নয়—তার জন্যেই বলতে গেলে দাদার এই অবস্থা আজ। কী কষ্টই না পেলে, আর আজও পাচ্ছে। এর শেষ কবে হবে তাও জানে না। কবে এই অসহায় পরনির্ভরতা থেকে, এই সদাকুণ্ঠিত হিসেব-করা জীবনযাত্রা থেকে মুক্তি পেয়ে আবার আগের মতো স্বাধীন স্বচ্ছন্দ জীবন ফিরে পাবে কে জানে। কোন দিন পাবে কি না। খাটতে ওর আপত্তি নেই, দিল মহম্মদের মতো লোকের জন্যে সে সারাজীবন খেটে যেতে রাজী আছে। কিন্তু স্বেচ্ছায় খাটা আর বাধ্য হয়ে খাটায় ঢের তফাৎ যে।

তবে আগে আগে এসব ভাবলে, পূর্বাপর তার বা তাদের ভাগ্যের কথা চিন্তা করলে যেমন অবিলম্বে নিজে থেকে নিজের জীবনে ছেদ টেনে দিতে ইচ্ছে করত, আজকাল আর সে আত্মহত্যার ইচ্ছাটা হয় না। এখন যেন নতুন ক'রে জীবনের প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করছে। নতুন অর্থ খুঁজে পেয়েছে জীবনের। মায়ার পাত্রও বেড়েছে। আগে ছিল দাদা আর মা, এখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দিল মহম্মদ। দিল যা করেছে আর এখনও যা করছে তার তুলনা নেই—এ ঋণ শোধ হয় না। ওর ঐ চওড়া ছাতিটার মধ্যে দিলটাও অতখানিই চওড়া। দিল মহম্মদ নাম সার্থক ওর। তাদের মনের সামান্যতম কাঁটা, এতটুকু বেদনা দূর করার জন্য অহরহ কী চেষ্টাই না করে বেচারী!

আজ যে ভোর থেকে গুল বকাবকি শুরু করেছে, সেও কতকটা ঐ কারণেই। আজকাল দিলের একটা ছুতো হয়েছে কথায় কথায় দিল্লী যাওয়া। ভোরে উঠে, না-বলা না-কওয়া, মুখ হাত ধুয়ে জামা কাপড় এঁটে তৈরী, বলে, 'চটপট—একটু দুধ গরম ক'রে দে গুল, আমি একবার শহরটা ঘুরে আসি।'

ভ্রূ কুঁচকে কঠিন কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রে গুল বলেছে, 'কে—কে শহরে যাচ্ছে তাই শুনি?'

'আমি, আবার কে!' গলায় বেশ জোর দিয়েই বলবার চেষ্টা করেছে দিল মহম্মদ কিন্তু জোরটা ঠিক ফোটে নি।

'না, কোথাও যেতে হবে না। ঘরের ছেলে ঘরে বসে থাকো। দুধ হালুয়া ক'রে দিই খাও—তারপর মাথা ঠান্ডা ক'রে বসে মেওয়ালালের হিসেবটা তৈরী ক'রে ফ্যালো। ক' খেপ পর পর চানা নিয়ে গেল—এক ঢেবুয়াও দেবার নাম নেই। আজ হিসেবটা নাকের ওপর ফেলে দিয়ে টাকাটা জোর ক'রে আদায় করবে।'

'বা রে! আমি বলে কাল থেকে ঠিক ক'রে রাখলুম দিল্লী যাবো—তা নয় আমি এখন মেওয়ালাল না মুন্সীলালের হিসেব করতে বসি!'

'কেন ঠিক করো অমন—আমাকে জিগ্যেস করেছিলে? কার মত নিয়ে যাচ্ছিলে শুনি?'

'ইস্! আমি কি ছেলেমানুষ যে জিগ্যেস ক'রে মত নিয়ে চলতে হবে প্রতি-পদে! আমি ও বাড়ির কর্তা? তা জানিস্? আর জিজ্ঞেস করলেই বা তোকে করব কেন? আমাকে কি এবার থেকে তোর হুকুম নিয়ে সব কাজ করতে হবে নাকি?'

'আলবৎ! যদ্দিন না তোমার ঘরোয়ালী আসে—তদ্দিন আমার হুকুম নিয়েই চলতে হবে। আমার ভাবী এলে কি আর আমি হুকুম চালাব? তখন সে-ই তোমার ভার নেবে।'

'আরে, আমার ভার কোন না কোন আওরতকে বইতে হবে এমন আজগুবী কথা তোর মাথাতে কে ঢোকাল?'

'নিশ্চয়। তুমি যা বুদ্ধু, মায়ের আদর খেয়ে খেয়ে এখনো তো চার বছরের খোকা রয়ে গেছ. অভিভাবক না হ'লে চলে?'

'বটে! আমি খোকা রয়ে গেছি? আমি বুদ্ধু? অভিভাবক চাই আমার! আবার ভাবীর বাহানা।...এই আমি চললুম দিল্লী, দেখি কে ঠেকায়। দরকার নেই আমার দুধ খেয়ে, আমি খালি পেটেই যাব। শহর-বাজার জায়গা, পয়সা ফেললে সেখানে ঢের দুধ মিলবে।'

'দ্যাখো দিলু মিঞা, ভাল হবে না বলে দিলুম। তুমি বাড়াও এক পা দেখি, কেমন বাড়াতে পারো—যদি একটা খুনোখুনি না করি তো আমার নাম নেই। এখখুনি গিয়ে আমি ঐ ইন্দারায় ঝাঁপ দেব তা বলে দিলুম।'

'আরে, এ তো ভাল আপদ হ'ল দেখছি। সেখানে সে লোকটা এমনি পড়ে আছে—তার একটু খবর নেব না? হ'ল না হয় আমার দোস্ত, তোরও তো ভাইয়া বটে?'

'তার খবর পাওয়া গেছে, সে বেঁচে আছে, ভাল আছে, কিল্লাতে কাজ করছে—আবার কি খবর তার আনবে শুনি? না পারবে কিল্লাতে ঢুকে তার সঙ্গে দেখা করতে—না পারবে সে বাইরে আসতে। তবে? তুমিই তো বললে চার দোরেই অষ্ট-প্রহর দুশমনগুলো পাহারা বসিয়ে রেখেছে, মায় বনের দিকে কী একটা ছোট দোর আছে, সেখানেও পর্যন্ত।...আজ কি তারা সব ফুশমন্তর সরে যাবে?'

এসব খবর দিল মহম্মদই এনে দিয়েছে। আগা রওনা দেবার কদিন পরেই গেছে সে তার খোঁজে—তার পরে পরপরই গেছে ক'দিন। আগে সে শহরে যেতেই চাইত না, ভয় করত অত বড় শহর দেখে, ভীড়ে হাঁপ ধরে যেত তার। কিন্তু আট দশ দিন পর্যন্ত আগার কোন খবর না পেয়ে এরা পাগলের মতো কেঁদে কেটে অস্থির হয়ে পড়েছিল, তাতেই আরো মরীয়া হয়ে বেরিয়ে পড়েছিল দিলু। আগা কিল্লায় না থাকলে অবশ্য খোঁজ পাওয়া শক্ত হ'ত, অত বড় শহরে কোথায় খুঁজে বার করত সে? কিন্তু দিলু জানত সে কিল্লাতেই যাবার চেষ্টা করবে প্রাণপণে, সেখানেই চাকরি খুঁজবে—দিলুই বুদ্ধি দিয়েছে তাকে। তা ছাড়াও, দিলু জানে, লালকিল্লার ওপর টান আগার নিজেরও যথেষ্ট, সুতরাং খবর মিললে সেখানেই মিলবে। প্রথম দু'দিন অবশ্য কোন পাত্তাই পায় নি, সব কটা বড় ফটকেই খবর নেবার চেষ্টা করেছে সে সান্ত্রীদের কাছে। প্রথমটা তো আমলই দেয় নি তারা, কাছে ঘেঁষতেই পারে নি—শেষে মোক্ষম ওষুধ বার করতে নরম হয়েছে। দিলু জেব থেকে দুটো টাকা বার ক'রে দেখাতেই কাজ হয়েছে। প্রসন্ন হয়ে কাছে ডেকেছে, কী চাই জিজ্ঞাসা করছে।

কিন্তু সে দিন কোন সান্ত্রীই কিছু সঠিক বলতে পারে নি। তারা কোন খবরই রাখে না। এতবড় কিল্লায় হাজার লোকের মধ্যে কে আগা—তার খবর কেমন ক'রে জানবে তারা?'

ফলে এত কাণ্ডর পরেও ম্লান মুখে ফিরে আসতে হয়েছে দিলুকে। কিন্তু

এদের মুখের দিকে চেয়ে সত্য কথাটা বলতে পারে নি কিছুতেই। 'কোন খবর পাওয়া যায় নি'—একথা বললে ওরা আরও ভেঙ্গে পড়ত। মিথ্যাই বলেছে সে, বলেছে যে, অনেক কষ্টে একজনা একটু খবর দিয়েছে। বলেছে, ঐ রকম একটা লোক এসেছে শুনেছিল যেন সে। ঠিক জানে না। পাকা খবর জেনে পরে বলবে।

দু'দিন বাদ আবার গেছে সে। সেদিন একটা কাজ করেছে। একটা সান্ত্রীর হাতে একটা টাকা দিয়েছে আর বলেছে, ঠিক ঠিক খবর এনে দিতে পারলে এক বোতল বিলায়তী সরাব খাওয়াবে। চায় তা তার সঙ্গে আর এক বোতল কাচ্চাও, অর্থাৎ দেশী। সে সান্ত্রী দু'দিন সময় নিয়েছে। বলেছে, যদি কিল্লাতে এসে থাকে তো খুঁজে বার করবেই ওর দোস্তকে।

সেদিনও ফিরে মিথ্যে ক'রে বানিয়ে একটা আশ্বাস দিতে হয়েছে। কিন্তু দু'দিন পরে গিয়ে পাকা খবরই পেয়েছে। এক বোতল বিলাতী সুরার প্রলোভন অসম্ভব সম্ভব করেছে। সে লোকটি বহু লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে বহু ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ করেছে। ঠিক ঠিকই বলেছে। চোর বলে ধরে আনা থেকে শুরু ক'রে বাদশার আকস্মিক অনুগ্রহ লাভ, অযাচিত চাকরি পেয়ে যাওয়া, কতকগুলো পাঠানের হামলা এবং এখন তাদের অষ্টপ্রহর পাহারা দেওয়ার কথা—সব বলেছে সে। চেহারারও বর্ণনা দিয়েছে সে। তাও মিলেছে। দিল বলেছে, 'তা ওরা যে পাহারা দিয়ে বসে আছে বেরোলেই কাটবে, কেন এখানে কি থানা-পুলিস নেই? অরাজক রাজত্ব নাকি?' সে সিপাহী বলেছে, 'এখানে কি আর কিছু করবে? পিছু নেবে হয়ত—কোন নির্জন জায়গায় গিয়ে কাজ হাসিল করবে। তাছাড়া ও জাতটা বড় বদ—ওরা অত নিজেদের জানের পরোয়া করে না। আক্রোশটা তো আগে মেটাবে, তারপর থানা-পুলিস হয় হোক।

যাই হোক, খবরটা পাওয়া গেছে, সেইটেই বড় কথা। দিলু তখনই তাকে এক বোতল নয়, পুরো দু' বোতল বিলায়তী সরাবের দাম দিয়ে দিয়েছে (অবশ্য তার মা সে খবরটা জানেন না, জানলে সোজাসুজি ক্ষেপে যেতেন একেবারে)। সে সান্ত্রীকে বললে, তখন কিল্লাতেও ঢুকিয়ে দিত সে। কিন্তু দিল মহম্মদের সাহসে কুলোয় নি। ঐ বিশাল ফটক, দু'দিকে ঘেরা গলিপথ এবং চারদিকে বন্দুকধারী সেপাই সান্ত্রী দেখে তার মাথা ঝিমঝিম ক'রে উঠেছে। সে সেই সিপাইকে দু'টি হাত ধরে অনুরোধ করেছে, যে আগাকে যেন খুঁজে বার ক'রে খবরটা দিয়ে দেয়—তার মা বোন ভালই আছে। বলা বাহুল্য টাকাটা হাতে পাবার পর সে লোকটির আর অত গরজ থাকে নি, তৎক্ষণাৎ ভুলে গেছে। কিন্তু দিল মহম্মদের বিশ্বাস যে আগা খবর পেয়েছে নিশ্চয় এবং নিশ্চিন্ত হয়েছে। সে লোককে সহজে অবিশ্বাস করতে পারে না। নিজেকে দিয়েই সকলকে বিচার করে।

সেদিন দিলু বাড়ি ফিরেছে প্রায় নাচতে নাচতে। শহর থেকে এক ঝুড়ি খাবার কিনে এনেছে—ভাল ভাল লাড্ডু, বালুশাহী, ঘিওর। গুলের জন্যে এনেছে দামী সালোয়ার কামিজ ওড়না। ওর মায়ের জন্যেও একপ্রস্থ নতুন পোশাক এনেছে। একটু হয়ত কম-দামী, তবে একেবারে নিরেস নয়। পাছে অর্থাভাবে ওরা বলতে সঙ্কোচ বোধ করে, তাই জোর ক'রে গুল আর তার মাকে পাঠিয়েছে পীরের দরগায় সিন্নি চড়াতে, আয়োজন ক'রে দিয়েছে ভাল রকম পুজো দেবার—মায় ধূপ বাতি কিছুই ভোলে নি। স্থানীয় পীর গাজীসাহেবের নামেই এ গাঁয়ের গাজীমণ্ডী নাম,

তাঁর দয়াতেই সুখবর মিলেছে, তাঁকে খুশী করা আগে দরকার।

তারপর অনেকটাই নিশ্চিন্ত হয়েছে এরা। কি চাকরি, কত টাকা মাইনে কেউই জানে না—সুতরাং আশাটা বেশ ফুলে ফেঁপে বড়ই হয়ে উঠেছে ক্রমশঃ। গুলের ধারণা একদিন অনেক টাকা নিয়ে এসে দাদা হাজির হবে রূপকথার রাজপুত্রের মতো—সেদিন এদের ঋণ, আর্থিক ঋণ অবশ্য, অন্তরের ঋণটা শোধ করার স্পর্ধা সে রাখে না আজও—পাইপয়সা পর্যন্ত চুকিয়ে দেবে। আজকের এই উপহারেরও চতুর্গুণ না হোক দ্বিগুণ ফিরিয়ে দেবে সে। সেই ভরসাতেই দিল মহম্মদের দেওয়া উপহার হাত পেতে নিতে পারে—নইলে এটা চরম অপমান বলে বোধ হ'ত, এ দান নেবার আগে গলায় দড়ি দিত।

তবু, সবটারই একটা সীমা থাকা দরকার বৈকি! কোন জিনিসেরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। কিন্তু দিল মহম্মদ আজকাল সেই বাড়াবাড়িই শুরু করেছে। এই নিয়েই তাদের মধ্যে এত কলহ কেজিয়া হয়। দিল্লী যাওয়া একটা ছলছুতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাইয়ার খবর আর নতুন কি আসবে—কিছুই আসে না বিশেষ। 'হাঁ ভাল আছে, কাজকর্ম করছে' এইটুকু শুধু। আসে যা তা হচ্ছে গুলের জন্য নিত্য নতুন উপহার। কিছু না কিছু আনবেই সে। আর ওজরেরও অভাব হয় না। 'এই সামনে পেলুম তাই' কিম্বা 'ফিরিওলাটা হাতে পায়ে ধরতে লাগল—সকাল থেকে তার বউনি হয় নি', নয়তো 'সস্তায় দাঁওতে পেয়ে গেলুম বলতে গেলে—তাই।' আনেও বিচিত্র সব জিনিস ভেবে ভেবে। হয় নতুন পোশাক, নয়তো ফিরোজাবাদী চুড়ি, নয়তো আগ্রার আতর, বেরিলীর সুর্মা—আরও কত কি। মায় আংরেজদের মেমরা মুখে যে সব জিনিস মাখে ননীর মতো, গুঁড়ো সাদা সাদা চকখড়ির মতো —সেসব সুদ্ধ। কোনটার কত দাম তা ঠিক জানে না গুল। নিজের মায়ের কাছে তো দিল অসম্ভব কমিয়ে বলেই—কিন্তু কোনটারই যে দাম অত অল্প নয় তা হলফ্ করে বলতে পারে সে। বিশেষ ক'রে এই 'বিলায়তী' প্রসাধন সামগ্রী—এর যে কত দাম তা আন্দাজ করতে গেলেও মাথা ঘুরে যায় ওর। কিন্তু এতেই শেষ নয়, আরও বাড়াবাড়ি করেছিল একদিন। চাঁদনীচকের এক বিখ্যাত জেবরওয়ালার দোকান থেকে রুপোর হাঁসুলি আর খাড়ু এনে হাজির করেছিল। ওটা বার করতেই গুলের মুখে যে আষাঢ়ের মেঘ ঘনিয়ে এসেছিল, এবং দুই চোখে বিদ্যুৎ—তাতে আসন্ন বজ্রপাতের আভাস পেয়ে ভয়ে ভয়ে বলে ফেলেছিল দিল মহম্মদ, 'একটা সিপাই দিয়ে আগাই পাঠিয়ে দিয়েছে এ দু'টো—'

কিন্তু গুল তাকে কথা শেষ করতে দেয় নি, গহনা দু'টো নিয়ে একদম বাইরের আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। কঠিন ভাবেই বলেছিল 'ঝুট। তুমি ঝুট বলছ দিলু মিঞা। এ তুমিই কিনে এনেছ। যদি সত্যি কথা বলতে তাহ'লেও রাগ করতুম কিন্তু এত অপমান বোধ করতুম না। তাছাড়া এই মিথ্যা কথাটার পেছনে তোমার অজান্তে তুমি একটি সত্য স্বীকার করেছ যে এটা দেওয়াও তোমার অন্যায় —আমার নেওয়াও। এর পর আমি আর কোন উপহার তোমার কাছ থেকে নিতে রাজী নই। ও জেবর তুমি কাল সকালেই ফেরৎ দিয়ে আসবে—নইলে এ বাড়িতে আমি আর জলগ্রহণ করব না।'

অতঃপর বহু বলে, বহু বুঝিয়ে, ভবিষ্যতের জন্যে বহু প্রতিজ্ঞা ক'রে অনেক দিব্যি দিয়ে বলতে গেলে গুলের হাতে পায়ে ধরে সে যাত্রা অব্যাহতি পেয়েছিল দিল মহম্মদ কিন্তু সে খাড়ু ও হার পরাতে পারে নি। কিছুতেই ও অলঙ্কার গায়ে

তুলতে রাজী হয় নি গুল, আজও সেটা জমা আছে সাকিনা বিবির কাছে (সাকিনা বিবি বোধ করি সেই দিনই সব চেয়ে খুশী হয়েছিলেন গুলের ওপর), গুল বলেছে, 'দাদা যদি কোনদিন আসে, ঐ জেবরের দাম কড়ায় গণ্ডায় শোধ দেব, তবে আমি পরব ওগুলো, তার আগে নয়।'

সেই থেকে বেশ কিছুদিন চুপচাপ ছিল দিলু। আজ আবার নতুন ক'রে দিল্লী যাবার এই হুজুগ। গুল বেশ জানে যে এটা একটা ছুতো—এই ভাইয়ার খবর নিতে যাওয়াটা। আসলে তারই জন্য নতুন কোন পোশাক কি কিছু একটা কিনতে যাচ্ছে। সম্প্রতি মার অজ্ঞাতে হাতে কিছু টাকা এসেছে দিল মহম্মদের, সে খবর ও জানে।

দিল মহম্মদ গুলের সহজ অথচ তীক্ষ্ণ প্রশ্নটার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে মাথাটা চুলকে বলল, 'না—তবু কেমন আছে মানুষটা, অসুখ-বিসুখ করল কিনা একটু খবর নেওয়া দরকার নয়?'

'তুমি আবার এই সাত-সকালে মিথ্যের ঝুড়ি খুলে বসলে দিলু মিয়া? কে তোমার জন্যে রোজ রোজ এত খবর নিয়ে বসে থাকে বল তো? হড়ঘাড় সান্ত্রী বদল হচ্ছে কিল্লার ফটকে—কিল্লা সুদ্ধ সেপাইকে তুমি হাত করেছ বলতে চাও? সেবার তো একটি গাদা টাকা খরচ ক'রে তবে খবর পেয়েছিলে, এখন কি সান্ত্রীরা সবাই পীর ফকির বনে গেছে, না রাতারাতি তারাও দিল মহম্মদ হয়ে গেছে, টাকার ওপর কোন দুখ-দরদ নেই? সব কি বিনা ঘুষেই খবর এনে দিচ্ছে নাকি আজকাল? ...দ্যাখো, আমাকে কোন কথা ছাপাতে যেও না, পারবে না। সত্যি ক'রে বল তো, কী মতলবে যেতে চাইছিলে?'

'মতলব আবার কি!' দিল মহম্মদ রাগ ক'রে বলে, 'তোর এক কথা! তোর মনে হয় তুই খুব একটা জান-বুঝদার মানুষ হয়ে গেছিস—না? সবতাইতে টিক্‌টিক্‌ করা যেন একটা রোগে দাঁড়িয়ে গেছে তোর!'

'বেশ, তবে যাও। কিন্তু একটা কথা, আমার মাথায় হাত দিয়ে কিরে খেয়ে যাও যে শহর থেকে কোন জিনিস আনবে না—এক দামড়ি এক ছিদামের জিনিস নয়? আমি এখনই দুধ গরম ক'রে এনে দিচ্ছি, ক্ষারে কাচা পিরান বের ক'রে দিচ্ছি—সেজেগুজে তোফা চলে যাও, কিচ্ছু বলব না।'

'দ্যাখ গুল্লু, সবতাইতে এক-শোবার কিরে খেতে বলবি নে, বুলে দিলুম। কথায় কথায় কিরে খেলে খোদা নারাজ হন। দোস্তের খবর নেওয়াটাই আসল—তবে বাজারে কি যাব না একবারও বলেছি? আর আনব না-ই বা কেন? বিশ্বাস ক'রে ভরসা ক'রে আমার হাতে রেখে গেছে সে, সব দিক দেখা আমার কর্তব্য নয়? সে যদি দ্যাখে এই ময়লা কামিজ পরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস—মনে দুঃখ পাবে না? ভাববে না যে, আমি এসে না হয় টাকাটা ফেলেই দিতুম, দোস্ত এই ক'দিনের জন্যে একটা নতুন পোশাক এনে দিতে পারে নি?'

'দ্যাখো, মেলা বকবক ক'রো না বলছি সক্‌কাল বেলা। আমার দাদা কি ভাববে সেটা আমি তোমার চেয়ে ভালো বুঝি!...আমি ঠিক জানি যে ঐরকম একটা কিছু বাজে মতলব ফেঁদে বসে আছ! আমার পোশাকের এত অভাব তোমায় কে বলেছে? বলি, তুমিই এই কমাসে কটা এনে দিলে তার কোন হিসেব আছে? তোমার মাথাটা দেখছি বিলকুল বিগড়ে গেছে।'

'এত যদি আছে তবে কাল থেকে ঐ ময়লা কামিজটা পরে ঘুরছিস কেন?' মুখ গোঁজ ক'রে উত্তর দেয় দিলু।

'আ গেল যা! তোমার এটা বাদশার প্রাসাদ না আমির ওমরাওয়ের দৌলতখানা? পাকা ইমারত, পাথরের মেঝে—সত্যিই তো, এর মধ্যে কামিজ ময়লা হবে কেন? ওগো নবাব সাহেব, বাড়িই তোমার মাটির, এর মধ্যে ঘুরে ফিরে কাজ করলে পোশাক ময়লা হবে না? এই তো আজই গরম জল বসিয়েছি—অর্জুন গাছের ফল এনে পুড়িয়ে রেখেছি ক্ষারে কেচে দেব, বিকেলেই দেখবে ধব্‌ধবে ফর্সা হয়ে গেছে। বরং এখনই আমি একটা সালোয়ার কামিজ বার ক'রে পরছি। তাহ'লেই হবে তো? ...এখন লক্ষ্মী ছেলের মতো বসে মেওয়ালালের হিসেবটা ক'রে ফেল দিকি—'

'কিচ্ছু করব না আমি। পারব না অত হিসেব-নিকেশ করতে। এই আমি আবার শুয়ে পড়লুম।'

সত্যিই সে ধপ করে চারপাইতে বসে পড়ে আবার।

অতিকষ্টে হাসি চেপে গুলই ওকে আস্তে আস্তে শুইয়ে দেয় বিছানায়, তারপর ছেলেমানুষের মতো ওর কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে, 'সেই ভাল! এখন বরং ঘুমিয়ে নাও আরেকটু। তাহলে আমিও বাঁচি। একেবারে গরম হালুয়া ক'রে, দুধ জ্বাল দিয়ে ডাকব—তখন উঠে খেয়ো। বেলায় বরং দুখানা কচুরীও ভেজে দেব —দেখো তোমার ঘণ্টেওয়ালা হালুয়াইয়ের চেয়ে খারাপ হবে না কিছু। যেমন ভাল-বাসো তুমি, ইয়া বড় বড়!'

'সাচ্? সত্যিই আজ কচুরি বানাবে গুল্লু মিয়া?'

'বানাব—যদি অবশ্য দুধ খেয়ে বসে ঐ চানার হিসেবটা ক'রে দাও!'

'ঐ তো বেয়াড়া বেরসিকের মতো কথা বলো! হচ্ছে কচুরির কথা, তার মধ্যে আবার চানার হিসেব আসে কোথা থেকে?'

'হিসেব হ'লে কচুরি মিলবে—বক্‌শিশ। নইলে কিচ্ছু না। পোড়া রুটি আর জল একটু। আচ্ছা হিসেবটা হ'লে টাকাটা কি আমি পাব, না তুমি জেবে পুরবে তাই শুনি!'

'আচ্ছা—তাই হবে। আজ মেওয়ালালের মুণ্ডুপাত না ক'রে তুমি ছাড়বে না দেখছি।'

গুল হেসে ওর গালে একটা টোকা দিয়ে চ'লে যাচ্ছিল, দিল মহম্মদই আবার ডাকল, কেমন একটু গাঢ় স্বরে, 'আচ্ছা গুল্লু শোন্—এদিকে আয়!'

'কী?' কাছে এসে দাঁড়ায় গুল, 'কি বলছ কি?'

'আচ্ছা আমি তো তোর সব কথা শুনি—তুই আমার কথা শুনিস না কেন?'

'কি কথা শুনি না বলো?'

'এই—মানে এই কিছু জিনিসপত্র আনলে নিতে চাস না, গালাগালি করিস—আমি, আমার এতে দুঃখ হয় না?'

'দুঃখ হয় জানি দিলু মিয়া—' গলা বুঝি গুলেরও গাঢ় হয়ে আসে এবার, 'তোমার দুঃখ দেখলে আমারও কি দুঃখ কম হয় মনে করো! তবু কেন যে আমি নিতে চাই না সে তোমাকে এখন বোঝাতে পারব না। তুমি—তুমি সত্যিই বড় ছেলে-মানুষ। আমি বয়সে তোমার থেকে ছোট, তবু দুনিয়াকে ঢের বেশী বুঝি, ঢের বেশী চিনি সত্যিই!'

সে চলে যেতে দু' হাতে এক বিচিত্র ভঙ্গী ক'রে আবার শুয়ে পড়ে দিল

মহম্মদ। সত্যিই এত ঘোরপ্যাঁচ বোঝে না সে।

সেদিনই যে আগা অমন অপ্রত্যাশিতভাবে চলে আসবে তা ওরা স্বপ্নেও ভাবে নি। সে এসে যখন ডাকছে তখনও ওদের কারো বিশ্বাস হয় নি। ওরা অবশ্য খানিক আগেই খেয়েদেয়ে শুয়েছে—কিন্তু তখনও ঘুমিয়ে পড়ার দেরি ছিল। ডাক কানে গেছে সকলেরই, তবু মনে হয়েছে ভুল শুনছে। তিন চার বার দিল মহম্মদ আর গুলের নাম ধরে ডাকতে যখন আর কোন সন্দেহের অবকাশ রইল না—সকলেই হৈ হৈ ক'রে বেরিয়ে পড়ল যে যার ঘর থেকে।

তারপর যে কী হ'ল কিছুক্ষণ ধরে, কেউ জানে না। আগার মা হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলেন ছেলেকে জড়িয়ে ধরে, চুমো খেলেন, দিলু ওকে কোলে তুলে নিয়ে নাচতে লাগল, আর গুল একই সঙ্গে কেঁদে হেসে চেঁচিয়ে হাট বসিয়ে ফেলল।

প্রাথমিক উচ্ছ্বাসটা কমতেই দিলু হুকুম করল গুলকে, 'আরে চুল্‌হাতে আগ দে! হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কি? দোস্ত্‌ খাবে, না—শুধু তোর সুরত্‌ দেখলেই পেট ভরে যাবে তার?'

'উহুঁ, উহুঁ, খাবার সময় নেই ভাই দোস্ত্‌ এখনই ফিরতে হবে। বাদশার কড়া হুকুম—দশটার আগে কিল্লাতে ফিরতেই হবে।'

'সে কি! সে কি করে হয়! আজকের রাতটা থাকবে না এখানে?' সকলেই অনুযোগ করে—এমন কি সাকিনা বিবিও।

'কোনও উপায় নেই—' একটু অন্যদিকে চেয়ে বলে আগা, 'বাদশা রাগ করবেন নইলে, যেতেই হবে।'

তখন শুরু হয় প্রশ্ন চারদিক থেকে।

তাহ'লে সে কি সিপাহীর চাকরীই পেয়েছে? কত তন্‌খা? এখানে কি কাজে এসেছিল? না ওদেরই দেখতে? তাহলে একটু বেশী ছুটি নিয়ে আসে নি কেন? ইত্যাদি।

এর মধ্যেই দিলুর মনে পড়ে যায় কথাটা, 'তুমি আমাদের খবর পেয়েছিলে ঠিক ঠিক?'

আগা আকাশ থেকে পড়ে, 'কৈ না তো। কী ক'রে খবর পাবো? সেই জন্যেই তো আমি পাগলের মতো হয়ে রয়েছি—কোন খবর পাই নি বলেই।'

তখন দিলু সব খুলেই বলল, ওর বেকুফির ইতিহাস। তার খবরের জন্যেই শুধু কত টাকা খরচ করেছে শুনে দুই চোখ ছল্‌ছল্‌ করতে লাগল আগার। খরচ আরও কত করেছে সে এবং এখনও হয়ত করছে—শুধু কোনমতে ভিক্ষার দানেই রাখে নি ওর মা আর বোনকে—তা তাদের পোশাকের দিকে চেয়েই বুঝছে আগা। সে নিজের দু' হাতে দিলুর দু'টো হাত ধরে বলল, 'এখনও তোমার ওপরই অত্যাচার চালাব দোস্ত —এখনও আমার এমন ক্ষমতা হয় নি যে ওদের খরচ টানতে পারি কোথাও রেখে। শহরে ওদের নিয়ে যাওয়াও নিরাপদ নয়। আমি আজ বেরিয়ে এসেছি কোনমতে— বাদশার দয়ায়, আবার কবে বেরোতে পারব তা জানি না। মাইনে পাই খাওয়া বাদ আট টাকা—তা তাতে কি ওদের চলবে?'

'সে কী—তবে যে শুনি সেপাইরা ষোল টাকা মাইনে পায়!' দিলু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

'সেপাইরা কত পায় তা জানি না—আমি এখনও সেপাইর কাজ পাই নি। এটা

শুধু পোশাক। রাত্রে এই পোশাকে এলে দুশমনরা চিনতে পারবে না তাই বাদশা ক'ঘণ্টার জন্যে ধার দেবার হুকুম দিয়েছেন। সেপাইয়ের কাজ হয়ত আংরেজ ছাউনীতে পেতে পারি—একজনের সঙ্গে দোস্তি করেছি, সে বলেছে একটু লেখাপড়া জানা থাকলে সেপাই থেকে হাবিলদার হ'তে ছ'মাসও লাগবে না। জমাদার পর্যন্ত হ'তে পারব। লেখাপড়াও শিখছি সেই দোস্তের কাছে। আংরেজিও পড়ছি কিন্তু বড্ড অসময়ে নিজে থেকে এই কাজ দিয়েছেন বাদশা, এখনই ছাড়তে লজ্জা করছে। আর কিছুদিন দেখে একটা চেষ্টা করব। তবে মনে হচ্ছে বাদশার নজর আছে আমার ওপর, কিছু একটা সুযোগ-সুবিধা পেলে ভাল কাজে লাগিয়ে দেবেন। বাদশার হাতে পুঁজি তো তেমন নেই—আংরেজদের পিন্‌সিন ভরসা!'

'ব্যস ব্যস!' আশাবাদী দিল মহম্মদ আগার বুকে দু'টো চাপড় মেরে বলে, 'কিচ্ছু ভেব না, আল্লার ফজলে, বড় পীরসাহেবের দয়ায় সব ঠিক হ'য়ে যাবে। যখন বাদশার নজরে পড়ে গেছ—তখন আর ভয় কি। দিন কিনে নিতে কতক্ষণ। ব'লে কতলোক ঐ কিল্লাতে দ্যাখ পুরো জিন্দিগী কাটিয়ে দিল—বাদশা তার খবরও রাখেন না। বাদশার নজরে পড়া কি সাধারণ কথা! বাপ রে, কত বড় লোক হয়ে যাবে দেখো দু'চার দিনের মধ্যে—তখন যেন গরীব দোস্তের কথা মনে থাকে!...তবে ভাই দোস্ত্—ঐসব অত্যাচার-ফত্যাচারের কথা যদি বলো তো মুখ-দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যাবে, আমি স্রেফ দু'আঁখ যেদিক চায় চলে যাব ঘরবাড়ি ছেড়ে। আর এও বলে রাখছি, কোনমতে যে একটা কোথাও কুটুরি ভাড়া ক'রে মা আর গুল্লুকে নিয়ে যাবে তাও চলবে না। সে আমি ছাড়ব না। এমনিই গুল্লু চলে গেলে বড্ড অসুবিধে। আমার জমি-জমা তো ঐ দেখে বলতে গেলে। তা যাকগে মরুকগে, সে যদি নিজের বাড়িটাড়ি ক'রে কখনও নিয়ে যেতে পারো তো আর আটকাব না, নইলে—'

বাধা দিয়ে আগা বলে, 'বাড়িঘরের ভাবনা কি দোস্ত্, বারকতক অত্যাচার, তোমার দয়া, ঋণ, এইসব বললেই তো তুমি ঘরবাড়ি ছেড়ে দিয়ে দিওয়ানা হ'য়ে বেরিয়ে যাবে—তখন এই ঘরবাড়ে দখল ক'রে ফেললেই হবে!'

বলতে বলতেই সে হো হো ক'রে হেসে উঠল। অনেকদিন পরে দিলখোলা হাসি হাসল সে। হাসতে পারল।

হাসল দিলুও—কিন্তু তারপরেই আগাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তামাশা না দোস্ত্। কী হবে দুটো পয়সার জন্য পরের খিদমৎ খেটে, এসো না—যা আছে দুই বন্ধু ভাগাভাগি ক'রে নিই! যা আছে খেটে খেলে তোমার আমার জীবনটা খুব কেটে যাবে।'

আগাও ওকে বুকে চেপে ধরল গাঢ় আলিঙ্গনে, বলল, 'তোমার উপযুক্ত কথাই তুমি বলেছ দোস্ত্। এদিক থেকে তুমি দুনিয়ার যে কোন বাদশার বড় বাদশা। কিন্তু তা হয় না। পুরুষমানুষ, নিজের জীবন নিজে গড়ে না নিলে এর পর আমার ছেলে নাতির দিকে চোখ তুলে চাইতে পারব না যে, সবাই অমানুষ ভাববে। ভয় কি, জীবন তো পড়েই আছে, ভগবানের দয়ায় হাতে জোর আছে, বুকে সাহস আছে, একটা কিছু ক'রে নিতে পারব না? খুব পারব...। আর না পারি, জীবনযুদ্ধে হেরে যাব—এই-ই যদি খুদার মনে থাকে—তুমি তো রইলেই অধম-তারণ।'

এর উত্তরে দিলু যেন কি বলতে যাচ্ছিল—হঠাৎ বাইরে একটা শোরগোল উঠল। খানিকটা জোর আলোও এসে পড়ল ওদের চিরাগজ্বালা আঙিনায়।

অনেকগুলো ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ না?

একটা ঘোড়া তো ডেকেও উঠল চিঁহি' চিঁহি' ক'রে।

মুখ শুকিয়ে উঠল সকলকারই। গুল্লু ছুটে গিয়ে ওর ঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে দেখে এসে সংক্ষেপে শুধু বলল, 'রাজমাকীরা। ওরা তো আছেই, বোধহয় কিছু ভাড়া-করা লোকও এনেছে। দশ বারোজনের কম হবে না দলে। দুটো মশাল জেবলে এসেছে—বন্দুক আছে চারজনের কাছে।'

এক মুহূর্তে একটা অসহনীয় স্তব্ধতা।

তারপরেই দিলু চাপা গলায় বলে উঠল, 'লুকিয়ে পড়ো দোস্ত্, লুকিয়ে পড়ো। বলব কেউ আসে নি। আঃ, ঘোড়াটা কোথায় আবার লুকোব ছাই!'

মুহূর্তের জড়তা মুহূর্তেই কেটে যায়। আগা সক্রিয় হয়ে ওঠে নিমেষে। এক ফুঁয়ে চিরাগটা নিভিয়ে দেয় সে।

তারপরেই বলে, 'আমি চললুম ভাই দিল, লুকিয়ে পার পাওয়া যাবে না, ওরা ভালরকম খবর নিয়েই এসেছে। পিছু পিছু এলে টের পেতুম, অন্য কোন পথ দিয়ে এসেছে। বোধহয় হেকিমসাহেবের কাজ এটা—আমিই বলেছিলুম। চলি—'

'কোথায় যাবে দোস্ত্—একলা যাবে মরতে অতগুলো লোকের মধ্যে? চলো তাহ'লে আমিও যাই।'

'না, তুমি গেলে এদের কে দেখবে? তা ছাড়া তুমি লড়াইয়ের কিছুই জান না—তুমি প্রথম চোটেই মরবে। আর দেরি করব না, দেরি করলে ওরা হয়ত এদের ধ'রে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। আমি বেরিয়ে ওদের ব্যস্ত রাখছি, তুমি এদের নিয়ে গিয়ে আর কারও ঘরে কি জঙ্গলে আশ্রয় নাও আপাততঃ—আর সময় নেই। আমার জন্যে ভেবো না, আমি ঠিক বেরিয়ে যাব, ওদের চোখে ধুলো দিয়ে।'

সত্যিই সময় ছিল না আর। মাটির দেয়ালে উঠে পড়েছে দু'জন, দু'জন শক্ত মজবুত কবাটে দমাদম লাথি মারছে।

ঘোড়াটা ভাগ্যে উঠানের মধ্যে এনেছিল, আগা নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়ে এক-লাফে ঘোড়ায় চেপে বসল। ঘোড়ার পিঠে বাঁধা ছিল বন্দুকটা। দোনলা বন্দুক, দুটি মাত্র টোটা ভরা আছে। আর ভরবার সময় হবে না। ওর ওপর ভরসাও করা চলবে না এই অন্ধকারে, সে বন্দুকটা খুলে নিয়ে অব্যর্থ লক্ষ্যে দুটি গুলিতে দু'জনের হাত থেকে মশাল দুটো ফেলে দিল, তারপর বন্দুকটাও ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেই সাময়িক অন্ধকার এবং ইতিকর্তব্য-বিমূঢ়তার সুযোগ নিয়ে তলোয়ারখানা খুলে বিদ্যুৎগতিতে বেরিয়ে গেল পাঁচিল ডিঙিয়ে। শিক্ষিত ঘোড়া ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র সেই অল্পপরিসর স্থানেই নিজের চাল ঠিক ক'রে নিয়ে অনায়াসে পার হয়ে গেল পাঁচিলটা।

আর একবার বলে গেল আগা যাবার আগে, 'পালাও দোস্ত্, পালাও। আর একটুও দেরি ক'রো না। আর মোটে সময় নেই।'

তারপর কি হয়েছে আগা জানে না। সে ক'জনকে জখম করেছে আর তাকে ক'জন জখম করেছে সে অন্ধকারে, তা বলতে পারবে না। ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় দয়া—ঘোড়াটা অক্ষত ছিল বরাবর, তার গায়ে একটুও চোট লাগে নি। সে ছুটেওছে খুব নাহ'লে কোনমতেই রক্ষা পেত না আগা। সে অবশ্য দাঁড়িয়ে লড়াই করবার চেষ্টাও করে নি একবারও। কারণ এটুকু ওর মধ্যেই বুঝে নিয়েছিল যে, সে চেষ্টা শুধু চরম নির্বুদ্ধিতাই হবে না—আত্মহত্যারও সামিল হয়ে পড়বে। তাছাড়া ক্রমাগত

ছুটে এগিয়ে যাবার আরও উদ্দেশ্য ছিল, গুলদের পালাবার সুযোগ দেওয়া, তাদের দিক থেকে মনোযোগ এবং সম্মিলিত শক্তি নিজের ওপর টেনে নিয়ে যতটা সম্ভব দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া দুশমনদের।

আর—আর যদি ভাগ্যই খারাপ হয়, যদি ওদের হাতে মৃত্যুই অদৃষ্টে থাকে তো সেটা যেন গুলদের চোখের সামনে না হয়। তাহলে তারা হয়তো কেঁদেকেটে পাগলের মতো সামনে এসে পড়বে, সেধে এসে ধরা দেবে শয়তানগুলোর হাতে। যে দুর্ভাগ্য এড়াবার জন্য সে এতদিন ধরে কত কৃচ্ছ্রসাধন করল, সেই দুর্ভাগ্যকেই ডেকে আনবে তারা সেই ক্ষণিক চিত্তবৈকল্যের ফলে।

তাই ক্রমাগত এগিয়েই গেছে সে। যেতে যেতেই লড়াই করেছে। ওরা বার বার এসে ঘিরে ধরবার চেষ্টা করেছে—বারবারই পিছন ফিরে প্রবল তেজে আক্রমণ করেছে ওদের, ফলে কেউ হয়ত পড়েছে, কেউ হয়ত জখম হয়ে পিছিয়ে গেছে কিছুক্ষণের জন্য—সেই অবসরে আবার এগিয়ে গেছে আগা। ওর লক্ষ্য কিল্লা—কোনমতে কিল্লায় পৌঁছতে হবে।...

তবে রাত দশটার মধ্যে হবে না সেটা বুঝেছিল। হয়ত সোজাপথে গেলে তাও হ'ত কিন্তু তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছোটাতে গিয়ে, আক্রমণকারীদের থেকে ব্যবধান বাড়াতে গিয়ে অন্য পথে গিয়ে পড়েছিল, ফলে আরও দেরি, আরও বেশীক্ষণ লড়াই।

শত্রুদের কাছে বন্দুকও ছিল গোটাকতক। ছুঁড়েছেও তারা সেগুলো মধ্যে মধ্যে—কিন্তু অন্ধকারে, বিশেষ দুপক্ষই যখন ছুটছে তখন লক্ষ্য ঠিক রাখা শক্ত। একটা গুলি বাঁ হাতের খানিকটা ছড়ে বেরিয়ে গেল। অবশ্য গুরুতর জখম কিছু হয় নি তাতে। জখম যা হয়েছে তলোয়ারেই তবে তখন আর সেদিকে খেয়াল ছিল না, অবিরাম রক্তপাতে জামা পাজামা ভিজে উঠে যা অস্বস্তি হচ্ছে—নইলে জ্বালা-যন্ত্রণা কিছু অনুভব করে নি সে, অনুভব করার মতো অবসরও ছিল না।

অবশেষে একসময় চাঁদ উঠল। সে আরও বিপদ। অন্ধকারের আবরণ রইল না আর। অন্ধকারই প্রধান বর্মের কাজ করছিল এতক্ষণ। অবশ্য এর মধ্যে আক্রমণ-কারীর সংখ্যাও কমে এসেছে। মাত্র চারজনে এসে ঠেকেছে। বাকী মারা গেল কি জখম হল কি পিছিয়ে গেল—তা বুঝতে পারল না। কমেছে এইটুকুই আশ্বাসের কথা। তবে যারা আছে তারাই যথেষ্ট। এক মুহূর্তও শান্তি দিচ্ছে না তারা। তারাও হয়ত জখম হয়েছে কিছু কিছু, কিন্তু সেদিকে তাদেরও ভ্রূক্ষেপ নেই।

শেষ পর্যন্ত অজস্র রক্তপাতে যখন মাথা ঘুরতে শুরু করেছে, হাত আসছে অবশ হয়ে—সেই চরমক্ষণে লাল কিল্লার লাল পাথরটা নজরে পড়ল! ঐ তো ফটক একটা। কী ফটক? কোন ফটক ওটা? কে জানে। যাই হোক, হে ভগবান, আর একটু, আর একটু বল দাও, আর কয়েক মুহূর্ত বাঁচিয়ে রাখো—যদি মরতেই হয় তো সেই বেহেস্তবাসিনী হুরী—তার শাহ্জাদী, তার আসমানের চাঁদের পায়ের কাছে যেন জীবনটা যায়। সে যেন জানতে পারে—ইচ্ছে ক'রে দশঘড়ি পার ক'রে দেয় নি আগা। নিতান্ত বাধ্য হয়েই দেরি করতে হয়েছে তাকে—

আঃ!—আর ভয় নেই, আসতে পেরেছে সে ফটকের মধ্যে, ফটক পার হয়েও এল শেষ অবধি।

আর বইতে পারছে না তলোয়ারটা, দেহটাও আর ঠিক থাকছে না যে! মাথা—মাথাটা এমন করছে কেন?

অয় আল্লা!...সে কোথায়? এরা কারা? সিপাই কি? শাহ্জাদী—

আর কিছু জানে না আগা। আর কিছু মনে নেই।

এরপর কটা দিন আগার যেন নিরবচ্ছিন্ন দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে কাটল। কিছুই ভাল রকম মনে পড়ে না তার। যেটুকু মনে আছে—ঝাপ্সা ঝাপ্সা অস্পষ্ট, টুকরো টুকরো—ছাড়া-ছাড়া ভাবে। স্বপ্নের মতোই। স্বপ্ন যেমন মাঝে মাঝে খাপছাড়া ভাবে মনে পড়ে ঘুম ভাঙবার পর—তেমনিই। মনে আছে যেটা—সে হল যন্ত্রণা, অসহ্য অসহনীয় যন্ত্রণা। যখনই একটু জ্ঞানের মতো হয়েছে তখনই বোধ করেছে সর্বাঙ্গে সর্ব-অনুভূতি-বিহ্বল-করা যন্ত্রণা একটা। কারা সব এসেছে মধ্যে মধ্যে, বোধ হয় চিকিৎসাদির ব্যবস্থাও হয়েছে—কিন্তু সে সব গৌণ—মুখ্য যা তা হল অসহ্য একটা জ্বালা। সর্বদেহে পাগলকরা যন্ত্রণা।

তবে ঘুমিয়েও পড়েছে মধ্যে মধ্যে। ঘুম হয়ত নয়—অজ্ঞান অবস্থা। যেন মনে হচ্ছে সেই প্রথম রাত্রেই কে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি এসে দেখে গেলেন তাকে। কী কতকগুলো ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা যেন লাগিয়েও দিলেন তার কাটা জায়গাগুলোতে। তার আগে কে যেন এসে পোশাকগুলো খুলে নিল। ওঃ, সে সময় কী কষ্ট! ঠিকমতো জ্ঞান না থাকলেও একটা দুঃসহ কষ্টের স্মৃতি মনে আছে। তখন মনে হয়েছিল সেই বুঝি মৃত্যু-যন্ত্রণা। এবার মরছেই সে। তারপর যেন সেই বৃদ্ধই তার মুখ হাঁ করিয়ে কী একটা খাইয়ে দিলেন তাকে। তারপর আর কিছু মনে নেই। বেহুঁশ হয়ে পড়েছে।

কতদিন এমন অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল সে তাও জানে না। মধ্যে মধ্যে এক একবার খুব কষ্ট বোধ করেছে। সেই জ্বালাযন্ত্রণা,—আবার যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। সম্ভবতঃ প্রলাপের মতোও বকেছে কিছু কিছু। কারণ সেই অজ্ঞান অবস্থাতেই মাঝে মাঝে নিজের গলা নিজের কানে গেছে। কী যেন বলছিল সে।...কাকে বলছে, কার সঙ্গে কথা কইছে?...চমকে চাইবার চেষ্টা করেছে, চোখ মেলে দেখেওছে হয়ত—কিন্তু কাউকে দেখতে পায় নি।

তবে কেউ কেউ এসেছে তার ঘরে—এটা টের পেয়েছে। সেই বৃদ্ধ লোকটি, আলখাল্লার মতো দীর্ঘ কালো রঙের সেরওয়ানী পরা, চোখে পরকলা—তিনি এসেছেন কয়েকবারই। বোধ হয় তিনি কোন হেকিমসাহেব হবেন। তিনি এসে কী সব লাগিয়ে দেন যেন—কী সব খাইয়েও দেন। ওষুধই সম্ভবতঃ, হয়ত ঘুমের ওষুধই—কারণ সেই ওষুধ খাবার পর দীর্ঘকাল আর কোন হুঁশ থাকে না। গাঢ় ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে। এভাবে কতকাল পড়ে থাকে তা সে বলতে পারবে না। দুদিন, একদিন, না কয়েক ঘণ্টা—কে জানে! ঐ বৃদ্ধ ছাড়াও এসেছে কেউ কেউ। ওর সে হাবিলদার বন্ধু আসত, বোধ হয় প্রতি সন্ধ্যাতেই আসত সে। কেমন যেন বার বার একটা ছবিই মনে পড়ে তার—সে এসে চিরাগ জ্বালাচ্ছে। তাতেই মনে হয়, সে প্রতি সন্ধ্যায় না হোক, অনেক সন্ধ্যাতেই এসেছে। রহমৎও এসেছে—এক-আধবার যেন তার মুখটা নজরে পড়েছে মনে হয়। আরও সব এসেছে কারা যেন—কেশবলাল, জীহন আলি, নাসের, মাতা প্রসাদ—এদের মুখগুলো তো মনেই আছে।

অবশ্য এ সবই স্বপ্ন হতে পারে। স্বপ্নও সে দেখেছে প্রচুর। এমন লোককে স্বপ্নে দেখেছে—যে লোকের এখানে তাকে দেখতে আসবার কোন সম্ভাবনা নেই।

রাবেয়া এসেছে প্রায়ই, সেটা মনে আছে। আর স্বপ্নও নয় সেটা। এতবার একই লোককে স্বপ্নে দেখতে পারে না। মনে হয় সে প্রথম রাত্রেও এসেছিল, সে-ই বোধ হয়

ডেকে এনেছিল বৃদ্ধ হেকিম সাহেবকে।

বেচারী রাবেয়া। রাবেয়া তার সত্যিকারের বড় বোন। নইলে এত কি পরের জন্যে কেউ করতে পারে। ছি ছি, কত কৌতুকই না করেছে সে ওকে নিয়ে, বহিন সম্পর্ক পাতানো নিয়ে কত হেসেছে মনে মনে। সময়ে সময়ে ভদ্র ব্যবহারের অভিনয়ও বুঝি কাজে লেগে যায়। রাবেয়া না থাকলে গরজ ক'রে হেকিম ডাকত কে? ঘরে পড়ে মরে পচে থাকত—

শিরীণ্! শিরীণও হয়ত এসেছে সত্যিই। সেও হয়ত স্বপ্ন নয়। যদিও অন্ধকারের মধ্যে কালো বুরখা পরা তাকে ছায়ামূর্তির মতোই মনে হয়েছে। কিন্তু এক আধবার নয়, বেশ কয়েকবারের কথাই মনে পড়ে যে। কাছে এসেও ছুঁয়ে তার ললাটে, কপোলে মধুর স্পর্শ রেখে গেছে তার কোমল হাতের। স্নেহ-প্রেমে-মেশা সে মৃদু নারী-করস্পর্শ পৃথিবীতে অতুলনীয়। যে না পেয়েছে তার জীবনই বৃথা! সে সময়টা মনে হ'ত সে এতটুকু ছোট্টটি হয়ে গেছে। সেই বাল্যকালের মতো। অসুখ বিসুখ করলে মা যেমনভাবে তার কপালে হাত রাখতেন তখন, আল্‌তো-হাতে মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দিতেন—তেমনই লাগত শিরীণের সে স্পর্শ। অভাগিনী শিরীণ্—এত যে দিল সে পেল কি? অকৃতজ্ঞতা, হৃদয়হীনতা—এই তো! কেন এরকম একটা অপদার্থ অকৃতজ্ঞ দীন হীন লোককে এমন হৃদয় উজাড় ক'রে দিল শিরীণ্? এমন অপাত্রে কি এতখানি দিতে আছে? শিরীণ্ স্বপ্ন নয়, তবে স্বপ্নেও এসেছে কেউ কেউ।

স্বপ্ন কি বিকারের ঘোর, তা অবশ্য ঠিক বলতে পারবে না সে।

হঠাৎ একদিন মনে হ'ল একটি চিরাগ হাতে এক দেবদূতী তার মুখের ওপর হেঁট হয়ে অপলক নয়নে চেয়ে আছেন ওর মুখের দিকে। তাঁর অনিন্দ্য, অপার্থিব মুখে কী নিবিড় বেদনার ছায়া—দীর্ঘায়ত পবিত্র চোখে কী সুগভীর করুণা!...সে বাল্যকাল থেকে বহুবার শুনেছে যে কোন মানুষের দুঃখের পাত্র পূর্ণ হয়ে উঠলে খুদা তাঁর আশীর্বাদ দিয়ে দেবদূতদের মর্ত্যে পাঠান। সে আশীর্বাদ, দুঃখ সহ্য করার—দুঃখের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি বাড়িয়ে দিয়ে যায়। খুদা তার জন্যও নিশ্চয় পাঠিয়েছেন সেই দেবদূত। সুরলোকের আশীর্বাদ আর করুণার অমৃত বাণী বয়ে এনেছে সে। এবার আর আগার কোন ভয় নেই, নবজন্ম নিয়ে জেগে উঠবে, নবতর শক্তিতে বলীয়ান হয়ে। দুঃখ দুর্ভাগ্য আরও যত পারে আসুক—পরোয়া করে না সে।

কিন্তু স্বপ্নেও বুঝি মানুষের নিভৃত অন্তর-বাসনাই প্রতিবিম্বিত হয়। অথবা এও ঈশ্বরের আর এক অনুগ্রহ। আকারহীন অদেহী দেবদূতেরা বুঝি যাদের প্রতি করুণায় অবতীর্ণ হন, তাদের প্রিয় ব্যক্তির রূপ নিয়েই দেখা দেন, সে বেশী তৃপ্ত হবে বলে। নইলে সে দেবদূত নারীমূর্তি নিয়ে দেখা দেবেন কেন? আর তার মুখের সঙ্গে বহুকাল আগেকার দেখা একটি অতি প্রিয় মুখ, যার স্মৃতি এতদিন ধরে সযত্নে লালন করেছে সে অন্তরের অন্তরতম নন্দনলোকে—সেই মুখ মিলে যাবে কেন? সেই রাজকীয় অরণ্যের ছায়াঘন স্বল্পাচ্ছাদিত ভূমিশয্যায় একদা অবগুণ্ঠন উন্মোচিত ক'রে যে সুরদুর্লভ মুখ তার চোখে পড়েছিল, যে মুখ দেখে তারপর অনেকক্ষণ চোখ ফেরাতে পারে নি সে, মুগ্ধ বিহ্বল চোখে শুধু চেয়েই ছিল!

স্বপ্নই হবে নিশ্চয়—নইলে কেন মনে হ'ল তার, সে দেবদূতীর সর্বাঙ্গে শিরীণের বুরখা? সেই পরিচিত সামান্য বুরখার মধ্যে থেকেই যেন ঈষৎ একটু আবরণ সরিয়ে

বেরিয়ে এসেছে সেই অসামান্য মুখ।...আর স্বপ্ন না হ'লে আগা চোখ মেলে চাইতে সে স্বর্গ-সুষমা-মাখা চোখ দুটির দৃষ্টিই বা কেন উজ্জ্বল হয়ে উঠবে—কেন মনে হবে আগার যে সেই মুখ—যার স্পর্শ পাওয়া তার সুদূরতম কল্পনারও উর্ধ্বে, সে মুখ পরম স্নেহে ও করুণায় বিগলিত হয়ে ধীরে ধীরে নেমে আসছে তার মুখের উপর, সেই রক্তকমলদলের মতো আরক্তিম ওষ্ঠ দুটি তার ললাট স্পর্শ করছে!

হোক স্বপ্ন—অথবা দেবদূতীর আবির্ভাব—ঈশ্বর যে তার এই দুঃসহ কষ্টের মধ্যে সেই মুখখানি স্বপ্নেও দেখিয়েছেন একবার, স্বপ্নে সেই মুখের স্পর্শ লাভ করতে পেরেছে—এই জন্যেই কৃতজ্ঞ থাকবে সে তাঁর কাছে চিরদিন।

তারপর একদিন সত্যই জ্ঞান হয়েছে তার। পরিষ্কার হয়ে গেছে বুদ্ধি ও দৃষ্টির অস্বচ্ছতা। দেহের সে যন্ত্রণা নেই, আড়ষ্ট ব্যথাটাও কম। হেকিম সাহেব দেখতে এসে বলে গেলেন, ঘাগুলোও শুকিয়ে এসেছে এবার ; ওষুধ খাবার আর প্রয়োজন নেই, মলমটাও আর দু'চারদিন লাগালেই চলবে। জ্বরও নাকি ছেড়ে গেছে। সেই দিনই শুনল সে, প্রবল জ্বর এসেছিল তার, জ্বরের সঙ্গে বিকারও, ওষুধ খেয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত অচৈতন্য থাকত ততক্ষণ চুপচাপ—নইলেই ভুল বকত। ছেলেমানুষের মতো আসমানের চাঁদকে ডাকত, আর বেহেস্তের হুরীকে। কে এক শিরীণের নামও করেছে কয়েকবার। এ ছাড়া আরও কয়েকটা নাম করত, তবে সে কম। যাক্, এখন সে সব উপসর্গই গেছে। শুধু দুর্বলতা আছে, তা দু'চারদিন নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া করলেই সারবে। অল্প বয়সের দুর্বলতা বেশী দিন থাকে না, একটু একটু ক'রে উঠে দাঁড়াতে এবং ঘরের মধ্যে বা সামনের চলনে অল্প অল্প পায়চারি করতে উপদেশ দিয়ে গেলেন হেকিম সাহেব। নইলে নাকি হাত পায়ের খিল ছাড়বে না।

বহু প্রশ্ন গলার মধ্যে ঠেলাঠেলি করলেও মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারল না তাঁকে কিছু। এসব খরচ কে দিচ্ছে, হেকিম সাহেবের ওষুধের দাম, তার পথ্য—মাথার কাছে দুধও তো দেখছে বসানোই আছে—সেইটাই বড় কৌতূহল তার।

বাদশা কিছু দিচ্ছেন কিনা, তিনি খবর রাখেন কিনা—নইলে এসব করেছে কে—অনেক কিছু জানতে চায় সে। কিন্তু হেকিম সাহেবকে এসব প্রশ্ন ক'রে কোন লাভ নেই। নিশ্চয় তার বহিনজী আসবে একবার খবর নিতে—তাকেই শুধোবে সে।

রাবেয়া এলও ঠিক। ওদিকে কাজের পালা চুকিয়ে বেগম সাহেবারা ঘুমোলে এসে বসল সে।

ঘরে ঢুকে আগাকে চেয়ে থাকতে দেখে বেশ শব্দ ক'রেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল একটা, 'বাব্বা, বাঁচা গেল। এমন সহজ মানুষের মতো চেয়ে থাকতে দেখব তোমাকে, এ আশা আর ছিল না। আমি তো গোড়ায় গোড়ায় ভেবেছিলাম এ যাত্রায় আর তুলতে পারব না তোমাকে। ও, কম সিন্নি মেনেছি তার জন্যে দরগায় দরগায়? খাজা সাহেবের মেহেরবানী না হলে চোখ খুলতে হ'ত না তোমাকে। সব তাঁর অনুগ্রহ। পাঁচ ঢেবুয়ার পূজা তুলে রেখেছি—মরুকগে, না হয় আর পাঁচ ঢেবুয়া দিয়ে পাঠাব। মেহেন্দী হোসেন আতরওলার জামাই যায় প্রত্যেক বছর উরস্-এর সময়, তার হাতেই দিয়ে দেব। তবে ভাইয়া, তোমার নাম ক'রেও মানসিক করা আছে—যখন পারবে সেরসুরে উঠে একবার নিজে গিয়ে আজম শরীফ বাবা খাজা সাহেবের দরগায় ভেট দিয়ে আসবে, বাতি আগরবাতি চড়াবে তাঁর কবরে। ওঁর উর্স্-এর সময়তেই যেও—সে সময় ওঁর নাম ক'রে ছুটি চাইলে দেবে না, কোন ওপরওলারই সে সাহস

নেই।'

এক নিঃশ্বাসে বলে গেল কথাগুলো, তার মধ্যে কোন কথা বলার কি প্রশ্ন করার ফুরসৎ পেল না আগা। রাবেয়ার ওপর গলা চড়াবে সে সাধ্য নেই এখন ওর, মৃত্যুর দোর থেকে সদ্য ফিরে এসেছে—কণ্ঠ এখনও ক্ষীণ। এইবার একটু ফাঁক পেয়ে বলল, 'বহিনজী, তোমার দেনা আমি জীবনে শোধ করতে পারব না। আমি জানি—তুমি না এসে পড়লে আমার খোঁজও কেউ করত না। তুমি বলছ যে তোমার খাজা সাহেবের কুদরৎ—আমি তো দেখছি তোমার দয়াতেই প্রাণ পেলুম।'

'বাপ রে!' এতখানি জিভ কেটে, নাকে কানে হাত দিয়ে বলে ওঠে রাবেয়া, 'ওসব কথা মুখে উচ্চারণ করতে নেই, গুনা হয়! সবই তাঁর দয়া। তাঁর দয়া নইলে আমি খবরই তো পেতুম না। আমি তো দোরতাড়া দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আমাকে দোর ঠেলে জাগিয়ে খবর দেবে কেন বলো—তাঁর দয়া না হলে!'

'ও, তোমাকে দোর ঠেলে খবর দিয়েছে কেউ!' আগ্রহে উত্তেজনায় উঠে বসবার চেষ্টা করে আগা—যদিও তা পারে না শেষ পর্যন্ত—বরং সেইটুকু চেষ্টাতেই দুর্বল শরীরে ঘাম দেখা দেয়। একটু দম নিয়ে বলে, 'এমন মেহেরবান কে এই কিল্লাতে বহিনজী? এমন হৃদয়বান মানুষ এখানে কেউ আছে—বিশ্বাসই যে হয় না। তার নামটা আমাকে বলো—আমি নিত্য ফজর আর মগরেবের নমাজের সময় তার নাম ক'রে দোয়া মানব।'

'ঐ দেখো পোড়া স্বভাব! যেটি বলবার কথা নয়, সেইটি ঠিক আগে বলে বসে থাকব। কত ঝ্যাঁটা লাথি খাই এ জন্যে—আগেকার দিন হলে তো গর্দানই যেত—তবু কি ছাই চৈতন্য হয়। না ভাইজান, ওসব কথাতে কাজ নেই আমাদের, গরীব মানুষ খেটে খুটে খাই—বড় ঘরের বড় কথায় দরকার কি?'

আপসোসের সীমা রইল না আগার। তার নিজের ভুলেই এই কাণ্ডটি হল। আগ্রহ বড় বেশী রকম প্রকাশ ক'রে ফেলেছে, বড় বেশী অধৈর্য দেখিয়েছে। তাতেই সতর্ক হ'য়ে গেল রাবেয়া। যদি শুধু চুপ ক'রেও থাকত! দৈবপ্রেরিতের মতোই প্রসঙ্গটা উঠে পড়েছিল, আর একটু অপেক্ষা করলে রাবেয়া নিজেই বলে ফেলত। একটুর জন্য সব মাটি হয়ে গেল। অথচ—এই উত্তরটা যে তার বড় দরকার। অনেক সমস্যার সমাধান হ'য়ে যেত তাহ'লে, অনেক স্বপ্নের অর্থ প্রকাশ পেত!

শিরীণই নিশ্চয়, শিরীণ্ ছাড়া এত গরজ কার! কিন্তু শিরীণের নামটা বার বার ঠোঁটের ডগায় এগিয়ে এলেও উচ্চারণ করতে পারল না। জিজ্ঞাসা করতে পারল না মুখ ফুটে যে খবরটা শিরীণ্ বলে শাহীজনানার কোন বাঁদী দিয়েছে কিনা। সোজাসুজি ঠিক লোকের নামটা করলে আর চাপতে পারবে না—কিন্ত সঙ্গে সঙ্গেই সহস্র প্রশ্ন শুরু করবে। সন্দেহ করবে শিরীণের সঙ্গে তার আশনাই ইশক আছে! কথাটা চাপা থাকবে না কিছুতেই, ফলে শিরীণকে হয়তো বহু লাঞ্ছনা সহ্য করতে হবে।

কিন্তু শিরীণই কি?

তাহ'লে এত চেপে যাওয়ার কি প্রয়োজন ছিল রাবেয়ার? বড় ঘরের কথাটাই বা উঠবে কেন তাতে? শিরীণও আর একজন বাঁদী বৈ তো নয়।...না কি—

শিরীণ না হ'লে আর কার এত গরজ থাকবে এই পাষাণপুরীতে সে প্রশ্নটা যেন নিজের মনেও করতে পারে না আগা। সাহস হয় না ভাবতেও। এই প্রশ্নের সূত্র ধরে সুদূর যে নামটা মনে আসতে পারে, সেই সম্ভাবনাটাকেই সভয়ে এড়িয়ে যেতে

চায় সে। অবচেতনেই লড়াই করে যেন নিজের সঙ্গে। না, না, সে অসম্ভব, সে অবিশ্বাস্য। সে কল্পনারও অতীত। সে সম্ভাবনার কোন ভিত্তিই যে নেই কোথাও। সে প্রসঙ্গ চিন্তা করারও কোন যৌক্তিকতা নেই।

তাই কিছুই বলা হয় না, কোন প্রশ্নই করা যায় না। শুধু ক্ষীণ কণ্ঠে নিস্পৃহতা ফোটাবার চেষ্টা ক'রে বলে, 'না—বলতে আপত্তি থাকে তো থাক। কিন্তু এতবড় উপকারটা কে করলে এটা জানতে ইচ্ছে তো করেই—।......খবরটা যে দিলে সে-ই বা খবরটা পেল কি ক'রে—কে জানে।'

'তবে আর বলছি কি, সবই বাবার দয়া।...নইলে কাক-পক্ষীতেও টের পেত না, তুমি ঐ সিঁড়ির নিচের ঘরে অমনি অবস্থায় পড়ে থাকলে!......অবিশ্যি পরের দিন সক্কাল বেলাই খবর নিতুম আমি, সেদিনও সন্ধ্যে থেকে তিন চার বার খবর নিয়ে গেছি! মানে—চাকরি-বাকরির কি সুবিধা হ'ল না হ'ল জানার একটু গরজ ছিল কিনা—। ঐ যে সেপাইয়ের পোশাক এঁটে ঘোড়া তড়বড়িয়ে যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলে সেদিন সন্ধ্যের সময়টায়—তখন যে আমি মেহেন্দী হোসেনের দোকানে দাঁড়িয়ে গো! সেই থেকেই ছটফট করছি যে ব্যাপারটা কী শুধোব। তা অত রাতেও এলে না যখন—দশঘড়ি বেজে গেল—তখন গিয়ে শুয়েই পড়লুম, কত রাত আর করব বলো, ভাবলুম সকালেই খোঁজ করব অখন, এত তাড়াই বা কি, খবর যা হবার তা হয়েছে—জিজ্ঞাসা না করলেও তো আর উড়ে যাবে না।......তবে আমি উদ্দেশ করত সেই যার নাম সকাল সাতটা আটটা হত, অতক্ষণ ঐ অবস্থায় পড়ে থাকলে তোমাকে আর বাঁচানো যেত না, যে রকম লোহু বেরুচ্ছিল আর তিন চার ঘণ্টা পরে এক ফোঁটাও বাকী থাকত কিনা সন্দেহ।...সে ক্ষেত্তরে এটা খাজা সাহেবের দয়া ছাড়া কী বলব!'

'তা তো বটেই। তাই দেখছি। নইলে অত রাত্তিরে কারুরই তো জেগে থাকবার কথা নয়।' এবার যথাসাধ্য নিরাসক্ত কণ্ঠে সায় দেয় আগা।

'তবেই বলো!...সে মানুষটারই বা সেদিন ঘুম আসবে না কেন, আর মাথায় জল দিতে নেমে আমার সঙ্গে দেখা হবে কেন! আমার মুখেই শুনেছিল বলে তো তাই—কথাটাই ইয়াদ ছিল যে, আমি ভাইয়ার খোঁজ নিচ্ছি, আর ভাইয়া সেই যে সন্ধ্যের কিছু আগেই কিল্লা থেকে বেরিয়েছে—এখনও ফেরে নি।...আবার দ্যাখো গরম মাথা ঠাণ্ডা করত সে মানুষটা ফের ছাদেই বা উঠবে কেন। জেনানী মহলের ঐ মাঠ-ময়দান ছাদ, বিকেল বেলাই আমাদের উঠতে গা ছম্‌ছম্ করে, সে জায়গায় কী সাহসে ঐ এক ফোঁটা মেয়ে ওপরে উঠেছিল বলো।...অয় খোদা, কী বলতে দ্যাখো কি বলে ফেলছিলুম—এসব কথা পাঁচকান হ'লে রক্ষে থাকবে না, আমার চাকরিটি নিঘ্‌ঘাৎ চলে যাবে।...তা যা বলছিলুম, ছাদে উঠেছিল বলেই তো নজরে পড়েছিল যে তুমি জখম হয়ে ফিরেছ, তোমাকে ধরা-ধরি ক'রে নিয়ে আসছে। তাই তো গরজ করে গিয়ে সে খবরটা ডেকে দিল আমাকে—আবার আমার কান্নাকাটি দেখে চারটে টাকাও দিল, নইলে কি আর অতবড় হেকিমকে ডাকতে পারতুম!...তা এসব বাবার যোগাযোগ না হ'লে হত কি ক'রে বলো!'

'তা তো বটেই!' যন্ত্রচালিতের মতো উত্তর দেয় আগা।

তার বুকে তখন ঢেঁকির পাড় পড়ছে। তার মন ছুটছে তীরবেগে, সে রাত্রের সেই ঘোড়ার মতো। নিজের অস্পষ্ট আবছা কল্পনা থেকে আত্মরক্ষা করতে চাইছে যেন প্রাণপণে।

খোদা মেহেরবান! সত্যিই তোমার দয়ার অন্ত নেই! নইলে তোমার এই অধম

অপদার্থ সেবকের জন্যে এত মাথা-ব্যথা করাও হ'ত না!...কেন ঘুম আসে নি, সেদিন এই শাহীপ্রাসাদের কোন্ পুরললনার—এত মাথা গরমেরই বা হেতু কী—তা রাবেয়ার কাছে না হোক, আগার কাছে সব স্বচ্ছ পরিষ্কার হ'য়ে যায় যেন। শিরীণ্, শিরীণই নিশ্চয়, নইলে এত গরজ কার হবে।

শিরীণই! অথচ এ বিশ্বাস যত দৃঢ় হয় তত—যেমন শিরীণের প্রতি কৃতজ্ঞতায় চোখে জল আসে তেমনি, কেন কে জানে—একটা অকারণ সূক্ষ্ম হতাশার দীর্ঘ নিঃশ্বাসও ওঠে বুকের মধ্যে। অকারণ! সম্পূর্ণই অকারণ। কিন্তু অবুঝ দীর্ঘ-নিঃশ্বাসটা বুঝি কোন যুক্তিই মানে না।

একটু চুপ ক'রে থেকে শীর্ণ আড়ষ্ট ডান হাতটা অতিকষ্টে তুলে ঝাপ্‌সা হয়ে যাওয়া চোখ দু'টো মুছে নেয় আগা। তারপর কণ্ঠস্বর কিছুটা সহজ হয়ে এসেছে বুঝে ভরসা ক'রে কথা বলে আবার, 'ইস! আমার জন্যে খরচাও তো তোমার কম হ'ল না! গরীব মানুষ—না-হক এই বিপদ টেনে আনলে। ধার-দেনায় জড়িয়ে পড় নি তো?...কবে যে এ দেনা শোধ করতে পারব তাও তো বুঝছি না। কতদিন না কতমাস এভাবে পড়ে আছি কিছুই জানি না। তন্‌খার টাকাটা পেলেও তোমাকে দিতে পারতুম। খানিকটা আসান হ'ত তবু—'

চেষ্টা ক'রেই যেন একটু কেশে, গলাটা সাফ ক'রে নিয়ে রাবেয়া বলে, 'তা আমার খরচ যে একেবারে হয় নি, সেকথা বলতে পারি না! হয়েছে কিছু—কিন্তু সে এমন কিছু নয়।...তবে বাপু সত্যি কথাই বলব, এ হাতি পোষার খরচা কি আর আমি যোগাতে পারতুম! ধার-দেনাই বা এত দিত কে আমায়। হেকিম দাতাবক্সের দাওয়াই কিনে খাওয়াব সে সাধ্যি কি আর খোদা রেখেছেন আমার।...না, মিছে জাঁক করব না, ওটা আমার পছন্দও নয়—আর একজনের দয়াতেই এটা করতে পেরেছি। নাম বলতে বারণ আছে, তবে দিয়েছে হাতখুলে। যখনই চেয়েছি তখনই দিয়েছে, চারটাকা, দু'টাকা যখন যা বলেছি। 'না' বলে নি কখনও।'

বুকের মধ্যেটা এমন ধক্ ধক্ করে কেন? নিঃশ্বাস নিতে কেন এমন কষ্ট হয় আগার? এই সাংঘাতিক জখম থেকে বেঁচে উঠে এতদিন প'র এখন কি শুধু শুধু—অকারণেই জানটা বেরিয়ে যাবে নাকি? উঃ কী কষ্ট! যেন মনে হচ্ছে ওর এই সংকীর্ণ ঘরের কোথাও হাওয়া নেই, নিঃশ্বাস নেবার মতো যথেষ্ট হাওয়া—। অনেক-অনেকক্ষণ সময় লাগল এ ভাবটা সামলে নিতে। অনেক চেষ্টার পর নিঃশ্বাসটা যেন সহজ হয়ে এল আবার। তারপর কথা বলার মতো শক্তি ফিরে আসতে অতিকষ্টে বলল আগা, 'আরও একজন! কত লোকের কাছেই না ঋণী করেছেন ভগবান, এত দেনা আমি শুধব কি ক'রে? এ জন্মের বাকী কটা দিন খেটেও কি শোধ করতে পারব?... আমাকে এভাবে কেন বাঁচাতে গেলে দিদি— এতো দাম নয় এ সামান্য বান্দার জীবনের। তার চেয়ে আমাকে সরকারী হেকিমখানায় পাঠিয়ে দিলে না কেন? বরং—বরং যদি বলে-কয়ে আংরেজদের বারাক হস্‌পিটালে পাঠিয়ে দিতে! মিছিমিছি এই বিপুল দেনায় কেন ফেলতে গেলে আমাকে, তুমিই বা এত ঝুঁকি নিলে কেন?'

আগার এই ব্যাকুলতার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন অনুযোগ তাকে অকৃতজ্ঞতা মনে করা চলত—কিন্তু তার মূলে যুক্তিটা যে মিথ্যা নয় তা রাবেয়াকেও মানতে হ'ল মনে মনে। সে সান্ত্বনা দেবার মতো ক'রেই বেশ নরম সুরে বলল, 'সে সময় যে তখন ছিল না ভেইয়া, অত তখন মাথাতেও যায় নি যে। অত রাত্রে ঘুমের ঘোরে কি কোন দিশে পেয়েছি! দাতাবক্সের নাম বললে, টাকাটাও এনে দিলে—আমিও ছুটে চলে গেলুম।

তারপর অবিশ্যি সরকারী হেকিমকে ডাকবার কথা বলেছিলুম আমি তা শা—মানে সবাই বললে—ইস্—কী বলছিলুম দ্যাখো—সবাই বললে, এত সাংঘাতিক অবস্থা—ওখানে টেনে নিয়ে যাওয়া যাবে না, আর হেকিমও একদিন আসবে তো তিনদিন আসবে না। ঘুষ ছাড়া তাকে রোজ আনা যাবে না। যদি খরচই সেই করতে হয় তো দাতাবক্সই ভাল। ওর কাছে মলেও জানব পরমায়ু নেই তাই বাঁচে নি। বেঘোরে মরেছে কেউ বলতে পারবে না তো।'

হে ঈশ্বর! তুমি যেমন অসীম দুঃখ দাও, তেমনি আনন্দ দেবার সময়ও বুঝি কৃপণতা করো না। তোমার করুণার গতিও বিচিত্র, এই সাংঘাতিক অবস্থায় না পড়লেও এ জিনিস তো সে পেত না!

যে প্রশ্নটা পর্যন্ত করতে সাহস হচ্ছিল না মনে মনে—যার কল্পনা মাত্র দুঃসাহস বোধ হচ্ছিল, তাই তো সম্ভব ও সত্য হয়ে উঠল! 'শা'—ঐ একটি অক্ষর কোন্ শব্দের সূচনা করছিল তা আগার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় বৈ কি। শিরীণ্—শিরীণের জন্যেই এটা সম্ভব হয়েছে বোধ হয়—তবু টাকাটা কে দিয়েছে তা বুঝতে আর অসুবিধা থাকে না।

আর সংগে সংগে একটা আশ্চর্য আশ্বাস ও শক্তি—ফিরে পায় যেন। বেশ সহজ কণ্ঠেই প্রশ্ন করে, 'তা কর্তারা, মানে হেকিম আহ্সানউল্লা সাহেব কি মির্জা আবুবকর সাহেব, ওঁরা কিছু দেন নি?...ওঁদের, ওঁদের খবর দিয়েছিল কেউ?'...

'পোড়া কপাল! পরের দিন কার মুখে খবর পেয়ে যেন—ঐ মুখপোড়া—না, না, মানে বড় হেকিম সাহেব নিজে এসেছিলেন তো, তা তুমি কেমন আছ, সে খোঁজ-খবর চুলোয় গেল, আমার ওপর কি টাঁইশ! বলে—কার হুকুমে দাতাবক্সকে ডাকা হয়েছে। এ খরচা কে দেবে, কে দিচ্ছে?...আমিও তেমনি মেয়ে, ওর কাছে যখন চাইছি না এক পয়সা তখন অত খাতির কিসের? সোজা বললুম, আমি ডেকেছি, খরচা আমি দোব। বলে—এত পয়সা তুমি পাচ্ছ কোথায়? আমি বলি, গতর খাটানো পয়সা, চুরি করছি এ তো কেউ বলতে পারবে না, চুরির পথও খোলা নেই আমার—বড় বড় সাহেবদের মতো। যা জমিয়েছি যথাসর্বস্ব দিয়ে যদি আমার ভায়ের চিকিৎসা করাই—কার কি?'

তখন হালে পানি না পেয়ে বলে, এ তো তোমার পাতানো ভাই, এর জন্যে ফতুর হবে?...কী রকম ভাই তোমার? মানুষ তো আশনাইয়ের লোকের জন্য এরকম করে।...হেমাকৎ দেখো একবার! আমিও তেমনি, কড়া ক'রে শুনিয়ে দিয়েছি একেবারে! বললুম, সে আপনাদের বড় ঘরে হ'তে পারে। আপনাদের শুনেছি মা-ভাই-বোন কেউ কিছু না—আপনিটি আর বিবিটি। আমাদের এইসব বান্দাবাঁদীর ঘরে অন্য ব্যবস্থা। আমাকে যে বোন বলে ডেকেছে তার জন্যে জান দিতে হয়, তাও দেব। তখন পালিয়ে গেল তাড়াতাড়ি। আর কিছুক্ষণ থাকলে আরও শোনাতুম। তুই আবার কোন সাহসে মুখ নাড়তে আসিস তাই শুনি। আমি যদি জিজ্ঞেস করতুম'—গলা নামায় এবার রাবেয়া যথাসাধ্য—'বড় বেগম সাহেবার উপর তোমার এত টান কেন—আর তুমি হেকিম মানুষ—দরবারেই বা তোমার এত দবদবা কিসের—তখন মুখটা কোথায় থাকত শুনি।'

ঈষৎ অধৈর্য হয়েই প্রশ্ন করে আগা, 'তা ওঁরা সরকার থেকে কিছুই করলেন না? আমি তো ওঁদের নৌকর—নৌকরদের সম্বন্ধে এমনিই ব্যবস্থা নাকি?'

'না, ওঁরা বলেন—মানে ঐ মুখপোড়া হেকিমটা—মুখপোড়া বলেই ফেললুম বাপু, তুমি যেন বলো না কাউকে—পাজী লোক তো, ক্ষতি করতে খুব পারে। হেকিমটা বলে,

আমাদের রীতি-মাফিক চললে আমরা দেখতুম—এমনি দেখব কেন? তোমরা আলাদা হেকিম ডেকেছ—তোমরা বোঝ।...আমি তো আর বাদশার কাছে যেতে পারি না। তা ঐ শা—আবার দ্যাখো পোড়াকপাল, কী বলতে কি বলছি, যাই হোক, সবাই বললে, মির্জা জওয়ান বখ্‌ৎ-কে গিয়ে ধরতে, উনি যদি বলে দেন বাদশাকে। তাই কি ছাই ধরতে পারি, ঐটুকু ছেলে দিনরাত মদ আর মেয়েমানুষে চুর। অনেক কষ্টে গিয়ে ধরতে—তাও বাগ মানে না, তবে ওর আবার শাহ্‌জাদী মেহেরের ওপর টান তো খুব—মেহের তো ওর নাম ক'রে জোড়া লাথি মারে রোজ—যাই হোক, আমি ওর নাম ক'রে মেহের শাহজাদীর কাছে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলব এই শর্ত ক'রে তবে নরম করি। বাদশা নাকি এতসব জানতেনও না—শুনে তোমার ছুটি, ছুটির পুরো তন্‌খা মঞ্জুর করেছেন, আর দাওয়াইয়ের জন্যে মবলগ দশটা টাকা। এ ছাড়া খানা তোমার ঘরে পৌঁছবে, যদ্দিন না খানা খাবার মতো অবস্থা হয়—এক-সের ক'রে দুধ। আর বললে তো ছোট মির্জা সাহেব—এবার তুমি ভালো হয়ে উঠলে সিপাইর কাজ বাঁধা, চাই কি নায়েকও ক'রে দিতে পারে।'

বলতে বলতে বাইরের দিকে চেয়ে ব্যস্ত হয়ে ও'ঠে, 'যাই, আবার এখন বিবি-জানদের সব ওঠার সময় হয়ে এল—এক মিনিট না দেখতে পেলেই তম্বি শুরু হবে। যার মুখে মুখে না যোগাব তারই গোসা। আবার ফুরসৎ পেলে সেই সন্ধ্যের সময় আসব। বরং পারি তো একটু কাবাব টাবাব নিয়ে আসব—দুধ খেয়ে খেয়ে মুখ পচে গেছে নিশ্চয়। দুধ আর সুরুয়া এই তো খাওয়া, হাঁ ক'রে যা মুখে ঢেলে দেওয়া যায়।'

ব্যস্তভাবে চলে যায় সে। আগাও আর ধরে রাখার চেষ্টা করে না। এইটুকু কথা কয়েই যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাছাড়া আর দরকারও নেই ও বকুনি শোনবার। চুপ ক'রে একটু আপন মনে ভাবতে চায় কথাগুলো—যে পরমাশ্চর্য অবিশ্বাস্য বার্তা সে শুনল—তারই রোমন্থন করতে চায়।

আরও যেটুকু জানার দরকার ছিল, তাও শোনা হয়ে গেছে।

বাদশা নারাজ হন নি তার ওপর। সেই'টেই বড় কথা। নিজের কাজে গিয়েই তো এই ঝঞ্ঝাট বাধিয়েছে সে। গাজীমণ্ডিতে না গেলে তো আর এসব কিছু হ'ত না। এতদিনের কাজের কামাই, সরকারী খাজনার এই বাজে খরচ—এর দায়িত্ব তো তারই। রাবেয়া জানে না—কিন্তু সত্যিই, তার কোন এক্তিয়ারই তো নেই এ খরচ চাইবার। বাদশার বিশেষ দয়া—এটা মানতেই হবে।

গাজীমণ্ডী।

মনে হতেই দুশ্চিন্তায়, দুর্ভাবনায় মাথাটা কেমন ক'রে ওঠে আবার। কী হ'ল কে জানে তাদের, বেঁচে রইল কিনা! বদমাইশদের হাত থেকে জানমান বাঁচাতে পারল কিনা।

কিন্তু যাক এখন ও পুরনো কথা। অন্য কথা ভাববে সে। নিজের মনের কথা। আর সেই আশ্চর্য মহাজনের কথা।

তারপর বাকি সারাটা দিন এবং সন্ধ্যা উন্মুখ হয়ে রইল সে শিরীণের জন্যে। শিরীণ্ আসবেই, তা সে জানে। নিশ্চয়ই আসবে। তবে পথ জনহীন না হ'লে, নিশীথ রাত্রির তন্দ্রামগ্নতার অবসর না মিললে আসতে পারবে না সে। অন্ধকারের আবরণে আত্মগোপন ক'রে আসতে হয় যে তাকে। সবই জানে—তবু সন্ধ্যার পর

থেকে উৎসুক হয়ে চেয়ে থাকে খোলা দরজার দিকে। উৎসুক, সেইসঙ্গে একটু অধীরও।

বাবুর্চিখানার লোক এসে সকালের দুধের লোটা সরিয়ে আর এক লোটা দুধ রেখে গেল। সন্ধ্যার পর এক ভাঁড় সুরুয়া আর পাতায় করে দু' টুকরো শিককাবাব এনে খাইয়ে গেল রাবেয়া। অনেকদিন পর সজ্ঞানে খাদ্য গ্রহণ করল সে। উপাদেয় লাগল তার সবকিছুই। সাধারণ কাবাব, কিন্তু মনে হল এমন কাবাব কখনও তৈরী হয় নি। রাবেয়ার বসবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু আর একদফা তার অবিরাম বকুনির দায় থেকে বাঁচিয়ে দিল আগার সেই হাবিলদার বন্ধু। আর তার ঠিক পিছনে পিছনেই রহমৎ ও মাতাপ্রসাদ। অগত্যা রাবেয়াকে মুখের ওপর ওড়না টেনে পালিয়ে যেতে হ'ল। হ'লই না হয় বাঁদী—শাহী-জেনানার বাঁদী, তার ইজ্জৎ আছে।

খুশী ওরা সকলেই। রহমৎ তো স্পষ্টই বলল যে, আগা বেঁচে উঠবে আবার, সে আশা তার ছিল না। কেন এমন হল, কী কাজে কোথায় গিয়েছিল—এ হামলা তার উপর হ'লই বা কেন? তার সঙ্গে কোন 'কিমতী চীজ' ছিল নাকি? এরা তার দুশমন না সরকারের দুশমন?...স্বাভাবিক ভাবেই এসব প্রশ্ন উঠল। উঠবে তা আগাও জানে। আজ হোক আর কাল হোক—এ প্রশ্নর সম্মুখীন হ'তেই হবে। আর মিথ্যা ক'রে বানিয়ে যাহোক একটা কৈফিয়ৎ দিতে হবে তাকে—কিন্তু সে এখন আর কিছু ভাবতে পারছে না। ভাল লাগছে না তার এসব প্রসঙ্গ। সে ক্লান্তির দোহাই দিয়েই সেদিনের মতো অব্যাহতি নিল। আর সত্যিই, লাগসই কৈফিয়ৎ ভাবতে গেলেও শক্তির দরকার।

আগাও খুশী হল ওদের দেখে। খুবই খুশী হ'ল। নিজের বাঁচবার আনন্দ তো আছেই। কিন্তু মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে প্রিয়জনদের দেখার আনন্দও কম নয়। আমি আছি এখনও—এই রূপ-রস-গন্ধ ভরা পৃথিবীতে।—সে আনন্দ অন্যরকম। কিন্তু আমার প্রিয়জনরাও আমার এই প্রত্যাবর্তনে—আমাকে ফিরে পেয়ে আনন্দিত, এর স্বাদ স্বতন্ত্র। সে আনন্দ আরও বেশী, কারণ তাতে আমার আত্মাভিমান তৃপ্ত হয়। ওরা ভোলে নি আমাকে, ওরা চেয়েছিল আমাকে ধরে রাখতে—ওদের কাছে আমার মূল্য কিছু আছে—এ একটা মস্তবড় আত্মতৃপ্তির কথা। আমারও সেই রকম কিছু গুণ আছে—যাতে এতগুলো লোকের অকৃত্রিম ভালবাসা পাচ্ছি।

খুশী, কৃতজ্ঞ ও তৃপ্ত—তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু সেই সঙ্গে অধীরও। আরও একটি মানুষকে এবং তার মধ্য দিয়ে সবচেয়ে প্রিয় মানুষকে খুশী দেখতে চায়, সে খুশী হয়েছে জানতে চায়। এরা না গেলে সে আসতে পারে না। সেই আশমানের চাঁদের দূতী, বেহেস্ত্ ও জমীনের মধ্যেকার সেতু—শিরীণ্।

শেষে এক সময় একটু বেশী স্পষ্ট ক'রেই জানাল যে তার খুব ঘুম পেয়েছে। বন্ধুরা নিমেষে অনুতপ্ত হয়ে উঠল, ব্যস্ত ভাবে বিদায় নিল সবাই। আলো জেলে রেখে যাচ্ছিল—আগা বলল নিভিয়ে দিয়ে যেতে। রহমৎ বেরিয়ে যাবার সময় কপাট বন্ধ করছিল, আগা বলে উঠল, 'উঁহু উঁহু, খোলা থাক ভাই রহমৎ। বাইরের হাওয়া আসুক। এই আঁধারে ঘরে পড়ে থাকা—বুঝছ তো। তাছাড়া ঝাড়ু-টাড়ু পড়ে না—কেমন একটা বদ্ বু বেরোয়। খোলাই থাক।

অর্থাৎ আয়োজন সব প্রস্তুত, শুধু যার জন্য এত আয়োজন তারই দেখা নেই। দেখা এরই মধ্যে পাবার কথাও নয়—কিন্তু অত হিসেব তখন আগার মাথাতে ঢুকছে না। তার মনে হচ্ছে সময়টা দুঃসহ বোঝার মতো বুকে চেপে বসে আছে।

কিছুতেই সরছে না, নড়ছে না। যদি শক্তি থাকত তো উঠে বসে হাত দিয়ে সরিয়ে দিত সে। সত্যিই, এমন কেউ বন্ধু নেই যে কিল্লায় ঘড়িগুলোর কাঁটা এগিয়ে দেয়?

রাবেয়া এল আর একবার। বোধ করি তার শোবার সময় হয়েছে, তার আগে খবর নিতে চায়। আগা কাঠ হয়ে পড়ে রইল—ঘুমের ভান ক'রে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সামান্য ইতস্ততঃ ক'রে চলে গেল রাবেয়া। আঃ, এবার নিশ্চিন্ত, আজ রাতে অন্ততঃ সে আর আসবে না।

দশটা বেজে গেল কিল্লার পেটা ঘড়িতে। সান্ত্রী বদল হল ফটকে।

তারও খানিক পরে বাইরে সেই অতি—অতি মৃদু, অতি ঈপ্সিত পদশব্দ শোনা গেল। শিরীণ্। 'এতক্ষণ পরে দয়া হল বুঝি'—মনে মনেই অভিমানক্ষুণ্ণ কণ্ঠে অনুযোগ করে আগা।

কিন্তু সে অভিমান প্রকাশের অবসর পেল না সে। ওর সেই ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা দেখা অন্যদিনের মতো একেবারে পাশে এসে দাঁড়াল না শিরীণ্, বুরখাও খুলল না। কোন অন্তরঙ্গতা আকুলতাই প্রকাশ পেল না তার আচরণে। বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে প্রথমেই প্রশ্ন করল, 'দুধটা খাও নি কেন? ঠান্ডা জল হয়ে গেল যে!'

চমকে উঠল আগা। দুধের কথা মনেই ছিল না। কিন্তু অভিমানটাকে কাজে লাগাল সে এবার। বলল, 'আমি কি ঐ অতবড় লোটা উঠিয়ে খেতে পারি? অন্য দিন যে খাওয়ায় সে খাওয়াল না কেন?'

বোধহয় হাসিই চাপল শিরীণ্, কারণ উত্তর দিতে মুহূর্ত-দুই-তিন দেরি হ'ল তার। বলল, 'রাবেয়া তো এসেছিল, তখন খাও নি কেন? তখনও তবু গরম ছিল নিশ্চয়!'

'বা রে! বহিন তো আবার সুরুয়া কাবাব এনেছিল, খাইয়ে গেল—একসঙ্গে কত খাব তাই শুনি!'

'সুরুয়া কাবাবটাই না হয় পরে খেতে! হাতের কাছে রেখে গেলে নিজেই খেতে পারতে। তাছাড়া দোস্তরা তো তারপর বসে ছিল অনেকক্ষণ, তারাও যাবার আগে খাইয়ে যেতে পারত।...তাঁর অনেক পরেও তো তোমার বহিন আর একবার এসেছিল। তখন ভালমানুষের মতো তাকে ডেকে খেয়ে নিলে না কেন, ঘুমের ভান ক'রে মটকা মেরে পড়ে রইলে কেন?'

'হ্যাঁ, দুধ খাওয়ার জন্যে ডাকি আর একঘড়ি ধরে তার বকবকানি শুনি।'

একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে ওঠে আগা। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটা মাথায় খেলে যায়, বিস্মিত হয়ে বলে, 'কিন্তু তুমি এত খবর জানলে কি ক'রে? তাজ্জব তো! তুমি কি সারাবেলা এই কাছেই কোথাও চৌকী দিয়ে বসেছিলে নাকি?'

দারুণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে আগা, সামর্থ্যে কুলোলে নিজেই উঠে গিয়ে শিরীণের হাত ধরত বোধহয়।

কিন্তু শিরীণ্ এ প্রশ্নে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। কথাগুলো যেন স্পর্শই করতে পারে না তাকে। কালো বুরখার বর্মে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। কণ্ঠে তীব্র বিদ্রূপ হেনে বলে, 'বাঃ, বাহ্‌বা বা! যে বহিন তোমার জন্য এত কান্ড করল তার সম্বন্ধে খুব কৃতজ্ঞতা-বোধ তো! তুমি এই রকম ইমানদার মানুষ নাকি?'

নিমেষে লজ্জিত হয়ে ওঠে আগা। অনুতপ্ত কণ্ঠে বলে, 'না না, ছিঃ! তা নয়—সত্যিই ওর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। তোমরাও ঢের করেছ কিন্তু ও না

থাকলে তোমরাও বোধহয় কোন সাহায্য করতে পারতে না। সামনে এগিয়ে আসতে তো পারতেই না। না, আমি ওর কাছে সত্যি সত্যিই কৃতজ্ঞ—বহিন বলা সার্থক হয়েছে আমার। আমি কি পশু যে সেটুকু বোধ থাকবে না।...তা না, আসল কথা কি জানো শিরীণ্, পাছে সে থাকলে তোমার আসতে অসুবিধা হয়—আরও দেরি হয়ে যায়, এই জন্যেই আরও—। আসলে আমি একমনে তোমারই অপেক্ষা করছিলাম যে!'

'আমার কিসমৎ! এত দাম যে আমার আছে, তা জানতুম না। সত্যি, তোমারই কিল্লায় বাস সার্থক হয়েছে। দু'দিন যেতে না যেতেই শাহী দরবারের কেতা দুরস্ত ক'রে নিয়েছ। বেশ মন-যোগানো মিথ্যে কথা বলতে শিখে গেছ। সাহেব, তোমার বহিনজী এসেছিল তখনও ঘড়িতে নটা বাজে নি, আর আমি যে দশটার আগে আসতে পারব না তা তো জানতেই।'

'মন কি অত হিসেব ক'রে চলে? আগ্রহ কি ঘড়ি ধরে বিচার করতে বসে কারও? বহিনজীকে একবার বসালে সে যে হিসেব ক'রে দশটায় উঠত তার ঠিক কী? কিন্তু তুমি কি এসে কেবলই রোগা মানুষটাকে ধমকাবে? মিষ্টি কথা কি একটাও বলবার মতো নেই?...অন্ততঃ আর একটু কাছে এসো—'

'না—দূরেই বেশ আছি। অসুবিধে কি হচ্ছে এতে তোমার?'

'কিন্তু অসুখের মধ্যে তো কাছে আসতে শিরীণ্, তাহলে কি আমার সেরে ওঠাটাই অপরাধ হ'ল?'

'কে বললে কাছে আসতুম? এসব কিস্সা কে বলেছে তোমাকে?' এবার যেন শিরীণের অবিচল স্থৈর্য নাড়া খায় খানিকটা। চমকে ওঠে সে, আর সে চমকে ওঠাটা আধো অন্ধকারে দেখা না গেলেও গলার কাঁপনে বোঝা যায়।

'কেমন জব্দ!' ছেলেমানুষের মতোই খুশী হয় আগা, খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে, 'ভেবেছিলে সব সময়ই আমি অজ্ঞান হয়ে আছি, কিছু টের পাচ্ছি না। কিম্বা যা দেখছি সব খোয়াব ভাবব।...না গো দোস্ত, মধ্যে মধ্যে এক আধ লহমার জন্যে হুঁশ ফিরে পেয়েছি বৈকি! তাতেই দেখেছি তোমাদের।'

'তোমাদের! তোমরা আবার কে এল এর মধ্যে?'

আগেকার আত্মসংযম বহুকষ্টে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে শিরীণ্।

'কেন—। সেই যে—।' বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায় আগা। সুর পাল্টে বলে, 'তুমি—তুমি আমাকে দুধটা খাওয়াতে পারবে না শিরীণ্?...আমার তেষ্টাও পেয়েছে খুব।'

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে শান্তভাবে উত্তর দেয় শিরীণ্, 'ওটা যে ছল তা আমি জানি। তবু খাওয়াচ্ছি কিন্তু আমার গায়ে হাত দেবার কি টানাটানি করবার চেষ্টা ক'রো না। তাহ'লে আর কোন দিন আসব না।'

বলতে বলতেই এগিয়ে এল সে। বুরখা খুলল না, শুধু তার মধ্যে থেকে হাতটা বার ক'রে দুধের লোটাটা সামনে এগিয়ে ধরল। কিন্তু বিরক্তির সঙ্গেই লক্ষ্য করল শিরীণ্, অন্যদিন যে চুমকী লোটাতে ক'রে দুধ দিত এটা সে রকম নয়। লম্বা ধরণের লোটা—এ থেকে মুখে ঢালতে গেলে অসুবিধা হবে। একটা কটোরা থাকে, অন্ধকারে সেটাও দেখতে পেল না।

কী করবে ইতস্তত করছে শিরীণ্, দেখে আগাই মাথা তুলতে গেল—কিন্তু একটু উঁচু করার সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ মাথা ঘুরে উঠল—ধপাস ক'রে মাথাটা পড়ে

গেল আবার। এটা যে ছল নয়—শিরীণও বুঝল তা। সে আর দ্বিধা করল না। আর একটা হাত বার ক'রে ডান হাত ওর ঘাড়ের নিচে দিয়ে মাথাটা উঁচু ক'রে ধরে বাঁ-হাতে দুধের লোটাটা মুখের সামনে ধরল।

আগা কোন প্রকার উচ্ছ্বাস প্রকাশের চেষ্টা করল না। শান্ত ছেলের মতোই একটু একটু ক'রে সব দুধটা খেয়ে নিল—এমন কি যখন আবার আস্তে আস্তে তাকে শুইয়ে দিয়ে মাথার নিচে থেকে হাতটা টেনে নিল, তখনও কোন বাধা দিল না, কিন্তু লোটাটা নামিয়ে রেখে পাশে রাখা গামছাটা তুলে যখন ওর মুখ মোছাতে যাবে সেই সময় আর সামলাতে পারল না, গামছা সুদ্ধ হাতটা সজোরে চেপে ধরল শিরীণের।

'আমি সত্যিই বড় দুর্বল এখনও, বড় অসহায়। আমার ওপর নারাজ হয়ো না। কিন্তু আমি আর এ সংশয় বইতে পারছি না। দোহাই তোমার, একটা কথা সত্যি ক'রে বলে যাও, আমাকে ছুঁয়ে আছ মিথ্যে বলো না, তাহ'লে কিরে ভাঙ্গার গুনা লাগবে। সে—সে কি আসে নি একবারও, সত্যি সত্যি আসে নি? আমি—আমি কিন্তু যে তাকে দেখলুম।'

শিরীণ্ টানাটানি ক'রে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল না, ওকে তিরস্কারও করল না কিছু—বরং স্থির ভাবে সেই রকম হেঁট হ'য়েই ওর কথাগুলো শুনল। হয়ত তখন ঠিক কথা বলার শক্তিও ছিল না, কেবলই ভয় হচ্ছিল তার বুকের রক্ত তোলপাড়ের এই উত্তাল শব্দ আগা শুনতে পাচ্ছে না তো?

আগার কথা শেষ হ'তে একটু চুপ ক'রে থেকে ঈষৎ যেন জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'কে—কার কথা বলছ তা-ই বুঝতে পারছি না যে!'

'উঃ—তুমি কী পাষাণী শিরীণ্, তোমার কি একটুও মায়াদয়া নেই?...না না শিরীণ্ তুমি বড় সৎ, বড় ভাল মেয়ে—অন্য কেউ হ'লে আমার এত বেয়াদপি সহ্য করত না। কিন্তু, কিন্তু কার কথা বলছি তা তো তুমি বুঝতেই পারছ। আমি বলছি আমার আসমানের চাঁদের কথা। শাহ্‌জাদী মেহের, শাহ্‌জাদী কি আসেন নি একদিনও?'

'আমি তো জানি আমিই এসেছি। আর কে এসেছে সে খবর রাখি না। যদি এসে থাকেন তো এসেছেন। কিন্তু শাহ্‌জাদীর পক্ষে এখানে এসে তোমাকে দেখে যাওয়া কি সম্ভব?'

একান্ত নিরাসক্ত ভাবেই কথাগুলো বলে শিরীণ্।

আশাহত আগা ওর হাতটা ছেড়ে দিয়ে কেমন একরকমের স্খলিত ভগ্ন কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু আমি যে স্পষ্ট দেখলুম একদিন—অমনি তোমার মতোই বুরখা—কিন্তু মুখ খুলল একবার, তখন দেখলুম—বেশ মনে আছে, সেই মুখ। দেবদূতীদের মতো করুণায় বেদনায় পবিত্র। আমি যে তাঁকেই দেখলুম শিরীণ্, সে মুখ তো ভুল হবার নয়।'

'খোয়াব দেখে থাকবে। বিকারের ঘোরও হ'তে পারে। খুব বেশী ভেবেছ তো তাঁর কথা।...ঘুমোও তুমি—আমি এখন যাই।'

অনুতপ্ত গাঢ় কণ্ঠে আগা বলে, 'শিরীণ্, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। তোমার কাছে অপরাধ আমার অনেক, কিন্তু ক্ষমা পেয়ে পেয়ে লোভ আর স্পর্ধা দুই-ই বেড়ে গেছে। আমি বেইমান নই। তুমি আমার জন্যে যা করেছ তার কি মূল্য আমি জানি। হয়ত তোমার জন্যেই প্রাণ পেয়েছি আমি। কতক এর মধ্যেই আমি দেখেছি, বাকীটা অনুভব আর অনুমান করতে পারি। তোমার কাছে আমার

ঋণও অপরিসীম।...যতদিন বাঁচব ততদিন তোমার করুণা আমার মনে থাকবে। নিত্য আল্লার কাছে দোয়া মাগব তোমার নামে। তুমি রাগ ক'রো না, কিন্তু মানুষের মন বড় অবুঝ তা তো তুমি জানই। তাই ঐ অসম্ভব কল্পনা করেছিলুম...আর আশাও—'

শেষের দিকে ওর গলাটা যেন অনুনয়ে করুণ হয়ে উঠল। তবু শিরীণ্ চুপ ক'রেই রইল। কোন উত্তরও দিল না, চলেও গেল না। একটু চুপ ক'রে আবার বলল আগা, কান্নার মতোই শোনাল কথাগুলো, 'শিরীণ্ লক্ষ্মীটি—কিছু মনে ক'রো না, একটা ভিক্ষা চাইছি তোমার কাছে।...একবার তো তাঁর দয়া হয়েছিল, সেদিন যে তাঁর খিদ্মতে হাজির হ'তে পারি নি, তাতে আমার কোন দোষ ছিল না তাও তিনি জানেন! কিন্তু এখন তো—মানে অন্ততঃ আরও কদিন তো এমনি থাকতে হবে—আমার তো সাধ্য নেই যে উঠে যাব।...তিনি কি—মানে—তাঁকে কি এখানে কোনমতেই আশা করতে পারি না? আমার হয়ে একটু বলবে? বুঝিয়ে বলবে একটু তাঁকে?'

এতক্ষণে বুঝি পাষাণে প্রাণসঞ্চার হ'ল। কথা কইল শিরীণ্, তবে একটি শব্দই, 'বলব।' আর অপেক্ষাও করল না, নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাইরের স্বল্পালোকিত চলনে যেন চকিতে মিলিয়ে গেল সে।

তবে, আগার মনে হ'ল, এবার তার গলাটা আগের মতো শীতল আর কঠিন মনে হ'ল না তত, বরং কোমলই শোনাল। হয়তো এও ভুল।

তার পরের সারা দিনটা শয্যাকণ্টকীর মতো হয়ে রইল আগার। না পারে উঠতে, না পারে শুয়ে থাকতে। কী শুনবে, কী উত্তর পাবে ওর আর্জির—এই আশা ও আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে থাকে সারাক্ষণ।

পুরো দিন এবং সন্ধ্যা। এর মধ্যে কত কে এল গেল। দুপুরে রাবেয়া এসে গল্প জমাবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে বিরক্ত হয়ে ফিরে গেল। সন্ধ্যায় বন্ধুরা এল দল পাকিয়ে। কিন্তু আগা অন্যমনস্ক এবং কেমন যেন উন্মুখ হয়ে রইল। তারা ভাবল ওর মাথার চোটটা শুধু বাইরের হাড়ে বা চামড়ায় নয়—ভেতরের মস্তিষ্ক-কোষেও লেগেছে কিছুটা, তাই এখনও সব কথা ওর মাথাতে ঢুকছে না। তারাও ওকে বিশ্রাম করবার অবকাশ এবং পরামর্শ দিয়ে চলে গেল।

কিন্তু সেদিনই শিরীণ্ এল রাত এগারোটার পর। কী একটা ব্যাপারে খোদ বাদশাই জেগে ছিলেন বহুরাত পর্যন্ত। শুধু জেগে ছিলেন না—বেশ সক্রিয়ও ছিলেন। হেকিম সাহেব, মির্জা মোগল বাহাদুর, মির্জা খিজির সুলতান—এঁদের সঙ্গে কী সব পরামর্শ করছিলেন। কোন একটা জরুরী ব্যাপার নিশ্চয়ই, কারণ মির্জা মোগল কতবার যে বাদশার খাশ কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন এবং নতুন কাগজপত্র বা অন্য লোক সঙ্গে ক'রে আবার ঢুকলেন—তার হিসাবই নেই। কোথাকার রাজা বা নবাবের লোক এসেছেন, তাঁরা একটা ঘরে বসে আছেন গম্ভীর মুখে—মির্জা মোগল এসে তাঁদের সঙ্গে কী কথা বলে যাচ্ছেন। অর্থাৎ কী ব্যাপার তা না বুঝলেও খুব যে জরুরী কোন ঘটনা ঘটেছে বা ঘটবে—তা সবাই বুঝছে। এই অবস্থায় কিল্লার সাধারণ কর্মচারীরা তো তটস্থ থাকবেই। ওদিকে বড় বেগম জিন্নৎ মহল সাহেবার মহলেও দরজা পড়ে নি, অন্তঃপুরিকাদেরও জেগে বসে থাকতে হয়েছে। সে অবস্থায় মেহেরের বেরিয়ে আসা শুধু কঠিন নয়—

বিপজ্জনকও।

আগা অবশ্য এত কথা জানে না। তাকে কেউ বলে নি। বলবার সুযোগও পায় নি কেউ। কারণ এই কর্মব্যস্ততা শুরু হয়েছে রাত আটটার পর। আগা এটাকে অবহেলাই ভাবছিল তাই। দশটাও যখন পার হয়ে কিছুটা সময় কেটে গেল অথচ শিরীণের আভাস-মাত্র মিলল না, তখন হয়তো হতাশায় সে নিজেই নিজের গলা টিপে ধরত—যদি না সেই সময়েই বাইরের চলনে বহু লোকের আনাগোনার শব্দ উঠত। অর্থাৎ কোন কারণে আজ কিল্লার লোকজন এখনও জেগে আছে। কোন মেলা কি কোন উৎসব আছে হয়ত—মাস, তারিখ, তিথি সবই তো তার গুলিয়ে গেছে—কোথায় কী ঘটছে না ঘটছে, কোন্ তিথি এল না এল তার কোন হদিসই সে রাখে না।...যাই হোক এই একটি ক্ষীণ আশ্বাসেই সে আবার কিছুটা সান্ত্বনা লাভ ক'রে অপেক্ষা করতে লাগল কিল্লা শান্ত সুষুপ্ত হবার।...

সেদিন সন্ধ্যা থেকে কিছু খায়ও নি আগা। দুধ সুরুয়া সবই সাজানো ছিল। রাবেয়া খাইয়ে যেতে চেয়েছিল, তাকে বলেছিল খিদে নেই, পরে খাব। অবশ্য রাবেয়ারও একবার আসার কথা, সেও আসে নি। একই কারণ নিশ্চয়—অন্তঃপুরে হয়তো সবাই জাগ্রত বা ব্যস্ত। তাই কারুরই আসা সম্ভব হয় নি—নিজেকেই নিজে বোঝাবার চেষ্টা করছিল আগা। তবু অভিমান বড় অবুঝ, বিশেষত অসুস্থ লোকের অভিমান। আজ সে রাবেয়া সম্বন্ধেও অভিমান বোধ করতে লাগল। ভুলেই গেল সে—কিছু আগেও মনস্থ করেছিল অত রাত্রে 'রাবেয়া এলে সে ঘুমের ভাণ ক'রে পড়ে থাকবে।

অবশেষে শিরীণের বুরখা পরা মূর্তি দ্বারপ্রান্তে দেখা দিতে এতক্ষণের সমস্ত নিরুদ্ধ অভিমানই তার ওপর এসে পড়ল, 'আর, আর কেন শিরীণ্ মিছিমিছি কষ্ট ক'রে এলে, রাত কতটুকুই বা বাকী, এটুকুও বেশ কেটে যেত এমনি একা একাই। না হয়—না খেয়ে মরতুমই। আমার জানের কি দাম আছে কারো কাছে!'

শিরীণ্ সে কথার কোন কড়া উত্তর দিল না। স্মরণ করিয়ে দিল না যে তার আসার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। বিশেষতঃ তার এই অযাচিত আগ্রহ ও সেবার কোন প্রাপ্য মূল্যই যখন দেয় নি বা দিতে প্রস্তুত নয় আগা—তখন ততটা আশা কী দাবী করার কোন অধিকারই নেই তার।

বরং সে অনেকটা কাছে এসে সান্ত্বনা দেবার মতো ক'রে বুঝিয়ে বলল, বেশ কোমল কণ্ঠ অনুনয়ের মতো ক'রে, 'রাগ করো না লক্ষ্মীটি, আজকে এর আগে আসার কোন উপায় ছিল না, সবাই জেগে ছিলেন। জেনানী মহলেরও কেউ ঘুমাতে পারে নি। এখনও অনেকে ঘুমোন নি—এখনও হয়তো আমার আসা উচিত হয় নি। কী হয়েছে তা জানি না, নিশ্চয় কোথাও একটা বড় রকমের কোন গোল-মাল বেধেছে। আংরেজ পিনসিন কেড়ে নেবে কি কিল্লা থেকে তাড়িয়ে দেবে হয়তো—একবার তো সে কথা উঠেছিল। বাদশা রাজীও হয়েছিলেন। ওঁর মরবার পর জওয়ান বখ্‌তকে পিনসিনের সব টাকাটা দিতে রাজী হলে বাদশা কুতুবে উঠে যাবেন বলেছিলেন, বড় মামার জন্যেই সেটা ফাঁস হয়ে গেল!...হয়তো ওদিক থেকেও কিছু না, ঐ হেকিমটাই কি একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলেছে।...সে যাক্‌গে, আমি আজ বেশীক্ষণ থাকতেও পারব না, বড় বেগম এখনও জেগে আছেন, তাঁর কামরায় বাতি জ্বলছে দেখে এসেছি। আমি দুধটা খাইয়ে যাচ্ছি, একটু পরে সুরুয়াটা তুমি আপনিই খেয়ো, কেমন? হাতের কাছে রেখে যাচ্ছি—'

এসব কোন কথাই শুনতে চায় না আগা, খাওয়াতেও তার কোন দরকার নেই। সে এই প্রথম একটু অবসর পেয়ে ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু আমার সেই আর্জিটা শিরীণ্?'

'বলছি, আগে দুধটা খেয়ে নাও তো!'

আজ আর মাথা তুলে ধরতে হ'ল না, সে বাহানাও করল না আগা, নিজেই মাথা তুলে সুবোধ বালকের মতো সব দুধটা খেয়ে নিল। লোটা নামিয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়ে শিরীণ্ বলল, 'আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। শাহ্‌জাদী রাজীও হয়েছেন, কিন্তু—'

সবটা শোনার ধৈর্যও নেই আগার। সে লাফিয়ে উঠে বসার মতো ভঙ্গী ক'রে বলল, 'কখন শিরীণ্, কখন আমার এই নিশীথ রাতের অন্ধকারে চাঁদের রোশনি লাগবে?'

'শোন!' একটু ধমকের সুরেই বলে শিরীণ্, 'অত কাব্য করার আমার সময় নেই। কবে তিনি আসবেন তা বলা সম্ভব নয়, তাঁর পক্ষেও না। কোন একদিন, কোন এক সময় সুযোগ পেলে আসবেন। তুমি তাঁর জন্য জেগে থেকো না, তিনি যখনই আসুন—তিনিই তোমার ঘুম ভাঙ্গাবেন কিন্তু কথা কইবেন না, তাঁকে স্পর্শ করারও চেষ্টা ক'রো না। তিনি আসবেন, মুখের বুরখা সরাবেন, দূর থেকেই দেখো—তিনি আবার তওর সময়মতো চলে যাবেন। কোন রকম পাগলামি করতে গেলে তিনি আর কখনও কোন কথা শুনবেন না, আমারও এখানে আসা বন্ধ হবে।'

'তাই হবে, তাই হবে শিরীণ্—কিন্তু কখন না বলতে পারো, কবে তাও কি বলতে পারো না?'

'না, তাও বলা সম্ভব নয়।'

বাইরে কোথায় একটা কপাট পড়ার শব্দ হ'ল ঠিক সেই সময়, শিরীণ্ বুরখাটা ভাল মতো জড়িয়ে ব্যস্তেব্যস্তে বেরিয়ে গেল।

সেদিন আসার কোন কথা নেই, সম্ভাবনাও নেই বিশেষ। এখনও পর্যন্ত যে কিল্লায় কেউ কেউ জেগে আছে সে প্রমাণ প্রায়ই মিলছ বিভিন্ন রকমের আওয়াজে। কোথাও দরজা দেওয়ার শব্দ হচ্ছে, কেউ বা কাশছে, দূরে লোক-চলাচলও হচ্ছে পাথর-বাঁধানো পথে। এর মধ্যে অন্ততঃ বাদশাজাদীদের অন্তঃপুরের বাইরে আসা চ'ল না। তবু বহু রাত্রি পর্যন্ত জেগে রইল আগা, কে জানে কিসের প্রত্যাশায়। দেহের ব্যথা যে অনুপাতে কমেছে সেই অনুপাতেই বুঝি মনের ব্যথা বাড়ছে। আর তাইতেই তাকে এমন অস্থির ক'রে রেখেছে। জেগে থাকতে থাকতে মনে হ'ল—এই সময় সেই ঘুমের ওষুধ একটু পেলে ভাল হ'ত। এসব জ্বালা যন্ত্রণা চিন্তা কোন হাঙ্গামাই থাকত না।...

জেগে জেগেই কিল্লার ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে দু'টো বাজার শব্দ পর্যন্ত শুনল। অবশ্য তার পর আর বিশেষ হুঁশ ছিল না। মানসিক অবসাদ ও শারীরিক ক্লান্তিরই জয় হল শেষ পর্যন্ত, এক সময় চোখের পাতা বুজে এল, চৈতন্য এল শিথিল হয়ে। কিন্তু ঘুমের মধ্যেও একটা উৎকণ্ঠা ছিল বোধহয়, অথবা বহুদিন শুয়ে আছে বলেই ঘুমটা খুব গাঢ় হয় নি অন্যদিনের মতো। খানিকটা পরেই সামান্য একটু খশ্-খশ্ শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল তার।

অসময়ে কাঁচা ঘুম থেকে জাগা—ঘুম গেলেও জড়তা যায় না, চোখের পাতা

মেলতে কষ্ট হয়। কিন্তু একটুখানি চোখ খুলতেই যে দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে তন্দ্রার সমস্ত জড়িমা কেটে গেল এক নিমেষে। কে যেন ইতিমধ্যেই ঘরে চিরাগ জেবলেছে, তবে অন্যদিনের চেয়েও স্তিমিত ভাবে জ্বলছে সেটা, তবু তাইতেই দেখা যাচ্ছে—দরজার একটা কপাট ভেজানো, আর সেই ফাঁকটায়, বোধ করি বাইরে থেকে আত্মগোপন ক'রেই বুরখা পরা একটি নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে।

চমকে লাফিয়ে ওঠবার চেষ্টা করল, প্রাণপণ চেষ্টায় উঠে বসলও খানিকটা কনুইয়ে ভর দিয়ে—কিন্তু তার বেশী আর তার সাধ্য কুলোল না। সদ্য-শুকনো ঘাগুলো টনটনিয়ে উঠল—পিঠে অসহ্য একটা আড়ষ্টতা, যেন হাড়ে টান পড়েছে এমনি—সে-যন্ত্রণায় দেখতে দেখতে ঘেমে উঠল, চোখে অন্ধকার দেখল এক মুহূর্তের জন্য। কোনমতে প্রাণপণে দাঁতে দাঁত চেপে সেই কষ্টটা সামলে নিল বটে—তবে বুঝল সে চারপাই থেকে নামবার চেষ্টা করাও চলবে না।

ওদিকে সে মূর্তিও নড়ে উঠল এবার। বুরখার মধ্য থেকে একটা হাত বেরিয়ে এসে নিষেধের ভঙ্গী করল একটু—বোধ করি আগাকে স্থির হ'তে ইঙ্গিত করল। হাতটা শিরীণের মতোই অনেকটা, শিরীণের হাত অন্ধকারে দেখেছে অবশ্য—বুরখাও সেই রকম, তবু যে এসেছে সে যে শিরীণ নয়, তা হাত নাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝল আগা, কারণ ঘরের নেই ক্ষীণ আলোতেই অনামিকার পাথরখানা ঝিলিক দিয়ে উঠল।

আর কোন সন্দেহই রইল না। এ সেই বহু প্রতীক্ষিত আবির্ভাব।

কিন্তু আগা যে বড়ই অসহায়। তার যে কিছুই করার নেই। কেমন ক'রে অভ্যর্থনা করবে এই পরমাশ্চর্য আবির্ভাবকে। কথা কওয়া বারণ, উঠে গিয়ে পায়ের উপর লুটিয়ে পড়বে সে উপায়ও যে রাখেন নি খোদা।

যে এসেছিল সে এবার দু'হাতে বুরখার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করল।

অয় আল্লাহ্! মেহেরবান খুদা!

আজও বিস্ময়ে কিছুক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ হয়ে রইল আগার, আজও সেদিনের মতো আকুলিবিকুলি ক'রে উঠল মনটা।...সেই মুখ, সেই অবিস্মরণীয় অপার্থিব মুখ। বেহেস্তের হুরী যদি এরকম না হয় তো, হুরীও দেখতে চায় না আগা। আশমানের চাঁদের সঙ্গে তুলনা দিলে একে অপমান করা হয়। চাঁদও এমন সুন্দর, এমন স্বর্গীয় নয়। সেদিন খোয়াবে দেখেছিল করুণায় বেদনায় অপরূপ সুষমা মাখা—আজ দেখল সেই দীর্ঘ আয়ত চোখে সুন্দর একটি বিনম্র লজ্জা, আর বুঝি সেই সঙ্গে ঈষৎ একটু কৌতুকও।

কিন্তু অতি অল্পক্ষণস্থায়ী সে দৃশ্য। কয়েকটি মুহূর্ত—তাও, জীবনের সমস্ত ফলবান মুহূর্তের মতো, সে মুহূর্তগুলোও যেন কালের মাপে ছোট। আশ মিটিয়ে দেখার সুযোগ মিলল না। মুখের ওপর আবার অবগুণ্ঠন নেমে এল। বোধহয় এবার সে দেবীমূর্তি অন্তর্হিত হবার উপক্রম করল।

এতক্ষণে নিশ্বাস পড়েছে আগার। সামনের সেই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় বিহ্বলকরা সৌন্দর্য অপসারিত হ'তে কণ্ঠস্বরও খুঁজে পেয়েছে এবার। সে চাপা অথচ ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমি অসহায়—অসুস্থ, গুস্তাকী মাপ করবেন—কিন্তু একবার, একবার একটু স্পর্শ করতে পারব না আপনাকে? এক লহমার জন্যে? ভেবে দেখুন—আমার একটা দাবীও আছে, সেদিন আপনার আদেশ-মতো ঘোড়া ধরেই এনেছিলুম, যদি আপনি থাকতেন ঘোড়ার মুখ ধরে উঠিয়ে দেবার অধিকার আমারই

ছিল। আমার হাতেই পা রেখে উঠতেন শাহ্‌জাদী,—সেই পাটাই হাত দিয়ে ছুঁতে দিন অন্তত।'

শাহ্‌জাদীকে স্পর্শ করতে চায় সাধারণ বান্দা একজন! সেই মুহূর্তেই তো আগুনের মতো জ্বলে ওঠবার কথা শাহ্‌জাদীর। কিন্তু...একটু কি ইতস্ততঃ করলেন শাহ্‌জাদী? একটু দ্বিধাগ্রস্ত হলেন? ভাবতেও সাহস হয় না যে!

আঃ, ঐ যে এগিয়ে আসছেন। হয়েছে, তারই যুক্তির জয় হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

বুরখা ঢাকা মূর্তি কাছে এগিয়ে এল একটু, আরও কাছে। তারপর পা নয়, সাক্ষাৎ বরাভয়ের মতো সেই হাতটিই, সেই বড় চুনির আংটি পরা কমল কোমল হাতই বেরিয়ে এল বুরখার মধ্য থেকে, ওর দিকে প্রসারিত হ'ল—

ব্যস, আগার আর কোন হিতাহিত অগ্রপশ্চাৎ জ্ঞান রইল না। সে পাগলের মতো যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই অনিন্দিত হাতটির দিকে, ব্যাগ্র ব্যাকুল দুইহাতে সেই হাতখানি চেপে ধরে মাথাটা ঝুঁকিয়ে তার উপর নিজের মুখটা চেপে ধরল।

কিন্তু মৃত্যুর দূত তার দেহের ওপর যে কামড়ের চিহ্ন রেখে গেছে, সেটা এখনও মিলোয় নি—সেইটেই মনে ছিল না ওর। দু'হাত বাড়াতে গিয়ে কনুয়ের ভর চলে গেছে। সমস্ত জোরটা পড়েছে ঘাড়ে আর মেরুদণ্ডে, টং ক'রে উঠেছে কোথায়—অসহনীয় ব্যথা ও বেদনায় চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে গেছে কয়েক লহমার মতো, বিবশ শিথিল হয়ে এসেছে হাতপায়ের জোর, আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে অনুভূতি। শাহ্‌জাদীও বোধহয় সেটা বুঝলেন, তাঁর হাতেই সব ভারটা এসে পড়েছে, তিনি সযত্নে সামান্য আর একটু হেঁট হয়ে ওকে শুইয়ে দিয়ে হাতখানা টেনে নিলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চেতনা ফিরে এল আগার। তাড়াতাড়ি চোখ খুলে চারিদিক তাকিয়ে দেখল—কিন্তু তখন ঘর খালি, সে মূর্তি আর নেই। স্বপ্নে দেখবার মতোই যেন এসেছিল সে ঘরে, তন্দ্রা ভেঙ্গে স্বপ্নের মতোই মিলিয়ে গেছে।

তবে কি আজও খোয়াবই দেখল সে? এটাও কি তার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা? তাহলে এ ঘরে আলো জ্বালল কে? আর আর, হাতেই বা কি?

সাগ্রহে হাতের মুঠি খুলে দেখল। সুন্দর মিনের মধ্যে বড় চারকোণ লাল পাথর বসানো আংটি একটি। আগা চেনে না, তবে চুনি সে দেখেছে, সম্ভবতঃ এটাও চুনি। সেই সামান্য-মাত্র আলোতেই ঝিকমিকিয়ে উঠল, যেমন শাহ্‌জাদীর হাতে উঠেছিল একটু আগে।

তবে কি আংটিটা তার টানে খুলে এসেছে? না কি দয়া ক'রে সে-ই দিয়ে গেছে তাকে? সেই হুরী, সেই অমর্ত্যবাসিনী দেবদূতী?

আর পারে না সে ভাবতে, বা মাথা ঘামাতে। মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে এখনও। কিছু পূর্বের উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেহেমনে নেমেছে একান্ত অবসন্নতা। সে আংটিটা বুকে চেপে ধরে চোখ বুজল আবার।

পরের দিন রাত্রে শিরীণ্ ঘরে ঢুকেই বলল, 'তুমি শাহ্‌জাদীর আংটি খুলে রেখেছ কেন?'

নিজের মনে সন্দেহ একটা ছিলই—কিন্তু এখন শিরীণের প্রশ্ন করার ভঙ্গীতে যেন মরীয়া হয়ে উঠল। অসীম সাহসে ভর করে বলল, 'কেড়ে রাখব কেন, তিনি দিয়ে গেছেন।'

'ঝুট! তিনি আর দেবার লোক পেলেন না, তোমাকে দিয়ে গেছেন।...তুমি তাঁর হাত থেকে জোর ক'রে কেড়ে নিয়েছ। তোমাকে বারণ ক'রে গিয়েছিলাম, তুমি তাঁর হাত ধরতে গেলে কেন?'

'সে তুমি বুঝবে না। ওটুকু আমার হকের পাওনা। তাঁকে সেটা মনে করিয়ে দিতে জেনে-বুঝেই তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর কাজ করেছিলাম—এতকাল কোন পারিশ্রমিক দেন নি, ঐটেই আমার পারিশ্রমিক।'

বেশ জোরের সঙ্গেই চটপট উত্তর দেয় আগা আর্জ।

'তাই বলে তুমি তাঁর আংটি কেড়ে নেবে? ওটাও কি পারিশ্রমিকের মধ্যে পড়ে নাকি?'

'তিনি বড়মানুষ, তাঁর কত আছে। একটা নিলুমই বা।'

'এটা তাঁর মায়ের দেওয়া আংটি। বিশেষ প্রিয় তাঁর! ও চুনির দামও অনেক। ...ওটা ফেরৎ দাও।'

'বেশ দেব। ঐ সামান্য একটা আংটির জন্যে যদি শাহ্‌জাদীর চোখের ঘুম ছুটে যায়—নিশ্চয়ই দেব। আমরা চাকর নফর লোক, গরীব মানুষ—আমাদের অত পয়সার মায়া নেই—কিন্তু দিতে হয় তাঁকেই দেব। নিজে এসে চাইলে, স্বীকার করলে যে একটা আংটি তিনি প্রাণ ধরে দান করতে পারেন না, তবেই দেব।'

বুরখার মধ্যে একটু কি কৌতুকের ঝিলিক খেলে যায় শিরীণের চোখে? চাপা হাসির একটা কাঁপন জাগে কি তার দেহে? কে জানে, বুরখার আড়ালে অত বোঝা যায় না।

একটু চুপ ক'রে থেকে বেশ কঠিন কণ্ঠেই বলে, 'ইস্! তোমার হেমাকৎ তো কম নয়। তিনি আবার আসবেন তোমার কাছে, বাদশাজাদী নিজে এসে চাইবেন? তোমার আশা কত! কেন, আমাকে দিলে ক্ষতি কি? আমাকে কি বিশ্বাস হয় না? তিনি না বললে আমি জানলুম কি ক'রে?'

'বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথাই নয়। তুমি বলছ কেড়ে নিয়েছি, আমি বলছি তিনি দিয়ে গেছেন। এ মামলার নিষ্পত্তি করতে তাঁরই আসা দরকার। আমি সুস্থ থাকলে আমি নিজেই যেতাম। তিনি দয়া ক'রে আমার সামনে এসে বলুন যে তিনি দিয়ে যান নি, তৎক্ষণাৎ ফেরৎ দেব। এ তো সিধা কথা।'

'বেশ, সেই কথাই বলব তাঁকে।' যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ায় শিরীণ্।

'কিন্তু—তুমি—তুমি আর একটু দাঁড়াবে না? এটা তামাশা ক'রে বলছিলুম, তুমি কি সেজন্যে নারাজ হ'লে? যদি সত্যিই শাহ্‌জাদী রাগ করবেন মনে কর তো এটা এখনই নিয়ে যাও। আমার দরকার নেই। তোমাকে অসুবিধায় ফেলতে কি অপদস্থ করতে চাই না কোনমতেই।'

বোধহয় এবার একটু নরম হ'ল শিরীণ্। ফিরেও দাঁড়াল।

'তা নয়, ভাবছি নিজের পাওনা যে এতই ইয়াদ রাখে, পরের বেলা তার হুঁশ থাকে না কেন?'

'পরের পাওনা—? ও, তোমার কথা বলছ। কিন্তু তোমার পাওনা তো এত সামান্য নয় শিরীণ্, যে তুচ্ছ কোন বস্তুতে তার শোধ হবে। তোমার দেনা শুধব কি দিয়ে?'

'কেন, কথা দিয়ে?' তীক্ষ্ন বিদ্রূপ বেজে ওঠে শিরীণের গলায়, 'এই তো বেশ মিষ্টি ক'রে ক'রে কথা বলেই আমার দেনা শোধ দিচ্ছ, আর নিজের কাজ গুছিয়ে

নিচ্ছ। খোদা তোমাকে টাকা না দিন—কথা দিয়েছেন ঢের। অন্য দেনার কথা বলছি না নবাব সাহেব—হালফিলের কথাটাই মনে করো। নবাব বাদশাদের দরবারে আর্জি পেশ করতে গেলে কিছু খরচ করতে হয়, পেশকারদের পাওনা সেটা। শাহ্জাদীর কাছে আর্জি পেশ করার খরচটাই দিতে অন্ততঃ আজ্ঞা হোক।'

'তা বটে, তা বটে শিরীণ্', অপ্রতিভ হয়ে পড়ে আগা, 'তুমি আমাকে বড়ই লজ্জা দিলে। কিন্তু এ কাজের পেশকারীও সামান্য নয়। আমি তোমাকে কি দেব যাতে এই দেনা শোধ হয়। আমার যে সত্যিই আজ কথা ছাড়া কোন পুঁজি নেই! তুমি যা করেছ তার জন্য যথাসর্বস্ব উজাড় ক'রে দিলেও যে যথেষ্ট হয় না। কিন্তু কিছুই যার নেই, তার যথাই বা কি, সর্বস্বই বা কি! তবু—আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না, তুমিই বলো, এই মুহূর্তে দেবার মতো আমার কী আছে? থাকলে অবশ্য দেব—'

'কেন—দিল?'

বিদ্রূপ না আন্তরিক আবেগ? ঠিক বুঝতে পারে না তবু কথা দু'টো যেন চাবুকের মতো গায়ে চেপে বসে আগার। সে করুণ অপ্রতিভ কণ্ঠে ব'লে, 'সেটুকুও যে নেই আমার, তা তো তুমিই ভাল জানো শিরীণ্। সেটা তোমার সর্বাগ্রে প্রাপ্য কিন্তু আমি এমনই হতভাগ্য, সেটুকুও আজ হাতে নেই। আছে জান্, সেটা যে কোন সময় তোমার জন্যে দিতে রাজী আছি।'

'ওটা তোমারই থাক।' শাণিত বিদ্রূপে কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে আবার, 'ও জঞ্জালে আমার কাজ নেই। দিল বাদ দিয়ে যে জান, সে তো বোঝা একটা। সে যে-কোন পশুরও তো আছে।...তবু দিতে যে চেয়েছ সে জন্যেই ধন্যবাদ। তুমি তোমার জান্ নিয়ে নিরাপদে ঘুমোও, আমি চললুম!'

'শিরীণ্, এ ভাবে চ'লে গেলে বড় লজ্জা পাব কিন্তু। এরপর আর কারও কাছে মুখ দেখাতে পারব না। কিছু—কিছু কি একটা চাইতে পার না, যা আমার সাধ্যে কুলোয়? তোমার কাছে কিছুই নয় তা—তবু একটা স্মৃতি?'

'কিছু একটা নগদ বিদায় দিয়ে এই পাজি মেয়েছেলেটার হাত থেকে অব্যাহতি পেতে চাইছ—এই তো?'

'আঃ শিরীণ্, তোমার মুখে কি কিছুই আটকায় না? জেনে শুনে এসব কথাগুলো বল কেন? যাও, আমি আর কিছু বলতে চাই না।'

চ'লেই যাচ্ছিল শিরীণ্। যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল। আগার দিকে ফিরল, 'সত্যিই কিছু দিতে চাও?'

'সত্যি!...কী বলছ তুমি শিরীণ্, এই মুহূর্তে আমার রাজত্ব থাকলে গোটা রাজত্বটাই তোমাকে দিতে পারতুম।'

'না, অত ভয়ঙ্কর কিছু করতে হবে না তোমাকে। আপাতত হাতে যা আছে তাই দিলেই আমি কৃতার্থ হই!'

'হাতে? হাতে তো কিছুই নেই। তোমাদের যোগাড় ক'রে দেওয়া টাকাতেই তো বেঁচে উঠলাম—তবে আবার ওকথা বলে লজ্জা দিচ্ছ কেন?'

'টাকার কথা কে বলছে!...বলি, হাতে আংটিটা তো আছে!'

'আংটি!' নিমেষে বিবর্ণ হয়ে যায় আগার মুখ, তবু হাত থেকে মেহেরের দেওয়া আংটিটা খুলেই ফেলে।

'ওটা কে চাইছে বাবুসাহেব! ও রাহাজানি করা আংটি তুমিই রেখে দাও।

আমি বাটপাড় নই'। পরের ধনে পোদ্দারি করা পর্যন্ত বুঝি দৌড় তোমার? তবু ভরসা করে নিজের ঐ তুবড়ে যাওয়া আংটিটা দিতে পারছ না?'

'আমার তুবড়ে যাওয়া—'?'

মনেই ছিল না আগার। কোন্ ছেলেবেলাকার, সত্যি-সত্যিই ক্ষয়ে তুবড়ে যাওয়া একটা রুপোর আংটি কী যেন বাজে পাথর বসানো ছিল একটা—সেটাও খসে পড়ে গেছে, রুপোটা ক্ষয়ে পাত হয়ে গেছে'। এ আংটি যেন তার দেহেরই অঙ্গ হয়ে গেছে। তাই, ওর কথা আর মনে ছিল না বলেই, খোলা হয় নি। কোন আর্থিক মূল্য নেই বলেই অত বিপদের সময়ও সেটার কথা মনে পড়ে নি'।

'ও, এইটের কথা বলছ? ছিঃ ছিঃ, এই জিনিস কি তোমার হাতে তুলে দেওয়া যায়! এর যে এক ঢেবুয়াও দাম নেই!'

'তবু ঐটেই তো তোমার নিজস্ব। টাকা দিয়ে কত দামী জিনিস কিনতে পারবে তুমি আমার জন্যে? তুমিই তো বলছ ঋণের শেষ নেই।...আর ও শাহ্‌জাদীর আংটি নিয়ে আমি কোথায় রাখব, চোর বলে ধরবে যে!'

'কিন্তু তাই ব'লে ঐ আংটিটা!...ও আংটি তোমার আঙ্গুলে পরলে লোকে কি বলবে'। আর আমিও লজ্জায় মরে যাব তোমার দিকে চেয়ে।'

'দেবার ইচ্ছে নেই, সোজাসুজি তাই বলে দাও না'। উনি আবার রাজত্ব দেবেন বকশিশ, তবেই হয়েছে!'

'তুমি—শিরীণ্—তুমি সত্যিই চাইছ! বেশ, তবে নাও, কিন্তু দোহাই তোমার, হাতে যেন পরতে যেও না।'

'সে আমি বুঝব।'

তখনও আগা ভাবছে শিরীণের এটা দুষ্টুমি'। সে দিতে গিয়েও ইতস্ততঃ করছিল। কিন্তু দেখল যে শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই হাত পেতে নিল সে আংটিটা। তারপর বুরখাটা ভাল ক'রে গুছিয়ে নিয়ে যাবার সময় বলে গেল, 'শাহ্‌জাদীর আংটিটা ফেরৎ না দাও, জামার মধ্যে লুকিয়ে রাখ, কেউ দেখলে কী কৈফিয়ৎ দেবে? আর জানাজানি হ'লে শাহ্‌জাদীই বা কী জবাব দেবেন?'

॥ তেরো ॥

আর কটা দিন পরে চাকরির জন্যে দপ্তরে এত্তেলা দিতে গিয়ে শুনল যে সেখানেও এক অঘটন ঘটে ব'সে আছে। মনে হ'ল যে এবার তার ওপর অদৃষ্ট-দেবতার কোপ কাটছে একটু একটু করে। নইলে হঠাৎ অকারণে বাদশার এমন মতি-গতি হবে কেন? অবশ্য ঘটনা ঘটিয়েছেন ঠিক যে, বাদশা না হেকিম সাহেব, না বড় মির্জা সাহেব তা জানে না আগা, তবে হুকুম তো বাদশার নামেই, সুতরাং বাদশার মতিই মানতে হবে।

হুকুমটা হচ্ছে—তার চাকরিতে উন্নতি হয়েছে। সিপাহীর চাকরি হয়েছে তার, তাও সাধারণ সিপাহী নয়—বাদশার দেহরক্ষী বলে যে কুড়ি পঁচিশ জন বেশী মাইনের সিপাহী পোষা হয়—তাইতেই নেওয়া হয়েছে ওকে। সে দলের কে একজন এর মধ্যে হঠাৎ মারা গেছে, সেই জায়গায় ওর নাম উঠেছে খাতায়'। অর্থাৎ মাইনে বেশী, কাজ কম, দামী পোশাক, অবসর প্রচুর। কখনও-সখনও বাদশা রেশেলা ক'রে বেরোলে তবেই ধড়াচুড়ো এ'টে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে—নইলে এমনি সপ্তাহে দু'দিন এক

এক বেলা হিসেবে বাদশার কামরার বাইরে সান্ত্রী পাহারা দেওয়া, এইটুকুই আসল কাজ। বাকী সমস্ত সময়টা অখণ্ড অবসর। অবশ্য হ্যাঁ, মধ্যে মধ্যে কুচকাওয়াজ আছে। তবে সেও বিশেষ কিছু না, আংরেজদের দিকে যত মেহনৎ, এদিকে তত নয়।

এতটা অনুগ্রহ কার জন্য সম্ভব হল তা জানা গেল না ঠিক, তবে আগার বিশ্বাস এর মূলেও শাহ্‌জাদীর গোপন হাত কিছু আছে। অন্ততঃ সেইটেই ভাবতে ভাল লাগল তার এবং সেজন্য আর এক দফা কৃতজ্ঞ বোধ করল। আগা যে তাঁকে ফেরিস্তা ভাবে তা নিতান্ত কল্পনা নয়—তার জীবনের চরম সন্ধিক্ষণগুলিতে তিনিই তো মঙ্গল বহন ক'রে আনছেন।

অবসর অনেক, নিজস্ব জমকালো পোশাকও হয়েছে একটা, ঘোড়াও বরাদ্দ আছে, চাইলেই পেতে পারে। এখান থেকে গাজীমণ্ডী ভাল ঘোড়া পেলে যেতে আসতে দুঘণ্টাও লাগে না। ওদের খবরের জন্য প্রাণটা ছটফট করছে—একটু হুঁশ ফিরে আসবার পর থেকেই। কী হ'ল ওদের, বাঁচাতে পারল কিনা দিল মহম্মদ—সে নিজেই নিরাপদে আছে কিনা, কিছুই জানা যাচ্ছে না। তার মন্দ ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে সে বেচারীর যদি ভাল-মন্দ কিছু হয়, নিজের কাছেই নিজে মুখ দেখাতে পারবে না আগা। অথচ এইখান থেকে এইখানে—খবরটুকুও নিতে পারছে না। আগ্রহ এবং সুবিধা যতই থাক, বাধাও পর্বতপ্রমাণ। এখনও দুশমনের পাহারা সদাজাগ্রত—সব কটি ফটকেই। এর আগের বারের সিপাহীর পোশাক ও ঘোড়া কাজে লেগেছিল, কারণ সেভাবে ওকে দেখবে কেউ আশা করে নি। এবার তারাও হুঁশিয়ার হয়ে গেছে, ওভাবে আর ওদের চোখে ধুলো দেওয়া যাবে না। অথচ অন্য কি ভাবে যে বেরোনো যায় কিল্লা থেকে তাও তো ভেবে পায় না।

অবশেষে একদিন দৈবাৎ ফন্দীটা খেলে গেল মাথায়। দিনের বেলা বিস্তর বাইরের লোক কিল্লায় মজুরী খাটতে আসে। নানা রকমের কাজে দরকার হয় ওদের। সম্প্রতি আংরেজদের ব্যারাকে কি একটা বাড়ি ভেঙ্গে নতুন ইমারত উঠছে, তার জন্যে বাইরে থেকে মিস্ত্রী মজুর দুই-ই আসে। ঝুড়ি গাঁইতি কোদাল এসব নিয়েই আসে ওরা—আবার নিয়ে বেরিয়ে যায়। অনেক সময় অনেকের কাজ ঠিক থাকে না, কাজের সন্ধানেও আসে। তাদের মধ্যে সকলের সবদিন কাজ হয়ও না। কেউ হয়ত খানিকক্ষণ বসে থেকে একে-ওকে ধরে শেষের দিকে আধরোজের মতো কাজ পায়, আবার কারুর অদৃষ্টে আদৌ জোটে না—বিকেলে রোদ পড়া শুরু হওয়া পর্যন্ত দেখে শুকনো মুখে বেরিয়ে যায়। কেউ সোজাসুজি গোড়াতেই আধবেলার কড়ারে কাজে লাগে—দুপুরে তাদের ছুটি হয়ে যায়। তারা সেই সময়েই একেবারে ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে বাড়ি ফেরে। এদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। বাদশার দিকেও বাদশার খাশ 'জাফর-মহলে' কী সব মেরামতি কাজ হচ্ছে। সে জন্যেও মজুর লাগছে কিছু। মোট কথা দুদিক মিলিয়ে বেশ কিছু লোক এইভাবে আনাগোনা করে। সাধারণত মাথায় বা হাতে ঝুড়ি দেখলেই সান্ত্রীরা পাহারাওয়ালারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। মানুষটার দিকে ভাল ক'রে তাকায় না। ঝুড়ির সঙ্গে যদি শাবল-কোদাল রইল তো কথাই নেই।

আগা কদিন ধরে ভাল ক'রে লক্ষ্য করল এদের হাব-ভাব, চলন, পোশাক-আশাক—সব। বেশির ভাগই জাঠরা এই মজুরী খাটতে আসে, কিছু কিছু স্থানীয় দেহাতিরাও আছে। আর কিছু না থাক মাথায় পাগড়ি আছে প্রত্যেকেরই প্রকাণ্ড

প্রকাণ্ড। তার মধ্যে জাঠরা আবার অধিকাংশই রঙীন কাপড়ের পাগড়ি বাঁধে। এ ছাড়া হাঁটুর উপর পর্যন্ত অনাবৃত মোটা গাড়া কাপড় এবং খাটো কুর্তা—এই-ই সাধারণ বেশ। মিস্ত্রীরা প্রায় সবই মুসলমান, এদেশী সাদা টুপি তাদের—পোশাক-আশাকেও খাশ দিল্লীওয়ালা। খাটো দাড়ি, ছাঁটা গোঁফ,—তাদের নকল করা মুশকিল, কিন্তু মজুররা প্রায় সবাই একরকম। শুধু আগার পায়ের দিকটা একটু বেশী ফর্সা—তা বোধহয় বেশী ক'রে খানিকটা ধুলো মাখিয়ে নিলেই বৈসাদৃশ্যটা ঢাকা পড়বে।

ফটকের ভেতর থেকে ওর দুশমন পাঠান পাহারাদারদেরও লক্ষ্য করল আগা। তারা সিপাহী সান্ত্রী দেখলেই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে আজকাল, ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখে মুখের দিকে। কিন্তু ধুতি পরা লোক, বিশেষ এই মজুরদের দিকে লক্ষ্যও করে না।

আগা তনখার টাকা পেয়েছিল। তাই থেকে একটা টাকা দিয়ে রহমৎকে বাজারে পাঠাল—একখানা খাটো গাড়া ধুতি, আর সাধারণ মজুরদের মতো একটা খাটো কুর্তা আনতে।

রহমৎ তো অবাক, 'সে আবার কি হবে তোমার!'

'দেব একজনকে।'

'দেবে? কে সে—যে এমন বলিহারী চিজ দিতে হবে?'

'আছে বন্ধু, আছে। এত কৌতূহল কেন?'

'কোনও মিস্ত্রী মজুরের পরিবারের সঙ্গে আশনাই করেছ বুঝি যে তাকে ঘুষ দিতে হবে—না মেয়েটার ভাইকে দেবে? আপাততঃ শালাকে?'

'উঁহু! দেব আমার ভায়ের মামার ভগ্নীপতিকে। সে তুমি বুঝবে না।'

'কী, কী হল—ভায়ের মামার ভগ্নীপতি? ও বাব্বা, এ বড় জটিল সম্পর্ক হল যে দেখছি। সত্যিই আমি বুঝব না। নিজের ভগ্নীপতির সঙ্গেই সম্পর্কটা কি দাঁড়াল তাই দশবার ভাবতে হয়—তা ভায়ের মামার ভগ্নীপতি। মরুকগে, লেকিন কুর্তার মাপ?'

'মাপ? ধর—তা আমার মাপই আন্দাজ করে নাও।'

'তোমার মাপ? সে তো বেশ দশাসই চেহারা হবে দেখছি,—তোমার মেহমান! তাকে এই গাড়া কাপড় দেবে? ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো মনে হচ্ছে!'

'আরে দোস্ত্—যা বলছি নিয়ে এসো না। এ সব ব্যাপার কি আর তোমার বুঝতে বাকী থাকবে? যা সাফ্ মাথা তোমার? বুঝবেই একদিন। তোমাকে ফাঁকি দিয়ে আর কে কবে কি করতে পেরেছে?'

'জরুর! সো বাত্ ঠিক হ্যায়। আমাকে ফাঁকি দিয়ে কি চোখে ধুলো দিয়ে কিছু করবে—এমন লোক জন্মায় নি এখনও।'

রহমৎ নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল। আগাও নিশ্চিন্ত হ'ল। এসব কথা দু'প্রহর পরে আর রহমতের মনে থাকবে না।

কাপড় জামা সংগ্রহ হতে আগা লক্ষ্য ক'রে ক'রে একটা বুড়ো গোছের মজুরকে বেছে নিল। বুড়ো এবং একটু বোকা ধরণের। আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার কাছে প্রস্তাব করল যে, সে যদি দুপুরটা একটু আরামে ঘুমোতে রাজী থাকে তো ঘুমোক,—স্রেফ তার কোদালটা আর ঝুড়ি আগাকে দিয়ে দিক, বসে বসে মজুরী পাবে। চাই কি—পুরো কাজের মজুরীর ওপরও এক আনা বেশী দেবে সে। সন্দেহ

হয় তো সেটা আগাম নিয়ে নিক, তাতে কোন আপত্তি নেই। ও বাইরে এক জায়গায় একটু জরুরী কাজের জন্যে নিচ্ছে, জান-পছানা এক শেঠের লোহার সিন্দুক মাটিতে বসাবার কাজ, বাইরের অজানা লোককে দিয়ে সে করাবে না। ওর সঙ্গে জানাশুনো আছে বলে ওকেই ডেকেছে। যারা যারা কাজ করবে তারা আটগুনো মজুরী পাবে। তাই আগার এত আকিঞ্চন।

বুড়ো বোকা-সোকা হ'লেও সোজা কথাটা বুঝবে না এত হাঁদা নয়। সে বললে, 'সে আমি পারব না। তুমি অন্য লোক দ্যাখো।'

আগা তো অবাক, 'কেন—এতে তোমার অসুবিধে কি?'

বুড়ো কথাই শোনে না, চলে যেতে চায়। আগা তখন জোর ক'রে তার সামনে এসে পথ আটকে দাঁড়াল।

'আরে, তোমার আপত্তিটা কি অন্ততঃ তাই বলে যাও।'

'দ্যাখো, আমি মুলুকী গাঁওয়ার হ'তে পারি কিন্তু বয়স আমার ঢের হ'ল—তোমার মত ফেরেববাজ লোকও আমি ঢের দেখেছি। আমাকে ঠকাতে এসো না।'

অপমানে আগার মুখ রাঙা হয়ে উঠল কিন্তু এ ক্ষেত্রে ধৈর্য হারালে চলবে না, সে হাসি-হাসি মুখেই বলল, 'কিন্তু এর ভেতর ফেরেববাজীর কি আছে তা তো বুঝছি না। একটু খুলেই বলো না।'

'আরে, আমাকে চোদ্দ পয়সার মজুরির লোভ দেখিয়ে আমার আট আনার কোদালখানা মেরে দেবার তালে আছ—সে আমি বুঝি না? ঝুড়ি না হয় ধরছিই না—এক মুঠো মকাই দিয়ে কেনা, হয়েও গেল ঢের দিন, কিন্তু কোদালটা আনকোরা নতুন।'

'ও, এই কথা! বেশ, কোদালের আট আনা জমা রাখো, সন্ধ্যের সময় এসে তোমার কোদাল ফেরত দিলে ও আট আনা তুমি ওয়াপিস দিও—নইলে সোজা কিনে নেবে একখানা কোদাল, তাতে কি?'

তবুও বুড়োর সন্দেহ যায় না, 'তা এতই যদি—কোদাল একখানা তুমিই কিনে নিচ্ছ না কেন?'

'আরে, বুদ্ধু বেঅকুফ! কোদাল নিয়ে আমি কি করব, রোজ তো আর আমি একাজ করছি না। সেই জন্যেই তো আমি চোদ্দ পয়সা ভাড়া দিচ্ছি।'

আরও খানিক ভাবল বুড়ো। শেষে বলল, 'তা তবে নাও। সন্ধ্যের সময় এখানেই থাকব আমি।...তুমি দেবে এখন, ধরো জমার আটআনা, মজুরীর চোদ্দ পয়সা, আর এক ঢেবুয়া আরও—'

'কেন, আবার এক ঢেবুয়া কেন?'

'এতক্ষণ চুপচাপ বসে থাকব আমি—তামুক খেতে হবে না? সে খরচা কে দেবে? কাজে থাকলে তো তা খেতে হ'ত না। এক আধ ছিলিম ঠিকেদারই খাওয়াত।'

'খুব বোকা লোককে বেছে নিয়েছিলুম!'—মনে মনে বলে আগা, 'বুড়ো আস্ত ঘুঘু।'

আগার প্রথম মতলব ছিল যে কিল্লার বাইরে কোনমতে বেরোতে পারলে শহরের কোন সরাইখানা থেকে একটা ঘোড়া ভাড়া করবে। তাতেও যদি অসুবিধা হয় হেঁটেই মেরে দেবে পথটা। পা চালিয়ে হেঁটে গেলে—সেখানে যদি দেরি না করে, হেঁটেই

ফিরে আসতে পারবে সন্ধ্যের মধ্যে। আর সন্ধ্যে বলতে কি ঠিক ঠিক সন্ধ্যেই—বুড়ো কি আর এক-আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করবে না তার ঝুড়ি কোদালের জন্যে?

কিন্তু ফটক দিয়ে বেরোতে বেরোতে একটা দুষ্টুবুদ্ধি খেলে গেল মাথায়।

আগা যখন বেরোল তখন ঠিক বারোটা, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ বাইরে। লাহোরী দরওয়াজায় সান্ত্রীরা যতটা সম্ভব পাঁচিলের ছায়া ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বন্দুকে ভর দিয়ে ঝিমোচ্ছে। যে ছোকরা রাজমাকীটির ওপর এ ফটক পাহারা দেবার ভার, সেও কিছু দূরে টাঙ্গার আড্ডায় একটা টাঙ্গাওয়ালার সঙ্গে ভাব জমিয়ে টাঙ্গা আশ্রয় করেছে, তারও চোখে ঢুলুনি।......সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল আগার, এ লোকটা তো পরের গাড়িতে চেপে আছে, এর ঘোড়াটা কোথায়? ঘোড়া ছাড়া তো এরা থাকবে না, দরকার হ'লে তখনই খবর দিতে হবে কিম্বা পিছু নিতে হবে যাকে, ঘোড়া তার চাই-ই।......এর ঘোড়াটা পেলে তো হয়—এদের ঘোড়াতে ক'রে এদের ফাঁকি দেওয়া, মন্দ কি! নিজের মতলবে নিজেই খুশী হয়ে উঠল আগা।

একবার চারদিকে তাকাতেই ঘোড়াটাও চোখে পড়ল। দূরে একটা চারা নিম-গাছের ডালে একটা মালিকহীন ঘোড়া বাঁধা। ঐটেই নিশ্চয় ওর ঘোড়া। জীন লাগাম সাজ দেখে বুঝল পাঠানের ঘোড়া। তখন আর সন্দেহ রইল না—দুই আর দুইয়ে মিলিয়ে চারের মতোই ঘোড়ার মালিকানা বোঝা গেল। ঘোড়া চুরি ক'রে পালালে তখন না হোক কিছু পরেই টের পাবে লোকটা, তখন সাজ সাজ রব উঠবে, ফিরে আসার সময় মুশকিলে পড়তে হবে—এসব কোন কথাই তখন মনে পড়ল না। ওদের ঠকানো হবে ভারী, এই আনন্দেই মশগুল হয়ে রইল আগা। ছেলেমানুষের কাছে ছেলেমানুষী বুদ্ধির আকর্ষণ প্রবল, এ বয়সে ভবিষ্যতের হিসেব অত মাথায় আসে না। সে প্রথমে ফটক থেকে বেরিয়ে সোজা চাঁদনীর দিকে এগিয়ে গেল খানিকটা, তারপর ডান দিকের একটা গলি দিয়ে বেরিয়ে অনেকটা ঘুরে এসে গড়-খাইয়ের ঢালুতে একটা কাটা গাছের গুঁড়ি খুঁজে তাতেই ঝুড়ি কোদাল আটকে রেখে চুপি চুপি এসে ঘোড়াটা খুলে নিল। তারপর তাকে খানিকটা হাঁটিয়ে অনেকখানি দূরে নিয়ে এসে সওয়ার হয়ে বসল। ঘোড়া পাকা সওয়ার চেনে, পায়ের ঈষৎ চাপ খেয়েই নক্ষত্রবেগে ছুটল সে। ওধারে তার রাজমাকী মালিক তেমনিই ঢুলতে লাগল বসে বসে, এসবের বিন্দুবিসর্গও জানল না।

এতক্ষণ পর্যন্ত নির্বিবাদে এবং সুশৃঙ্খলে সবরকম সুবিধা হয়ে যাওয়াতে আগা যেন মনে বল পেল অনেকখানি। আশা হ'ল যে, ওখানে গিয়েও সবাইকে বহাল তবিয়তে সুস্থ শরীরে দেখতে পাবে। একটু শুধু ভয় ছিল যে, ওখানেও এরা কোন পাহারা বসাবার ব্যবস্থা করেছে কিনা। কোনদিন না কোনদিন আগা আবার মা বোনের খবর নিতে আসবে, এই আন্দাজ ক'রে। মনে মনে এর জন্যও প্রস্তুত হয়ে-ছিল সে। কাছাকাছি পেঁছে একটু চোখ-কান সজাগ রাখতে হবে। হুঁশিয়ার হয়ে এগোতে হবে গাঁয়ের ধারে পেঁছে। তেমন তেমন দেখলে সে বাড়িতে যাবার কি ওদের ডাকবার চেষ্টা করবে না, দূরে থেকেই দেখে কিম্বা পাড়া-ঘরে খবর নিয়ে ওরা সুস্থ আছে জেনে—চলে আসবে।

আর বেশী দিনও তো নয়, আগা মনে মনে বেশ জোর দিয়েই বলে। মুক্তি পাবার উপায় সে একটা ভেবে নিয়েছে ইতিমধ্যেই। ফৌজের মধ্যে যখন এসে পড়েছে তখন আর ভয় নেই, সিপাহীদের সঙ্গে দোস্তি হবেই। তার মধ্যে আবার জন-কতককে বাছাই ক'রে নিয়ে তাদের সঙ্গে একটু বেশী করে ঘনিষ্ঠতা করবে।

দোস্তি পাকা হ'লে সব কথা খুলে বলবে তাদের। তিন-চারজনও যদি ঠিক মনের মতো সঙ্গী পায়—যারা অত জানের পরোয়া করে না, শরীরটা বাঁচাবার জন্যে পুতু-পুতু ভাব নেই—তাহ'লে তাদের নিয়েই একদিন মুখোমুখি দাঁড়াবে রাজমাকীদের সঙ্গে—এস্পার ওস্পার ক'রে ফেলবে একটা। দূরে কোথাও নিয়ে যাবে—দরিয়া কিনারে কি জঙ্গলের মধ্যে—তারপর ওদের দেখে নেবে, বিশেষতঃ ঐ এক-চোখো কাইয়ুম খাঁকে। আজ আগা যতই বিপন্ন ও বিব্রত হোক, ন্যায় ও সত্য যখন তার দিকে, তখন শেষ পর্যন্ত তার জয় হবেই।

শুধু আরও কটা মাস—দোস্তিটা জমাট না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। লোক বাছাইটা হ'ল আসল কথা, যাকে তাকে দিয়ে এসব কাজ হবে না। রহমতের মত লোক হলে চলবে না। খুব সাচ্চা লোক রহমৎ—কিন্তু বিষম বোকা ও ভীতু। কোন ঝঞ্ঝাট ঝামেলায় যেতে চায় না সহজে। ওর হাবিলদার বন্ধুকে দিয়েও কোন কাজ হবে না—আংরেজের কাছে নোকরী ক'রে কানুনের বড় বেশী ভয় ঢুকে গেছে ওর মাথায়। না, অন্যলোক দেখতে হবে। তার বয়সী, মনে সাহস আছে, হাতে বল আছে—যাকে বন্ধু বলে মেনেছে তার জন্যে জান্ দিতে পারে—এমন লোক চাই। কিন্তু তা কি আর মিলবে না, অতগুলো সিপাহীর মধ্যে? মিলেই যাবে।

অল্প বয়স আগার, স্বভাবতই আশাবাদী সে। দুর্ভাগ্যের মেঘ কেটে গিয়ে সামনে সৌভাগ্যের দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে সেইটেই ভাবতে ভাল লাগছে তার।

গাজীমন্ডীতে গিয়ে প্রথম রূঢ় আঘাত পেল ওর এতক্ষণের সুখস্বপ্ন। হঠাৎ একটা ঝাঁকানি খেয়ে কল্পনার নন্দন-লোক থেকে যেন বাস্তব কঠিন পৃথিবীতে এসে পড়ল। পৃথিবী বললেও ভুল বলা হবে, বোধ হয় দোজখে এসে পড়ল।

না, রাজমাকীদের চিহ্ন নেই কোথাও। আশেপাশে যতদূর দৃষ্টি যায়—কোথাও কোন ধূর্ত সতর্ক চক্ষু নেই তার দিকে। আগা একটা গাছের উপর উঠে ভাল ক'রে দেখল—পাঠানদের অস্তিত্ব কোথাও চোখে পড়ল না।

কিন্তু তাও যেমন পড়ল না, তেমনি দিল মহম্মদেরও না। তাদের কোন চিহ্ন কোথাও নেই।

ভাল ক'রে চোখ রগড়ে দেখল আগা। এটাই গাজীমন্ডী তো? সন্দেহের কারণ নেই, তবু ভাল ক'রে মিলিয়ে দেখল। ঐ মাঠটা, মাঠের ওপারে রজৌল, রজৌলের হাটতলা, সেই বড় অশ্বত্থগাছটা—সবই তো ঠিক মিলছে। দু'একটা ঘর-বাড়িও তো চেনা-চেনা লাগছে। ঐ তো চৌধুরী হরকিষণ লালের পাকা বাড়িটাও নজরে পড়ছে। সবই তো ঠিক আছে। এটাই গাজীমন্ডী সন্দেহ নেই। তবে? তাহ'লে দিল মহম্মদের বাড়ি? সে বাড়িটা গেল কোথায়?

এ প্রশ্নের যে স্বাভাবিক ও সঙ্গত একমাত্র উত্তর হ'তে পারে, সেটা অন্তত বিশবার নিজেরই জিভের ডগায় এলেও, উচ্চারণ করতে পারল না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠল ওর, কপাল থেকে ঘাম গড়িয়ে চোখে পড়ে জ্বালা করতে লাগল। গাছের ওপর বসে থাকা আর সম্ভব নয়, মাথাটা ঘুরছে একটু একটু। সেখান থেকে মাটিতে নেমে আবার যেন হুঁশ ফিরল কিছুটা। আবার খুঁজল ভাল ক'রে। তন্ন তন্ন ক'রে হিসেব মিলিয়ে, আগের অভিজ্ঞতা মনে ক'রে। স্মৃতি থেকে পথটা মনে ক'রে দেখে আবার সেই জায়গাতেই ফিরে এল। ফল সেই একই। বাড়িঘর, গো-

শালা, খামারশালা—কোথাও কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, ভাল ক'রে তাকিয়ে কিছু চিহ্ন মিলল এবার। মনে হচ্ছে ছিল এখানে—বসতি ছিল মনে হচ্ছে, বাড়ি ঘর সবই ছিল। তবে এখন তার ভগ্নাবশেষ পড়ে আছে। ছাইয়ের গাদা থাকলে আগেই নজরে পড়ত, প্রবল বাতাসে উড়ে উড়ে অনেক কমে গেছে বোধহয়, হয়ত এর মধ্যে বৃষ্টিও হয়ে থাকবে, কিছু ধুয়েও গেছে। ছাই অনেক কম বলেই দূর থেকে দেখতে পায় নি। এবার কাছে এসে ভাল ক'রে দেখতে ছাইয়ের নিচে ঘরের পোতাগুলোও লক্ষ্য হ'ল। ঘরগুলোর সংস্থান দেখে মনে হ'ল—এইটাই এককালে দিল মহম্মদের বাড়ি ছিল, এইখানেই সে থেকে গেছে, সেদিনও এসে দেখা করেছে।

সেই প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত পোড়া ভিটেটার ওপরই অবসন্ন ভাবে বসে পড়ল আগা। ঘোড়াটা বাঁধা হয় নি, ঘাসের সন্ধানে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে। দূরে চলে যেতে পারে ক্রমশঃ। ফলে আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে ফেরার সময় অসুবিধা হবে। কিন্তু সে সব কিছুই খেয়াল রইল না আগার। কোন কিছুতেই দরকার নেই আর, যা খুশি হোক গে। ফেরারই বা আর প্রয়োজন কি? চাকরিই বা আর করতে যাবে কার জন্যে? চুলোয় যাক চাকরি আর উন্নতি।......

এতদিন, এত দুঃখে যা হয় নি, আজ তাই হ'ল। চোখ ফেটে জল এল আগার। এ চোখের জল নিজের বা নিজেদের জন্যে নয়, এ জল দিল মহম্মদের জন্যে। বেচারী বন্ধুবৎসল দরাজদিল দিলু!...তার তো এসব কিছুই হবার কথা নয়। মা-বাপের এক ছেলে সে, পৈতৃক সম্পত্তিও যথেষ্ট—শুয়ে-বসে কাটিয়ে দিলেও তার জীবনটা সচ্ছলে কেটে যেত। সুখেই কাটত। কোন দায়, কোন দায়িত্ব, কোন ঝঞ্ঝাট নেই জীবনে—নিষ্কণ্টক নিরুপদ্রবে দিন কাটাবার কথা। পথ থেকে উড়ো-আপদ ধরে এনে কী সর্বনাশই করল নিজের। সর্বস্বান্ত হল, জানেপ্রাণে মারা গেল। ঘর-বাড়ি তো গেছেই, প্রাণেই কি আর বাঁচতে পেরেছে! নিশ্চয়ই সবসুদ্ধ পুড়িয়ে মেরেছে খুনেগুলো, চারিদিক থেকে বেড়া আগুন দিয়েছে। ওর মা বোন গেছে যাক, বেইজ্জত, অপমানিত হওয়ার হাত থেকে পুড়ে মরাও ঢের ভাল—কিন্তু দিলু আর সাকিনা বিবি? ওদের মৃত্যুর জন্যে যে প্রধানতঃ সে-ই দায়ী হয়ে রইল। সেদিন সে যদি না আসত, ঐ হেকিমটার ফাঁদে পা না বাড়াত—নিশ্চয়ই মোটা ঘুষের বদলে হেকিমটা এই ব্যবস্থা করেছে—তাহ'লে তো আর ওদের এই সর্বনাশ হ'ত না। সে এর পর বেঁচে থেকে লোককে মুখ দেখাবে কি ক'রে? রোজ কিয়ামতের দিন খোদার দরবারেই বা কি জবাব দেবে?......

অনেকক্ষণ ধরে সেইভাবে বসে রইল আগা। সেইভাবেই অবিরাম চোখের জল পড়ে পড়ে তার বুকের কাছে কুর্তাটা ভিজে উঠল। কিন্তু তাইতেই সুফল হ'ল কিছু। কান্নার ফলেই দুঃখ এবং বুকের বোঝা অনেকটা লঘু হয়ে গেল। একটু একটু ক'রে ভরসাও ফিরে এল খানিকটা। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। দেখাই যাক না একটু খোঁজ-খবর ক'রে। একেবারেই 'কু'টা ধরে নিচ্ছে কেন? আল্লা এতদিন এত বিপদ থেকে বাঁচিয়ে এসে—বলতে গেলে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে শেষে কি এমন সর্বনাশটাই করবেন? তাঁর রাজত্বে এতবড় অবিচার হবে?

উঠে দাঁড়াল আগা। ঘোড়াটাকে ধরে এনে একটা গাছের ডালে বাঁধল। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে চৌধুরী হরকিষণ লালের বড় বাড়িটাতে গিয়ে হাজির হ'ল।

চৌধুরী সাহেব বাড়িতেই ছিলেন। আহারান্তে উঠানের বড় আমগাছটার তলায়

চারপাই পেতে বসে কাঠের শ্লেট পেতে খড়ি দিয়ে কি হিসাব-নিকাশ করছিলেন। আগাকে এর আগে তিনি দেখেন নি। দেখলেও চিনতে পারতেন না এই বেশে। মুখ তুলে ওকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করলেন, 'কী চাই?' তারপর আগার প্রশ্ন শুনে ঈষৎ যেন অমায়িক কণ্ঠেই বললেন, 'কেন, দিল মহম্মদকে তোমার কি দরকার? তুমি তার জমি চাষ করো বুঝি? তা খাজনা দিতে যদি এসে থাক তো আমাকেই দিয়ে যেতে পারো। আমি তার বাপের বন্ধু—এ গাঁয়ের আমিই চৌধুরী, আমিই তার জমি দেখা-শুনো করছি।'

দেখাশুনো যে কত করছেন তা এক নজরেই আগা বুঝে নিয়েছে। পাক্কা বেনিয়া—চোখের দৃষ্টিতে ধূর্ততা আর লোভ মাখানো। তবু সবিনয় বলল, 'আজ্ঞে না, আমি সামান্য কিছু পেতুম, তাই—'

সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হয়ে উঠল চৌধুরী সাহেবের কিছু পূর্বের প্রসন্ন দৃষ্টি, 'পেতে? তা এতদিন কি করছিলে? ওরা তো এখান থেকে চলে গেছে অনেকদিন।'

চলে গেছে! আগার বুকটা আশা ও আনন্দে লাফিয়ে উঠল। তার মানে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে পেরেছে। খোদা হাফেজ!...আরও বিনীত ভাবে আগা বলল, 'আজ্ঞে, আমি বড্ড বেমারিতে পড়েছিলুম, গাড়ি চাপা পড়ে বহুৎ দিন ভুগেছি তাই আসতে পারি নি। গরিব মানুষ, এ সময় টাকাটা পেলে খুব উপকার হত। বড় দেনা হয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। আপনি যখন সব হিসাবপত্র দেখছেন তার, তখন আমার নামও অবিশ্যি পেয়ে থাকবেন। দয়া ক'রে দেখুন না খাতাটা, হবিবুল্লা শেখের নামে কত লেখা আছে?'

চৌধুরী বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, 'ওসব দেখবার এখন আমার সময় নেই বাপু। বলে, নিজের রুগী পথ্যি পায় না, আমি যাব পরের বাড়ি রুগী দেখতে। অত শখও নেই আমার। পাড়ার ছেলে, ওর বাপ আমার অনুগত ছিল—চলে গেছে বিপদে পড়ে, যদি কিছু আদায় আঞ্জাম করতে পারি, ফিরে এলে তার কাজে লাগবে—এইটুকু তাই দেখছি। তাই বলে হিসেব-নিকেশ ক'রে পরের পাওনা-গন্ডা মেটাতে বসব, সময় আমার অত সস্তা নয়।'

'তা ওঁদের কী বিপদ হ'ল, কোথায়ই বা গেলেন এখান থেকে উঠে—ঘর-বাড়িই বা ভেঙ্গে দিলেন কেন, কিছুই তো বুঝতে পারছি না লালাজী, দয়া ক'রে যদি একটু খোলসা করেন—'

'ভাঙ্গা কেন হবে—পোড়া। মাস দুই আগে ডাকাত পড়েছিল—ওদের পায় নি, বোধহয় টাকা-কড়িও পায় নি, সেই আক্রোশে বাড়ি-ঘর-দোর জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে।'

'তাই নাকি?...হায়-হায়, বড় তাজ্জব কথা তো। এতবড় গাঁয়ে ঢুকে এমন কান্ড ক'রে যেতে সাহস করল? তা গাঁয়ের লোক কিছু বলল না?'

'তুমি যাও দিকি বাপু, মিছে বকর-বকর ক'রে আমার মাথা ধরিয়ে দিও না। বন্দুক তলোয়ার নিয়ে মশাল জ্বালিয়ে ডাকাত এসেছে, তার সঙ্গে শুধু লাঠি হাতে গাঁয়ের লোক যাবে লড়াই করতে! সরকারী পুলিস থাকলেও ভেগে যেত, তা গাঁয়ের লোক! সবাই তখন বাড়িতে বসে কাঁপছে আর রামজীর নাম জপ করছে, ভাবছে তাদের উপর আবার না পড়ে আবার!'

'আজ্ঞে অন্যায় হয়ে গেছে, মাফ করবেন। গরীব চাষী মানুষ, অত কি বুঝি সুঝি, সময় নষ্ট করছি আপনার। বাপ রে, আপনাদের সময়ের কত দাম!...লেকিন গরীব পরওয়র, একটা কথা—ওরা কোথায় গেছে এখান থেকে, যদি বলে দেন তো এই

নাচার লোকটার খুব উপকার হয়!'

আগার বিনয়ে চৌধুরী সাহেব খানিকটা নরম হলেন, 'তা আমি জানি না। হয়তো শহরে-টহরেই গেছে। রাত্তিরটা নাকি গঙ্গাপ্রসাদের ওখানে ছিল, সেইখান থেকে শেষ রাত্রে পালিয়েছে। ওরা বলতে পারে তাদের পাত্তা।'

চৌধুরী আবার তাঁর হিসেবে মন দিলেন। আগাও আর একটা আভূমিনত সেলাম ক'রে চলে এল সেখান থেকে। একটা কাজ হয়েছে তো তবু—সন্ধান যে দিতে পারে তার সন্ধান পাওয়া গেছে।

গঙ্গাপ্রসাদের বাড়িও খুঁজে বার করল তার পরে। গঙ্গাপ্রসাদ বাড়ি ছিল না, তবে তার মাকে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে কিছু খবর পাওয়া গেল। সে মহিলা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, দিল মহম্মদের যথার্থ হিতৈষীও বটে। তিনি গোড়াতে কিছু ভাঙতে চান নি, প্রশ্ন শোনবার সঙ্গে সঙ্গে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। দিলু তাঁর ছেলের বন্ধু, তাঁরও ছেলের মতো। তার খবর তিনি কাকে দিচ্ছেন, সেটা তাঁর জানা দরকার। ডাকাত-টাকাত পড়ে নি সেদিন, একদল দুশমন এসেছিল। তাদের লক্ষ্য আসলে নাকি দিলুর দোস্তের যে বোনটি দিলুর আশ্রয়ে ছিল—সেই মেয়েটি। সে দুশমনরা এখনও হাল ছাড়ে নি, ওদের খোঁজ-খবর করছে, তা তিনি জানেন। আগা যে তাদেরই দলের কেউ নয় তার প্রমাণ কি? মুলুকী চাষার মতো আগার বেশভূষা বটে কিন্তু সুরৎ তো সেরকম নয়। চেহারা তো অনেকটা পাঠানদেরই মতো। সে রাত্রে যারা হামলা করতে এসেছিল তারাও নাকি পাঠান।

আগা তখন তাঁকে অনেক বোঝাল। বিস্তর মিনতি করল, দিব্যি গালল। দিল মহম্মদের যে দোস্তের জন্য এত হাঙ্গামা আগাই যে সেই দোস্ত—জানাল তাঁকে। ওর দুর্ভাগ্যের ইতিহাস আনুপূর্বিক খুলে বলল। দুশমনদের কেন এত আক্রোশ তা তিনি এই থেকেই বুঝবেন। আসলে তারা সেদিন আগার সন্ধানেই এসেছিল—দিলুর ওপর তাদের ব্যক্তিগত কোন বিদ্বেষ নেই। আর প্রধান আক্রমণটা সেদিন চলেও ছিল আগার ওপরই। আগা জামা খুলে সদ্য-শুকনো ক্ষতচিহ্নগুলো দেখাল। সব শেষে বলল, 'যদি সেই দলেরই লোক হতুম, তাহলে দলবল এনে আপনার ওপর হামলা ক'রে নির্যাতন ক'রেই তো তাদের পাত্তা আদায়ের চেষ্টা করতুম।'

এবার গঙ্গার মা খানিকটা আশ্বস্ত হলেন। লজ্জিতও হলেন একটু। বললেন, 'কিন্তু বাবা বুঝতেই তো পারছ, ওদের কেন, তোমাদেরও মঙ্গলের জন্যেই হুঁশিয়ার থাকতে হয়।'

আগা হেসে বলল, 'কিন্তু গোড়াতেই তো আপনি জানিয়ে দিলেন মা যে আপনি তাদের পাত্তা জানেন। দুশমন হলে তো সে তখনই আপনাকে বিপন্ন ক'রে ঠিকানা আদায় করবার চেষ্টা করবে। ওখানেই যে কাঁচা কাজ হয়ে গেল কিছুটা।'

'তা বটে। ঐ জন্যেই বোধহয় বলে মেয়েবুদ্ধি।' গঙ্গার মা খুব খানিক হেসে সরল ভাবেই মেনে নিলেন কথাটা, 'বজ্র আঁটুনি ফস্‌কা গেরো।' এবার তিনি ওকে বসবার জন্যে খাটুলি দিলেন, মাটির পুরুয়া ক'রে জল আর এক ডেলা গুড় দিলেন খেতে, তারপর বললেন, 'তারা দিল্লীতেই আছে, ভাল আছে। কোথায় আছে তা বাপু বলতে পারব না ঠিক, গঙ্গা হ'লে বলতে পারত। তা সে তো ফিরবে সেই সন্ধ্যের পর। ততক্ষণ কি তুমি থাকতে পারবে? পাহাড়গঞ্জের দিকে কোথায় যেন আছে—এইটুকু শুনেছি। মধ্যে এসেছিল একদিন, চুপি চুপি ভোরবেলা টাকাকড়ি নিয়ে গেছে কিছু। সেদিন তো কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছিল শুধু, টাকা-

কাড়ি কি জেবর কিছুই নিয়ে আসতে পারে নি। তবে ওরাও কিছু নেয় নি, জ্বালিয়ে দেওয়াতে নষ্ট হয়েছে কিছু, টাকা পয়সা তাতে গলে ডেলা পাকিয়ে গেছে। সে সব আমার ছেলে যতটা পেরেছে পরের দিন খুঁজেপেতে কুড়িয়ে এনে রেখেছিল। তা কি ঐ শকুনি হরকিষেণ লালটার জন্যে সব পাওয়া গেল? ওর অত পয়সা তবু আশ আর মেটে না, শকুনির মতো দিনরাত শুধু পরের পয়সার দিকে তাকিয়ে আছে, কখন কার কি বিপদ আপদ হবে আর ও অমনি ভাগাড়ে পড়ার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে কিছু কামিয়ে নিতে পারবে। এটাও সেই সাতসকালে এসে হাজির হয়েছে। চামার, আস্ত চামার ওটা। কারও সর্বনাশ, কারও পৌষ মাস। এখন তো মজা, জমি-জমার ফসল খাজনা যা পাচ্ছে লুটে পুটে খাচ্ছে দিলুর। গঙ্গার অত সময় নেই। আর এথিরও অত জোর নেই যে চামারটার সঙ্গে তা নিয়ে কেজিয়া করবে।'

একটু থেমে, গলা আর একটু নামিয়ে গঙ্গার মা আবার বললেন, 'তবে কি জান বাবা, দিলুর মা তো খুব হুঁশিয়ার মানুষ, গহনা সোনা চাঁদি যা কিছু সব মাটির নিচে পুঁতে রাখত, টাকা-কড়িও কিছু ছিল সেইভাবে। সেগুলোর কোন নুকসান হয় নি। সেই সবই নিতে এসেছিল দিলু। শহর বাজা'র থাকা—ফী হাত পয়সার দরকার। তাছাড়া দিলুর ইচ্ছা ঐখানেই দোকান-পাতি কিছু একটা দেবে। এখন এখানে ফিরে আসবার ইচ্ছে নেই ওর। এলেই ওরা পেছনে লাগবে হয়তো আবার—তার থেকে কিছুদিন শহরেই ঘাপটি মেরে থাকা ভাল। অত লোক, অত বাড়ি—সেখানে কে কাকে খুঁজে বার করবে? যত দিন তুমি না তোমার মা বোনের কোন সুরাহা করতে পার, ততদিন আর এখানে এসে লাভও নেই। অবিশ্যি তার জন্যে তুমি কোন মনখারাপ ক'রো না বাবা। তুমি এখন তাদের সরিয়ে নিলেও দিলু কিন্তু এখনই ফিরে আসতে পারবে না এখানে। ওর ওপরও দুশমনদের একটা আক্রোশ হয়ে গেছে, দিলুর জন্যেই তো হাত-ছাড়া হয়ে গেল মেয়েটা। তোমার বোনকে পেলেও তাদের খানিকটা ঝাল মিটত।'

তারপর আপন মনেই খানিকটা হেসে নিয়ে বললেন, 'দিলুর ইচ্ছে হালুয়াইয়ের দোকান দেয় একটা। তোমার বোন বলেছে, কিছুতেই হবে না। তাহ'লে দোকানের সব খাবার তুমিই খেয়ে মেরে দেবে। এই নিয়ে ঝগড়া চলেছে দু'জনে।...সেদিন মোটে দু'ঘড়ি ছিল বোধ হয়, তার মধ্যেই এসব কথা হয়ে গেছে। গুলুর নামে নালিশ করছে, আমি আবার যখন বললুম, ঠিক বলেছে গুল, তখন আমার ওপরেও রাগ। বদ্ধ পাগল তো ছেলেটা।'

খানিকক্ষণ থেমে হেসে আবার বললেন, 'দুটিতে ভাবও খুব।...আমি তাই গঙ্গাকে বলছিলুম, একদিন একটা মোল্লা ডেকে মন্তর পড়িয়ে দিলেই তো হয়, তারপর থেকে ওরই দায় হয়ে যায়। গুলুর দাদারও আর চিন্তা থাকে না।'

বুকের মধ্যে থেকে সে বোঝাটা অনেকক্ষণ নেমে গেছে আগার। পৃথিবী আবার সুন্দর বোধ হচ্ছে। আশমানের চাঁদের কথাও মনে হচ্ছে আবার। সেও হাসতে হাসতেই উঠে গঙ্গাপ্রসাদের মায়ের সামনে একেবারে মাটিতে হাত দিয়ে সেলাম জানিয়ে বেরিয়ে পড়ল সেখান থেকে।

ভালো আছে, সুখে না হোক স্বচ্ছন্দে আছে, সেইটেই বড় কথা। গঙ্গার মা কথাটা মন্দ বলেন নি, দুটিতে মানায় বেশ। ভাবও হ'য়েছে তা সেদিন এক লহমায় লক্ষ্য করেছে আগা। দিলুর মতো লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা হওয়া—সে সৌভাগ্যেরই কথা। কিন্তু এখন নয়—এই বিপদ আর ঝুঁকি সুদ্ধ দিলুর ঘাড়ে

চাপাতে চায় না সে বোনকে। যদি সুযোগ সুবিধা হয়, আল্লা যদি দিন দেন—ওদের এখানে আসার পথ নিষ্কণ্টক ক'রে দিতে পারে আগা—তখন কথাটা পাড়বে, তার আগে নয়। দিলুর সহৃদয়তার সুবিধা নিতে পারবে না সে, তার ভালমানুষীর সুযোগ নেবে না। তাছাড়া এখন বিয়ে দিলে গাছিয়ে দেওয়া হবে—বিপদমুক্ত হয়ে কথা পাড়লে সমানে সমানে কথা, তার মধ্যে সঙ্কোচের কিছু থাকবে না। দয়াদাক্ষিণ্যের প্রশ্নও না।

দিবা-স্বপ্ন যার দেখা স্বভাব সে দেখবেই। ঘোড়া খুলে তার ওপরে চেপে ব'সে শিস্ দিতে দিতে শহর দিল্লীর দিকে রওনা হ'ল আগা।

পনটুন পুল পেরিয়ে শহরে প'ড়ে প্রথম তার খেয়াল হ'ল যে এভাবে ঘোড়ায় চড়ে কিল্লায় ফেরা সম্ভব নয়। যার ঘোড়া সে নিশ্চয় এতক্ষণে তার দলবলকে খবর দিয়েছে। সে খবর ছড়িয়েও গেছে এতক্ষণে। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেছে, পথের মোড়ে মোড়ে সতর্ক প্রহরী বসেছে। চোর যে সে-ই, এ খবর হয়ত পেয়ে গেছে কোনক্রমে, তাহলে তো আরও বিপদ।...ঘোড়াটাকে এবার মানে মানে ছেড়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। বিশেষ ঘোড়ার সাজে আর সওয়ারের সাজে এমনই অসামঞ্জস্য যে লোকের চোখে আগেই পড়ে যাবে, এইভাবে গেলে।

একবার ভাবল, ঘোড়াটা বেচে দেয় কাউকে, যেমন-কে-তেমনি। ওরা ক্ষতি অনেক করেছে—ওদের ওপর দিয়ে দু'পয়সা রোজগার হয়ে যাক। তারপরই মনে হ'ল বেচবে কাকে? সেখানেও এই প্রশ্ন উঠবে। তার মতো সাজপোশাক পরা গাঁওয়ার লোক এমন জিন লাগাম চড়ানো ঘোড়া, অপরিচিত লোককে বেচতে গেলেই সন্দেহ করবে লোকে, হয়তো চোর বলে কোতোয়ালীতে ধরে নিয়ে যাবে। সেখানেও প্রমাণ করতে পারবে না যে ঘোড়াটা চোরাই মাল নয়। জেল তো হবেই, চাকরিও থাকবে না। মাঝখান থেকে আরও অসহায় হয়ে পড়বে, দুশমনদের ক্ষতি করতে গিয়ে তাদের সুবিধাই ক'রে দেবে বরং।...না, সে কোন কাজের কথা নয়।

অগত্যা একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত জনহীন পথে একটা বন্ধ দোকানঘরের আংটার সঙ্গে বেঁধে রেখে—যেন কোন নৈসর্গিক কাজে যাচ্ছে এই-ভাবে সরে পড়ল। শহর দিল্লীতে দুপুরেও পথ জনহীন হয় না, এমনি ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেও সন্দেহের কারণ হবে। তবে এমন ভাবে বাঁধল যাতে একটু টান দিলেও খুলে আসতে পারে। ঘোড়াটা বাঁধা থেকে শুকিয়ে মরে, এ তার ইচ্ছা নয়। বড় ভাল ঘোড়া, সামান্য ইঙ্গিতও বোঝে। যে ঘোড়া চড়তে জানে, ভাল ঘোড়া তার প্রাণ। যেতে যেতেও সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে নিল আগা একবার।

অন্ধকার হয়ে আসছে চারদিকে। বুড়ো অবশ্যই আর বসে নেই। তাকে গালাগাল দিতে দিতে বাড়ি ফিরে গেছে। না হলেও যেখানে রেখে গেছে সেখান থেকে এখন ঝুড়ি কোদাল সংগ্রহ করতে যাওয়ার বিপদ আছে। তবু এই সময়েই তার কিল্লায় ফিরে যাওয়া উচিত ছিল। এখন এই সন্ধ্যার মুখে অসংখ্য লোকের আনাগোনা চলে—ভিড়ে গা মিশিয়ে অনায়াসে চলে যেতে পারত। অন্ততঃ ওরা কি রকম চৌকী দিচ্ছে, কথাটা টের পেয়েছে কিনা—তাও দেখে নেওয়ার এই-ই সুযোগ। বহু লোকের মধ্যে অনেকটা নিরাপদে লক্ষ্য করা চলত।

এইটেই বুদ্ধিমানের কাজ, যুক্তি বুদ্ধি সবই সেই কথা বলে। আগাও যে সেটা

না বুঝল তা নয়, তবু কিছুতেই সে একটু খোঁজ-খবর না ক'রে তখনই কিল্লার দিকে ফিরতে পারল না। যেন মোহাবিষ্টের মতোই পায়ে পায়ে পাহাড়গঞ্জে এসে উপস্থিত হ'ল। কে যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে টেনে নিয়ে এল তাকে। পাহাড়গঞ্জেই দিলুরা আছে কিনা তার কোন নিশ্চয়তা নেই, ভাল ক'রে তো বলতেই পারল না গঙ্গার মা, থাকলেও সে ঘিঞ্জী বস্তীর মধ্যে তারা কোনখানে আছে খুঁজে বার করার সম্ভাবনা খুবই কম। খুঁজে পেলেও আবার হয়ত বিপদই টেনে নিয়ে যাবে তাদের উপর। এ সবই বুঝল, যুক্তি হিসাবে স্বীকারও করল, তবু—। এই 'তবু'র ক্ষীণ আশাই ছাড়তে পারল না কিছুতে। নিজেকে বোঝাল—না হয় একটু ঘোরাঘুরিই হ'বে, কতদিন তো বেরোতে পারি নি কিল্লা থেকে—। গভীর রাত্রে যা হয় ক'রে কিল্লাতে ঢুকে যাবেই। অসুবিধে হবে না।...মানুষ যখন নিজের ইচ্ছার সপক্ষে যুক্তি দেয় তখন বহু যুক্তিই টেনে আনে। আরও বোঝাল, রাজমাকীরা রাত্রে একজনই চৌকি দেয়, বেশী রাত্রে সে ঢুলবে নিশ্চয়—সেই সময় ফেরাই সব থেকে নিরাপদ।

জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে পাহাড়গঞ্জ এসে পৌঁছল। তারপর খানিকটা লক্ষ্যহীন ভাবে এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরল। শেষে একসময় পা-ব্যথা করতে লাগল তার। দীর্ঘদিন ধ'রে শয্যাগত থাকার জের এখনও যায়নি—এতটা অত্যাচার দুর্বল শরীর আর অনভ্যস্ত পা সইতে চাইল না। যেমন ক্লান্তি বোধ করছে তেমনি ক্ষিধে-তেষ্টাও। কিছু খাওয়া দরকার, আর একটু কোথাও বসা। জেবে হাত ঢুকিয়ে দেখল একটা গোটা টাকা ছাড়াও দশ বারোটা পয়সা আছে। অর্থাৎ দস্তুরমতো অবস্থাপন্ন এখন সে। যা খুশী, এমন কি কোন হালুয়াইয়ের দোকান থেকে মিঠাইও খেতে পারে। এদিক-ওদিক চেয়ে কিন্তু কোন হালুয়াইয়ের দোকান বা দুধ দহির দোকান নজরে পড়ল না, বরং একটা তন্দুরখানা চোখে পড়ল। সামনেই একজন তন্দুরে রুটি সেঁকছে, কাঠকয়লার আঁচে শিককাবাবও বসানো আছে বিস্তর। সে আর ইতস্ততঃ না ক'রে সেখানেই ঢুকে পড়ল। একটা রুটি কিছু কাবাব—আর তারও আগে এক বদনা ঠাণ্ডা জল ফরমাশ ক'রে অবসন্ন ভাবে বসে পড়ল এক পাশে।

লোকে বলে, ওর হাবিলদার বন্ধুকে প্রায়ই বলতে শুনেছে আগা যে, সাধারণ জানা ইন্দ্রিয় কটা ছাড়া মানুষের অনুভূতির জন্য আর একটা অদৃশ্য ব্যবস্থা আছে। আংরেজরা নাকি তাকে বলে ষষ্ঠ অনুভূতি। সব সময় সেটার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না—আপৎকালে ছাড়া। সে সময়ে সেটা অদৃশ্য থেকেই মানুষকে তার আসন্ন বিপদের পূর্বাভাস দিয়ে দেয়।...কথাটা শুনেই এসেছিল এতদিন, আজ তার প্রমাণ পেল।

তন্দুরখানার মধ্যে সার সার কতগুলো চৌকি পাতা আছে—মাঝখান দিয়ে বাবুর্চি খানসামাদের যাওয়া-আসার সরু পথ। চৌকির ওপর চাটাই পাতা, তার ওপরই বসা ও খাওয়ার ব্যবস্থা। আগা যখন আসে তখনই দেখেছে বহু লোক বসে আছে সেসব চৌকীতে। কেউ খাচ্ছে, কেউ খাওয়া সেরে বসে গল্প করছে এবং সরকারী হুকোয় তামাক খাচ্ছে—কেউ খাওয়া ফরমাস ক'রে বসে অপেক্ষা করছে। আগা তাদের দিকে ভাল করে তাকায় নি, সে তখন কোথাও একটু বসতে পারলে বাঁচে। সে দরজার কাছেই একটা চৌকিতে একটু খালি জায়গা পেয়ে তাড়াতাড়ি বসে পড়েছিল। বসে ছিল রাস্তার দিকে মুখ ক'রে কিন্তু হঠাৎ মনে হ'ল—যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহের মতোই অনুভূতিটা খেলে গেল মাথার মধ্য দিয়ে—যে

পিছনে একটা বিপদ আসন্ন। অনেক চৌকী, অনেক লোক তাতে, কেউ বা ফিস্ ফিস্ করে, কেউ বা জোরেই কথা বলছে নিজেদের মধ্যে—তার মধ্যে কোন একটা চৌকীর দু'তিনজন লোক নীরব হয়ে গেলে টের পাবার কথা নয় ; তবু তাও পেল। সেইটেই যেন মনে হ'ল আগার, পিছনে কোন এক চৌকীতে বোধ হয় আকস্মিক একটা নীরবতা নামল।

বহুদিন ধরে বিপদের সঙ্গে ঘর করছে আগা। সামান্য একটু নীরবতা, কোথায় পিছনে বাকী খদ্দেরদের মধ্যে একটা অস্বস্তির ভাব—তার কাছে তাই যথেষ্ট। মুহূর্ত-মধ্যে সজাগ হয়ে উঠল সে। স্নায়ুর শৈথিল্য নিমেষে দূর হয়ে গেল—এক রকম প্রস্তুত হয়েই পিছন ফিরে চাইল সে। আর সঙ্গে সঙ্গে একেবারে চোখো-চোখি হয়ে গেল কাইয়ুম খাঁ ও রজব আলির সঙ্গে। দুজনেই স্থির ভাবে লক্ষ্য করছে তাকে, দুজনেরই দৃষ্টি প্রত্যাশা ও বিজয়গর্বে উজ্জ্বল। একটা ক্রূর ধূর্ত ভাব মুখের। হাতের নাগালের মধ্যে শিকার পেলে হিংস্র জন্তুদের মুখভাবও বোধ-করি এই রকমই হয়। একেবারে হাতের কাছেই এসে গেছে শিকার—এখন শুধু ঝাঁপিয়ে পড়ার ওয়াস্তা, দুজনের ভঙ্গীতেই সেই রকম প্রস্তুতি একটা।

মুহূর্তকালও বোধ করি নেই হাতে। চিন্তা করার সময় নেই, সুযোগ খোঁজারও না। পালাতে হবে। পালাতে হবে আর তিন চার বার চোখের পলক পড়ার আগে। চিন্তা ছুটেছে মাথায় তীর বেগে। একটা বিষয় বুঝে নিয়েছে সে সেই এক পলকেই যে, সে নিরস্ত্র আর ওদের দুজনের কাছেই হাতিয়ার আছে। রজব আলির পিঠে বন্দুক বাঁধা, যেমন তাদের দেশে পাহাড়ী পাঠানরা পিঠে ঝুলিয়ে রাখে তেমনি। কাইয়ুম খাঁর ওপাশে বন্দুক আছে কিনা কে জানে, খাপ সুদ্ধ তলোয়ার তো সামনেই। শুধু তাই নয়, ওদের পিছনে বোধ হয় আরও দু'চারজন ভাড়াটে পাঠান আছে—কিন্তু আছে কিনা ভাল ক'রে আর দেখার অবসর নেই, আছে ধরে নেওয়াই ভাল।

চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় কাইয়ুম খাঁ ক্ষিপ্রহস্তে হাত বাড়াল খাপটার দিকে। সময় এত কম যে—চোখের পলক ফেলতে যেটুকু কালক্ষেপ হয়, সেটুকুরও মূল্য আছে। আগাও তা জানে। হাতিয়ার আশপাশে কারো কাছে নেই। নিতে হলে ওদের কাছ থেকেই নিতে হবে। ওরা আশা করছে, আগার সামনে খোলা রাস্তা—সেদিকেই ছুটে বেরুবে। পালাতে চেষ্টা করবে সে তো জানা কথাই। লড়াই করার অবস্থা নেই, সুতরাং পালানো ছাড়া গত্যন্তর কি?...আগাও বুঝল যে ওরা সেটা ধরে নিয়েছে। সে সেই সহজ মনস্তত্ত্বটুকুরই সুযোগ নিল, ওদের হিসেবের ভুলটার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল। রাস্তার দিকে নয়, সে যেন বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল কাইয়ুমদের চৌকির দিকেই—বিদ্যুতের মতো ত্বরিত গতিতে কাইয়ুমের হাতে ধরা খাপ থেকে তলোয়ারখানা টেনে নিয়ে রজব আলির পিঠে প্রচণ্ড এক খোঁচা দিয়ে আবার বাঘেরই মতো লাফিয়ে পড়ল রাস্তায়, তারপর দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটল সামনের রাস্তা ধরে।

তারপর কী হয়েছে তা কেউ জানে না। একটা বিষম হৈ-চৈ এবং কতকগুলো লোকের চিৎকার আর্তনাদ। সে তন্দুরখানায় অপর যারা খাচ্ছিল তারাও বলতে পারবে না ব্যাপারটা কি হ'ল। যথেষ্ট আলো ছিল না, মশালের মতো কয়েকটা ডিবিয়ার আলো ভরসা ভেতরে, বাইরে তখনও একটু আবছায়া মতো ছিল বটে তবু তাতে বেশী দূরে নজর চলে না। আর সবটাই যেন কয়েক লহমার মধ্যে ঘটে গেল।

রজবের আঘাতটার জন্য সামান্য কয়েক মুহূর্ত দেরি হয়েছিল কাইয়ুমের বেরোতে—তার বেশী নয়। রজবও ডান হাতে বাঁ কাঁধের ক্ষতটা টিপে ধরে বেরিয়ে পড়েছিল। এইটুকু শুধু ওদের মনে আছে, তারপর সেই চেঁচামেচি, হৈ-চৈয়ের মধ্যে সব মিলিয়ে গেছে। একটু পরে আর কাউকে দেখা যায়নি—না যে পালাচ্ছে তাকে, আর না যারা পিছু নিয়েছে তাদের। থাকার মধ্যে থাকল রজবের খানিকটা রক্ত চৌকিতে—এবং তন্দুরওয়ালার কিছু পাওনা। সে সমস্ত চেঁচামেচির উপর গলা চড়িয়ে এদের গালাগাল দিতে লাগল। অন্তত বারো আনা পয়সা বরবাদ গেল তার—মাঝখান থেকে ঐ চাটাইখানাও। খুব খদ্দের জুটেছিল আজ তার। যতসব জোচ্চোর গুণ্ডা মরতে আসে তার কাছেই—ইত্যাদি—

আগা দুর্বল, পরিশ্রান্ত। এরা সবল সুস্থ। এদের সঙ্গে পারার কথা নয়। কিন্তু আগা দৌড়চ্ছে প্রাণভয়ে। দৌড়নো ছাড়া উপায় নেই তার। প্রথমে সে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় গিয়ে সে মুখোমুখি দাঁড়াবে এই ছিল প্রথমটায় মতলব। কিন্তু এর ভেতরেই দেখে নিয়েছে সে যে, তার অনুমানই ঠিক, এ দুজনের পেছনে আরও লোক আছে, অন্তত দু'তিনজন। এরা রাজমাকী নয় হয়তো, ভাড়াটে গুণ্ডা। সে আরও মারাত্মক। তাছাড়া ওদের কাছে বন্দুক আছে। অবশ্য হঠাৎ বন্দুক ছুঁড়তে সাহস করবে না, কারণ এ ওদের সে বে-কানুন অরাজক দেশ নয়, এখানে আংরেজ কোম্পানীর আইন—ভারী কড়া—কিন্তু তবু, যে ধরনের মরীয়া লোক ওরা, শেষ পর্যন্ত সে ভয়ও করবে না। ও যখন দুজন লোককে সামলাবে, বাকী লোকের মধ্যে থেকে একজন গুলি ছুড়তে কতক্ষণ। বহুদিন দেশ ছাড়া ওরা, আগাকে শেষ করতে না পারলে দেশে ফিরতে পারছে না। মরীয়া তো হ'তেই পারে।

তবে গুলি চালাবার দরকারও হবে না—ওরা তো এসে পড়ল বলে—এমনিই ধরতে পারবে হয়তো। যতই প্রাণভয়ে দৌড়োক আগা, তার দুর্বল শরীরের শক্তি সীমিত। ক্রমশই পা ভেঙ্গে আসতে লাগল, বুকে যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে—নিশ্বাস নেওয়াই কঠিন হয়ে উঠল। মনে হচ্ছে যে বুকটা ফেটে প্রাণ বেরিয়ে যাবে এবার। ফলে রাজমাকীদের সঙ্গে ব্যবধান ক্রমেই কমে আসছে, আর একটু কমলেই তলোয়ারের নাগালের মধ্যে এসে যাবে। ওদের হাতেই মৃত্যু অদৃষ্টে ছিল বোধহয় —নইলে এমন দুর্বুদ্ধি হবে কেন! শাহ্জাদী, শিরীণ্, গুল, দিলমহম্মদ, মা—সকলের মুখগুলোই একবার চকিতে মনে হ'ল। বিদায় বিদায়—মাপ করো তোমরা—

অবশ্য একটা সুবিধা ছিল। সংকীর্ণ রাস্তা, দোকানপাট সব খোলা। তখন সবে সন্ধ্যা হয়েছে, পথে লোকও বিস্তর। হৈ-চৈ শুনে অনেকে বাড়ি বা দোকানের মধ্যে থেকে বাইরেও এসে ভীড় করছে। তাদের মধ্যে একজনের যাওয়া সুবিধা—দল বেঁধে যাওয়া কষ্টকর। প্রায়ই গতি কমাতে হচ্ছে ওদের, কারও সঙ্গে ধাক্কা লাগলে সে বা তারা রুখে উঠছে, তখন অন্তত একটা কথা বলে মাপ না চাইলে চলে না। এর ভেতর পথের লোক শত্রুভাবাপন্ন হ'লে বিপদে পড়বে—সে জ্ঞান ওদের আছে। একবার তো একটা ভারীকে পেয়ে সুবিধাই হয়ে গেল খানিকটা। সে বেচারা বাঁকে করে দুদিকে দুই বিরাট তামার ঘড়ায় ঝুলিয়ে জল আনছে, আগা পাশ কাটিয়ে যেতে যেতেই তার কাঁধের উপর বাঁকটা দিল ঘুরিয়ে—ফলে ওদের সামনে একটা মানুষ, দুটো ঘড়া মিলিয়ে রাস্তা জোড়া ব্যবধান তৈরী হয়ে গেল, হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার ওপরে, সামলে উঠে আবার ছোটা শুরু করতে মিনিট দুই তিন দেরি

হয়ে গেল অন্তত।

এইভাবে ছুটতে ছুটতে ক্রমশঃ একটু জনবিরল পাড়ায় এসে পড়ল আগা। তাতে অসুবিধাই হবার কথা কিন্তু সুবিধা হ'ল সামনে একটি প্রকাণ্ড বাগান বাড়ি পড়ে। খুবই সুবিধা হ'তে পারত—কারণ আগা একটা বুদ্ধি করেছিল, এক লাফে পাঁচিল টপকে বাগানে পড়ে—কিন্তু বাগানের মধ্যে যাবার চেষ্টা করে নি, পাঁচিলের কোণেই বসেছিল ঘাপটি মেরে। সেটা ওরা বোঝে নি—রাজমাকীরা। তারা ভেতরে প'ড়েই চারিদিকে ওকে খুঁজতে দৌড়চ্ছিল। সেই অবসরে আবার নিঃশব্দে বাইরে পড়ে আস্তে আস্তে সরে পড়াই উচিত ছিল—কিন্তু আবারও এক দুর্বুদ্ধি হ'ল আগার। সবশেষে যে লোকটা পাঁচিল ডিঙিয়ে ওর সামনে প'ড়েছিল, সে একটু পিছিয়েই ছিল অবশ্য, তাকে একটা মরণ-খোঁচা দেবার লোভ সামলাতে পারল না। সঙ্গে সঙ্গেই মুখ থুবড়ে পড়ল লোকটা কিন্তু সেই সঙ্গে একটা সামান্য আর্তনাদও ক'রে উঠল। যত সামান্যই হোক—জনহীন বাগান-বাড়ির পক্ষে তা যথেষ্ট। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে এল তারা, আর আগা যে আবার সেইখানেই পাঁচিল ডিঙিয়ে প'ড়ছে তাও বুঝতে পারল। তারাও তখুনি এপারে পড়ল। তবে ততক্ষণে আগা খানিকটা এগিয়ে যেতে পেরেছে। এদেরও সংখ্যায় দু'জন কমেছে—যে মারা গেল সে, আর একজন তার লাশ সরাতে পিছিয়ে থেকে গেল।...

এইভাবেই ওরা এক সময় এসে পড়ল দরিয়াগঞ্জের সাহেবমহল্লায়। এদিকটা অপেক্ষাকৃত নির্জন, দোকানপাট কম। তাতে অন্ধকারের কিছু সুযোগ আছে— কোথাও গা-ঢাকা দেবার চেষ্টা করা যেতে পারে। তেমনি শত্রুরও সুবিধা। পথ জনহীন, বাধা নেই কোথাও। আর সুবিধাটা তাদেরই হ'ল শেষ অবধি, শিকার ক্রমশ শিকারীর নাগালের মধ্যে এসে পড়ল।

শরীর অনেকক্ষণই বিদ্রোহ করেছে, অস্বীকার করেছে চলতে, মন শুধু চাবুক মেরে চালাচ্ছিল কোন রকমে। এবার মনও ভেঙে পড়ল। আশা আর কোথাও নেই—মিছিমিছি এ বৃথা চেষ্টা করার দরকার কি। তলোয়ারখানা নিয়ে চলতে কষ্ট হচ্ছিল, অসম্ভব ভারী লাগছিল বলে বাগান থেকে আসবার সময় সেটা ফেলে রেখে এসেছে, এখন আফসোস হ'তে লাগল। পালাবার চেষ্টা না ক'রে তখনই যদি সোজা-সুজি লড়াই দিত ওদের, অন্তত দু'একজনকে ঘায়েল ক'রে মারতে পারত এটা ঠিক। এমন নিরস্ত্র অবস্থায় পথের ওপর অসহায় ভাবে মরতে হ'ত না। এখনও যদি হাতিয়ার পেত একটা—! অন্তত ঐ কাইয়ুম খাঁটাকে যদি মারতে পারত মরবার আগে! কিন্তু তা হ'ল না। আল্লার ইচ্ছা অন্যরকম।. তাঁর ইচ্ছারই জয় হোক। আর পারছে না, আর পারল না আগা। পথের মধ্যে পড়ছে, আবার উঠছে, আবার পড়ছে। আল্লাকেই স্মরণ করল আগা।

বোধ করি আল্লার আরস্ নড়ল এবার। তিনিই তখন রক্ষা করতে পারতেন— তিনিই রক্ষা করলেন ওকে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। রাজপথে গাড়িঘোড়ার ভীড় নেই— সাহেবরা যে যার ঘরে ফিরে এসেছেন। ফলে নিশুতি রাতের মতোই নিস্তব্ধ হয়ে উঠেছে পাড়া। এতগুলো লোকের দৌড়বার শব্দ বহুদূর থেকেই পাবার কথা। পেয়েছিলেনও অনেকে। কিন্তু সেটা তাঁদের বিশ্রামের সময় ; তখন ডিনার খেতেন তাঁরা সন্ধ্যার আগেই— অনেকে সদ্য খাওয়া শেষ ক'রে মদ আর কফি নিয়ে বসেছেন-

গল্প করতে—কেউ কেউ তখনও খাবার টেবিলে বসে গল্পগুজব করছেন। গোলমালের শব্দ কানে গেলেও তখনই কারও উঠতে ইচ্ছা হয় নি, ব্যাপারটা কাছে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন তাই। কিন্তু একজন বাইরে এসেছিলেন, নির্জন রাস্তায় প্রথম দৌড়বার শব্দ উঠতেই—মিসেস লীসন বলে একটি মহিলা।

আগার সৌভাগ্যক্রমেই রাস্তার ঐখানটাতেই দু'তিনটে দোতলা বাড়ির খোলা দোর-জানালা দিয়ে আলো এসে পড়েছিল। ওখানে সরকারী তেলের আলোও ছিল দু'একটা—মিটমিটে আলো—তবু অন্ধকারে অভ্যস্ত চোখের বিশেষ অসুবিধে হয় না তাতে দেখতে। আর বেশী দেখবার কিছু ছিলও না। একটি লোক অসহায় ভাবে দৌড়চ্ছে—এদেশী গ্রাম্য চাষাভূষোর মতো বেশ, আর তার পিছনে ক'জন কাবুলী-ওয়ালার মতো পোশাক-পরা লোক তাড়া করেছে, তাদের সকলের হাতেই হাতিয়ার, বন্দুকও আছে বলে মনে হচ্ছে। মিসেস লীসনের মনে হ'ল এ লোকটা কোন স্থানীয় বানিয়া ; এরা এইরকম পোশাক পরে থাকে কিন্তু টাকার কুমীর এক একজন—নিশ্চয় মোটা টাকা নিয়ে যাচ্ছিল কোথাও—এরা খবর পেয়ে পিছু নিয়েছে, টাকাটা রাহাজানি করবে বলে। এমন এখানে হামেশাই হয়, মিসেস লীসন আরও ভাবলেন, চোর ডাকাত হ'লে ভরসা করে বন্দুক ছুঁড়ত, চোর চোর বলে চেঁচাত—এ নিশ্চয় রাহাজানির ব্যাপারই। তিনি আর এক মুহূর্ত দ্বিধা না ক'রে ঘর থেকে স্বামীর বন্দুকটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

তখন আর সময়ও ছিল না। অবসন্ন আগা আর একবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছে আর সেই অবসরে একটা লোক পিছন থেকে তলোয়ার তুলেছে—বোধহয় পিঠে বসিয়ে দেবে এখনই—দেখার সঙ্গে সঙ্গে মিসেস লীসন গুলি ছুঁড়লেন, অব্যর্থ লক্ষ্যে গুলিটা এসে আঘাতকারীর হাতে লেগে ঝন্ ঝন্ ক'রে তলোয়ারখানা খসে পড়ে গেল। সে লোকটাও একটা কাতরোক্তি করে হাত চেপে বসে পড়ল রাস্তায়।

সামনে প্রায়-আয়ত্ত শিকার ছাড়া রাজমাকীদের এতক্ষণ আর কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না। আর যা-ই হোক, এ ধরনের বাধার জন্য প্রস্তুত ছিল না তারা, এ রকম কিছু ঘটতে পারে তা তারা একবারও ভাবে নি। তারা রীতিমতো হকচকিয়ে গেল একেবারে। গুলিটা কোথা থেকে এসে পড়ল তা বুঝে নিতেও সময় লাগল খানিকটা। ততক্ষণে গুলির শব্দ পেয়ে আরও দু'চারজন ছুটে আশপাশের বারান্দায় বেরিয়ে এসেছেন। একটি সা'হব আগেই আওয়াজ পেয়ে মিসেস লীসনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে এসেছিলেন—তিনি 'খবরদার' বলে একটা হুঙ্কার ছাড়লেন। ভরসা পেয়ে মিসেস লীসন বন্দুক বাগিয়ে ধরে এলেন রাস্তায়।

অর্থাৎ গতিক সুবিধের নয়। সাহেবদের সকলের কাছেই বন্দুক আছে। তাদের এ দুটো বন্দুক নিয়ে পেরে উঠবে না ওদের সঙ্গে। সাহেব খুন তো দূরের কথা, জখম হ'লেও বিপদ—রক্ষা থাকবে না তাদের। এ কোম্পানীর রাজত্ব। তা যদি না-ও হয়, চেঁচামেচিতে আরও লোকজন এসে পড়তে পারে, ধরা পড়লে সোজা কোতোয়ালী নিয়ে যাবে, অনেক জবাবদিহি, অনেক হাঙ্গামা—রাহাজানির দায়ে পড়লেও জেল হয়ে যাবে।

অতএব, এক্ষেত্রে বুদ্ধিমানেরা যা করে তারাও তাই করল। সোজা ওদিকের পথে দৌড় মারল। যার হাতে লেগেছিল সেও বন্দুক ফেলে এক হাতে জখম-হওয়া হাত চেপে ধরে ছুটতে লাগল। যে সাহেব মিসেস লীসনের সঙ্গে বেরিয়ে এসে-ছিলেন তিনি বয়স্ক, শরীরও তাঁর ভারী—ওদের পিছনে ছোটা তাঁর কাজ নয়। যারা

ছুটতে পারত—অপেক্ষাকৃত তরুণেরা, বেরিয়ে আসতে আসতে ওরা চারজনে চার রাস্তার মোড় ঘুরে হাওয়া হয়ে গেল, সেই অন্ধকার রাত্রে কে তাদের খুঁজে বের করবে?

মিসেস লীসন ইতিমধ্যে এগিয়ে এসে আগার হাত ধরে উঠিয়ে একেবারে তাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলেন। আলোতে ভাল ক'রে দেখে তিনি তো অবাক। স্পষ্টই বললেন, 'আমি তোমাকে কোন বুড়ো বানিয়া ভেবেছিলুম। তুমি তো দেখছি নিহাৎই ছেলেমানুষ। তোমাকেও তো এদেশী বলে মনে হচ্ছে না—এত ফর্সা রঙ তোমার। ব্যাপার কি? তোমার সঙ্গে টাকাকড়ি ছিল? না এমনি রেষারেষি?'

আগার মুখ সাদা হয়ে গেছে তখন, এত ঘাম বেরোচ্ছে যে দেখলে ভয় করে। পা দুটো নিশ্চল হয়েও স্থির থাকছে না, থরথর ক'রে কাঁপছে, সেটা বাইরে থেকেই দেখা যাচ্ছে। প্রশ্ন করার সঙ্গে-সঙ্গেই মিসেস লীসন উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে, একটু দুধের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা ব্র্যাণ্ডী মিশিয়ে খাইয়ে দিলেন। সেটা খেয়ে যেন আগা ভাল করে নিঃশ্বাস ফেলতে পারল; চোখেও যেন এতক্ষণ ঝাপসা দেখছিল, সে ভাবটাও কেটে গেল। তবু বহুক্ষণ কথা কইতে পারল না সে, দু হাত জোড় করে মিসেস লীসনের মুখের দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু। আনন্দে কৃতজ্ঞতায় স্বস্তিতে—কিছুক্ষণ পূর্বের অবস্থা স্মরণ করে আতঙ্কেও— তার দুই চোখ আচ্ছন্ন করে জল ভরে এল।

মিসেস লীসন বুঝলেন অবস্থাটা, পিঠে মাথায় সস্নেহে হাত চাপড়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন, 'নাউ, নাউ, ডোন্ট্ ক্রাই! বি ব্রেভ।...রোনা মৎ, আউর কোই ডর নেহি, ডাকু লোক ভাগ গিয়া। টেক ইওর টাইম। ধীরে ধীরে বোলো, কোই এয়সা জল্দি নেহি!'

একটু কথা বলবার মতো অবস্থা হ'তে সংক্ষেপে তার সেই উপন্যাসের মতো বিচিত্র জীবনেতিহাস খুলে বলল আগা। দীর্ঘ, অবিশ্বাস্য কাহিনী। বিশ্বাস হবার কথা নয়। কিন্তু মিসেস লীসন ওর মুখের দিকে চেয়ে বুঝলেন যে সে সত্যি কথাই বলছে। ততক্ষণে আরও দু'একজন প্রতিবেশী এসে পড়েছিলেন, তাঁরা ঠিক বিশ্বাস করতে চাইলেন না, স্পষ্টই মিসেস লীসনকে বললেন, 'দ্য চ্যাপ ইয়ার্নস্ এ ভেরি গুড্ স্টোরী! এ রেগুলার থ্রিলার!' কিন্তু মিসেস লীসন ঘাড় নেড়ে বললেন, 'আই ডোন্ট্ থিংক্ সো। দ্য ফেলো স্পীক্স্ বাট ট্রুথ। আই ক্যান সী ইট ইন হিজ ফেস।' 'ও ইউ চিকনহার্টেড গার্ল!' ব'লে হেসে তাঁরা যে যাঁর আস্তানায় চলে গেলেন খানিক পরে, কিন্তু মিসেস লীসন ধৈর্য ধারণ ক'রে আদ্যোপান্ত শুনলেন। সবই বলল আগা, অবশ্য তার আশমানের চাঁদ আর শিরীণের অংশটা ছাড়া।

সব শুনে মিসেস লীসন জ্বলে উঠলেন একেবারে, 'এ কী অন্যায় কথা, এ কি অরাজক রাজত্ব নাকি? দস্তুরমতো ইংরেজ কোম্পানীর রাজত্ব—এখানে আইন আছে, পুলিস আছে, আর্মি আছে। মেট্কাফ সাহেব কালেক্টর আমার বন্ধু, আমি কালই তাঁকে এ ব্যাপার জানাব, যাতে দিল্লী শহরে ওরা আর থাকতে না পারে। রাজধানীর বুকে বসে ওরা এরকম ডেলিবারেট শয়তানী করতে সাহস করে কী ক'রে! ওদের আস্পর্দ্ধা তো কম নয়। সব কটাকে ধরে ফাঁসি দেওয়া উচিত।...তুমি আর একটু ব'সো—আমার স্বামী ক্লাবে গেছেন, এখনই ফিরবেন গাড়ি ক'রে, আমি বলে দিচ্ছি —তিনি তোমাকে কিল্লায় নামিয়ে দিয়ে আসবেন এখন।...ইস! কী অন্যায়, কী অত্যাচার! কালই আমি মেট্কাফকে বলব, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো!'

আগা যখন কিল্লায় ফিরল তখন রাত দশটা বেজে গেছে। দিল্লী দরওয়াজাতে সান্ত্রী পাহারায় ছিল রোশনলাল আর মাতাপ্রসাদ, তারা তো অবাক।

'আরে, তোমাকে যে সাহেবদের গাড়ি পেঁৗছে দিয়ে যাচ্ছে আজকাল—খোদ সাহেব একজন সঙ্গে—ব্যাপার কি?...তলে তলে কী করছ বাবা, এ পোশাকই বা কেন, তোমার অমন জমকালো পোশাক কী হ'ল?...আংরেজদের হয়ে গোয়েন্দাগিরি-টিরি করছ নাকি?'

দস্তুরমতো ঈর্ষা তাদের গলায়। ঈর্ষা আর সন্দেহ।

কোনমতে পাঁচটা সত্য-মিথ্যা বলে তাদের বুঝিয়ে শ্রান্ত অবসন্ন পা দুটোকে টেনে তার বারাকঘরের দিকে চলল সে। চাকরিতে উন্নতি হয়ে এই একটা বড় ক্ষতি হয়েছে তার—সিঁড়ির নিচের সে ঘরটি—তার গোপন সুখস্বর্গ—ছেড়ে দিতে হয়েছে। বাদশার খাশ সিপাহীরা যে ব্যারাকে থাকে, সেইখানে বড় হলঘরের মধ্যে অনেকের সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা, কুড়িটি লোকের সঙ্গে একঘরে থাকতে হয়। কুড়িটি খাটিয়ার একটি তার। সেখানে শিরীণ্ তো শিরীণ্—রাবেয়ারই আসা সম্ভব নয়। তবে একটা ব্যবস্থা হয়েছে—মন্দের ভাল রকমের। আগার সেই আগের ঘরখানা এখন রহমৎ দখল করেছে। তার যেদিন পালা পড়ে (আংরেজরা বলে 'ডুাটি'—আগাও শিখেছে কথাটা), সেদিন রাত্রে আগা ব্যারাক থেকে চুপি চুপি পালিয়ে এসে মাঝে মাঝে রহমতের ঘরে বসে। শিরীণ্ ওকে দেখে কোন কোন দিন চলে আসে, তবে সব দিন আসতে পারে না। কারণ সব দিন খবরও পায় না রহমতের রাতের পালা পড়ল কিনা। আগে নিত্য ঘুলঘুলি দিয়ে দেখা চলত, এখন সেটাতেও অসুবিধা হয়েছে। উস্তানি বড় বেগমসাহেবার কাছে নালিশ করেছে যে মেহেরের মোটে পড়া-শুনোয় মন নেই, কিছুই এগোচ্ছে না। তিনি তো তাই চান, তিনি আবার সাতখানা ক'রে নালিশ করেছেন বাদশার কাছে। বাদশা হুকুম দিয়েছেন উস্তানীকে দুবেলা পড়াতে হবে, রাত্রে উস্তানী বসে পড়া তৈরী করিয়ে তবে যাবে। বলা বাহুল্য সে এ ব্যবস্থায় খুশী হয় নি। সেও কতকটা মেহেরকে জব্দ করার জন্য, অন্য ঘরে পড়ানো শেষ ক'রে খাওয়া-দাওয়া সেরে পান তামাক খেয়ে রাত আটটার পর দেখা দেয়। ফলে পড়া শেষ হ'তে হ'তে বহু রাত হয়ে যায়। তাছাড়া, ঘুলঘুলি থেকে মানুষটাকে দেখা গেলেও রহমৎ কি আগা বুঝতে পারে না অনেক সময়, কারণ রহমৎ ঘরে আলো জ্বালে না, চিরাগ দেশলাইয়ের পাটই রাখে নি।

কাজেই—ওদের দেখা হয় কদাচিৎ। অথচ এখন দেখা না হওয়াটা আরও লোকসান মনে হয় আগার। কেননা, এখন শাহ্জাদীর খবর জিজ্ঞাসা করলে শিরীণ্ বলে কিছু কিছু, তিনিও যে আগার খবর নেন মধ্যে মধ্যে—তাও বলে। সেই দিন-গুলো আগার কাছে পরম সৌভাগ্যের দিন—কিন্তু হায়, সেগুলো মেলাই যে আজকাল দুর্ঘট হয়ে উঠেছে!...

আজ বিষম ক্লান্ত হয়ে এসেছে, ভারী পাথরের মতো হয়ে উঠেছে পা দুটো, তাদের ওপর যেন কোন এক্তিয়ারই নেই আর। ফটক থেকে উঁচু পথটা ভেঙে উঠতেই তো চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে গেছে। শুধু পা নয়, বুকের মধ্যেও যেন কষ্ট হচ্ছিল সে সময়। এখন কোনমতে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়তে পারলেই হয়। খাওয়ার পাটও নেই—কারণ বাবুর্চিখানা এতক্ষণ নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে গেছে, না হ'লেও গিয়ে খোঁজ নিয়ে ফিরে আসবে এত সামর্থ্য আর নেই তখন। খাওয়া চুলোয় যাক,

কোথাও একটু পড়ে চোখ বুজতে পারলে হয়।

তবু, একেবারে শেষ মুহূর্তে—লোভটা সামলাতে পারল না। আবারও কী যেন এক অদৃশ্য শক্তি টেনে নিয়ে এল তাকে—কী এক সুদূর আশা দুর্নিবার বেগে চালনা করল তার ইচ্ছাকে—সে অন্য পথ ধরে, জেনানা মহলের দরজার সামনে দিয়ে ঘুরে ফিরে সেই রহমতের ঘরেই এসে উপস্থিত হ'ল।

দেখা গেল এবেলা আর আশা তাকে ছলনা করে নি। অপেক্ষাও করতে হ'ল না। দেখল সেই অতি-বাঞ্ছিত কালো বুরখা-পরা মূর্তিটিই অপেক্ষা করছে তার জন্য।

আগার ভাল ক'রে ভেতরে আসারও বোধ করি তর সইল না, সে কাছে এসে চাপা রুদ্ধস্বরে বলল, 'আবার তুমি আজ সেই সর্বনেশে জায়গায় গিয়েছিলে? এত রাত অবধি কি করছিলে? অমন ক'রে খোঁড়াচ্ছ কেন? নিশ্চয়ই কোন চোট লেগেছে? একবার শয়তানের মুখের মধ্যে থেকে ফিবে এসেও শিক্ষা হয় নি তোমার?'

কণ্ঠ শুধু উষ্মায় নয়, কান্নাতেও বিকৃত। এ যেন সে শিরীণের গলাই নয়। দুর্ভাবনায়, আতঙ্কে, উত্তেজনায় গলাটাই যেন অন্যরকম হয়ে গেছে।

শিরীণের এই আন্তরিকতা কাঁটার মতো বিঁধল আগাকে। পরিতাপের শেষ রইল না। বেচারী শিরীণ্। দুনিয়ায় এ ইশক্ দুর্লভ, এই খাঁটি মুহব্বৎ! যে পায় সে রাজা-বাদশার চেয়েও সৌভাগ্যবান—আগা তো সামান্য প্রাণী। তবু সে এমনই হত-ভাগ্য—এই প্রেম মাথা পেতে নিয়ে শিরীণকে যোগ্য প্রতিদান দেবে—সে শক্তিটুকুও ওর নেই!

সে চুপ ক'রে চারপাইটাতে বসে পড়ে অনুতপ্ত কণ্ঠেই বলল, 'আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে শিরীণ্, আমি স্বীকার করছি। কিন্তু কিছুতেই থাকতে পারলুম না যে! আর কী অবস্থায় তাদের সে রাত্রে ফেলে এসেছিলুম, সেটাও ভেবে দ্যাখো—তুমি তো জানই সব!...তবে তাতেও কিছু হ'ত না, যে বুদ্ধি করেছিলুম অনায়াসে সন্ধ্যার আগে ফিরে আসতে পারতুম। আর এসেছিলুমও তো—বড় বেশী দুঃসাহস করতে গিয়েই তো শেষটা—'

সে আস্তে আস্তে দম নিয়ে সবটাই খুলে বলল। অন্ধকারে কালো বুরখা মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিরীণ্, শুধু যা বাইরের সিঁড়ির মুখের সেই আলোটার সামান্য একটু আভা এসে পড়েছে ঘ'রে—তবু কাহিনীর শেষ অংশটা শুনতে শুনতে শিরীণ্ যে বার বার শিউরে উঠতে লাগল, আগা স্পষ্ট অনুভব করল।...

আগার কথা শেষ হ'তে আরও একটু কাছে এসে অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলল শিরীণ্, 'তুমি আল্লার নাম ক'রে কিরে খাও যে আর কখনও এমন দুঃসাহসের কাজ করবে না, কোনদিন না! কখনও এমন ভাবে একা ঐ দুশমনের মধ্যে বেরিয়ে যাবে না! তা নইলে আমি আর কোনদিন আসব না তোমার কাছে, কোনদিন কোন খবর পাবে না শাহ্জাদীর!'

'কিন্তু শিরীণ্—মা বোন উপকারী বন্ধু, তাদের খবর কোনদিন নেব না? কথাটা একটু ভেবে দ্যাখো। তা ছাড়া সেই মেমসাহেব তো বললেন, হাকিম বাহাদুরকে বলে একটা ব্যবস্থা করবেন, ওদের জব্দ ক'রে দেবেন!'

'তা আমি জানি না। ওসব কথা শুনতে চাই না। তুমি যদি কিরে না খাও, তাহ'লে আমি যা বললুম তাই করব—এই তোমার কিরে খেয়ে বলছি।'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আগা বলল, 'তাই হবে শিরীণ্, আমি খোদাতালার

নাম নিয়ে বলছি—তোমাদের না ব'লে, অনুমতি না নিয়ে এভাবে আর যাব না, এমন দুঃসাহসিক কাজ করব না।'

তার পরই মনে পড়ে যায় কথাটা। বিস্মিত ভাবে বলে, 'কিন্তু আমি যে এইভাবে গিয়েছিলুম—তুমি কি ক'রে জানলে?'

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে লজ্জা-লজ্জা সুরে বলল শিরীণ্, 'আমি আজকাল মধ্যে মধ্যে দুপুরবেলা ছাদে উঠি। এই...এই লোকজন সব দেখা যায়, অথচ আমাকে তারা তো দেখতে পায় না।...দুনিয়াটা দেখা হয়ে যায়। সেই সময়ই তোমাকে এই অভিনব পোশাক পরে ঝুড়ি কোদাল মাথায় নিয়ে বেরোতে দেখি। প্রথমটা চোখকে বিশ্বাসই করতে পারি নি—'

বাধা দিয়ে আগা বলল, 'তুমি ঐ অত উঁচু থেকে এই পোশাকে চিনলে? আশ্চর্য তো!'

'তোমাকে আমি অন্ধকারে অনেক লোকের মধ্যে থাকলেও চিনতে পারব।...সে কথা যাক, ঐভাবে বোরোতে দেখেই বুঝেছি তুমি কোথায় যাচ্ছ আর কি কাজে যাচ্ছ।... সেই থেকেই সারাদিনটা ছটফট করছি। খবর নেবারও তো উপায় নেই—। শেষে এখানে এসেছি মরীয়া হয়ে, কোন আশা নেই, তবু ঈশ্বরকে ডাকছি, পীর সাহেবের কাছে সিন্নি জানাচ্ছি—যদি এ পথে এসে পড়ো।'

আবারও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ায় আগা। আর একটুও ব'সে থাকার সামর্থ্য নেই।

কিন্তু উঠতে গিয়েও টলে যায়। শিরীণ্ বলে, 'এখানেই শোও না, রহমৎ তো সেই ভোরের আগে আসছে না। আর সে এসে তুমি তার বিছানায় শুয়ে আছ দেখলে গোসা করবে না।...এখন ওঠবার চেষ্টা ক'রো না—পারবে না।'

'কিন্তু ব্যারাকে ফিরব না—রাত্রে দেখতে না পেলে—কি কেউ যদি বলে দেয়, জমাদার সাহেবকে কি জবাব দেব?'

'বলো যে বাদশা কোন খাশ কাজে পাঠিয়েছিলেন। এ পোশাকও তিনিই আনিয়ে দিয়েছেন, আর ব'লো যে কাউকে বলা নিষেধ এসব কথা। তা হলে বিশ্বাসও করবে—না করলেও ওপরওলা'র কাছে যাচাই করতে সাহস করবে না।...শুয়ে পড়ো। ঐখানে টুলের ওপর দুটো পরোটা রইল—খেও মনে ক'রে।'

'ওঃ শিরীণ্, কী বলে যে দোয়া মাগব ঈশ্বরের কাছে!' মনে মনে বলল আগো। ক্ষিদেও খুব পেয়েছে—আর পাওয়াই উচিত—ক্ষিদেতেই আরও মাথা ঘুরছে—এবার মনে হ'ল তার। ঠাওর ক'রে দেখল একটা পাতাতে জড়ানো দুখানা পরোটা আর খানিকটা শুকনো মাংস। এরকম সুস্বাদু উৎকৃষ্ট খাদ্য আগা জীবনে কখনও খায় নি, মাংস এমন রান্না হয় তাই জানত না। নিশ্চয় বাদশার খাশ বাবুর্চিখানায় তৈরী। শিরীণ্ কী ক'রে পেলে এসব কে জানে! ওদেরও কি এইসব খেতে দেয় নাকি?... বাঁদীদের আলাদা ব্যবস্থা নেই? কে জানে!

খেতে খেতেই তন্দ্রায় ও শ্রান্তিতে চোখের পাতা জুড়ে এল। হাতও ধোওয়া হ'ল না।...সেই প্রথম আধো ঘুমের মধ্যেই মনে হ'ল, আচ্ছা এমন যদি হয় যে শিরীণ্ ভাণ্ডল না, খোদ শাহ্‌জাদীই পাঠিয়েছেন আগার জন্যে—নিজের খাবার থেকে বাঁচিয়ে, নিজে পুরো না খেয়ে? সম্ভব নয় অবশ্য, তবু ভাবতে ভালই লাগে!...

পরের দিন সকালে রহমৎ এসে প্রথমটা তো রেগেই খুন—সে ভেবেছে কোথা

থেকে কোন্ জংলী চাষা এসে শুয়ে পড়েছে তার বিছানাতে, কারণ পায়ের ধুলোটাও ধোবার ফুরসুৎ পায় নি আগা। তারপর অনেক চেঁচামেচি ধমক-ধামকেও লোকটার ঘুম ভাঙ্গছে না দেখে ভয় হ'ল ওর—মরে পড়ে নেই তো? কেউ খুন ক'রে লাশটা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় নি তো? তখন কাছে এসে কাঁধটা নেড়ে দেখতে গিয়ে দেখলে, মুন্দর নয়,—তার বন্ধু আগা!

তখন সে আরও অবাক!

'আরে, কেয়াবাৎ! ই কাঁহাসে আয়া!' কাঁধ ধরে বিস্তর ঝাঁকানি দিয়েও জাগাতে পারে না আগাকে। তখন ভাবল নিশ্চয় নেশা-ভাঙ্ করেছে! মদ নয়, তাহলে গন্ধ থাকত; আপিং কি চরস খেয়েছে নিশ্চয়! আপিং-এর আরক বেরিয়েছে কী এক রকম, কিল্লাতে খুব চলছে, শাহ্‌জাদারা তো বটেই বেগম সাহেবারা পর্যন্ত নাকি খাচ্ছেন। এ নিশ্চয় তাই। সে তখন খানিকটা জল এনে ওর মাথায় মুখে ছিটিয়ে দিলে।

এবার ঘুম ভাঙ্গল আগার। প্রথমটা সেও বুঝতে পারে না তার মনে হচ্ছে সে তো নিজের ঘরেই আছে, রহমৎ এখানে কেন এল! সে বলে, 'তুম কাঁহাসে আয়া?' রহমৎ 'তুম' শব্দটার ওপর জোর দিয়ে বলে, 'তুম কাঁহাসে আয়া, মেরা চারপাই পর লেট্ গিয়া আকর্! কেঁও জনাব, আপকা উহ্ বড়া বারিক ঘরকা কেয়া হুয়া!'

এই প্রথম মনে হ'ল আগার যে কোথায় কি একটা গোলমাল হয়েছে। এবার একটু একটু ক'রে মনে পড়ল সব কথা। তখন ভারী হাসি পেল তার, হা-হা ক'রে হাসতে লাগল।

রহমৎ আরও রেগে উঠল, 'আরে বেঅকুফ্ ইস মে ইৎনা মজাকা বাত্ কাঁহাসে আয়া? নশা কিয়া থা ক্যা? ইয়ে গাড়া ধোতি তুম নে কেঁও পিন্‌হা?'

'হাঁ ভাই রহমৎ, নশা কিয়া থা। বহুৎ জব্বর!'

'কৌন সি নশা? পুস্তা? গাঁজা? ভাঙ্গ? পুস্তাকী আরক পিয়া ক্যা?'

'নেহি দোস্ত, উস্ সে ভি জব্বর!'

'উস্‌সে জব্বর? উস্‌সে জব্বর নশা কৌন চীজ ক্যা হ্যায়?'

'আওরৎ!'

'ও হো!' দুটো ঠোঁটের একটা অদ্ভুত ভঙ্গী ক'রে শিস দিয়ে ওঠে রহমৎ, 'তো হামারে গারীবখানেমে ক্যায়সে আয়ে জনাব!'

'এক হুরী নে রাহ্ ভুলাকর লে আয়ী থী!'

'হুরী নে? বেশক!' তার পরই ওর নজরে পড়ল উচ্ছিষ্ট পাতাগুলো এবং মেঝেতে পড়ে থাকা রুপোর চুলের কাঁটা একটা। কাঁটাটা কুড়িয়ে নিয়ে শুঁকে দেখল, মিষ্টি চামেলি তেলের গন্ধ, 'ক্যা, আজকাল ক্যা হুরী লোগ খানা ভি খাতী হ্যায় আদমী'ক মাফিক, আউর্ চাঁদিকী কাঁটা সে কেশ ভি বনাতী হ্যায় ক্যা?'

আরও হাসে আগা। তীব্র ঈর্ষায় রহমতের মুখ কালি হয়ে গেছে। আগা বলে, 'কেঁও নেহি! যিস বখ্‌ৎ আদমী কে সাথ মিলনে আতী হ্যায়, উস্‌কো রাহ্ ভুলাকর লে আতী হ্যায়—উস বখ্‌ৎ ঔরৎ কী বদন ভি পাকড় লেনী চাহিয়ে, নেহি তো মুহব্বৎ হোগী ক্যায়সে?'

'আচ্ছা, অব্ সমঝ গয়া! তুম আওরৎ লেকর ই'হা মজা উড়াতে থে! লেকিন বাবা, কম্‌সে কম কিরায়া ভি তো কুচ্ছ দেও চারপাইকা!'

'ও হি লেও—উহ্ কাঁটা রাখ দেও। ক্যায়া মালুম উহ্ কোই রোজ আপনা

কাঁটা কে লিয়ে তুম্‌হারে পাশ ভি আ জায়গী। তব তুম ভি মজা উড়াও গে।'

সে উঠে হাসতে হাসতে চলে যায় বারাকের দিকে।

॥ সতের ॥

ক্রমাগত ঋণ শুধু বেড়েই যাচ্ছে জীবনে, জিন্দিগী ভর শুধু হাত পেতে দানই নিয়ে যাচ্ছি—আগা ভাবে, কোনদিন কি তার প্রতিদান দিতে পারব? এই যে সব মহা উপকার নিয়ে যাচ্ছি একটার পর একটা—কোন প্রত্যুপকার ক'রে কি এর কণা মাত্র শোধ দিতে পারব? কী ভাবে শোধ করব—ভাবে সে—কীই বা পুঁজি আছে এমন? তেমন লেখাপড়া জানি না যে সেদিকে উন্নতি করব; টাকার জোর নেই যে ব্যবসা ক'রে বড়লোক হবো, টাকা দিয়ে এদের কারও কোন উপকার করতে পারব। এক আছে হাতের জোর, কিন্তু সে যুগ নেই—সে যুগে হাতের জোরে রাজ্য জয় করা চলত। এখনকার লড়াই মানুষের দৈহিক শক্তির ওপর ততটা নির্ভর করে না, যতটা করে অস্ত্রশস্ত্রের ওপর, পয়সার ওপর। এখন হঠাৎ গিয়ে একটা রাজ্য জয় করা চলে না। হাতের কসরৎ দেখিয়ে নিজের গায়ের জোরের পরীক্ষা দিয়ে একটা রাজ্য ও রাজকন্যা জয় করা যেত যে কালে, সে কাল রূপকথার মধ্যে চলে গিয়েছে।

লীসন মেমসাহেবের কথাই বেশী ক'রে ভাবে আগা। উনি যা করেছেন, একেই সত্যিসত্যি জীবনদান করা বলে। সেদিন সে মুহূর্তে ঈশ্বর-প্রেরিত হয়ে যেন এসে পড়েছিলেন উনি। বিধর্মী বিদেশিনী—একেবারেই অপরিচিতা—কিন্তু তিনি গরজ ক'রে বাইরে এসে ওর বিপদ দেখে সাহস ক'রে গুলি না ছুঁড়লে সেদিন আগার বাঁচবার কোন পথ ছিল না। শুধু তাই নয়, মেমসাহেব তাঁর কথাও রেখেছেন, সে দিনের দিনতিনেক পর থেকে কিল্লার ফটকে ফটকে রাজমাকীদের সেই অবিরাম পাহারা উঠে গেছে। বেশ ভাল ক'রেই লক্ষ্য ক'রে দেখেছে আগা। শুনেওছে মাতা-প্রসাদের মুখে—ওর কে চাচেরা ভাই কাজ করে পাহাড়গঞ্জ কোতোয়ালীতে—যে, ওখানে বিস্তর পাঠানকে ধরে এনে কালিক্‌টর সাহেব খুব 'তঙ্‌' করেছেন। শাসিয়ে দিয়েছেন যে ফের এই ধরণের গুণ্ডাবাজী চলছে শুনলে তিনি ওদের ধরিয়ে এনে এক একটাকে শহরের এক এক 'চৌরাহা'য় ফাঁসি লটকে দেবেন!...

বোধ হয় তার ফলেই ওদের অন্তর্ধান। যদিচ ওরা একেবারে শহর ছেড়ে গেছে বলে মনে করে না আগা। কোথাও ঘাপ্‌টি মেরে ওৎ পেতে বসে আছে। হয়ত অন্য কোন এদেশী লোকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছে টাকা দিয়ে, সে বা তারা ওর গতি-বিধির খবর পোঁছে দেয় কাইয়ুম খাঁকে। হয়তো সান্ত্রীদের মধ্যেই কাউকে ঘুষ খাইয়ে রেখেছে—কিছুই বিচিত্র নয়। সুতরাং এখনও ঠিক ভরসা ক'রে শহরে গিয়ে দিলুদের খুঁজতে সাহস করে না আগা। আর কিছুদিন না দেখলে অতটা সাহস করা ঠিক হবে না। সে যাই হোক, লীসন মেমসাহেব তার জন্য অনেক করেছেন—মানুষের যা সাধ্য সবই করেছেন। এতটা কে করে—তার মতো নগণ্য, বলতে গেলে রাস্তার লোকের জন্যে?

'তাঁর ঋণ কি শোধ করতে পারব?' আগা প্রায়ই ভাবে, 'যদি কোনমতে একটুও শোধ করতে পারতুম!'

সে শোধের সুযোগ যে এত শীঘ্রই আল্লা তাকে দেবেন, তা কে জানত! এমন

ভয়ংকর, এমন মর্মান্তিক সুযোগ! তাকে এই ঋণ শোধের উপায় ক'রে দিতে তিনি এতগুলি লোকের সুবিপুল সর্বনাশের আয়োজন করবেন—তা আগা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। বুঝি সে সুযোগ দিতে খুদা তামাম দুনিয়াটাকেই হেলিয়ে দিলেন একবার, তাঁর দোজখের যতগুলো শয়তান পোষা ছিল সবটাকে ছেড়ে দিলেন এই দিল্লী শহরে—হিন্দুস্তানে। প্রলয়ের নমুনা দেখিয়ে দিলেন ওদের।

ওঃ, শেষ-বৈশাখের সে অগ্নিঝরা দিনটার কথা আগা জীবনে ভুলবে না।

ইংরেজী তারিখটাও মনে আছে তার, সেদিনই সকালে ওর উস্তাদ্ হাবিলদার বন্ধু আংরেজী শেখার পরীক্ষা নিচ্ছিল তার, সেদিনের তারিখ হিসেব ক'রে আংরেজীতেই লিখতে বলেছিল। লিখেও ছিল সে ঠিক ঠিক—১১ই মে, ১৮৫৭।

এর আভাস যে একেবারে পায় নি তা নয়। তবে পূর্বাভাস থেকে ব্যাপারটা কী সাংঘাতিক দাঁড়াবে সেটা বোঝে নি। আকাশের কোণে মেঘ, তা কেটেও যেতে পারে কিম্বা সামান্য দুর্যোগও হ'তে পারে, সে যে এই রকম প্রলয়ংকর ঝড়ে পরিণত হবে সেটা বোঝা যায় নি।

আভাস তার সিপাহী বন্ধুদের কাছ থেকে পেয়েছে। আভাস পেয়েছ সান্ত্রীদের কাছ থেকে। শুনেছে পূর্বে গোলমাল শুরু হয়েছে—সে গোলমাল এখানেও এল বলে। গোলমালের কারণ সবটা বোঝে নি আগা। এইটুকু বুঝেছে যে এদেশের মহারাজারা তালুকদাররা অনেকেই খুশী নয় আংরেজদের ওপর। অনেকের তালুক রাজগী কেড়ে নিয়েছে আংরেজ বড়লাট, অনেককে তখ্‌ৎ থেকে নামিয়ে সে তখ্‌তে মনোমত ব্যক্তিকে বসিয়েছে। তারাই আছে এর তলে। তারাই টাকা যোগাচ্ছে, খরচ করছে—সিপাহীদের তাতাচ্ছে। এর আয়োজন চলছে অনেক দিন থেকে। গাঁ থেকে গাঁয়ে এর নির্দেশ যাচ্ছে—কোথাও বা চাপাটি কোথাও বা পদ্মের চেহারা ধরে। আপাতদৃষ্টিতে এগুলো নিতান্ত নিরীহ। চাপাটির ব্যাপারটা তো অর্থহীন নিছক পাগলামি। কিন্তু ওর মধ্যে নাকি গূঢ় অর্থ নিহিত আছে। যারা জানে তারাই বোঝে।

আরও শুনেছে আগা যে, হাংগামা অনেক আগেই শুরু হয়ে যেত কিন্তু জনসাধারণ, রায়ৎ জোতদার চাষী মজুর কেরানী—তাদের নাকি তাতানো যাচ্ছে না কিছুতেই। তারা বহুদিন অরাজকতার পর সুশাসন আর শান্তির মুখ দেখেছে, তারা আংরেজ-রাজ চায়, আংরেজদের দুহাতে আশীর্বাদ করে। আগার হাবিলদার বন্ধুও এই দলে। সে বলে, 'তুমি বিদেশী, তুমি জান না কী অরাজকতা কী অনাচারের মধ্যে আমাদের দিন কেটেছে। বাদশা-নবাবরা জানেন বিলাস আর মদ আর মেয়েছেলে। এক কড়ার মুরোদ ছিল না কারও। বড় বড় বাদশা—আকবর জাহাঙ্গীর আলমগীর ওঁদের জমানা ছিল আলাদা। তারপর যেগুলো—সেগুলো কি বাদশা হবার যোগ্য—না মানুষ তারা? ওদিকে বর্গী এদিকে জাঠ রোহিলা—যা খুশি তাই করছে, খুন জখম লুটপাট। বাদশাকেই দুবেলা চোখ রাঙায় তারা। জোর ক'রে চৌথ সরদেশমুখী আদায় করছে বর্গীরা, সে টাকা যোগাতে হচ্ছে রায়তদেরই। বাইরে থেকে লুটেরারা আসছে—নাদিরশা, আমেদশা—তারা লুঠতরাজ-খুন ক'রে চলে যাচ্ছে দেশ শ্মশান ক'রে দিয়ে, আমাদের বাদশারা কলের পুতুলের মতো চেয়ে দেখছেন। নিজেরই কর্মচারী গোলাম কাদের, তার অত্যাচারে তটস্থ। মারাঠীরা এসে রাজধানীতে চেপে বসল, জাঠেরা এসে দেওয়ানী খাশের ছাদ খুলে নিয়ে গেল—কেউ কিছু করতে পারলেন না। সুযোগ পেয়ে সুবাদার ফৌজদাররা সব স্ব-স্ব প্রধান হয়ে বসলেন—কেউ হলেন

নবাব, কেউ হলেন নিজাম, মারাঠা সর্দাররা চার-পাঁচজন রাজা সেজে বসল—ওদিকে পর্তুগীজ লুটেরা আছে, মগ আছে। নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে তারা—লড়াই তো কত, এ ওর হক্কের জিনিস কেড়ে নিচ্ছে, ও এর মাল লুঠ করছে। যাই হোক, মরবার মধ্যে মরছে প্রজারা, তারাই এর টাকা রসদ যোগাচ্ছে, তাদেরই যথাসর্বস্ব যাচ্ছে বার বার। জান্ মান কিছুই নিরাপদ নয় তাদের। পথে যাওয়া যেত না—ঠগী ফাঁসুড়ে ডাকাতের ভয়ে, এক সুবা থেকে আর এক সুবায় যেতে হ'লে আর কখনও দেখা হবে না এইটেই ধ'রে নিত সকলে। হিন্দুরা তীর্থে যেতে পারত না—মুসলমানরা তাদের বড় বড় পীরস্তানে যেতে পারত না। এই অবস্থা থেকে আংরেজ আমাদের বাঁচিয়েছে। আমরা ওদেরই চাই।'

'তবে একটা দল ওদের হাতে এসেছে—এই সিপাহীরা', হাবিলদারই ব'লেছিল আগাকে, 'পেশোয়া ধুন্ধুপন্থ আর যারা যারা ষড় করছে তাদের ঐ একটা সুবিধে হয়ে গেছে। তার কারণ কি জানো? দেশী সিপাহীরা কাজ করে বেশী। অন্তত সাহেবদের থেকে লড়াইতে কেউ খামতি যায় না একটুও—অথচ ওদের তন্‌খা আর এদের তন্‌খায় আকাশ-পাতাল তফাৎ। আমাদের সিপাহীরা মাইনে পায় মাসে ষোলটাকা আর সিধা—পোশাক তো কোম্পানীর, অন্য কোন কাপড়ও নয়—সে জায়গায় আংরেজরা পায় একশ টাকার মতো। এইটেই বড় গায়ে লাগে, চোখে লাগে। ...আরও কি হয়েছে জানো আগা দোস্ত্—আমরা এই হিন্দুস্থানীরা বসে খেতে বড় ভালবাসি, একজন রোজগার করলে বহুলোক এসে তার ঘাড়ে চাপে। আবার যে রোজগার করে সেও একটু হিম্মৎ দেখাতে চায়। আমাদের বাহাদুরী হ'ল কে কত লোককে পুষতে পারে। আমরা আশীর্বাদ করি, "সহস্রপুষী হও" বলে। সিপাহীরা মাইনে পায় তো ষোল টাকা—কিন্তু দেশগাঁয়ে দেখায় তারা কোম্পানীর বড় চাকুরে, মস্ত বড় লোক। সেই বড়মানুষী বজায় দিতে প্রাণান্ত হয় ওদিকে। মুখ ফুটে বলতে পারে না যে তাদের সামর্থ্য কম, দেনা ক'রে বাইরের দাপটটা বজায় রাখে। ওদের রকমসকম দেখে গাঁয়ের লোকদেরও মনে হয় খুব পয়সা সিপাইদের, তারা একটা দুটো বৌ আছে জেনেও সতীনের ওপর মেয়ে দিতে সাধাসাধি করে। বাবুদের আমীরী মেজাজ—তাঁরাও কেউ চারটে কেউ পাঁচটা বিয়ে ক'রে বসেন। বিরাট সংসার—। অবিশ্যি জমিজমা থাকলে ষোল টাকা মাইনে কম নয়, কিন্তু তিন চারটে পরিবার পোষবার মতোও নয়। নবাব-বাদশাদের আমলে সিপাইরা মাইনে পেত না কেউ, কিন্তু লড়াইয়ের সময় লুটের মালে পুষিয়ে যেত অনেক বেশী। শুনেছি লড়াই করতে করতে কোন বাদশা বা শাহ্‌জাদা মারা গেলে তার সিপাইরাই আগে তার যথাসর্বস্ব লুঠ করে নিত, মায় জেনানা সুদ্ধ। এখন ইংরেজ আমলে না আছে লড়াই আর না আছে উপরি আয়ের কোন রাস্তা, চলবে কেন ওদের? দেনায় চুল বিকিয়ে আছে সকলের—তারা ভাবছে একটা গোলমাল বাধলে আর কিছু না হোক লুঠপাট ক'রে দেনাটা তো শোধ করতে পারবে—তারপর যদি আবার আগের জমানা ফিরে আসে তো ভালই। কিম্বা এই সব হাঙ্গামা দেখে কোম্পানীও মাইনে বাড়িয়ে দিতে পারে। এই আশাতেই এরা ঝুঁকছে এই দিকে। ...মরবে, মরবে আহাম্মকরা! একটা ধুয়ো তুলে দিয়েছ যে নতুন আমদানি কার্তুজে শুয়োরের চর্বি আছে।—এমন জিনিস মাথা থেকে বার করেছে যাতে হিন্দু-মুসলমান সকলেই ক্ষ্যাপে—শুয়োর সকলের কাছেই হারাম। আংরেজরা বলছে নেই—দেখিয়ে দিচ্ছে—তাও বলছে ও গুলি বন্ধ ক'রে দিচ্ছি—কিন্তু সে কথা কেউ বলছে না কাউকে। চর্বির কথাটাই

ফলাও ক'রে ছড়িয়ে দিচ্ছে—আর, একদল আহাম্মক তো আছেই, তারা কিছুই বোঝে না, কোন একটা ধুয়ো পেলেই নাচতে শুরু ক'রে দেয়। তাদেরই নাচাচ্ছে আরও বেশী ক'রে।'

তার পর গলা নামিয়ে আরও বলেছে, 'আমাদের বুড়ো বাদশাকেও জড়াবার তালে আছে সব। তাহলে খুব জোরদার হয় জিনিসটা। হাজার হোক দিল্লীর বাদশা—নামটা তো আছে। অবশ্য বাদশা খুব হুঁশিয়ার, ওঁর সাহসও নেই অত। তেতেছেন বড় বেগমসাহেবা, আর শাহ্‌জাদারা। অকর্মণ্য সব শাহ্‌জাদার দল ভাবছে আবার আগের মতো বাদশাহী ফিরে আসবে ; আর ঐ হেকিম আহ্‌সান-উল্লাটা পাজীর পা-ঝাড়া, ও এদিকে এখন খুব তাতাচ্ছে, মুঠো মুঠো টাকা খাচ্ছে বেগম-সাহেবার, ওদিকে ঠিক সময়ে দেখবে কোম্পানীর দিকে চলে যাবে। এখনই, বাদশাকে বলে কোম্পানীর দিক টেনে—বেগমকে বলে সিপাহীদের কথা। বড় খারাপ দিন আসছে ভাইয়া!'...

এ ঝড়ের পূর্বাভাস আগাও যে একেবারে পায় নি তা নয়। বরং বলা যেত পারে সে-ই আগে পেয়েছিল। বিশেষ এই কিল্লার যে অংশ ছিল এর মধ্যে, শাহ্‌জাদাদের আর বেগম-সাহেবার, সেটা চাপা ছিল না। আরও কয়েকবার তাকে বাদশার গোপন দৌত্য করতে হয়েছে। বাদশারই বলবে সে—কারণ হুকুম বাদশার নাম ক'রেই দেওয়া হয়েছে তাকে। কখনও কখনও বাদশা খোদও ডেকে পাঠিয়ে হুকুম দিয়েছেন। হেকিম দিয়েছেন। হেকিম সাহেবই এর মধ্যে বেশী অবশ্য, হেকিম ও মির্জা মোগল বাহাদুর। হেকিম বোধ হয় এতদিনে বুঝেছেন আর যাই হোক আগা বিশ্বাসী, ইমানদার। তাকে কাজ দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়।

অনেক রকম কাজ করতে হয়েছে তাকে এ ব্যাপারে—বিচিত্র কাজ, করবার কালও বিচিত্র। কোথাকার কোন্ মহারাজার লোক রাত বারোটায় আসবে, কিল্লার দোর থেকে তাকে নিঃশব্দে পথ দেখিয়ে আনতে হবে বাদশার গোসলখানায় (গোসল-খানা যে কেন তা আগা আজও জানে না, আসলে তো ওটা মন্ত্রণালয়—আগেকার দিনেও বাদশারা নাকি ওখানে বসে নিভৃতে উজীরদের সঙ্গে কি দূতদের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করতেন)। কোন্ নবাবের লোক কোন্ দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবে, তাকে গিয়ে খৎ পৌঁছে দিতে হবে। ঠিক লোক কিনা সেটা বোঝবার ভার আগার। যদি অন্য কোন গুপ্তচর ঠকিয়ে জাল পরিচয় দিয়ে নিয়ে যায় তাহ'লে বহু বিপদ হবে—বাদশারও—এবং সেই জন্য তারও। একথা বার বার বলে দেওয়া হয়েছে তাকে। অনেক সময় খৎও থাকে না কিছু—কোন সাঙ্কেতিক ভাষায় সংবাদ পাঠানো হয়। সাঙ্কেতিক শব্দে যে পরিচয় দেবে তাকেই সে সংবাদ বলতে হবে। সে ক্ষেত্রে দুদিকের সব কথাগুলিই সাবধানে মুখস্থ ক'রে যাওয়া দরকার—তার মধ্যে একটি এদিক-ওদিক হলেই মহা মুশকিল। কারণ যে শুনবে সেও মুখস্থ ক'রে নেবে—শেষ যাঁকে বলা হবে তিনিই বুঝবেন সেসব কথার অর্থ ; মানে না বুঝে কতকগুলো আপাত-অর্থহীন শব্দ মুখস্থ করা বড় কঠিন। তবু আগা প্রত্যেকবারই ঠিকমতো করেছে তা। সেইজন্যেই বড় বড় পদস্থ লোক থাকতে তার ওপরই কর্তাদের অত মেহেরবানি।

একবার বাইরেও যেতে হয়েছিল তাকে। ঝজ্জরের নবাবের খাস মুন্সী কাশী-প্রসাদ বাবুর কাছে পাঠানো হয়েছিল খৎ দিয়ে। সঙ্গে আরও দুজন বিশ্বাসী লোক

দিয়ে পাঠিয়েছিলেন অবশ্য শাহ্‌জাদা মির্জা মোগল, কিন্তু তাদের হাতে খৎ ছাড়েন নি। খৎ দিয়েছিলেন আগার হাতেই। এই কাশীপ্রসাদ লোকটাকে ভাল লাগে নি আগার, বড় বেশী ধূর্ত, বড় বেশী অনুসন্ধিৎসু। সে কিন্তু উপকারই করেছে আগার, সে কথা পরে শুনল।

কাশীপ্রসাদ নানান্‌ প্রশ্ন করেছিল আগাকে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কিল্লার ভিতরের আসল খবর জানতে চেয়েছিল। ওখানের হাওয়া ঠিক কেমন, কতটা বিশ্বাস করা যায় ওদের সেইটে জানাই বোধহয় আসল উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আগাও তেমনি—সে ওর মতলব আগেই বুঝে নিয়েছে, সে কাজের কথা একটিও জানতে দেয় নি। সুকৌশলে অথচ সবিনয়ে সবই এড়িয়ে গেছে।

একটা কথা নিয়ে কাশীপ্রসাদ অনেকক্ষণ ধরে খুঁচিয়েছিল তাকে। বলেছিল, 'আচ্ছা, লোকে বলে, বুড়ো বাদশা জিন্নৎ বেগম সাহেবার হাতধরা আর বেগম সাহেবা হেকিম আহ্‌সান-উল্লা সাহেবের হাতের মুঠোর মধ্যে—আসল বাদশা তাই নাকি হেকিম সাহেবই! কথাটা কি সত্যি?'

'তা আমি কি ক'রে জানব বলুন?' আগা উত্তর দিয়েছিল, 'চাকর নফর মানুষ আমরা, ওসব কথা কি আর জানা সম্ভব?'

'না, তবু এসব কিস্‌সা তো আর ঢাকা থাকে না, ছড়িয়ে পড়েই কিছু কিছু। তোমরা কি আর শুনতে পাও না! আরে এসব তো গুজব, শুনলেই বা কি দোষ আর বললেই বা কি?'

'জনাব অপরাধ নেবেন না। কথাটা বললেন বলেই বলছি। উপমাটা বড় ভালো দিয়েছেন—আমিও আপনার উপমাতেই বলছি। এ দেশে এসেই দেখেছি জিনিসটা, লক্ষ্য করেছি। আমাদের দেশে তো তলাও নেই। তলাওতে পানা ছড়ায় দেখেছেন? যতই ছড়াই পানা, যতই বাড়ুক, জলের তলায় তা যায় না, ওপরেই থাকে। এসব কহানী কিস্‌সা হ'ল বড় ঘরের—ওপর মহলের খবর। সে ওপরেই ছড়াব, নিচে নামবে কেন বলুন? ইট, পাথর ফেলুন তার ঢেউ ওপরেও যেমন ছড়াবে তেমনি তা সোজা নিচেও নেমে যাবে, জলের নিচেও সে আঘাত পৌঁছতে দেরি লাগবে না। ঐ পাথরের মতো কোন ভারী ঘটনা ঘটলে তবে আমাদের নিচের তলার কানে পৌঁছয়—নইলে না।'

কাশীপ্রসাদ হেসে বলেছিল, 'তবে ওপরে যে পানা ছড়াচ্ছে কিছু কিছু সে খবরটা জলের নিচে পৌঁছচ্ছে তো?'

'সে তো ঠিক কথা জনাব'। তবে কি পানা, কোন ধরণের পানা—কেউ ছেড়ে দিল না উড়ে এসে পড়ল বাতাসে, এ সব খবর জলের নিচের প্রাণীরা রাখে না। ওপরে ছায়া আছে, এইটুকুই ঢের। ওপরের খবর নিচের প্রাণীর রাখতে যাওয়াও বিপদ। জলের তলার মাছ যখন ওপরে ভেসে ওঠে, তখন তার মরণকাল ঘনিয়ে এসেছে বুঝতে হবে।'

কাশীপ্রসাদ খুব একচোট হেসেছিল। বলেছিল, 'বুঝেছি, তুমি খুব চালাক আর নিমকহালাল। দেখছিলুম তাই পরখ ক'রে যে—এত লোক থাকতে, অগুন্তি শাহ্‌জাদারা থাকতে হেকিম সাহেব তোমাকেই বা পাঠাল কেন!...তবে কি জান ভাই. ('ভাই' শুনে আগা আরও সতর্ক হয়ে উঠল) এ সব মজাদার দু'একটা কিস্‌সা বড় ঘ'র দু'টো চারটে থাকেই—তা নিয়ে তারাও মাথা ঘামায় না বিশেষ।...অনেক সময় হয়তো কথাটা পুরোপুরি মিথ্যে, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত—তবু এসব কিস্‌সা

না থাকলে বাদশা নবাবদের নবাবীরই মান থাকে না। আমরা সাধারণ লোক, এইসব দু'একটা কথা বলে মজা করা আমাদের—এইটুকুই যা লাভ। আমাদের আর দোষ কি বলো?'

'জনাব মাপ করবেন, সাধারণ লোকের দোষ থাকে না হয়ত—কিন্তু নৌকরদের থাকে। তা সে যে দরের নৌকরই হোক। ধরুন যদি এমন আজগুবী মিছে কথাও কখনও শোনেন যে আপনার নবাব জেনে শুনে তাঁর মেয়েটাকে ঝাড়ুদারের ঘরে পাঠিয়ে দেন রোজ রাত্রে—কথাটা তো আজগুবী বটেই—তবু তা নিয়ে কি আপনি তামাশা করতে পারবেন?'

কাশীপ্রসাদের মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। কঠিন কণ্ঠে বলল, 'মুখে তুমি একশো বার বলছ নফর নৌকর, কিন্তু তোমার জিভ তো দেখি নাদির শার মতো বেপরোয়া। একটু হুঁশিয়ার থেকো হে ছোকরা। কথা বলতে জানা ভাল কথা—কিন্তু না বলতে জানা আরও ভাল।...আচ্ছা তুমি যেতে পারো।'

কিন্তু তখন যত রাগের ভাবই দেখাক, পরে স্বয়ং মির্জা মোগলই তাকে দয়া ক'রে জানিয়েছেন যে কাশীপ্রসাদ ওদের কাছে ভূয়সী প্রশংসা করে ছ আগার। বলেছে, 'বাদশার লোক, বলা যায় না—নইলে আমি অনেক বেশী টাকা মাইনে দিয়ে আমার কাজে বহাল করতুম।'

এইসব চাপাচাপি ঢাকাঢাকি এবং চিঠি-আনাগোনার অর্থই হল—এ'রাও একটা কিছু গোপন ষড়যন্ত্র চালাচ্ছেন তলে তলে। হাবিলদার বন্ধুর মুখে শোনা খবরের সঙ্গে এই ব্যাপার মিলিয়ে সে ষড়যন্ত্র যে কি তারও খানিকটা আঁচ পেয়েছে আগা। এ'রা, যাকে বলে বেড়া নেড়ে গেরস্তর মন বুঝতে চাইছেন। অন্য রাজা মহারাজা নবাবদের মতি-গতি কি তা বুঝে তবে এগোবেন। কে কতটা আংরেজদের দিকে তা জেনে নিতে চান আগে। মিছিমিছি আংরেজদের চটিয়ে দিলে পেনসন তা যাবেই, এখন তবু নামে একটা বাদশাহী আছে—যতই হোক ঠাটটাও মন্দ না—সেটুকুও হয়ত থাকবে না। শুধু সিপাহীদের ওপর ভরসা নেই। শুধু রাজা মহারাজা নন, আরও একটা গুজব শুনেছিল আগা যে বাদশা নাকি আফগান মুলুকের আমির আর পারস্যের শাহের কাছেও খৎ পাঠিয়েছেন। কথাটা যে একেবারে মিথ্যা নয় তা আগা বুঝেছে, কারণ তাকে একবার মির্জা সাহেব ডেকে পাঠিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন যে দরকার হয়তো সে একবার আফগান মুলুকে যেতে পারবে কিনা। আগা সোজাসুজি অস্বীকার করেছিল, বলেছিল, পাঠান মুলুক দিয়ে তাকে যেতে হবে—একা সে যেতে রাজী নয়। সঙ্গে আরও অন্তত পাঁচ ছ' জন বিশ্বস্ত সঙ্গী দিলে সে যেতে পারে। তাতে মির্জা সাহেব যেন বেশ একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন।

তবু, এতটা কিছু ভাবে নি আগা। জিনিসটা যে এই রকম একটা প্রচণ্ড চেহারা নেবে বা এত শিগগীর কিছু ঘটবে তা মনে করে নি। সে ভেবেছিল শেষ পর্যন্ত বাদশা এসব হাঙ্গামায় নিজেকে জড়াতে সাহস করবেন না। ভীতু বলে নয়, বুদ্ধিমান বলেই। বুদ্ধিমান বলেই বৃদ্ধ ইংরেজদের ভয় করেন। তিনি যদি রাজী না হন, বড় বড় মহারাজা, নবাবরা যদি এতে যোগ না দেন তো শুধু সিপাহীরা কি করবে? যতদূর শুনেছেন, রাজা মহারাজারা—যাঁরা মাথা মাথা—তাঁরা নাকি কেউ কোম্পানীর বিরুদ্ধে যেতে রাজী নন।

কোম্পানীকে বিশেষতঃ ইংরেজ জাতটাকেই ভয় করেন তাঁরা বিষম, গত একশো বছর ধরে তাঁরা এদের প্রতাপ দেখে আসছেন। মারাঠারাই পেরে উঠল না, টিপু

সুলতান ফোঁৎ হয়ে গেল, শিখরা হার মানল—এমন কি বলতে গেলে ওদের জাত যারা ফরাসী, পর্তুগীজ তারাও হঠে গেল ; ইংরেজদের সঙ্গে পেরে উঠল না কেউ। তখনকার দিনে সিন্ধিয়া হোলকার পেশোয়া—এঁদের প্রতাপ ছিল কত, আজ বিষ হারিয়ে ঢোড়া সাপ তাঁরা। তাছাড়া এটুকু সবাই বুঝেছেন যে ইংরেজ থাকলে তাঁদের আরাম বিলাসিতা এগুলো অব্যাহত থাকবে অথচ লড়াই দাঙ্গার কোন দায় থাকবে না। ইংরেজ চলে যাওয়া মানেই আবার আগের মতো মারামারি কাটাকাটি—একদিনও কেউ নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে না।

সুতরাং সলা-পরামর্শ ষড়যন্ত্র যতই যা চলুক, এখনই কিছু ঘটবে না এইটেই ভেবেছিল সে ; এটাও হয়ত একধরণের খেলা। আর ইংরেজদের যে প্রতাপের কথা শুনছে, দেখছেও কিছু কিছু—যদি সত্যিই কোন গোলমাল কোথাও বাধে, শুরুতেই তাঁরা দাবিয়ে দিতে পারবেন। তাই সে রবিবার মীরাট থেকে সদ্যপ্রাপ্ত-ক্ষমতামদমত্ত সিপাহীর দল যখন এসে পৌঁছল এবং ইংরেজেরই ব্যারাক থেকে মুসলমান সিপাহীরা গিয়ে দরিয়ার দিক ফটকে খুলে তাদের অভ্যর্থনা করল—তখন আগার বিস্ময়ের শেষ রইল না। সে যেন একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। কী ঘটছে, কেন ঘটছে, এর পরিণাম কি, কেই বা কর্তা, অপরও এদের পিছনে আছে—না এরা এই এক দলই মাত্র—কিছুই ভাল ক'রে বুঝল না। যেন প্রচণ্ড একটা ঘূর্ণিঝড় উঠল, সে ধূলিজালের মধ্যে কিছুই দেখা যায় না। কী ঘটছে তা বোঝবার আগেই ঘটনা শেষ হয়ে যায়—আবার অন্য ঘটনা শুরু হয়। ভাল ক'রে নিঃশ্বাস নেবারও আগে যেন একটা খণ্ডপ্রলয় ঘটে গেল কিল্লার ভেতরে-বাইরে। অপরাহ্ণের সূর্য লাল হবার আগেই লাল কিল্লার মাটি লাল হয়ে উঠল।

যতক্ষণ রক্তপাত হয়নি ততক্ষণ একরকম ছিল, এবার আগা বুঝল ঘটনাটা গুরুতর আকার ধারণ করছে। সহজে মিটবার আর কোন সম্ভাবনা রইল না। ইংরেজরা পালাচ্ছে, তারা ভীত হয়ে উঠেছে, তাদেরও এত সহজে কেটে ফেলা যায়—এ একটা নতুন অভিজ্ঞতা সিপাহীদের, তাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে অভিনব সচেতনতা। ক্ষমতার নেশা রক্তের নেশা যে ভাবে মাতাল করে লোককে—বিশেষতঃ মূর্খ নির্বোধ লোককে—সেভাবে মদও মাতাল করতে পারে না। সিপাহীরা সেই নতুন নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠল একেবারে। যে আনুষঙ্গিক কাণ্ড-কারখানা তারা বাধিয়ে তুলল এক প্রহর না যেতে যেতে—তা আগার মতো লোকের ধারণারও অতীত।...

এরই মধ্যে ঝড়ে-ভেসে-আসা দুটো কুটোর মতো অল্প কিছুক্ষণের জন্য সেই হাবিলদার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আগার। তার মুখ কঠিন গম্ভীর। সে ঘাড় নেড়ে বিষণ্ণ মুখে বলল,—'এ ভাল হ'ল না আগা ভাইয়া, এ ভাল হল না। আমি এ জাতকে ভাল ক'রে চিনে নিয়েছি। আংরেজদের যতটুকু রক্তপাত হ'ল, এর এক একটি ফোঁটা লোহুর দাম আমাদের একশ ফোঁটা লোহুতে শোধ দিতে হবে। সহজে ছাড়বে না ওরা।'

আগা একটু খোঁচা দিয়েই বলতে গেল, 'কিন্তু তোমার এত প্রবল-প্রতাপ আংরেজরা তো এদের এক ফুঁয়ে উড়ে গেল—তাদের সে প্রতাপের এক বুঁদও তো দেখলুম না!'

হাবিলদার ওর মুখের দিকে গম্ভীর দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, 'ছিঃ! তুমিও না ভেবে চিন্তে এমন কথা বলো না, এরা আহাম্মক, এদের সুরে সুর মেলানো তোমার সাজে না। আংরেজরা একেবারেই প্রস্তুত ছিল না বলে এমনটা হয়েছে,

একটু আভাসেও যদি জানতে পারত তো ঘটনার চেহারা অন্য রকম দেখতে। আর পালানোর কথা বলছ, স্বয়ং পয়গম্বরকেও তো একদিন মক্কা থেকে মদিনাতে পালাতে হয়েছিল। সেই মক্কাতে বিজয়ী রূপে ফিরতে কি বেশী সময় লেগেছিল তাঁর? ওটা কিছু নয়, মহা মহা বীরকেও সময়ের ফেরে অসুবিধেয় পড়তে হয়—তা দিয়ে তাদের বিচার করা যায় না। এই বলে রাখলুম, যদি বেঁচে থাকো তো দেখবে—এর একশো গুণ শোধ উঠবে একদিন, আর সে দিন খুব বেশী দূরেও নয়। সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে হাজার হাজার ক্রোশ দূর থেকে এসে ওরা এখানে রাজগী ফেঁদছে, ওদের দেশ তো শুনেছি এতটুকু, আমাদের দিল্লী থেকে ইলাহাবাদ যতটুকু—ব্যস! এর মধ্যেই ওদের মুলুক খতম। সেই দেশের কটা লোক এসে এতবড় দেশ দখল করেছে, এত বড় বড় রাজা বাদশাকে ঘায়েল ক'রে হুকুমের নৌকর ক'রে রেখেছে—তাতেই বুঝছ না কতবড় জাত এরা!'

তারপর একটু থেমে আবার বলল, 'একটা কথা বন্ধু, আমি তো মরেইছি, এখন এদের হয়ে লড়াই করলেও মরব—না করলেও মরব। ফেঁসে গিয়েছি ভাল রকমই। দলের সঙ্গে সঙ্গে সকলকার ওপরেই বেইমান ছাপ পড়ে গিয়েছে। আমার যে এতে মত ছিল না এক কড়াও, সেকথা কাকে বিশ্বাস করাবো বলো।...সে যাক, কিন্তু তুমি তো হিন্দুস্থানী যাকে বলে তা নও, বিদেশী তুমি—এর মধ্যে জড়াচ্ছ কেন? তুমি সরে পড়ো। দেশে ফেরার পথ না থাকে, সোজা দক্ষিণ মুলুকে কোথাও চলে যাও। সেখানে এসব হাঙ্গামা পৌঁছবে না। তেলেঙ্গীরা আংরেজদের বিপক্ষে যাবে না কোনদিন। তুমি সেখানে গেলে কাজও পাবে ঢের।'

'তা হয় না বন্ধু'—আগা দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়ে, 'বাদশার নিমক খেয়েছি, তাঁর মাইনের নোকর আমি, একান্ত অসময়ে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন, তাঁর অসময়ে ছেড়ে যেতে পারব না, তাতে মরি আর বাঁচি।...তাছাড়া আমার মা বোন এখানেই কোথায় পড়ে রইল—তাদের খবর পর্যন্ত না নিয়ে কোথায় যাব আমি? এখানেই থাকি, অদৃষ্টে যা আছে তা হবে।'

হাবিলদার আর কথা বাড়াল না। বেশী সময়ও ছিল না। ঘূর্ণিঝড়ে একত্র এসে পড়ে যে দুটো কুটো, তা আবার ঘূর্ণিঝড়েই কোথায় ছিটকে চলে যায়।...

হাবিলদারের কথাটা একটু পরেই বুঝল আগা—যখন উইলাবীর দল বারুদখানা উড়িয়ে দিল নিজেরা আগুন লাগিয়ে। সে শব্দ কিল্লোর মধ্যে এসেও পৌঁছল, কথাটাও চাপা রইল না। যে জাতের লোক—বারুদটা শত্রুর হাতে পড়লে শত্রুর কিছু সুবিধা হ'তে পারে বলে—ওপরওলার হুকুমে নয়, নিজেরাই জেনে শুনে বুঝে সেই বারুদ নষ্ট করতে নিশ্চিত মৃত্যুবরণ করতে যায়—সে জাতের অসাধ্য কিছু নেই।

আগা সকাল থেকেই নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র হয়ে আছে এ নাটকের। সে কোন অংশ নেয় নি, নেবার ইচ্ছেও নেই। সম্ভব হ'লে বাধা দিত। তা যখন সম্ভব নয়, তখন ভাগ্যের ওপর নির্ভর ক'রে যতটা সম্ভব নিষ্ক্রিয় থাকা ছাড়া উপায় কি? ওর সব চেয়ে দুঃখ—এবং কিছু দুশ্চিন্তাও হ'ল বৃদ্ধ বাদশার জন্য। আজ সারাদিনে যতটা দেখল তাতে আরও পরিষ্কার বুঝল—বাদশা সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই ধুলোর ঘূর্ণি, এই আঁধিতে জড়িয়ে পড়লেন। এত অসহায় আর করুণ লাগছিল ওঁর অবস্থাটা। মায়া হচ্ছিল ওঁকে দেখে। কত বড় বড় সম্রাটদের বংশধর আজ তাঁরই রাজ্যের—এবং নামে তাঁরই বেতনভুক অনুগত সামান্য সৈনিকের হাতের

পুতুল মাত্র। বস্তুত সিপাহীরা ওঁকে নিয়ে খেলাই করছিল যেন। ধমক দিয়ে, হুকুম দিয়ে চালাচ্ছিল, মাকুর টানার মতো এদিক ওদিক করাচ্ছিল।

বাদশা বোধহয় পালিয়েই যেতেন—যদি ইংরেজ শিবিরের কোন অস্তিত্ব ধারে কাছে কোথাও থাকত। কিছু দূরের মধ্যেও ইংরেজ-শক্তির কোন আস্তানা থাকলে উনি গিয়ে সেখানে আশ্রয় নিতেন। কিন্তু প্রায় তাবৎ ইংরেজ পলাতক—না হয় নিহত। শহরে সারা দিন ধরেই সাহেবদের বাড়ি লুঠ হচ্ছে, আগুন লাগানো হচ্ছে। ইংরেজ তো বটেই, এমন কি ফিরিঙ্গি বা এ-দেশী ক্রীশ্চানদেরও রেহাই দেওয়া হচ্ছে না। এ অবস্থায় তিনি কোথায় যাবেন, কার কাছে যাবেন? মীরাট থেকে এরা এসেছে, তার মানে সেখানকার ছাউনীতেও ইংরেজ কর্তৃত্ব বলতে আর কিছু নেই। বেঁচেও নেই সম্ভবতঃ কেউ। আর কোথায় যাবেন? লুকিয়ে কাছে-পিঠে যাওয়া যায়। বেশীদূর কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। কলকাতা পৌঁছবার আগেই এরা ধরে ফেলবে। বাদশাকে ছাড়তে পারবে না এরা। এদের নৈতিক দাবী রাখতে গেলে, ওজন ভারী করতে হ'লে বাদশার নামটা যুক্ত থাকা চাই। যা কিছু করছে এরাই—করবেও, কিন্তু সর্বত্র সমস্তটাই বাদশার হুকুম বলে চালানো হচ্ছে।...

তাছাড়া, হয়ত বাদশার মনে একটা ক্ষীণ আশাও দেখা দিয়েছে যে, যদি এরা জেতে, না জিতলেও যদি ইংরেজ এদের সঙ্গে একটা আপস ক'রে, মিটিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়, তাহ'লে তাঁরও কিছু সুবিধা হবে। তাঁর বা তাঁর বংশধরদের—বিশেষ তাঁর প্রিয়তমা—বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা—মহিষী জিন্নৎ মহলের গর্ভজাত সন্তান জওয়ান বখ্‌তের কিছু মর্যাদা বাড়বে এখনকার চেয়ে, হয়ত কিছু ক্ষমতাও। কে জানে বাতুল বৃদ্ধ তাঁর কিশোর পুত্রকে ভাবী আলমগীর রূপে কল্পনা করছেন কি না!...

কিন্তু আশা ও কল্পনা যাই হোক, এদের সম্মানহীন রূঢ় আচরণে বৃদ্ধ বাদশার বাবরশাহী রক্ত যে ক্ষণে ক্ষণেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল তা তাঁর প্রায়বিবর্ণ সুগৌর মুখের প্রবল রক্তোচ্ছ্বাস এবং স্তিমিত চোখের বিরক্ত ভ্রূকুটিতেই ধরা পড়ছিল। তাঁর রক্ত শুধু বাবর আকবর আলমগীর বাদশারই নয়—কুখ্যাত তৈমুর ও চেঙ্গীজের রক্তও মিশ্রিত আছে যে!...

আগা আরও চিন্তিত শাহ্‌জাদী মেহেরের জন্যে। যদি কিছু হয়—যদি এরা হারে, অপমানিত ক্রুদ্ধ ইংরেজ আজকের এই লাঞ্ছনার শোধ তুলতে শুরু করে—সে সম্ভাবনা তো আছেই—তাহ'লে তার কোন বিপদ হবে না তো? মেয়েদের ওপর কি কোন শোধ তুলবে? পুরুষদের দুষ্কৃতির জন্য কি মেয়েদেরও শাস্তি দেবে? আবার মনে হয়, দেবে না-ই বা কেন, এরা কি ছেলেমেয়েদের রেয়াৎ করছে? হে ঈশ্বর, তেমন দুর্দিন যদি আসে, অন্ততঃ মেহেরকে তুমি রক্ষা ক'রো। তোমার এ বান্দা তো আছেই, সে তার জীবনের শেষ বিন্দু রক্ত দিয়েও শাহ্‌জাদীর সম্মান রক্ষা করবে, কিন্তু তুমি তার সহায় থেকো।

॥ আঠারো ॥

কিল্লার মধ্য থেকেই শোনা যাচ্ছিল লুণ্ঠনরত রক্তোন্মত্ত সিপাহীদের উদ্দাম তাণ্ডবের ঘোর কোলাহল। শোনা যাচ্ছিল আহতদের আর্তনাদ। আগুনও জ্বলছে

সারাদিন ধরে, এখানে ওখানে। হঠাৎ এক জায়গায় দেখা গেল বিপুল ধূম ও বিরাট শিখা আকাশস্পর্শী হয়ে উঠেছে, আবার খানিক পরে সেটা যখন একটু একটু ক'রে কমে আসছে, তখন ওদিকে আর কোনওখানে নূতন ধূম্র-কুণ্ডলী ও লেলিহান অগ্নিশিখা সেদিকের সেই আকাশ-খণ্ডে নূতনতর সর্বনাশের ভয়াবহ স্বাক্ষর অঙ্কিত করছে। সন্ধ্যার দিকে আর্তনাদের শব্দটা কমে এল একটু একটু ক'রে—কিন্তু বহ্নিলীলার বিরাম নেই। আর্তনাদ কমে আসার কারণটা খুব স্পষ্ট; মাতাপ্রসাদ হি হি ক'রে হাসতে হাসতে খবর দিয়ে গেল, 'শহরে আর একটি সায়েব রইল না ভাই রে—বাল-বাচ্চা-মেম সবসুদ্ধ খতম। কী মারা মেরেছে, একবার দেখ আয়। দেখবার মত জিনিস বটে, এমন আর দেখতে পাবি না কখনও।...হি-হি, ব্যাটারা আমাদের যেন মাথার ওপর দিয়ে চলত—এখন তেমনি ওদেরই মাথা রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে আমাদের পায়ের ধুলোয়।...হি হি, সব চেয়ে দরিয়াগঞ্জে, ওপাড়ার রাস্তা তো রক্তে কাদা হয়ে গেছে একেবারে কিন্তু সেটাই ভাল ক'রে দেখা গেল না, যা আগুন জেলেছে! বাপ! সে তাতে ঢোকাই যাচ্ছে না পাড়ার ভেতরে!...যাক, তবু দেখ একটু ঘুরে—'

সেই দুপুর বেলা, যখন মীরাটের দল এসে পড়ে তখন থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত আগা দেখেই যাচ্ছিল শান্তভাবে। সে এসবে থাকবেও না, বাধাও দেবে না, ওদের দলের সঙ্গে কোন যোগাযোগও রাখবে না। সে বাদশার সেবক, বাদশা যদি কোন হুকুম দেন যথাসাধ্য পালন করবে—নইলে একেবারে নির্লিপ্ত থাকবে, এই ঠিক করে রেখেছিল। সাহেবদের মারা হচ্ছে—ইংরেজ, আধা-ইংরেজ মায় ক্রীশ্চানদেরও, তা তো শুনছেই—কিন্তু তবু তখনও বিশেষ বিচলিত হয় নি। বিচলিত হয়েই বা কি করবে? তার ভাল লাগছে না ঠিকই—কিন্তু এ অকারণ হত্যাকাণ্ড বন্ধ করবারও তো কোন শক্তি নেই!

কিন্তু এখন হঠাৎ দরিয়াগঞ্জের নামটা শোনামাত্র মাথার মধ্যে কোথায় যেন কী একটা ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে উঠল। যেন উঁচু সুরে বাঁধা কোন বাদ্য-যন্ত্রের সব কটা তার একসঙ্গে ছিঁড়ে পড়ল। এ স্নায়ুর আঘাত—তবে আগার তা জানবার কথা নয়। তার মনে হ'ল তার মাথার মধ্যে কী একটা দাপাদাপি শুরু হয়েছে, বুকের মধ্যেটা যেন যন্ত্রণায় মুচড়ে মুচড়ে উঠছে।

অকৃতজ্ঞ বেইমান সে। তার এতটুকু কৃতজ্ঞতা বোধ থাকলেও কথাটা মনে পড়ত।

লীসন মেম! লীসন মেমসাহেব দরিয়াগঞ্জে থাকেন যে! সেটা মনে পড়ে নি এতক্ষণ। আশ্চর্য!

এই তো ঋণ শোধের সময়। প্রয়োজন হয় তো তাঁর দেওয়া জান তাঁর সেবাতেই নিঃশেষে নিবেদন করবে।

মাথাটায় একবার ঝাঁকানি দিয়ে সেই প্রবল উত্তেজনার ভাবটা কমাবার চেষ্টা করল। উত্তেজিত বা বিচলিত হ'লে চলবে না। উন্মত্ততার এই ঘূর্ণির মধ্যে যতটা সম্ভব মাথা ঠাণ্ডা না রাখলে কোন কাজই করতে পারবে না যে! সবটাই পণ্ড হয়ে যাবে হয়ত। সে চারিদিকে চেয়ে নিল একবার। যেন বাস্তবে ফিরে আসতে চায়। নিজের দিকেও চাইল। সরকারী পোশাক তার পরাই আছে। এ পোশাক মীরাটের সিপাহীরা চেনে না হয়ত ঠিক—এখানকার এরা চেনে। বাদশার খাস দেহরক্ষী, তারা সম্মান করবেই। মীরাটওয়ালারা না জানলেও সিপাহী এটা তো বুঝবে?

বন্দুকও একটা পেয়েছে সে, সেটা ঘরে রাখা আছে। নেবে নাকি? কী প্রয়োজন, তলোয়ার সঙ্গেই আছে, ছোট তলোয়ার, ওর কাছে খেলাঘরের অস্ত্র বলে মনে হয়, তবু এই ভাল। বন্দুক নিলেই টোটার মালা নিতে হবে, সব জড়িয়ে অনেকখানি ওজন। ছুটোছুটি করার অসুবিধা। যদি কাঁধে ক'রে বা হাতে তুলে কাউকে বহন করতে হয় তাহ'লে বন্দুক ফেলে আসতে হবে। সরকারী বন্দুক—হিসেব দেওয়া কঠিন হবে তখন। অবশ্য এ যা প্রেতের নৃত্য চলছে—কৈফিয়ৎ নিচ্ছেই বা কে? আর নিলেও যা হোক কিছু বুঝিয়ে দেওয়া কঠিন হবে না। তবু দরকার নেই ঐ বাড়তি ওজন ঘাড়ে ক'রে।

কাউকে বলে যাবে কিনা ভাবল একবার। কাকেই বা বলবে? সবাই ব্যস্ত, সবাই উদ্‌ভ্রান্ত! কে যে কর্তা তাই এখন বোঝা মুশকিল। সে আর ও নিয়ে মাথা ঘামাল না। একবার জেনানী মহলের দিকে তাকাল, একবার ছাদের দিকেও উৎসুক চোখে চেয়ে দেখল। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে—তবে আকাশ তখনও লাল—অস্ত সূর্যের আভায়—নিচের বহ্ন্যুৎসবের ফলেও, সেই আলোতে মনে হ'ল যেন একক একটি মূর্তি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছাদে। শিরীণ্? শিরীণ্ কি তাকেই লক্ষ্য করছে? একবার মনে হ'ল শাহ্‌জাদী নয় তো! আবার ভাবল, দূর, শাহ্‌জাদী কখনও একা ছাদে উঠতে পারেন!......সে যেতে যেতে ফটকের কাছ থেকে একটা হাত নাড়ল, যদি শিরীণের নজরে পড়ে, তারপর বেরিয়ে গেল।...

বাইরে বেরিয়ে এসে যেন প্রচন্ড একটা আঘাত পেল মনে মনে আগা। পৈশাচিক কান্ড চলছে—সেটা আন্দাজ করেছিল, নিজের চোখে দেখে এবং পরের কাছ থেকে শুনেও। নিজেও শুনেছে ঢের। কিন্তু সে যে এই, তা ভাবতে পারে নি। চাঁদনীর মোড় থেকে দেখে মনে হ'ল বড় একটা শ্মশানে এসেছে। বিবিধ বিচিত্র পণ্যে সাজানো বিপণীমালা, যার খ্যাতি দেশ-দেশান্তর থেকে লুব্ধ ক্রেতাকে ডেকে আনে—তার কি এই চেহারা? এখানে লুঠতরাজের কোন কারণ নেই, কারণ দোকান অধিকাংশ এদেশীয়দেরই। তবু, সম্ভবত ছুতোর অভাব হয় নি কোন, সেসব দোকান লুঠ হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। আর লুঠটাই যেখানে মূল উদ্দেশ্য সেখানে ছুতোরই বা প্রয়োজন কি? বহু দোকানদারই হাঙ্গামা শুরু হ'তে ভয়ে দোকান বন্ধ ক'রে দিয়েছিল কিন্তু তারাও সকলে রেহাই পায় নি। বড় বড় দোকান অনেক-গুলো তালা ভেঙ্গেই লুঠ হয়েছে। সবচেয়ে মোটা দাঁও মিলছে বোধহয় ব্যাঙ্কেই। ব্যাঙ্কের সামনে দিয়ে যেতে চোখে যেন জল এসে গেল আগার। অতবড় বাড়িটা অন্ধকারে—খোলা, হা হা করছে, জীবিত জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই—টাকা পয়সা তো নেই-ই। দরজার সামনেই ম্যানেজার ও তার মেমের মৃতদেহ পড়ে। বোধহয় শেষ পর্যন্ত তাঁরা বাঁচাতে চেয়েছিলেন অপরের গচ্ছিত রাখা এইসব টাকা। নিজের দায়িত্ব এত ছিল না ঠিকই—কিন্তু সে দায়িত্ব তাঁরা মাথা পেতে নিয়েছেন, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সে দায়িত্ব বহন করেছেন তাঁরা।

এসব দেখে লাভ নেই কিছু। চাঁদনীতেও খানিকটা পর্যন্ত গিয়ে সে আবার ফিরল। তার লক্ষ্য অন্য, এসব ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নেওয়া নয়। সে জোরে জোরে পা হাঁকাল দরিয়াগঞ্জের দিকে। জোরে যাওয়াও অবশ্য কঠিন, পথে বিস্তর বাধা, লোকের ভীড়ও কম নয়। কারণ লুঠ শুধু সিপাইরাই করছে না—অনুপাতে হয়তো তারা কমই হবে—অরাজক অবস্থার সুযোগে শহরের তাবৎ গুন্ডা বদমায়েশের দল বেরিয়ে পড়েছে। অনেক দিনের ক্ষুধা তাদের, বহুদিন এমন মওকা মেলে নি।

তাদের উৎপাত উপদ্রবই প্রধান বাধা। শুধু লুঠই নয়, যার উপর যার যে কোন কারণে আক্রোশ ছিল, তার সর্বনাশ করারও এই সুযোগ। পথে পথে আহত নিহতদের দেহ ছড়ানো। সাহেব মেম ছাড়াও দু একটা লাশ চোখে পড়ল, মাথায় টিকি কপালে ফোঁটা—ক্রীশ্চানও নয়। তবে সাহেব ফিরিঙ্গিই বেশী। এক এক জায়গায় জড়াজড়ি ক'রে ঢিপি হয়ে পড়ে আছে কতকগুলো মুর্দা। হয়তো এক সঙ্গে পালাতে গিয়েছিল দল বেঁধে—এদেরও মারবার সুবিধা হয়েছে। একই সঙ্গে মেরে ফেলে রেখে গেছে। হয়তো কেউ তাড়াতাড়ি যাবে এই আশায় গাড়ি চেপে পালাচ্ছিল, গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে তাদের মারা হয়েছে। তারপর ঘোড়া খুলে দিয়ে গাড়িটাতেও আগুন লাগিয়ে দিয়েছে কেউ—সিপাহী কিম্বা জনতা। গাড়ির কাঠটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, লোহার কঙ্কালগুলো পড়ে আছে তখনও, পথ জোড়া ক'রে।

যে মুর্দাগুলো পড়ে আছে রক্ত-গঙ্গার মধ্যে—তার সব কটাই হয়ত মড়া নয়, এখনও হয়ত তাদের সকলের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় নি, এখনও খুঁজে দেখলে সেই মৃত্যুশীতল মাংসপিণ্ডের মধ্যে কিছু উষ্ণতা পাওয়া যাবে দু'একটাতে—কিন্তু কে দেখে? আগার সে সময় নেই। দৃশ্যটা যতই তার চক্ষুকে পীড়িত করুক, সম্ভাবনাটা যতই বিবেককে খোঁচা দিক—এখানে এদের জন্য, বিশেষতঃ অনিশ্চিত ব্যাপারে সময় নষ্ট করা তার চলবে না। তাছাড়া খুঁজে খুঁজে আহতদের সেবা করাও বিপদ, প্রকাশ্য রাজপথে কোন আংরেজ কি কোন মেমকে সে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করছে দেখলে তার ওপরই হামলা হবে হয়তো। আর তার ফলে তার যা এখন প্রধান উদ্দেশ্য—সেটাই নষ্ট হয়ে যাবে। তার একটি মাত্র প্রাণ, সে প্রাণের ঋণ শোধ দিতেই সে প্রাণ নিবেদন করা উচিত তার, ঋণ থাকতে বন্ধকী জিনিস হস্তান্তর করার অধিকার তার নেই। অন্য কাজে মেতে—তা সে যতই মহান্ কাজ হোক—তার জীবনের সর্বাগ্রগণ্য দায়িত্ব পালনে যদি সে অপারগ হয় তো নিজের বিবেক ও ঈশ্বর—কারও কাছেই সে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না কখনও।

সে সত্যি সত্যিই আর কোন দিকে তাকাল না। যতদূর সম্ভব দ্রুতপদে পথের হল্লা এড়িয়ে ও সংঘর্ষের কারণ বাঁচিয়ে এগিয়ে চলল। রোশন-উদ-দৌলতের সোনেরী দরগার কাছে খুব বড় রকম একটা জটলা হচ্ছে দেখা গেল। আন্দাজে—অল্প যা দু'একটা কথা কানে এল, তাতেই বুঝল—স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীরা তাদের কাজ-কারবার ও ধনপ্রাণের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্যই এখানে জড়ো হয়েছে। সিপাহীদের হামলার চোটটা তাদের ওপরও এসে পড়েছে—এইটেরই প্রতিকার করা দরকার। সেজন্য খোদ বাদশার কাছে যাবে, না মির্জা মোগলের কাছে—সেটাই প্রধান আলোচ্য। এই প্রসঙ্গে দু'একজন শাহ্‌জাদা ফকরুদ্দিনের নামও করছে। তিনি থাকলে এতটা উচ্ছৃঙ্খলতা ঘটতে পারত না কখনই। ঐ মেয়েছেলেটা আর হেকিমটা যদি তাঁকে বিষ দিয়ে না মারত—

আর বেশী শোনবার জন্য দাঁড়াল না আগা। কাছাকাছি সিপাহীর দল বলতে কিছু নেই। ওর পোশাক দেখে সিপাহী সন্দেহ ক'রে এবং ওকে একা পেয়ে গায়ের ঝাল মেটানো আশ্চর্য নয়। অবশ্য আগা তাতে ভয় পায় না, আজ সঙ্গে হাতিয়ার আছে যখন তখন অনেকটাই সে নিশ্চিন্ত, তবু গোলমাল বাধলে আর কিছু না হোক, অনর্থক দেরি হয়ে যাবে খানিকটা। এর মধ্যেই দু'একজন ক্রুদ্ধ ভঙ্গী ক'রে আঙুল দিয়ে তাকে দেখাতে শুরু করেছে। অর্থাৎ হাঙ্গামার পূর্বাভাস।

দুর্বল লোকের স্বভাবই এই—অপেক্ষাকৃত কোন নিরীহ লোককে পীড়ন ক'রেই প্রবলের অত্যাচারের শোধ তোলে তারা।

কোনমতে পাশ কাটিয়ে ওখানটা পেরিয়ে এসে থৌবা বাজারে পড়ল আগা। এখানটা একেবারেই জনহীন, থম্ থম্ করছে। কারণ এখানে বেশির ভাগই দেশী ক্রীশ্চান ও ফিরিঙ্গির বাস, তার সঙ্গে দু'চারজন গরীব ইংরেজ থাকে। দোকান-পাটও অধিকাংশ ওদের, সে সব বহুক্ষণ লুঠ হয়ে গেছে। ঘর-বাড়িও কতক কতক জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, দু'চারটে যা সে চোট এড়িয়ে যেতে পেরেছে, সেগুলোও নিস্তব্ধ অন্ধকারে হা হা করছে, হানাবাড়ির মতো! মরা বা মারার দৃশ্য আগার কাছে নতুন নয়—কিন্তু বিনা লড়াই কি দাঙ্গা-হাঙ্গামায় এ ভাবে অকারণ মানুষ মারা কোনদিনই তার কাছে রুচিকর ব'লে মনে হয় না—আজও হ'ল না। বরং তার কেমন গা বমি-বমি করতে লাগল, একঘেয়ে এই হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ ক'রে।

সে আরও জোরে পা হাঁকিয়ে দিল, কায়িকশ্রমে যদি স্নায়ুর এ বিবশতা কিছুটা কমে। লীসন মেমের বাড়িটা তার ভালই মনে আছে। এখান থেকে শাহী-বাগ পর্যন্ত যে পথটা চ'লে গেছে তারই মাঝামাঝি ডানদিকে মোড় ফিরলেই ওদের গলি। কারণ শুধু সে রাত্রেই নয়—মাঝখানে আরও একবার এসে সে তার সঙ্গে দেখা ক'রে গেছে। লেফ্‌টেন্যান্ট উইলোবী সাহেব লীসন মেমের বন্ধু। মেম সাহেবের অনুরোধে তিনিই সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন ওকে—কিল্লার ব্যারাক থেকে খুঁজে বার ক'রে। লীসন সাহেব বিশেষ উদ্দেশ্যেই ওকে আনিয়েছিলেন—ওরই কল্যাণের জন্য। কারণ সেদিন অনেক অতিথি সমাগম হয়েছিল তাঁর বাড়িতে, তার মধ্যে কালেক্‌টার হাচিনসন সাহেব ও কমিশনার ফ্রেজার সাহেবও ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ওর কাহিনী তাঁদের শুনিয়ে দিয়েছিলেন। থিওফীল মেটকাফ সাহেবও ছিলেন, তিনি ওকে আশ্বাস দিয়েছিলেন দিল্লী শহরে ওর আর কোন ভয়ের কারণ যাতে না থাকে, সে ব্যবস্থা তিনিই করবেন। লীসন মেমের কাছে ঋণ কি ওর একটা! মনে করতেই চোখে জল এসে গেল আগার।

থৌবা বাজার থেকে শাহীবাগের ফটক পর্যন্ত যে চওড়া রাস্তাটা চ'লে গেছে তারই মাঝামাঝি ডান দিকে একটা গলি, সেইটেই লীসনের বাড়ির পথ। সাবধানে দেখে দেখে চলল আগা। অন্যদিন তবু পথে কয়েকটা তেলের আলো জ্বালা হয়—আজ তাও কেউ জ্বালে নি। কে-ই বা জ্বালবে এই হ্যাঙ্গামে? দু'একটা বাড়ির আগুন এখনও নেভে নি, তারই অঙ্গারাবশেষের লাল আভায় পথ দেখে দেখে যাওয়া চলছে তবু, নইলে নক্ষত্রের আলো ছাড়া কোন উপায় থাকত না। বাড়ির আলো একটু আধটু পথে এসে পড়বে—এমন কোন সম্ভাবনাও আর নেই কোথাও। হয়ত এই পাড়াতেই আর কেউ বেঁচে নেই—আলো জ্বালবার মতো একজনও।

জনহীন শ্মশানের মতো পথ—আলো-আঁধারিতে বার বার শবদেহেই হোঁচট লাগছে শুধু, কোথাও কোন জীবিত জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই—তারই মধ্যে একসময় হঠাৎ কেমন মনে হ'ল, কোথা থেকে কে যেন তাকে লক্ষ্য করছে নিঃশব্দে। এমন মনে হওয়ার কোন কারণই নেই, নিতান্তই সেই আংরেজরা যাকে বলে ষষ্ঠ অনুভূতি—কিন্তু এখন সেটা আর আগার কাছে অবাস্তব নয়। সে থমকে দাঁড়িয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাল একবার। আর সঙ্গে সঙ্গেই দেখল একটা বন্ধ দোকানঘরের ভাঁজকরা দরজার পাল্লায় ঈষৎ যে একটু ফাঁক ছিল, সেটা নিঃশব্দে বুজে যাচ্ছে।

'কে, কে ওখানে?' বেশ একটু চেঁচিয়েই প্রশ্ন করল আগা, আর প্রায় সঙ্গে

সঙ্গেই বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল দরজাটার ওপর। এবং ভেতরের লোকটি খিল এঁটে দেবার আগেই সজোরে ধাক্কা দিয়ে কপাটটা ফাঁক ক'রে একটা পা ঢুকিয়ে দিল —যাতে আর কোনরকমেই সম্পূর্ণ বন্ধ না করা যায়।

তারপর দরজাটা আর একটু খোলার কোন বাধা রইল না। ভেতরে উঁকি মেরে দেখল—রাস্তার ওপার থেকে আগুনের আভা ভেতর পর্যন্ত গিয়ে পড়েছে দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই—দোকান নয়, একটা দর্জিখানা সেটা, ভেতরে এক বৃদ্ধ মুসলমান ওস্তাগর বসে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে। একটা চেরাগ জ্বলছে ছোট মতো —বদনা দিয়ে সেটা আড়াল ক'রে রাখা হয়েছে, পাছে তার আলো বাইরে থেকে দেখা যায়। আর একটু তাকাতে নজরে পড়ল, পাল্লার বাইরে চক্ খড়ি দিয়ে বড় ক'রে চাঁদ-তারা আঁকা—সম্ভবতঃ তাইতেই বেঁচে গেছে দোকানটা। অথবা মাল বলতে বিশেষ কিছু নেই জানত বলেই এদিকে কেউ নজর দেয় নি।

লুঠের মতো মাল না থাক, একেবারে ঘর খালিও নেই। বোধহয় কারও ফরমাশ ছিল, ওস্তাগর একটা কালো রঙের বুরখা সেলাই ক'রে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছে, বোধ করি আর একটা ওরই জোড়া—বসে সেলাই করছিল, এখনও চাটাইয়ের ওপর সে, কাপড়টা পড়ে আছে স্তূপাকার হয়ে।

বুরখাটা দেখে মনে হ'ল আগার—এটা দৈব-প্রেরিত, ঈশ্বরেরই ইঙ্গিত। সে আর বাজে কথায় সময় নষ্ট না করে একেবারেই কাজের কথা পাড়ল, 'ভয় নেই ওস্তাগরজী, আমি লুঠ করতে আসি নি, কিনতে এসেছি, ঐ বুরখাটি আমাকে বিক্রি করতে হবে।'

একে সিপাহী তায় সশস্ত্র—এতক্ষণ ওস্তাগরজী প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে আল্লার নাম জপ করছিল, এখন যেন তার ধড়ে প্রাণ এল কতকটা। তবু ঠাট্টা করছে আগা, না সত্যি কথাই বলছে ঠিক বুঝতে না পেরে একটু আমতা আমতা ক'রে প্রশ্ন করল, 'ঐ বুরখাটা—মানে এই যেটা তৈরী আছে—কিনবে তুমি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিনব। কথা বুঝতে পারছ না?'

'কিন্তু ওটা, ওটা যে পরের ফরমাশী—কালই দুটো দেবার কথা আছে।'

'আর একটা বানিয়ে নিও তুমি। আমার খুব জরুরী দরকার।' বলতে বলতেই আগা হাত বাড়িয়ে টেনে নেয় বুরখাটা, 'এখন দাম কত তাই বলো!'

'দাম? তা চার টাকাই দাও। রেশমের বুরখা ওটা।'

ভরসার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বুদ্ধিও ফিরে এসেছে বুড়োর।

অসহিষ্ণু আগা তাকে ধমক দিয়ে উঠল, 'দ্যাখো ওসব চালাকি করতে এসো না আমার সঙ্গে। দুটো টাকা সঙ্গে আছে—এইতেই খুশী থাকো। এমনি নিয়ে গেলেই বা কি করবে, দাম দিতে চাইছি এই ঢের। সারাদিন এত দেখেও বুঝি শিক্ষা হয় নি তোমার—বাদশার সিপাহীর সঙ্গে এসেছ চালাকী করতে!'

সে দুটো টাকা ফেলে দিয়ে আবার চলতে শুরু করল। বলা বাহুল্য, ওস্তাগর সাহেব আর দ্বিরুক্তি করল না, দুটো টাকা যে পাওয়া গেছে এই তার বাপের ভাগ্যি, দলবল জুটিয়ে এনে যে যথাসর্বস্ব লুটে নিয়ে যায় নি—এ তার বাবা-মায়ের মহাপুণ্যের ফল। আজকের রাত ভালয় ভালয় কাটলে সে নিজামুদ্দীনের দরগায় গিয়ে সিন্নি চড়িয়ে আসবে।

বুরখাটা পেয়ে একটু যেন উৎসাহ বোধ করেছিল আগা, আল্লা যখন এতটা যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন তখন শেষ পর্যন্ত রক্ষা করবেন নিশ্চয়। কিন্তু লীসনদের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতেই তার বুকের ওপর বিরাট তুষারশিলার মতো

কী যেন একটা চেপে বসল আবার। পা যেন আর চলতে চাইল না—কে যেন দশমণ ওজনের একটা লোহা বেঁধে দিয়েছে তাতে।

লীসন মেমের বাড়ির দরজা ভাঙ্গা, সামনেই উপুড় হয়ে পড়ে আছেন মিস্টার লীসন। সিঁড়ির মুখটাতে ওদের তেলেঙ্গী ক্রীশ্চান চাকরটার মৃতদেহ—সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ থম্ থম্ করছে। অন্য কোন প্রাণী জীবিত আছে এর মধ্যে, তা মনে করার কোন কারণ নেই।

আর এগিয়ে লাভ নেই, ফিরে যাওয়াই উচিত, কারণ তারপর কি দেখবে সে তো জানা কথাই। তবু—। আগার মনে হ'ল শেষ পর্যন্ত দেখেই যাবে সে। তাছাড়া প্রাণদাত্রী লীসন মেম তার মায়ের মতোই—সে ক্ষেত্রে তার শবদেহটা মাটিতে না দিয়ে চলে যাওয়া তার পক্ষে অকৃতজ্ঞতারই সামিল হবে।

আস্তে আস্তে পা টেনে টেনে শেষ পর্যন্ত ওপরেও উঠল সে সিঁড়ি দিয়ে। দেখল তার আশঙ্কাই ঠিক, সামনেই যে বড় ঘরটা সেই ঘরে ঢোকবার মুখে লীসন মেমের মৃতদেহ আরও তিন-চারটি শবের সঙ্গে একটা ঢিপির মতো হয়ে পড়ে আছে—

চোখ ঝাপ্সা হয়ে গেল অশ্রুতে। কিছুক্ষণের মতো কোন জ্ঞানই রইল না। একবার মনে হ'ল নিজের তলোয়ারখানা বুকে বসিয়ে দেয় সে নিজেই, এর পর আর জীবনের কোন অর্থই রইল না যেন। কিন্তু তারপরই কিছুক্ষণ পূর্বেকার সংকল্পের কথা মনে পড়ল। মার শেষকৃত্য এখনও বাকী আছে, সেটুকু করার আগে মরবারও কোন অধিকার নেই ওর। তাঁর শেষ আশ্রয়ের ব্যবস্থা না ক'রে কোথাও যেতে পারবে না।...

অনেকক্ষণ পরে, কতকটা মরীয়া হয়েই যেন সে লীসন মেমের মৃতদেহটা টেনে বার করতে চেষ্টা করল। কিন্তু গায়ে হাত পড়তেই চমকে উঠল। একটা অবিশ্বাস্য আশায় বুকের মধ্যেটা ধ্বক্ করে উঠল তার। অন্য দেহগুলোর মতো শক্ত এবং ঠান্ডা হয়ে যায় নি তো, এখনও যে গরম রয়েছে হাত-পা। গরম শুধু নয়—সেগুলো ইচ্ছা-মতো নাড়ানো যাচ্ছে যে। তবে কি—তবে—কি— ?

হে ঈশ্বর—হে ঈশ্বর—

একেবারে নাকের কাছে কান নিয়ে গিয়ে দেখল, সত্যিই একটু একটু নিঃশ্বাস পড়ছে এখনও। এবার ভরসা করে নাড়িতে হাত দিল—আঃ এই তো, এখনও তো নাড়ি চলছে ওঁর। খুব ক্ষীণ, তবু নিয়মিতই চলছে, তাতে কোন ভুল নেই। গায়ে ঘামও আছে কিছু কিছু, মরা মানুষের ঘাম হয় না কখনও!

এইবার অনেকটা যেন প্রকৃতিস্থ হ'ল আগা, শুধু সাহস নয়, হাতে-পায়ে বলও ফিরে পেল অনেকখানি। বোধহয় বিকেলের দিকেই একটা শেজ জ্বালা হয়েছিল ঘরের মধ্যে, সেটা প্রায় নিভে নিভে জ্বলছিল এতক্ষণ। আগা তার সল্তে বাড়িয়ে আলোটা জোর ক'রে তুলল খানিকটা, শেজের গেলাসটা ধরে কাছে নিয়ে এল। না, ওঁর দেহে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই, পোশাকে যে রক্ত লেগেছে সে অপরের ক্ষত থেকে। সম্ভবতঃ এই বীভৎস কান্ড দেখে ভয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, মড়া মনে ক'রে লুটেরারা আর ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখেনি, ফেলে রেখে গেছে।

কিন্তু তখন আর অতকিছু ভাববার সময় নেই। আনন্দ করার তো নেই-ই। দূরে আবারও একটা হল্লা উঠেছে কোথায়—হয়ত লুটেরার দল আবার এই দিকেই আসছে, কোথায় কি অবশিষ্ট পড়ে আছে এখনও তার খোঁজ করতে। সিপাহীর

দলই হোক আর লুটেরার দলই হোক, সামনে পড়লে আর রক্ষা থাকবে না।

আগা অচৈতন্য লীসন মেমের দেহটা টেনে ভেতরের বারান্দায় নিয়ে এল, একটা বালতি থেকে জল নিয়ে থাবড়ে থাবড়ে দিতে লাগল ওঁর চোখে মুখে।

একটু পরেই জ্ঞান হ'ল মিসেস্ লীসনের। খানিকটা বিহ্বল হয়ে চেয়ে থাকার পর সেই আবছা অন্ধকারেই বুঝি চিনতে পারলেন আগাকে, 'এ কি, আগা--তুমি? তুমি কি আমাকে খুন করতে এসেছ?'

'না, না মেমসায়েব। আমি আপনাকে বাঁচাতেই ছুটে এসেছি। কিন্তু এখন আর কথা বলার সময় নেই বেশী, এখনই হয়ত আবার ওরা এসে পড়বে, দুশমনেরা দল বেঁধে এলে আমি একা আর কি করতে পারি বলুন! এখনই আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে। কিন্তু তার আগে চট্ ক'রে এই বুরখাটা গলিয়ে নিন, আর একটুও সময় নেই হাতে, খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে—'

'আমি যাব—পালাব? কিন্তু কোথায় নিয়ে যাবে আগা আমাদের?' বিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করেন মিসেস লীসন, তারপরই সাগ্রহ-ব্যাকুল কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'সাহেব, তোমার সাহেব কোথায়?'

আগা এক মুহূর্ত সময় নেয় নিজের গলাটাকে সহজ করতে। তারপর অকারণ খানিকটা জোর দিয়ে বলে, 'কোথায় আছেন তিনি, বেঁচে আছেন কি না বলতে পারব না। এই অন্ধকারে এই ঘোর বিপদের মধ্যে খুঁজে দেখা সম্ভবও নয়। যদি বেঁচে থাকেন তো আছেনই—কিন্তু এখন সবাইকে জড়াতে গেলে কাউকে বাঁচাতে পারবেন না, নিজেও বাঁচবেন না। তার চেয়ে সকলকেই তার নসীবের ওপর ছেড়ে দিন—আপনি এখন দয়া ক'রে বেরিয়ে চলুন তাড়াতাড়ি—যত তাড়াতাড়ি হয় এই দোজখ থেকে। আর একটুও সময় নষ্ট করা উচিত নয়।'

'কিন্তু আমি যে মোটে চলতে পারছি না আগা, আমার পায়ে একটুও জোর নেই।' যেন কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন মিসেস লীসন।

'এখন একটু আমার হাতে ভর দিয়ে চলুন, দু'চার পা গেলেই আবার পায়ে জোর পাবেন। আমি আপনাকে কাঁধে তুলে নিয়েও যেতে পারি, খোদা সে তাকৎ দিয়েছেন আমাকে—কিন্তু তাতে ক'রে যে দেখবে সেই সন্দেহ করবে, ঠিক বুঝবে আমি কোন মেমসাহেবকে নিয়ে যাচ্ছি। আপনি একটু চেষ্টা করুন চলবার, আল্লার দোহাই—'

বলল কিন্তু লীসন মেমসাহেবের সক্রিয়তা ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করল না আর। নিজেই বুরখাটা গলিয়ে দিল ওঁর মাথার ওপর দিয়ে, তারপর প্রায় টানতে টানতেই নামিয়ে আনল ওঁকে। বুরখায় মুখ ঢাকা ছিল বলে স্বামীর মৃতদেহটা দেখতে পেলেন না মিসেস লীসন, তা নইলে সেখানেই আছড়ে পড়তেন নিশ্চয়। তাছাড়া এতক্ষণের বাঁধ-ভাঙ্গা তপ্ত অশ্রুতে দু' চোখ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে—চেয়ে কিছু দেখারও শক্তি ছিল না তাঁর।

আগা ঠিকই বলেছিল। খানিকটা চলতে চলতেই পায়ে জোর পেলেন মিসেস লীসন। পথও জনহীন, নিস্তব্ধ—দুশমনের ভয় কম। আগা দ্রুত এগিয়ে চলল নদীর দিক লক্ষ্য ক'রে, একমাত্র ভরসা যদি কোন একটা নৌকা পেয়ে যায় তো রাতারাতি নদী পেরিয়ে ওপারের গ্রামের দিকে গিয়ে নামবে, যেখানে এখনও শহরের এ দানবীয়তা গিয়ে পৌঁছয় নি। শহরে আর বোধহয় কোথাও ওঁকে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়।

খানিকটা চলার পর সে লীসন মেমসাহেবকেই জিজ্ঞাসা করল, 'এদিকে কোন নির্জন পারঘাটা আছে ব'লে জানেন?'

লীসন মেম খানিকটা ভেবে, যেন গত জন্মের সূত্র ধরে স্মৃতিকে ফিরিয়ে এনে বললেন, 'খয়রাতি দরজায় নৌকো থাকে অনেক, কিন্তু নির্জন হবে কি না বলতে পারি না—'

'সেটা কোন দিকে?'

'সেদিকেই যাচ্ছি আমরা। এই সোজাই হবে বোধহয়। কে জানে কিছুই যেন ঠিক মনে পড়ছে না। কিন্তু আগা—এখানে কি আর কোন ইংরেজ নেই? সব কি—?'

'বোধহয় না। অনেকেই সময়মতো পালিয়ে গেছেন।' মিথ্যে ক'রেই বলল আগা।

পথে অবশ্য দু'একজন রাহীর সঙ্গে যে দেখা হ'ল না তা নয়, কিন্তু তারা মুসলমান সিপাহীর সঙ্গে বুরখা পরা মেয়েছেলে দেখে কোন সন্দেহ করল না। কিন্তু একেবারে শেষদিকে একটা বড় রাস্তা পেরোতে গিয়ে দারুণ গোলমালে পড়ে গেল। যাকে বলে সাক্ষাৎ যমের মুখে পড়ে যাওয়া তাই হ'ল। একদল সিপাহী প্রচুর লুটের মাল আর প্রচুর মদ্যের আনন্দে হল্লা করতে করতে এসে পড়ল ওদের সামনে।

ওদের দেখে হৈ হৈ ক'রে উঠল তারা একসঙ্গে।

'কে যায়? কাকে নিয়ে যাচ্ছ ভাই সিপাই?'

উত্তর তৈরীই ছিল আগার, এতক্ষণ ধরে ভেবেই রেখেছিল সে। বলল, 'খবরদার ভাই সব, মোগলের জেনানা, শাহী হারেমের আওরৎ। মির্জা আবুবকরের হুকুমে ওঁকে ওঁর অসুস্থ দাদার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

সকলে সসম্ভ্রমে পিছিয়ে গেল। 'মুঘল হারেমের জেনানা' এ কথাটা জাদুমন্ত্রের মতো কাজ করত তখন—হিন্দু মুসলমান এমন কি ইংরেজদের কাছেও। এ খবর তার বন্ধু সেই হাবিলদারের কাছে বহুবার শুনেছে আগা। রেশমের বুরখা—সঙ্গে বাদশার সিপাহী, অবিশ্বাস করবার মতো নয়ও কথাটা।

কিন্তু তবু, ওরা সবে দু চার কদম এগিয়েছে—কে একজন যেন পিছন থেকে প্রশ্ন করল, 'বাদশার হারেমের জেনানা, পায়দল যাচ্ছেন কেন ভাইসাব? গাড়ি পাও নি?'

'গাড়ি কোথায় বলো? এই হ্যাঙ্গামে কি কোন গাড়ি আসতে চায়?'

বলতে বলতেই দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল আগা। হয়ত ওর সেই ব্যস্ততাই কাল হ'ল। একের সন্দেহ অপরের মনে ছড়িয়ে পড়ল।

'এই রোকো রোকো—রুখ্ যাও!' পেছন থেকে কর্কশ পুরুষ কণ্ঠে হুকুম হ'ল, 'আমরা দেখব তোমার কথা সত্যি কি মিথ্যে—তুমি আমাদের সঙ্গে বেইমানী করছ কি না। তাছাড়া ওর পা-টাই বা এত ফরসা দেখাচ্ছে কেন? এই আঁধেরাতেও একদম সফেদ্ মালুম হচ্ছে। মেমসাহেবের মতোই সাদা যেন—।'

আর দেরি করার সময় নেই, কোন সঙ্কোচেরও না। চোখের পলকে পরিস্থিতিটা বুঝে নিল আগা, সে আর সঙ্কোচও করল না, লীসন মেমসাহেবকে পাঁজাকোলা ক'রে কোলে তুলে অশ্বের মতো ছুটল ঘাটের দিকে।

সৌভাগ্যের বিষয় দরিয়ার সামনেই এসে পড়েছিল ততক্ষণে, সামনেই যমুনার কালো জল—একটা নৌকোর মতোও কী যেন দেখা যাচ্ছে সামনে। আর একটু এই-

টুকু কি দয়া করবেন না ঈশ্বর, এইটুকুর জন্যে এত আয়োজন ব্যর্থ করে দেবেন?

ততক্ষণে সিপাহীরা হৈ হৈ ক'রে ওদের পিছু নিয়েছে। তবে একটা সুবিধা এই যে, অত্যধিক সুরাপানের ফলে কারুরই পায়ের অবস্থা ভালো নয়—অবাধ্য চরণ কিছুতেই যথেষ্ট জোরে চালাতে পারছে না কেউ, ঠিক মতো পড়ছেও না সেগুলো। এদিকে আগাও দৌড়চ্ছে প্রাণপণে, তার হাতে অত বড় বোঝা—কিন্তু সে সময়টায় যেন মত্তহস্তীর বল এসে গেল ওর দেহে—ও প্রাণপণে ছুটে, সিপাহীর দল কাছে আসবার আগেই পৌঁছে গেল নদীর ধারে। আছে, আঃ—সত্যিই একটা ডিঙি নৌকো বাঁধা আছে একটা খুঁটিতে—নৌকোর মালিকও সৌভাগ্যক্রমে অনুপস্থিত। কাঁধের বোঝা একরকম নৌকোর ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আগা দড়ি-বাঁধা খোঁটাটা প্রাণপণে উপড়ে তোলার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু যত সহজে সেটা উঠে আসবে ভেবেছিল—তত সহজে এল না। সাধারণ খোঁটার থেকে এটা যেন একটু বেশী লম্বা, অনেকখানি মাটিতে পোঁতা আছে। দড়ির বাঁধন জটিল—খোলা দুঃসাধ্য!

সে টানাটানি করছে পাগলের মতো—তার মধ্যে ওরা অনেকখানি কাছে এসে পড়ল। ততক্ষণে ওদের কিছু বুদ্ধিও খুলে গেছে সুরামত্ত মস্তিষ্কে। পর পর দুটি গুলি ছুঁড়ল দুজন। তবে কিনা হাতও পায়ের মতো বেঠিক, তাই গুলি দুটো আগার দুপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। কোনটাই লাগল না গায়ে। তবু এমনভাবে বেশীক্ষণ ভাগ্যের ওপর বরাত দেওয়া চলবে না—এটা ঠিক, আর একটু কাছে এসে পড়লে কিছুতেই ঠেকাতে পারবে না ওদের। আগা তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে খুঁটিটা তোলবার চেষ্টা করতে লাগল—

নৌকোয় পড়বার প্রথম আঘাতটা সামলে নিয়ে মিসেস লীসন এতক্ষণে একটু সুস্থ হয়েছেন, বুদ্ধিটা প্রথম তাঁর মাথাতেই এল, তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তলোয়ার, আগা তোমার তলোয়ার রয়েছে সঙ্গে—দড়ি কেটে ফেল—'

তাও তো বটে! নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেরই গালে-মুখে চড়াতে ইচ্ছা করল আগার। এ কথাটা এতক্ষণ তার মাথাতে যায় নি, আশ্চর্য। সে ক্ষিপ্র-হস্তে তলোয়ার খুলে দড়িটা কেটে ফেলল, কিন্তু তখন ওরাও এসে গিয়েছে কাছে, দুদিক থেকে দু'জন লাফিয়ে পড়েছে জলে। আগা নৌকোটাকে প্রাণপণে জলের দিকে ঠেলে দিয়ে চাপা গলায় বলল, 'দোহাই মেমসাহেব, আপনি নৌকোটা একটু বেয়ে মাঝদরিয়ায় পড়বার চেষ্টা করুন, ওখানে স্রোত পাবেন। স্রোতে চলে যাবে নৌকা আপনা-আপনিই। আমি যেতে পারব না সঙ্গে, এদের ঠেকাতে হবে।'

সত্যিই তখন আর সময় ছিল না, দুটো লোক নৌকোর একেবারে কাছে এসে পড়েছিল, ধরেও ছিল প্রায় গলুইটা—আগার তলোয়ার বিদ্যুৎবেগে এসে পড়াতেই সে উদ্যত হাত দু'টুকরো হয়ে খসে পড়ল জলে। আর একজন ওদিক থেকে সাঁতরে নৌকোর দিকে এগোচ্ছিল, তার কাঁধে প্রচণ্ড এক খোঁচা দিয়ে তার সাঁতারের প্রবৃত্তি খর্ব করে দিল আগা।

আহত ঐ দুটি লোকের আর্তনাদ নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল তা বলাই বাহুল্য। সে শব্দ নদী পার হয়ে অপর তীরের মাঠ জঙ্গল জনপদের বহুদূর পর্যন্ত যেন প্রতিধ্বনির তরঙ্গ বিস্তার করল। সেই শব্দেই এদেরও নেশা কেটে গেল। দেখতে দেখতে—আরও তিনচারজন সিপাহী হুঙ্কার ছেড়ে সঙ্গীন উঁচিয়ে নদীতে নেমে পড়ল—দু'একজন পার থেকে আন্দাজ গুলি চালাল।

তা হোক, আগার আসল দুশ্চিন্তার কারণ দূর হয়েছে। এবার ওদের লক্ষ্য আগা, ক্রোধ এবং প্রতিহিংসা প্রকৃতিস্থ ক'রে দিয়েছে ওদের, বোধ করি নিজেদের সদ্য উপলব্ধ শক্তির অহঙ্কারেও আঘাত লেগেছে অনেকখানি। ওরা ক্রূর শ্বাপদের মতোই নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। আগা চোখের নিমেষে অবস্থাটা বুঝে নিল একবার। মিসেস লীসন সম্ভবতঃ নৌকো বাওয়া কিছু কিছু জানেন। নিতান্ত অনভ্যস্ত হাতে দাঁড় তুলে নিয়েছেন বলে মনে হয় না। আর সামান্য কিছুক্ষণ সময় পেলে মাঝ দরিয়ায় গিয়ে পড়তে অসুবিধে হবে না ওঁর। এমনিতেই অন্ধকারে আর নদীর কালো জলে কালো নৌকা ও কালো বুরখা একাকার হয়ে গিয়েছে, দাঁড়ের শব্দ ছাড়া আর কিছুতে বোঝবার উপায় নেই ওঁর অস্তিত্ব।

আগা সেই সময়টুকু দেবার জন্য প্রস্তুত হল। তলোয়ার মাত্র সম্বল বন্দুক-ধারীদের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফেললও দুটো বন্দুক জলের মধ্যে, বোধহয় আরও একজনের হাত কাটা গেল—কিন্তু তা আর তাকিয়ে দেখার অবসর হ'ল না আগার। পাড় থেকে গুলিবৃষ্টির পরিমাণ বেড়েই চলেছে, নিতান্ত দৈবক্রমেই এতক্ষণ রক্ষা পেয়েছে। তার চির-প্রতিকূল ভাগ্যকে আর এমন ভাবে লোভ দেখানো ঠিক নয়। সে আর দ্বিধা করল না, তড়িত গতিতে ওদের এড়িয়ে যথেষ্ট ব্যবধান রেখে ঘুরে গিয়ে আবার লোকালয়ের দিক ধরে ছুটতে লাগল।

একটা গলির মধ্যে ঢুকে একবার মাত্র চোখ ফিরিয়ে দেখেছিল। সিপাহীর দল ক্রূর পশুযূথের মতোই একসঙ্গে তার দিক লক্ষ্য করে ছুটছে। নৌকোর কথা সম্ভবতঃ ওদের মনেও নেই আর। ঈশ্বরকে আর একবার ধন্যবাদ জানিয়ে সে দরিয়া-গঞ্জের আঁকা-বাঁকা গলি-ঘুঁজির মধ্যে আত্মগোপনের চেষ্টা করল।

অবশ্য দৌড়ল না বেশীক্ষণ। কারণ সেটা মূর্খতা, বিপদ হাত বাড়িয়ে টেনে আনা। নদীতীরের সেই ঝাপ্‌সা আলো-আঁধারিতে ওর মুখ নিশ্চয়ই কেউ দেখতে পায় নি ভাল করে। সুতরাং আলোয় দেখলে চিনতে পারবে সে সম্ভাবনা নেই। বরং এমন ভাবে ছুটলে আশপাশের বাড়ির লোক সন্দেহ করবে, তারাই ধরিয়ে দেবে সিপাহীদের ডেকে। নিজেদের বাঁচাবার জন্য করবে আরও—সিপাহীদের দলকে তুষ্ট রাখতে। পাড়া যতটা নিস্তব্ধ ততটা জনহীন নয়। বহু বাড়ি এখনও অক্ষত দাঁড়িয়ে আছে, এগুলো ক্রীশ্চানের বাড়ি নয় বলেই অব্যাহতি পেয়েছে হয়ত—সুতরাং সব-গুলো না হোক, কিছু কিছু বাড়িতে অধিবাসীরাও আছে। শুধু লুটেরাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ভয়েই যথাসাধ্য প্রচ্ছন্ন আছে। কে জানে ঐ সবকটা রুদ্ধ জানলার ফাঁকেই হয়ত কয়েক জোড়া ক'রে চোখ তাকে লক্ষ্য করছে। আর এ বিশ্বাস আরও দৃঢ়মূল হল—অমনি এক অন্ধকার, আপাত-জনহীন বাড়ি থেকে নাক-ডাকার শব্দ পেয়ে।

সে একটা সংকীর্ণ গলিতে দাঁড়িয়ে পড়ে একটু দম নিল, তারপর জেব থেকে একটা রুমাল বার করে তলোয়ারটা মুছে খাপে পুরে মুখে যতটা সম্ভব সহজ প্রশান্তি ফুটিয়ে তুলে আবার আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করল।

নিশ্চিন্ত বোধ করার কারণও আছে অবশ্য—এতক্ষণ যে বহু নাল-বাঁধানো জুতোর শব্দ ওর পিছনে এগিয়ে আসছিল, সেটা এবার দূরের দিকে মিলিয়ে যাচ্ছে—অর্থাৎ ওরা পথের হদিস হারিয়ে অন্য পথে চলে গেছে, ছায়াকে কায়া মনে ক'রে আর কোথাও বৃথা ওর অন্বেষণ করছে।

॥ উনিশ ॥

ঘুরতে ঘুরতে কোথায় এসে পড়েছিল তা আগা প্রথমে অতটা বুঝতে পারে নি। হঠাৎ এক সময়ে একটা বড় বাগানবাড়ির সামনে এসে পড়ায় ওর সম্বিৎ ফিরল। এ বাগানবাড়ির সঙ্গে এক অতিবড় দুর্দিনের স্মৃতি জড়ানো তার, এই বাড়ির সু-উচ্চ প্রাচীর একদা তাকে ঘোর বিপদে আশ্রয় দিয়েছিল, কিছুকালের জন্য অন্ততঃ। লীসন সাহেব পরে তাকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন, বাবু মাধব দাসের বাগানবাড়ি।

এমনিই বিশেষ কেউ থাকে না এ বাগানে, আজ তো থাকবেই না, আগা পাঁচিল টপকে নেমে পড়ল। এর ওদিকেই চোরা বাজার—কয়েকটি সঙ্কীর্ণ গলিপথের গোলক-ধাঁধাঁ। সেখান থেকে বেরিয়ে খানিকটা ঘুরে গেলে আজমীরী দরওয়াজা।

সেই পথ ধরল আগা, এবং আজমীরী দরওয়াজা পৌঁছতে খুব বেশী দেরিও হ'ল না তার।......

ওখান থেকেই ফিরে শহরে ঢোকবার কথা, দেরীও হয়ে গেছে ঢের, হয়ত এতক্ষণে কিল্লার কেউ খোঁজ ক'রে থাকবে তার, অবশ্য আজ এই গন্ডগোলে কেইবা কার খবর রাখছে—তবু তারও তো একটা দায়িত্ব আছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কিল্লায় ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু তবু যাওয়া হ'ল না। দরওয়াজার কাছ থেকেই নজরে পড়ল—খানিকটা দূরে একটা বিরাট হট্টগোল হচ্ছে।

একেবারে কাছে নয় অবশ্য। সে গন্ডগোলের মধ্যে ওর না ঢুকলেও চলত। আর কোন হাঙ্গামার মধ্যে জড়ানো বা কাছে যাওয়াও এখন ওর পক্ষে যুক্তিযুক্ত নয়, খানিকটা গেলও সে নিজের পথে এগিয়ে—কিন্তু আবারও তাকে ফিরতে হল। চির-বিরূপ অদৃষ্ট তার সেদিন তাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না বলেই বোধহয় কৃত-সঙ্কল্প। কারণ সেই নানা কণ্ঠের মিলিত কোলাহলের মধ্যে মনে হ'ল যেন দিল মহম্মদের গলা শুনতে পেল সে। সকলের গলা ছাপিয়ে উঠছে তার বলিষ্ঠ এবং উদাত্ত কণ্ঠস্বর।

হয়ত ভ্রম হয়ত তার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের ইচ্ছাতুর · কল্পনা। নিজের ঐকান্তিক আবেগেরই প্রতিক্রিয়া। যাই হোক, তবু ফিরতে হ'ল তাকে। এতকাল প্রতি দিন-রাত্রি ওদের সংবাদের জন্যে ছটফট্ করেছে সে, এখন খবর শুধু নয়,—তাদের দেখা পাবার একটা সম্ভাবনা হোক না তা সুদূর পরাহত—হাতের কাছে পেয়েও ছেড়ে দেবে সে?

আজমীরী দরওয়াজা দিয়ে সেই দুর্দিনেও বিস্তর রাহী চলাফেরা করছে—তত রাত্রেও। তাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ গোছের লোককে ধরে প্রশ্ন করল, 'বড়ে মিঞা, ঐ যে ওখানে হল্লা হচ্ছে, ওর পিছনে ওদিকটা ও কী পাড়া? শহরের বাইরে তো দেখছি, ওটা কি কোন গাঁ—না অন্য কোন শহর?'

বড় মিঞা সেই অন্ধকারেই যতখানি সম্ভব ওর চেহারাটা আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করতে করতে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'তুমি বুঝি শহরে নতুন এসেছ? এলবা পোশাক দেখে সিপাহী মনে হচ্ছে। তোমরাই বুঝি আজ মীরাট থেকে এসে

পে'ীচেছ সকালে? আংরেজদের সঙ্গে লড়বে বলে?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, নতুন লোক না হ'লে আর জিজ্ঞাসা করব কেন?' একটু অসহিষ্ণু ভাবেই বলল আগা।

বড়ে মিঞা কিন্তু ওর অসহিষ্ণুতায় কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না, বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে ধীরে সুস্থে পুনশ্চ প্রশ্ন করলেন, 'তা সিপাই যদি তো বন্দুক নেই কেন?'

ম'নে হল আজ সারাদিন এই শহরের ওপর দিয়ে যে উন্মত্ত তাণ্ডব বয়ে গেছে তার খবর পর্যন্ত রাখেন না মিঞা সাহেব। শান্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবন তাঁর—অবসরেরও অভাব নেই জীবনে।

আগা কিন্তু বিরক্ত হয়ে উঠল। এই শ্রেণীর মানুষ সে চেনে। তোমার যত ব্যস্ততাই থাক, নিজের কৌতূহল না মিটিয়ে কারও কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে অভ্যস্ত নয় এরা। সে এবার বেশ একটু ভয় দেখানোর ভঙ্গীতেই কোমরের তলোয়ারে হাত দিয়ে বলল, 'বন্দুক না থাক, অন্য হাতিয়ার তো আছে, তোমার মতো দশটা লোককে ঘায়েল করার পক্ষে যথেষ্ট। নমুনা দেখতে চাও সে হাতিয়ারের?'

'তওবা, তওবা।' বড়ে মিঞা সভয়ে দু'পা পিছিয়ে যান। বার বার মাফ চেয়ে নিয়ে জানান জনাব যেন বান্দার অপরাধ না নেন, গুস্তাকী না ধরেন। জনাব যে তাকৎ ও মদৎদার জঙ্গী জওয়ান তা কি আর তিনি জানেন না—না বুঝতে পারেন নি? কথাটা এমনি নিছক কৌতূহলবশতঃ জিজ্ঞাসা করেছিলেন মাত্র। এবারের লড়াইটা ওঁরা তলোয়ার দিয়েই সারবেন, না বন্দুকও ব্যবহার করবেন সেইটেই জানতে চেয়েছিলেন শুধু। মানে সেই অপবিত্র চর্বি মাখা কার্তুজ ব্যবহার করবেন কি না—

বৃদ্ধের বাক্য-স্রোত বন্ধ করবার অন্য কোন উপায় না পেয়ে আগা তাঁর দিকে পিছন ফিরে—গোলমালটা যেখানে হচ্ছে সেদিকে লক্ষ্য ক'রেই পা চালাল।

'আহা আহা, জনাব কি নারাজ হলেন বুড়ো নৌকরের ওপর?...বুড়ো মানুষ, একটু বেশী না বকে থাকতে পারে না।...শুনুন, শুনুন, বাৎলে দিচ্ছি, ও মহল্লাটা শহর দিল্লীর মধ্যেই—শাহ্‌জাহনাবাদের বাইরে অবশ্য—তবু দিল্লীই। পাহাড়গঞ্জ নাম জায়গাটার। ঐ যে সফেদ বড় দরগাটা দেখা যাচ্ছে—ঐখান থেকে পাহাড়গঞ্জ শুরু। কত আর দূর হবে, এখান থেকে পাঁচশ' গজ হোক বড় জোর।'

আর শোনে না আগা, শোনবার দরকারও বোধ করে না। পাহাড়গঞ্জেই তো দিল মহম্মদরা উঠেছে এসে—গঙ্গাপ্রসাদের মা বলেছিলেন। তা'হলে কিছুমাত্র ভুল হয় নি আগার—খোয়াবও দেখে নি সে। ঠিকই শুনেছে দিলুর গলা। নিশ্চয়ই তার দরাজ-দিল বন্ধু কোথায় কোন পরের জন্যে হাঙ্গামা বাধিয়ে তুলেছে—

সে হন্ হন্ করে এগিয়ে গেল। জায়গাটা ঠিক পাহাড়গঞ্জের মধ্যে নয়, মহল্লায় ঢোকবার মুখে। একটা বড় বাড়ির নিচে সার সার কতকগুলি দোকান—সব কটাই বন্ধ অবশ্য—তাদেরই একটার সামনে জটলা। বেশ গোটাকতক মশাল এসে গিয়েছে—সুতরাং দেখার কোন অসুবিধা হল না। কাছে গিয়ে দেখল ভীড় একটা নয়, দু'টো। একটা ভীড় ভেতরদিকে, ঠিক দোকানের সামনে—গোলমাল হাঙ্গামাটা সেখানেই আসল : আর একটা ভীড় বাইরে, ঐ জমায়েৎ থেকে বেশ খানিকটা ব্যবধান রেখে দূরে অর্ধবৃত্তাকারে রচিত হয়েছে। এরা কাছাকাছি এই পাহাড়েই অধিবাসী, বেশির ভাগই মজা দেখতে এসেছে মাত্র। সেই জনাই খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখেছে অর্থাৎ

কোন হাঙ্গামায় নিজেদের না জড়িয়ে পড়তে হয়, বেগতিক দেখলেই যাতে ছুটে পালাতে পারে।

আগা বাইরের বেষ্টনী ভেদ ক'রে কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখল তার অনুমানই ঠিক। এই হাঙ্গামায় এক পক্ষে তার বন্ধু দিলমহম্মদ আছে অথবা বলা যায় সে একাই এক পক্ষ। একটা দোকানের বন্ধ দরজার সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে দরজায় পিঠ দিয়ে—আর তার সামনে অন্ততঃ দশ-বারোজন সশস্ত্র সিপাহী। উদ্যত সঙ্গীন সেই দশ-বারোটি বন্দুক দিলুর দিকে লক্ষ্য ক'রে উঁচিয়ে ধরে আছে তারা, ঘোড়া টেপবার ঠিক পূর্ব অবস্থা। সকলেরই ক্রুদ্ধ ভঙ্গী, গালি-গালাজও করছে কেউ কেউ। কিন্তু তাদের সে মিলিত কণ্ঠের ওপর গলা তুলেছে দিলমহম্মদ, চড়া গলায় দৃপ্ত বক্তৃতার ভঙ্গীতে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে সে। আগা লক্ষ্য ক'রে দেখল যে তার দোস্ত একেবারেই নিরস্ত্র, হাতে একগাছা লাঠি পর্যন্ত নেই। আর তা নেই বলেই বোধহয়—একেবারে শুধু হাতে এতগুলি বন্দুকধারীর সামনে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে তাদেরই তিরস্কার করতে দেখে, কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে এরা—এখনও কেউ এগিয়ে গিয়ে ওকে টেনে সরিয়ে দিতে বা গুলি করে মারতে পারছে না।

আগা কাছে এগিয়ে এসে শুনল, দিলমহম্মদ বলছে, 'ভাইসব, আমার কাছে এই সাফ সাফ কথা, আমি গাজীমণ্ডীর দিলমহম্মদ—গাজীমণ্ডীর আশেপাশের দশখানা গাঁয়ের লোক জানে দিলমহম্মদের যে কথা সেই কাজ—আর দিলমহম্মদেরও এক কথা, তার জান থাকতে এ দোকান সে লুঠ করতে দেবে না।...সিপাহী ভাইয়া সব, তোমরা ভুলে যেও না যে তোমরা কি মহান কাজে নেমেছ, আংরেজের জুয়াচুরির শাসন ঘুচিয়ে আবার এদেশে মহান বাদশার শাসন কায়েম করতে হবে তোমাদের। এ খুব সহজ কথা নয়। উত্তম কাজ, কিন্তু তুড়ি মেরে বাগাবার মতো কাজ নয়। তা হোক, হিন্দুস্তানের বীর সন্তান তোমরা—জঙ্গী জওয়ান মরদ বাচ্চা সব। কর্তব্য যত কঠিনই হোক, তোমরা তা পালন করতে পারবে জানি। কিন্তু ভাইসব, তোমরা জঙ্গী মরদ, লড়াই করতে শিখেছ, লড়াই তোমাদের পেশা,—তোমরা ঝুটা আংরেজের লড়াই দিয়ে দেখিয়ে দাও যে তোমাদের হিম্মৎ তাদের চেয়ে কম নয়। তাদের মারো লড়াই ক'রে—বহুত আচ্ছা, কিচ্ছু বলবার নেই আমার। কিন্তু তাদের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া, কতকগুলো আওরৎ আর বাচ্চাকে মারা, এ তো ইনসানের কাজ নয়, এ তো কসাইয়ের কাজ। না হয় তাও হ'ল—তাদের ওপর রাগ থাকে সবাইকে মারো, সেও একরকম মানে হয় তবু—লুঠ করবে কেন তোমরা? সামনে কতবড় কাজ পড়ে রয়েছে, তোমরা জওয়ান মরদ—সে সব ফেলে এ ছোট কাজে নামবে কেন? এ তো লুটেরার কাজ। লুটেরা চোর তো সবার ঘৃণিত, মানুষের শত্রু, সমাজের শত্রু। এ কাজ কি তোমাদের সাজে!'

'আরে এ পীর পয়গম্বর এলো কোথা থেকে! ওহে মুলুকী ফকীর সাহেব, এ সব এসাইয়ের দোকান। এ লুট করা পুণ্যের কাজ।' কে যেন বলে উঠল ভীড়ের মধ্যে থেকে।

আর একজন বলল, 'এ বেটাও নিশ্চয় এসাই। দে বেটাকে খতম ক'রে।'

যেন সিংহ-গর্জন করে উঠল দিলমহম্মদ, 'খবরদার! আমি মুসলমান, সত্যাশ্রয়ী, সত্য বিশ্বাসী। আর খাঁটি মুসলমান বলেই আমি কোন ছোট কাজ করতে বা করতে দিতে রাজী নই। অকারণে নিরীহ লোকের সর্বনাশ করার চেয়ে ছোট কাজ কী থাকতে পারে। হ্যাঁ, এ লোকটা এসাই, কিন্তু সে তার বিশ্বাসের কথা, কিন্তু মানুষটা

খাঁটি হিন্দুস্তানী, তার সাত পুরুষের বাস এখানে। সে আংরেজদের দান নিয়েছে বলে আমাদের পর হয়ে গেল? আর তাছাড়া আমি জানি, লোকটা গরীব—কিন্তু খাঁটি লোক বলে মহাজনরা ভালবাসে, বিশ্বাস করে। এ দোকানের বেশির ভাগ মালই তাদের, বেচে দাম নেবার কড়ারে এনে তুলে দিয়েছে। গেলে তাদেরই যাবে, এ লোকটার এমন কোন সামর্থ্য নেই যে এ দেনা কোন দিন শোধ করতে পারবে। তাহ'লে ভাই, লুকসানটা হচ্ছে কার, তোমরা দেখ!'

'আরে, এ বেত্তমিজটা তো জ্বালিয়ে খেলে দেখছি।'

'পাগল, পাগল! দেখছ না এলোমেলো বকছে!'

'দাও না, সঙ্গীনের একটা খোঁচা, পাগলামী বেরিয়ে যাক একেবারে।' ইত্যাদি নানা কথা শোনা যেতে লাগল এবার।

সত্যি সত্যিই দু'একজন এগিয়ে গেল ওর দিকে খানিকটা।

আগা বুঝল আর ইতস্ততঃ করার সময় নেই। সে সবাইকে ঠেলে সরিয়ে একেবারে প্রথম বেষ্টনী অর্থাৎ সিপাহীদের পাশে এসে দাঁড়াল।

'কী, ব্যাপার কি! এসব কি হচ্ছে এখানে?'

'তুমি আবার কে এলে বাবা, নবাব খাঞ্জা খাঁর মতো মেজাজ দেখাতে! বলি মাটি ফুঁড়ে উঠলে নাকি বাবা, আমাদের হকের ধনে ভাগ বসাতে? কই এতক্ষণ তো তোমার টিকি দেখি নি! ওসব হবে-টবে না ভাই। আগে থেকে বলে রাখছি।'

আর একজন একটু ঠাহর ক'রে দেখে বলল, 'তোমাকে দেখে তো সিপাহী বলেই বোধ হচ্ছে, কিন্তু তোমার পোশাক-আসাক তো খুব জমকালো! কী করো তুমি? কোথায় থাকো?'

'আমি বাদশার খাশ দেহরক্ষী বাহিনীর হাবিলদার। এ পোশাক সে ফৌজেরই। কিন্তু সে কথা থাক, তোমরা কি করছ এখানে? এই সামান্য পুঁটিমাছ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ আর ওধারে রুই কাৎলা কাবার হয়ে যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাগলটার সঙ্গে তকরার ক'রে এই মহামূল্য সময় নষ্ট করছ! ওটাকে ধ'র দু'চার ঘা দিলেই তো মামলা চুকে যেত। ও বদ্ধ পাগল, ওকে আমি ভাল রকমই চিনি।......কিন্তু সেও যাক। ওধারে পাহাড়গঞ্জ কোতোয়ালীর দারোগা মুইনুদ্দীন যে তোমাদের চোখে ধুলো দিয়ে দু'দুটো সাহেবকে বস্তায় পুরে পার ক'রে দিলে, তোমরা তার খবরও রাখলে না। তার মধ্যে খোদ কালেকটার সাহেবও পেরিয়ে চলে গেলেন, সাক্ষাৎ হাচিনসন সাহেব। তাও, শুধু যদি দুটো হারামীর বাচ্চা আংরেজই যেত তো অত দুঃখ ছিল না, সেই সঙ্গে সরকারী খাজনার দু'বস্তা টাকাও যে লোপাট হয়ে গেল। তোমাদের কানের পেছন দিয়ে চলে গেল, তোমরা টেরও পেলে না। ছিঃ ছিঃ! সেই সময়টা এই তিন পয়সার দোকান নিয়ে মেতে রইলে!'

সিপাহীরা দোকান এবং দিলুর দিকে পিছন ফিরে আগাকে ঘিরে দাঁড়াল। দু'-তিনজন ওর হাত, কনুই, কাঁধ—সামনে যা পেল চেপে ধরল।

'কই, কই, কোথায়? কখন গেল? কোথা দিয়ে গেল? কতদূর গেল? কোনদিকে গেল?'

অসংখ্য প্রশ্ন বর্ষিত হ'তে লাগল চারিদিক থেকে। ব্যগ্র ব্যাকুল প্রশ্ন সব।

ভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময়েই বহুদূরে ঘোড়ার গাড়ি যাবার একটা ক্ষীণ শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আসলে সেইটে শোনার ফলেই চট্ ক'রে কথাটা খেলে গিয়েছিল আগার মাথাতে। ভাগ্যক্রমেই বিকেলে শোনা উড়ো নাম দু'টো এখনো পর্যন্ত মনে থেকে

গিয়েছিল। সে আন্দাজে আন্দাজে অন্ধকার শহরের একদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'ঘোড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছ না? ভারী গাড়ি যাওয়ার আওয়াজ একটা? কালেক্টার সাহেবের গাড়ি! কান পেতে শোন একটু। তাহলেই শুনতে পাবে।... আশ্চর্য! এখান দিয়েই তো গেল বলতে গেলে—কিছু শুনতে পাও নি? নেশায় বুঁদ হয়ে ছিলে নাকি?...কী বলব, আমার সঙ্গে যদি আর একজনও লোক থাকত—ওদের দুটো পিস্তলকে পরোয়া করতুম না তাহলে।'

আর কিছু বলতে হ'ল না। সব ক'জন সিপাহীই ঊর্ধ্বশ্বাসে সেই অনিশ্চিত অন্ধকারের মধ্যে—ক্ষীণ দূরাপস্রিয়মান একটা অশ্বপদ-শব্দ লক্ষ্য ক'রে ছুটল। দেখতে দেখতে কয়েক মিনিটের মধ্যে তাদেরও আর চিহ্ন দেখা গেল না। সেই সঙ্গে ভীড়ও অনেকখানি পাত্‌লা হয়ে গেল। যারা তামাশা দেখতে এসেছিল, তারা খানিক হতাশা নিয়েই বাড়ির পথ ধরল।

বিস্ময়ে বেদনায় এতক্ষণ দিলমহম্মদের বাক্যস্ফূর্তি হয় নি। কথা বলার সুযোগও মেলে নি অবশ্য। সে এবার অভিমানক্ষুণ্ণ স্বরে বলে উঠল, 'আগা ভাইয়া, তুমি খামকা এতগুলো লোকের সামনে বেইজ্জত করলে! আমাকে পাগল বললে! বাদশার নৌকরী নিয়ে দুদিনেই তোমার দিমাগ এমন বিগড়ে গেল!'

ভীড় কমলেও দুচারজন কৌতূহলী লোক তখনও রগড় দেখছিল দাঁড়িয়ে। তাদের দিকে ফিরে আগা বললে, 'শুনলে তোমরা! বলছি না লোকটা আমার চেনা! বড়লোকের ছেলে, এই পাগলামী ছিটের জন্যেই ওর সব বরবাদ হয়ে গেল। কাজ-কর্ম কিছুই দেখে না—নেশাভাঙ্ ক'রে বেড়ায় আর পাগলামীর খেয়াল চাপে যখন মাথায়, এমনি বক্তৃতা করে। ওর মা বেচারী কত কান্নাকাটি করে তার ঠিক নেই!'

তারপর একেবারে দিলুকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'চলো দোস্ত্, তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

দিলমহম্মদ ওর বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করতে করতে মুখটা গোঁজ ক'রে বলে, 'কোই জোরুরৎ নেহি ইৎনা মেহেরবানী'ক—আপনা কামমে যাইয়ে। কাজের মানুষ তুমি, তোমার সময় নষ্ট করে লাভ কি। আমার পাগলামী আর নেশা যখন ছুটবে আমি তখন যাবো।'

আগা তাকে জোর ক'রে টেনে রাস্তায় নেমে পড়ে, কানে কানে বলে, 'চলো, চলো, দেখছ না—বেশী দেরি করলে আমি সুদ্ধ ফ্যাসাদে পড়ব। ওসব কথা ওখানে না বললে কি আর তোমাকে বাঁচাতে পারতুম?'

তবুও দিলুর অভিমান যেত চায় না। সে যায় বটে আগার সঙ্গে কিন্তু বেশ খানিকটা যেন অনিচ্ছাতেই। বলে, 'তা ঐ কি হাঁচি সায়েব না কি বললে. তার কথা বললেই তো হ'ত, তাতেই তো ছুটত ওরা—আমাকে পাগল বানাবার কি দরকার পড়ল!'

'আরে পাগল, শুধু কালেক্টার ধরবার জন্যে যদি সবাই না যেত ওরা শেষ পর্যন্ত? আমি অত ঝুঁকি নেব কোন ভরসায়? তোমার জানটাই যে চলে যেতে বসেছিল আর একটু হ'লে। পাগল না বললে ভাবত তোমার সঙ্গে আমার ষড় আছে, দোস্তি আছে, আমার ওপর সুদ্ধ হামলা করত। ক্রিশ্চানদের দোকান বাঁচাতে যাচ্ছ আজকের দিনে—ঐ যারা দূরে ভীড় ক'রে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল, তারাও এগিয়ে এসে লাগত কিছু ভাগ পাওয়ার আশায়। তাদেরও লোভ কি কম—মুফতে খানিকটা মাল পেলে কে সুযোগ ছাড়ে বলো!'

অর্ধ-অবিশ্বাসের সুরে দিলু প্রশ্ন করে, 'তা'হলে তুমি আমাকে বাঁচাবার জন্যেই—? মানে সত্যি সত্যিই পাগল ভাবো না?'

'তুমি দোস্ত চিরদিনের পাগল। নইলে মাথার একটুও ঠিক থাকলে কি আর কেউ আমার মতো লোককে ঘরে ঠাঁই দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়? না সর্বস্বান্ত হয়েও সেই বিপদ ঘাড়ে বয়ে নিয়ে বেড়ায়? না কি কোথাকার কোন্ অপরিচিত এসাইয়ের দোকান বাঁচাতে চোদ্দটা বন্দুকের সামনে বুক পেতে দিয়ে দাঁড়ায়?'

হা-হা ক'রে অট্টহাস্য ক'রে ওঠে দিলু, তার বুক থেকে সংশয়ের বোঝাটা নেমে গিয়ে সে আপন সহজ সত্তায় ফিরে এসেছে এতক্ষণে, 'ও, এই পাগলামি? ওটা আমার থাকবেই আগা ভাইয়া—তা তুমি যতই বলো। আমি যতদিন আছি আমার স্বভাবও ততদিন থাকিবে।'

নৈশ অন্ধকারে সেই জনহীন পাড়ায় বহুদূর অবধি প্রতিধ্বনি হতে থাকে দিলুর সেই অট্টহাস্য। তাড়াতাড়ি তার মুখে হাত চেপে দিয়ে আগা বলে, 'চুপ চুপ! এতক্ষণে সিপাইরা হয়ত জোচ্চুরীটা বুঝতে পেরে গেছে। এই হাসির শব্দ ধরে আবার এদিকে ছুটে আসবে হয়ত। তাহ'লে আর রক্ষে থাকবে না।'

'জোচ্চুরী মানে? তাহ'লে ও হাঁচি সাহেবের খবরটা সত্যি নয়?'

'মাথা খারাপ! ওদের পাশ দিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি গেল আর ওরা টের পেল না! সত্যিই কি আর এমন হয়! তাছাড়া ওসব সাহেব-সুবাদের আমি চিনবোই বা কি ক'রে? নামগুলো শোনা আছে এই পর্যন্ত। কিন্তু সে কথা যাক্—তোমার বাসা কোথায় তাই বলো, ওরা সব ভালো আছে তো?'

'বিলকুল! আমি যখন ভাল আছি ওরা ভাল না থেকে পারে?...বাসা আমার এই কাছেই। এসেই পড়েছি প্রায়। গেলেই দেখতে পাবে কেমন আছে। তবে ভাই সাফ কথা, বাসায় ফিরতে একদম মন চায় না। আমি পথের মানুষ, পথই আমার ভালো। আসল কথা তোমার সেই সেপাই বোনের সঙ্গে আমার একতিল বনছে না। আদর দিয়ে দিয়ে তোমরা বোনটিকে এমনই মাথায় তুলেছ যে কাউকে গ্রাহ্যই করে না। নিজেকে যেন মনে করে শাহানশার মেয়ে, আর বুদ্ধির তো কথাই নেই, রাজা সলোমানের চেয়েও সে মাথাওয়ালা ভাবে নিজেকে।......আমি যা করতে চাইব তাতেই বাধা, তাতেই কেজিয়া! এ কী আর ভাল লাগে? এরকম হ'তে থাকলে একদিন ঘর বাড়ি ছেড়ে দরবেশ দিওয়ানা হ'য়ে একদিকপানে চলে যাবো—এই বলে রাখছি, হ্যাঁ! তখন কিন্তু আমাকে দোষ দিতে পারবে না।'

আগা কিছুটা বিস্মিত এবং কিছুটা শঙ্কিত হয়ে তাকায় ওর মুখের দিকে। কিন্তু সে মুখে বিরক্তি বা বৈরাগ্যের লেশমাত্র দেখতে না পেয়ে আশ্বস্তও হয় সঙ্গে সঙ্গে। অতি কষ্টে হাসি চেপে কণ্ঠস্বরে যৎপরোনাস্তি পরিতাপের সুর এনে বলে, 'ইস্! দ্যাখো দিকি, কী অন্যায়! তোমার মতো লোকের জান পরেসান ক'রে ছেড়েছে বজ্জাত মেয়েটা! তা তুমি ওকে একটু শাসন করতে পার না? ওর জন্যেই বলতে গেলে তোমাকে দেশভুঁই ছাড়তে হয়েছে, এখন যদি ঘর সংসার ছাড়তে হয় তো তার চেয়ে আফসোসের কথা আর কি হতে পারে। আসলে তোমার আস্কারাতেই আরও বেড়েছে ছুঁড়ি। তোমার ঘর তুমি ছাড়বে কিসের জন্যে, ওকেই চুলের মুঠি ধরে রাস্তায় বের ক'রে দেবে এই তো কথা।'

'বাহ্বা! খুব তোমার বুদ্ধি তো ভাই আগা। চারদিকে দুশমন, এসব হাঙ্গামা হুজ্জৎ-এর মধ্যে আমি ঐ সোমত্থ মেয়েটাকে পথে বের ক'রে দেব? তার চেয়ে

সোজাসুজি জাহান্নমে পাঠিয়ে দিলেই হয়।...না, সে আমার দ্বারা হবে না, আমার জান থাকতে ওর চুলের ডগা কেউ ছোঁবে—সে আমি বরদাস্ত করব না।'

আগা এবার প্রকাশ্যেই মুখ টিপে হাসে, কোন উত্তর দেয় না।

এ গলি সে গলি পেরিয়ে এক সময় দিলু একটা সংকীর্ণতর গলির মধ্যে একটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে হাজির হয়। বাড়িটার বাইরের দিকে দোর জানালা সব বন্ধ। কোথাও কোন আলো জ্বলবার চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। মনে হয় না যে সে বাড়িতে কেউ বাস করে। সম্ভবতঃ ইচ্ছা ক'রেই এটা করা হয়েছে—শহরের এই হাঙ্গামার ভয়েই। কিম্বা সবাই এই গরমে ছাদে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে তাই আলো জ্বালবার কোন পাট নেই।

কিন্তু দিলু কোন সতর্কতার ধারও ধারে না। শিকল নেড়ে গৃহস্থকে সজাগ করারও ধৈর্য নেই তার। সে সেইখান থেকে হাঁক পাড়ে, 'আরে কাঁহা রে,—কাঁহা গিয়া? এ গুল,...হো গুল্লু মিঞা। জলদি বেরিয়ে আয়, বহুত জলদি! দ্যাখ্ এসে, কাকে ধরে এনেছি আজ!'

এই লোকের জন্যেই নাকি সে দেওয়ানা ফকির হয়ে বেরিয়ে যাবে। আগা মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়। তার স্বপ্ন সফল হয়েই আছে অর্ধেক।

দিলুর হাঁকাহাঁকিতে যেন ঘুমন্ত পুরীতে প্রাণের স্পন্দন জাগল। চটির শব্দ উঠল সিঁড়িতে, ভিতর থেকে খিল খোলার শব্দ হ'ল একটু পরেই—তারপর একটা তেলের বড় আলো হাতে গুল বেরিয়ে এল। প্রথমটা বিরক্তি, অসময়ে দিল কোন অতিথি ধরে এনেছে মনে ক'রে—তারপর অবিশ্বাস—তারপরই প্রচণ্ড বিস্ময় ও আনন্দ ফুটে ওঠে গুলের মুখে। বিভিন্ন ভাব নিমেষে নিমেষে পাল্টায় তার মুখের ওপর, ছায়াছবির মতো। তারপর সে আলোটা দেওয়ালের একটা গজালে ঝুলিয়ে রেখে ছুটে এসে আগাকে জড়িয়ে ধরে, 'দাদা!'

আগা হেসে স্মিত মুখে তার মাথায় হাত দিয়ে আদর করতে করতে বলে, মিছে কথা বলছে রে, ও আমাকে ধরে আনে নি। আমিই ওকে ধরে এনেছি। বীর পুরুষের কি আর আমার দিকে নজর ছিল, না বাড়ি ফেরারই ইচ্ছে ছিল। সদ্য মাটিতে যাবার জন্যেই উঠে-পড়ে লেগেছিলেন একেবারে। বাবু সাহেবের কত বীরত্ব, কে না কে ক্রেস্তানের দোকান বাঁচাতে বাবুসাব চোদ্দ-পনেরটা গুলিভরা বন্দুক আর সঙীনের সামনে বুক পেতে দাঁড়িয়েছিলেন শুধু হাতে। আমি গিয়ে না পড়লে আর খোদার দেওয়া বাতাস নাকে নিতে হ'ত না এতক্ষণ, ফোৎ হয়ে যেত।'

বড় কুপিটার আলোতে স্পষ্টই দেখল আগা—কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে গুলের মুখখানা ছাইয়ের মতো বিবর্ণ হয়ে উঠল, শিউরে কেঁপে উঠল কয়েকবার। এক লহমা যেন চোখ বুজে সামলে নিল নিজেকে। তারপরই দুই চোখের চাহনিতে বিদ্যুৎ ঝলকে উঠল একেবারে, 'ও, এই তোমার কাজকামে যাওয়া! ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলে আমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বেরিয়েছিলে তাহ'লে এই মতলবে! দাঁড়াও, তোমার বেরনো বার করছি আমি। আজ থেকে আর কোথাও বেরোবার নাম ক'রো দিকি—যে কদিন এই হ্যাঙ্গামা থাকে! ঘরের মধ্যে পুরে শিকলি দিয়ে রাখব এই বলে দিচ্ছি!'

'থাক্ থাক্—শাসনটা বাড়ির মধ্যে গিয়ে করবি চল, নইলে এক্ষুনি পাড়ার সকলে ছুটে আসবে।'

আগা জোর ক'রেই একরকম ওদের দু'জনকে নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে প'ড়ে কপাটটা বন্ধ ক'রে দেয়।...

আগার গলার আওয়াজ পেয়ে ওপর থেকে তার মাও ছুটে আসেন। কিন্তু দিলুর মাকে দেখা যায় না। তাঁর খবর জিজ্ঞাসা করতে আগার মা জানালেন, সাকিন-বিবির খুব অসুখ চলছে। এখানে আসার আগে থেকেই বাতে ভুগছিলেন একটু একটু, এখানে এসে একেবারে শয্যাগত হয়ে পড়েছেন। কত কি দাওয়াই খাওয়ানো হচ্ছে—কিছুতেই বাগ মানছে না, এতদিনে একটা দৈব মাদুলী ধারণ ক'রে দু'আনা মাত্র কমেছে বোধ হয়।

দিলু চোখ মটকে আগার কানে কানে বলে, 'খুব জব্দ হয়েছ বুড়ি, বুঝলে দোস্ত্! মুখে কিছু না বললেও এদের তত পছন্দ করত না তো, মনে মনে চাইত কি, এরা নেমে যাক আমার ঘাড় থেকে। এখন তেমনি—এদের সেবা না হ'লে একদণ্ড চলে না। বিশেষত গুল্লু। দিনরাত শুধু হা গুল—আর জো গুল। এক মিনিট না দেখলে চোখে অন্ধকার দেখে একেবারে। এখন বলে, তুই-ই আমার সত্যিকারের সন্তান—ও ছেলে কেউ নয়। আর তোমার বোনও, ওঃ, সেবা করতে পারে ব'ট, হাতে পায়ে যেন ওর কোন কাজ লাগেই না।'......

আগা সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বোনের দিকে চেয়ে কৃত্রিম শাসনের ভঙ্গীতে বলে, 'তুই নাকি দিনরাত আমার দোস্ত্কে জ্বালাতন করিস, বাড়িতে তিষ্ঠুতে দিস না মোটে? মুখপুড়ি, ওর ঘাড়ে চেপে ব'সে আছ—সেটা খেয়াল থাকে না? ও যদি আজ তাড়িয়ে দেয় তো দাঁড়াবি কোথায়?'

গুল সদর্পে উত্তর দেয়, 'সে আমি বুঝব। কতদিন তো বলেছি ওকে যে ছেড়ে দাও, আমরা আমাদের পথ দেখব। ছাড়ে না কেন? চলে যাবার নাম করলেই চেঁচিয়ে লাফিয়ে হাট বসিয়ে তোলে কেন? পাগলের মতো কাণ্ড-কারখানা বাধিয়ে দেয়। পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে ছেলেমানুষের মতো। বলে, আমার জান থাকতে যেতে দেব না, কৈ যাও দেখি কেমন করে যাবে?'

'আলবৎ!' মাটিতে পা ঠুকে বলে দিলমহম্মদ, 'সেই কথা আমার। আমি জিন্দা থাকতে আর কোথাও যাওয়া চলবে না। যেতে হয় খুনোখুনি ক'রে যেতে হবে। হ্যাঁ—সাফ্ সাফ্ কথা আমার!'

'শুনলে, শুনলে দাদা! তুমি এসেছ, এর একটা বিহিত ক'রে যাও বলে দিচ্ছি। আমার এই দিকদারি আর পরেসানি সহ্য হচ্ছে না। দিনরাত নিজের খাটুনি খাটব, না ঐ বুড়ো খোকার ঝক্কি সামলাব? এ আর আমার দ্বারা পোষাবে না—তা পরিষ্কার ব'লে দিচ্ছি। ওকেও জ্বালাতন করতে চাই না, মায়ে বেটায় সুখে থাক, তার মধ্যে আমার কথা বলার দরকারই বা কি? আমি চলে গেলে যা খুশী করতে পারবে—আমি দেখতেও আসব না, বলতেও আসব না। আর আমরা? খেটেই যখন খেতে হবে তখন খাবার ভাবনা কি, যেখানেই গতর খাটাব, সেখানেই দু'খানা রুটি মিলবে।'

'কে, কে তোকে দিনরাত খাটতে বলেছে তাই শুনি? কতদিন বলেছি যে একটা চাকরানী রেখে দিই—শুনিস সে কথা? ঝি রাখার নাম করলেই তো তেড়ে মারতে আসিস এ'কবারে! তবে তুই খাটানোর খোঁটা দিবি কিসের জন্যে তাই শুনি?'

'খাটতে কি আমি নারাজ!' সমান তেজের সঙ্গেই উত্তর দেয় গুল, 'খাটার খোঁটা দেব কেন? তবে সংসারে খাটুনীর সঙ্গে আবার তোমার দায়দায়িত্ব যে বইতে হয়—

সেই বাড়তি খাটুনী খাটতে রাজী নই। একে বোকা তায় পাগল—কখন কি ক'রে বসে এই চৌকী দিতে দিতেই আমার দিন গেল।...সত্যি বলছি দাদা, এ আমার ভাল লাগে না! এই তো, আজই একটু আলগা দিয়েছি অমনি কি কাণ্ড বাধিয়ে বসেছিল, স্বচক্ষে তো দেখলে!'

'আমি বোকা, আমি পাগল, বটে! কোথাও যাব না, খাটব না, রোজগারের চেষ্টা করব না, পুরুষ মানুষ দিনরাত তোর ওড়নার তলায় বসে থাকব—এই চাস তুই, না? তাহ'লেই আমি খুব ভালো আর সেয়ানা হয়ে গেলুম। হাত্তোর মেয়ে জাত রে! বুঝলে আগা ভাইয়া—এই খাণ্ডারণী বোনটি তোমার—যা কিছু করতে যাব তাইতেই খুঁত কাটবে। কিচ্ছু করতে দেবে না। হালওয়াইয়ের দোকান করব—বলে তুমি সব খেয়ে আর পাড়াসুদ্ধ লোককে খাইয়ে শেষ ক'রে দেবে। কাটা কাপড়ের দোকান করব—বলে তোমাকে বোকা পেয়ে ঠকিয়ে নেবে। তাহলে কী করব আমি তাই বলো। কিছু তো একটা করতে হবে—না কী বলো দোস্ত্!'

'খুঁত কাটি কী আর সাধে? এখানে এসে তো গোলদারী দোকান দি'য়েছিলে, রাখতে পার'ল? দুদিনেই পাড়াসুদ্ধ জোচ্চোর লোককে দেদার ধার বাকীতে মাল দিয়ে সব ফুঁকে বসে রইল। বুদ্ধি নেই এক কড়ার—উনি করবেন কারবার!'

দিলু আগুন হয়ে উঠে কি বলতে যাচ্ছিল, আগা তাকে নিরস্ত ক'রে বলল, 'তাহ'লে খাবে কি ক'রে তাই বল। জমিজমার আয় তো আমাদের জন্যেই বন্ধ হয়ে গেছে বলতে গেলে। খাওয়া পরা চালাবে কি ক'রে তাহ'লে?'

গুলু ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'হ্যাঁ, ওই চালাচ্ছে কি না। তাহ'লে আর ভাবনা ছিল না। ওর মা তেজারতী কারবার করতেন ওখানে। এখানে এসেও সেটা বজায় রেখেছেন। বরং এখানে সে কারবার জোর হয়েছে আরও। আমিই তো আজকাল হিসেবপত্র রাখি তার—টাকা দেওয়া নেওয়া করি, আমি সব খবর রাখি। মা ওর চেয়ে ঢের মজবুত আর সেয়ানা। তাছাড়া গঙ্গাপ্রসাদকে দিয়ে কিছু কিছু চানা বেচিয়ে টাকা আনিয়ে নিয়েছি—সেও আমি, তোমার ঐ গাদ্হা দোস্ত্ না।'

'দ্যাখ—মুখ সামলে কথা বলিস। অমন যা-তা বললে সত্যিই আমি দু' চোখ যেদিকে যায় চলে যাব—' হুঙ্কার দিয়ে ওঠে দিলু।

এ ঝগড়ার শেষ নেই তা আগা জানে। সে হাসতে হাসতে ওপরে চলে যায় দিলুর মাকে দেখতে।......

ওরই মধ্যে এক ফাঁকে বোনকে একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'সত্যিই কি অন্য কোথাও যেতে চাস? আমি এখন যা তন্‌খা পাই তাতে হয়ত তোদের কোথাও একটু মাথা গুঁজে থাকার ব্যবস্থা হ'তে পারে কিন্তু এই যা হাঙ্গামা শুরু হ'ল—চাকরি কতদিন রাখতে পারব—মরব কি বাঁচব তাই তো বুঝতে পারছি না—'

কথাটা শেষ করতে দেয় না গুল। বাধা দিয়ে বলে ওঠে, 'তুমি ক্ষেপেছ দাদা, ও কথার কথা বলছিলুম। অসময়ে পথ থেকে ধরে এনে আশ্রয় দিয়েছে, আমাদের জন্যে এত ক্ষতি স্বীকার করেছে—এখন তার অসময়ে ফেলে চলে যাব? সে কি মানুষের কাজ? আমরা না থাকলে ওর মা সময়ে একটু তেষ্টার জল পাবে না। তাছাড়া ও লোকটাও বড় অসহায়, বড় ছেলেমানুষ। ওকে ফেলে কোথায় যাবো? মা ভালো থাকলে তবু একটা কথা ছিল। এমনিতেও যাবার কথা উঠলে যা কাণ্ড করে তা তুমি জানো না, সত্যি সত্যিই চলে গেলে হয়ত আত্মঘাতী হবে।'...

নিশ্চিন্ত হয়ে কিল্লার দিকে রওনা হয় আগা। এদিকটা নিয়ে আর ভাববার

কিছু রইল না। এখন থেকে শুধু নিজেরটা ভাবলেই চলবে।

তখন রাত গম্ভীর হয়ে এসেছে। সারা দিনের সে হল্লা, সে পৈশাচিক উন্মত্ততা এসেছে কমে, শহরব্যাপী বহ্নিলীলার লাল রঙও নিশীথ রাত্রির অন্ধকারে আত্মগোপন করেছে। ক্লান্তি ও সুষুপ্তির শান্তি নেমে এসেছে শহরে। লুণ্ঠনক্লান্ত সিপাহীরাও পরস্বের বোঝা বয়ে কিল্লায় ফিরে গেছে অনেকে—সেখানে হয়ত ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে নূতন হল্লা, নূতন অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে, তবে সে শব্দ এতদূর পৌঁছবার কথা নয়।

আগার সঙ্গে সঙ্গে আজমীরী দরওয়াজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসে দিল মহম্মদ। আগাই তাকে ফিরিয়ে দেয় এবার। বলে 'তিনটে আওরত রয়েছে শুধু বাড়িতে—তুমি যদি বিপদে পড়ো তো তাদের কি দশা হবে? দ্বিতীয় কোন পুরুষ—একটা বাচ্চা ছেলে অবধি নেই। তুমি যা গোঁয়ার, শহরে ঢুকে হয়ত কার সঙ্গে কি বাধিয়ে বসবে, তার চেয়ে এখান থেকেই ফেরো, বাকী পথটুকু আমি ঠিক যেতে পারব।'

অগত্যা দিলু থেমে যায়। কিন্তু তখনই ফিরতে পারে না ঠিক। একটু ইতস্ততঃ ক'রে যেন কতকটা উৎকণ্ঠিত ভাবেই বলে, 'তাহ'লে আবার কবে আসছ তুমি?'

'ভাই, সে এখন বলা শক্ত। আমার দুশমনেরা গা-ঢাকা দিয়েছিল আংরেজের ভয়ে। এখন হয়ত আবার তারা মাথা তুলবে। একটু সাবধানে চলাই উচিত। চারিদিকে অরাজক অবস্থা। আমার মালিক আবার তখ্‌তে বসেছেন কিন্তু সে তখ্‌ত নড়বড়ে, ভাঙ্গা। কতদিন এ বাদশাহী রাখতে পারবেন কে জানে। শাহী তখ্‌তে ওঠাটা সহজ, নামাই শক্ত। ওখান থেকে মাটিতেই যেতে হয় সোজা। যাই হোক—বিপদের শেষ নেই তাঁর, কাজও ঢের। এ সময় তাঁর কাছে কাছেই থাকা দরকার। ফাঁক যদি মেলে তো ঠিক আসব, তবে যদি না আসতে পারি ব্যস্ত হয়ো না।'

দিলু ঘাড় হেঁট ক'রে মাটির দিকে তাকিয়ে ছিল এতক্ষণ. এবার এদিক ওদিক চাইতে লাগল—কেবল আগার মুখের দিকে ছাড়া। ওর এমন সঙ্কোচ এর আগে আর কখনও দেখে নি আগা। সেই সামান্য আলোতেই সে লক্ষ্য করল দিলুর কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। সে সস্নেহে ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'আর কিছু বলবে ভাইয়া, কোন জরুরী কথা কিছু বলতে চাও?'

তবু দিলু তখনই কোন কথা বলতে পারে না। নিজের কুর্তার একটা প্রান্ত নিয়ে টানাটানি করে শুধু, এদিক ওদিক কেমন অসহায় ভাবে চায়। তারপর আগা তার মুখের দিকে উৎসুক ভাবে চেয়ে প্রতীক্ষা করছে বুঝে যেন মরীয়া হয়েই বলে ওঠে, 'বলছিলুম কি, তুমি আর এমন ভাবে কতদিন টানা-পোড়েন করবে? অথচ এদের এভাবে এখানে ধরো একেবারে অনাত্মীয়ের মধ্যে ফেলে রাখা কি ঠিক?'

কথাটার অর্থ ঠিক বুঝতে পারে না আগা। অথবা ভুল বোঝে সে। কিছুটা শঙ্কিত, কিছুটা লজ্জিত ভাবে ওর মুখের দিকে চেয়ে প্রায় শুষ্ক কণ্ঠে বলতে যায়, 'কিন্তু, এখনই মানে আমি তো—'। তবে যে গুল বললে—'

সে কথা বোধহয় কানেও যায় না দিলুর। কথাটা শুরু করতে পেরে যেন তার সাহস অনেক বেড়ে গেছে। সে বেশ ভারিক্কী চালে বলে, 'না, একদম ঠিক নয়।

লোকে নানারকম মন্দ কথা বলতে পারে। তাছাড়া, নিজেদের ওপরেই বা বিশ্বাস কি? যতই বলো, ঘি আর আগুন। এ ধারে তোমার যা অবস্থা, কিছুকালের মধ্যে যে এদের নিয়ে কোথাও বাসা বাঁধতে পারবে তা তো মনে হয় না। অথচ এদের জন্যে তোমার মনে শান্তি নেই একতিল, দিনরাত কাঁটার মতো বুকে বিঁধে থাকে চিন্তাটা—তাই না? সেই জন্যে বলছিলুম কি—যদি গুস্তাকী মনে না করো—একটা মোল্লা ডেকে শুভ কাজটা সেরে ফেললে হ'ত না?'

এবার অন্ধকারটা যেন খানিক ফিকে হয়ে আসে। সত্যটা আন্দাজ করতে পারে আগা। তবু যেন ঠিক বিশ্বাসও হয় না, অবাক হয়ে দিলুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তখন আরও মরীয়া হয়ে দিলু বলে, আরও খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে, 'ইয়ে, কথাটা বুঝলে না? গুলকে আমি সাদী করতে চাই। ওকে ছেড়ে আমার চলবে না, থাকতেও পারব না। ওকে না পেলে জিন্দীগীটাই বরবাদ হয়ে যাবে। এটা আমি খুব সাফ্ সাফ্ বুঝে নিয়েছি, তুমিও মনে কোন সন্দেহ রেখ না। গুল যদি আমাকে ছেড়ে চলে আসে, আমিও দুনিয়া ছেড়ে চলে যাব—তা তুমি জেনে নিও। আমার যে কথা সেই কাজ—তুমি তো জানই। কাজেই ওদের এনে বাসা করার কথা ভুলে যাও। গুলও আমাকে আর কারুর কাছে রেখে নিশ্চিন্ত হ'তে পারবে না। তার চেয়ে আমার হাতে তুলে দাও, আমিও বাঁচি, তুমিও বাঁচো।...মা বোন তাহলে কারুর ভাবনাই ভাবতে হবে না। কেননা তোমার মা তো তখন আমারও মা হয়ে যাবেন। আমি দিব্যি দুই মাকে নিয়ে থাকব। তিনি এখনও হয়ত সঙ্কোচ বোধ করেন—তখন তো তাঁর হক্কই দাঁড়িয়ে যাবে একটা। আর ওদের ভাবনা না থাকলে তুমিও নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের উন্নতির চেষ্টা দেখতে পারবে। কোন পিছুটান থাকবে না।'

আগা একেবারে দিলুকে বুকে জড়িয়ে ধরে এবার। বলে, 'ভাই বাঁচালে আমাকে, এই কথাটাই সাহস করে বলতে পারছিলুম না, পাছে তুমি মনে করো যে জোর ক'রে তোমার ঘাড়ে আমার বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছি। ইচ্ছে ছিল যে, যদি কোনদিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি, ওদের দায়-দায়িত্ব আবার তুলে নিতে পারি নিজের কাঁধে—তাহ'লে সেদিন আর সঙ্কোচের কোন কারণ থাকবে না, সেদিন তোমার হাত ধরে অনুরোধ জানাতে পারব যে, আমার ভগ্নিদায় থেকে আমায় উদ্ধার করো। কিন্তু আল্লা সে সুযোগ আর আমাকে দিলেন না, কোনদিন দেবেন কিনা তাও বুঝতে পারছি না, এ অবস্থায় তুমি যদি চিরদিনের মতো ওর ভার নাও—আমি তো বেঁচে যাই। তবে এটা তুমি বিশ্বাস করো যে, আজ যদি এমন বিপন্ন নিরাশ্রয় নাও হতুম, আজ যদি আমার লাখো টাকাও রোজগার হ'ত, তাহ'লে আমার বোনের জন্যে তোমার চেয়ে ভাল পাত্রের কথা ভাবতে পারতুম না। তোমার মতো লোককে যে স্বামী পাবে সে মেয়ে সত্যিই সৌভাগ্যবতী, তার ওপর খোদার অসীম দয়া বুঝতে হবে।'

'ওসব বড় বড় কথা ছাড়ো দিকি আগা ভাইয়া। তোমার মতো অমন গুছিয়ে গুছিয়ে বলতেও পারি না, ওসব বুঝতেও পারি না। তবে এইটুকু বুঝি যে গুলকে যে ভগবান আমার ঘরে এনে দিয়েছেন সে তাঁর একান্ত মেহেরবানী আমার ওপর। তুমি ভুল বলছ, আমি ওর যোগ্য নই কোনদিনই। ও মেয়ে বাদশা নবাবের ঘরেই মানায়। তবে খোদার মর্জি খোদাই বোঝেন। তা আমি যখন পেয়েছি তখন

আর ছাড়ব না—জান থাকতে নয়। তুমি ভাই এবার নিশ্চিন্ত হও, ওদের ভাবনা ভেবে আর তোমাকে মন খারাপ করতে হবে না। তবে একটা কথা, আমার ঘরের দোর তোমার জন্যেও খোলা থাকবে চিরদিন, যেদিন খুশী চলে এসো। তোমাকে কাছে পেলে আমারই লাভ হবে। তুমি যদি আমার সঙ্গে কাঁধ মেলাও, তাহ'লে জমিনে হোক, কারবারে হোক—সোনা ফলাতে পারব। খাটতে আমি পারি খুব—তবে ঐ যা তোমার বহিন বলে, মাথাটা কিছু মোটা। তোমাকে পেলে সে অভাবও আর থাকবে না।'

বলতে বলতেই হা হা ক'রে হেসে ওঠে দিলু। সে হাসির শব্দ সেই নিশীথ-রাত্রের জনহীন পথে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। সে হাসির তরঙ্গ আজমীরী দরওয়াজার খিলানে খিলানে ধাক্কা খেয়ে যেন প্রতিধ্বনিতে আছড়ে আছড়ে পড়তে থাকে ওদের চার পাশে।

নির্মল বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের হাসি। আজ এতক্ষণ ধরে এই শহরের নরককুণ্ডে ঘুরে ঘুরে যে গ্লানি আর ক্লেদ জমেছিল আগার মনে—তা ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এই হাসিতে। এ হাসি ঈশ্বরের আশীর্বাদ—পৈশাচিকতার প্রতিষেধক।

॥ কুড়ি ॥

এর পর চারটে মাস কেটে গেল আগার যেন একটানা একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে। কত কীই না দেখল এর ভেতর। মানুষের মনের কী সব কদর্য চেহারা।

সবচেয়ে যেটা তার কাছে বেদনাদায়ক বোধ হয়েছে সেটা হ'ল বৃদ্ধ বাদশার দুরবস্থা। তৈমুর ও চেঙ্গিসের উদ্ধত রক্ত যাঁর শিরায় প্রবাহিত, তিনি কবিই হোন আর দার্শনিকই হোন—বিন্দুমাত্র অমর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন ও স্পর্শকাতর তিনি হবেনই। বারবারই তাই বৃদ্ধ সম্রাটের সুগৌর মুখে গভীর রক্তোচ্ছ্বাস লক্ষ্য করে আগা, বারবারই দেখে তাঁর স্তিমিত ঘোলাটে চোখে আগুন জ্বলে উঠতে। কিন্তু সেও ক্ষণেকের জন্যে। তারপর এক একান্ত করুণ হতাশায় সে আগুন নিস্তেজ হয়ে আসে, সে দ্যুতি মিলিয়ে যায়। নিদারুণ অসহায়তায় ধীরে ধীরে নেমে আসে আকবর আলমগীরের বংশধরের মাথা। এ যেন মুহূর্তে মুহূর্তে মৃত্যু ঘটছে বাদশার, একই জীবনে বার বার জীবনান্ত হচ্ছে।

একটা মাস আগা তাই যেন তাঁকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছে। নিজের জন্যে নয়—বাদশার দ্বারা আর ওর কোন ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নেই তা সে জানে—ধরে আছে বেচারী বৃদ্ধ অসহায় বাহাদুর শার জন্যেই। একদিন যে সে তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়েছে, জীবন পেয়েছে বলতে গেলে তাঁর অনুগ্রহে—সে ঋণ সে ভুলবে না কোনদিন। আজ এই স্বার্থসমুদ্রের মধ্যে সকলে তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেও সে যেতে পারবে না কোনমতেই। আর কিছু না পারুক, তাঁর দেওয়া জান দিতে পারবে তাঁর খিদমতে, তাঁর আদেশে মরতে পারবে।

অথচ আজকের এই তুফানে বাদশারই হাল ধরবার কথা, জাতীয় তরণীর তিনিই কর্ণধার—অন্তত নামে বা পদবীতে। তাঁর নাম ক'রেই তরে যেতে চাইছে চারি-দিকের এই অসংখ্য স্বার্থান্বেষী ও ভাগ্যান্বেষীর দল। কারণ তাঁর নাম করলে হিন্দুস্থানের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের সমর্থন পাবে তারা—তা ভাল রকমই

জানে। বাদশা নিজে এ সব চান নি। তাঁর কাছে বাদশা বাহাদুর শাহ নামের চেয়ে কবি জাফরের নামের মূল্য বেশী। তিনি কবি এই পরিচয় সত্য থাক—বৃদ্ধের এই বাসনাই সবচেয়ে বড়। স্বলিখিত রুবাই ও গজলের দ্বারাই অমরত্ব লাভ করতে চান তিনি। নিজের জন্যে পুষ্করিণীর মধ্যে জাফর মহল তৈরী করিয়েছেন তিনি—ছোট্ট একটুখানি ঘর—নিভৃতে বসে কাব্য রচনা করবেন বলে। যুদ্ধ ক'রে, রাজ্যখণ্ড জয় ক'রে কীর্তি স্থাপনের বয়স বা শক্তি কিছুই নেই তাঁর—সে ইচ্ছাও নেই। এসব পার্থিব কীর্তি তাঁর কাছে তুচ্ছ, তিনি চান বৃহত্তর কীর্তির দ্বারা ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকতে—মানুষের হৃদয়-রাজ্য জয় ক'রে সেইখানে মহত্তর তখৎ-এ-তাউস রচনা করতে।

জাফর শা স্বভাব-কবি, কবি স্বভাবের নির্বিরোধ মানুষ তিনি। কবির মতোই জীবন যাপন ক'রে এসেছেন এতকাল—কাব্য-চর্চা করে ঘুড়ি উড়িয়ে ও তৈরী ক'রে এবং পোষা বুলবুলের গান শুনে। অতি শান্তিপ্রিয় মানুষ, তাই (আগা শুনেছে অনেকের মুখেই) তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ্‌জাদা ফকিরুদ্দীনকে বিষ দিয়ে হত্যা করা হয়েছে বুঝেও—আর কে এই হত্যা করিয়েছে বুঝেও চুপ ক'রে গেছেন—কেবল অশান্তির ভয়ে। আড়ালে চোখের জল ফেলেছেন শুধু। লোকে বলে, ছোট ছেলে—প্রেয়সী তরুণী ভার্যা জিন্নৎ মহলের গর্ভজাত জওয়ান বখৎকে সিংহাসনে বসাবার জন্যে খুব ব্যস্ত তিনি—কিন্তু আগা তাও বিশ্বাস করে না। অতটা উদ্যমও আর অবশিষ্ট নেই তাঁর। তাছাড়া তিনি বুঝি অতটা লিপ্তও নন আসক্তিতে। বাহাদুর শা জাফর—শুধু কবি নন, দার্শনিকও।

সবচেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেছে আগা মানুষের হীন স্বার্থের বাস্তব ও কুৎসিত চেহারাটা দেখে। সিপাহীরা আর তাদের নেতানায়করা মুখে সকলেই বাদশার নাম করলেও বাদশাকে আসলে তারা কলের পুতুলের মতই ব্যবহার করছে। এতদিন হৃতসর্বস্ব বাদশারও একটা শাহী মর্যাদা ছিল। ঘোড়ায় চড়ে তাঁর সামনে আসার অধিকার রাজা-মহারাজা, নবাব, শাহ্‌জাদা তো কারুরই ছিল না, খোদ কোম্পানীর রেসিডেন্ট কমিশনারদেরও ঘোড়া থেকে নেমে কুর্নিশ করতে করতে নগ্নপদে সামনে আসতে হ'ত।

এবং এসে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ত, বাদশার সামনে বসবার অধিকার কারও ছিল না। এ মর্যাদা বাহাদুর শার নয়, তা বলাই বাহুল্য। এ মর্যাদা ঐ উপাধিটারই। আকবর শাহ্‌জাহান আলমগীরের সেই জ্যোতিচ্ছটা আজও একটা মোহের সৃষ্টি ক'রে রেখেছে ঐ উপাধিটার চারপাশে। মহরমের তাজিয়া বাঁশ ও কাগজ দিয়ে তৈরী হয় তা সকলেই জানে—তবু তাকে শহীদের উপযুক্ত সম্মানে কাঁধে ক'রে বয়ে নিয়ে যায় ভক্তরা। প্রতিমা মাটির তৈরী, তবু তা দেবতারই প্রাপ্য সম্মান পায়।

কিন্তু এখন আগা দেখে, সামান্য একটা হাবিলদার কি নায়েকও অনায়াসে ঘোড়া ছুটিয়ে বাদশার খাস্‌মহলে চলে আসে। 'অয় বুড্‌ঢে' বলে সম্বোধন করে কথায় কথায়। প্রয়োজনমতো হুকুম করে হাতিতে চেপে শহরে বেরুতে—আবার তাদেরই মর্জি ও হুকুম মতো ফিরে আসতে হয়। নতুন শক্তির সুরায় মত্ত সামান্য সিপাহীরাও অনায়াসে বাদশার দাড়ি ধরে টান দেয়।

এই দৃশ্য যেদিন দেখেছিল সেদিন আর আগা নিজেকে সামলাতে পারে নি। মুহূর্ত মধ্যে তলোয়ার টেনে বার করেছিল খাপ থেকে। মির্জা মুঘল যদি সজোরে তার হাত চেপে না ধরতেন তো সেই ধৃষ্ট সিপাহীর মাথা আর এক লহমার মধ্যেই

ভূমি চুম্বন করত। মির্জা মুঘল তাকে একটানে খানিকটা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে কানের কাছে যেন হিস্‌ হিস্‌ ক'রে উঠেছিলেন, 'বেঅকুফ! ভীমরুলের চাকে ঢিল মেরে কি বাঁচবে ভেবেছ? না আমরাই বাঁচব? মাঝখান থেকে যাঁর জন্য এ কাজ করতে যাচ্ছিলে তাঁকেই এ জন্যে সহস্র অপমান, লাঞ্ছনা সইতে হ'ত এক্ষুনি।...কী করবে বলো, হাতি যখন পাঁকে পড়ে ব্যাঙও তাকে লাথি মারে। দুনিয়ায় এই-ই নিয়ম।'

সিপাহীরা দেখছে লুঠতরাজ, টাকা—এবং স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার অবাধ অধিকার। সিপাহ্‌শালাররা দেখছে নিজে কতটা ক্ষমতা অধিকার করতে পারে—নিজেদের দিন কিনে নিতে পারে। শাহ্‌জাদারা দেখছেন সেই অতীতকালের জনশ্রুতিতে পর্যবসিত গৌরবের স্বপ্ন—আবার তারা বুঝি তেমনি ভাবেই হাতে মাথা কাটতে পারবেন ইচ্ছামতো। আবার হয়ত তেমনি ভাবেই বিশ্বের সেরা সুন্দরীর দল চুনে চুনে নিয়ে এসে হারেম পূর্ণ করতে পারবেন; তামাম হিন্দুস্তানের ঐশ্বর্য এসে লুটোবে তাঁদের পায়ে; আবারও বুঝি তাঁদের বিলাসের ও সম্ভোগের বিবরণ ইতিহাসের পাতায় লিপিবন্ধ হবে—ভাবীকালের পাঠকদের ঔৎসুক্য কৌতূহল ও সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের খোরাক হয়ে থাকবে।

বেরিলির বখ্‌ৎ খাঁ স্বপ্ন দেখছেন নিজাম-উল-মুল্‌কের মতো তিনিও গোটা অযোধ্যা রোহিলাখণ্ড জুড়ে এক বিপুল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছেন। আরো দূরে দূরে, যাঁরা বিদ্রোহী সিপাহীদের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছেন দায়িত্ব নিয়েছেন তাদের চালনা করবার—তাঁদেরও কারুরই ভারতের স্বাধীনতার জন্যে বিন্দুমাত্র মাথা-ব্যথা নেই। সবাই ব্যস্ত নিজের নিজের দিন কিনে নেবার জন্যে। নিজের জন্যে কতটা কি সুযোগ সুবিধা ক'রে নেওয়া যায় সেই চিন্তাতেই তারা মগ্ন। মুখে সকলেই—হিন্দুস্তানের ন্যায়তঃ ধর্মতঃ অধিকারী, দীনদুনিয়ার মালিক—বাদশা বাহাদুর শার নাম করছেন কিন্তু সে জায়গায় নিজেকে ঐ লালকিল্লার দিওয়ান-ই-খাসে কল্পনা করতে মন্দ লাগছে না। তখ্‌ৎ-এ-তাউস নেই, কিন্তু হিন্দুস্তানের মালিকের জন্যে আর একটা অমনি তখ্‌ৎ বানাতে কতক্ষণ?

পেশোয়া ধুন্ধুপন্থ নানা দিল্লীর পথে রওয়ানা হয়েও আবার ফিরে গেছেন বিঠুরে। তাত্যা তোপী, ঝাঁসীর রানী, জগদীশপুরের কুঁয়ার সিং সাহেব, পাটনার ওয়াহাবী মোল্লারা—কেউই এগিয়ে আসে নি দিল্লীর দিকে। যতদূর খবর পাচ্ছে আগা, দিল্লীতে এসে বাদশাকে সাহায্য করার সামর্থ্যও নেই, সম্ভবতঃ ইচ্ছাও নেই তাঁদের। অথচ নিজেরা আংরেজদের সঙ্গে লড়াই ক'রে হটিয়ে দেবে এমন শক্তিমান নন কেউ তাঁরা। আগার মনে পড়ে হাবিলদার বন্ধুর কথা। সে-ই ঠিক বলেছিল। আংরেজদের সামনে দাঁড়াবার হিম্মৎ কারও নেই।...

বাদশার এই ঘোর দুর্দিনে, এই নিদারুণ অসহায় অবস্থায় যদি আত্মীয়ারাও একটু মান্য করত ওঁ'কে, ও'র কথা ভাবত! তারাও যদি ও'র সিংহাসন ঘিরে দাঁড়াত। পুত্র পৌত্র স্ত্রী—কেউই ওঁর আপন নয় যেন। ওঁর কথা কেউ ভাবে না। অন্তঃপুরে যাওয়ার অধিকার নেই আগার, জিন্নৎ মহল বেগম সাহেবাকে সে চোখে দেখে নি কিন্তু তাঁর মন বা ইচ্ছাটার স্পষ্ট চেহারা সে দেখছে। সেটা নানা ভাবে, নানা লোকের মুখে, নানা আদেশের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়। তিনিই আরও জোর ক'রে—এই ভয়ঙ্কর ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন তাঁর বৃদ্ধ স্বামীকে। নিরাপত্তার কূল থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছেন। তাঁর আশা তাঁর তরুণ পুত্র জওয়ান বখ্‌ৎ সিংহাসনে বসবে আর সে

সিংহাসন তাঁর স্বামীর সিংহাসনের মতো এমন প্রতিমুহূর্তে বাদশাহীকে বিদ্রূপ করবে না—ধিক্কার দেবে না তার আসনারূঢ় ব্যক্তিকে। সবটা না হোক—অতীত কালের মর্যাদা ও শক্তি যেন কিছুটাও লাভ করতে পারে সে পদবীটার সঙ্গে সঙ্গে। বাকী যে সব শাহ্‌জাদা—তাঁরা ভাবছেন যে জিন্নৎ মহল ও জওয়ান বখ্‌তের খাতিরে বাদশা যদি একটু সক্রিয় হন তো ক্ষতি কি? কার্য সিদ্ধি হ'লে ঐ বৃদ্ধের সঙ্গে স্ত্রীলোক ও বালকটাকে সরিয়ে দিতে কতক্ষণ? মুঘল রাজঅন্তঃপুরের পক্ষে এ ঘটনা প্রথমও নয়, অভাবনীয়ও নয়। মাত্র বৎসরখানেক আগেই তো শাহ্‌জাদা ফকিরুদ্দীনকে এই উপায়েই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারা সরিয়েছে তাও তো কারও অজ্ঞাত নই এই কিল্লা-ই-মুবারকে।

তবু এই শাহ্‌জাদারাও যদি একটু শক্ত হতেন—একটু মানুষের মতো হতেন! সাধ যত এঁদের—তার শতাংশও যদি সাধ্য থাকত! সিংহাসনটা অধিকার করতে পারলে যা করবেন, তার জন্য সিংহাসনটা অধিকার করা পর্যন্ত অপেক্ষা করার মতোও ধৈর্য এঁদের নেই। এখনই পানাসক্তি, উচ্ছৃংখলতা ও যথেচ্ছাচারিতার রাশ ছেড়ে দিয়েছেন একেবারে ; ব্যভিচারের তো কথাই নেই।

এর জন্য অবশ্যই টাকার দরকার। সে টাকা আদায়ও হচ্ছে। আদায় করা হচ্ছে ওঁদের ভাবী প্রজাদের নিপীড়ন করে। ফলে তারা বিরক্ত, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ ও অতিষ্ঠ। বার বার তারা নালিশ জানাচ্ছে বাদশার কাছে, বাদশা উৎকণ্ঠিত ও লজ্জিত হয়ে শাহ্‌জাদাদেরই ডেকে বলছেন এ অন্যায়ের প্রতিকার করতে—অর্থাৎ ভক্ষকদেরই রক্ষক রূপে কল্পনা করছেন। ভৎর্সনাও করছেন তিনি তাঁর মতো, কড়া হুকুম-নামাও জারী করছেন, কিন্তু সে হুকুম তামিল করার ভার যাদের হাতে তাদেরই যে সে আদেশ লংঘন করার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। ফলে কোন প্রতিবিধানই হচ্ছে না। ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে শহরে। ব্যবসায়ী বনিকের দলই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে—অথচ সমস্ত শহরের তারাই স্তম্ভ স্বরূপ। লুঠ এবং জুলুম জবরদস্তি—সিপাহী ও সিপাহ্‌সলার সকলের এইটে অর্থাগমের প্রশস্ততম উপায় বলে স্বীকৃত হয়ে গেছে।...

সবচেয়ে আঘাত লেগেছিল বাদশার সেইদিন—তাঁর সেদিনকার মুখের চেহারাটা আগা কোনদিন ভুলতে পারবে না—যেদিন খবর এল তাঁর পৌত্র শাহ্‌জাদা মির্জা আবুবকর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সর্বজন-শ্রদ্ধেয়া স্বয়ং ইমানী বেগমের বাড়ি লুঠ করিয়েছে। অতি বৃদ্ধ ইমানী বেগম মুঘল বংশের সকলের গুরুজন-স্থানীয়া, প্রথম বাহাদুর শার পুত্রবধূ তিনি। একশর ওপর বয়স হয়েছে তাঁর। শুধু বর্তমান 'জাফর' বাদশা নন, তার আগের বাদশারাও পালে-পার্বণে তাঁর বাড়িতে গিয়ে সেলাম জানিয়ে এসেছেন বরাবর। বাদশা বদল হয়েছে, শক্তি হস্তান্তরিত হয়েছে, কিন্তু ইমানী বেগমের মর্যাদা ও মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় নি একদিনের তরেও। তাঁর ঘরে কোন-দিন কোন বাদশা জুতো পায়ে দিয়ে ঢোকেন নি—চিরদিনই নগ্নপদে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন তাঁর সামনে। সেই ইমানী বেগমের গা থেকেও নাকি জেবর খুলে নিয়েছে আবু-বকরের পাপ-সহচররা। ইমানী বেগম নিষ্ফল ক্ষোভে নাকি অভিসম্পাত করেছেন, 'তোরা নির্বংশ হবি, তোদের অত সাধের অত আশার ঐ রঙমহলে গুজাররা ঘুরে বেড়াবে—কৌতূহলী পথের লোকে তোদের বাদশাহী নিয়ে তামাশা করবে ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। মুঘলদের নাম আর মহিমা মাত্র জনশ্রুতিতে পর্যবসিত হবে। তোদের অপঘাত মৃত্যু ঘটবে।' ইত্যাদি—

সে অভিসম্পাতের কথা শুনে শিউরে উঠেছিলেন বাদশা, দু'হাতে কান ঢেকে শব্দগুলোকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। নাক, কান মলেছিলেন বার বার। দোয়া মেগেছিলেন আল্লার কাছে, মইনুদ্দীন চিশ্তি খাজা সাহেবের কাছে। তাতেও শান্ত হতে পারেন নি। ক্ষোভে, দুঃখে দু'হাতে নিজের চুল ছিঁড়েছিলেন মুঠো মুঠো। আগাই কাছে ছিল তখন—ওকে লক্ষ্য ক'রে বলেছিলেন, 'ওরে, আমাকে আজ এও শুনতে হ'ল! আমাদের বংশে পুরুষরা যতই না করুক নিজেদের মধ্যে ঝগড়া, লড়াই, হানাহানি—জেনানার গায়ে কেউ কখনও হাত তোলে নি। তাঁদের বিন্দুমাত্র অসম্মান করতে সাহস করে নি। এক বাদশা আর একজনকে হত্যা ক'রে সিংহাসন কেড়ে নিয়েছেন কিন্তু গুরুজন-স্থানীয়াদের গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগতে দেন নি, তাঁদের কাছে হাত জোড় ক'রে খালিপায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। এইটুকুই আমাদের বৈশিষ্ট্য। সেই জন্যে হিন্দুস্তানে আপামর সাধারণের কাছে মুঘল-জেনানা মানেই সম্ভ্রমের পাত্রী। এইটুকুর মধ্যে আজও আমাদের নামটা বেঁচে আছে। সেটুকুও গেল এবার। যাক্, তবে এ নাম, এ বংশও যাক। হজরৎ ইমানী বেগমের কথা মিথ্যা হবে না, এ লাল-কিল্লায় পথের লোক বাস করবে একদিন। গুজাররাই ঘুরে বেড়াবে। 'ই রাহে উজার ই বাসে গুজার' তুঘলকাবাদের অভিশাপ এখানেও ফলবে। কেউ আর রক্ষা করতে পারবে না এদের—কেউ রাখতে পারবে না এ বাদশাহী।'

ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, দুঃখিত হয়েছিলেন—কিন্তু কোন প্রতিকার করতে পারেন নি। শাসন তো করতে পারেনই নি। কাকেই বা করবেন শাসন, বার বার ডেকে পাঠিয়েছেন আবুবকরকে, সে দেখা করাও আবশ্যক মনে করে নি। নিজ কর্ম-ডোরে বন্দী, অক্ষম স্থবির বৃদ্ধ পিতামহের আদেশে তাঁর সামনে হাজির না হ'লেও তিনি কিছু করতে পারবেন না, তা সে জানে। যে বাদশাকে সামান্য ষোল তঙ্কা বেতনের সিপাহীরাও ভ্রূকুটি ক'রে পার পেয়ে যায়, তাঁকে তাঁর পৌত্র সমীহ করবে—এ আশা বোধ করি বাদশাও করেন না।

সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছিল আগা হেকিম আহ্সানউল্লার ব্যাপার দেখে।

বোধহয় তখনও বিদ্রোহের এক সপ্তাহ কাটে নি। একদিন হীরা মহলে ডাক পড়ল আগার। হীরা মহলও জাফর মহলের মতো বর্তমান বাদশার তৈরী এবং কিল্লা-ই-মুয়াল্লার অন্যান্য ইমারতের তুলনায় অতি দীন ও অকিঞ্চিৎকর। কিল্লা-ই-মুয়াল্লা বা মহিমা-মণ্ডিত দুর্গ (লালকিল্লা বা কিল্লা-ই মুবারকের অন্য নাম)—এ নামের সঙ্গে বেমানান। তবু হীরা মহল নিজের তৈরী বলেই বোধহয় শাহ্ জাফরের বেশি প্রিয়। সুতরাং হীরা মহলে ডাক পড়াতে আগা ভেবেছিল বাদশাই ডেকেছেন তাকে, কোন বিশেষ প্রয়োজনে। ব্যস্ত হয়েই গিয়েছিল সে। কিন্তু গিয়ে দেখল যে সেখানে হেকিমসাহেব একা দাঁড়িয়ে আছেন, কিছুটা অসহিষ্ণুভাবে—সম্ভবত তার জন্যই অপেক্ষা করছেন।

অন্যদিনের মতো ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টিতে তাকালেন না হেকিম সাহেব, বরং ওকে দেখে যেন অতিমাত্রায় প্রসন্ন হয়ে উঠলেন, স্নেহে ও সৌজন্যে গলে গেলেন।

'এসো বাবা, এসো। তোমাকেই খুঁজছিলুম। ভালো আছ তো? রাজী-খুশী আছ বেশ? আর যা চলছে কদিন—ভাল থাকাই তো মুশকিল।'

তবু আগা বুঝতে পারে না তখনই। তার দৃষ্টি বার বার চারিদিকের শূন্যতা খুঁজে ঘুরে আসে। বলে, 'আপনি—মানে আমাকে কি আপনিই ডেকেছিলেন?'

'হ্যাঁ বাবা, একটু বিশেষ জরুরী কথা ছিল। তোমার কোন অসুবিধা করলুম না তো? অবশ্য কাজ আমারও বলতে পারো, তোমারও বলতে পারো।'

নিমেষে সতর্ক হয়ে ওঠে আগা। স্থির-দৃষ্টি হেকিমের মুখের ওপর নিবদ্ধ ক'রে বলে, 'ফরমাশ করুন—'

কিন্তু জরুরী কথাটা সেখানে বলা গেল না। ঠিক সেই মুহূর্তেই বিস্তর লোক এসে পড়ল। শাহ্‌জাহানাবাদের এই শাহী কিল্লার পূর্বের গৌরব আর মর্যাদা কিছুই নেই—তার আদব-কায়দাও ভুলে গেছে লোকে। এ সব খাস মহলের অন্তর্গত—এখানে কিছুদিন আগেও বিনা এত্তেলায় কেউ প্রবেশ করতে পারত না। এখন যে-সে, পথের লোক, এমন কি ফিরিওয়ালাদেরও চলাফেরা করার কোন বাধা নেই। সিপাহীদের কল্যাণে বাদশার খাস মহলে আর চাঁদনী চকের রাস্তায় বিশেষ তফাৎ নেই।

এসব বাজে লোকের দৃষ্টি কৌতূহলী হয়ে উঠেছে এখনই, কানও হয়ে উঠেছে সজাগ। যা শুনবে তার সঙ্গে কিছু যোগ ক'রে এখনই চারিদিকে নানা কাহিনী কথিত হতে থাকবে তাদের সম্বন্ধে। হেকিম আর একটুও সেখানে দাঁড়ালেন না। চোখের ইঙ্গিতে আগাকে তাঁর অনুসরণ করতে বলে চলে গেলেন হায়াত-বক্স বাগে। প্রসঙ্গত বুঝিয়ে দিলেন—গোপনীয় কথার প্রশস্ত স্থান হচ্ছে উন্মুক্ত প্রান্তর বা উদ্যান, যেখানে আড়ি পাতবার সম্ভাবনা থাকে না।

বাগানের মাঝামাঝি একটা কালো কষ্টি পাথরের বেদীতে গিয়ে বসলেন হেকিম সাহেব। ওকে পাশে বসালেন। তারপর একটু ইতস্তত করে দু'একটা মামুলি কুশল প্রশ্নের পর গলা নামিয়ে বললেন, 'দ্যাখো বাবা আগা, তোমার মুখের ভাব ও চোখের চাউনীতে বুঝেছি যে তুমি পুরবীয়া সিপাহীদের দলে নও। এদের উপর তোমার কোন আস্থাও নেই।...না না—কিছু বলতে হবে না, মানুষের চোখের দিকে চেয়েই তার মনের ভাব আমরা বুঝতে পারি। নইলে এত কাল আর কি মানুষ চরালাম? এই খুন-খারাপি লুঠতরাজ কোনটাই তোমার পছন্দ নয় তা আমি জানি। এই লুঠেরার দল কোনদিন কোম্পানীকে এদেশ থেকে তাড়াতে পারবে তাও তুমি বিশ্বাস করো না। সত্যি কথা বলতে কি—আমিও তা করি না। কিন্তু আমার হাত-পা বাঁধা। বাদশাকে ফেলে আমার নড়বার উপায় নেই। কোশিস করলেই চেপে ধরবে। তখন আর প্রাণ মান কিছুই এদের হাতে নিরাপদ থাকবে না, তখন আমি হবো বিশ্বাসঘাতক।...কিন্তু তুমি কেন মিছিমিছি এর ভেতর পড়ে থাকবে? এক কাজ করো, আমি তোমার সঙ্গে বাদশার পরোয়ানা দিয়ে দিচ্ছি—তুমি দুশমনের ছাউনীর খোঁজে যাচ্ছ রটিয়ে দেব এখানে—মুখে সে কথা তুমি বা আমি কেউ স্বীকার করব না। তুমি পূবদিকে এগিয়ে গিয়ে যেখানে হোক কোম্পানীর ফৌজের সঙ্গে যোগা-যোগ ক'রে নাও। কানপুরেই চলে যাও না হয়, সেখানে এখনও নানা সাহেব শুনেছি মনস্থির করতে পারেন নি—এখনও সেখানে আংরেজ ছাউনি আছে। নয়তো আরো দূরে কোথাও চলে যাও। তোমাকে আমি কতকগুলো গোপন সংবাদ দিয়ে দেব—সেগুলো আংরেজদের দিলেই তারা তোমাকে বিশ্বাস করবে। তুমি যে তাদেরই দলে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ওদের থাকবে না। সেখানে তাদের সঙ্গে তুমি থাকবে, তাদের হয়েই লড়াই করবে। শেষ পর্যন্ত এ খেলার কি পরিণাম হয় দেখা যাক। যদি কোম্পানী জেতে, তুমি তাদের বিশ্বাস-ভাজন ব্যক্তি—তুমি যদি ইসাদী হও যে আমি মনেপ্রাণে তাদের দিকে ছিলুম, আমিই তোমাকে গোপন খবর যুগিয়েছি, তারা

আমাকে ছেড়ে দেবে। তুমি অনায়াসে আমাকে বাঁচাতে পারবে। আর যদি বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়েই, যদি সিপাহীদেরই জিত হয়, তখন আমি তোমাকে বাঁচাব। এ আমি কথা দিচ্ছি। অর্থাৎ দুজনে দুজনের জামিন রইলুম। এ বন্দোবস্ত মন্দ কী?'

কথা শেষ ক'রে উৎসুক ব্যগ্রভাবে আগার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন হেকিম সাহেব।

আগা অবাক হয়ে গিয়েছিল। হেকিম সাহেবকে সে প্রথম থেকেই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চোখে দেখলেও তার আসল স্বরূপ যে এই, সেটা ভাবতে পারে নি এতদিন। খানিকটা চুপ ক'রে থেকে সে বলল, 'বন্দোবস্ত তো খুব ভালোই হেকিম সাহেব, কিন্তু সামান্য একটা অসুবিধা থেকে যাচ্ছে আমার দিক থেকে।'

'কী অসুবিধা বলো।' আহ্সানউল্লা ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

'প্রথম হলো, কাজটা আসলে গোয়েন্দাগিরির, ছিঁচকে গোয়েন্দার। ছিঁচকে চোরের মতোই ছিঁচকে গোয়েন্দাকে ঘেন্না করে মানুষ। হয়তো তার চেয়েও বেশী। এ কাজ আমার দ্বারা হবে না। এর মধ্যে ঝুঁকিও কম নয়। এদের চোখ এড়িয়ে যাওয়া খুব কঠিন হবে। আপনার পরোয়ানা হয়তো আরো বেশী বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তারপর আংরেজদের দিকে গিয়ে পড়লে, পরিচয় জানার আগেই হয়তো তারা আমাকে গুলি ক'রে দেবে। প্রাণ রাখার জন্যেই যদি প্রাণটা যায় তবে এত কান্ড করার দরকার কি?'

একটু থেমে আবার বলে, 'আর সব চেয়ে বড় অসুবিধা হ'ল আমি বাদশার কাছে মহা উপকৃত। নিমক খেয়েছি তাঁর, নিমকহারামী করতে পারব না। আমরা পাঠান, আজ পর্যন্ত ওটা শিখি নি। বাদশা হুকুম করলে আমি জাহান্নামে যাব, কিন্তু তাঁকে এই বিপদের মধ্যে ফেলে বেহেস্তে যেতেও রাজী নই। আপনি যা হুকুম করলেন, যদি খোদ বাদশা করেন—হাসি মুখে তামিল করব, নই'ল নিজের জন্যে বা আপনার জন্যে একাজ করতে পারব না।'

স্তব্ধ হ'য়ে বসে থাকেন আহ্সানউল্লা। এ জবাব তিনি আশা ক'রেন নি। একই সঙ্গে তাঁর মুখে হতাশা, দুশ্চিন্তা এবং একটা কুটিল ও ক্রুর সংশয় ফুটে ওঠে। খানিক পরে তিক্ত কণ্ঠে বলেন, 'সৎপরামর্শ সেই জিনিস যা কাউকে দিতে নেই। আর সৎপরামর্শ অপাত্রে দেওয়ার বিপদ হ'ল এই যে সাংঘাতিক অস্ত্রের মতো তা ফিরে এসে পরামর্শদাতাকেই আঘাত করে। এই দ্যাখো না, তোমার ভালোর জন্যে বলতে গেলুম—এখন তুমি যদি এই কথাটি তোমার সিপাহী ভাইয়াদের গিয়ে বলো,—তুমি মোটা ইনাম পাবে সন্দেহ নেই কিন্তু আমার গর্দান থেকে শিরটি খসবে। অবশ্য সে জন্যে তোমার দোষ দেব না। এটাই স্বাভাবিক, আর আমার মূর্খতার যোগ্য পুরস্কারও।'

আগা উঠে দাঁড়ায়। নিজের তরবারিতে হাত দিয়ে বলে, 'আমি ঈশ্বরের নামে, পাঠান জাতের নামে, এই তলোয়ার স্পর্শ ক'রে বলছি যে একথা কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি শুনতে পাবে না। আমি আপনার পরামর্শ না নিলেও আপনাকে কখনই বিপদে ফেলব না।'

কিছুটা আশ্বস্ত হন এবার হেকিম সাহেব। কিন্তু পুরোটা যে হন না তা আগা বুঝতে পারে। তবে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না সে। উঠে নিজের কাজে চলে যায়। এ লোকটার পাপসংসর্গে থাকতে তার গা ঘিনঘিন করছিল।

অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা।

এই কটা মাসের সংক্ষিপ্ততম ইতিহাস বলতে হলে বড় বড় হরপে ঐ দুটি কথা লিখে দেওয়াই যথেষ্ট।

কী যে হচ্ছে তা অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারে না আগা। কে কর্তা, কে লড়াই করছে, কে শাসন করছে রাজত্ব—তা বোধ হয় কেউই ভালো রকম জানত না। শাহ্জাদারা সকলেই স্ব স্ব প্রধান। সকলেই নিজ স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা চালিত। সে স্বার্থবুদ্ধিও খুব তীক্ষ্ম এবং হিসাবী নয়। দূরদৃষ্টি বা স্থির বুদ্ধি নেই কারো। শাহ্জাদারা ভাবেন তাঁরাই হুকুম দেবার মালিক, বখ্‌ৎ খাঁও তাই ভাবেন। সিপাহীরা কিন্তু কারো হুকুম বিশেষ শোনে না। ইংরেজ একেবারে দিল্লীর উপর এসে পড়ায় ঈষৎ কাণ্ডজ্ঞান ফিরে এল বটে, কিন্তু তাও খুব বেশী নয়। ওদের লড়াইয়ের চেহারাটা কয়েকদিন মাত্র দেখেই আগা বুঝল—'তদা নাশংসে বিজয়ায়।' ইংরেজ কেমন কর্মঠ তা সে আজও জানে না, কিন্তু এরা যে কি পরিমাণ অকর্মণ্য ও অপদার্থ তা বুঝতে খুব বেশী জানা-শোনার দরকার হয় না।

শহর প্রায় ধনীশূন্য হয়ে পড়েছে। অল্প যে কজন টিঁকে ছিল, তাদের কাছ থেকে ছলে-বলে-কৌশলে যতটা সম্ভব টাকা আদায় করা হয়েছে, তারাও এখন নিঃস্ব। ছোট বড় সব ব্যবসাদার বিরক্ত ও বিব্রত। অধিকাংশের কাজকারবার অচল। সুতরাং তারাও অন্তঃসারশূন্য। এ অবস্থায় লড়াই চলতে পারে না। যুদ্ধের প্রধান কথা হল হাতিয়ার এবং রসদ। রসদ যোগাবার পথ একরকম বন্ধ। সিপাহীরা তন্‌খা পাচ্ছে না যে নিজেরাও কিনে খাবে। অস্ত্র ও গোলাবারুদ যা ছিল তাতে এখনও চলছে বটে কিন্তু বেশীদিন চলবে না। নূতন ক'রে তৈরী করার লোক নেই এদের মধ্যে। যারা আছে তারাও মাল পাচ্ছে না। অর্থাৎ আশা এবং ভরসা কোন দিকেই নেই। কোথাও নেই।

শুধু কিল্লা-ই-মুয়াল্লা কেন, সারা শাহ্জানাবাদের আকাশে যে কালো মেঘটা ঘনিয়ে এসেছে, যেটা গত কয়েকমাস ধরে একটু একটু ক'রে কৃষ্ণতর হচ্ছে সে সম্বন্ধে সকলেই অবহিত। সে সত্যটা স্বীকার করলে এদের পায়ের নিচে আর মাটি থাকে না বলেই শুধু চোখ বুজে আছে সিপাহী এবং তাদের তথাকথিত নায়করা। বাদশা নিজেও সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র অনবহিত নন। তাঁর উদাস হতাশ দৃষ্টি, বিষণ্ণ গম্ভীর মুখ এবং ক্রমবর্ধমান অস্থিরতায় তা টের পাওয়া যায়। আগা জানে—আকবর আলমগীরের বংশধররা ভাঙে কিন্তু মচকায় না। তাঁর মুখে এখনও পর্যন্ত কোন বিলাপ বা পরিতাপ প্রকাশ পায় নি। কণ্ঠস্বরও প্রশান্ত। কিন্তু সেটা যে বহুদিনের অভ্যস্ত ছদ্মবেশ সে সম্বন্ধে আগার কোন সন্দেহই থাকে না। ভেতরে ভেতরে তিনি যে একটা হিম-হতাশা অনুভব করছেন—অথবা দীর্ঘদিন ধরেই ক'রে আসছেন তা বেশ টের পাওয়া যায়।

বাদশা আরও ভেঙে পড়েছেন তাঁর বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও অনুচর আহ্‌সানউল্লার ব্যাপারে। হেকিম সাহেব চতুর লোক। মেঘটা তিনি অনেকদিন ধরেই লক্ষ্য করছেন এই মহামহিম প্রাসাদ-দুর্গ কিল্লা-ই-মুয়াল্লার ভাগ্যাকাশে। এই অসম যুদ্ধের ফলাফল ও পরিণাম আগার মতো অপরিপক্ক তরুণ যুবা অনুমান করতে পেরেছে সেটা তাঁর মত ঝানু লোকের বুঝতে দেরি লাগে না। তিনি দেখেছেন এবং ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। তলে তলে ইংরেজদের সঙ্গে একটা ষড়যন্ত্রও চালাচ্ছিলেন।

সিপাহীরা তাই বিশ্বাস করে অন্ততঃ। বাদশাও জানতেন সে কথা। আগার সামনেই কথাটা হঠাৎ উঠেছিল। আগার উপস্থিতি ভুলে গিয়ে উত্তেজিত বাদশা এই সংক্রান্ত প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরের উদ্বেগ অনুযোগ ও ধিক্কার লক্ষ্য ক'রেই আগা বুঝেছিল সংবাদটা কতখানি বিচলিত করেছে বাদশাকে। অবশ্য বেশী কিছু আর শুনতে পায় নি। মুহূর্তে তার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে তাকে বাইরে যেতে আদেশ দিয়েছিলেন বাদশা। তবে মনে হয় যেন শুধু নিজের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্যেই এটা করছেন না, তিনি যদি ইংরেজদের মনে বিশ্বাস জন্মাতে পারেন, তাহ'লে বাদশা এবং তাঁর প্রেয়সী বেগম জিন্নৎমহলের পক্ষেও মঙ্গল। তিনি ওদের বুঝিয়ে দিতে পারবেন যে বাদশা এবং বেগমসাহেবার ঘোরতর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁদের জড়ানো হয়েছে এই বিদ্রোহের সঙ্গে।

কিন্তু আহ্‌সানউল্লা যতই বুদ্ধিমান হোন, যতই কূট-কৌশলী হোন, তাঁর এই এই ভাবগতিক সিপাহী ও তাদের নেতৃবৃন্দের কাছে চাপা থাকে নি। হয়তো তারা বহু পূর্ব থেকেই তাঁকে সন্দেহ ক'রে আসছে। নজর রেখেছিল তার গতিবিধির উপর। তাই সামান্য ভাবান্তরও চোখে পড়েছে। দু'একবার এ নিয়ে বাদশার কাছে নালিশও গেছে। হেকিম সাহেব বহুকষ্টে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে এ অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা, মনে-প্রাণে তিনি সিপাহীদের দিকে। মুঘলদের শাহী তখ্‌ৎ কলঙ্কমুক্ত হয়ে আবার পূর্ব গৌরব ফিরে পায় এই তো তাঁর সারা জীবনের স্বপ্ন, জিন্দিগীর সাধনা। তিনি তো সিপাহী অভ্যুত্থানের অনেক আগে থেকেই এদিকে কাজ করছেন।...

তবে শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারলেন না আহ্‌সানউল্লা সাহেব। শ্রাবণের এক দুর্যোগঘন রাতে ঝাড়ুদারের বেশে যখন পালাবার মতলবে নিজের ঘ'র অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বেশ পরিবর্তন করছেন তখন তাঁকে বন্দী করল সিপাহীরা। বাদশার হুকুমের কেউ তোয়াক্কা করল না। তাঁকে জানানোও আবশ্যক বিবেচনা করল না। এমন কি এ ঘটনার পূর্বাভাস শাহ্‌জাদারাও টের পান নি। যখন জানলেন তখন আর কিছু করার নেই। আর হেকিম সাহেবের উপর শাহ্‌জাদারাও খুব প্রসন্ন ছিলেন না।

কিছুটা নেকনজর ছিল মির্জা জওয়ান বখ্‌তের। কিন্তু তিনিও তাঁর মায়ের উপর হেকিম সাহেবের একটা অশুভ অবাঞ্ছিত প্রতিপত্তি লক্ষ্য ক'রে ইদানীং বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। সুতরাং আহ্‌সানউল্লাকে মুক্ত করার জন্যে কেউ একটা অঙ্গুলি হেলনেরও ক্লেশ স্বীকার করলেন না। বাদশা ও জিন্নৎমহল বেগম ছাড়া কেউ ক্ষুণ্ণও হলেন না।

॥ একুশ ॥

আশ্বিনের প্রথম দিকেই সকলে বুঝতে পারল যে ইংরেজদের আর বেশী দিন ঠেকানো যাবে না। তাদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বা হচ্ছে যথেষ্ট, খাদ্যাভাব, চিকিৎসাভাবে তাদের দুর্গতির শেষ নেই। যুদ্ধে যত লোক মরেছে, রোগে তার চেয়ে কম মরে নি, তবু তাদেরই যে জয় অনিবার্য এটা ক্রমশ সকলের কাছেই দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল। ইংরেজ মরতে বা মার খেতেও ভাল জানে এদের থেকে—আর যুদ্ধজয়ী

হবার পক্ষে বোধহয় সেটাই বড় কথা। তাছাড়া তাদের বাইরে থেকে সাহায্য আসছে। আরও আসবে বলে শোনা যাচ্ছে, আর এপক্ষে যেটুকু ক্ষয় সেটা পূরণ হবার কোন আশাই নেই। কানপুর, লক্ষ্মৌ, বেরেলী, কাশী, এলাহাবাদ—কোথাও অবস্থা ভাল নয় সিপাহীদের। কোথাও থেকে কোন আশা বা আশ্বাসের খবর এসে পৌঁছচ্ছে না। কারো পক্ষে সম্ভব হবে না দিল্লীর শাহী তখ্‌ৎ রক্ষা করতে এগিয়ে আসা। বরং কোম্পানীর ব্যূহই অব্যর্থ ও অমোঘ গতিতে ঘনীভূত হচ্ছে। জালিক তার জাল গুটিয়ে আনছে, আস্তে আস্তে চারিদিক থেকে এগিয়ে আসছে তাদের শক্তি। ঘিরে ধরছে এদেশীয়দের অবশিষ্ট বাধা দেবার ক্ষমতা। বজ্রকঠিন মুষ্টি তাদের উপর একটু একটু ক'রে চেপে বসছে, দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে তা। সে মুঠি থেকে বেরিয়ে আসার মতো কোন রন্ধ্র কোথাও খোলা নেই।

মরতেই হবে। ক্রুদ্ধ ইংরেজদের হাতে পরিত্রাণ নেই কারও। সে খবরও এসে পৌঁছচ্ছে প্রত্যহ। যে দিক দিয়ে আসছে—পথে পথে যে কোন শক্তসমর্থ জোয়ান মরদ দেখছে তাঁকেই ফাঁসি দিতে দিতে এগিয়ে আসছে ওরা। পথের দু ধারে বড় বড় সব গাছগুলোই ফাঁসীকাঠে পরিণত হয়েছে। এই 'নেটিভ' কৃষ্ণাঙ্গ বিশ্বাসঘাতকদের জন্য গোলাবারুদ খরচ করতে প্রস্তুত নয় তারা ; অথবা তাদের বিশ্বাস, গুলি ক'রে মারাও এক প্রকারের দয়া প্রদর্শন। এদের জন্যে ফাঁসিই প্রকৃষ্ট শাস্তি।

সুতরাং শাহ্‌জাহানাবাদ তথা লালকিল্লার পতন হলে সেদিন এরা কেউই বাঁচবে না। সম্ভবত শাহ্‌জাদা বা বেগমরাও নয়। বাদশাকেও রেহাই দেবে না হয়ত। যদি বা তাঁরা কোন কৌশলে পালাতে পারেন, ওদের মতো চুনোপুঁটির পরিত্রাণ নেই —তা আগা ভাল রকমই বুঝেছে। তাদের মরতেই হবে। তাকেও। সেজন্যেই প্রস্তুত হচ্ছে সে।

অবশ্য একটা দুর্ভাবনা তার দূর হয়েছে। গুলের ভাবনা আর তার নেই। মায়ের ভাবনাও নয়। দিলুর সঙ্গে গুলের শাদী হয়ে গেছে। এই হাঙ্গামার মধ্যে বিয়ে দেবার কথা আগার মাথাতেও আসত না—কিন্তু দিলুই জোর করেছে। তার মায়েরই নাকি ইচ্ছা। কার ইচ্ছাটা যে বেশী সে সম্বন্ধে আগার সন্দেহ থাকলেও সে সানন্দে সম্মতি দিয়েছে। বেঁচে গেছে সে এই বিপুল দুর্বহ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়ে। শুধু তাই নয়, দিলুরা এ শহর ছেড়ে দেহাতের দিকে চলে গেছে। দিলুর মা তাঁর গোপন সঞ্চয় বার ক'রে দিয়েছেন—সেখানেই নতুন ক'রে জমি নিয়ে আবার বাড়িঘর তুলে নিয়েছে দিলু।

দুর্যোগের দিনে অবশ্য টাকা থাকলেও কাজ হয় না। দিলুও পারত না যেতে, যদি না ইংরেজদের সাহায্য পেত। যে ক্রীশ্চানের দোকান বাঁচাতে গিয়ে উদ্যত গুলির সামনে সে বুক পেতে দিয়েছিল—সেই লোকটা এখন ইংরেজদের ছাউনীতে গিয়ে দোকান খুলেছে। সে-ই বার্নার্ড সাহেবকে বলে একদল গুর্খা সিপাহী দিয়ে ওদের দেহাতের দিকে যাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। নাহলে টাকাকড়ি মালপত্তর কিছুই নিয়ে যেতে পারত না। ওধারে যাওয়ার সোজা রাস্তাটা এখনও অনেকটা সিপাহীদের কবলে। দেখা পাওয়া মাত্র লুঠপাট ক'রে দিত।

যাই হোক, সুখে আছে শান্তিতে আছে তারা—এ-ই আগার পক্ষে যথেষ্ট। দুচার দিন ওদের সংসারে থেকে আসতে পারলে খুশী হ'ত আগা। কিন্তু পাছে সে আবার কোন নতুন অভিশাপ, কোন অশান্তি পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় ওদের আনন্দের সংসারে—এই ভয়েই যেতে পারে নি। তবে খবর পায় প্রত্যহই। লোক মারফৎ খৎও

পাঠায় দিলমহম্মদ। এই তো শেষের চিঠিতে লিখেছে—'বাড়ি দেখলে আর চিনতে পারবে না দোস্ত্। মনে হবে কোন রইস আদমীর বাড়ি। আর আরামের এত ব্যবস্থাও জানে তোমার বোন! তবে কি জানো ভাই, আরাম আর সুখ যে একটু চেখে চেখে ভোগ করব তা ওর জন্যে হবার জো নেই। ফজর থেকে যতক্ষণ না সাঁঝের আঁধার নামে—নাকে দড়ি দিয়ে খাটিয়ে নেয়। রাগ ক'রে মাঝে মাঝে বলি—এই রইল তোর ঘর সংসার, আমি গিয়ে কোম্পানীর ফৌজে নাম লেখাব। তাতেও কি ভয় পায়? বলে, যাও না, আমি তাহলে বাঁচি। বুড়ো খোকার ঝক্কি পোয়াতে হয় না। এখানে এই খাটুনিই পারেন না, উনি যাবেন লড়াইয়ে! সেখানে জাঁদরেল সাহেব আমার মতো কচৌরী হালুয়া নমকীন ক'রে তোমায় সাধাসাধি করবেন—না তোমায় কুচকাওয়াজ করাবেন?...বুঝলে দোস্ত, ছুঁড়ি বড়ই আস্কারা পেয়ে গেছে, বুঝে ফেলেছে কিনা যে ওকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না।'...

আনন্দ হয় আগার; তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ভাবে, আহা সুখে থাক দুটিতে, শান্তিতে থাক। এমন আনন্দেই যেন জিন্দিগীর বাকী কটা দিন কাটিয়ে দিতে পারে।......আবার কেমন যেন একটু ব্যথাও অনুভব করে। সামান্য একটু অপ্রকাশ্য ঈর্ষা। কোথায় যেন একটা অব্যক্ত ব্যথায় টনটন করতে থাকে বুকের মধ্যেটা।

তারই কিছুই হ'ল না শুধু, সে-ই কিছু পেল না। তার জীবনটা মরুভূমি হয়ে রইল চিরদিনের মতো। এক এক সময় অস্পষ্ট ঈর্ষাটা স্পষ্ট জ্বালা হয়েও প্রকাশ পায়। ভাবে, যে বোনের জন্যে তার আজ এই দুর্দশা—সে তো বেশ সুখে শান্তিতে সংসার পেতে বসল, মাঝখান থেকে তার জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে গেল চিরদিনের মতো। এমন নিঃস্ব রিক্ত হয়ে এখানে এসে না পেঁাছলে তো এসব যোগাযোগও হ'ত না, আর বাদশাজাদীর পৃষ্ঠপটে নিজের জীবনের ব্যর্থতাও এমনভাবে ধরা পড়ত না। সেই উজ্জ্বল আলোতেই না নিজের দৈন্য নিজের অকিঞ্চিৎকরতা এমন স্পষ্ট হয়ে উঠল! ...কেন, কেন সে-ই চিরদিন একা এমনভাবে বঞ্চিত হয়ে থাকবে! চিরদিন এই যাবতীয় দুর্ভাগ্যের বোঝা বয়ে বেড়াবে! তার বেলায়ই কেন জিন্দিগীর সঞ্চয় হয়ে উঠবে আকাশজোড়া হাহাকার!

আবার জ্বালাটা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শিউরেও ওঠে।

ছি ছি, এসব কি ভাবছে সে যা-তা! ওরাও কি কম কষ্ট পেয়েছে! আহা সুখে থাক ওরা। সুখী হোক, নিশ্চিন্ত হোক, তার দুর্ভাগ্যের বোঝা তাকেই বয়ে বেড়াতে হবে চিরকাল। অপরের দুর্ভাগ্য সেজন্যে কেন সে কামনা করবে? আর কেউ তার সঙ্গে সমান কষ্ট পাচ্ছে জানলে তার বোঝা কি হাল্কা হবে? এর ওপর তাদের দুর্ভাবনা যে ভাবতে হচ্ছে না, শুধু নিজের জীবন নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাগ্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে অতঃপর, এইটুকুই তো যথেষ্ট। এর জন্যেই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত তার খোদাতালার কাছে।

প্রকৃতিস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অকারণ জ্বালা ও তিক্ততার জন্য, নিজের চিন্তার এই দৈন্য ও মানসিক নীচতার জন্য লজ্জা হয় তার। ভেবে পায় না, এমন কথা তার মাথায় আসে কেমন করে? এত ছোট সে?

আসলে এই হাঙ্গামা বাধার পর থেকে ওর জীবনের যে সামান্য আনন্দ অবসরটুকু ছিল—সেটুকুও হারিয়ে গেছে। নিদাঘ দিনের দিবাস্বপ্নের মতোই শান্তি ও সুখের সেই ক্ষণস্থায়ী বাসাটুকু আর খুঁজে পাচ্ছে না সে। শাহ্‌জাদী ও শিরীণের সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ করতে পারে নি। স্বপ্নে দেখা সে অস্তিত্বটুকু নিদ্রা-

ভঙ্গের রূঢ় বাস্তবে কোথায় মিলিয়ে গেছে। তাতেই নিজেকে এত একান্ত রিক্ত ও ভাগ্যহত বোধ করছে সে। অপরের সুখ-সৌভাগ্যের সংবাদে তার বেদনার তন্ত্রীতে তাই এমন আঘাত লাগছে।

ওর আরও অসহ্য বোধ হয় এই জন্য যে, এই প্রাসাদ-দুর্গের মধ্যেই তারা দু'টি প্রাণী বাস করছে, মাত্র কয়েকশ' গজের ব্যবধান বড় জোর, অথচ সেইটুকুই আজ অলঙ্ঘ্য হয়ে উঠল। এত কাছে থেকেও চোখের দেখা তো দূরের কথা, একটা খবর পর্যন্ত পাচ্ছে না। লালকিল্লা এখন বারোভুতের আস্তানা হয়ে উঠেছে। কতক-গুলো অসভ্য পুরবীয়া সিপাহীর যথেচ্ছাচারিতার লীলাভূমি। বাদশাহী এরা কখনও চোখে দেখে নি—সম্ভবত শোনেও নি—তার রীতিনীতি কায়দা-কানুনের কথা। কোন আদব-কায়দা ভদ্রতা-ভব্যতার ধার ধারে না তারা। এদের শাসন বা সংযত করবেন—এমন লোকও কেউ নেই। সুতরাং যতটা সম্ভব সযত্নেই মুঘল অন্তঃ-পুরিকারা অন্তঃপুরের কপাটের আড়ালে আত্মগোপন করেছেন। সমস্ত অন্দরমহল-টাকেই যেন বুরখা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সম্ভবতঃ এছাড়া তাঁদের সম্ভ্রম রক্ষার কোন উপায়ও ছিল না।

এক এক সময় হতাশ হয়ে আগা ভাবে, হয়ত দূরে কোথাও সরিয়েই দেওয়া হয়েছে তাদের। বহুদিন আগে, এই গণ্ডগোল শুরু হওয়ার ক'দিন পরেই, একবার দেখা হয়েছিল রাবেয়ার সঙ্গে। সে তখন একবার বলেও ছিল যে, হয়ত মেয়েদের মেহেরৌলি বা কুতুবের দিকে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হবে। হয়ত, আগা জানে না, কোন নিশীথ রাত্রের অন্ধকারে বা কোন সুড়ঙ্গপথে দিনমানেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের। নইলে, আগা ভাবে, শিরীণ্ অন্তত কি কোনমতে একবার যোগাযোগ করত না?

প্রেম মানুষকে স্বার্থপর এবং একদেশদর্শী ক'রে তোলে। না হ'লে আগার মনে পড়ত যে নিজের জীবন এবং সম্মান বিপন্ন ক'রে এই দুর্দিনে তার সঙ্গে যোগাযোগ করবে—শিরীণের তরফ থেকে তার সম্বন্ধে এতখানি আকর্ষণের কোন সঙ্গত কারণ নেই। সে-ই শিরীণের কাছে ঋণী, শিরীণের কোন ঋণ নেই। সে অকৃতজ্ঞতা এবং ঔদাসীন্য ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে নি শিরীণকে—শিরীণের এতখানি অনুরাগ ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে এতটুকু স্নেহ পর্যন্ত দিতে পারে নি—প্রেম তো দূরের কথা। আজ কোন্ দাবীতে সে আরও আত্মত্যাগ প্রত্যাশা করবে তার কাছে? প্রত্যাশা করবে আরও অনুরক্তি!

•

আহ্সান্উল্লা সাহেব বন্দী হবার ঠিক পাঁচ সপ্তাহ পরে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার সময় আগার ডাক পড়ল বাদশার ঘরে। শুনল বাদশা জাফর-মহলে আছেন, সেখানেই তাকে যেতে বলে দিয়েছেন।

নানারকম গুজব শোনা যাচ্ছে কদিন যাবৎ। লালকিল্লা খালি-খালিও ঠেকছে অনেকটা। অন্তত আগের ভীড় আর নেই। নিহত হয়েছে অনেকে, পালিয়েছে আরও বেশী। যাদের কিছুমাত্র সুযোগ আছে পালাবার, কোথাও কোন নিরাপদ আশ্রয় আছে—তাদের প্রায় সকলেই সে সুযোগ গ্রহণ করেছে। বেরেলীর বখ্ৎ খাঁ বাদশাকেও পালাতে বলেছিল, উত্তর দিকে বা পূবে কোথাও নিরাপদ স্থানে গিয়ে নতুন ক'রে ফৌজ গড়বার পরামর্শ দিয়েছিল। বাদশা কিন্তু রাজী হন নি। এখনও কি আশা রাখেন তিনি, কে জানে। অথবা কোথাও কোন আশা রাখেন না বলেই

রাজী হন নি। ভাগ্যের সঙ্গে পাঞ্জা লড়বার আর শখ নেই তাঁর, সাধ নেই বালির বাঁধ দিয়ে বন্যা রোধ করার।

আগা যখন জাফর-মহলে প্রবেশ করল তখন বাদশা একাই বসে আছেন। আশ্বিনের অপরাহ্ণ বহুক্ষণই হায়াৎবক্স বাগের বড় গাছগুলোর আড়ালে আত্মগোপন করেছে। জাফর-মহলের সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ঘনিয়ে এসেছে অন্ধকার। কিন্তু তবু কেউ বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে যায় নি সে ঘরে। ঝাড়ের বাতি আর জ্বলে না। অত মোমবাতি নেই। তেলের আলো, তাও জ্বলে নি একটা। হয়তো বাদশার নিজস্ব ভৃত্যরাও বিশেষ কেউ নেই আর। যাকে খান-ই-সামানের পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল নয়া রাজগীতে—যার এই সব চাকরবাকরদের চালিত করবার কথা—তিনি বহুদিনই নিরুদ্দেশ। তবু হয়ত একটা চিরাগ জ্বেলে দেবার লোকাভাব হত না, সম্ভবত বাদশাই জ্বালতে দেন নি। কিম্বা না বললে আজকাল আর কেউ গরজ ক'রে জ্বালে না।

ইদানীং এমনি বসে থাকেন বাদশা। তামাকু কেউ মনে ক'রে সেজে দিয়ে গেলে বসে বসে টানেন। নইলে সেটুকুও না। তামাকু সেজে দিতে বলেন না কাউকে। কিছুই বলেন না, নড়েনও না। বোধ হয় নিজের দুর্ভাগ্যের বা বিচিত্র ভাগ্যের চিন্তাতেই তন্ময় হয়ে বসে থাকেন।

ঘরে ঢুকে প্রথমটা কিছুই দেখতে পেল না আগা। একটু পরে, চোখ যখন অন্ধকারে অপেক্ষাকৃত অভ্যস্ত হল তখন দেখল বাদশা একটা চারপাইয়ের উপর গোটা দুই মোটা মোটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে আছেন। হাতে গড়গড়ার নলটা ধরা আছে অভ্যাস মতো—কিন্তু কলকেতে আগুন নেই—তামাক পুড়ে ছাই হয়ে গেছে অনেক আগে। টানছেনও না, কেবল নলটা কেউ হাত থেকে নামিয়ে নেয় নি বলেই নামান নি।

চারপাইতে বসে থাকতে দেখে বিস্মিত হয় না আগা। কদিন নাকি এখানেই রাত্রিবাস করছেন বাদশা। দিনরাতের বাসা হয়ে উঠেছে তাঁর এই ঘর আর এই শয্যা। সাধারণত যে বিলিতী আরাম-চৌকিটাতে বসে উনি কাব্যচর্চা করেন সেটা মোটেই দেখা যাচ্ছে না কদিন। এই চারপাই এবং গড়গড়া ছাড়া ঘরে আর কোন আসবাব নেই। এই দুটি বস্তু, আর এক কোণে একটা কালো কাপড় জড়ানো মেটে সুরাই ও একটি বদনা। দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা—দীনদুনিয়ার মালিক শাহনশাহের অস্থাবর সম্পত্তি বলতে বোধহয় আর কিছু অবশিষ্ট নেই। হয়ত সব বেচে খেয়েছেন শাহজাদার দল—কুর্সীটা সুদ্ধ। কিম্বা সিপাহীরা কেউ খুশিমতো উঠিয়ে নিয়ে গেছে তাদের ব্যারাকে। কোন জমাদার বা সুবেদার-মেজর নিজের দপ্তরে ব্যবহার করছেন বাদশাহী কেদারা, মেজ আর কলমদান।

একেবারেই স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন বাদশা, যেমন স্থির হয়ে শুধু বাবরশাহী তৈমুরশাহীরাই বসে থাকতে পারেন। এখন আগাকে এসে দাঁড়াতে দেখে সেই নিথর পাথরখানাতে যেন একটু প্রাণসঞ্চার হল। আবরোঁয়ার আঙরাখা পরা মূর্তিটা একটু নড়েচড়ে বসল। হাতে ধরা ফরসীর মুখ-নলটা নেড়েই ইঙ্গিত করলেন বাদশা আরও কাছে আসতে।

বাদশার সামনে কুর্ণিশ করতে করতেই এগিয়ে আসার নিয়ম। আগাও সেইভাবে আসছিল কিন্তু শাহজাফর যেন তাতে বিরক্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, 'আঃ, ওসব কেতা-কানুন থাক এখন। মিছিমিছি আর ওসবে সময় নষ্ট করতে হবে না। ঘরে

আর কে আছে, কাকে করছ কুর্ণিশ? কে দেখছে ওসব কায়দা? ওসব ঘুচে গেছে, আর কোন কাজে আসবে না কোনদিন। দরবারের কানুন ওসব। সে দরবারের কাল খতম হয়ে গেল চিরদিনের মতো। আংরেজ কোম্পানী বাদশা হবে, তারা অত কেতাকায়দার ধার ধারে না। কায়দার চেয়ে তাদের কাছে কাজের দাম বেশী।'

বিরক্ত কণ্ঠস্বরে তিক্ততা আছে, ঝাঁঝ নেই। সে তিক্ততাও কোন ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে নয় হয়তো। সম্ভবত কোন স্পষ্ট নালিশও নেই কারও বিরুদ্ধে। সব নালিশ সব অনুযোগ সব তিক্ততা হয়ত তাঁর নিজের সম্বন্ধেই, এতকাল বেঁচে থাকার জন্যে নিজের বিরুদ্ধেই।

ভয় কেউ করে না আর বাদশার বিরক্তিতে, আগাও করল না। দুঃখই বোধ করতে লাগল বরং। অসহায় অবোধ শিশুর বেদনায় যেমন মমতা-ভরা দুঃখ অনুভব করে মানুষ—তেমনিই। সে কুর্ণিশ বন্ধ করল না, অভ্যস্ত রীতি পালন ক'রেই কাছে এসে নতমস্তকে দাঁড়াল, বাদশার মর্জির প্রতীক্ষায়।

বাদশাও মুখনলটা হেলিয়ে বললেন, 'বসো।'

বাদশার সামনে বসা! তার মতো সামান্য নফর হয়ে! আগা বিষম বিব্রত হয়ে পড়ল, তাঁর আদেশ বড় না সম্মান বড় ঠিক বুঝতে না পেরে। কি করবে সে ঠিক করতে পারল না। সুতরাং তেমনি নতমুখে দাঁড়িয়েই রইল।

'দাঁড়িয়ে রইলে কেন—বসো। বাদশার সামনে বসার রীতি নেই, তাই ভাবছ? বাদশা কোথায়? বাদশা আর বাদশাহী দুই-ই ফৌৎ হয়ে গেছে, বাবরশাহী বংশের এন্তেকাল হয়েছে বহুদিনই। তোমার সামনে যা দেখছ সেটা ঐ দুয়েরই মুর্দা। মুর্দার সামনে আর কায়দা-কানুন রীতি-আচারের প্রশ্ন কি?...যা বলছি শোন, বসো এখানে আমার কাছে। এই একেবারে কাছে। কেউ নেই অবশ্য ধারে কাছে, মুর্দার মর্জি-মাফিক ফরমাশ খাটবে এমন বেঅকুফ কে আছে। এ মহলেই কেউ আসে না আজকাল, তবু তোমার সঙ্গে কথাটা গোপনেই বলতে চাই। অত দূরে দাঁড়ালে শোনাতে পারব না। বেশীক্ষণ চেঁচিয়ে কথাও বলতে পারি নে আজকাল।'

অগত্যা আর একটু কাছে এসে ওঁর চারপাই'য়র ঠিক ধারেই বসল আগা, মেঝের উপর। পাথরের মেঝে, আগে এখানে কার্পেট পাতা থাকত। সে কার্পেটও কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে। বহুদিন কেউ বোধহয় ঝাড়ুও লাগায় নি। ধুলো ও জঞ্জালে বিবর্ণ হয়ে গেছে মেঝের পাথর। তবু তাতেই বসল আগা। বাদশার দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এসেছে, তাছাড়া এসব দিকে দৃষ্টি দেবার অবস্থাও এখন নয়। কার্পেটটা যে নেই তাও বোধহয় তিনি খেয়াল করেন নি, নইলে ওই ধুলো-জঞ্জালের উপর নিশ্চয়ই বসতে বলতেন না।

আগা বসবার পরও বাদশা অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইলেন। নিঃশব্দে। কী বলবেন তিনি, কী এমন অকল্পিত রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করবেন, কোন আজানা ভবিষ্যতের—কে জানে! কে জানে এখনও কী প্রয়োজন আছে, কোন প্রয়োজন থাকা সম্ভব! এই সর্বনাশের কূলে দাঁড়িয়েও কোন গোপন স্বার্থসিদ্ধির স্বপ্ন দেখছেন!... গোপনে কোথাও পাঠাতে চান কিনা কোন সাহায্যের জন্যে, এখনও কোন ক্ষীণ আশা ওঁর মনে আছে কিনা এ যুদ্ধে জয়লাভ করার! অথবা ইংরেজদের অমোঘ ও নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে কোন ছেলেমানুষী প্রচেষ্টা করতে চান?......

কয়েকটি নীরব মুহূর্তে অনেক কিছু ভেবে নিল আগা। এ কি সঙ্কোচ,

না ক্লান্তি? না হতাশা? সঙ্কোচ হলে তাজ্জবের কথা, তার মতো ভৃত্যকে আদেশ করতে সঙ্কোচ বোধ করছেন? এমন কি আদেশ করতে পারেন তিনি?

কিছুই ভেবে পেল না আগা। সেই প্রায়ান্ধকার প্রকোষ্ঠে বাদশার আঙরাখার শুভ্র আস্তিনটার দিকে চেয়ে সেও চুপ করে বসে রইল।

অনেকক্ষণ পরে বাদশা বললেন, 'বাবা আগা, তোমার কাছে আমার একটি ভিক্ষা আছে—'

যেন শিউরে উঠল আগা।

'ছি ছি, এসব কি বলছেন শাহান্‌শাহ্‌। এতে যে আমাকে দারুণ অপরাধী করা হয়। এসব কথা যে শোনাও গুনাহ্‌। আপনি আদেশ করলেই আমি কৃতার্থ হবো।'

'আঃ—!' ক্লান্ত বিরক্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন বাদশা, 'ঐ সব ভণ্ডামি, ঐসব শুকনো শিষ্টাচার আর আমার ভাল লাগছে না আগা। অনেক শুনেছি, অনেক দেখেছি। জীবনভোরই দেখছি আর শুনছি এই তামাশা। আগে তামাশা মনে হত, এখন মনে হয় মর্মান্তিক পরিহাস। অপমান বোধ হয়। মনে হয় আমার এই শোচনীয় অসহায় অবস্থাকে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে।...না না, এ দরবার নয়, আমিও আর বাদশা নই। এই নির্জন ঘরে আমি এক অথর্ব বৃদ্ধ, তুমি নওজোয়ান ছোকরা। অন্য সব সম্পর্কের কথা ভুলে যাও। যা কিছু সম্পর্ক পরিচয় তা এখন কেবল ইন্‌সানের। তুমি মানুষ, আমিও মানুষ। শুধু এইটুকু ভাবতে চেষ্টা করো।'

আগা বলল, 'তা হলেও আপনি আমার পিতামহের বয়সী; আপনার আদেশই আমার কাছে বাদশার আদেশ, মনিবের আদেশ। ভিক্ষা শব্দটা আর দয়া ক'রে ব্যবহার করবেন না। হুকুম করুন—এ দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও তা পালন করব।'

'করবে? করতে পারবে?' এই প্রথম পূর্ণ প্রাণলক্ষণ প্রকাশ পায় পাথরের মূর্তিটায়; আগ্রহে আরো সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েন, 'কথার কথা নয় কিন্তু! হয়ত শেষ পর্যন্ত তাই দিতে হবে। কঠিন বিপদের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে হয়ত—প্রাণ-সংশয় হবে প্রতিপদে। দেখ, ভাল ক'রে ভেবে দেখ। আমি জোর করছি না, কোন কিছু দাবীও করছি না। কারও কাছে কোন দাবী নেই আর—কাউকে জোর ক'রে কিছু বলার অধিকারও নেই। কেননা তার বদলে কিছু দেবার ক্ষমতা নেই আমার। উপকারের বদলে কোন প্রত্যুপকার করতে পারব না। তাই শুধু নিতে হবে, যে দেবে সে দয়া ক'রে দেবে। এখন যে ঋণ করব তার বোঝা টেনেই খোদাতালার দরবারে পৌঁছতে হবে।'

'না শাহান্‌শাহ্‌, আমার গুস্তাকী ক্ষমা করবেন—আপনার একটু ভুল হচ্ছে। আমার বেলা অন্তত একথা খাটছে না। আপনার আদেশ পালন করতে গিয়ে আমার যদি মৃত্যুও হয়, তাহলেও আপনাকে কোন ঋণ নিয়ে যেতে হবে না। বরং আমি এই তৃপ্তি এবং কৃতজ্ঞতা নিয়ে যেতে পারব যে শেষ মুহূর্তে আমাকে ঋণ পরিশোধের সামান্য সুযোগ আপনি দিয়েছেন।'

বুঝতে পারেন না ঠিক বাদশা। এ ধরণের কৃতজ্ঞতায় অভ্যস্ত নন তিনি। তাছাড়া গত ক'মাসের ঘটনার ঘূর্ণিপাকে, আশা-নিরাশার ক্লান্তিকর দ্বন্দ্বে অনেক কথাই তিনি ভুলে গেছেন। সব যেন ঘুলিয়ে যাচ্ছে ইদানীং।

বাদশার ঘোলাটে চোখের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি সেই অন্ধকারেই অনুভব করে আগা। বলে, 'আপনি মহানুভব, বহু দয়া করুণার ইতিহাস আপনার জীবনে আছে।

আপনি বাদশা, প্রতিপালকও আপনি, আমার মতো সামান্য প্রাণীর প্রাণরক্ষার কথা আপনার মনে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু আমার কাছে আমার প্রাণ বড়, তাই আমার মনে আছে। আমি আজও ভুলি নি যে সির্ফ আপনার মেহেরবানিতেই একদিন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম। সেই মুহূর্তের মৃত্যুই শুধু নয়, তার পরেও যে মৃত্যু অবধারিত ছিল, অনাহারে ও অনাশ্রয়ে, তারও ব্যবস্থা আপনি ক'রে দিয়েছিলেন, আশ্রয় ও নোকরি দিয়ে। তাও ভুলি নি। এ জীবন আপনার দেওয়া, আপনার কাজে লাগার চেয়ে তার সদ্‌গতি আর কি হতে পারে।'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন বাদশা। একটু চুপ ক'রে থেকে আরও মৃদু আরও গাঢ় স্বরে বলেন, 'ছোকরা, কৃতজ্ঞতা বস্তুটা যে কী তা আমরা বহুকাল ভুলে গেছি। এই লালকিল্লার ইতিহাস অকৃতজ্ঞতা থেকেই শুরু তা ভুলে যেয়ো না। এই কিল্লা-ই-মুবারকের যিনি স্রষ্টা সেই শাহ্‌জাহান বাদশার ছেলেই তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে নি। বাপকে কয়েদ ক'রে এই কিল্লাতে নিজের বাদশাহী সামিল ক'রছিল। তারপর থেকে বরাবর এগিয়ে যাও—দেখবে এর ইতিহাস মানেই বিশ্বাসঘাতকতা আর অকৃতজ্ঞতার ইতিহাস। এর পাথরে পাথরে সেই গুণাহ্—দোজখী গুণাহ্—শয়তানী গুণাহ্ জমে আছে। এর প্রতিটি পাথরের খাঁজে খাঁজ জমে আছে অভিশাপ ও দীর্ঘশ্বাস। এখানে উপকারের প্রত্যুপকার আশা দূরের কথা, উপকারের কথা কেউ মনে রাখবে তাও আমরা আশা করি না। এটা কিল্লা-ই মুয়াল্লা নয় বাবা, এ হল কিল্লা-ই-জাহান্নাম্।...উপকারের কথাটা যে তোমার আজও মনে আছ এটাই তাজ্জব।'

বলতে বলতে কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে পড়েছি'লন বৃদ্ধ বাদশা। যেন দম নেবার জন্যেই থামলেন একটু। আবার অপেক্ষাকৃত ধীরভাবেই শুরু করলেন, 'যাক গে, আল্লা তোমার মঙ্গল করুন। হয়ত আমার চরম দুঃখে একটু আশার আলো দেখাবেন বলেই তোমার মনে এই কৃতজ্ঞতার শিখাটি জ্বালিয়ে রেখেছেন।... ভালই হল, আমি আজ তোমাকে যে কাজের ভার দেব সেটিও এই ঋণ শোধেরই ব্যাপার। অন্যে শুনলে হয়ত ঠাট্টা করবে—এতদিনের কথা মনে রেখেছি বলে। তবে তুমি বোধহয় এর মর্ম বুঝবে।'

আরও একটু চুপ ক'রে রইলেন বাদশা। বাইরের আকাশ দিবালোকের শেষ চিহ্নটুকুও মিলিয়ে আসছে। ঘরের মধ্যে গাঢ় অন্ধকার। সেই অন্ধকারে যেন ঈষৎ উৎসুক ভাবে অপেক্ষা ক'রে রই'লন বাদশা—আগার কাছ থেকে যেন কিছু শুনবেন এই আশায়। তারপর আবার নিজেই বলতে শুরু করলেন, 'অনেকদিন আগেকার কথা—আমার খুব ভারী বিমারী হয়েছিল। আমার বেগম তখন অন্তঃসত্ত্বা, ফকিরুদ্দীন তখন মায়ের গর্ভে। তিনিও খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, সেবা করবার কেউ ছিল না। মনে রেখো, তখন আমি বাদশা নই, এমন কি বাপজানও তখন তখ্‌তে বসেন নি। কোনকালে বাদশা হবো কিনা তাও কেউ জানে না। আর বাদশাহীর তো এই ছিরি। আসল মালিক-এ-মুলুক তো আংরেজরা। সুতরাং কিছু পাবার আশায় ভবিষ্যতের আশায় কেউ এগিয়ে এসে সেবা করবে, এমন সম্ভাবনা ছিল না। সে করে শুনেছি—সাধারণ মানুষের ঘরে কেউ কেউ করে। কিন্তু সম্রাটের ঘরে স্বার্থ ছাড়া আর কিছুতে অভ্যস্ত নই আমরা। সেদিন আমাকে কেউ না দেখলেও দুঃখিত হতাম না, বিস্মিত তো হতামই না। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই, সেদিন নিঃস্বার্থভাবেই সেবা করেছিল একজন। শুধু ইসলামের ধর্মপালন

করতে এগিয়ে এসেছিল আমার এক ভাইঝি। প্রাণপণে সেবা করেছিল, অষ্টপ্রহর বিছানার পাশে বসে থাকত, দিন-রাতের কোন হুঁশ ছিল না তার। সে সেবা আমাদের শাহী প্রাসাদে কল্পনাতীত তো বটেই—বাইরেও, মানুষ যেখানে মানুষ—অন্য কোনো বাহ্য অস্তিত্বে বাঁধা নয় সে—সেখানেও বোধহয় কেউ কোনোদিন দেখে নি। আমি তখন একেবারেই নাচার। যখন সেরে উঠলাম তখনও তাকে কৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু দিতে পারি নি। প্রতিজ্ঞা ছিল, যদি কোনদিন শাহী তখ্‌তে বসতে পারি, এর যোগ্য প্রতিদান দেব—সেদিন বুঝিয়ে দেব আমি অকৃতজ্ঞ বেইমান নই। তৈমুরশাহী বাবরশাহী বংশে জন্মেছি, ক্ষমতাপ্রিয় বিলাসপ্রিয় সবই ঠিক—তবু মনুষ্যত্ব আছে আমার।'

আবেগ ও উত্তেজনার ক্লান্তিতে চুপ করতে হয় আবার। একটু থেমে পুনরায় বলেন, 'কিন্তু বাবা, খোদার এ দুনিয়ায় তাঁর মর্জি ছাড়া তো কিছু হবার জো নেই। তাঁর মর্জির কাছে যে আমরা খেলার পুতুল ছাড়া আর কিছু নই। এইটা বোঝাবার জন্যেই বোধহয়—তখৎ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, গুছিয়ে বসতে না বসতেই আমার সে বেটীকে—আমার সত্যিকার আম্মাজানকে টেনে নিয়ে গেলেন তিনি। তার জীবদ্দশায় আর প্রাণের মূল্য শোধ দেবার সময় পেলাম না।'

বহুদিনের বহু ঘাত-প্রতিঘাতে কর্মে-অকর্মে চাপা পড়া স্মৃতি বোধ করি তার বিস্মৃত বেদনার সমস্ত সত্যতা নিয়ে জেগে ওঠে মনের মধ্যে। শুষ্ক ক্ষতে আবার রক্তক্ষরণ শুরু হয়। অনেকক্ষণ সময় লাগে এবার। দীর্ঘকাল চুপ ক'রে বসে থেকে সেই উদ্বেলিত আবেগটা সামলে নেবার চেষ্টা করেন বুঝি কবি জাফর। তারপর আরও চুপি চুপি, আরো স্খলিত কণ্ঠে বলেন, 'মা আমার অতি সামান্য লোকের হাতে পড়েছিলেন, সে লোকটিও ভাল ছিল না। মৃত্যুর আগে সেই স্বামীর হাত থেকে রক্ষা করতেই তার সদ্যোজাত মেয়েটিকে আমার কাছে সঁপে দিয়ে গিয়েছিল। সেদিন আবার নতুন ক'রে পুরানো প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলাম—মায়ের কাছে করা ঋণ মেয়ের কাছে শোধ দেব কিন্তু তারও বুঝি অবসর আর মিলল না বাবা...ও-হো-হো—'

আবারও সময় লাগে খানিকটা সামলে নিতে।

তারপর বলেন, 'চেষ্টা করেছি অনেকদিন থেকেই, কিন্তু নানা কারণে কেবলই দেরি হয়ে গেছে। আমার এই সব অপদার্থ আত্মীয়দের মধ্যে অকর্মণ্য স্বল্পপ্রাণ লোভী অশিক্ষিত শাহ্‌জাদারা অনেকেই ওকে বিবাহ করতে উৎসুক ছিল। কিন্তু আমি তা হতে দিই নি। আমার এই দীন অবস্থার মধ্যেও ভাগ বসিয়ে যারা পরপ্রসাদভোজী পরান্নজীবীর জীবন যাপন করে তাদের কারও হাতে দিয়ে মেয়েটার জীবন নষ্ট করব না—এ সিদ্ধান্ত আমার প্রথম থেকেই ছিল। তাই প্রথম থেকেই ভেবেছি বাইরের কোন সৎপাত্রকে দেওয়া যায় কি না। খুঁজেছি, পেয়েছিও ঢের—কিন্তু প্রাসাদের ভেতরকার ষড়যন্ত্র আর দূষিত হাওয়াতেই শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে নি। ভাংচি পড়েছে বার বার—এপক্ষে ওপক্ষে দুদিকেই। মেয়েটা হাতছাড়া হওয়াতে তত আপত্তি নয় ওদের, আপত্তি কেবল টাকা খরচ করায়। সবাই জানত আমি যথাসাধ্য খরচ করব ওর বিয়েতে, হয়ত ধার-দেনাও করব। সেইজন্যে আরও প্রাণপণে বাধা দিয়েছে সকলে। মায় বাদশাবেগম জিন্নৎমহল সাহেবা পর্যন্ত। তবু শেষ অবধি একটা জায়গায় স্থির হয়ে গিয়েছিল। বেরেলির উত্তরে ধরমপুর বলে একটা জায়গা আছে—তারই নবাব। নবাব অবশ্য লোকে বলে, আসলে বড় জায়গীরদার। তা হোক, অনেক

পয়সা ওদের। সেই জন্যেই—ওরা রোহিলা আফগান জেনেও রোহিলাদের উপর আমাদের বিজাতীয় ঘৃণা থাকলেও—আমি আপত্তি করি নি। অবশ্য প্রকাশ্যে কথা বলতে পারি নি এটা ঠিক, তাহলে প্রবল বাধা আসত। আমি শুধু ভেবেছি আমার দিদিমণির কথা। ওদের অবস্থা ভাল, বিস্তর টাকা, বিষয়সম্পত্তি অগাধ, চাল-চলনও বেশ বনেদী নবাবের মতো। আর যাই হোক পয়সার দুঃখ কখনও পাবে না। বাদশাজাদীর মতোই থাকতে পারবে।...কথাবার্তা ঠিক হয়ে গিয়েছিল, খুব একটা খরচও আমার হ'ত না। মেয়েটাকে গোপনে পাঠিয়ে দিয়ে তারপর সবাইকে জানাব এই ঠিক করেছিলাম। তখন গয়নাগাঁটি হাতি ঘোড়া যা খুশি পাঠিয়ে দেওয়া চলত। বিয়ে হবে জানলে আর কেউ বাধা দিত না, কেন না তখন শাহী ইজ্জতের প্রশ্ন উঠত। কিন্তু যে মুহূর্তে সব ঠিক করলাম, বলতে গেলে সেই মুহূর্তেই গদর বেধে গেল। আগুনের বন্যায় সব ভেসে গেল।'

আবার খানিকটা থামতে হয় বৃদ্ধকে, দম নিতে। তবে বেশীক্ষণ নয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করেন, 'ধরমপুরের নবাব গোলাম আলি খান এই লড়াইয়ে যোগ দেয় নি। কোন পক্ষেই দেয় নি। বড় বুদ্ধিমান ছেলে—শুনেছি সে বেশ দুদিক রেখে কাজ করছে। লক্ষ্ণৌয়ের লড়াইয়ে একশটি লোক পাঠিয়ে আংরেজদের খুশী করেছে, কৈফিয়ৎ দিয়েছে যে সে কোম্পানীর দলে বলে সিপাহীদের আক্রোশ তার উপর—তাই ফৌজ বেশী হাতছাড়া করতে পারছে না। আংরেজরাও তাই বুঝেছে, নবাবের উপর খুব খুশী। আবার সিপাহীরা পাছে হামলা করে বলে তাদেরও গোপনে গোপনে টাকা যোগাচ্ছে। ফলে দুপক্ষই ওর উপর খুশী। যে দলই জিতুক ওর খানিকটা সুবিধা হয়ে যাবেই।'

আগা এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল, কিন্তু এবার আর চুপ ক'রে থাকতে পারল না। বলল, 'গুস্তাকী মাপ করবেন, এই লোককে আপনি সৎপাত্র বলছেন শাহানশা?'

হাসলেন বাহাদুর শা। পঞ্চদশ পুরুষের রাজ-অভিজ্ঞতা যেন হেসে উঠল সেই হাসির মধ্যে দিয়ে। বললেন, 'বাবা, যখন মেয়ের বিয়ে দেবে তখন সর্বাগ্রে দেখবে, সে সুখে থাকবে কিনা, তার জীবনটা নিরাপদে আর সুখে কাটবে কিনা। যে লোক নিজের পাওনা ষোল আনা বুঝে নিতে পারে, এমন দুনিয়া-কাঁপা গোলমালের দিনে, এমন দুর্যোগেও মাথা ঠাণ্ডা রেখে হিসেব ক'রে সব কাজ করতে পারে, তার চেয়ে সৎপাত্র আর কে আছে বাবা? তার হাতে পড়ে অভাবে কোনদিন কষ্ট পাবে না এটা তো ঠিক। কোন দিন নবাবী হারিয়ে পথে বসবে না—কিম্বা গর্দানও দেবে না হঠাৎ মাথা গরম ক'রে। তাছাড়া পয়সাও তার ঢের, তার তালুকের আয় শুনেছি আমার বাদশাহীর আয়ের চেয়ে বেশী।'

আরও একটু হেসে চুপ করেন দীন-দুনিয়ার মালিক তামাম হিন্দুস্তানের বাদশা। সে হাসি কান্নার চেয়েও করুণ।

আগা চুপ ক'রে থাকে। বাদশাই আবার প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপন করেন কিনা—সেজন্য অপেক্ষা করে। তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'আমার উপর কি হুকুম তা কিন্তু এখনও জানতে পারি নি জাহাঁপনা।'

আরও এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন বাদশা, বোধ করি তখনও একটু দ্বিধা ছিল। তারপর বললেন, 'আমার এই নাতনীকে কোনমতে তোমাকে ধরমপুরে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে বাবা। আমাদের পরিণাম তো আমি দিব্যচক্ষে দেখতেই পাচ্ছি, সে

সর্বাত্মক সর্বনাশ আর দুর্গতির মধ্যে মেয়েটাকে টেনে আনতে চাই না। ও আমার বিশেষ দায়, বিশেষ দায়িত্ব। এখান থেকে বার করাও কঠিন। সিপাহী আর কোম্পানীর ফৌজ —দুদলের চোখ এড়িয়ে ধরমপুর পর্যন্ত পৌঁছনো আরো কঠিন। লোকজন কিম্বা সিপাহী সান্ত্রী যে সঙ্গে দেব এমন লোকেরও অভাব। যাকে বলব সেই প্রথম গিয়ে বেইমানী করবে।...এমন কি আমার বেগম সাহেবাকেও জানানো চলবে না।'

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যান বাদশা। যেন ঈষৎ সঙ্কোচ বোধ করেন বলতে। সেটা আরও বোঝা যায় যখন পরের কথাটা শুরু করেন—তখনকার তাঁর অপ্রতিভ কণ্ঠস্বরে—'তোমাকে কিন্তু এর জন্য কোন পারিশ্রমিক কি পারিতোষিক আমি দিতে পারব না। আর তুমি ফিরে এসে সে পারিশ্রমিক দাবী করা পর্যন্ত বাঁচবও না খুব সম্ভব। এখনও তোমার সঙ্গে বিশেষ কিছু দিতে পারব না, কারণ আমি একেবারে রিক্ত, সর্বস্বান্ত। বেগম সাহেবার গায়ের জেবর পর্যন্ত এর মধ্যে চলে গেছে পোদ্দারের দোকানে। কোম্পানীর টাকা বন্ধ, শাহ্‌জাদারা যা লুঠপাট করছে সব নিজেরাই উড়িয়ে দিচ্ছে—ওদেরই ফৌজ অথচ তন্‌খার জন্যে আমার গায়ের মাংস খুবলে খাচ্ছে। বাবুর্চিখানার খরচ চালাতেই বেগম সাহেবার জেবর আর বাসন বিক্রী করতে হচ্ছে। তোমাকে একটা ঘোড়া দেব—আমার নাতনীর জন্যে একটা ডুলি। ডুলির বাহকও দুজনের বেশী দিতে পারব না—নফর-নৌকর তো দিতে পারবই না। রাহা খরচ আর ওদের তন্‌খা বাবদ একশটি টাকা রেখে দিয়েছি, সেই সম্বল ক'রেই তোমাকে রওনা দিতে হবে। এ ছাড়া ওর নিজের কাছে থাকবে পাঁচখানা আকবরি আসরফি, দরকার হয় তো স্বচ্ছন্দে চেয়ে নিও, কোন সঙ্কোচ ক'রো না। ওকেও সে কথা বলা থাকবে। ওকে সেখানে পৌঁছে দিলেই তোমার ছুটি। তোমার হাতেই আমি গোলাম আলি খাঁর নামে খৎ দেব—যাতে সে তোমাকে কিছু টাকা দেয় ফেরার খরচ—অবশ্য ফিরবেই বা কোথায়, তোমাকে তখন নতুন চাকরি নতুন জীবিকারই খোঁজ শুরু করতে হবে। তোমাকে কিছুই দিতে পারলুম না, সত্যিকার কোন উপকারই করতে পারলুম না, কিন্তু বিশ্বাস করো বাবা—সত্যিই আর আমার কোন সঙ্গতি নেই। দিদিভাইয়ের জন্য যৎসামান্য যা যৌতুক দেব ভেবেছিলুম তাও খুইয়ে বসে আছি। ওর মায়ের দরুণ কিছু জহরৎ আছে—সেটা আমি নিজের কাছে রাখি নি বলেই আছে—তবে সেও তোমাদের সঙ্গে দেব না। পথের বিপদ মিছি-মিছি বাড়িয়ে লাভ নেই। এমনিই অল্পবয়সী মেয়ে এক বিরাট বোঝা, সে বোঝা সোনাদানায় ভারী করতে চাই না। এখানে বড় মহাজন আছে একজন—উত্তরমল কুবেরমল—তাদের কাছেই গচ্ছিত আছে ওর জেবর। যদি ভালয় ভালয় সব হাঙ্গামা মিটে যায়, গোলাম আলি খাঁ দিল্লীতে এসে ওদের কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারবে, সেই রকম বলা আছে ওদের। সেকথা খতে লিখলুম না, তুমি মুখে বলে দিও—'

চুপ ক'রে যান আবারও। বোধ হয় এত কথা বলে কষ্টই হচ্ছিল, ক্লান্তিতেই চুপ করতে হয়।

আগা কিছুক্ষণ ওঁর বলার জন্য অপেক্ষা ক'রে থেকে প্রশ্ন ক'রে, 'কবে রওনা হতে হবে তাহলে?'

'কবে নয় বাবা, আজই। এখন প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। ক্রমে ক্রমে আমার চারদিক থেকে, ধীর অথচ অমোঘ ভাবে কিসমতের জাল গুটিয়ে আসছে, বেশ অনুভব করতে পারছি সেটা। এর পর হয়ত আর বেরোতেই পারবে না কোথাও দিয়ে হাজার চেষ্টা করলেও। যদি যেতে রাজী থাকো, তবে আজই রাত্রে বারোটা নাগাদ

তুমি পানি-দরওয়াজা দিয়ে বেরিয়ে আটা মসজিদে চলে যাবে, সেখানে মীর মর্দান খাঁ, বখ্‌ৎ খাঁর চাচেরা ভাই—বড় ঈমানদার আর বড় নেক্‌ ছোকরা—তোমার জন্যে অপেক্ষা করবেন। তিনিই সব কথা জানেন শুধু—তিনিই তোমাদের যাত্রার সব ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। তুমি কোথায় যাচ্ছ, কী কাজে যাচ্ছ—আর কাউকেই বলবে না, সেটা নিরাপদও নয়।'

আগা যেন রীতিমত ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এতকাল ভাগ্যের ওপর বরাত দিয়ে স্রোতে গা ভাসিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল সে, সর্বনাশ ও সমাপ্তি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—কিন্তু তাতে সে বিচলিত হয় নি, সর্বনাশের বন্যায় যখন সবই ডুববে সবাই ডুববে—বাদশা বাদশাহী সিপাহী—সব ভেসে যাবে যেকালে, সেকালে না হয় সেও যাবে, তার জন্যে চিন্তা ক'রে লাভ কি? নিজের জন্যে পৃথক ক'রে ভাববার কিছু ছিল না বলেই নিশ্চিন্ত ছিল কতকটা। কিন্তু এ যে আবার সব উল্‌টে পাল্‌টে গেল, তার ভাগ্যের সামনে এক নতুন দিগন্ত প্রসারিত হ'ল—নতুন ক'রে নিজের জন্য চিন্তার বোঝা চাপল মাথায়। তবে কি খুদা তাকে বাঁচিয়ে রাখবেন বলেই এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে এদের ভাগ্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিলেন তার ভাগ্য? না কি আরও সাংঘাতিক কোন পরিণতির মধ্যে নিক্ষেপ করবেন বলেই এই নূতন আয়োজন তাঁর?

সে উদ্বিগ্ন কণ্ঠেই প্রশ্ন করে তাই, 'কিন্তু কী ভাবে যাব, কোন পথে কোথা দিয়ে যাওয়া নিরাপদ হবে তার কিছুই জানি না। সে বিষয়ে কি মীর মর্দান খাঁ-'

'উহুঁ! উহুঁ!' একটু অসহিষ্ণু ভাবেই তার কথা থামিয়ে দেন বাদশা, 'সে সব কিছুই বলতে পারব না। জানিও না কিছু—ভাবতেও পারছি না এখন। যেমন ভাবে পারবে, যে পথে পারবে নিয়ে যেও। এখন যাও—সঙ্গে কি কি নেবে গুছিয়ে তৈরী হয়ে নাওগে। তবে আমার মনে হয়—হাতিয়ার আর টাকা পয়সা—বর্তমান কালে টাকাও একটা হাতিয়ার—এ ছাড়া কিছু না নেওয়াই ভাল!'

চুপ করলেন বাদশা। দরবারী রীতি বলে এর পর আর এক মুহূর্তও এখানে অপেক্ষা করা উচিত নয়, কোন কারণও আর নেই অপেক্ষা করার। বাদশা যখন 'যাও' বলেন তখন সেখানে থাকা মানেই বেয়াদবী। আর কেউ মানুক না মানুক—প্রত্যহ বহু লোকের কাছে যে অসম্মান ঘটছে তাঁর তা তো সে চোখেই দেখছে—কিন্তু আগা আজও তাঁকে মান্য করে, ওর কাছে আজও উনি বাদশা, মালিক। সে উঠে অন্ধকারেই কুর্নিশ করতে করতে পিছু হঠতে লাগল।

কিন্তু একেবারে বাইরে যাবার আগে বাদশা আর একবার কথা কইলেন। তেমনি চাপা গলাতেই বললেন, 'তবে আবারও তোমাকে বলে দিচ্ছি বাবা, ইচ্ছে করলেই এ দায় তুমি এড়াতে পারো। চক্ষুলজ্জার কোন কারণ নেই—বিশেষ ক'রে যেখানে জানের প্রশ্ন, সেখানে চক্ষুলজ্জা করতে যাওয়া বে-অকুফী। আমি বিন্দুমাত্র জোর করছি না, কোন দাবী নেই আমার। তুমি এ ভার বইতে অস্বীকার করলে আমি বিব্রত হবো হয়ত, দুঃখিত হবো না। বিস্মিত তো হবোই না। দ্যাখো, এখনও ভেবে দ্যাখো। যে কাজে পাঠাচ্ছি, সে কাজে কতটা ঝুঁকি তা আমি জানি, সেই জন্যই তোমাকে হুঁশিয়ার ক'রে দিচ্ছি!'

আগা সেই অন্ধকারেই অভিবাদন করে বলল, 'আমার বাদশা সলামতের হুকুম আমি পেয়ে গেছি আলা হজরৎ—সে হুকুম আমার কাছে খোদার হুকুমেরই সামিল।

এর ভেতর আর নতুন ক'রে ভাববার কিছু নেই।'

'পরমেশ্বর তোমার কল্যাণ করুণ বাবা। তুমি আমায় যে কতখানি শান্তি দিলে আজ তা তুমি জানো না। আমি কোন প্রতিদান দিতে পারব না এর—কিন্তু আমি জানি—মেহেরবান খোদা তোমাকে এ ইমানদারীর পুরস্কার দেবেন।'

শেষের দিকে কি গলা কেঁপে গেল শাহ্ জাফরের? কিন্তু চেঙ্গিজ তৈমুরের বংশে তো কেউ কখনও আবেগে বিচলিত হয় না!

আগারও দু চোখ, কেন কে জানে, ঈষৎ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল, সে আবারও নীরবেই অভিবাদন করে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হ'ল। যেতে উদ্যত হ'ল কিন্তু তখনই যেতে পারল না। বাদশার এই সমস্ত কথার সারাংশটুকুর মতো একটা কথাই তার মনের উপর বার বার ঝাপ্‌টা খাচ্ছিল। জোর ক'রে যেন মনের অর্গল বন্ধ ক'রে তাকে বাইরে ঠেকিয়ে রেখেছিল এতক্ষণ।

বাদশার দৌহিত্রী। শাহ্‌জাদী তিনি, তাঁকে—তাঁকে নিয়ে যেতে হবে। কে সে? তবে কি—

ভাবতে পারে না আগা, ভাবতে সাহস করে না যেন। প্রশ্ন করতে তো নয়ই।

কিন্তু এবার না করলেই নয়। আর সময় পাবে না হয়ত। সুযোগই মিলবে না প্রশ্ন করার। প্রাণটা আকুলিবিকুলি ক'রে ওঠে বলেই মরীয়া হয়ে ওঠে। চরম সাহসে ভর ক'রে প্রশ্নটা ক'রেই ফেলে শেষ পর্যন্ত।

'আচ্ছা, তাঁর নামটা?...মানে, অপরাধ ক্ষমা করবেন—এতটা পথ নিয়ে যাওয়া, যদি দরকার হয়? একেবারে কিছুই জানব না—'

বাদশা বেশ সহজ ভাবেই উত্তর দেন, 'নাম? নুরুন্নেসা। নুরুন্নেসা বেগম।'

আর দাঁড়াবার প্রয়োজন থাকে না। আবারও অভিবাদন ক'রে পিছু হাঁটে আগা এক পা—

'শোন। দাঁড়াও।'

হঠাৎ হুকুম দিয়ে উঠলেন বাদশা। তিনি নিজেও উঠে দাঁড়ালেন। অন্ধকারেই ছায়াপথের ঝাপসা আলো লক্ষ্য ক'রে ক'রে এগিয়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন। সেই প্রায়ান্ধকার প্রদোষেই আগার মনে হ'ল শাহানশার পা কাঁপছে একটু একটু। কাঁপছে তাঁর গলার স্বরটাও। তবু যেন প্রাণপণ চেষ্টায় সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। সেই জরা-জীর্ণ ক্ষীণ অথচ দীর্ঘ দেহ যেন সেই মুহূর্তে বাবর-শাহী রক্তের পরি-পূর্ণ মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আগার চোখের সামনে। তিনি কম্পিত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'শোন—দাঁড়াও!...আমীর তৈমুর বংশের, বাবরশাহী বংশের বাদশা আমি—হয়ত আমাতেই শেষ এ বাদশাহীর, তবু আজও আমি দিল্লীশ্বর। বিনা পারিশ্রমিকে বা বিনা বকশিশে কোন কাজ করানো আমাদের বংশের ধারা নয়। ভেবেছিলুম কিছুই নেই—কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে আছে, দেবার মতো আজও কিছু আছে! আর তাই দেব তোমাকে—আগাম পুরস্কার।'

এই বলে শাহ্ জাফর তাঁর দীর্ঘ আচকানের মধ্যে হাত পুরে গলায় ঝোলানো একটি সরু হার বার করলেন, তাতে আটকানো প্রবালের একটা তক্তি। কী এক অদৃশ্য কাঁটা টিপতেই সে তক্তির অর্ধেক খুলে এল—কৌটার মতো বাকী অর্ধেকটা থেকে বেরোল কী একটা বস্তু। সেইটিই আগার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন বাদশা—আগা দু হাত পেতে নিয়ে মাথায় ঠেকাল, সম্রাটের—মালিকের দেওয়া বকশিশ।

কিন্তু তার মধ্যেই বুঝতে পারল—ঈষৎ হতাশার সঙ্গেই হয়ত—যে বস্তুটি এমন

কোন মূল্যবান কিছু নয়, পুরানো আমলের সামান্য একটি তাম্রখণ্ড, সম্ভবত একটা ঢেবুয়া।

ওর মুখের চেহারা দেখতে না পেলেও ওর মনের ভাব বুঝতে অসুবিধা হয় না বাদশার। তিনি কেমন এক ধরণের ম্লান করুণ হাসি হেসে বললেন, 'এর পার্থিব মূল্য যে কিছু বিশেষ নেই তা আমিও জানি বৎস, কিন্তু যে কোন স্বধর্মনিষ্ঠ সত্যাশ্রয়ী মুসলমানের কাছে এর মূল্য অনেক। হজরৎ বড় পীর সাহেব—বাবা মৈনুদ্দীন চিস্তির আশীর্বাদী ঢেবুয়া এটা, নিজে হাতে তাঁর এক ভক্তকে দিয়েছিলেন। শুনেছি এ ঢেবুয়া যার কাছে থাকে তাকে কোন অস্ত্র কখনও বিদ্ধ করতে পারে না, আগুনে পোড়াতে পারে না। আমার যখন কঠিন অসুখে একেবারেই বাঁচবার আশা ছিল না, তখন আমার মাকে এটা দিয়েছিলেন তাঁর গুরু বা আলেম। তিনি পেয়েছিলেন আবার তাঁর আলেমের কাছ থেকে। সে গুরুও সিদ্ধ ফকীর ছিলেন। এ সবই শোনা কথা অবশ্য—কিন্তু আমি বিশ্বাস করি মনেপ্রাণে। এটা কাছে রেখো—আমি আশা করি—কোন বিপদআপদ কখনও তোমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না, বিপন্ন করতে পারবে না কোন দুশমন।'

'কিন্তু শাহানশা'—আকুল কণ্ঠে বলে ওঠে আগা, মনের আবেগ কিছুতেই সামলাতে পারে না সে, 'বান্দার গুস্তাকী মাপ করতে আজ্ঞা হয়—এই দুর্দিনে এতে আপনারই যে বেশী প্রয়োজন খোদাবন্দ্! না, না—এ আপনার কাছেই রাখুন—আমি মিনতি করছি!'

আন্তরিকতার দুর্বার বেগে বুঝি স্থান-কাল-পাত্র সম্বন্ধে সমস্ত রকম বিচার বিবেচনা যুক্তি বুদ্ধি ভেসে চলে যায়। দরবারী রীতি-নীতিতে খুব বেশী ওয়াকিবহাল হবার অবকাশই হয় নি তার, যেটুকু শিখেছিল সেটুকুও বুঝি ভুলে যায় সে।

কিন্তু বাদশা ভোলেন না—অকস্মাৎ চেঙ্গিজী রক্ত তৈমুরশাহী রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে তাঁর ধমনীতে—মুঘল পূর্বপুরুষের উষ্ণ্যা-কঠিন কণ্ঠই প্রতিধ্বনিত হয় তাঁর কণ্ঠে। তিনি তীক্ষ্ম কর্কশ কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'সব চেয়ে অমার্জনীয় গুস্তাকী হচ্ছে বাদশার দেওয়া উপহার খিলাৎ তাঁর অনুগ্রহের দান তাঁকে ফিরিয়ে দিতে যাওয়া। তোমার স্পর্ধা তো কম নয়। বদবখৎ বেশরম ব্যন্দা। আগের জমানা হ'লে এই মুহূর্তেই তোমার শির চলে যেত।'

তারপরই, অকস্মাৎ যেমন সে কণ্ঠ চড়েছিল, তেমনই সহসা আবার কোমল হয়ে আসে। বলেন, 'ছোকরা, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, জিন্দিগী খতম হতে চলেছে, —আমার আর এতে কতটুকু প্রয়োজন! কী আর কাজে লাগবে আমার—এ কী চিরকাল বাঁচিয়ে রাখতে পারবে? তোমার সারা জীবন সামনে পড়ে, তোমার দ্বারা এখনও খোদা কত কী করিয়ে নিতে পারবেন। এ তুমিই রাখো। তা ছাড়া এখন আর আমার বেঁচে থেকেই বা ফয়দা কি! এ জিন্দিগীর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়েই দিয়েছি বলতে গেলে, যেটুকু শেষ সম্পর্ক ছিল, আশা বলতে আকর্ষণ বলতে—দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তা উদ্বেগের যে একমাত্র উপলক্ষ—তারই দায়িত্ব চাপিয়ে দিলুম তোমার মাথায়, এ কবচ তারই নিরাপত্তার জন্যে আরও দরকার। যাও বাবা, আর দেরি ক'রো না। খোদা হাফেজ!'

আগা কোনমতে কুর্নিশ করতে করতে বেরিয়ে এল সেখান থেকে। ভয়ে লজ্জায় তার সারা শরীর কাঁপছে তখন। বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়ছে। বাদশার সামনে

থেকে পালাতে পারলে—অন্ধকারের আবরণে শুধু নয়—কোন সু-উচ্চ প্রাচীরের আড়ালে নিজেকে গোপন করতে পারলে যেন বেঁচে যায় সে সেই মুহূর্তে।

॥ বাইশ ॥

আগা যখন জাফর-মহল থেকে বেরিয়ে দিওয়ান-ই আমের পিছনে এসে পৌঁছল তখন চারিদিকে অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে এসেছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। শরতের আকাশ তাই অস্ত-সূর্যের আভা একেবারে বিদায় নেয় নি পশ্চিম দিগন্ত থেকে, কিন্তু কিল্লা-ই-মুবারকের বড় বড় গাছপালার ছায়ায় দিনের সে স্মৃতিচিহ্নটুকু টিকে থাকতে পারে নি।

সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে বুঝি একটা নিস্তব্ধতাও নামে—কিন্তু আজকের এ নিস্তব্ধতা ঠিক স্বাভাবিক বোধ হ'ল না আগার। এ যেন একটা অমানুষিক স্তব্ধতা। চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম আর অন্ধকার। এ কিল্লার সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত এমন আলোর অভাব বোধ করি কোনদিন হয় নি এখানে—শাহী জমানার ঘোরতর দুর্দিনেও না। বাদশার ঘরে এখনও পর্যন্ত আলো জ্বালা হয় নি—তাতেই অবাক হচ্ছিল আগা কিন্তু বাইরে এসে দেখল প্রাসাদের অধিকাংশই তখনও অন্ধকারে থম থম করছে। দূরে বেগম মহ'লের কোন ঘরে একটু আধটু আলো দেখা যাচ্ছে—কিন্তু সে যে যার নিজস্ব ঘরে চিরাগ বা মোমবাতি জ্বেলেছে—সেই আলো। সরকারী ব্যবস্থায় যে সব আলো জ্বালা হয়, পথের মোড়ে মোড়ে বা দেউড়িতে—তার একটাও জ্বলে নি তখনও পর্যন্ত। সেই অনভ্যস্ত জন-বিরলতায় ও অন্ধকারে যেন কেমন গা ছমছম করে!

আগা দ্রুতপদে নিজের ব্যারাকে চলে এল। ব্যারাকও বেশ খালি হয়ে এসেছে আজকাল। মীরাটী ফৌজ যখন এসে পৌঁছয় তখন দিওয়ান-ই-খাশ পর্যন্ত তাদের বিছানা পড়েছিল! হাতিয়ার পোশাক আর তামাকুর সরঞ্জামে দিওয়ান-ই-খাশ থেকে শুরু ক'রে হায়াৎ-বক্স-বাগিচা এমন কি সামান-বুরুজে পর্যন্ত পা ফেলবার জায়গা ছিল না। কিন্তু এখন আর সে ভীড়ের কিছুই নেই। অনেকে মরেছে ইতিমধ্যে ইংরেজের গুলিতে। যারা আছে তারাও বেশির ভাগ শহরের পাঁচিলে বুরুজে পাহারা দিচ্ছে, লড়াই করছে। পালিয়েছেও অনেকে। দলকে দল পালিয়েছে শাহজাহানাবাদের পতন আসন্ন বুঝে। ফলে কিল্লা একরকম সিপাহী-শূন্যই হয়ে পড়ছে বলতে গেলে। জনকতক সান্ত্রী পাহারাদার—নিতান্ত ঠাট বজায় রাখার মতোই শুধু—বাদশার দেহরক্ষী, তারা দশ-বারোজন আর নফর নৌকর—পুরুষ বলতে এই। বড়জোর সব মিলিয়ে দু'তিনশ হ'বে। ওদিকের ছাউনীতে কিছু কিছু সিপাহী ছিল এতদিন, বোধহয় তারাও কেউ নেই আর। এবার বোধহয় নৌকরদের পালা। চাকরীর অবস্থা বুঝে অনেকদিনই যাই-যাই করছিল—এবার মনিবের অবস্থা বুঝে চলেই গেছে। হয়ত লোকের অভাবেই দেউড়ির আলো জ্বলে নি—কিম্বা তেলের অভাবে।

এ অবস্থায় এই আসন্ন মহাসর্বনাশের মুখে অসহায় বৃদ্ধ বাদশাকে ফেলে যেতে কষ্ট হয় বৈকি! দুঃখ ও উদ্বেগ দুই-ই বোধ করে।

কিন্তু তার চেয়েও দুঃখ উদ্বেগ ও হতাশ কামনার পাত্র রয়ে গেল এই কিল্লার

মধ্যেই।

জীবনের মূল্য বলতে তার একমাত্র যা কিছু আজ—তার আত্মার আনন্দ, প্রাণের আরাম—সবই তো রইল। জীবনটাই রয়ে গেল এখানে।

অবশ্য আগা এখানে থাকলেই বাচাতে পারবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। বরং পারবে না এটাই সম্ভব। তেমন যদি কোন শোচনীয় অবস্থা আসে—আর যদিই বা কেন, সে অবস্থা তো আসন্ন—এই কিল্লা আর তার সমস্ত অধিবাসীরা যদি কোম্পানীর ফৌজের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়, সেদিন সে ক্রুদ্ধ বর্বরতা ও পাশবিক প্রতিহিংসার বন্যা প্রতিরোধ করা কি সম্ভব হবে কারও পক্ষেই? ওরই বা কি সাধ্য, কতটুকু সাধ্য?...কিছুই করতে পারবে না সে। প্রতিহিংসায় উন্মত্ত রক্তপাগল ইংরেজ ফৌজের কাছ থেকে কোন বিবেচনা কি করুণা কেউ পাবে—এমন আশা করাও বাতুলতা। সে আশা ও করেও না। তবু তার সঙ্গে মরতে অথবা তার জন্য প্রাণ দিতে তো পারবে। আজ আর তার চেয়ে বেশী কোন আশা রাখার দুঃসাহস ওর নেই। এইটুকু হলেই সে কৃতার্থ হবে।

কিন্তু সেটুকুও হ'ল না। সে তৃপ্তি, সে চরিতার্থতাটুকুও পেল না সে। সে লোভ করাও বুঝি গুনাহ্ হয়ে দাঁড়াল তার কাছে।

কামনা-বিলাসের চেয়ে কর্তব্য অনেক বড়। মনিবের হুকুম, মালিকের হুকুম। যতদিন দেহে একবিন্দুও রক্ত থাকবে বা সামান্যতম সামর্থ্যও থাকবে—সেই হুকুমই পালন করবে সে। আর কিছু ভাববে না, আর কোন দিকে চাইবে না। তাতে যদি মনের একটা দিক অসাড় এবং পাথর হয়ে যায়—তবুও না। প্রাণ তার হয়ত পাথর হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত, জীবনে আশা বলতে, আনন্দ বলতে, ভবিষ্যৎ বলতে কিছু থাকবে না। নিরস মরুভূমি হয়ে যাবে সবটা। তবুও উপায় কি আর! মনটা তার, কিন্তু দেহটা তো ষোল আনা তার নয়। দেহটা মালিকের নিমক খেয়েছে—তার জন্য তাঁর কাছে সে দেহ কোরবানি করতে বাধ্য সে। তাতে যদি মনকেও কোরবানি করতে হয় করবে।......

না, না, এসব কী ভাবছে সে। সময় অল্প, হয়ত চিরদিনের মতোই এ প্রাসাদ-দুর্গের আস্তানা ছেড়ে যেতে হবে—গোছগাছ সেই ভাবেই ক'রে নেওয়া দরকার।

কিন্তু কীই বা আছে মালপত্র তার—নেওয়ার মতো! সঙ্গে তো বিশেষ কিছুই নেওয়া চলবে না। এক পোশাক—সেও এক প্রস্থর বেশী নয়। সে তো পরাই আছে। কিন্তু সিপাহীর পোশাক পরে যাওয়া কি উচিত হবে? না না—। আপন মনেই মাথা নাড়ল আগা। ও পোশাক-পরা অবস্থায় ইংরেজদের হাতে পড়লে তারা একবার প্রশ্নও করবে না যে সে কে, কোথায় যাচ্ছে। তার আগেই গুলি চালাবে তারা। এমনিতেই শোনা যাচ্ছে যে, দোয়াবের দিকে যে কোন এদেশী নওজোয়ান ছেলেকে দেখছে তাকেই ওরা ধরে ফাঁসিতে ঝোলাচ্ছে। কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ পর্যন্ত করছে না। হয়ত বেরিলীর দিকটাতে এখনও ওদের অতটা জোর কায়েম করতে পারে নি ওরা—তবু বেশী ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল, উড়ো কথা, গুজব কথা যা শোনা যাচ্ছে তাতে এটা বেশ বোঝা যায় যে ধীরে ধীরে ইংরেজ তার মালিকানা ফিরেই পাচ্ছে আবার।

অনেক খুঁজে আগা তার পুরনো পোশাকটা বার করল। এটাও রাজ সরকার থেকে পাওয়া—তবে ঠিক সিপাহীর পোশাক নয়। যখন ফাই-ফরমাস খাটার দারোয়ান মাত্র ছিল, তখনকার পোশাক এটা। ওর সে সাবেক দিনের পাঠানী পাজামা-কুর্তাও

আছে, কিন্তু সে বড়ই জরাজীর্ণ, দীন। তার চেয়ে এটাই ভাল।

পোশাক বদলে কুর্তার নিচে কার্তুজের কোমরবন্ধটা এঁটে নিল। বন্দুক নিলে চলবে না। পোশাক সিপাহীর থাক বা না থাক—বন্দুক মানেই দুশমনীর চিহ্ন ইংরেজদের কাছে। পিস্তলটাই নিল সে। পিস্তল কোমরবন্ধে ঝুলিয়ে নেওয়া যায়। এছাড়া একটা ছোট তলোয়ারও নিল। এটা কোমরে ঝোলাবার দরকার নেই, খাপ-সুদ্ধ ঘোড়ার পিঠে বেঁধে নিলেই চলবে। এ দুটো ছাড়া আর নেবার মতো কিছু মনে পড়ল না। টাকা পয়সা বিশেষ কিছুই নেই, গত চার মাসে এক ঢেবুয়াও তন্‌খা পায় নি সে। অথচ খরচ করতেই হচ্ছে কিছু কিছু। খাওয়াটা সরকারী লঙ্গরখানায় চলে বটে—তা বাদ সবই কিনতে হয়। সব জিনিসই মহার্ঘ্য হয়ে উঠেছে কোম্পানীর অবরোধ শুরু হবার পর থেকে। শাহ্‌জাদা আর তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গ সিপাহীদের অত্যাচারে দীর্ঘকাল বাজার বন্ধ, ফলে সহজে কিছু কেনবারও উপায় নেই। দু একটা জিনিস যা পাওয়া যায়—তার পাঁচ গুণ দাম পড়ে। সিপাহীরা লুঠ ক'রে চালায়, তেমন দরকার পড়লে—গেরস্তবাড়ির কপাট ভেঙ্গে লুট করতেও অসুবিধা নেই তাদের—কিন্তু আগার সে প্রবৃত্তি হয় না। সে ঐসব পুরবীয়া সিপাহীদের সঙ্গে মিশতেও পারে না তেমন ভাবে।

সামান্য যা কিছু পয়সা কড়ি ছিল খুচরো—নিয়ে নিল অবশ্য। আর নিল বাদশার দেওয়া পবিত্র উপহার—সেই ঢেবুয়াটি। কিন্তু জেব্‌এ নিতে ভরসা হল না সেটা। একটা গেঁজে ছিল তার অনেকদিনের—সেই গেঁজেতে ঢেবুয়াটা ভরে বুকে বেঁধে নিল কুর্তার নিচে। বর্মের মতো রক্ষা করবে তাকে।

আরও একটা কাণ্ড ক'রে বসল সে। যে জিনিসটা একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও কাউকে দেখাতে পারে নি এতকাল, বুকের মধ্যে ছেলেবেলাকার কবচের সঙ্গে ঝুলিয়ে সঙ্গোপনে রেখে দিতে হয়েছিল—তার সেই দুর্লভতম ঐশ্বর্য—আশমানের চাঁদের স্পর্শপূত সেই আংটিটি আজ ভরসা ক'রে কুর্তার কারাগার ঘুচিয়ে আঙুলের আম দরবারে নিয়ে এল। আর কাকে ভয় তার, কিসের ভয়? এ আংটির মালেকানের অপ্রস্তুত হবার ভয়টাই বড় ছিল—কিন্তু সে সম্ভাবনাও তো আর রইল না। সে তো চলেই যাচ্ছে এই অন্ধকারের মধ্যে, কালকের সূর্যালোকে তো আর তাকে দেখতে পাবে না! তাছাড়া এই দারুণ উপপ্লবের দিনে কে কার খোঁজ রাখছে—বাদশাজাদীর আংটিই বা কে চিনে রেখেছে!......

সাজসজ্জা শেষ ক'রে ধীরে ধীরে ছাউনীর ঘর থেকে বেরিয়ে এল আগা। বাইরে তেমনিই অন্ধকার। সারা শহরই অন্ধকার। ইংরেজদের ভারী কামানগুলোর অগ্নি-বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর থেকেই পথেঘাটে আলো জ্বালানো বন্ধ হয়েছে। লুটেরাদের দৃষ্টি আকর্ষণের ভয়ে গৃহস্থরাও আলো জ্বালে না বিশেষ। এত বড় শহর যেন প্রেতপুরীর মতো অন্ধকার দেখাচ্ছে।

অন্ধকারটা সয়ে গেলে অবশ্য পাথর-বাঁধানো পথ দেখতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। আস্তে আস্তে পথ ধরেই এগিয়ে চলল সে। কোথায় যাচ্ছে সে সম্বন্ধে সেও বোধহয় সচেতন ছিল না—একেবারেই অন্যমনস্ক হয়ে চলছিল। কিন্তু পা দুটো বুঝি মনের কথা জানত, তারা এক সময় তাকে অন্দর-মহলের দেউড়িতে এনে পেঁছে দিল। সে মহলের সামনে এসে চমকে উঠল সে, কিন্তু লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করল না, সরেও এল না। দাঁড়িয়েই রইল বরং।

দেউড়িও অন্ধকার আজ। চিরাভ্যস্ত ঝোলানো আলোটা কেউ জেবলে দেয় নি

সন্ধ্যায়। পাহারা পর্যন্ত নেই কেউ। ভেতরে লোক আছে অবশ্য। দাসী ও পরভৃতিকার দল । কোথাও পালাতে পারে নি তারা, সবাই আছে। কিন্তু ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে আছে বলেই হয়ত—কিম্বা সাজসরঞ্জামের অভাবে—বাতি জ্বালার তকলিফ কেউ নেয় নি।

অনাবৃত অবারিত দ্বার। বেহেস্তের পথ উন্মুক্ত ও প্রসারিত। লোভও দুর্বার এবং প্রবল। সে লোভকে প্রবলতর ক'রে তুলছে এই অপ্রত্যাশিত সুযোগ ও সুবিধা। সাহস ক'রে শুধু ঢুকে যাওয়ার ওয়াস্তা। কেউ বাধা দেবে না, সেটুকু সামর্থ্য বা উদ্যম কারও নেই।...

তাই যাবে নাকি কপাল ঠুকে ?......

কিন্তু কোন্ ঘরে সে থাকে—সে বা তার দাসী শিরীণ্—তা আগা জানে না। কাউকে জিজ্ঞাসা করতে গেলে পাঁচ রকম জবাবদিহি, যে রকম ভয়ে আছে, অন্ধকারে অন্তঃপুরের মধ্যে একটা মর্দানা দেখলে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠাও বিচিত্র নয়। সে চিৎকারে হয়ত পাঁচজন ছুটে আসবে চারদিক থেকে। সামান্য দুর্নাম নয়—রীতি-মতো কেলেঙ্কারী ব্যাপার ঘটবে তাহলে। তারও গায়ে সে কলঙ্কের কালি ছিটকে লাগবে—সেই স্বর্গের হুরীর গায়ে। নিজে সে অনেক লাঞ্ছনা সইতে রাজী আছে একবার তার দেখা পাবার আশায়—কিন্তু সেই বেহেস্ত-বাসিনীর এতটুকু অসম্মানও অসহ্য।

না, থাক। দরকার নেই। লোভকে প্রশ্রয় দেবে না সে।

তাছাড়া সে রকম কোন গোলযোগ বাধলে বাদশার হুকুমও তামিল করতে পারবে না। তাঁকে জবান দিয়ে এসেছে—রাত বারোটার সময় আটামসজিদে পেঁছবে, শেষ চরম নির্দেশ গ্রহণ করবার জন্য। হয়ত বাদশার সে নাতনী—নুরুন্নেসা বেগম সাহেবাও অপেক্ষা করবেন। আরও কেউ, আরও কিছু তৈরী থাকবে সেখানে। শাহ্‌জাদীর ডুলি, ওর ঘোড়া। সব আয়োজন পণ্ড হয়ে যাবে—সামান্য একটুখানি অবিমৃশ্যকারিতায়। বাদশা অপ্রস্তুত হবেন, ওকে দায়িত্বজ্ঞানহীন অমানুষ ভাববেন। না, সে হয় না।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে সেই একান্ত ও দুর্নিবার লোভ দমন করে সে। কিন্তু তাই বলে তখনই চলে আসতেও পারে না। অনেকক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে সে তার সেই পুরনো ঘরটার দিকে এগিয়ে যায়। সিঁড়ির নিচের সেই ঘরটা—যেটায় রহমত থাকত ইদানীং। রহমৎটাও যে কোথায় চলে গেল !...

কিসের লোভে, কী আশায় যে এ ঘরে এল সে—তা আগাকে জিজ্ঞাসা করলেও হয়ত সেই মুহূর্তে বলতে পারত না। সে কি সত্যিই আশা করে যে ঐ ঘরে গিয়ে দাঁড়ালেই কোন অদৃশ্য জাদুতে সে খবর পেঁছবে অন্তঃপুরের দাসী-মহলে আর শিরীণ্ ছুটে আসবে তার কাছে ?...তা নয়, অত নির্বোধ নিশ্চয়ই নয় আগা।... তবুও—

সমস্ত যুক্তিতর্ক, বাস্তব সত্য ও তথ্যের অন্তরালে যে একটি অসম্ভব আশা প্রত্যেক মানুষের বুকেই সঙ্গোপনে নিজের অস্তিত্ব গোপন ক'রে বাসা বেঁধে থাকে —সারা জীবনের রূঢ় কঠোর বাস্তব অভিজ্ঞতার সরোবরে হতাশার পঙ্ক থেকে উদ্ভূত সেই পঙ্কজ—যা সমস্ত প্রতিকূলতার হিমস্পর্শ সহ্য ক'রেও বেঁচে থাকে, সহস্র ঝড়-ঝাপ্‌টাতেও তার অনির্বাণ শিখা নেভে না কোনদিন—সেই আশাটিই সম্ভবতঃ, তার

প্রত্যক্ষ অনুভূতির অগোচরে, প্রবল আকর্ষণে টেনে নিয়ে এল ওই ঘরে!

কিন্তু সেই সুদূর আশা সুদূরেই রয়ে গেল, অসম্ভব সম্ভব হ'ল না কোনমতেই। কোন জাদুতেই তার আগমন-বার্তা অদৃশ্য যোগাযোগে কোন আবির্ভাবকে অবতীর্ণ করাতে পারল না। প্রায় চার পাঁচ দন্ড কাল সেই অন্ধকারে এক ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর লোহার মতো ভারী পা দুটো টেনে নিয়ে কোনমতে ফিরে চলল আবার তাদের ছাউনির দিকে।...লঙ্গরখানায় গিয়ে কিছু খেয়ে নেওয়া বোধহয় দরকার,—অজানা, বিপদসঙ্কুল পথে অপরসীম দায়িত্ব নিয়ে যাত্রা করার আগে। অবশ্য যদি জোটে। কে জানে, সেখানেও কোন খাদ্য আছে কি না, তন্দুর জ্বলেছে কিনা!

মীর মর্দান খাঁ একটি মাত্র মোমবাতির ক্ষীণ আলোকে যথাসাধ্য তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন তাকে—আপাদমস্তক। অনেকক্ষণ ধরে নিঃশব্দে ও প্রায় নিষ্পলকে তাকিয়ে রইলেন তার চোখের দিকে।

কিল্লার ঘড়িতে রাত বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই আটা মসজিদের ফটকে হাজির হয়েছে আগা। আলো জ্বলছে না বটে—ঘড়িটা বাজছে এখনও—একটু অবাকই লেগেছিল তার। কিল্লার কর্মচারীদের মধ্যে একজন অন্তত এখনও নিমকহালাল আছে। কিন্তু অবাক যতই হোক—কৃতজ্ঞও হয়েছিল সে। নইলে বাদশার হুকুম এমন কাঁটায় কাঁটায় তামিল করতে পারত কিনা সন্দেহ। আজ সন্ধ্যা থেকেই বড় বেশী যেন দিবাস্বপ্নে ডুবে যাচ্ছে সে। খেয়ালটাই কমে আসছে ক্রমশঃ।

পানি দরওয়াজা দিয়ে বেরিয়ে মসজিদে আসতে তাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল, সময়ও লেগেছিল খুব। তবু শেষ পর্যন্ত ঠিক সময়েই পেঁছতে পেরেছিল সে খুদার কুদরতে। মসজিদ পর্যন্ত এসে বরং একটু দ্বিধায় পড়েছিল। গোটা মসজিদটা ঘুট-ঘুট করছে অন্ধকারে। এখানে অন্তত একটা চিরাগ জ্বালা উচিত ছিল। ঈশ্বরের সেবক কি এমন কেউ নেই যে তাঁর প্রার্থনা মন্দিরের সম্মান রাখে! একটু ইতস্তত ক'রে হয়ত ফিরেই যেত সে—যদি না সেই অন্ধকারে অশরীরী কোন ছায়া-মূর্তির মতো একজন সিপাহী নিঃশব্দে ওর পাশে এসে আবির্ভূত হ'ত। ভয় পেয়েই গিয়েছিল আগা,—কিন্তু লোকটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাকে রীতিমতো চমকিত ক'রে তুলে প্রশ্ন করল, 'তুমি আগা মহম্মদ? ভেতরে এসো—'

প্রশ্ন করেছে, কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা করে নি। একেবারেই হাত ধরে অন্ধকারে পথ দেখিয়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিল মসজিদের পিছন দিকটায় ইমামের বিশ্রাম করবার যে ছোট্ট একটি ঘর আছে—সেইখানে। সেইখানেই এক কুলুঙ্গীতে কলুকের পিছনে বসানো একটা মোমবাতি জেবলে অদ্বিতীয় কুর্সিখানায় বসে ছিলেন মীর মর্দান খাঁ। তাঁকে চিনতে একটুও বিলম্ব হ'ল না আগার, এর আগেও কয়েকবার দেখেছে সে।

আগা গিয়ে সামরিক কায়দায় অভিবাদন ক'রে দাঁড়াতে একবার শুধু মাথাটা ঈষৎ হেলিয়েছিলেন—সে অভিবাদনের প্রাপ্তিস্বীকার হিসেবে—তারপর থেকে চেয়েই আছেন তিনি স্থির ভাবে।...

বহু—বহুক্ষণ পরে একটু নড়েচড়ে বসলেন মীর মর্দান খাঁ। প্রস্তরমূর্তিতে প্রাণলক্ষণ জাগল এতক্ষণে। এবার একটি প্রশ্নও করলেন তিনি, 'তুমিই আগা মহম্মদ?'

'জী জনাব।' উত্তর দিল আগা।

'কিন্তু তুমি তো ছেলেমানুষ। কত উমর হ'বে তোমার? একুশ বাইশ?'

'ঐ রকমই হ'বে জনাব। ঠিক হিসেব বলতে পারব না। হয়ত আরও কম।'

'হুঁ! তাই মনে হচ্ছে—কিন্তু তুমি কি পার'বে এ ভার বইতে? এ বড় দুরূহ ভার, বড় কঠিন কাজ! এতটা দায়িত্ব—এ ঝুঁকি নেওয়া তোমার উচিত হয় নি। কারণ শুধু শক্তি থাকলেই বিপদে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। কিছু পরিণত বুদ্ধিও থাকা দরকার। আর বয়স না হ'লে বুদ্ধি সে পরিণতি লাভ ক'রে না। এত লোক এত তাঁবেদার থাকতে মহামান্য বাদশা একটা বালককে ডেকে এই দায়িত্ব দিলেন! বড় তাজ্জব!!'

কী আর উত্তর দেবে আগা, চুপ ক'রেই দাঁড়িয়ে রইল সে। বাদশার বিবেচনা বাদশার কাছে—তাঁর মনের খবর অবশ্যই আগার কাছ থেকে আশা করেন না মীর মর্দান খাঁ।

মীর মর্দান কিন্তু ওর এই নীরবতাকে স্পর্ধা বলে মনে কর'লেন বোধহয়। তিনি কঠিন ভ্রূভঙ্গী ক'রে প্রশ্ন কর'লেন, 'ও, তাহলে তোমার মনের জোর আছে খুব, এটাকে নিতান্তই সামান্য কাজ ভাবছ।'

আগা বিনত ভাবেই বলল, 'মনের জোর আছে কি নেই, শক্ত কি সামান্য কাজ তা তো ভে'বে দেখি নি হুজুর। বাদশার আদেশ—এর ওপর নিজের যে কিছু ভাবা সম্ভব -তাই তো ভাবতে পারি না। আমি শুধু জানি—আমার কথা এইটুকু বলতে পারি—যতটা সাধ্য আর যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকবে, মালিকের আদেশ পাল'ন কোন ত্রুটি হবে না। আর সকলের ওপর হ'ল খোদাতালার মর্জি, তাঁর কুদরতে তো খোঁড়া লোকও পাহাড় ডিঙ্গায় জনাব!'

মীর মর্দান খাঁর ভ্রূকুটি প্রসারিত হল কিন্তু নিঃসংশয় হলেন বলে বোধ হ'ল না। শুধু প্রশ্ন কর'লেন, 'শির জামিন?'

'শিরের চেয়ে ইমান আর ইজ্জৎ দুইই বড় সিপাহ্‌সলার।'

'তুমি পাঠান?'

'জী!'

আর কথা বাড়ালেন না মীর মর্দান খাঁ।

জেবের মধ্যে থেকে ভাঁজ করা কাগজ বার করলেন একখানা—সেটা ওর হাতে দিয়ে বললেন, 'মোটামুটি একটা পথের নক্সা আঁকা আছে কাগজটায়। কিন্তু সোজা বড় রাস্তা ধরে যাবার চেষ্টা ক'রো না, তাহলে কোনদিনই তোমাকে ধরমপুরে পৌঁছতে হবে না। মোটামুটি নক্সা দেখে দিকটা ঠিক ক'রে নিয়ে মাঠ বা জঙ্গল ধরে যেও; রাস্তা বাত্‌লাবার মতো লোক পাওয়া যাবে না—এই রকম পথ ধরেই যাওয়া ভাল। দিনে সুরয আর রাতে তারা—এই দেখে দিকগুলো মোটামুটি ঠিক ক'রে নিয়ে নক্সার সঙ্গে মিলিয়ে নিও। নক্সাটা সাবধানে জেবে ভ'রে নাও—আর এই নাও একশটা টাকা। বাইরে ডুলি তৈরী আছে, তোমার ঘোড়াও। ডুলির সওয়ারও পৌঁছে গেছেন। ব্যস, আমার দায়িত্ব তোমাকে বুঝিয়ে দেওয়া, সেটা খতম হল! এবার তোমার দায়—তোমার ওপর।'

যন্ত্রচালিতের মতোই নক্সাখানা তাঁর হাত থেকে নেয় আগা। বিহ্বলভাবে মেলে ধ'রে সেটা মোমবাতির ক্ষীণ আলোতে। হাতে আঁকা—কাঁচা নক্সা একটা। জায়গার নামধাম নেই—শুধু নদী মাঠ জঙ্গল আর গ্রাম—এইভাবে দেখানো আছে। নাম আছে শুধু বেরিলীর আর ধরমপুরের। চারটে দিকও দেখানো আছে নক্সার একটা

কোণে।

কাগজখানা আবার ভাঁজ ক'রে জেবে পুরল আগা। টাকার থলিটা কোমরে বাঁধল। তার পর পুনশ্চ মীর মর্দান খাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'আর শাহী খৎখানা?'

'ঠিক!' আর একটি জেব থেকে খৎখানা বার করলেন মীর মর্দান খাঁ। সাধারণ কাগজ নয়—দলিলের মতো চামড়া-কাগজে লেখা, বাদশার পাঞ্জা পড়েছে, দেখা যাচ্ছে বাইরে থেকেই। মীর মর্দান কপালে ঠেকিয়ে খৎখানা দিলেন ওর হাতে, আগাও নিয়ে কপালে ঠেকাল। তার পর সাবধানে কুর্তার ভেতরদিকের জেবে রেখে দিল সেটি।

'আউর কুছ? আউর কোই ফরমায়েশ?' প্রশ্ন করলেন মীর মর্দান খাঁ।

কণ্ঠস্বরটা কি কিছু অস্বাভাবিক শোনাল? কোথাও কি একটা সূক্ষ্ম ও প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুর ফুটে উঠল তাঁর আপাত-প্রশান্ত গলার আওয়াজে? কিন্তু তাঁর ভ্রূকুটি-হীন ললাটে বা স্থির মর্মভেদী দৃষ্টিতে তো কোথাও সেরকম কোন চিহ্ন নেই!

তবে আগার একটা অস্বস্তি বোধ হ'ল কেন?

একটু ইতস্তত করল আগা। তারপর সসংকোচেই বলল, 'তিনি—মানে শাহ্‌জাদী—মানে যাঁকে নিয়ে যেতে হবে আমাকে—তিনি কোথায়?'

'তিনি ঠিক জায়গাতেই আছেন। তুমি তৈরী হ'লে দেখবে তিনিও তৈরী আছেন। কিন্তু বে-অকুফ, ঐ শব্দটা আর উচ্চারণ ক'রো না। তোমার বহিনজী আছেন সঙ্গে—কি ভাবীজী—এই কথাটা যেন মনে থাকে।—শাহ্‌জাদীর পরিচয় জানিয়ে এ পথে কাউকে নিয়ে যাওয়া—সে তোমার পাঠানী হিম্মতেও কুলোবে না।'

আগা অপ্রতিভ হ'ল কিন্তু সতর্ক হ'তে পারল না। আবারও একটা নিবুদ্ধিতা প্রকাশ ক'রে বলল, 'তা—সেই, মানে মালেকানের সঙ্গে একবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে থাকা কি উচিত নয়? আমাকেই যখন এতটা পথ নিয়ে যেতে হবে—একবার মুখটাও যদি না দেখা থাকে'—

শাহী অন্তঃপুরের মেয়েকে ভাবী বা বহিন ব'লে উল্লেখ করাটা তার ধৃষ্টতা বলে মনে হ'ল—কিন্তু এ প্রস্তাবটা যে অধিকতর ধৃষ্টতা তা বুঝতে পারল না।

কিন্তু বুঝিয়ে দিলেন মীর মর্দান খাঁ—ক্রুদ্ধ সর্পের মতো হিস্ হিস্ ক'রে উঠলেন যেন।

'বান্দা, তোমার বেয়াদবি তো কম নয়! আগের জমানার কথা ছেড়েই দাও,—এখনও, যদি শাহানশার কাজ পণ্ড হবার ভয় না থাকত, তাহলে আমিই তোমার ঐ জিভ দুটুকরো ক'রে ফেলতাম এই মুহূর্তে। তুমি দেখবে মুঘল হারেমের শাহী জেনানার মুখ!.. একথা বলার পরও যে তোমার জান আছে—এতেই বোঝা যাচ্ছে যে দুনিয়াটা ওলটপালট হবার আর দেরি নেই! তোমার মতো নফরদের—বুরখার নিচে দিয়ে পা ফেলবার সময় চটীসুদ্ধ পায়ের যেটুকু দেখা যায়—তার বেশী দেখতে নেই। চিনবে ঐটুকু দিয়েই। সাবধান, আর কখনও এমন ধৃষ্টতা প্রকাশ ক'রো না!'

বারবারই নফর ও বান্দা শব্দ দুটো উচ্চারণ করার সময় যেন কণ্ঠে অতিরিক্ত জোর দেন মীর মর্দান খাঁ। আর সে জোরটা যথাস্থানেই গিয়ে আঘাত করে। অপমানে আগার কান দুটো জ্বালা করতে থাকে, হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হয় বার বার। কিন্তু প্রতিকারের কোন পথ নেই তা সে নিজেও বোঝে। তারও সেই বাদশার কাজ পণ্ড হবার ভয়। অতিকষ্টে আত্মসম্বরণই করে সে। সমস্ত অপমান হজম ক'রে

শুধু নীরবে অভিবাদনের একটা ভঙ্গী মাত্র ক'রে ঘর থেকে বেরোতে উদ্যত হয় সে।

এবার যেন মীর মর্দান খাঁই একটু অবাক হয়ে যান, বলেন, 'তা তুমি কখন রওনা দেবে বা দিতে পারবে তা বললে না তো!'

'দেখি। এখনও ঠিক ভেবে দেখি নি। ঘোড়া আর ডুলির বেহারাদের দেখে নিই তো—তারপর সুবিধা ও সময় বুঝে আমিই তাদের বলব।'

'শাহ্‌জাদী বহুক্ষণ ধরে এসে বসে আছেন। তুমি কখন রওনা দিতে পারবে—সেটা তাঁকে জানানো দরকার।' ঈষৎ অসহিষ্ণু ভাবেই বলেন মীর মর্দান খাঁ। এই নয়া জমানার ধৃষ্টতা আর দুঃসাহসের যেন তল পান না তিনি। তাঁর উদ্যত রোষ ছাপিয়ে তাঁর বিস্ময়টাই প্রবল হয়ে ওঠে।

এবার আগা হাসল একটু। মোমবাতির ক্ষীণ আলোয় সে আনন্দলেশহীন হাসিতে নিরাবরিত কয়েকটি শুভ্র দন্ত প্রকাশ পেল শুধু। আগা বলল, 'আপনি কার কথা বলছেন আমি ঠিক জানি না। আমার এক মালেকানকে নিয়ে এক জায়গায় রওনা হবার কথা আছে বটে—তবে সে নিতান্তই আমার দায়িত্ব—আমার দায়। আপনার তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন আছে বলে তো জানি না সিপাহ্‌সলার। আপনাকে যেটুকু কাজের ভার দিয়েছিলেন মালিক-এ-আজম, আশা করি তা শেষ হয়ে গেছে। অতি যোগ্যতার সঙ্গে আপনার কর্তব্য পালন করেছেন আপনি—এবার আমাকে আমার কর্তব্য পালন করতে দিন—আমার জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেচনামতো।'

মীর মর্দান খাঁর মুখ অঙ্গারবর্ণ ধারণ করল। কোমরে গোঁজা পিস্তলটা চেপেও ধরলেন একবার—কিন্তু বোধ করি কিছু-পূর্বেকার নিজের কথাটা স্মরণ ক'রেই সে দুর্বার ক্রোধ সামলে নিলেন শেষ পর্যন্ত। শুধু নিজের ঠোঁট দুটো বার বার কামড়াবার ফলে সে দুটো ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হয়ে উঠল।

॥ তেইশ ॥

সেদিন সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত মেহের জানত না যে তাকে কোথাও যেতে হবে। হয়ত সকলকেই যেতে হবে এক দিন, তাদের বহুকালের বাসা এই প্রাসাদ-দুর্গ ছেড়ে—কিন্তু সে অন্য কথা। সে হ'ল ভাগ্য ভাগ ক'রে নেওয়া। লড়াইয়ের গতিক ভাল নয়। কদিন কোম্পানীর অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণের উত্তরে বাদশাহী কামান যে ক্রমশ নিস্তেজ ও নিরুত্তর হয়ে আসছে—এটা আরও কোন কোন পুর-ললনার সঙ্গে সেও লক্ষ্য করেছিল। এ নিয়ে চাপা আলোচনা শুরু হয়ে গেছে অন্তঃপুরের মধ্যেও। কানাঘুষো শুনছে সে নানা রকমরই। লালকিল্লা ও শাহ্‌জাহানাবাদ যে জনশূন্য ও সিপাহীশূন্য হয়ে আসছে ক্রমশ—তা কতক ওরা দেখছে, কতক না দেখেও অনুভব করছে। শুভানুধ্যায়ীরা যে এসে নানারকম পরামর্শ দিচ্ছেন বাদশাকে, তারও কতকটা কানে যাচ্ছে। কেউ বলছেন তরাই অঞ্চলে জঙ্গলের মধ্যে চলে যেতে—কেউ বলছেন সোজাসুজি লক্ষ্মৌতে গিয়ে উঠতে। এখনও লক্ষ্মৌ আছে, আরা আছে—লড়াই এখনও থামে নি। আখেরী মীমাংসার এখনও ঢের দেরি। বাদশা যেখানে যাবেন সেখানেই লোকে তাঁকে দেখে আশায় বুক বাঁধবে, তাঁর খিদমতে ছুটে আসবে। নতুন ক'রে সাড়া জাগবে আবার হিন্দুস্তানে। কিন্তু এখানে থাকলে আর ঐ বুনো ইংরেজগুলোর হাতে পড়লে আর রক্ষা নেই—অবধারিত মৃত্যু! মৃত্যুও বড় কথা নয়

হয়ত—তার চেয়েও বেশী, লাঞ্ছনা।

বাদশাও এই পরামর্শ শুনবেন—শোনা উচিতও, অন্তত মেহের তাই ভেবেছিল। এছাড়া আর কোন উপায়ের কথা তার মাথাতে যায় নি। পালাতে হ'লে সবাইকে পালাতে হবে। সে ক্ষেত্রে অনর্থক দেরি ক'রেই বা লাভ কি? যত দেরি হচ্ছে ততই তো চারিদিক থেকে বিপদ ঘনিয়ে আসছে, সর্বনাশের জাল ঘনীভূত হচ্ছে—নিয়তির মুষ্টি কঠোরতর হয়ে আসছে। এর পর সবাইকে নিয়ে যাওয়া চলবে তো? এমনও একটা কুটিল সংশয় এবং আশঙ্কা দেখা দেয় মেহেরের মনে—শেষ পর্যন্ত তাদের সকলকে ভাগ্যের হাতে ফেলে রেখে বাদশা ও বেগম শুধু কোনমতে পালিয়ে যাবেন না তো?......সে ক্ষেত্রে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোন্ পথ, আর কোন উপায় তো দেখতে পাচ্ছে না সে।...কথাটা কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারলে নিশ্চিন্ত হ'তে পারত সে। কিন্তু কাকেই বা করবে, নানীজী জিন্নৎ মহল বেগম সাহেবার ঘরে তো এখন ঘন ঘন রণমন্ত্রণাসভা বসছে। বলতে গেলে, লড়াই তো তিনিই চালনা করছেন এক-রকম। তাঁর বোধ হয় বিন্দুমাত্র সময় নেই আর কোনদিকে বা আর কারো দিকে মন দেবার। তাঁর এখন একমাত্র চিন্তা নিজের ছেলের—সেই সঙ্গে নিজেরও ভবিষ্যৎ ও নিরাপত্তা।

কিছুই শোনে নি, কিছুই বোঝে নি—একটা অনিশ্চিৎ ভবিষ্যতের সুতোয় ঝুলে ছিল এই কদিন। অবশ্য তাতে যে খুব একটা তার ক্ষতিবৃদ্ধি হচ্ছিল তাও যেন নয়। জীবন সম্বন্ধে কেমন যেন একটা ঔদাসীন্য, একটা বীতস্পৃহা এসে গেছে তার। মনে হয় তার যা কিছু আনন্দ,—যা কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যতের স্বপ্ন—সবই যেন কোন্ অতলে তলিয়ে গেছে, সে যেন কোন সুদূরের কথাও। এখন তার বেঁচে থাকা শুধু তো দেহটাকেই বাঁচিয়ে রাখা। কাজেই শেষ পর্যন্ত সেটার কী হ'ল না হ'ল সমস্ত চিন্তাটাই তার কাছে নিরর্থক। তেমন যদি কোন চরম দুর্ভাগ্যেরই সম্মুখীন হ'তে হয় তাকে, তাহ'লে এমনি উদাসীন নিস্পৃহতার সঙ্গেই এ জীবনটা বার ক'রে দিতে পারবে।

তবু—সেদিন সন্ধ্যার পর যখন খোদ বাদশা তাকে ডেকে পাঠালেন তখন সে একটু বিস্মিত না হয়ে পারে নি। হুকুম শুনে আরও বিস্মিত হয়ে গেল সে। তাকে আজই—এখনই রওনা হ'তে হবে—কোন্ এক অজানা শ্বশুরবাড়ি, অপরিচিত অজ্ঞাত স্বামীর উদ্দেশে, একটি সামান্য সিপাহী ও দুজন ডুলি বাহ'কের ভরসায়। এর বেশী আর তার নানার সাধ্য নেই, আজ। এটুকুও দুঃসাধ্য—এর বেশী যা, তা সাধ্যাতীত। সব বুঝে যেন অক্ষম অপারগ বৃদ্ধকে ক্ষমা করে মেহের।

কথাটা বুঝতেই প্রথমে কিছু সময় লাগল। তার পর, বিরক্তির বা ভয়ের পরিবর্তে হাসিই পেল তার। হায় রে শাহজাদী! একে তো উপযাচিকা হয়ে যাচ্ছে ভাবী স্বামীর কাছে—সে স্বামী কেমন হবে তাও জানে না সে, ইতিমধ্যেই কটি স্ত্রী এবং কটি উপপত্নী তার হারেমে জেঁকে বসে আছে তা কে জানে, তবে আছেই কেউ কেউ ; সামান্য জায়গীরদার একজন, ধূর্ত ও মতলব-বাজ বলেই টিকে আছে এখনও—এই তো যা সে পরিচয় পেল বাদশার কাছে,—তাও, সেই স্বামীর ঘরেই বা কী ভাবে যাচ্ছে। সকলের অগোচরে, নিশীথরাত্রির অন্ধকারে, চোরের মতো—সঙ্গে একটা বাঁদী কি নৌকর পর্যন্ত থাকছে না। কোন যৌতুক নেই, কোন উপঢৌকন নেই—ভিখারিণীর মতো তার কৃপাপ্রার্থী হয়ে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তাই কি পৌঁছতে পারবে শেষ পর্যন্ত? এই দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল পথে একেবারেই অসহায় ভাবে যাত্রা

করতে হবে তাকে—একজন মাত্র রক্ষীর ভরসায়। সে লোকটা কেমন তাই বা কে জানে --ভালো লোকও যদি হয়—একজনের কতটুকুই বা হিম্মৎ।

হাসি পেল কিন্তু হাসবার সময় সেটা নয়। বাদশার স্তিমিত শান্ত দৃষ্টিও আজ স্নেহে মমতায় উদ্বেগে বিগলিত হয়েছে, চোখের শ্বেত পক্ষ্মগুলি ভিজে ভিজে দেখাচ্ছে। সেদিকে চেয়ে মেহেরের চিত্তও উদ্বেল ও বিচলিত হয়ে উঠল। এই অসহায় বৃদ্ধকে চারিদিকের নিষ্ঠুর স্বার্থপরতার আবর্তে ফেলে কোথায় যাবে সে? চরম দুঃসময়ে এঁর মুখের দিকে তাকাবার মতো লোক বোধহয় একজনও নেই এ কিল্লায়। ...সে কাছে এগিয়ে এসে বাদশার দুটি হাত ধরে বলল, 'আমিও থাকি না জাহাঁপনা—অনর্থক এত হাঙ্গামা করতে যাচ্ছেন কেন? বাঁচি তো ভালই—আর যদি মৃত্যুই থাকে কিসমতে লেখা—এক সঙ্গেই মরব না হয়। সেই তো ভাল, কারও জন্য কারও দুঃখ কি দুশ্চিন্তা থাকবে না—? বাবরশাহী বংশে আমাদের জন্ম, মৃত্যুকে ভয় করার শিক্ষা তো কখনও পাই নি জনাব!'

বাদশা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বোধ করি বা চোখের জলটাই গোপন করার চেষ্টা করেন তাঁর প্রিয় ও তীক্ষ্ম-দৃষ্টি দৌহিত্রীটির কাছ থেকে। তারপর, গাঢ়স্বরে বলেন, 'না দিদিভাই, মৃত্যুই যদি একমাত্র আশঙ্কা হ'ত তাহলে ব্যস্ত হতুম না। নবাব বাদশার ঘরের সব চেয়ে বড় শিক্ষাই হ'ল মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকার শিক্ষা, মৃত্যুকে ভয় না করার শিক্ষা। যে বহু লোকের জীবন-মৃত্যুর মালিক, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা—তার কাছে জীবন আর মৃত্যু সমান তুচ্ছ, এই শিক্ষাই আমরা পেয়েছি চিরকাল বাপ দাদার কাছে। বাদশা বড়ে আলমগীর এতটুকু বয়স থেকে বার বার মৃত্যুর সামনে অবিচলিত থেকে প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন যে তিনি খোদার কাছ থেকে সনদ আনা বাদশা, বাদশাহী করার জন্যেই জন্মেছেন তিনি! কিন্তু মরার চেয়ে অনেক বড় ভয় আছে দিদি, বাদশার ঘরে সেইটেই বড় ভয়।...ইজ্জতের ভয়।...আমাদের কর্তব্য আমরা পালন করতে পারি নি—খোদার দরবারে অপরাধী হয়ে আছি। সে গুনাহ্‌গার দিতে হবে বৈকি! এই শহর শাহ্‌জাহানাবাদে আংরেজদের মেয়েরা বেইজ্জৎ হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে—সে কথা ওরা ভোলে নি। ওরা যেদিন আবার জয়ী হয়ে এই শহরে ঢুকবে, সেদিনকার কথাটা ভেবে ভয় পাচ্ছি ভাই। বর্বরতার শোধ যদি বর্বরতা দিয়েই কেউ দেয় তাকে দোষ দেব কী ক'রে? হয়ত ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা উশুল দিতে হবে, সুদ সুদ্ধ। কিন্তু সে যা হয় হবে, সে দিতে হয় আমরাই দেব। আমাদের পাপের ফল আমাদের দৌহিত্রী ভোগ করবে কেন বল? সে আমরা করতে দেবই বা কেন! বিশেষ ক'রে—তোর মা যে আমার কাছে তোকে গচ্ছিত রেখে গেছে ভাই!'

'বেশ, তাহলে চলুন এক সঙ্গেই যাই জাহাঁপনা। যদি আমার যাওয়া সম্ভব হয়—আপনারও হবে। হিন্দুস্তানের তখ্‌তের আপনিই হকদার—ন্যায়তঃ ও ধর্মত আপনি যেখানেই যাবেন সেখানেই আপনি বাদশা। শুনেছি লক্ষ্মৌতে খুব জোর লড়াই চলছে, আপনি যদি এখানকার বাকী সিপাহী নিয়ে যান, আরও জোর পাবে তারা।'

'না ভাই', বাধা দিয়ে ব'লন বাদশা, 'আমি কোথাও যাব না। শুনেছি ইংরেজ জাতের বড় খেলাই হচ্ছে শিয়াল খেদানো। হঠাৎ মারে না ওরা; তাড়া ক'রে বেড়ানোতেই ওদের আনন্দ। একটা খ্যাঁকশিয়ালকে তাড়া করে অনেকগুলো মানুষে আর অনেকগুলো শিকারী কুকুরে, শিয়ালটা একটা গর্ত থেকে আর একটা গর্তে

যায়—একটা আশ্রয় থেকে আর একটা আশ্রয়ে। কোথাও ওরা শান্তিতে থাকতে দেয় না তাকে। তিন-চার ঘণ্টা ধরে ছুটোছুটি ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে পড়লে বধ করে। আমি ওদের হাতে শিয়াল বনতে চাই না দিদিভাই। আমি হিন্দুস্তানের বাদশা, দিল্লী আমার রাজধানী। আমার স্থান এইখানে, এই শহরেই। কোথায় যাব আমি সামান্য একটু আশ্রয়ের জন্যে! এখানেই যদি বেঁচে থাকি তো থাকব—আর মৃত্যু হ'লে? এই তো আমার উপযুক্ত স্থান শেষ শয্যার। বাদশা বিদেশী কাফেরদের কাছে হেরে শির বাঁচাবার জন্যে এখানে ওখানে ছুটোছুটি করছেন—সে বড় লজ্জার কথা! এ বয়সে সে অপমান সইতে রাজী নই!'

'আমি—আমি যে—যদি তেমন দুর্দিন সত্যিই আসে—আপনার সঙ্গে থাকতে চাই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।...সেটুকু শান্তি থেকে আমাকে বঞ্চিত করছেন কেন শাহান্‌শা—কৃতজ্ঞতার ঋণ তো আমারও কিছু আছে!'

'সেই ঋণের দোহাই দিচ্ছি, আমাকে শেষ কটা দিন একটু নিশ্চিন্ত হতে দে! তোর কোন ব্যবস্থা করতে না পারলে যে মরেও শান্তি পাব না রে!'

তবুও হয়ত কিছু বলত মেহের, বাধা দিয়ে বাদশা বললেন, 'বাদশার কথা কেউই শুনতে রাজী নয় আজ, বেঁচে থেকে এও দেখতে হ'ল! কিন্তু তুইও কি শুনবি না ভাই? তুইও তোর বাদশার হুকুম অমান্য করবি?'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাথা নামাল মেহের, 'না শাহান্‌শা, আমি অন্তত আপনার হুকুম তামিল করব, আমার জন্য আপনাকে অশান্তি ভোগ করতে হবে না!'

এর পর আর একটি কথাও জিজ্ঞাসা করে নি। কার সঙ্গে যেতে হবে, যাওয়ার ঠিক কী ব্যবস্থা, সেখানে গিয়েই বা কি করবে—একটা প্রশ্নও না। তার প্রস্তুত হবারও কিছু ছিল না। কিছুই যখন সঙ্গে নিতে পারবে না—ডুলিতে যেতে হবে সেটা শুনেছিল সে, ডুলিতে একটা মানুষ বসলে আর কিছুই ধরে না—। তখন আর গোছগাছ করার কী আছে! যে পোশাকটা পরে আছে—সেই পোশাক পরেই যাবে! তার কাছে এখন সব পোশাকই সমান। বরং দামী জমকালো পোশাক না পরাই ভাল। তাতে পরিচয় গোপন করার অসুবিধা। আজ রাজকন্যারা নিরাপদ নয়—নিরাপদ সামান্য মুলকীন্‌রাই!...না, যা পরে আছে তাই ভাল, তার ওপর বুরখাটা শুধু চাপিয়ে নেওয়া—

বুরখার কথাটা মনে পড়তেই শিরীণের কথা মনে পড়ল। শিরীণের সঙ্গে সঙ্গে—শিরীণ্ সাজবার প্রয়োজন হয়েছিল যার জন্যে—তার কথাও। কোথায় যে গেল কে জানে! কিম্বা কিল্লাতেই রয়ে গেল চরম দুর্দিনের মোকাবিলা করার জন্য। গত ক'মাসে বারকতক মাত্র দেখেছিল আগাকে—প্রাণপণে, ঠিক তপস্যার মতো ক'রে ছাদের কোণে বা নিজের ঘুলঘুলিতে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে চকিতে একবার হয়ত দেখতে পেয়েছিল মাত্র। তাও, দেখা হওয়া যাকে বলে, তা হয় নি! অর্থাৎ আগা তাকে দেখতে পায় নি—কথাবার্তা তো হয়ই নি। গত এক মাসে সে চোখের দেখাটুকুও দেখতে পায় নি কোনদিন। কে জানে এখানে আছে কিম্বা বাদশা কোথাও পাঠিয়েছেন। ভরসা ক'রে আগার বিষয়ে প্রশ্নও করতে পারে নি সে। কারণ বাদশাও যেন বহু দূরে চলে গিয়েছিলেন এই চার মাস। নিভৃতে পাবার তাঁকে আর কোন উপায় ছিল না, বহু লোকের মধ্যে সত্যকার বাদশার মতোই ছিলেন তিনি, জ্যোতিষ্কলোকের মধ্যকার নক্ষত্রের মতো। সেখানে তুচ্ছ এক অন্তঃপুরিকার হৃদয়-দৌর্বল্যের কথা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় নি। অন্তঃপুরের

যাঁরা প্রধানা, তাঁরা সবাই রাজনীতি নিয়ে এবং যে যাঁর স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। তাঁদেরও কাউকে তুচ্ছ এক বাদশার দেহরক্ষী সিপাহীর খবরের জন্য বিব্রত করতে ভরসা হয় নি। এমনিতেই রাবেয়া মারফৎ—তার ধর্ম ভাইয়ের চিকিৎসার জন্য শাহ্‌জাদীর উদ্যম ও সহায়তার কথাটা অন্দরমহলে ছড়িয়ে পড়ে বড় বেগমসাহেবার কাছে অনেক বাঁকা বাঁকা কথা শুনতে হয়েছে তাকে। তাতেই আরও সতর্ক হয়েছে মেহের—কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ না বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু তবু সে একটা সান্ত্বনা ছিল যে, এই কয়েকশ' হাত জমিনের মধ্যেই সে লোকটা আছে, বেঁচে আছে—সুস্থ আছে! বাদশার দেহরক্ষী যখন, তখন বাদশাকে ফেলে লড়াইয়ে যাবে—এমন সম্ভাবনা নেই। যদি বাদশাকে পালাতে হয়, ওকেও সঙ্গে যেতে হবে। আর যাই হোক, ইংরেজের গুলি কি গোলায় মরবার আশংকা কম। অবশ্য গত কদিন ধরে ইংরেজের গোলা যে ভাবে শহরের মধ্যে এসে পড়ছে, তাতে আগের মতো অতটা নিশ্চিন্ত ভাব আর রাখতে পারে নি এটা ঠিক—কে জানে ঐ হারামখোর-গুলোর গোলা শেষ অবধি কতদূর যাবে, শেষ অবধি কিল্লার মধ্যেই এসে পড়বে কিনা তার ঠিক কি!—তবু সে গোলা যে বেছে বেছে আগার গায়েই এসে পড়বে এটা ভাবার কোন সংগত কারণ ছিল না!

না, প্রাণের ভয় হয় নি আগা সম্বন্ধে। বরং—মেহের মাঝে মাঝে কল্পনা করত, দিবা স্বপ্নই বলা উচিত, যে ঘোরতর কোন বিপদের মধ্যে, এক চরম বিপর্যয়ের দিনে আগাই নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রে বাদশা কি জেন্নৎ মহল সাহেবাকে বাঁচাল—আর সেই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বাদশা তাকে কোন উচ্চ পদবী কি খেতাব দিলেন আর সেই সঙ্গে দিলেন রাজবংশে বিবাহ করার অধিকার। আচ্ছা, এমন কি হয় না? হ'তেও তো পারে। কহানী-কিস্‌সার বইতে তো এমন কত পড়া যায়, সে কি তাহলে সবই অসম্ভব, সব মিথ্যা?

গত একমাস যেন আবার এই খোয়াবটা বেশী দেখেছে সে। নিত্যই দেখছে, অবসর পেলেই দেখছে। আর অবসরেরই বা অভাব কি?...হয়ত এই একমাসে একদিনও তার দেখা পায় নি বলেই তার কথা এত ভেবেছে। কত অসম্ভব ঘটনার কথাই না ভেবেছে সে, কত অবাস্তব অবস্থার মধ্যে নিজেকে কল্পনা করেছে। যে মিলনের স্বপ্নও সুদূরপরাহত, সেই মিলনকে স্বপ্নেই পেতে চেয়েছে সে।

তখন কিছুটা আশা ছিল যে!

দেখা হবার, দেখা পাবার আশা। সম্ভাবনাটা যত কষ্ট-কল্পিতই হোক—তার বাস্তব স্থূল ভিত্তি ছিল একটা, সে ও আগা একই কিল্লার মধ্যে বাস করছে। যোগাযোগের সেই অদৃশ্য অথচ অনুভূতিগোচর সূত্রটাই আজ ছিঁড়ে গেল এক নিমেষে। সে চলল কোন অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের পানে—অজ্ঞাত অপরিচিত পরিবেশে, অনভ্যস্ত জীবনযাত্রার মধ্যে। একেবারে নিষ্পর একটা মানুষের সঙ্গে চিরজীবনের মতো বাঁধা পড়তে চলল সে; আর আগা এখানে রইল—তবে সে-ই বা কদিন থাকবে, থাকতে পারবে? বাদশা গেলে তাঁর সঙ্গে যেতে হবে—কিন্তু বাদশা যদি সত্যিই ইংরেজদের হাতে ধরা দেন? বাদশা হয়ত রক্ষা পেয়ে যাবেন, প্রাণে বাঁচবেন—তাঁর কোন অনিষ্ট করতে সাহস করবে না হয়ত ওরা—কিন্তু বাদশার অনুচরদের কি ছাড়বে? এই তো গত কদিন ধরে শুনতে পাচ্ছে—বর্বরগুলো যেখান দিয়ে আসছে—দুদিকের সমস্ত গাছ ফাঁসী কাঠে পরিণত করতে করতে আসছে। বিশেষ ক'রে অল্পবয়সী তরুণ ছেলেদের দিকেই বেশী বিষ দৃষ্টি ওদের—

সর্বাঙ্গ শিউরে কাঁটা দিয়ে উঠল ওর। খুদা তার মঙ্গল করুন, তাকে নিরাপদে রাখুন। আজই চলে যেতে হচ্ছে তাই, নইলে হজরৎ নিজামুদ্দীনের দরগায় সিন্নি পাঠাত কাউকে দিয়ে।...যদি সে বেঁচে থাকে এবং কোন সুযোগ মেলে তো সে নিশ্চয় কোন দিন না কোন দিন আজম শরীফ গিয়ে বড় পীরের দরগায় সিন্নি চড়াবে। খাজা বাবা ভাল রাখুন আগাকে, নিরাপদে রাখুন, জীবন্ত রাখুন!......

মানুষটা যে বেয়াড়া! লোকটাকে ভাল ক'রেই চিনে নিয়েছে সে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বাদশাকে ফেলে নড়বে না কোথাও, নিজেকে বাঁচাবার কি প্রাণ নিয়ে পালাবার চেষ্টা করবে না—যতক্ষণ না বাদশা হুকুম করেন, নিজে থেকে কোথাও যাবে না। একটু যদি কম কর্তব্য-পরায়ণ হ'ত, স্বার্থপরের মতো একটু যদি নিজের কথা ভাবত—তাহলে অত চিন্তার কারণ থাকত না।

একবার এমনও সুদূর আশা একটা মনে উঁকি-ঝুঁকি মারল—আচ্ছা, সঙ্গে যে লোকটাকে দেবেন বলেছেন বাদশা, সে লোকটা যদি কোন জাদুমন্ত্রে, খাজা সাহেবের দয়াতে, আগা হয়ে যায়!......

কথাটা কল্পনা করার সঙ্গে সঙ্গেই বুকের মধ্যে এক ঝলক রক্ত ছলাৎ করে চল্‌কে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই—অতিরিক্ত আশার ফলে অতিরিক্ত আশাভঙ্গের সম্ভাবনাটা ভেবেই যেন—জোর ক'রে মন থেকে তাড়িয়ে দেয় চিন্তাটাকে। ধ্যেৎ! বাদশা তো বলেই দিলেন, মেহেরের এই যাত্রার বন্দোবস্ত করার ভার দিয়েছেন মীর মর্দান খাঁকে। ডুলি, বিশ্বস্ত লোক খাঁ সাহেবই ঠিক করবেন।

এক নিজে থেকে বললে হ'ত বোধ হয়। কিন্তু না—সে বড় লজ্জার কথা। ছিঃ, বাদশাই বা কি মনে করবেন! তাঁর এই দুঃসময়ে—না, না, সে হয় না। তার চেয়ে না হয় চিরদিনের জন্য এই বিরহ-বিষাদভরাই বইবে সে। বাইরের এই বহুজন-ঈপ্সিত দেহটার মধ্যেকার প্রাণটা ম'রই যাবে চিরকালের মতো। বাবরশাহী বংশের রক্ত আছে তার ধমনীতেও। মৃত্যুকে ভয় করলে চ'ল না তাদের, তা সে যে কোন রকমেরই মৃত্যু হোক—দে'হর অথবা মনের।

ফলে, গভীর রাত্রে যখন মীর মর্দান খাঁর প্রেরিত লোক এসে দাঁড়াল তখন অতি সহজেই উঠে তার সঙ্গে রওনা হ'ল মেহের। কিছুই নেওয়ার নেই, কোনদিকে তাকাবার নেই। শুধু একটি বুরখা মুড়ি দিয়ে দিল যাওয়ার আগে। এ বুরখাও মীর মর্দান খাঁ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কিছুক্ষণ আগে, যাত্রার প্রস্তুতি হিসাবে। নইলে মেহেরের ইচ্ছা ছিল সেই শিরীণ্ সাজার বুরখাটাই নেয়। বহুদিনের বহু সুখ-স্মৃতি বিজড়িত সেই বুরখা। কিন্তু এ যাত্রায় তার নিজের যখন কোন স্বাধীনতা নেই—তখন নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকেও সে কোন রকম প্রাধান্য দেবে না। যন্ত্রের মতোই উঠল, যন্ত্রের মতোই রওনা দিল। বিদায় নেবার পালা নেই—কারণ তার এ যাওয়ার কথা কাউকে জানানো চলবে না। নইলে—নইলে অন্তত যদি রাবেয়াটাকেও কিছু বলে আসতে পারত!...

মেহের শুনেছিল এই প্রাসাদ দুর্গ থেকে গোপনে বার হবার একাধিক সুড়ঙ্গ পথ আছে, কিন্তু কোনদিন চোখে দেখে নি। আজ দেখল সেই রকম একটা পথ দিয়েই তার যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। মমতাজ বেগমের নামাঙ্কিত মমতাজ মহল থেকে বেরোবার পথে সাধারণ একটি দরজা, চিরকাল তালা দেওয়াই থাকে, কখনও মনেও হয়নি মেহেরের যে কাউকে প্রশ্ন করে—এর মধ্যে কী আছে, বা এটা কোন ঘরের দরজা কিনা! সেই তালাই খোলা হয়েছে আজ, দেখল সে। সঙ্গে যে

লোকটি এসেছিল—নাম বলল মুখদম খাঁ—সে অন্ধকারেই দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল, মেহেরকে ইঙ্গিত করল পিছনে আসতে।

একবার মুহূর্তকালের জন্য একটা আশঙ্কা বোধ করল মেহের, একবার বুকটা একটু কেঁপে উঠল। তবে সে ঐ মুহূর্তকালই। কোমরে গোঁজা ছোট কিরীচখানায় হাত দিয়ে নির্ভয়ে সেই জমাট কালো অন্ধকারে পা বাড়াল সে। জান নিতে না পারুক এ কিরীচ দিয়ে, তেমন কোন বিপদ উপস্থিত হ'লে জান দিতে তো পারবে।

আর, এই অন্ধকারে পা বাড়ানোটাকে তার এই যাত্রার প্রতীক বলেই ধরে নেওয়া যায় অনায়াসেই। এমনি অজানা অন্ধকারের যাত্রা তো সেও। এইতো তার শুরু। শুরুতেই ভয় করলে চলবে কেন?

ভেতরে ঢুকেই সিঁড়ি নয়। খানিকটা সমতল পথ বেঁকেচুরে যেতে হয়। আন্দাজে পা ঘষে ঘষে দুচার পা এগিয়ে একটা বাঁকের মুখে যেতেই দেখল সেখানে আলো আছে। একটা মশাল কে জেবলে রেখে গেছে ইতিপূর্বেই। মুখদম খাঁ বিনাবাক্যে মশালটা তুলে নিয়ে আগে আগে পথ দেখিয়ে চলল।

বহুদিনের অব্যবহৃত পথ,—ভ্যাপ্‌সা গন্ধে যেন নিঃশ্বাস রোধ হয়ে আসে প্রথমটা। তবে একটু পরেই বুঝল যে বাতাস একেবারে বন্ধ নয় এখানে। কোন আশ্চর্য কৌশলে বাইরের হাওয়া আসার ব্যবস্থা আছে এ সুড়ংগপথে—কারণ মধ্যে মধ্যেই এক এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস এসে লাগছিল মেহেরের চোখে—বুরখার ফোঁকর দিয়ে। শেষ শরতের মধুর ঠান্ডা বাতাস। মশালের শিখাটাও কেঁপে কেঁপে উঠছিল সে সময়টায়। কিন্তু সে মধ্যে মধ্যেই। নইলে ভেতরটায় বেশির ভাগই একটা অস্বস্তিকর গুমোট ভাব। পথ আবর্জনায় ভর্তি। মাকড়শার ঝুলে এক এক জায়গায় একেবারে যেন রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। যে লোকটি নিয়ে যাচ্ছিল ওকে সে তলোয়ার খুলে সে ঝুল অপসারিত করতে করতে যাচ্ছিল, কোথাও বা তাতেও যাওয়া যাচ্ছিল না—মশালের আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে হচ্ছিল সে ঝুল।......

সিঁড়ি দিয়ে বেশ খানিকটা নেমে আবার সমতল পথ মিলল একটা। সরু পথ, দুজন পাশাপাশি যাওয়া চলে না। সে পথও সোজা সমান যায় নি। অজস্র বাঁক তাতে। কোথাও বা শাখাপ্রশাখা বেরিয়ে দ্বিভুজ কি ত্রিভুজের সৃষ্টি করেছে। এটা হয়ত কোনও সম্ভাব্য পশ্চাদ্ধাবনকারীকে বিভ্রান্ত করার জন্যই ইচ্ছে ক'রে রাখা হয়েছে। যে স্বপক্ষের লোক সে জানে, সে চিহ্ন বুঝে ঠিক পথে যাবে। মুখদম খাঁও—সম্ভবত তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে মহড়া দিইয়ে নেওয়া হয়েছে—কী যেন সব মিলিয়ে দেখে ডাইনে যাবে না বাঁয়ে যাবে ঠিক করছিল। অথবা তাকে কোন হিসাব মুখস্থ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল—কবার ডাইনে যাবার পর কবার বাঁয়ে ফিরতে হবে—কিম্বা উল্‌টো—সে গুণে গুণে নিচ্ছিল।

এমনি ভাবে অনেকটা চলবার পর আবার সিঁড়ি মিলল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আবার তেমনি আগের মতো আঁকাবাঁকা পথ, তার পর আবার দরজা। অর্থাৎ মুক্তি—কিন্তু সে শুধুই বন্ধ এই পাতাল পথ থেকে—অন্ধকার থেকে নয়। কারণ তার পথ-প্রদর্শক শেষ বাঁক ঘোরবার আগেই মশালটা গুঁজে রেখে অন্ধকারে এগিয়ে দরজা খুলল। আলো বা মানুষের উপস্থিতি বাইরের কেউ না টের পায়।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেখানে পড়ল—অন্ধকার হ'লেও মেহেরের কেমন যেন

চেনা-চেনা লাগল। স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে চিনতেও পারল। দু একবার পালে-পার্বণে নামাজ পড়তে এসেছে এখানে। আটা মসজিদ এটা। কিল্লার বাইরে অনেকটা দক্ষিণে এসে পড়েছে ওরা।

মখদম খাঁর পিছু পিছু খানিকটা চলে মসজিদের পিছনদিকের একটা ছোট ঘরে এসে পৌঁছল। সারি বাঁধা এই রকম ঘর একটু বড় মসজিদ মাত্রেই থাকে। মসজিদের অঙ্গ বলা যায় এগুলোকে। রাহী বা ফকিরদের জন্য করা হয় এগুলো, উৎসব কি পর্বদিন উপলক্ষে এসে পড়লে যাতে একটু আশ্রয়ের অভাব না হয়।

জানলাহীন আসবাবহীন ছোট ছোট ঘর। তবে মেহের যে ঘরে ঢুকল সেটা বোধ করি ওর জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। কারণ তার কুলুঙ্গীতে একটা চিরাগ জ্বলছে—যদিচ সে আলোও একটা কী সরার মতো পদার্থ দিয়ে সযত্নে আড়াল ক'রে রাখা হয়েছে। যাতে সামান্য, কাজ-চলা গোছের একটু আলোর আভাস মাত্র থাকে—বাইরে থেকে আলো না দেখা যায়। সেই ঝাপ্সা অস্পষ্ট আলোতে চোখ অভ্যস্ত হ'তে দেখা গেল ঘরের মাঝখানে বসবার মতো একটা খাটুলীও আছে কিন্তু অন্য কোন আসবাব কি মানুষ নেই। মখদম খাঁ নীরবে সেই খাটুলিটা দেখিয়ে দিয়ে নিঃশব্দেই অভিবাদন ক'রে দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে গেল।

আবার শুরু হ'ল প্রতীক্ষা। মেহেরের মনে হ'তে লাগল—অন্তহীন। এভাবে তাকে কোনদিন কোথাও বসে সাধারণ কোন নফরের মর্জির জন্য অপেক্ষা করতে হবে তা কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করে নি সে। কখনও ভাবে নি যে তার ভবিষ্যৎ জীবন এমনভাবে তুচ্ছাতিতুচ্ছ লোকের মতো প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তের চলাফেরায় এক অপরিচিত লোকের অনিশ্চিত মতিগতির ওপর নির্ভর করবে। কোথায় যাবে, কখন যাবে, কার সঙ্গে যাবে—কিছুই জানে না, শুধু যেতে হবে এইটুকু মাত্র জানে। ভাগ্যের এ কী বিচিত্র খেলা তার জীবন নিয়ে! এখন থেকে এই রকমই চলবে নাকি? বার বার নিজেকেই যেন প্রশ্ন করে সে, এই রকম পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে তার জিন্দিগী ও জীবন? নিজের কিছুই সে নিজে বুঝবে না, নিজে স্থির করতে পারবে না?

প্রশ্নই করে শুধু, উত্তর মেলে না কোথাও। মিলবে না তাও জানে। মনে মনে আপনা-আপনিই শুধু পুনরাবৃত্তি ক'রে যায় প্রশ্নটা। খানিকটা পরে আর তাও করে না। সব চিন্তা-ভাবনার পাট চুকিয়ে কেমন যেন স্তম্ভিত ভাবে বসে থাকে। কী দরকারই বা তার ভবিষ্যতের এত চিন্তায়। তার ভবিষ্যৎ তো এই—তার পরবর্তী সারা জীবনই—যে পথ দিয়ে কিছু আগে সে এল—সেই পথের মতো। আঁকা-বাঁকা আর অন্ধকার। যেখানে মুক্তির বাতাস জীবনের আলো কিছুই এসে পৌঁছবে না কোন দিন। আলো কোনদিনই আর আসবে না তার জীবনে। সে আলো চিরকালের মতো ফেলে এল পিছনে, লালকিল্লায়—কিল্লা ই-মুবারকে। আলো, বাতাস, আনন্দ, মনের দিগন্তপ্রসারী স্বাধীনতা—সব কিছু। যা কিছু জীবনের প্রেয় ও শ্রেয়।

ওর মনে পড়ল, আগা ওকে বলত তার আসমানের চাঁদ। তখন কত হেসেছে তার কবিত্বে। অপরিণত মনের কাঁচা কবিত্ব ভেবেছে শুধুই। আজ বুঝতে পারল উপামাটার পূর্ণ তাৎপর্য। ওর মনে হচ্ছে, সবাইকে চেঁচিয়ে বলে, বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেয়—আগা ওর আসমানের সুরয।......'সুরয, সুরয!' মনে মনে বার

বার বলতে লাগল সে পাগলের মতো—'তুমি আমার আসমানের সুরয, আমার জিন্দগীর সুরয, আমার দিলের রোশনাই। তোমাকে বাদ দিলে সারা দুনিয়াটাই আঁধিয়ার আমার কাছে।'

অবশেষে, প্রায় যেন এক যুগ ব্যাপী প্রতীক্ষার পর ঘরের বাইরে ভারী জুতোর শব্দ উঠল। সামান্য একটু কাশির শব্দ ক'রে ঘরে ঢুকল কে। বুরখার ভিতর থেকেই মেহের চিনল, মীর মর্দান খাঁ—বখ্‌ৎ খাঁর রিস্‌তাদার।

মীর মর্দান খাঁর মুখ অন্ধকার। ললাটে ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি।

তিনি ঘরে ঢুকে অভিবাদনের ভঙ্গী ক'রে বললেন, 'আমি—আমি বড়ই লজ্জিত শাহ্‌জাদী—কিন্তু যে লোকটাকে আপনার সঙ্গে দেওয়ার জন্যে বাদশা হুকুম দিয়েছেন সে লোকটা ভারী অসভ্য আর বেয়াড়া। কখন রওনা দেবে কিছুই বলছে না পরিষ্কার ক'রে, বলে তার খুশি আর মর্জি-মাফিক রওনা হবে সে, তার জবাবদিহি কাউকে করতে রাজী নয়। সেই বুঝবে কি করবে না করবে।...বুঝুন ওর বেয়াদবি, বাদশার পাঠানো লোক তাই—নইলে সেই মুহূর্তে ওর মাথাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে ফেলে এ ধৃষ্টতার জবাব দিতুম!'

চুপ ক'রে থাকে মেহের, মনকে বোঝায়—এই শুরু, এই আরম্ভ। এখানেই শেষ নয়। আরও বহু দুর্দশার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এখনই বিচলিত হ'লে চলবে না।

একটুখানি দাঁড়িয়ে ইতস্তত করেন মীর মর্দান খাঁ। ওপক্ষ থেকে হয়ত একটু উৎসাহ কি অন্তত সহানুভূতির আশা করেন। তারপর বলেন, 'বাদশা স্পষ্ট সব হুকুম দিয়েছেন, আমার স্বাধীনভাবে অন্য কিছু করতে যাওয়া উচিত নয়। এখন এক যদি হুজুরাইন নিজে হুকুম দেন তো লোকটাকে তাড়িয়ে দিই। আর সে ক্ষেত্রে, যদিও এসময়ে দিল্লী ছেড়ে যাওয়া আমার উচিত নয়—তবু শাহ্‌জাদীর জন্যে আমি খুশীমনেই সে কর্তব্যপথ থেকে ভ্রষ্ট হ'তে রাজী আছি। আমিই আপনার সঙ্গে যাব তাহ'লে নিজে। আর কাউকে এতবড় দায়িত্ব ছেড়ে দিতে পারব না। অবশ্য, বাদশার খৎটা সেই অসভ্য লোকটার কাছে রইল, আমিই দিয়েছি বাদশার হুকুম মোতাবেক—কিন্তু তাতে কিছু আটকাবে না। খতের দরকারই বা কি, আমি তো সবই জানি, কোথায় যাবেন কার কাছে যাবেন!'

এই পর্যন্ত বলে চুপ করেন মীর মর্দান খাঁ। উৎসুক ভাবে চেয়ে থাকেন সামনের বুরখা-পরা মূর্তিটার দিকে।

কিন্তু মেহের নিশ্চল ভাবেই বসে থাকে, কোন উত্তর দেয় না। আরও খানিকটা উশখুশ ক'রে মীর মর্দান খাঁ বলেন, 'আমি হুজুরাইনের হুকুমের অপেক্ষা করছি। তা হ'লে ও লোকটাকে বাতিল ক'রেই দিই? কথা না কইলেও চলবে, শুধু ঘাড় নেড়ে জানান যদি দয়া ক'রে—'

কিন্তু কথাই কইল মেহের। তার মনে পড়ল কিছু-পূর্বে শোনা বাদশার সেই করুণ কথাগুলো—'তুইও তোর বাদশার হুকুম অমান্য করবি?' সে স্থির অকম্পিত স্বরেই বলল, 'বাদশার যা হুকুম, সব যেন ঠিক সেইমতো হয় সিপাহ্‌সালার, তিনি যাকে বেছে দিয়েছেন, তার সঙ্গেই আমি যাব।'

এ উত্তরটা আদৌ আশা করেন নি মীর মর্দান খাঁ, তিনি আবারও দাঁত দিয়ে নিচেকার ঠোঁটটা চেপে ধরে রক্তাক্ত ক'রে ফেললেন। বিরক্তি ক্ষোভ ও হতাশা স্পষ্ট

হয়ে ফুটে উঠল তাঁর মুখে। তবু সামান্য একটু অভিবাদন জানিয়ে নীরবেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। শাহ্‌জাদীর স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন মতামতের পর দ্বিরুক্তি করতে আর সাহসে কুলোল না।...

আবারও সেই প্রতীক্ষা, ক্লান্তিকর, দীর্ঘ। মেহেরের মনে হয় এ রাত্রেরও বুঝি শেষ হবে না, এ প্রতীক্ষারও না। না হোক, এই অন্ধকারই যখন চিরস্থায়ী হয়ে রইল জীবনে, তখন রাত্রির অবসান হয়েই বা লাভ কি? আশমানের সুরয তো আর তার জিন্দগীর সুরযের অভাব দূর করতে পারবে না! আর প্রতীক্ষা—? তাতেই বা ক্ষতি কি, চলা আর বসে থাকা, দিন আর রাত্রি দুইই তো সমান তার কাছে—

আরও কয়েক দণ্ড কাটবার পর আবারও একটা পদশব্দ শোনা যায়। তবে এবার আর আগের মতো ভারী আওয়াজ নয়—মীর মর্দান খাঁর পদবী ও মেজাজের সঙ্গে তার পা ফেলাটাও বেশ মেলে, ঈষৎ কৌতুকের সঙ্গে মনে হয় মেহেরের—এ খুব লঘু পায়ে, শব্দ না জাগাবার চেষ্টা ক'রেই যেন কে আসছে।

যে আসছিল, সেও বাইরে খুব মৃদু গলার আওয়াজ ক'রে ঘরে ঢুকল। মেহের চিনতে পারল তাকে, মুখদম খাঁ, একটু আগে সুড়ঙ্গ দিয়ে পথ দেখিয়ে যে এনেছে। লোকটি কথা কইল না, শুধু ইঙ্গিতে জানাল যে মেহেরকে এবার উঠতে হবে। দরজা খুলে বাইরের দিকে দেখিয়ে সেলাম করল শুধু।

অন্ধকারেই বেরিয়ে আসে মেহের। নক্ষত্রের ঝাপসা আলোতে মসজিদের পাথর-বাঁধানো প্রাঙ্গণ দিয়ে হেঁটে যেতে কোন অসুবিধা হয় না বিশেষ। মসজিদের বাইরে বাগানের মধ্যে জন-দুই-তিন লোক দাঁড়িয়ে আছে তাও দেখতে পায়, আর একটু পরে একটা গাছের নিচে গাঢ়তর অন্ধকার হিসাবে ঠাওর হয় ডুলিটাও। সাধারণ একটা মোটা কালো কাপড়ের ঘেরাটোপ দেওয়া, সেই জন্যই শুধু এক ডেলা অন্ধকারের মতো দেখাচ্ছে সেটাকে।

লোকগুলো কে কিছুই ভাল বোঝা গেল না। এইটুকু শুধু অনুমান করল যে এদের মধ্যে দুজন ডুলি বাহক আর একজন তার সঙ্গী, রক্ষক। কে কোনটা তা জানবারই বা এমন গরজ কী তার?...সে ডুলির কাছে দাঁড়াতে ওদেরই মধ্যে একজন এসে ঘেরাটোপের একটা প্রান্ত তুলে ধরল। মেহের হাতড়ে হাতড়ে ডুলির কাঠামোটা অনুভব ক'রে নিয়ে উঠে বসল তাতে। এতকাল বস্তুটা দূর থেকেই দেখেছে—কখনও উঠতে হবে তা ভাবে নি। ডুলিতে বসা যে এত কষ্টকর তাও জানত না। ঘাড় সোজা ক'রে বসা যায় না, ওপরের কাঠটা মাথায় লাগে। বসার জায়গাও খুব সংকীর্ণ, চারিদিকের মোটা শক্ত দড়িগুলো হাঁটুতে পিছনে লাগে। তবু কী ভাগ্যি নিচে একটু গদির মতো কি পাতা আছে, নইলে বোধহয় কোনমতেই বসা যেত না।

মেহের উঠে বসতেই ঘেরাটোপটা ফেলে দেওয়া হ'ল। ডুলি উঠল এবার বাহকের কাঁধে। আবার নিঃসীম গাঢ় অন্ধকার যেন চেপে ধরল তাকে, সেই আঁধারের মধ্যেই যাত্রা শুরু হ'ল তার—ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার মতোই বুঝি। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বহু কষ্টে বহুক্ষণ ধরে চেপে রেখেছিল বুকের মধ্যে—আর কোনমতেই যেন চাপা গেল না। অবাধ্য তপ্ত অশ্রুও আর বাধা মানল না—নিঃশ্বাসটার সঙ্গেই বেরিয়ে এল।

বিদায় বিদায়! বিদায় তার আবাল্যের আবাস লালকিল্লা, বিদায় স্নেহময় নানা! বিদায় আগা! বিদায় আনন্দ, বিদায় জীবন! জীবনের সমস্ত সুখস্মৃতি,

সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন পিছনে ফেলে রেখে অন্ধকার জীবন, অন্ধকার ভবিষ্যতের পথে যাত্রা করছে মেহের, পারো তো তাকে স্মরণ ক'রে দুফোঁটা চোখের জল ফেলো তোমরা, সেইটুকুই হবে তার অবলম্বন। ভুলো না, তাকে ভুলো না।...

অনেকক্ষণ ধরে চোখের জল চেপে রেখেছিল সে, বাধা দূর হ'তে তাই অনেকক্ষণ ধরেই তা ঝরে চলল। ভেসে যেতে লাগল তার কপোল আর চিবুক, ভিজে যেতে লাগল কুর্তা আর ওড়না, অবাধে পড়ে যেতে লাগল অবাধ্য তপ্ত অশ্রু। আকুলভাবে কেঁদে যেতে লাগল সে—নিঃশব্দে। মনে হ'ল বুঝি কখনও এ কান্নার শেষ হবে না, বুকটা ভেঙে যাবে তার কাঁদতে কাঁদতেই।...

অবশেষে তার সমস্ত অশ্রু বুঝি নিঃশেষ হয়ে গেল, অথবা নিতান্ত শারীরিক ক্লান্তিতেই একসময় থামল সে। ওড়নায় চোখ মুছে এবার সে একটু শান্ত ভাবেই তাকাল। দৃষ্টির আচ্ছন্ন ভাব কেটে গেছে তখন, বার বার চোখ মোছার ফলে। এবার অনেকটা সহজ ভাবেই তাকাতে পারল সে। আর সঙ্গে সঙ্গেই নজরে পড়ল, ঘেরাটোপের কুঁচিগুলির মধ্য থেকে একটু আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে এবার। ঊষার প্রথম আবছা আলো। অর্থাৎ ভোর হচ্ছে।

অল্প বয়স মেহেরের। এই বয়সে জীবন তার অনন্ত সম্ভাবনার দুয়ার খুলে রাখে চোখের সামনে—সে দুয়ারের নাম হ'ল আশা। সে দরজা আপন আলোতে আলোকিত, দেদীপ্যমান। বাইরের কোন অন্ধকার, কোন হতাশারই সাধ্য নেই সে জ্যোতির্ময় সিংহদ্বার আবৃত ক'রে রাখে। এই বয়সে মন আপনা থেকেই আশা ও আনন্দের প্রেরণা লাভ করে, অকারণেই ভরসা যোগায় কে তাকে, দুঃখের ও দুর্ভাগ্যের হিমশীতল মৃত্যুস্পর্শ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বাইরের কোন সহায়তা ব্যতিরেকেই সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে সে—শত নৈরাশ্য, সহস্র প্রতিকূলতার মধ্যেও!

কৌতূহলও প্রবল হয় এই বয়সে, সব অনুভূতির চেয়ে।

সেই কৌতূহল ও সর্বজয়ী আশাতেই সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে মেহেরও। কান পাতে বাইরে, সাগ্রহে চোখ মেলে ক্ষীণ আলোটুকুর দিকে। ডুলির দুজন বাহক ছাড়াও তৃতীয় এক ব্যক্তির পদশব্দ স্পষ্ট। সে লোকটা তার ডান দিকে, ডুলির পাশে পাশেই চলেছে। দৃঢ় এবং আত্মপ্রত্যয়ী পদক্ষেপ, কোন তরুণ যুবার নিশ্চয়ই—বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়ের এতটা প্রত্যয়ের ভাব থাকে না।

কৌতূহল প্রবলতর হয়ে ওঠে। অতি ধীরে অতি সন্তর্পণে ঘেরাটোপের সেই দিকের প্রান্তটা একটু তুলে ধরে সে। তাতে মানুষটাকে পুরো দেখা যায় না—কোমর থেকে হাঁটুর কাছ পর্যন্ত শুধু দৃষ্টিগোচর হয়। মানুষটার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই বোঝা যায় না তাতে, দেখতে পায় শুধু হাতখানা। বাঁ হাত। সে হাতের অনামিকায় একটা আংটিও নজরে পড়ে।......

বুকের মধ্যেটায় ধক্ ক'রে উঠে—যেন কিছুকালের জন্য নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে তার। প্রাণটা যেন ওষ্ঠ-প্রান্তে এসে থেমে থাকে কোনমতে।

আংটিটা তার পরিচিত। বিশেষ পরিচিত। অত বড় চতুষ্কোণ লাল পাথর ভুল হবার নয়। মূল্যবান চুনি—যেটা সেই অস্পষ্ট প্রথম দিবালোকেও ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

এ আংটি তারই, যা সে উপহার দিয়েছিল আগাকে।

॥ চব্বিশ ॥

তবু যেটুকু সংশয় থাকতে পারত মনে—সেটুকুও আর রইল না। বেশীক্ষণ মেহেরকে অবিশ্বাস্য আশা আর সর্বগ্রাসী নৈরাশ্যের মধ্যে দোল খেতে হ'ল না। একটু পরেই —বিশ্বের সকল জীবের মিলিত কোলাহল থেকে যে কণ্ঠস্বরটি চিহ্নিত ক'রে বেছে নিতে পারে সে—সেই বিপুলানন্দদায়ক কণ্ঠও শুনতে পেল। ডুলি বাহকরা ডুলি নামিয়ে একটু বিশ্রাম করবার প্রস্তাব করতেই আগা ধমক দিয়ে উঠল, 'এরই মধ্যে কি?...আর একটু এগিয়ে চল তাড়াতাড়ি—বেলা হ'লে কোন দরিয়া কি কোন তলাও দেখতে পেলে ডুলি নামাবে। মালেকানের গুসল করবার ব্যবস্থা আগে—তার পর আমাদের কথা আমরা ভাবব!'

আঃ! হে খোদা মেহেরবান! তুমি আছ তাহলে! এ বাঁদীর প্রার্থনা শুনতে পেয়েছ?......এ মানুষ যখন সঙ্গে আছে তখন আর কিছু ভাবে না সে—এ যাত্রা রসাতলের হ'লেও ভয় নেই তার!

কিন্তু পরক্ষণেই বুকের মধ্যেকার নব উদ্বেলিত আনন্দে বাস্তবের তুষারস্পর্শ এসে লাগে। হিম হ'য়ে যায় সমস্ত উচ্ছ্বাস। মনে পড়ে যে এই পথটুকুই মাত্র এ লোকটির সান্নিধ্যে তার অধিকার। তারপর? এ যাত্রার শেষে? এই কদিনের এই সঙ্গ—এতখানি আনন্দ লাভ করার পর আবার তো নেমে আসবে চিরবিচ্ছেদের দুঃসহ দুঃখ। নিজের হাতে প্রাণের চিরাগ নিভিয়ে তো প্রবেশ করতে হবে এক নির্বান্ধব নিরানন্দ পুরীতে! কী লাভ হ'ল এটুকু পেয়ে? তার চোখে দেখা ও জানার বাইরে ছিল—সেই তো ভালো। মনকে এক রকম শক্ত করেই তো নিয়েছিল সে। জগদীশ্বর এ কী নিষ্ঠুরতর কঠিনতর আঘাত দেবার জন্যে এই সুখের আস্বাদটুকু দেওয়ালেন তাকে! আশা ও আসঙ্গের মরীচিকা মাত্র দেখিয়ে কী ঘোর অন্ধকূপে নিক্ষেপ করার আয়োজন তাঁর!......

কত বেলা হয়েছিল, কোথা দিয়ে কতটা এসেছে—কিছুই হুঁশ ছিল না মেহেরের। দম বন্ধ হয়ে আসছিল হতাশা ও হতাশ্বাসে, তাই ঘেরাটোপের একটা প্রান্ত একটু তুলে বাইরের বাতাস নেবার চেষ্টা করছিল কিন্তু কোনদিকে ভালো ক'রে তাকায় নি, অথবা কিছুই নজরে পড়ে নি তার—একেবারে তার খেয়াল হ'ল—যখন বাহকরা এক জায়গায় ডুলি নামিয়ে পর্দার বাইরে থেকে তাকে জানাল যে সামনে একটা ছোটখাটো 'তলাও' পাওয়া গেছে—খুবই ছোট, জলও হয়ত তেমন নেই কিন্তু এইখানেই যেমন ক'রে হোক মালেকান যদি প্রাতঃকৃত্য সেরে নেন তো ভাল হয়—কারণ জায়গাটা বেশ নির্জন, ওরাও দূরে সরে যাচ্ছে, পাহারাও রাখবে, যাতে এদিকে না আর কেউ এসে পড়ে। মালেকান নিশ্চিন্ত হয়ে গুসল করতে পারবেন। ইত্যাদি—

এবার পর্দা সরিয়ে ভাল ক'রে দেখল। 'তলাও' না আরও কিছু, পথের ধারের পরিত্যক্ত একটা ডোবা ছাড়া কিছু নয়। হয়ত চাষের সুবিধার জন্য কোন চাষী কাটিয়েছিল—এই সাম্প্রতিক বর্ষায় সামান্য একটু জল হয়েছে কিন্তু এবারের বর্ষাও কম, জলও তেমন হয় নি। এই মেটে ঘাটে, এই গান্দা পানিতে গুসল করতে হবে তাকে?

পথের দুঃখকষ্টের জন্যে তৈরী হয়েই এসেছে সে—মনের মধ্যে এমনি একটা ধারণা ক'রে নিয়েছিল। এখন বুঝল যে, সে কষ্ট যে কী আর কতদূর হ'তে পারে সে সম্বন্ধে ধারণা ছিল না বলেই ও রকম ভাবতে পেরেছিল। এখন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে দেখতে পেল যে কিছুমাত্র প্রস্তুত হ'তে পারে নি সে।...সে কি পারবে ঐ ঢালু মাটির পাড় বেয়ে নিচে নামতে? যদি পা পিছ্‌লে জলে প'ড়ে যায়? সাঁতারও তো জানে না ছাই! লাজলজ্জার মাথা খেয়ে আগাকেই বলবে নাকি হাত ধরে নামাতে?... না-না, ছি, ডুলিওলারা কি ভাববে! আর—সহজাত কৌতুকপ্রিয়তা এই ঘোর দুঃসময়েও ওকে ত্যাগ করে নি—ভাবল এরই মধ্যে আগাকে পরিচয়টা জানানোও ঠিক হ'বে না। আর একটু খেলাতে হবে তাকে—

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে আর মন স্থির করতে করতে বাহকরা ও আগা বহুদূর চলে গেছে। কাউকে ডাকার কি অসম্মতি জানাবার আর উপায় নেই। অগত্যা নেমেই এল মেহের। একভাবে ব'সে থেকে পিঠ টনটন করছে—অন্তত হাত পা ছাড়াবার তো একটু ব্যবস্থা হ'ল। নেমে দেখল জায়গাটা সত্যিই নির্জন, চারিদিকে বাবলা আর ঠেঁটির বন, ফাঁক ফাঁকে আরও কী সব কাঁটার গুল্ম—সমস্ত পাড়টা যেন পর্দার ম'তো আড়াল ক'রে রেখেছে। যদি বাইরে গুসল করতেই হয় তো এমন জায়গা আর পাবে না। মনে মনে আগার বুদ্ধি ও বিবেচনার তারিফ করল। নিচে নেমে বিবস্ত্র হয়ে স্নান করলেও কেউ দেখ'তে পারে না এখানে।

সে নিশ্চিন্ত হয়ে নামতে যাবে—এমন সময় সেই নির্জন বনপথে পরিষ্কার এবং প্রবল এক অশ্বক্ষুর-ধ্বনি উঠল। প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে কেউ আসছে। হয়ত দুশমনই কেউ। মুহূর্তে অবস্থাটা বুঝে নিল মেহের। ডুলিতে বসে থাকলে আবরু বজায় থাকে ব'টে কিন্তু একা অসহায় অবস্থায় ডুলিতে বসে থাকার অর্থ হ'ল তেমন বিপদ কিছু ঘটলে পড়ে মার খাওয়া। তার চেয়ে নিজের মতো আত্মরক্ষা করার চেষ্টাই ভালো। সে একটা বড়গোছের কাঁটা-ঝোপের আড়ালে গিয়ে গুঁড়ি মেরে ব'সে পড়ল। সুবিধা এই সেখান থেকে—যে দিক দিয়ে ঘোড়াটা বা অশ্বারোহী কেউ আসছে—সেদিকটা বহুদূর অবধি দেখা যায়। ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় সে সেইদিকে চেয়ে রইল। নিজের জন্যে যত না হোক—উৎকণ্ঠা আগার জন্যেই তার বেশী। একটুও সাবধান নয় যে!

শব্দটা আগাও শুনতে পেয়েছিল। একটুখানি মাত্র নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে শব্দটা ঠিক কোন দিক থেকে আসছে বুঝে নিয়েছিল। তার পরই কোমরবন্ধ থেকে পিস্তলটা খুলে নিয়ে ইঙ্গিতে বাহকদের ডুলির দিকটা দেখিয়ে দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ গোলমাল যদি কিছু বাধেই তো সেটা ডুলি এবং শাহ্‌জাদী নুরুন্নেসা থেকে যতটা দূরে সম্ভব বাধাই শ্রেয়। সে এধারে দুশমনকে আটকে রাখবে—অন্তত খানিকটা তো পারবেই, ওধারে ডুলিওয়ালারা সেই অবসরে কোন নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে পারবে বেগমসাহেবাকে। যতক্ষণ আগা বেঁচে আছে ততক্ষণই তার দায়িত্ব, আর ততক্ষণই সে সর্বাগ্রে সেই দায়িত্বের কথা ভাববে। তার পরে কি হবে সে ভাবে না, ভেবে লাভ নেই—সুতরাং প্রয়োজনও নেই।

বেশীক্ষণ কাউকেই উৎকণ্ঠায় থাকতে হ'ল না। অশ্বারোহী শীগ্‌গিরই দৃষ্টি-সীমার মধ্যে এসে পড়ল। একজনই—এবং মেহের ও আগা দেখামাত্র চিনতে পারল —মীর মর্দান খাঁ স্বয়ং। তাঁকে দেখে আগা পিস্তলটা আবার খাপে ভরল ব'টে তবে তার ললাটের ভ্রূকুটি সরল হ'ল না—বরং তা যেন আরও ঘনসম্বদ্ধ হয়ে উঠল। এ

লোকটার মতলব ভালো নয়, তা কাল রাত্রিতেই বুঝতে পেরেছে, শুধু সেটা যে কী তাই ধরতে পারছে না। দিল্লী ফেলে বহু সিপাহ্‌শালারই পালাচ্ছে—একেও হয়ত পালাতে হবে, সেই সময় আসন্ন বুঝেই কি একটি শাহ্‌জাদী বাগাতে চায়? রাজ্য তো হ'লই না, নিদেন রাজকন্যা একটা থাক সঙ্গে!...এমনি বহু সংশয়ই মনে দেখা দিল আগার, সেই কয়েক-মুহূর্ত-কালের মধ্যে।

মীর মর্দান খাঁ আগার সামনে এসে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে বিনা ভূমিকাতেই বললেন, 'বাদশা তাঁর হুকুম রদ ও বদল করেছেন, তোমাকে তিনি ছুটি দিয়েছেন, তুমি কিল্লাতে ফিরে যেতে পারো বা যেমন তোমার অভিরুচি। শাহ্‌জাদীকে নিয়ে যাবার ভার আমার—এখন থেকে!'

আগার মুখের একটি শিরাও কম্পিত হ'ল না—বরং সেই আগেকার সংশয়-জটিল ভ্রূকুটিটা অনেকখানি মিলিয়ে গেল যেন। সে প্রশান্ত কণ্ঠে শুধু বলল, 'কৈ, দেখি সে হুকুম-নামা!'

বোধ হয় এ প্রশ্নটার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না মীর মর্দান খাঁ। তিনি যেন অপ্রস্তুত ভাবটা ঢাকতেই কেমন একটু উষ্ণ হয়ে উঠলেন, 'হুকুম-নামা আবার কি? তিনি কি লিখে দেবেন? কেন? আমাকে বলে দিয়েছেন, তাই তো যথেষ্ট। আমাকেই তো এই পাঠাবার সব বন্দোবস্ত করতে বলেছেন, সব ভারই তো আমার—আমিই তো তোমাকে বুঝিয়ে দিয়েছি কাল! তবে আবার এখন হুকুম-নামার প্রশ্ন উঠছে কেন? আমিই কাল গিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম যে এতবড় একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার তোমার মতো অর্বাচীনকে দেওয়া ঠিক হয় নি—তখনই তিনি বলে দিলেন, তুমি যা ভাল বোঝ করো তাহলে, তুমিই বরং সঙ্গে যাও—'

অসহিষ্ণু আগা তাঁর বাক্য-স্রোতে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'কাল আমাকে বাদশা নিজমুখে যে হুকুম দিয়েছেন, সে হুকুম রদ করতে হ'লে তাঁরই মৌখিক বা লিখিত হুকুম চাই। নইলে আমি আগের হুকুমই তামিল করব!'

'ও, তোমার একটা হুকুম চাই, এই তো? তা বেশ, আমিই তোমাকে হুকুম দিচ্ছি। তাই তো যথেষ্ট!'

'না, সিপাহ্‌শালার—মাপ করবেন আমাকে—তা যথেষ্ট নয়, প্রথমত আমি আপনার ফৌজের আপনার তাঁবের সিপাহী নই—দ্বিতীয়ত, বাদশার হুকুমের ওপর আর একটি হুকুমই আমি বড় বলে মানতে রাজী আছি, সে হ'ল আল্লার হুকুম। তা যখন পাওয়া সম্ভব নয় তখন যেটা পেয়েছি সেই বাদশার হুকুমই তামিল করব—যতক্ষণ এ দেহটায় প্রাণ থাকবে।'

'তবে আল্লার হুকুমই শোন্ বেতমিজ!'

মীর মর্দান খাঁর একটা হাত যে তাঁর কুর্তার জেবে ঢোকানো ছিল তা আগার চোখ এড়ায় নি। তাই যত ত্বরিত গতিতেই তিনি পিস্তলটা বার করুন না কেন—তার চেয়েও ত্বরিততর গতিতে সে ওর হাত চালাল। বিদ্যুৎ-বেগে বলতে গেলে—একটা প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে দিল মীর মর্দান খাঁর নাকে—তিনি গুলি চালাবার বা আত্মরক্ষা করার কোন চেষ্টা পাবার আগেই।

সে ঘুষিব প্রবল আঘাতে মুহূর্তকালের জন্য চোখে অন্ধকার দেখলেন মীর মর্দান খাঁ, আর সেই সুযোগে আগা তাঁর শিথিল মুষ্টি থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে দূরে একটা ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শান্তস্বরে বলল, 'আল্লার হুকুমই তামিল করলাম এই!...যান সিপাহ্‌শালার, এই বেলা চলে যান—আপনাকে প্রাণে

মারব না, আপনার মতো ছুঁচো মেরে হাতিয়ারের অপমান করতে চাই না আমি। বরং আরও উপকার করছি—সাবধান ক'রে দিচ্ছি, ভবিষ্যতে এসব বদ মতলব করার আগে ভেবে-চিন্তে দেখবেন।'

অপমানে ও আঘাতে মীর মর্দান খাঁর মুখের চেহারা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তিনি আর কোনও বাদানুবাদ বা লড়াই করতে সাহস করলেন না—নিঃশব্দে ঘোড়ায় উঠে চলে যাবার সময় দাঁতে দাঁত চেপে শুধু বলে গেলেন, 'হ্যাঁ, তাই দেখব। ভেবেচিন্তেই দেখব। ভাল ক'রেই ভেবে দেখব এবার। ধন্যবাদ। তোমার এই উপকারের প্রত্যুপকার করার ব্যবস্থাও আমার জানা আছে—সেইটেই করব।'

আগা ঘৃণায় কোন জবাবও দিল না, বরং যেন তাঁকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতেই পিছন ফিরে দাঁড়াল।

যতটা সম্ভব রাত্রি-বেলাই এগিয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু এটা শুক্লপক্ষ নয়, ওদেরও মশাল জ্বালিয়ে যাওয়ার সাহস নেই। তাই খোলা মাঠ বা প্রান্তর কি নদীর চড়া পেলে রাত্রে এগিয়ে চলে কিন্তু বন-জঙ্গলের পথে চলতে সাহস করে না। তখন কোন বড় গাছ দেখে তারই গুঁড়ি ঘেঁষে ডুলি নামিয়ে ওরা তিনজন তিন দিক বসে পাহারা দেয়। তাতে ওদেরই বিশ্রাম হয়, মেহেরের না। বরং সেই সময়টায় আরও যেন দুঃসহ কষ্ট হয় তার। ঘেরাটোপের মধ্যে অসহ্য গুমোটে বুরখা মুড়ি দিয়ে বসে থাকা। ঘেরাটোপ খুলে দিলেও বুরখা খোলা যায় না। আশ্বিন মাস পড়ে গেলেও আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয় নি, শুধু শেষ রাত্রিটায় একটু ঠাণ্ডার ভাব থাকে মাত্র। এই সময়টায় এমনিতেই ঘাম হয় বেশী—বুরখার মধ্যে মেহেরের অবস্থা অবর্ণনীয় হয়ে ওঠে। ঘামে কামিজ পাজামা ভিজে সপ্‌সপ্‌ করে—ঘেমে ঘেমে ক্লান্ত হয়ে পড়ে—এক এক সময় ভয় হয় বুঝি অজ্ঞানই হয়ে যাবে।

দিনেও সব সময় হাঁটতে পারে না। দিনে রাতের উল্‌টোটা হয় এই পর্যন্ত। বন-জঙ্গলের পথ পেলে বেশ খানিকটা এগিয়ে যেতে পারে—লোকালয় বা খোলা মাঠ পড়লে মুশকিল। তবু, আগা অনেকসময় নিজে একা এগিয়ে গিয়ে পথে কোন বিপদের আশঙ্কা আছে কি না খোঁজ-খবর ক'রে ভরসা ক'রে পেরিয়ে যায়। তবে সেটা সব সময় নিরাপদ মনে হয় না। আরও বিপদ বেধেছে খাদ্য-খাবার নিয়ে। সেটা সংগ্রহ করাই প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। রেঁধে খেতে গেলে চটী বা দোকান চাই। নইলে বাসন-পত্র দেবে কে? সোজাসুজি গিয়ে কোন চটীতে উঠতে সাহস হয় না। সরাইখানাতে তো নয়ই। নানান কৈফিয়ৎ—লোক জানাজানি। তাছাড়া চটী বা সরাই অধিকাংশই বন্ধ এখন। বড় বড় জনপদের অবস্থাও কতকটা শ্মশানের মতো—যারা আছে তারা জানলা কপাট বন্ধ ক'রে বসে থাকে। বিজয়ী ইংরেজ আর লুটেরা সিপাহী—ভয় দু দলকেই। এদেরই ভয়ে চটী বা দোকানপাট কি সরাইখানা খুলতে সাহস করে না বিশেষ কেউ। খুললেও দুচার দণ্ডের জন্য। গ্রামের লোকরা চটপট মাল নিয়ে সরে পড়ে—দোকানীও ঝাঁপ টেনে দেয়। কোন তৈরী খাবারও মেলে না। হালওয়াইরাও দোকান খুলতে সাহস করে না। বহু কষ্টে হয়ত একটু ছাতু কি দুটো ভুজা চানা সংগ্রহ হয়—কিম্বা এক আধ ডেলা গুড়। অনভ্যস্ত অরুচিকর এই খাদ্যে—তাও জোটে না বেশির ভাগ সময়ে, খাড়া উপবাসেই কাটাতে হয়, হয়ত, এক-দিন কি এক রাত—এবং বিনা বিশ্রামে, মেহেরের শরীর ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হ'ল দুতিন দিনেই।

মেহের ইতিমধ্যে ডুলিবাহকদের সঙ্গে কথা কয়েছে। না করে উপায়ও নেই—এরকম নিঃসঙ্গ যাত্রায় অত আভিজাত্য বজায় রাখ'তে গেলে চলে না। ডুলিবাহকদের মারফৎই আগার সঙ্গেও আলাপ জমাবার চেষ্টা করেছে কিন্তু কোন ফল হয় নি। কেমন যেন পাথরের মতো হয়ে থাকে লোকটা, তেমনি কঠিন, তেমনি ভাবলেশহীন। মুখ-চোখেও যেমন কোন ভাবান্তর দেখা যায় না কখনও, তেমনি কথাবার্তাতেও না। কথাই কয় না কারও সঙ্গে—নেহাৎ দরকারে না পড়লে। যখন হাঁটে মাথা হেঁট ক'রে পথ চলে, কখনও ফিরে ডুলিটার দিকে তাকায় না পর্যন্ত। যদিও সে সদাসর্বদা সতর্ক থাকে—সম্ভাব্য সমস্ত রকম বিপদ-আপদ থেকে, সে পরিচয় পায় মেহের হামেশাই। কর্তব্যে ত্রুটি নেই তার কোথাও, কিন্তু যন্ত্রের মতো কর্তব্যই পালন ক'রে যায় শুধু, তার বেশী প্রাণলক্ষণ দেখা যায় না কখনও।

তার এ গাম্ভীর্য, এই পাষাণবৎ আচরণের একটিই মাত্র অর্থ হয়—আর সেই অর্থটা অনুমান ক'রে নিয়েই আগার সমস্ত রকম অসামাজিকতা আপাতরূঢ় আচরণ ক্ষমা করে মেহের। এবং তার এই কঠিন অনমনীয়তায়—ওর তরফ থেকে আলাপ জমাবার চেষ্টা এমন ভাবে প্রত্যাখ্যান করায় পুলকিতই হয়। আগা ভাবছে নিশ্চয় যে তার দিল-কী-রোশনী তার আসমানের চাঁদ সে পিছনে ফেলে এসেছে—সহস্র বিপদের মধ্যে, একান্ত অসহায়তার মধ্যে। সেই ভেবেই তার সারা জীবন, তার প্রতিটি দিনরাত এমন নীরস অর্থহীন লাগছে, তার সমস্ত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মরুভূমির মতো বোধ হচ্ছে। কোন কিছুতেই তার প্রাণের সাড়া মেলে না তাই—এক নিছক কর্তব্যটুকু ছাড়া। যেন এটুকুর জন্যেই বেঁচে আছে শুধু, নিমকের ঋণ শোধ করতে।......

মেহের সেটা বুঝতে পারে—তাই আগার এই শীলীভূত বিষাদেও তার অহঙ্কারই চরিতার্থ হয়, খুশী হয় সে। সেসব সময়গুলোয় আসন্ন চিরবিচ্ছেদের কথাটাও ভুলে যায় যেন।

কিন্তু মন যে সান্ত্বনাই লাভ করুক, দেহ আর কোন কথা শুনতে রাজী হয় না। সে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ক্রমশঃ। সহ্যসীমার বাইরে চলে যাচ্ছে এবার। যারা হাঁটছে—বসলেই তাদের বিশ্রাম, কিন্তু দিনরাত যে আড়ষ্ট হয়ে ডুলিতে বসে আছে—তার বিশ্রাম মেলে না কখনই। সেই তথ্যটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় এবার। ডুলিওলাদের দিয়েই সে বলায় যে, অন্তত একরাত কোথাও একটু শুতে না পারলে তার পক্ষে আর এভাবে চলা সম্ভব নয়। আশ্রয় যদি কোথাও না মেলে তো অন্তত পথেই কোন গাছতলায় একটু শোবার ব্যবস্থা ক'রে দিক। মাঠের ওপর মাটিতে শুলেও চলবে—কিন্তু শোওয়া চাই-ই একটু।

এদিকটা আগা ভাবে নি একবারও। এখন চমকে উঠল। কথার যাথার্থ্যটাও বুঝল। অনুতপ্তও হ'ল একটু। এটা তারই ভেবে দেখা উচিত ছিল। সত্যিই বড় ভুল হয়ে গেছে।

কিন্তু ভুলটা বুঝলেও সেটা সংশোধনের কী উপায় বুঝে পেল না। কী ব্যবস্থা করবে? সত্যিই কি মাটিতে শুতে হবে শাহ্‌জাদীকে! রাজপ্রাসাদের মানুষ কি মাটিতে শুতে পারবেন আদৌ?

অনেক ভেবে ঠিক করল ঝুঁকিই নেবে একটু। এ ভাবে তাদের শরীর বইলেও সুখ প্রতিপালিতা অল্পবয়সী মেয়ের বওয়া সম্ভব নয়। বিশ্রাম এবং রান্না করা খাবার দুই-ই চাই, আর লোকালয়ে গিয়ে কারও বাড়িতে বা কোন চটীতে আশ্রয় না

দিলে ও দুটো মেলা সম্ভব নয়। স্থির করল সামনে যে গ্রাম পড়বে সেখানেই গিয়ে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করবে, তাতে যা আছে অদৃষ্টে হবে।

সেই কথাই বলল ডুলিওলাদের। সাবধান ক'রে দিল যে ডুলিতে কে আছেন বা কোথা থেকে আসছেন তা যেন কোন ক্রমেই কাউকে না বলে। শাহ্‌জাদী বা মালেকান এই দুটো শব্দ যেন একেবারে ভুলে যায় তারা। মুঘল হারেমের জেনানাদের সকলেই যথেষ্ট সম্ভ্রমের চোখে দেখে—সে পরিচয় দিলে আশ্রয় বা আতিথ্যের কোন অসুবিধাই হ'ত না—কিন্তু আগা ভেবে দেখল যে, কথাটা লোকমুখে দেখতে দেখতে বহুদূরে ছড়িয়ে যাবে। তাদের তিন দল দুশমন—ইংরেজ, সিপাহী এবং শাহ্‌জাদীর নিকট-আত্মীয়রা অর্থাৎ মুঘল পরিবার। সুতরাং ও পরিচয় দেওয়া চলবে না। বেগম সাহেবাকে নিজের বিবি বলেই পরিচয় দেবে—বেগম যেন অপরাধ না নেন।

অপরাধ!

ডুলিওলাদের মারফৎ বললেও মেহেরের শ্রুতিগম্য ক'রেই বলেছিল কথাটা। মেহেরেরও শোনার কোন অসুবিধা হ'ল না। 'আমার বিবি' শব্দ দুটো সহস্র যন্ত্রে-বন্ধ সুশ্রুত সংগীতের মতোই তার কানে বেজেছে। আনন্দে ও সুখে রিন-রিন ক'রে উঠেছে তার রক্ত। সুখে অবশ হয়ে এসেছে তার স্নায়ু। মিথ্যা—কিন্তু অতি-সুখকর, অতি আনন্দদায়ক মিথ্যা। সহস্র সত্যের চেয়ে শ্রেয়। হে খোদা—এই মিথ্যা তার জীবনে স্থায়ী হয় না, সত্য হয় না?

সন্ধ্যার দিকে একটা মাঝারি গোছের গ্রাম পাওয়া গেল। গ্রামের বাইরে ওদের রেখে আগা গেল খোঁজখবর করতে। দু'চারটি ঘর যা প্রথমে নজরে পড়ল গ্রামে ঢুকতে—নিতান্তই হতদরিদ্র গোছের। সেখান আশ্রয় নেবার চেষ্টা করা মানে তাদের বিব্রত করা। সরাই বা চটী এসব গ্রামে থাকার কথা নয়। একটি দোকান পাওয়া গেল—হিন্দু বানিয়ার, সে রান্নার জিনিসপত্র দিতে রাজী হ'ল কিন্তু আশ্রয় দিতে পারবে না তা স্পষ্টই জানিয়ে দিল ওদের। কোন হাংগামা হুজ্জতে জড়াতে রাজী নয়—ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করে। তবে সে-ই বলল, এখানে এক সম্পন্ন জোত্‌দার আছেন চৌধুরী সাহেব—বেশ সম্পন্ন চাষী গৃহস্থ—আশ্রয় মিললে সেখানে মিলতে পারে। তার বাড়িটাও দেখিয়ে দিল সে দোকানদার।

চৌধুরী সাহেব অনুরোধটা শোনার সংগে সংগে একটু কঠিন হয়ে উঠলেন, উত্তর দেবার আগে বারকতক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আগার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন—আগার বোধ হ'ল এ শ্রেণীর উ'ড়া আপদ ঘরে ঢোকানোর লোক তিনি নন, এখনই হয়ত ঝেড়ে অস্বীকার করবেন। কিন্তু দেখা গেল যে তা তিনি করলেন না। বেশ কিছুক্ষণ নানারকম জেরা করার পর হঠাৎ যেন উদার এবং অমায়িকই হয়ে উঠলেন বরং। বললেন, 'আরে, আমরা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এইসব বাজে কথা কইছি আর আপনার বিবি ওধারে—বিলক্ষণ!! সে কি কথা! আমার এ গরীবখানায় দয়া ক'রে একটা রাত আপনারা থাকবেন—এ তো আমার সৌভাগ্য। এর আর জিজ্ঞাসাবাদের কি আছে! এ গ্রাম হয়ে যাঁরা যাতায়াত করেন তারা সকলেই তো অনুগ্রহ ক'রে—হেঁ-হেঁ! আপনাদের খিদমত লাগতে পারাই তো ঘরবাড়ির সার্থকতা। এ আপনাদেরই বাড়ি, আপনাদেরই খানা। আমার কিছু নয়। আপনি যান—আগে বিবিজীকে নিয়ে আসুন—শরীর খারাপ বলছেন—এ অবস্থায়—ছি ছি, মিছিমিছি দেরি করলেন—একেবারে অনর্থক। কৈ রে, কে কোথায় আছিস!'

খুব হাঁকডাক চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন চৌধুরী সাহেব, নিজেই উজিয়ে গিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন। আত্মীয়তা ও আন্তরিকতার কোন ত্রুটি রাখলেন না কোথাও।

মাটির বাড়ি, খাপরার চালা—কিন্তু পোতা উঁচু, বেশ ভাল আর বড় বাড়ি। দু মহল গোছের, যে বৈঠকখানা ঘরটি ওদের দিলেন সেটাকে স্বতন্ত্র মহল ধরাই উচিত। ঘরটা বোধহয় এই উদ্দেশ্যেই করা—অনাত্মীয় অতিথিদের জন্য। কারণ বাড়ির সংলগ্ন হ'লেও ঘরটার বাইরের দিকের উঠানটা একেবারে স্বতন্ত্র, পৃথক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যে গাড়ি বা ঘোড়া রাখার আস্তাবল, সহিসদের থাকার জায়গা, তাদের রসুই পাকাবার ঘর,—সব ব্যবস্থা করা আছে। মাঝে একটি ইঁদারা পর্যন্ত। সেকালে সব সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়িতেই রাহী অতিথিদের জন্যে এই ধরণের ব্যবস্থা থাকত।

চৌধুরী সাহেবের দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর স্ত্রী বা মেয়ে এখানে নেই, বার বার আপসোস করতে লাগলেন সে জন্যে—বিবিজীর যত্নের খুবই ত্রুটি হবে হয়ত—কী একটা বিবাহ উপলক্ষে উত্তরে গেছে—কী একটা পাহাড়ে শহরের নাম করলেন—পিলিভিট না কি। আগা বুঝল এইসব হাঙ্গামার ভয়ে টাকাকড়ি জেবর জহরৎ দিয়ে উত্তর দিকে সরিয়ে দিয়েছেন মেয়ে-ছেলেদের।

'অবশ্য খুব একটা অসুবিধা হবে না' নিজেই আশ্বাস দেন আবার চৌধুরী সাহেব, 'আমার এক পিসী আছেন, পুরনো ঝি আছে—সংসার ধরুন না কেন আমার বিবি থাকলেও তো ওরাই দেখে—খানা পাকাতে শুরু করেছে তারা মেহমান আসার খবর পেয়েই। বিলকুল বন্দোবস্ত সব হয়ে যাবে, কোন চিন্তা নেই!'

কোন চিন্তা করতেও হ'ল না। ওরই মধ্যে একটু পর্দা দিয়ে ঘিরে বিবিজীর গুসলের ব্যবস্থা হল। আগারও। ডুলিওলাদের জন্য সিধা বেরোল—তারা তাদের মতো পাকিয়ে খাবে। আগাদের খাবারও তৈরী হয়ে গেল অলপক্ষণের মধ্যেই। রুটি ডাল আর একটু আলুর ভর্তা—মাংস এখন দুর্লভ হয়ে পড়েছে, আপসোস ক'রে বললেন চৌধুরীসাহেব—সামান্য খাদ্য, সাধারণ রান্না কিন্তু ছ সাত দিন পরে এই প্রথম খাবারের মতো কিছু একটা জুটল, মেহেরের মনে হল অমৃত। কদিন পরে স্নান ও পেট পুরে আহার—ঘুমে সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে এলো ওর খেয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই।

আগাকে নিয়ে একধারে খেতে বসেছিলেন চৌধুরী। খেতে খেতে এক সময় বললেন, 'ভাইসাহাব, আপনি তো দিল্লী থেকে আসছেন—যাবেন কোথায় বললেন, জৌনপুর? ওঃ—বহুত দূর সফর আপনার। জমানা ভি খুব খারাপ।...যাগ্‌গে, সে আপনার সওয়াল।...একটা খবর খালি নেব আপনার কাছ থেকে, আচ্ছা, আপনি মীর মর্দান খাঁর নাম শুনেছেন? বেরেলীর বখ্‌ৎ খাঁর চাচেরা ভাই।...শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে আমার রিসতাদার হয়।'

গলার মধ্যে রুটির ডেলা আটকে গিয়েছিল আগার, বদনা থেকে এক ঢোক জল খেয়ে নিয়ে নামাল সেটা। বলল, 'কৈ না, শুনেছি বলে তো মনে পড়ছে না!'

'শোনেন নি! তাজ্জব! বখ্‌ৎ খাঁ তো বড় সিপাহ্‌শালার শুনেছি, মীর মর্দান খাঁ তার ভাই, সেও এক জবর সিপাহ্‌শালার।...ওরা দুজনেই আমার আত্মীয়। আমার বিবিজী খুব বড় খানদানী ঘরের মেয়ে। আমার চেয়ে ঢের ভাল পাত্রে পড়া উচিত ছিল। তা যা বলছিলুম—বেচারা মীর তো বাদশার হয়ে লড়ছে, জান দিচ্ছে বলতে গেলে—এদিকে ওর পিয়ারের বিবিটিকে কে এক বাদশার সিপাহী চুরি ক'রে নিয়ে

ভেগেছে। কী নিমকহারামী দেখুন দিকি! এমন বুরা কাম মানুষে করে!...বেচারার খুব মনোকষ্ট।...খবর পাঠিয়েছে চারদিকে। আমাকেও খবর দিয়েছে। বলেছে পথে ঘাটে একটু নজর রাখতে।'

কথাটা শেষ ক'রে একটু যেন উৎসুক ভাবেই চেয়ে রইলেন চৌধুরী সাহেব আগার মুখের দিকে।

উষ্ণ জবাব একটা জিভের ডগায় এসে গিয়েছিল আগার, কিন্তু সাবধানে সংযত করল নিজেকে। বহু দিনের দুর্ভাগ্যের পাঠ আগাকে অনেক কিছুই শিখিয়েছে—তার মধ্যে আত্মদমনের শিক্ষা প্রধান। সে যতদূর সম্ভব নিস্পৃহ কণ্ঠে নৈর্ব্যক্তিকতা ফুটিয়ে বলল, 'তাই নাকি? তা এ গদরের দিনে লড়াই-ঝগড়ার মধ্যে তিনি বিবিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন?'

'আহাম্মক! সিফর্ বে-অকুফি। তবে আর বলেছে কেন যে জঙ্গী আদমীদের হাতে যতটা জোর মাথায় ততটাই কমজোর। বুঝলেন না ভাইসাহেব—এ গদ্‌হাপন আপনি আমি কেউ কখনও করতুম না। কেউ যায় এই গোলমালের মধ্যে অল্পবয়সী মেয়েছেলে নিয়ে?'

নিঃশব্দে আরও দুই এক গ্রাস রুটি খাবার পর আবার শুরু করেন, 'তবু সে যাই করুক, আত্মীয় তো! খবরটা যদি পাই তো পাঠাতেই হবে। হাজার হোক আমার জরুর সাক্ষাৎ ফুফেরা ভাই!'

'কিন্তু যদিই পান—খবরটা দেবেন কাকে?' ধীরে সুস্থে ডালের কটোরাতে রুটি ডুবোতে ডুবোতে বলে আগা, 'শুনলুম তো আংরেজরা শাহ্‌জাহানবাদে ঢুকে পড়েছে—আজ-কালের মধ্যে হয়ত কিল্লাও দখল করবে; বখ্‌ৎ খাঁর তো অনেক আগেই লক্ষ্ণৌ রওনা দেবার কথা। তাই যদি হয় তার চাচেরা ভাই কি আর বসে থাকবেন আংরেজদের দড়িতে গলা দিতে?'

'তাই নাকি?' মুখ শুকিয়ে ওঠে হঠাৎ চৌধুরী সাহেবের, 'আংরেজরা শাহ্‌জাহানাবাদে ঢুকে পড়েছে? কী ক'রে জানলেন আপনি? আপনি তো বলছেন পাঁচসাত দিন আগে রওনা দিয়েছেন!'

'পথেই শুনেছি। আজ সকালে যে দোকান থেকে ছাতু গুড় কিনেছি সে দোকানীও বলছিল।'

'ও, তাই নাকি!' হঠাৎ যেন উৎসাহ নিভে যায় চৌধুরীর।

'হ্যাঁ,—তাই বলছিলুম, আপনি বখ্‌ৎ খাঁর রিসতাদার—এ কথা বেশী প্রচার না হওয়াই ভাল।—কী হয় লড়াইয়ের গতিক বলা যায় না তো!'

'ঠিক বলেছেন। একটু হুঁশিয়ারীসে চলাই দরকার।'

খাওয়া শেষ হ'তে ঘরের দরজা পর্যন্ত পেঁৗছে দিয়ে চৌধুরী বলেন, 'নিন, এবার শুয়ে পড়ুন। সাবধানে দরজা বন্ধ দিয়ে শোবেন—জমানা ভাল নয়, চোর ডাকাতের উপদ্রব চারিদিকেই।'

'ঐটি মাপ করবেন বড় মিঞাজান', একটু অপ্রতিভ ভাবে হেসে বলে আগা, 'আমি আবার ঘরে শুয়ে একেবারেই ঘুমোতে পারি না। আমি চারপাইটা টেনে নিয়ে এই দাওয়াতেই বেশ শোব। ভয় নেই—দরজার সামনেই শুলাম, আমাকে ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকবে—এমন চোর এখনও জন্মায় নি।'

'সে কি! মুহূর্তের জন্য যেন বিমূঢ় দেখায় চৌধুরীর মুখখানা। সংশয়-কুটিল হয়ে ওঠে দৃষ্টি। তারপর চোখের একটা অর্থপূর্ণ ভঙ্গী ক'রে বলেন, 'আজ

এতদিন ঘরছাড়া—এতদিন পরে আবার একটা ঘরের আশ্রয় পেয়েছেন। বিবিজীকে একা রাখবেন? এমন হতাশ করবেন?'

'বিবিজীর জন্যেই তাঁকে হতাশ করা দরকার বড়-মিঞাজান। শরীর ওর খুব খারাপ, বিশ্রামের এতটুকু ব্যাঘাত করাও চলবে না।'

'তাই নাকি?' চৌধুরীর হাসিটা যেন আরও বক্র হয়ে ওঠে, 'বিশ্রামের ব্যাঘাতেও কিন্তু অনেক সময় শ্রান্তি দূর হয় ভাই সাহেব।...তা দেখুন, সে আপনার মর্জি।... কাল সকালে খানা-পিনা ক'রে রওনা দেবেন তো?'

'না না, চৌধুরী সাহেব, ও হুকুম আর করবেন না—এমনিই ঢের তকলীফ্ দিলুম আপনাকে—একেবারে ভোর বেলাই বেরিয়ে পড়ব ভাবছি।...যদি শেষ রাতে ঘুম ভাঙ্গে তো ডেকে দেবেন দয়া ক'রে। রোদ চড়া হবার আগে যতটা এগিয়ে যেতে পারি!'

'অবশ্য। অবশ্য। আপনি বেফিকির হয়ে আরাম করুন। এক প্রহর রাত থাকতে আমার ঘুম ভাঙ্গে—ভোরে উঠে একটু ক'রে দুধ খেয়ে অন্তত রওনা দিতে পারেন যাতে—সে ব্যবস্থা ক'রে দেব!'

চৌধুরী সাহেবের আর অপেক্ষা করার কোন কারণ নেই। করলেনও না। আর কোনও খিদমতে লাগতে পারেন কিনা বার বার প্রশ্ন ক'রে জেনে, গুসলের জল আছে কিনা দেখে, ঝাঁঝোরাতে পানীয় জল দিয়ে গেছে কিনা, চারপাই বিছানা সব ঠিকঠাক আছে কিনা পরীক্ষা ক'রে রাত্রের মতো শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি নিজেও শুতে গেলেন।

আগাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভেতরে যাবার দরজাটা এঁটে বন্ধ ক'রে দিল। তার-পর নিজের চারপাইটা যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে তুলে এনে দরজার বাইরে পেতে নিল—দরজা জোড়া ক'রেই।

অতঃপর চিরাগটা নিভিয়ে দেওয়া উচিত কিনা ভাবতে গিয়ে মনে পড়ল চকমকি ইত্যাদি কিছুই কাছে নেই। ডুলিওয়ালাদের কাছে আছে কিনা তাও সন্দেহ। সুতরাং আলোটা নেভানো উচিত নয়, বরং পল্‌তেটা উসকে ঠিক ক'রে দেওয়া ভাল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চিরাগের দিকে নজর পড়ল—দেখল যেটুকু তেল আছে, বড় জোর আর দণ্ড-দুই জ্বলবে, প্রায় শেষ হয়েই এসেছে। বুঝল চৌধুরী সাহেবের অন্তঃপুরিকারা বড়ই কৃপণ। এদিক ওদিক চেয়ে দেখল, আলো বা আগুন জ্বালার সাজ-সরঞ্জাম কোথাও দেখতে পেল না। একবার ভাবল, চৌধুরী সাহেবকে ডেকে একটু তেল চেয়ে নেয়—এরই মধ্যে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন নি—কিন্তু শেষ পর্যন্ত লজ্জা বোধ হ'ল। বাইরের দিকের কপাটটাও সন্তর্পণে ভেজিয়ে দিয়ে নিজের চার-পাইতে শুয়ে পড়ল।...

বিছানাটা গুটিয়ে রেখে শুধু চারপাইটা এনেছিল—বেশী আরামে পাছে বেশী ঘুমের আমেজ আসে, এই ভয়ে। কিন্তু তাতেও কোন সুবিধা হ'ল না। অনেকদিন পরে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করার সুযোগ এবং অবসর পেয়েছে—এ কদিন তো একটুও ঘুমোতে পারে নি, বসে বসে ঝিমুনি ছাড়া বিশ্রামই পায় নি কোন রকম। দড়ির ওপর শুয়েও তাই ঘুমকে ঠেকাতে পারল না। দু চোখ ভারী হয়ে আসছে তন্দ্রায় তারও। সকল দেহ অবশ করা ঘুম।...

কিন্তু ঘুমোলে চলবে না, মনকে বার বার শাসন করে আগা। কোনমতেই দেহের

এই স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় দাবীটার কাছে আত্মসমর্পণ করা উচিত হবে না। বরং সর্বেন্দ্রিয় সজাগ রাখতে হবে—চোখ ও কানের নিয়ন্ত্রা যে মস্তিষ্ক তাকেও তৎপর রাখতে হবে।

ঘুমোয় না, স্থির হয়ে পড়ে থাকে ঘুমের ভান ক'রে। কিন্তু তার মধ্যেই কখন সর্বপ্রকার সাধুসংকল্প বানচাল ক'রে আচ্ছন্ন হয়ে আসে তার চৈতন্য—তা ঠিক বুঝতে পারে না। তবে মনের মধ্যে একটা আশঙ্কার ভাব ছিল বলেই বোধহয় একেবারে বিহ্বল ক'রে ফেলতে পারে নি, ঈষৎ একটু শব্দই আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে মন ও বুদ্ধি। প্রথমটা তো মনে হয়েছিল বুঝি স্বপ্নে শুনছে—কিন্তু তার পরই বুঝল যে না, সত্যি-সত্যিই তার কাছাকাছি কোথাও কারা খুব চুপি চুপি কথা কইছে। এইবার অবাধ্য চোখের পাতা দু' জোড়াও জোর ক'রে খোলে একটু—যদিও তাতে দৃষ্টি ফিরে আসতে বেশ কিছুক্ষণ দেরি লাগে।...

হ্যাঁ, যা ভেবেছে তাই। চৌধুরী সাহেবই—বাইরের দিক দিয়ে ঘুরে এসেছেন বোধহয়, আস্তাবলে ঢুকে ডুলিওলাদের কী সব জেরা করছেন। কী বলছেন অত চাপা আওয়াজ থেকে ঠিক শোনা গেল না। তবে দু'একটা টুকরো-টুকরো শব্দ যা ওর মধ্য থেকে উদ্ধার করতে পারল তাতেই প্রশ্নের মূল বক্তব্যগুলো বুঝতে অসুবিধা হ'ল না। ডুলিতে কে, কোথা থেকে আসছে, সত্যিই ওরা স্বামী স্ত্রী কি-না,—ইত্যাদি। একটু ভয়-দেখানোও চলছে বোধ হ'ল। মীর মর্দান খাঁর নামটাও কানে গেল একবার। আরও একটা শব্দ কানে যেতে আগা হাসি চাপতে পারল না মনে মনে—জেবরের পেটি। চৌধুরী সাহেব তাহলে শুধু স্ত্রীর ফুফেরা ভাইয়ের কথাই ভাবছেন না—ঐ সঙ্গে নিজের কিছু মুনাফা হয় কিনা সে কথাটাও চিন্তা করছেন। চুরির ওপর বাটপাড়ি!

অবশ্য শুধু ভয়ই দেখালেন না। মনে হ'ল শেষ পর্যন্ত কিছু বকশিশের লোভও দেখালেন। তারপর যতটা সম্ভব নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন আবার বাইরের দরজা দিয়ে।

আর বিলম্ব করা ঠিক নয়। এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে এখান থেকে—যত দ্রুত সম্ভব। চৌধুরী-তনয়ের লোভ দুর্বার হয়ে উঠেছে, শেষ অবধি হয়ত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। কিন্তু তাড়া যতই থাক, বাধ্য হয়েই দেরি করতে হবে খানিকটা। চৌধুরী সাহেব না ঘুমোলে—অন্তত নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে গিয়ে না শুলে কিছু করা যাবে না। কখন শোবেন—তাই বা কে জানে। এখনই যে গিয়ে শুয়ে পড়বেন, তাও তো ভরসা করা যাচ্ছে না। হয়ত আরও কিছু কাজ বাকী আছে,—ষড়যন্ত্রের কাজ। হয়ত আজ রাত্রেই মীর মর্দানের কাছে লোক যাবে। যাই হোক, আর খানিকটা না দেখে কিছু করা উচিত না। দীর্ঘসূত্রিতাও যেমন ভালো নয়—তেমনি অকারণ ব্যস্ততাও না। এখন সামান্য শব্দ পেলেও হুঁশিয়ার হয়ে উঠবেন ওঁরা। তার চেয়ে আরও অন্তত আধ-ঘণ্টাটাক এমনি মটকা মেরে পড়ে থাকা ভাল। তার পর উঠে যাত্রার আয়োজন। ডুলিওলাদের জাগিয়ে ডুলিটাকে আগে বাইরে চালান করতে হবে—দূরে কোথাও। বেগম সাহেবা সেইটুকু হেঁটে গিয়ে চড়বেন, কী আর করা যাবে!

মনে মনে সমস্ত ব্যাপারটা ছকে নিয়ে আগা অপেক্ষা করতে লাগল। চৌধুরী সাহেবের একটু নিষ্ক্রিয় বা নিশ্চিন্ত হবার। যদি ব্যবস্থাই কিছু করার থাকে ও'র—খবর পাঠানো ইত্যাদি—তাতেই বা কতটা সময় যাবে, তার পরেও তো শোবেন একটু নিশ্চয়ই! কতক্ষণ আর দেরি হবে—বড় জোর আধ ঘণ্টা!

কিন্তু এই আধ ঘণ্টার পরেও কতটা সময় কেটে গেল তা বুঝতে পারল না আগা। ওর দেহটা ওর সঙ্গে এই চরম সঙ্কটময় মুহূর্তেই চরম বেইমানি করল। কখন যে সমস্ত-ইন্দ্রিয়-শিথিল-করা তন্দ্রা নেমে এসেছে ওর চোখের পাতায় তা বুঝতেই পারে নি। একেবারে এক সময় আপনিই চমকে ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল যখন—তখনই টের পেল যে ইতিমধ্যে বেশ খানিকটা ঘুমিয়ে নিয়েছে সে।

কতটা—তা অবশ্য ঠিক বুঝতে পারল না। তবে—একটু আশ্বাসের কথা এই যে—রাত এখনও শেষ হয় নি, এমন কি ঊষার প্রথম স্পর্শটুকুও লাগে নি বাতাসে। নিঃশব্দে উঠানে নেমে এসে আকাশের দিকে চেয়ে দেখল—নক্ষত্রগুলো দেখে মোটামুটি যা মনে হচ্ছে—ফরসা হবার অন্তত ঘণ্টা-দুই দেরি আছে। অর্থাৎ খুব কম ক'রেও সে তিন-চার ঘণ্টা ঘুমিয়েছে।

প্রথমটা নিজের ওপর রাগই হ'ল তার, 'দায়িত্ব-জ্ঞানহীন' 'নির্বোধ' বলে নিজেকেই গাল দিল মনে মনে। তারপর—এখনও কিছু সময় আছে বুঝে আশ্বস্ত হবার পর—ভেবে দেখল যে আল্লা যা করেন ভালর জন্যেই। একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে এতে। এখন দেহে ও মনে একটা অপরিসীম বল অনুভব করছে সে, দুটোরই সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেয়েছে। এইটুকু ঘুমিয়েই অনেকখানি ক্লান্তি কেটে গেছে তার—ক্লান্তি ও অবসাদ দুই-ই। নতুন উৎসাহ বোধ করছে, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে মানসিক অস্ত্রগুলোও। এখন যেন ভরসার অন্ত নেই তার—যে-কোন রকম লড়াইয়ের জন্যই সে প্রস্তুত। ক্রমশ বুঝতে পারল, এটুকু বিশ্রাম না পেলে অসুবিধাই হ'ত শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু এখন আর এক মুহূর্তও দেরি করা চলবে না। বাড়তি সময় আর কিছু-মাত্র নেই হাতে।

গুসল করার জন্য খানিকটা জল তোলাই ছিল একটা বড় মাটির ডাবায়। তা থেকে খানিকটা নিয়ে মুখে-চোখে দিয়ে নিল, তারপর চলল ডুলিওলাদের উঠিয়ে দিতে। নিঃশব্দেই চলাফেরা করছিল—বলা বাহুল্য। দীর্ঘকাল ধরে শত্রুর তাড়া খেতে খেতে কতকগুলো ক্ষমতা খুব আয়ত্ত হ'য়ে গিয়েছিল আগার—তার মধ্যে একটা হ'ল সরীসৃপ-সুলভ নিঃশব্দ লঘুগতি। এতবড় জোয়ান মানুষ কিন্তু ইচ্ছা করলে মাটিতে এতটুকু শব্দ না জাগিয়েও হাঁটতে পারত! চলাফেরাই শুধু নয়, কাজকর্মেও যাতে কোন শব্দ না ওঠে, সেই ভাবেই অভ্যস্ত ক'রে নিয়েছিল নিজেকে।

কিন্তু—এতক্ষণ ধ'রে যা-ই সান্ত্বনা দিয়ে থাক নিজেকে এই ক্ষণকালের আলস্যের জন্যে, আস্তাবলের সামনে গিয়েই বুঝতে পারল নিজের অসতর্কতার পরিণাম। সর্বনাশ যা হবার তা বেশ ভালই হয়ে গেছে। ডুলি ও বাহক দুই-ই অদৃশ্য হয়ে গেছে এর মধ্যে। মানুষ-দুটোর সরে পড়া সোজা—তাও না কেউ কেউ এসে ডেকেছে নিশ্চয়, হয়ত বাইরে নিয়ে গিয়ে কোনরকম ভয় দেখিয়েছে বা অনেক লোক মিলে মুখহাত চেপে ধরেছে—সুতরাং সে শব্দ না পেলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই কিন্তু বাইরের দোর খুলে যখন কেউ এসে ওদের ডেকেছে তখনও একটু শব্দ হয় নি—তা সম্ভব নয়। বিশেষ অতবড় ডুলিটা ওদের দিয়েই বইয়েছে হয়ত—কিম্বা নিজেরাই বয়েছে—যাই হোক, এখান দিয়েই একাধিক লোক চলাফেরা করেছে তবু তার ঘুম ভাঙেনি? আশ্চর্য! এ কী কালঘুমে পেয়েছিল তাকে! এই বিপদের সময় অমন নিশ্চিন্ত হয়ে তাকে ঘুমোতে দেখে ওরাই বা কী ভাবল, কী বে-অকুফই না মনে

করল! হয়ত এইখানে, তার খাটিয়ার পাশে দাঁড়িয়েই বিদ্রূপের হাসি হেসেছে, আর সে টেরও পায় নি! সে সময় তো অনায়াসে ওরা একটা চাকুও চালিয়ে দিতে পারত তার বুকে বা গলায়! অতটা বুদ্ধি হয় নি বা অতটা সাহসে কুলোয় নি বলেই রক্ষা—জানটা বেঁচে গেছে আগার।

কিন্তু—

সঙ্গে সঙ্গেই একটা কুটিল সন্দেহে তার সমস্ত মন যেন কিছুকালের জন্য অবশ হয়ে আসে। একটা দারুণ আশঙ্কায় হিম হয়ে ওঠে বুক। মন ও দেহ অল্পক্ষণের জন্য যেন অনড় হয়ে যায়।......

শাহ্‌জাদী—শাহ্‌জাদী ঠিক আছেন তো?

কিচ্ছু বিশ্বাস নেই—যে কালঘুমে পেয়ে বসেছিল তাকে! ডিঙিয়ে গিয়ে ভেতরের দরজা খুলে তাঁকে সরিয়ে নিতে পারে ওরা সহজেই।

বেশ কিছুকাল সময় লাগল হাত-পা নাড়বার ক্ষমতা ফিরে পেতে। ভেতরে গিয়ে দেখবার শক্তিটুকু সঞ্চয় করতে! সর্বনাশের পরিমাণ যতটা ভাবছে সে, হয়ত তার চেয়ে ঢের বেশী, হয়ত চূড়ান্তই হয়ে গেছে, কে বলতে পারে।......

অথচ বাদশা তাঁর সহস্র সেবকের মধ্যে বিশ্বাস ক'রে ওকেই এই কাজের ভার দিয়েছিলেন!

কিন্তু দেখতেই হবে। আশঙ্কা যত সাংঘাতিকই হোক, সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। যদি—যে সম্ভাবনাটা সে মুখে উচ্চারণ পর্যন্ত করতে পারছে না—সেটাই সত্য হয় তো তার কোন প্রতিকারের চেষ্টা করতে হবে, আরও বেশী বিলম্ব হবার আগে। সেক্ষেত্রে প্রতিটি মুহূর্ত অমূল্য। প্রতিকার করতে হবে জান-কবুল ক'রে—না পারলে জানই দিতে হবে, তাতে যদি বেইমানীর মূল্য শোধ হয়!

শেষ পর্যন্ত মানসিক বৈকল্য বা জড়তা জোর ক'রে ঝেড়ে ফেলে সে বিড়ালের মতো ত্রস্ত লঘুপদে চারপাই ডিঙিয়ে এক সময় ভিতরে গিয়ে ঢোকে......আঃ, বাঁচা গেল,—বাঁচল সে। শাহ্‌জাদী আছেন এবং—একটু কান পেতে নিঃশ্বাসের মৃদু ও নিয়মিত শব্দটা শুনে নিল সে—জীবিতই আছেন।

কিন্তু আর না। শঙ্কিত বিহ্বলতাটা কেটে গেছে সম্পূর্ণ রূপেই। তার চিন্তা-শক্তি এবং কর্মশক্তি দুই-ই রীতিমতো জাগ্রত এখন।...এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে, আর এক লহমাও দেরি করা চলবে না। তবে তার আগে শাহ্‌জাদীকে জাগানো দরকার—আর সেইটেই কিছু বিপজ্জনক। সেটা কি ক'রে করবে, হঠাৎ বুঝে উঠতে পারল না। বহুদিনের সঞ্চিত ঘুম ওঁর—বহুদিনের শ্রান্তি-অপনোদনের। গাঢ় ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছেন, সামান্য শব্দে যে ঘুম ভাঙ্গবে তা মনে হয় না। অথচ জোর কোন শব্দ করবে কি ডাকবে—সে উপায়ও নেই। এক যা করা যেতে পারে—গা ঠেলে জাগানো, কিন্তু সে অন্য মেয়ে হ'লেও না হয় সম্ভব হ'ত—এ শাহ্‌জাদী যে! স্বামী পুত্র বা বাবা ছাড়া কোন পুরুষেরই অধিকার নেই এঁদের স্পর্শ করবার!

তাহলে উপায়!

মুহূর্তখানেক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল আগা। রাগও হ'ল খুব—এ কী বে-আক্কেল মেয়েছেলে, চারদিকে এই বিপদ—এর মধ্যে এমন নিশ্চিন্ত ঘুম আসেও! রাজবাড়িতে জন্মালেই বোধ হয় কিছুটা বেঅকুফ হয়।...কিন্তু তখন আর রাগ করার সময় নেই, বেশী ভাববারও নয়। কিছু একটা করতে হবে—আর এখনই

করতে হবে। আরও বিপদ, ঘরে গাঢ় অন্ধকার—এর মধ্যে হঠাৎ জাগাবার চেষ্টা করলে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠবেন হয়ত।...তবু উপায় কি, সে ঝুঁকি নিতেই হবে। প্রথমটা স্পর্শদোষ বাঁচাবার জন্য, চারপাইয়ের নিচের দিকটা অর্থাৎ বেগম সাহেবার পায়ের দিকটা ধরে, খানিকটা উঁচু করে ঝাঁকানি দিল বার-কতক। তাতে কিছুই হ'ল না—বরং যেন আরও বেশীরকমের আরাম বোধ ক'রে বেশ বড়গোছের নিশ্বাস ফেলে গুছিয়ে-গাছিয়ে শুলেন উনি। তখন অগত্যা আপৎকালে কোন সহবৎ বা ভব্যতার নিয়মই মানা চলে না এই বলে মনকে প্রবোধ দিয়ে—হজরৎ বড় সাহেবের নাম নিয়ে, গায়ে নয় অবশ্য, পায়ে হাত দিয়েই ঠেলতে লাগল। প্রথম একটু আস্তে, তার পর বেশ জোরে জোরেই নাড়া দিল বারকতক। কারণ বুঝল, ঘুমিয়ে পড়লে বাদশাজাদীতে আর আহীরজাদীতে কোন তফাৎ থাকে না—গ্রাম্য মেয়ে ও রাজধানীর মেয়ে মোটামুটি এক রকমই।

চমকে উঠেছিল মেহের ঠিকই—অন্ধকারে এমন ভাবে ঠেলছে কে, বলিষ্ঠ হাতের পুরুষ-স্পর্শে ভুল হবার নয়—কিন্তু সম্ভবত খুব বেশী ভয় পেয়েছিল বলেই—কিম্বা বহুদিনের জমে থাকা গাঢ় ঘুমের বিহ্বলতা তখনও কাটে নি বলেই, একটা অস্পষ্ট এবং অস্ফুট আওয়াজ ছাড়া কোন শব্দই বেরোল না গলা দিয়ে। পরে আর চেঁচাবার অবকাশ দিল না আগা। মনে মনে দৈবকে ধন্যবাদ দিয়ে সেও প্রায় অস্ফুট-কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমি—আগা মহম্মদ, আপনার নৌকর। মাপ করবেন মালেকান, বান্দা পায়ে হাত দিতে বাধ্য হ'ল বলে—কিন্তু আর কোন উপায় ছিল না নইলে। এধারে বড় বিপদ, এখনই পালাতে হবে এখান থেকে।'

দয়িতের কণ্ঠস্বর চিনতে ভুল হ'ল না—তা যতই ফিসফিস ক'রে বলুক আর যতই তন্দ্রার আবিলতা আচ্ছন্ন করে থাক ওর মস্তিষ্ক-কোষ। বিপদেও যে এমন আনন্দ আছে এই প্রথম জানল সে। একটা অনাস্বাদিতপূর্ব আবেগে সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হ'ল তার, আগা তাকে স্পর্শ করেছে এই তথ্যটা মাথায় যেতে। একবার ভাবল যে ওর দুটো হাত চেপে ধরে বলে, 'আগা, আমি মেহের—তোমার আশমানের চাঁদ—আমার গায়ে হাত দেওয়াতে কোন অপরাধ হয় নি তোমার, বরং আমিই কৃতার্থ হয়েছি।' কিন্তু সে আবেগ সংযতই করল শেষ পর্যন্ত। কোন কথাই কইল না, কোন প্রশ্নও করল না—বুরখার মধ্য দিয়েই চোখ-মুখ মুছে প্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

এতটা তৎপরতা আশা করে নি আগা। সে নিশ্চিন্ত হ'ল একটু। নিজের খাটিয়াটা নিঃশব্দে সরিয়ে ঘর থেকে বেরোবার জায়গা ক'রে দিল। কিন্তু তার পর উঠানে নেমে বাইরের দরজা খুলতে গিয়ে দেখল চৌধুরী সাহেব পাকা লোক, ওর মতো মূর্খ বা গর্দভ নন—তিনি আটঘাট বেঁধেই কাজ করেছেন। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ, সম্ভবত চাবি দেওয়াই।

এ কথাটা আগেই আন্দাজ করা উচিত ছিল তার। যে এত কাণ্ড করেছে সে কিন্তু ওদের জন্যে দোর খুলে রাখবে না। তবু একবার ছুটে ঘরে ঢুকে দেখল —সেদিকের দরজা খোলা আছে কিনা। তবে ফলাফল তো জানাই—গিয়ে দেখল তাইই। সে দরজাও ওদিক থেকে বন্ধ। ভাগ্যে সে ঘরে শোয় নি, তাহলে ঘর থেকেই বেরোতে পারত না ওরা।

যদি তালা না লাগানো থাকে, শুধু শেকল লাগানো থাকে বাইরের দোরে—তাহ'লে পাঁচিল ডিঙিয়ে বাইরে গিয়ে সে দোর খুলে দিতে পারে, বেগমসাহেবা

বেরোতে পারেন সহজেই। কিন্তু কথাটা মনে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই বাতিল ক'রে দিল সে, চৌধুরী অত বেহুঁশ নন নিশ্চয়ই। মিছিমিছি পরীক্ষা করতে গিয়ে আরও দু-তিন মিনিট সময় নষ্ট। একবার সেই ঝাপ্‌সা আলোতেই দেখে নিল—পাঁচিলটা খুব উঁচু নয়। মাটির পাঁচিল বলেই বোধ হয় হাত চারেকের বেশী উঁচু করতে পারে নি। সে ছুটে গিয়ে নিজের চারপাইটা নিয়ে এসে পাঁচিল ঘেঁষে পেতে দিল, তার ওপর এনে রাখল গুটোনো বিছানাটা। অতঃপর নিজে এক লাফে পাঁচিলে উঠে মেহেরকে ইঙ্গিত করল উঠে পড়তে। হাত ধরতে হবে কিনা, ধরা উচিত কিনা ঠিক বুঝতে না পেরে একটা হাত শুধু আধা-আধি গোছের বাড়িয়ে রাখল খানিকটা।

এ হাত ধরার লোভ হয় বৈকি! তখনও—সেই বিহ্বল অবস্থাতেও লোভ দুর্বার হয়ে ওঠে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে লোভ সম্বরণই ক'রে। নিজেই দু হাতে পাঁচিল ধরে একরকম ক'রে লাফিয়ে উঠে পড়ে।

সেইটুকু দেখার জন্যই অপেক্ষা করছিল আগা। সে এবার তস্করগতিতে লাফিয়ে নিচে পড়ে পাঁচিলের গা-ঘেঁষে হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গীতে পিঠ পেতে বসল। মেহের সঙ্গে সঙ্গেই ইঙ্গিতটা বুঝল, সেও কিছুমাত্র ইতস্তত না ক'রে তার পিঠে পা রেখে নেমে এল ওপর থেকে। তারপর ওরা দুজনেই ছুটল—গন্তব্যদিক দক্ষিণপূর্ব মুখে নয়—উত্তর-পশ্চিম মুখে অর্থাৎ যেদিক থেকে এসেছে ওরা, সেইদিক লক্ষ্য ক'রে। দুশমন যখন খুঁজতে বেরোবে তখন এদিকটার কথা সম্ভবত তাদের মনে পড়বে না, ঐ কারণেই ওটা বাদ দেবে তারা। মেহের অত বুঝল না, কোন্ দিকে যাচ্ছে ওরা তাও জানে না সে—আগা যে আকাশের তারা দেখে দিক ঠিক ক'রে নিল, সেটাও লক্ষ্য করল না, সে শুধু অন্ধভাবে আগাকে অনুসরণ করল। অন্য হিসাবে তার প্রয়োজন নেই—আগার সঙ্গে যাচ্ছে তা-ই যথেষ্ট।

॥ পঁচিশ ॥

আগা ভেবেছিল যে খানিকটা উল্‌টো মুখে গিয়ে সোজা উত্তর দিকে চলে যাবে, তারপর চৌধুরী সাহেবের গ্রামকে বহু দূরে রেখে প্রদক্ষিণ করার মতো ঘুরে আবার নিজেদের পথ ধরবে। না হয় একটু ঘুর হবে, না হয় একদিনের চলাটা বাজে খরচা হবে—তা হোক, তবু নিরাপদে যেতে পারবে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র ছিল না। কিন্তু খানিকটা চলার পরই নিজের ভুল বুঝতে পারল। কাল রাত থেকেই—বার বার সে চৌধুরী সাহেবের বুদ্ধি, দূরদৃষ্টি ও সংগঠনশক্তিকে ছোট ক'রে দেখছে, তার নিজের বুদ্ধির মাপে চৌধুরীকে মাপতে যাচ্ছে! সে যা ভাববে চৌধুরী তা আগেই ভেবে নিয়ে তার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন!

একেবারে প্রথমে অতটা বুঝতে পারে নি। হেঁটে যাওয়া ছাড়া গতি নেই, আর শাহ্‌জাদী একেবারেই হাঁটায় অনভ্যস্ত। সেজন্য খুব অসুবিধা হচ্ছিল। অল্প পথ চলতেই বহুক্ষণ লাগছিল। আগা ভাবছিল একটা ঘোড়া কি খচ্চরের কথা। ঘোড়া এসব গ্রামাঞ্চলে পাওয়া যাবে না, কিন্তু যদি খচ্চরও একটা পাওয়া যেত অন্তত! শাহ্‌জাদীকে তাতে সওয়ার ক'রে সে হেঁটে গেলেও এর চেয়ে ঢের তাড়াতাড়ি যেতে পারত। একটা খচ্চরের দাম খুব বেশী হবে না—দশ-বারো টাকা বড় জোর।

ডুলিওলাদের মজুরীর টাকাটা তো তার সঙ্গেই আছে, তা থেকেই কিনতে পারত সে।

কিন্তু তার জন্যে ওরই মধ্যে একটু সম্পন্ন গণ্ডগ্রাম পাওয়া দরকার। জনপদ না পেলে ঘোড়া-খচ্চর যোগাড় হবে না। ওরা প্রায় তিন-চার ঘণ্টা চলে কয়েকটা মাঠ আর একটা ছোট জঙ্গল পেরিয়ে আসতে পেরেছে। তার মধ্যেও বসতে হয়েছে দুবার। শাহ্‌জাদী মুখে কিছু বলেন নি—কিন্তু তার চেয়ে বেশী করেছেন—নিজে নিজেই গাঢ় ছায়া দেখে গাছতলায় বসে পড়েছেন। তখন অগত্যা আগাকেও থামতে হয়েছে। সে সময় তার বিরক্ত মুখের দিকে চেয়ে মেহের হেসেছে মনে মনে খুব। যদি জানত বুরখার মধ্যে কে যাচ্ছে! আগা হয়ত কাঁধে ক'রেই বয়ে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করত!

তবু—সে ছিল বিলম্বের প্রশ্ন। বিপদ বলে বুঝতে পারে নি। সংকটের আভাস পেল প্রথম একটা গ্রামের কাছাকাছি পেণীছে। ভাগ্য ওরা একটু আড়ালে ছিল, সৌভাগ্যক্রমে সেখানটাই একটা আমগাছের সঙ্গে তিন-চারটে খেজুর গাছ মিলে একটা ঝোপের মতো ক'রে রেখেছিল, নইলে ওদের দেখা যেত বহুদূর থেকেই। আর মাঠে তো নেমেই পড়েছিল বলতে গেলে। ছোট মাঠ, সেটা পেরোলেই গ্রাম। কতকগুলো খাপরার ঘর, আর একটা পাকা মন্দির—এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে। ঐগুলোই চোখে পড়েছিল আগার, মাঠের দিকটা অত ভাল ক'রে চেয়ে দেখে নি। সে সোৎসাহেই এগিয়ে যাচ্ছিল, শাহ্‌জাদীর জন্যেই থামতে হ'ল। অনভ্যস্ত পায় কী একটা বড় কাঁটা ফুটে বসে পড়েছে সে—সেই খেজুর ঝোপের কাছটায়—তার আড়ালে। অগত্যা আগাকেও দাঁড়াতে হয়েছে—আর বিশেষ ভাবে কিছু দেখবার না থাকায় ধীরে-সুস্থে সামনের দিকেই তাকাতে হয়েছে। আর তাইতেই সবটা চোখে পড়ে গেল—দৈবাৎ।

অবশ্য খুব সহজে চোখে পড়ার কথা নয়, ওদিকেও গ্রামে ঢোকার মুখটা দুটো বট ও অশ্বত্থ গাছে জড়াজড়ি ক'রে দাঁড়িয়ে বিরাট একটা ছায়া ও আড়াল সৃষ্টি ক'রে রেখেছে। তারই আড়ালে দাঁড়িয়েছিল তারা—লোক দুটো। যদি তারাও উৎসুক কৌতূহলে একটু বেরিয়ে এসে এদিকটায় না তাকাত, তাহ'লে আগা দেখতেই পেত না একদম। এখন দেখতে পেল। দুজন ষণ্ডাগোছের জোয়ান লোক, দুজনেরই হাতে বিরাট লাঠি। তার মধ্যে একজনের মুখটা চেনাচেনা লাগল আগার। কিছু পরেই মনে পড়ল—কাল ঐ লোকটাকেই রাত্রে চৌধুরী সাহেবের বাড়ি ঘোরাফেরা করতে দেখেছে, ইঁদারা থেকে জল তুলে ডাবা ভর্তি করেছিল এই লোকই।

দুটো লোক এমন কিছু নয়। এখান থেকেই পিস্তলের গুলি চালিয়ে শেষ করতে পারে আগা। সামনে পড়লেও ক্ষতি নেই। ওদের হাতের লাঠিই ওদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ওদের মাথা ফাটাতে পারে সে। কিন্তু ভয় জানাজানির।

এ দুজনের পিছনে আর কেউ আছে কি না তারই বা ঠিক কি? তা না থাকলেও, গ্রামের আর কোন লোকের সঙ্গে চৌধুরীর যোগাযোগ আছে কি না তাই বা কে জানে। জানাজানি হয়ে গেলে এবং সে খবর চৌধুরীর কাছে পেণীছলে তাদের গতিবিধির নিশ্চিত খবর পেয়ে যাবে, তখন বহু লোক নিয়ে পিছু নেওয়া বিচিত্র নয়। এখন হয়তো বিবির ফুফেরা ভাইয়ের জন্যে মাথা-ব্যথা আর নেই তার, এখন হয়ত নিজেরই লোভ প্রবল হয়ে উঠেছে। লোভের কারণও নিহাৎ কম নয়—একটি অল্পবয়সী খানদানী ঘরের মেয়ে (সেটা অনুমান করা কঠিন নয় চৌধুরীর

পক্ষে) আর তার সম্ভাব্য জেবর-জহরৎ।

কথাটা তার সম্পূর্ণ ও সুদূর সম্ভাবনা নিয়ে দু-তিন নিমেষের মধ্যে মাথায় খেলে গেল আগার। সে মেহেরের দিকে ফিরে কুণ্ঠিত অথচ দৃঢ় স্বরে বলল, 'মালেকান, এ গ্রামে ঢোকা হবে না। সামনে দুজন দুশমন দাঁড়িয়ে। ও দুজনেই যদি শেষ হ'ত তো ভাবতাম না—কিন্তু মনে হচ্ছে ওদের আড়ালে আরও ঢের লোক আছে।...আপনার অবস্থা বুঝতে পারছি—তবু উপায় নেই, বিশ্রাম আর রুটি মিলতে আরও কিছু দেরি হয়ে যাবে।'

মেহের কথার কোন উত্তর দিল না—কিন্তু তার কণ্ঠ ভেদ ক'রে সামান্য যে স্বরটুকু বেরোল তা কতকটা আর্তনাদের মতোই। কিন্তু সেদিকে কান দিতে গেলে চলে না। এসব বিবেচনার সময় এটা নয়। শাহ্‌জাদীর মর্জির বা সম্মতির অপেক্ষা না ক'রে যথাসম্ভব ছায়ায় ছায়ায় আত্মগোপন ক'রে ফিরে আবার জঙ্গলের মধ্যে গিয়েই ঢুকল আগা। শুধু যেতে যেতে দেখে নিল একবার—শাহ্‌জাদী খোঁড়াতে খোঁড়াতেই তার পিছু পিছু—তারই মতো গুঁড়ি মেরে যতটা সম্ভব সাবধানে আসছেন।

কিন্তু সেদিন তাদের—আর যাই হোক্, সুপ্রভাত হয় নি।

আগা এর মধ্যে একদিন—প্রথম বর্ষার মুখটায়—কিল্লার সামান বুরুজ থেকে দেখেছিল যমুনায় বেড়াজাল ফেলতে। তিন-চারটে নৌকা—মধ্যে ব্যবধান রেখে এপার থেকে ওপার পর্যন্ত টানা জাল ফেলে ক্রমে ক্রমে পরস্পরের নিকটবর্তী হতে লাগল, আর সেই সঙ্গে নদীজোড়া জালও ঘনীভূত হ'তে লাগল একটু একটু করে। বিস্তর মাছ উঠেছিল তাতে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিল আগা, এপার-ওপার-জোড়া জাল এড়িয়ে মাছ পালাতে পারে নি।

সেই বেড়াজালের কথাটাই আজ মনে পড়ল তার। চৌধুরীর আপাতসৌজন্য ও বাহ্য আপ্যায়নের পিছনে যে এতখানি কর্মদক্ষতা দিল তা একটুও বুঝতে পারে নি আগা। নিজের এই একান্ত দুঃখের মধ্যেও তারিফ না ক'রে পারল না সে। আশ্চর্য, এতখানি শক্তি এই সামান্য গ্রামে বসে নষ্ট করছে!! রাজধানীতে গিয়ে বড় কাজ বড় কারবার করা উচিত ছিল।

বেড়াজাল কথাটা এমনি এমনি মনে হয় নি। কারণ তার পরও বিভিন্ন দিক দিয়ে বারবারই বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল তারা, কিন্তু কোনখান দিয়েই বেরোতে পারল না। সর্বত্রই সন্দেহজনক লোক ঘোরাফেরা করছে—দুজন বা তিনজন ক'রে—মোড়গুলো আগলে পাহারা দিচ্ছে। তাদের হাতে নানা আকারের হাতিয়ার—বল্লম, বর্শা, সড়কি। একজনের হাতে একটা দেশী গাদা বন্দুকও দেখা গেল। কোথাও কোথাও দেখা গেল গ্রামের লোকেরাও ভিড় ক'রে তামাশা দেখতে এসে জড়ো হয়েছে—গ্রামে ঢোকবার মুখেই। কে জানে আগাদের নামে কী কুৎসা রটনা করেছে চৌধুরীরা। মেমসাহেবকে নিজের জেনানী সাজিয়ে নিয়ে পালাচ্ছে এমন একটা রটনা ক'রে দেওয়াও অসম্ভব নয় ওদের পক্ষে। কিম্বা হয়ত রটিয়ে দিয়েছে যে এক বেইমান সিপাহী তার সিপাহ্‌সালারের আওরৎ নিয়ে পালাচ্ছে।...এতে গ্রামবাসীকে অর্থে বা অর্থের লোভ দেখিয়ে হাত করা সম্ভব নয়—নিশ্চয় এমনি কোন রটনার সাহায্য নিতে হয়েছে।......

শেষে বেলা দ্বিপ্রহর নাগাদ একেবারেই এলিয়ে পড়ল মেহের। সে আর চলতে

পারছে না, আর পারবে না। চলে চলে শুধু তার পায়ে ব্যথাই হয় নি, বনের পথে চলে পা কেটেও গেছে একাধিক জায়গায়। সেটুকু চোখে দেখতেই পেল আগা। যদি অন্য সম্পর্ক হ'ত—মা বোন বা বুড়ী গোছের কোন আত্মীয়া—তাহ'লে সোজা কাঁধে তুলে নিয়েই চলত সে। ঈশ্বরের দয়ায় এটুকু মেহনৎ বা এই সামান্য ক্ষুৎ-পিপাসা তার কাছে কিছুই নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যে তার হাত-পা বাঁধা!

মেহের আগার সঙ্গে একটাও কথা কয় নি এতাবৎ কাল, দু'একটা হুঁ-হাঁ ছাড়া। এখনও কইল না, শুধু একটা বড় গাছের নিচে ক্লান্ত ভাবে শুয়ে পড়ল। তার ভাবটা বোধ হয় এই যে, মারো আর ধরো, ইংরেজেই ধরুক বা ডাকাতেই ধরুক —সে আর এক পাও নড়তে পারবে না।

এমন ক'রে এলিয়ে পড়তে দেখে প্রথমটা আগার একটু ভয়ই হয়েছিল। মূর্ছাটুর্ছা গেল না তো? কিম্বা আর কিছু—? রীতিমতোই শংকিত হয়ে উঠেছিল সে। এ অবস্থায় তার কী করণীয়—ছুটে যাবে কোথাও কোন সাহায্যের জন্যে বা নিজেই একটু মুখে-মাথায় জল দিয়ে দেখবে—কিছুই ভেবে না পেয়ে মুহূর্তকাল মধ্যে চোখে যেন অন্ধকার দেখেছিল সে। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বুরখার মধ্যেই হাতটা নাড়তে আশ্বস্ত হ'ল কিছুটা। মৃত্যু তো নয়ই, মূর্ছাও নয়। নেহাৎই ক্লান্তি, সকল-দেহ-ভেঙ্গে পড়া ক্লান্তি, আর তার সঙ্গে ক্ষুধা ও পিপাসা।

এখন কি করা উচিত? কোথাও একটা—কারও কাছে ছুটে গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা কিম্বা এ অবস্থার কোন প্রতিকার করার কথাই প্রথম মনে পড়ে—কিছু করতে না পারার জন্যে আত্মধিক্কারেরও অন্ত থাকে না। কিন্তু কিছুই যে করার নেই! কাছে কোথাও একটু জল পর্যন্ত নেই। অনেক সময় জঙ্গলের মধ্যেও ইঁদারা দেখা যায়—গোরু-ছাগল যারা চরায় তাদের কাজে লাগে বলে কাটিয়ে রাখে অনেকে। কিন্তু আজ এই এতটা পথের মধ্যে তাও দেখে নি সে। বর্ষার জল দু-একটা নিচু জমিতে এখনও একটু-আধটু জমে আছে স্থানে স্থানে কিন্তু তার আর পানীয়ত্ব নেই, দুর্গন্ধময় পাঁকে পরিণত হয়েছে তা।

সুতরাং—কী করবে কিছুই ভেবে পেল না। আশপাশে কোথাও একটা কোন ফলের গাছও নজরে পড়ল না যে পেড়ে এনে খেতে দেয়! ফলের সময়ও এটা নয় অবশ্য—দু'একটা নারঙ্গী গাছ যা ফল ধরেছে তা সবই এখনও শিশু, তাতে রসের বাষ্পমাত্র দেখা দেয় নি।

কী করবে ভাবতে ভাবতে কিছুই করা হয়ে ওঠে না। আবারও একটা প্রচণ্ড উষ্মা দেখা দেয় তার মনে। এইসব ননীর পুতুল মেয়েদের নিয়ে এই দুর্গম পথে আসাই ভুল হয়েছে তার। বৃদ্ধ বাদশারও ভীমরতি, আর তিনি জানবেনই বা কি ক'রে—কখনও কি এমনভাবে পথে হেঁটেছেন? আগারই আহাম্মকি হয়েছে তাঁর প্রস্তাবে রাজী হওয়ায়। বেকুবি যতবড়—দুর্ভোগও ততবড় হবে বৈকি।

ক্রোধের প্রচণ্ডতা একটু কমতে শাহ্জাদীর দিকে ফিরে অবশ্য আশ্বস্ত হ'ল খানিকটা। দেখল যে আপাতত আর কিছু করার দরকার হবে না। শাহ্জাদী এইটুকুর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। নিয়মিত নিশ্বাসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে—পিঠের দিক থেকেই দেখছিল সে—সেটাও নিয়মিত ওঠা-নামা করছে। ঘুমের থেকে ক্লান্তিহরা রসায়ন আর নেই—তা আগা জানে। ঘুমিয়েই সুস্থ হয়ে উঠবে কিছুটা। সে নিশ্চিন্ত হ'ল।...বর্তমান সমস্যা থেকেই যে মুক্তি পাওয়া গেল তাই নয়—

ভবিষ্যতেরও অনেকটা সুরাহা হ'ল। ক্ষুধা-তৃষ্ণার কোন সুপ্রতিকার না হ'লেও ঘুম থেকে উঠে আরও খানিকটা যে হাঁটতে পারবেন উনি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এখন কাজ শুধু বসে পাহারা দেওয়া। দাঁড়িয়ে দেওয়াই বোধ হয় উচিত ছিল কিন্তু তা আর পারল না সে। শাহ্‌জাদীর থেকে, প্রয়োজন মতো—তাঁর সম্ভ্রম রক্ষার জন্য যতটা প্রয়োজন—দূরত্ব বজায় রেখে বসেই পড়ল সে। আরও নির্বুদ্ধিতা —পাশের বড় বটগাছটা থেকে এত দূরেও একটা ঝুরি নেমেছে—জাহাজ-বাঁধা কাছির মতো শক্ত ঝুরি—তাইতেই ঠেস দিল একটু। ঘুমোবে না এটা ঠিক—ঘুমোনো উচিত হবে না একেবারেই। চেয়েই রইল। চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল সামনের গাছটার উঁচু ডালে বসে দুটো বানরে উকুন বাছাবাছি করছে, তারও ওপরের একটা ডাল থেকে একটা কাক মধ্যে মধ্যে উড়ে এসে ওদের ঠোকর মেরে পালিয়ে যাচ্ছে, বানরগুলোর দাঁত-খিচুনি কিছুমাত্র গ্রাহ্য না ক'রে—ওদের প্রতিশোধের আয়ত্তের বাইরে।

দৃশ্যটা কৌতুককর তাতে সন্দেহ নেই। বেশ চেয়ে চেয়েই দেখছিল সে। চোখ কান দুই-ই খোলা। মাথার ওপর থেকে একাধিক ঘুঘুর ডাক কানে আসছে, খুব উঁচু দিয়ে কোথায় শঙ্খচিল ডেকে যাচ্ছে তাও শুনতে পাচ্ছে। এরই মধ্যে কখন তার সম্পূর্ণ অগোচরে—বিস্ফারিত দুই চোখে তন্দ্রার আবছায়া ঘনিয়ে এসেছে—তারপর কখন বুজে এসেছে চোখের পাতাও—তা সে একটুও টের পায় নি। একেবারে টের পেল—হঠাৎ বাস্তব পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল—কার যেন একটা কণ্ঠস্বরে। পুরুষেরই কণ্ঠস্বর, কে যেন প্রশ্ন করছে, 'আপনারা কোথায় যাবেন বাবা? আপনারা কি পথ হারিয়ে ফেলেছেন?'

চমকে ধড়মড়িয়ে একেবারে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল আগা। কোমরের পিস্তলেও হাত দিল সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু ভাল ক'রে চোখ চাইবার মতো অবস্থা হ'তে দেখল যে অত বিচলিত হবার কোন কারণ নেই। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এক সৌম্যকান্তি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণ যে তার প্রমাণ—তাঁর খাটো পিরাণ থেকে বেরিয়ে আসা শুভ্র যজ্ঞোপবীত, মাথার শিখা ও ললাটের শ্বেত ও রক্ত-চন্দন চিহ্ন। হাতে কোন অস্ত্র নেই—এমন কি একটা লাঠিও না। আছে যা তা হ'চ্ছ একটা মাঝারি আকারের বেতের সাজি—তাতে ফুল নয়—পাতালতা গোছের কী সব জিনিস।

ওদের ঐ চমকে ওঠা এবং ভীতি-বিহ্বলতা লক্ষ্য করলেন তিনি। ইতিমধ্যে বুরখা পরা মেয়েটিও চমকে কেঁপে উঠে বসেছে, বোধ হয় কাঁপছে এখনও। ব্রাহ্মণ একবার দুজনের দিকে তাকিয়ে কোমল কণ্ঠে পুনশ্চ প্রশ্ন করলেন, 'জিজ্ঞাসা করছিলুম—আপনারা কি পথ হারিয়ে ফেলেছেন? কতদূর যাবেন আপনারা? এ যা অরাজক দিনকাল, আপনাদের মতো এমন নওজোয়ান ছেলেমেয়েদের এভাবে একা বেরুনো ঠিক হয় নি।'

তবুও ঠিক যেন অস্বস্তি ভাবটা কাটতে চায় না আগার। তার ঘুম এবার নিঃশেষে ছুটে গিয়েছে—নিজের নির্বুদ্ধিতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য নিজেকে মনে মনে অভিসম্পাৎ করছে সে।

ব্রাহ্মণ বোধ করি ওদের মনের ভাব বুঝলেন। একটু মিষ্টি হেসে বললেন, 'আমি ব্রাহ্মণ—কিন্তু বৈদ্যের কাজ করি। ঠিক কবিরাজী করি না, কবিরাজদের ওষুধ করার মাল-মশলা পাতালতা গুলঞ্চ যোগাড় ক'রে দিই। এই-ই আমার ব্যবসা। ব্রাহ্মণের ব্যবসা করা উচিত নয় অবশ্য, কিন্তু কী করি—ঘোর কলিকাল, পূজাপাঠে দিন চলে না, পূজাপাঠের নামে বড় বড় লোকের মোসাহেবী—নয়তো তন্ত্রমন্ত্রের নামে

লোক ঠকানো—ব্রাহ্মণের এই দু-দোর খোলা এখন। তা ও কোনটাতেই আমার প্রবৃত্তি হয় নি—তাই এই স্বাধীন ব্যবসা ধরেছি। নির্দোষ ব্যবসা—লোকের প্রাণ-রক্ষাতেও লাগে খানিকটা তো।... আমার গাঁ হ'ল নদীর ওপারে কিন্তু মাল বেশীর ভাগ এই জঙ্গল থেকেই যোগাড় করতে হয় বলে এপারে একটা ছোট কুটির তৈরী ক'রে রেখেছি। আমার স্ত্রীও আছেন সেখানে, যদি আপত্তি না থাকে তো আমার কুটিরে চলুন—যা জোটে একটু কিছু মুখে দিয়ে ওখানেই একটু বিশ্রাম করবেন। আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে খুবই পরিশ্রান্ত—আর, বোধ হয় তেমন কিছু পেটেও পড়ে নি সকাল থেকে।...আমার অবশ্য গরীবের সংসার, তেমন কিছুই খাওয়াতে পারব না—এ বাবলার জঙ্গলে মেলেও না তো কিছু, যা হয় উঠোনে দুটো সব্জী লাগাই আর দুটো ভঁইস রেখেছি দুধ-ঘিটা পাওয়া যায়। বাকী সব মাসে একদিন ক'রে আনিয়ে নিই ওপার থেকে। তাইতেই চলে। তবু—একটু দুধ আর দুখানা চাপাটি তো দিতে পারব, আরাম করার জন্যে দুটো চারপাইও মিলবে।...দয়া করে আমার ওখানেই চলুন।'

প্রলোভন বড়ই বেশী। প্রয়োজনও। হয়ত এছাড়া প্রাণরক্ষার আর কোন উপায় নেই। হয়ত দৈব-প্রেরিত হয়েই এসে পড়েছেন বৃদ্ধ। তবু...ভয়ও তো বড় কম নয়। কে জানে এই মিষ্টভাষী ভদ্র স্নেহকোমল মুখোশটার অন্তরালে কোন্ শয়তান আত্মগোপন ক'রে আছে! কে জানে সেই চৌধুরীরই কোন চর কিনা, আশার আলোয় ভুলিয়ে নিয়ে যেতে চায়! প্রথমটায় তারও তো সৌজন্য বদান্যতা ও সহৃদয় ব্যবহারে কোন ত্রুটি দেখে নি আগা।

অথচ—আর কীই বা করা যেতে পারে! কে জানে এই অরণ্যে এমন ফাঁদে-পড়া খরগোশের মতো কতদিন আত্মগোপন ক'রে থাকতে হবে। কী খেয়েই বা থাকবে। শেষ পর্যন্ত হয়ত উপবাস ক'রে—এমন কি জলের অভাবেই শুকিয়ে মরতে হবে ওদের—

আগা বিপন্নমুখে বুরখাঢাকা মানুষটার দিকে তাকায়। হোক না মেয়েছেলে, একটা সামান্য বুদ্ধিও কি নেই! পরামর্শ দেবার মতো ক্ষমতা হয়তো নেই—ধনীর দুলালী মেয়ের কাছ থেকে অতটা আশাও করে না আগা—কিন্তু একটা যে-কোন রকম কথাও তো তুলতে পারে। অনেক সময় অপরের যুক্তিহীন কথা থেকে নিজের মাথায় বুদ্ধি বা যুক্তি খেলে যায়—আপাত-অর্থহীন বা মূল্যহীন কোন শব্দের সূত্র ধরেই। কী এমন আভিজাত্য ওঁর যে এই বিপদের দিনেও একটা কথা কওয়া যায় না? আর যাই হোক, সে তো একেবারে সাধারণ নৌকরও নয়!...

বেশী ভাববারও সময় নেই আর। বৃদ্ধ বারবারই নিজে সেধে সেধে কথা কইছেন, যেচে উপকার—সাধারণ উপকারও নয়, প্রাণরক্ষা করতে চাইছেন—এর পর জবাব না দেওয়া ঘোরতর অভদ্রতা—অকৃতজ্ঞতাও।

সে এক সময় মরীয়া হয়েই বলল, 'দেখুন, আমরা কাল থেকে এক গুণ্ডার পাল্লায় পড়েছি, চারিদিকে তাদের লোক, আমাদের ফাঁদে ফেলতে চাইছে। আপনি যে সেই দুশমনেরই লোক নন—কী করে বুঝব?'

ব্রাহ্মণ পিরাণের মধ্য থেকে উপবীতটা বার ক'রে হাতে জড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'আমি এই জেনেউ হাতে নিয়ে বলছি, কোন বদ মতলব আমার নেই। আমি অপর কোন লোকের কাছ থেকে কিছু শুনি নি বা কেউ আমাকে পাঠায়ও নি। যদি বদমাইশ গুণ্ডার পাল্লায় পড়ে থাকো—এখান থেকে বেরোনো মুশকিল হয়ে থাকে,

তাহ'লে আরও আমার বাড়ি যাওয়া সুবিধা, নদীর কাছাকাছি আমার ঘর—আজই সন্ধ্যের সময় ওপার থেকে গেঁহু চানা গুড় নিয়ে নৌকো আসবে, রাত্রেই ফিরবে আবার। যাবার সময়ও এইসব গাছ-গাছড়া নিয়ে যাবে থলে বোঝাই ক'রে। আমার নিজস্ব নৌকো, সেই নৌকোতে তুলে দিলে নিরাপদে পার হয়ে যেতে পারবে। নৌকো গিয়ে লাগে আমার বাড়ির ঘাটে, সেখানে কেউ অত রাত্রে দেখতেও পাবে না। দেখলেও ভাববে আমার লোক।'

তারপর একটু থেমে, কেমন একরকম যেন একটু ঝোঁক দিয়ে বললেন, 'না না। বাবা, তোমরা নির্ভয়ে এসো। বুড়োমানুষ, তোমরা আমার ছেলেমেয়ের মতো। তোমাদের ঠকাব—এমন কখনও ভেবো না। আহা, ছেলেমানুষ, উপবাস করা অভ্যাস নেই—নিশ্চয় খুব কাতর হয়ে পড়েছ। চলো চলো, যাহোক কিছু মুখে দিয়ে সুস্থ হবে—'

তবু হয়তো আগা মন ঠিক করতে পারত না তখনই, কিন্তু সে রীতিমতো বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখল শাহ্‌জাদী ইতিমধ্যেই উঠে দাঁড়িয়েছেন। যার জন্য আশঙ্কা ও সন্দেহ, এত সতর্কতা—সে-ই যদি সে চিন্তা না করে তবে আগার কি? সে একটা নিশ্বাস ফেলে নীরবেই ব্রাহ্মণের অনুসরণ করল। কিন্তু হাত দুই গিয়েই থমকে দাঁড়াল আবার, 'আপনি তো ব্রাহ্মণ বলছেন, হিন্দু—আমরা কিন্তু মুসলমান! সেটা ভেবে দেখুন—'

'ভেবে দেখা হয়ে গেছে বাবা, তোমরা যে মুসলমান তা কি চিনতে পারি নি! অতিথি নারায়ণ, আমরা তাই জানি। এর চেয়ে বেশী কিছু ভাববার বা জানবার প্রয়োজন নেই।'

আর কিছু বলল না আগা, বলে লাভও নেই আর কিছু। এ তবু বাঁচবার একটা ক্ষীণ আশা রইল, অন্যথায় শুকিয়ে মরাটাই তো ধ্রুব হয়ে আসছিল।

যে নির্গমনের পথ জানে না তার পক্ষে ভুলভুলাইয়ায় ঢোকা যেমন—বার বার সে পথের সামনে দিয়ে যায় তবু বেরোতে পারে না—আগাদের অবস্থাও দেখা গেল এতক্ষণ তেমনিই হয়ে ছিল। মনে হয়েছিল এ অরণ্য অনন্ত এবং যে কটি নির্গমনের পথ তার সব কটিতেই দুশমনে পাহারা দিচ্ছে। হয়তো সেটা একদিক দিয়ে ঠিক, কারণ ব্রাহ্মণ পথ দেখিয়ে যেখানে নিয়ে এলেন ওদের, সেটা ঠিক কোন প্রবেশ বা নির্গমন-পথ নয়। আগার বিস্ময়ের কারণ হ'ল পথের সংক্ষিপ্ততা। সামান্যই হাঁটল ওরা, এমন কি ক্ষতবিক্ষতপদ মেহেরেরও হাঁটাটা খুব বেশী বোধ হ'ল না। পথ বলা তাকে ঠিক যায় না অবশ্য, অতি সূক্ষ্ম গোছের একটা পায়ে চলার দাগ—তাও প্রায় লুপ্তই—অর্থাৎ যে পথে কদাচিৎ কেউ হাঁটে—সেইখান দিয়েই নিয়ে গেলেন বৃদ্ধ এবং সামান্য একটু গিয়েই ওরা তাঁর বাড়িতে পৌঁছল।

যেখানে এসে পড়ল তারা—সেটা একটা নদীর ধার। সদ্য-সমাপ্ত বর্ষার জলে নদী দুরবগাহ। সেখানে কোন ঘাট নেই, ফেরি তো নেই-ই। সেই জন্যেই সেখানে কোন পাহারা বসানোর প্রয়োজন আছে বলে বুঝতে পারে নি চৌধুরী। বরং একটা মাটির উঁচু ঢিপির মতো টিলা আছে—সে জন্যেও, সেখানটা দিয়ে যাতায়াতের কথা কেউ চিন্তা করে না।

সেই টিলার গায়েই নেকনারায়ণ বেদাধ্যায়ীর বাড়ি। বৃদ্ধ আসতে আসতে নিজেই নাম ও পিতৃপরিচয় বলেছেন। তাঁদের উপাধি ছিল শাস্ত্রী; তাঁর বাবা

চতুর্বেদে পরীক্ষা দিয়ে বেদাধ্যায়ী উপাধি পেয়েছিলেন। সেই উপাধিই চলছে—কিন্তু বাবার পক্ষে যেটা গৌরবের ছিল সন্তানদের পক্ষে সেইটেই লজ্জার কারণ হয়েছে। ভাবছেনও বেদাধ্যায়ী শাস্ত্রী সবকিছু ছেড়ে দিয়ে সোজাসুজি শর্মা পদবীতে পরিচয় দেবেন অতঃপর। তাতে অত সরমের কোন কারণ নেই।

তিনি 'লিখাপঢ়ি' বিশেষ শেখেন নি। ছেলেবেলায় ভাল লাগত না। ঘরে বসে পুঁথি পড়ার চেয়ে চিরদিন বনে-জঙ্গলে গাছপালার মধ্যে ঘুরে বেড়াতেই ভাল লাগত তাঁর, আজও লাগে। হয়ত ভগবান তাঁর নৌকর নেকনারায়ণকে দিয়ে এই কাজ করাবেন বলেই মতিগতিও এই রকম দিয়েছেন। অবশ্য লেখাপড়া করেন নি বলে এখন খুব আপসোস তাঁর। টোলে পড়েছেন কিছুকাল—উপাধিও দুটো একটা পেতে পারতেন অনায়াসে—কিন্তু তখন এ জিনিসের মূল্যই অত বোঝেন নি আসলে। ইত্যাদি, ইত্যাদি—

নেকনারায়ণ যেখানে বাস করেন সেটাকে বাড়ি বললে সত্যের অপলাপই করা হয়। মিথ্যা বিনয় করেন নি, সত্যিই সেটা কুটির। তিনচারখানা ঘর, গোশালা, রসুইঘর—সবই আছে কিন্তু সে সবই পাতা-লতার ওপর মাটিলেপা দেওয়াল এবং খাপরার চালা। তবে চালাই হোক আর মাটির ঘরই হোক—বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দেওয়াল দাওয়া নিকোনো ঝকঝক করছে। নদীর কাছেই বাড়ি, এখান থেকে ওপারে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায় কিন্তু টিলাটা থাকার দরুণ এ বাড়িটা হয়ত তেমন নজরে পড়ে না ওপারের গ্রাম থেকে।

বাড়ির কাছাকাছি পেঁাছে নেকনারায়ণ একটু জোরেই পা চালালেন। আগে বাড়িতে ঢুকে সম্ভবত গৃহিণীকেই খবর দিলেন তাড়াতাড়ি—কারণ দেখা গেল যে ওরা বাড়ি পর্যন্ত পেঁাছতেই সে ভদ্রমহিলা দীর্ঘ ঘোমটায় মুখ ঢেকে বেরিয়ে এসে, সাদরে, একরকম দূর-প্রত্যাগত আত্মীয়ার মতোই শাহ্জাদীকে জড়িয়ে ধরে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

নেকনারায়ণ আগাকে এনে নিজের ঘরে বসালেন। এটি তাঁর শয়নকক্ষও বটে, বৈঠকখানাও বটে। কারণ এর বাইরের দিকেও যেমন একটা দোর আছে (বেশ মজবুত গুলি-লাগানো কাঠের পাল্লা) তেমনি ভেতরের দিকে অর্থাৎ পাশের ঘরে যাবার মতো একটা আগড়ের দরজা আছে। এ ঘরে নেকনারায়ণের নিজের বিছানা ছাড়াও বাড়তি একটা চারপাইতে 'দরি' বা শতরঞ্জি বিছানোই ছিল, হয়ত এটা অতিথি-অভ্যাগত বা কর্মচারীদের জন্যই রাখা আছে—আগাকে সেই চারপাইতে বসতে বলে নিজেই গিয়ে একটা পিতলের লোটায় জল এবং নতুন গামছা এনে দিলেন মুখ হাত ধোবার জন্যে। 'তামাকু'-সাজা বা কাঁচা কোনটা চলে কিনা প্রশ্ন করলেন, তার পর নিজেরই একটা 'তাকিয়া' বা বালিশ এগিয়ে দিয়ে নিঃসঙ্কোচে 'আরাম' করবার অনুরোধ জানিয়ে ভেতরে চলে গেলেন আতিথেয়তার অন্য বন্দোবস্ত করতে।

বলা বাহুল্য, সেদিকেও কোন ত্রুটি হ'ল না। বর্তন বাসন দিলেন না অবশ্য, কিন্তু বিচিত্র-কৌশলে পলাশ না কি এক রকম চওড়া পাতা দিয়ে বাটি তৈরী ক'রে তাতেই ডাল পায়স প্রভৃতি এমন ভাবে সাজিয়ে দিলেন নেকনারায়ণের ব্রাহ্মণী যে, কোন অসুবিধাই হ'ল না ওদের। খাদ্য সামান্য হ'লেও রুচিকর—বহুদিন পরে ঘি-মাখানো ফুলকা, ঘন অড়হরের ডাল এবং কাঁকনি-দানার সুস্বাদু পায়েস খেয়ে মুখ যেন জুড়িয়ে গেল আগার। ফলে খাওয়ার পরিমাণটা একটু বেশী হয়ে গেল—এবং খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুই চোখ জড়িয়ে এল ঘুমে। সতর্কতা, সন্দেহ

ভবিষ্যতের চিন্তা—সব কিছু সে ঘুমের অতলে কোথায় মিশে তলিয়ে গেল, দেখতে দেখতে সর্ব-সন্তাপহারা গাঢ় নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়ল সে।

একেবারে তার ঘুম ভাঙল অপরাহ্ণও পেরিয়ে যাবার পর—সন্ধ্যার মাত্র কিছুক্ষণ আগে। আর সে ঘুম ভাঙার উপলক্ষটাও বড় অদ্ভুত। মনে হ'ল কে যেন তাকে নাম ধরে ডাকছে। বেশ যেন স্পষ্ট শুনতে পেল আগা ডাকটা। আর সেই গাঢ় ঘুমের মধ্যেও—সম্ভবত স্বপ্নের মধ্যেই—তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। এখানে তাকে কে ডাকবে নাম ধরে—তার নাম জানবেই বা কে? বেদাধ্যায়ীজী—আগা বার বার সে জন্য তারিফ করেছে তাঁকে মনে মনে—একবারও তাদের নাম-ধাম-পরিচয় বা গন্তব্য-স্থান জিজ্ঞাসা করেন নি। এসব গ্রামাঞ্চলে এ ধরণের সৌজন্য আশাতীত। তবে তার নাম ধরবে কে? শাহ্‌জাদীও তার নাম জানেন না নিশ্চয়, তবে?......

ঘুমের মধ্যেই এইসব ভাবছে সে। ঘুমের মধ্যেই যে ভাবছে তাও যেন জানে। অথচ ডাকটাও খুব স্পষ্ট! অবশেষে এক সময় তাকে মনে মনে স্বীকার করতে হ'ল যে ঘুমটা আর তার আগের মতো খুব গাঢ় নেই এবং ডাকটা সে স্বপ্নেও শুনছে না, সত্যিই কেউ নাম ধরে ডাকছে তাকে! তখন কিছুটা ভয়ে এবং কিছুটা বিস্ময়ে চমকে চোখ মেলে তাকাল সে, ধড়মড় ক'রে চারপাইতে উঠে বসল। কিন্তু চোখ চেয়ে যে মানুষটাকে প্রথম নজরে পড়ল, সম্ভবত যিনি নাম ধরে ডাকছিলেন এতক্ষণ, তাঁকে দেখে একেবারে পাথর হয়ে গেল। বিস্মিত হবার বা বিস্ময় প্রকাশ করার পর্যন্ত শক্তি রইল না।

লীসন মেম! লীসন মেম দাঁড়িয়ে তার সামনে!

লীসন মেমই তাহ'লে তাকে নাম ধরে ডাকছিলেন নিশ্চয়।

লীসন মেম, অথচ ঠিক যেন লীসন মেমও নয়। অন্তত মেম তাঁকে বলা যায় না আর কোন মতেই। তিনি দিব্যি হিন্দুস্থানী ধরণের শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছেন, শুধু বেদাধ্যায়ীজীর স্ত্রীর মতো সুদীর্ঘ 'ঘুঙট'টাই যা নেই কপালে।......

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটতেই শুরু হ'ল উভয় পক্ষের অজস্র অসংখ্য প্রশ্ন। উভয়েরই কৌতূহলের শেষ নেই। সেই সমগ্র কৌতূহলটাই যেন প্রশ্নের আকারে বেরিয়ে আসতে লাগল অজস্র ধারায়। প্রশ্নবাণ নয়—কারণ কোন পক্ষেই কাউকে বিদ্ধ করার চেষ্টা নেই—একে প্রশ্নবন্যা বলাই উচিত হয়ত।

প্রথম উত্তর দিতে হ'ল আগাকেই। সে সংক্ষেপে, তার সঙ্গিনীর আসল পরিচয় এবং প্রায়-নিরুদ্দেশ যাত্রার উদ্দেশ্য ও কারণ এড়িয়ে গিয়ে, জানিয়ে দিল যে সে নিতান্ত কর্তব্যপালনের জন্যই, মনিব কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে এক অপরিচিত ভদ্র-মহিলাকে নিয়ে তাঁর আত্মীয়-বাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছে। কাকে নিয়ে যাচ্ছে তা সে একেবারেই জানে না, তাঁর মুখ পর্যন্ত দেখে নি। সাধারণ বিপদ যা তা তো আছেই—আরও বহু উটকো বিপদ এসে পড়েছে। মীরমর্দান খাঁর নামটা বাদ দিয়ে চৌধুরীর কথা, ডুলিওলাদের অন্তর্ধান এবং আজ সকাল থেকে চৌধুরীর জাল ছিন্ন করার ব্যর্থ চেষ্টা—সবই খুলে বলল সে। আর সেই প্রসঙ্গেই শুনল সে এঁরা শাহ্‌জাদীকে ভেবেছেন আগার স্ত্রী এবং নবোঢ়া দুলহীনের মতোই আদর-যত্ন করছেন তাঁকে—সেই মতো কিছু কিছু ঠাট্টা-তামাশাও করছেন ভদ্রমহিলা।

কথাটা শুনে লজ্জায় আগার কানমাথা গরম হয়ে উঠল। ছি, ছি, কী না জানি ভাবছেন শাহ্‌জাদী নুরুন্নেসা। হয়ত এটাকে রটনার ফল এবং সে রটনার জন্য

আগাকেই দায়ী করছেন মনে মনে। সে বেশ একটু সরবেই প্রতিবাদ করে উঠল এবং সেই প্রতিবাদের ঝোঁকে বলে ফেলল যে তার সঙ্গে যিনি যাচ্ছেন তিনি মুঘল রাজবংশের কন্যা, কোন অজ্ঞাতনামী শাহ্‌জাদী। বলার সঙ্গে সঙ্গেই অনুতপ্ত হয়ে উঠল অবশ্য—কিন্তু তখন বলা হয়েই গেছে, আর উপায় কি?

অবশ্য মিসেস লীসনের সেদিকে বিশেষ কান ছিল না। তিনিও তাঁর কাহিনী শোনাতে চান! এতদিন কাউকে বলতে না পেরেই বুঝি হাঁপিয়ে উঠেছিলেন! বিশেষ আগার সঙ্গে যে আর জীবনে দেখা হবে তা কল্পনাও করতে পারেন নি।

সে রাত্রির কথা বলতে বলতে—ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মতো সে স্মৃতি মনে পড়ে গিয়ে—এতদিন পরেও ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললেন তিনি। স্বামীপুত্র আত্মীয়-স্বজন সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এ তাঁর কী বেঁচে থাকা! সম্ভবত কেউই তারা নেই আর (সোৎসুক ভাবে আজও বারে বারে প্রশ্ন করলেন আগাকে—তার স্বামীর খবর কিছু জানে কি না, বা জেনেছে, কিনা! আজও নিষ্ঠুর সত্যটা এড়িয়ে গেল আগা)—থাকলেও আর কি কোনদিন তাদের সঙ্গে মিলিত হ'তে পারবেন, দেখা পাবেন তাদের? চিরকালের মতোই তাঁর জীবন থেকে হারিয়ে গেল তারা—সেই সঙ্গে তাঁর জীবনের যা কিছু আনন্দ, যা কিছু সুখ, যা কিছু আশা তাও!......

দুঃখের ও দুঃস্মৃতির প্রাথমিক উচ্ছ্বাসটা প্রশমিত হ'তে গুছিয়ে বলার শক্তি আবার যখন ফিরে পেলেন মিসেস লীসন—তখন ধীরে ধীরে, আনুপূর্বিক সমস্ত ইতিহাসটাই জানতে পারল আগা।

সেই সর্বনাশা রাতে শোকে দুঃখে ভয়ে নৌকোর ওপর আবারও অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন মিসেস লীসন। কোথা দিয়ে রাত কেটেছে, কখন সকাল হয়েছে এবং কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে তাঁকে নৌকোটা—কিছুই টের পান নি। দৈবক্রমেই নৌকোটা ভাসতে ভাসতে পরের দিন দুপুর নাগাদ এই নদীতে এসে পড়ে এবং এই পণ্ডিত-জীর বাড়ির সামনে বালুচরে আটকে যায়। আরও সৌভাগ্য (অথবা দুর্ভাগ্য, এ জীবন বহন ক'রে চলা দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কী—চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন মিসেস লীসন) যে সেই সময়েই পণ্ডিতজী স্নান করতে নদীতে নেমেছিলেন।

নৌকোটা দেখে উনি প্রথমটা ভেবেছিলেন খালি নৌকো কারও, নোঙরের কাছি ছিঁড়ে ভেসে এসেছে—কিন্তু তার পরই পোশাকের প্রান্তটা চোখে পড়ে গিয়েছিল। তখন তাড়াতাড়ি কাছে এসে ওঁকে দেখতে পান। তাও, তখনও, জীবিত ভাবতে পারেন নি একবারও, ভেবেছিলেন কেউ খুন ক'রে লাশটা গোপন করার জন্য নৌকো ক'রে ভাসিয়ে দিয়েছে। আর এই ধরণের অনুমানের কারণ—ওঁর পোশাকে রক্তের চিহ্ন।

ভাসিয়েই দিচ্ছিলেন নৌকো—আবার ঠেলে দিচ্ছিলেন জলে—হঠাৎ কী ক'রে নজরে পড়ে যায়, বুকের কাছটা ঈষৎ একটু ওঠা-নামা করছে, অর্থাৎ নিশ্বাস পড়ছে। তখন নৌকোটা ঠেলে জলে নামিয়ে জলের মধ্যে দিয়েই টেনে ঘাটে নিয়ে এসেছিলেন। তারপর স্ত্রীকে ডেকে দুজনে মিলে ধরাধরি ক'রে নামিয়ে ঘরে এনে মুখে-হাতে জল দিয়ে বাতাস ক'রে—এবং সেই সঙ্গে একটু গরম দুধ খাইয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনেন।

তখনও সেই রবিবারের পৈশাচিক ঘটনাবলীর কথা কিছু জানতেন না পণ্ডিতজী, এতদূরে এই নিভৃত অরণ্যের অন্তরালে ওঁর শান্তজীবনে সে সংবাদের তরঙ্গাভিঘাত পৌঁছয় নি। মিসেস লীসনের মুখে শুনে প্রথমটা বিশ্বাসও করতে পারেন নি তাই। পরে যখন বুঝলেন মেমসাহেব সত্যি কথাই বলছেন তখন শিউরে উঠলেন

দুজনে। বেদাধ্যায়ীজীর স্ত্রী তো ঝরঝর ক'রে কেঁদেই ফেললেন শুনতে শুনতে—পণ্ডিতজীরও চক্ষু সজল হয়ে উঠল। তাঁরই কজন দেশবাসীর এই অপরাধে যেন তাঁরই কুণ্ঠা ও গ্লানির সীমা রইল না। বার বার তিনি মেমসাহেবের কাছে ও নিজের ইষ্টের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। তারপর বললেন, 'মা, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার এ সন্তানের কাছে থাকো—যতদিন না এ গদর মিটে যায়, দাঙ্গা-মারামারি থামে। কোথাও তোমাকে যেতে দেব না, কোথাও যাবার চেষ্টাও করো না তুমি, এই নির্জন বনই তোমার পক্ষে সব চেয়ে নিরাপদ আশ্রয়।'

মিসেস লীসন আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন পণ্ডিতজীর এই মহত্বে। তিনি বিদেশিনী, ক্রীশ্চান, বিধর্মী—ইনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণ—সে তথ্যটা স্মরণ করিয়ে দেবারও চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পণ্ডিতজী সেসব কথা তুলতেই দেন নি। বলে-ছিলেন, 'অতিথি অভ্যাগত আশ্রয়প্রার্থী বিপন্ন—এঁদের কোন জাতই নেই মা, তাঁদের সেবা ইষ্ট-দেবতারই সেবা।'

তবু মিসেস লীসন অনির্দিষ্ট কালের জন্য এইভাবে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে রাজী হন নি! প্রথম বেশ হাঁকড়-পাঁকড় করেছিলেন, চেষ্টা করেছিলেন এখান থেকে বেরিয়ে কোনমতে একটা নিরাপদ ইংরাজ-আশ্রয়ে পেঁছিবার, কলকাতার দিকে রওনা দেবার—তারপর ক্রমশঃ শান্ত হয়ে এলেন, নিজের নির্বুদ্ধিতা নিজের কাছেই ধরা পড়ল। বহু দুঃখে বুঝলেন যে ভাগ্যের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই তাঁর, কোন দিকে কোন পথ খোলা নেই। যদি নিরাপদে থাকেন তো এই দেবদূতের মতো লোকটির আশ্রয়েই থাকতে পারবেন, এই মাটির চারটি দেওয়ালের বাইরে আর কোথাও কোন আশ্রয় নেই তাঁর আজ।

না, প্রাণের মায়া ছিল না তাঁর, মরতে সহজেই পারতেন—কিন্তু প্রাণের চেয়েও প্রিয় ও রক্ষণীয় কোন বস্তু আছে মানুষের কাছে, বিশেষ মেয়েমানুষের কাছে—তা হ'ল ইজ্জৎ। আরও সেইটে খোয়াবার ভয়েই তিনি—এদের অসুবিধা ও বিপদ ঘটাচ্ছেন জেনেও—এখান থেকে আর কোথাও যাবার চেষ্টা একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলেন।......

তাই কি, এই লোকালয়ের বাইরে, এই অরণ্যের মধ্যে লুকিয়ে থেকেও পরিত্রাণ পেয়েছিলেন সম্পূর্ণ? বিপদ এ পর্যন্তও ধাওয়া করছিল। বোধ হয় পণ্ডিত-জীর রসদ নিয়ে আসে যে 'নাও-ওলারা'—তারাই গিয়ে খবরটা দিয়েছিল যে পণ্ডিতজীর কোঠিতে এক অপরিচিত স্ত্রীলোক এসে আছে—আর তার গাত্রবর্ণ অসম্ভব রকমের সাদা। অবশ্য ও'র সেই এখানে এসে পেঁছিবার দিনই ও'র রক্তমাখা পোশাক জলে ভাসিয়ে দিয়ে শাড়ি পরার ব্যবস্থা করেছিলেন পণ্ডিতজী, ঘোমটা দেওয়ার অভ্যাস করিয়েছিলেন বকে-ঝকে. কিন্তু পা দুটো যে শাড়ির তলা থেকে বেরিয়ে থাকে অতটা লক্ষ্য করেন নি। মল পরাবার কথাও মনে পড়ে নি তাঁদের কারও।

সেই নিরলঙ্কার শুভ্র চরণযুগলের সংবাদ পেয়ে তাই প্রথমেই যে অনুমান করা স্বাভাবিক তারা সেই অনুমানই করেছিল। পণ্ডিতজীর নিজের গ্রাম থেকে, তার পাশের গ্রাম থেকে এবং এপারেও—আশপাশের তিন-চারখানা গ্রাম থেকে প্রায় শতাধিক লাঠিয়াল এসে হাজির হয়েছিল। পণ্ডিতজী নাকি এক ক্রেস্তান মেমকে ঘরে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন? এ কী অনাচার হিন্দু ব্রাহ্মণের ঘরে! ছি ছি, এ কী পাপ!......এ তারা কিছুতেই বরদাস্ত করবে না! মেয়েছেলেটাকে তো বার করে

দিতেই হবে এখনি, তা ছাড়াও প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বেদাধ্যায়ীজীকে। এই তাদের পাঁচখানা গ্রামের—গ্রাম-সমাজের হুকুম।

সেইদিন মিসেস লীসন দেখেছিলেন, কী আশ্চর্য জোর পণ্ডিতজীর মনের ওপর, স্নায়ুর ওপর—আর মুখের মাংসপেশীর ওপর। অবশ্য উনি আগেই একটু আঁচ করেছিলেন, সেজন্য হয়তো খানিকটা প্রস্তুতও ছিলেন। আগের দিন ওঁর নৌকোওলা রামবিরীছকে কেবল ঘুরে ফিরে মেমসাহেবের পায়ের দিকে তাকাতে দেখেই তিনি তার মনোভাবটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। তাই সেদিন রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীর মল খুলিয়ে মিসেস লীসনকে পরতে দিয়েছিলেন। মিসেস লীসন প্রথমটা ঘোরতর বিদ্রোহ করেছিলেন, কিছুতেই পরতে চান নি। কিম্ভূতকিমাকার গহনাটা পরতে ভারী হাসি পেয়েছিল তাঁর—লজ্জাও করছিল। অকারণে এ বিড়ম্বনা পোয়াতে যাবেন কেন—এ প্রশ্নও করেছিলেন, কিন্তু পণ্ডিতজী উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে একরকম বকে-ধমকেই পরিয়েছিলেন বলতে গেলে। পাছে উনি ভয় পান বলে আসল কারণটা কিছুতেই খুলে বলতে পারেন নি বেচারী, ফলে তাঁর আচরণটা একটু দুর্বোধ্যই ঠেকেছিল মিসেস লীসনের কাছে—অভদ্র খেয়াল মনে ক'রে শেষ অবধি একটু বিরক্তই হয়েছিলেন তিনি।

তবু—যতই প্রস্তুত থাকুন পণ্ডিতজী—ঠিক এতটা ভাবতে পারেন নি। আক্রমণটা এত তাড়াতাড়ি এসে পড়বে তা তিনি আশঙ্কা করেন নি। কিন্তু এত দ্রুত এবং এত অতর্কিত এসে পড়া সত্ত্বেও তিনি বিচলিতও হন নি বিন্দুমাত্র। মুখের একটা শিরাও কাঁপে নি ওঁর। বরং কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই উচ্চহাস্যে ফেটে পড়েছিলেন যেন। সবাইকে বিস্মিত শঙ্কিত ক'রে বহুক্ষণ ধরে হেসেছিলেন পণ্ডিত নেকনারায়ণ বেদাধ্যায়ী। তাঁর সে সপ্রতিভ সরল হাসির সামনে সেই উত্তেজিত ক্রুদ্ধ জনতাই বরং যেন কেমন অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিল।

অনেকক্ষণ পরে হাসি থামলে পণ্ডিতজী ললাটে করাঘাতের ভঙ্গী ক'রে বলেছিলেন, 'জয় সীয়ারাম! আরে, ও আওরৎ যে আমার ব্রাহ্মণীর ভাবী। ওঁর আপনার মাতাতো ভাইয়ের জরু! কী মুশকিল দ্যাখো দিকি! একে বেচারীর স্বামী আজ চার মাসের ওপর নিরুদ্দেশ, কে জানে কোথায় গিয়ে কোন দুশমনের পাল্লায় পড়ে জান হারাল কিনা—কিম্বা সন্নিসী হয়েই চলে গেল কোথাও—ভেবে বেচারী শোকে দুঃখে পাগল হ'তে বসেছে—তার ওপর তোমরা ছুটে এসেছ তাকে কোতল করতে! বাহবা বা, বেশ বরাত বটে আমার শালাজের। আরে ও ভাবিজী, শোন শোন,—মজার কথাটা শুনে যাও একবার, তুমি নাকি মেমসাহেব আসলে? তাহলে এতকাল আমাদের ধোঁকা দিয়েছ নাকি? তাহলে জাতধর্ম তো সব গেছে আমাদের তোমার পাল্লায় পড়ে!'

আবারও খুব একচোট হেসেছিলেন পণ্ডিতজী। হাসতে হাসতে চোখে জল এসে গিয়েছিল তাঁর।

কিন্তু তবু, বলা বাহুল্য, অত সহজে তারা ভোলে নি।

মিসেস লীসন বাইরে বেরিয়ে আসতে, তাঁর মলপরা পায়ের দিকে চেয়ে তারা একটু থতিয়ে গিয়েছিল সত্যকথা—কিন্তু সে যাই হোক, এত সাদা কেন পা? যতই ফরসা হোক, এরকম রঙ তো এদেশী মেয়ের হয় না!

'আরে ওটা যে ওর রোগ, ব্যাধি! সেই জন্যই তো যত গোলমাল।' তারপর গলাটা আরও নামিয়ে বলেছিলেন পণ্ডিতজী, 'খুব ছোটবেলা থেকেই এ রোগে ধরেছে

—একে বলে ধবল-রোগ, শ্বেতী।...বিয়ের পরই প্রথম ধরা পড়ে—আর সে হ'লও তো কম দিনের কথা নয়, সারা গা-ই সাদা হয়ে গিয়েছে বলতে গেলে।...সেই তো ওর আরও ভাবনা। ওর বিশ্বাস ওর মরদ ইচ্ছে ক'রেই ওকে ফেলে পালিয়েছে—তাই দিনরাত কান্নাকাটি করে শুধু—'

এতেও ভোলে নি সকলে। বলেছ, 'বেশ, যদি এত নিকট-আত্মীয় তোমাদের তো মাতাজী ওর সঙ্গে বসে থাক্ এক থালায়। এক পংক্তিতে বসো তুমিও!'

তাতেও বিন্দুমাত্র দমেন নি বেদাধ্যায়ী, এক মুহূর্তও ইতস্তত করেন নি। বলেছেন, 'বহুৎ শওখ্ সে!...এখনই বসে খাচ্ছি, তোমাদের সামনেই। মালেকোন চোকা লাগাও, এখানেই।'

কে একজন বলে উঠল, 'পাকি নয় কিন্তু, কাঁচি খেতে হবে। রুটি ডাল—'

পাকি খাবারে অর্থাৎ পুরী বালুশাহীতে তত দোষ নেই নাকি। সে তো হালওয়াইয়ের হাতেই খেয়ে থাকে ব্রাহ্মণেরা। কিন্তু কাঁচি মানে ডাল-ভাত-রুটিতেই জাতের বিচার—ছোঁয়াছুঁইর বিচারটা বেশী।

'হাঁ, হাঁ, কাঁচিই তো। পাকী খাবার ঘরে কিছু তৈরীও নেই।'

খেয়েওছিলেন তাই।

ব্রাহ্মণী সুদ্ধ অম্লানবদনে মিসেস লীসনের থালা থেকে রুটি তুলে নিয়ে খেয়েছিলেন। পাশে বসে খেয়েছিলেন বেদাধ্যায়ীজী নিজেও—। এক লোটা থেকে আলগোছে জল খেয়েছিলেন তিনজনেই।

এর পর আর তারা সন্দেহ পোষণ করতে পারে নি। সরবে ও সরোষে রাম-বিবীছের মুণ্ডপাত করতে করতে ফিরে গিয়েছিল—ওপারে, পাশের গ্রামে—নিজের নিজের ঘরে।

পণ্ডিতজীর কাণ্ড দেখে মিসেস লীসন বিস্ময়েই শুধু নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন, নইলে হয়ত বিপদ ঘটত। যন্ত্র-চালিতের মতোই ঘুরে বেড়িয়েছেন, ওদের নির্দেশ-মতো কাজ করেছেন। খেয়েছেনও বসে তেমনি অভিভূত আচ্ছন্নের মতো, স্বপ্ন-সঞ্চারিতের মতো।

দুশমনেরা চলে যাবার বেশ খানিকটা পরে ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে বলেছিলেন মিসেস লীসন, 'এ কী করলেন পণ্ডিতজী, আমার জন্যে জাতটা দিলেন! আবার মিথ্যা কথাও বললেন!'

পণ্ডিতজী হেসে বলেছিলেন, 'জাতটা দিলাম কোথায় মা, জাতরক্ষা হ'ল বলো! ব্রাহ্মণ পরিচয়টা এতদিনে সার্থক হ'ল।......বিপন্নআশ্রিতকে রক্ষা করার জন্য, লোকের প্রাণ রক্ষার জন্য সব কিছুই করা যায়—আমাদের শাস্ত্রে, শুধু আমাদের শাস্ত্রে কেন মা, সব শাস্ত্রেই বোধ হয় এই কথাই লেখে। এ রকম সময়ে কিছুতেই পাপ হয় না। ......আর মিথ্যা বলা মা? মহাভারতে আছে কি—মহাত্মা ভীষ্‌মজী রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলছেন—পাঁচ কিসিম মিথ্যাতে পাপ হয় না। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে তামাশা করতে করতে, কিম্বা যেখানে মানুষের প্রাণ যেতে বসেছে, অথবা সর্বস্ব অপহৃত হচ্ছে, বিবাহের ব্যাপারে, আর'—একটু হেসে স্ত্রীর দিকে ইঙ্গিত ক'রে চোখ মট্‌কে বলেছিলেন, 'স্ত্রীর কাছে মিথ্যা কথা বলায় কোন দোষ হয় না। কেমন না—"ন মর্ম যুক্তং বচনং হিনস্তি, প্রাণত্যয়ে সর্বধনাপহারে, ন স্ত্রীষু রাজন্ ন বিবাহকালে পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি ন জায়তে॥"

দীর্ঘ কাহিনী শেষ করে যখন থামলেন লীসন মেম, তখন বেদাধ্যায়ী দম্পতির

প্রীতি শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় দুই চোখ ছলছল করছে তাঁর।

কৃতজ্ঞতার কারণ আগারও কম নয়। এতক্ষণ তবু যে একটু প্রচ্ছন্ন সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব ছিল সেটাও কেটে গেছে মেমসাহেবের কাহিনী শুনতে শুনতে। আর কোন শঙ্কা বা সংশয় নেই, বরং আশ্বাসেই ভরে উঠেছে বুক। সেজন্যে যেন বেশী ক'রে কৃতজ্ঞতা বোধ করছে সে এই মুহূর্তে।

নিজের কথা জানানো শেষ হয়েছে, লীসন মেমসাহেব এবার ওর গতিবিধির কথা আরও বিস্তারিত ভাবে জানতে চাইলেন। আগা কোথায় যাবে আর কী ভাবে যেতে চায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইলেন।

সব শুনে গম্ভীর হয়ে উঠল মেমসাহেবের মুখ। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'দ্যাখো, আমি বেরোতে পারছি না ঠিকই তবু অনেক কথাই আমার কানে আসছে। পণ্ডিতজীর লোকজন আসে মাল নিয়ে, আবার মাল কিনতেও আসে বৈদ্যের দল। জড়িবুটির ব্যাপারীরা আসে দূর গ্রামান্তর থেকে গাছগাছড়া কিনতে। পণ্ডিতজী নাকি এসব জিনিস ভাল চেনেন আর বাজে মাল চালিয়ে কাউকে ঠকাবার চেষ্টা করেন না—এইজন্যে বৈদ্য ব্যাপারীদের মধ্যে ওঁর খুব নাম। অনেকেই কষ্ট ক'রে এই জঙ্গলে মাল কিনতে আসে তাই। আত্মীয়স্বজনও আসে কেউ কেউ পণ্ডিতজীদের, ওঁরাও যান মধ্যে মধ্যে। আমি আছি বলেই ইদানীং কোথাও যেতে চান না—কিন্তু তবু বিয়ে-সাদীতে তো যেতেই হয়। কাজেই সব কথাই কানে এসে পৌঁছয় আমার।'

এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন মেমসাহেব, তারপর একটু যেন আবেগ-কম্পিত স্বরেই বললেন, 'ইংরেজদের দুঃখের দিন কেটেছে, তারা শুধু দিল্লীতেই জেতে নি, সর্বত্রই জিতছে। ইংরেজ ফৌজ চারদিক থেকে বেড়াজাল ফেলার মতো ক'রে এগিয়ে আসছে দিল্লীর দিক লক্ষ্য ক'রে। তাদের সে জালে একটু সন্দেহভাজন যে পড়ছে তার আর রক্ষা নেই। এতদিন তারা চরম মার খেয়েছে, এবার তাদের মার দেবার পালা। শুধু তারা দুনিয়ার চোখে অপদস্থ হয়েছে বা গোটাকতক ইংরেজ মরেছে সেটা তাদের কাছে বড় কথা নয়, এদেশী লোকদের তারা নিঃসংশয় বিশ্বাস করেছিল, তার বদলে তাদের কাছ থেকে চরম বিশ্বাসঘাতকতা পেয়েছে, তাতেও এতটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত না হয়ত—কিন্তু নিষ্পাপ শিশুদের হত্যা আর কুলনারীর অপমান—এ কোন জাতই সহ্য করতে পারে না, ইংরেজদের কাছে তো আরও অসহ্য, কারণ জীবন পণ ক'রেও তাদের স্ত্রীলোকদের রক্ষা করার শিক্ষা পেয়ে থাকে—ছেলেবেলা থেকে। সেই অপমান আর অত্যাচারেরই শোধ নিচ্ছে এবার তারা। ক্ষতির চেয়ে ক্ষতিপূরণ হয়ত বেশীই হয়ে যাচ্ছে—কিন্তু তার জন্য তাদের খুব একটা দোষ দিতে পার কি? ...যাক গে, যা বলছিলুম, শুনছি পূব দিক থেকে তিন-চারটে দলে ভাগ হয়ে তারা এগোচ্ছে, বড় দলগুলো আবার অসংখ্য ছোট দলে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, পথই শুধু নয়, পথের ধারের গ্রামও তাদের সে প্রতিহিংসার জাল থেকে অব্যাহতি পাচ্ছে না। ভারতীয় পুরুষ—বিশেষত অল্পবয়সী পুরুষ মাত্রেই তাদের কাছে এখন পাণ্ডে বা বিশ্বাসঘাতক। সেই বিশ্বাসঘাতকদের খোঁজেই চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা। যে কোন সময়েই সে রকম কোন দল এদিকে এসে পড়তে পারে। আমি তেমনি কোন দলেরই প্রতীক্ষা করছি। যে কোন দল—তা বৃটিশ ফৌজই হোক, আর সাধারণ ভলান্টিয়ার দলই হোক—ইংরেজের দেখা পেলেই তাদের সঙ্গে কোন ইংরেজ বা

সরকারী আশ্রয়ে চলে যাবো।'

তারপর একটু থেমে বললেন, ঈষৎ যেন একটু অপ্রতিভ ভাবেই—'শুনেছি যে হিন্দু বা মুসলমান যাই হোক না কেন, অল্পবয়সী কোন ছেলের দেখা পেলেই ওরা হয় গুলি ক'রে মারছে নয়তো ধরে ফাঁসি দিচ্ছে! এতটা আমি বিশ্বাস করি না অবশ্য—তবে শুনেছি অনেকের মুখেই। তোমারও অল্পবয়স, তাতে আবার তোমার সঙ্গে অস্ত্র রয়েছে—যদি কখনও কোন গোরা ফৌজের সামনে পড়ো, তোমাকে যে অল্পে রেহাই দেবে তা মনে হয় না।...তাই বলছিলুম, নাই-বা এ ঝুঁকি নিলে। বরং কয়েকদিন এখানেই থাকো, নয়তো তুমি একা কোন নিরাপদ জায়গায় চ'লে যাও, রাজকুমারী আমার কাছে থাকুন। ইংরেজ ফৌজের দেখা পেলে তাদেরই হেফাজতে আমি ওকে ধরমপুর পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেব।......কী বলো?'

আগা প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ল, 'তা হয় না মেমসাহেব। আমি জবান দিয়েছি, কীরে খেয়েছি। এ ভার শেষ পর্যন্ত আমাকেই বইতে হবে—ভরসা ক'রে আর কারও হাতে দিতে পারব না। আর বিপদ, সে তো জেনেই এসেছি। যিনি এ ভার দিয়েছেন তিনিও সেটা যাচিয়ে নিয়েছেন বার বার, কোন মিথ্যা ভরসার মধ্যে রাখেন নি। সুতরাং যাই হোক না কেন, ধরমপুরে ওঁকে পেঁৗছে না দিয়ে আমি ছুটি নিতে পারব না।'

লীসন মেম চিন্তাকুল মুখে চুপ ক'রে রইলেন, তখনই আর কিছু বললেন না।

সন্ধ্যার কিছু আগেই ওপার থেকে পণ্ডিতজীর নৌকো এসে পেঁৗছল। গেঁহু চানা মকাই তেল নুন—এমনি নানান তৈজস, নামাতে নামাতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তারপর পাতা পেতে উঠোনে বসে গণ্ডাদশেক ক'রে চাপাটি ও তদুপযুক্ত ডাল সেঁটে শ্রান্তি দূর করল নাও-ওলারা। তারপর শুরু হ'ল জড়িবুটীর বস্তা নৌকোয় তোলা। সে শেষ হ'তে হ'তে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে দু-দণ্ড রাত্রিই হয়ে গেল।

আগা এবং শাহ্জাদীরও খাওয়ার পাট শেষ হয়ে গিয়েছিল। এমনিতেই এসব পাড়াগাঁয়ে সন্ধ্যা হ'তে না হ'তে খেয়ে নেয় সবাই—এদের তো আরও তাড়ার কারণ ছিল সুতরাং তৈরীই ছিল ওরা। নাও-ওলাদের কাজ সারা হ'তে পণ্ডিতজী নিজে সঙ্গে এসে ওদের নৌকোতে তুলে দিয়ে গেলেন। বেদাধ্যায়ীজীর স্ত্রী একটু খুঁৎ-খুঁৎ করছিলেন—এই অন্ধকার রাত্রে নদী পার হওয়া উচিত হবে কিনা—কিন্তু পণ্ডিতজী উড়িয়ে দিলেন কথাটা। তিনি বললেন, 'এ-ই ভাল হ'ল। এত অন্ধকারে কারও চোখে পড়া তো দূরে থাক, কেউ টেরই পাবে না। এই উত্তম সুযোগ। আমি তো ইচ্ছে ক'রেই দেরি করিয়ে দিলুম ওদের!'

তিনি আরও বলে দিলেন, মিসেস লীসনের ঐ ঘটনাটার পর সমস্ত পুরনো দাঁড়িকে বরখাস্ত করেছেন তিনি—রামবিরীছ সুদ্ধ। এখন যারা আছে—এরা ভাল লোক, বিশ্বাসী। বিশেষ রামবিরীছদের চাকরি যাবার কারণ এদের শুনিয়ে দিয়েছেন তিনি, সে ভয়ও খানিকটা আছে। এরা কোন অনিষ্ট করবে না।

নৌকোয় ওঠার আগে মিসেস লীসন একখানা ভাঁজ-করা কাগজ এনে আগার হাতে দিলেন। বললেন, 'তোমার ঋণ সহজে শোধ হবার নয়, সে চেষ্টাও করব না। আর এখন আমার কী-ই বা সাধ্য। আবার যদি কখনও সজাতি স্বদেশবাসীর সঙ্গে যোগাযোগ হয়, নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যেতে পারি সে আলাদা কথা। কিন্তু সে যাই হোক—এই চিঠিটা রাখো, আমার মনে হচ্ছে কখনও না কখনও এটা তোমার কাজে

লাগবে। তুমি যে নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে এক ইংরেজ ভদ্রমহিলার জীবন ও সম্মান রক্ষা করেছ—সেই কথাটাই লেখা রইল এতে। কোন ইংরেজই—তা ফৌজের লোকই হোক আর সাধারণ লোকই হোক—এ চিঠি দেখলে আমার হয়ে তাদের জাতির হয়ে তোমার ঋণ শোধ করার চেষ্টা করবে।'

আগার দুই চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল, সে কোন কথা বলতে পারল না, নীরবে চিঠিখানা মাথায় ঠেকিয়ে কোনমতে মেমসাহেবকে একটা অভিবাদন জানিয়ে নৌকোয় গিয়ে চড়ল।

ঋণ মিসেস লীসনের নয়—তারই, একথা আগার চেয়ে বেশী কেউ জানে না।

॥ ছাব্বিশ ॥

ওপারে পৌঁছেও আশ্রয় বা বিশ্রামের কোন অসুবিধা হ'ল না। বোধ হয় পন্ডিতজীর সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল এ বিষয়ে—নাও-ওলারাই সব বন্দোবস্ত করে দিলে। তারাই আবার শেষ রাত্রে—কয়েকদন্ড রাত থাকতে—ওদের ডেকে তুলে, খানিকটা ক'রে গরম দুধ খাইয়ে, সঙ্গে সঙ্গে এসে গ্রামের সীমানা পার ক'রে দিয়ে গেল। এবার সামনে বহু-দূর-বিস্তৃত শষ্যক্ষেত্র, কোথাও কোন বাধা কি গুপ্তশত্রুর হিংস্র দৃষ্টি ওৎ পেতে নেই। সূর্য ওঠবার আগেই ওরা বেশ খানিকটা এগিয়ে যেতে পারল।

কিন্তু হাঁটতেই হচ্ছে, হবেও। গাধা কি খচ্চর কেনার কোন ব্যবস্থাই করা গেল না। এসব নিতান্তই অজ পাড়াগাঁ, একমাত্র 'বয়েল' ছাড়া কোন ভারবাহী জীবের কথা ভাবতে পারে না কেউ এসব জায়গায়। শেষ পর্যন্ত হয়ত একটা বয়েলই নিতে হবে—কিন্তু তাতে গতি অত্যন্ত মন্থর হয়ে পড়বে বলেই আগা চট ক'রে সে পথে গেল না। আরও খানিকটা দেখা যাক—ভাবল সে। পুরো এক দিন এক রাত তো বিশ্রাম পাওয়া গেছে, অভ্যস্ত খাদ্যও পেটে পড়েছে খানিকটা—এখন অন্তত দু-একটা দিন তো যুঝতে পারবে তার জোরে।

আস্তে আস্তেই হাঁটে। একটু ক'রে হাঁটে আবার খানিকটা বসে মেহের। ক্রমশ বসার সময়টাই দীর্ঘ হয়। আগা ভেতরে ভেতরে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেও মুখে কিছু বলতে পারে না। চন্দ্রসূর্য কখনও যাঁদের মুখ দেখে না—সেই মুঘলরাজ-অন্তঃপুরিকারা মাঠ ভেঙে হাঁটবেন—এটা আশা করাই অন্যায়। তবু যে এটুকু হাঁটছেন—এই যথেষ্ট।...

সৌভাগ্যক্রমে সেদিনও সন্ধ্যায় একটু আশ্রয় মিলল। এক গ্রামে ঢোকবার মুখে অথচ মূল গ্রাম থেকে অনেকটা দূরে এক চাষীর বাড়ি। মানুষও কম—বুড়োবুড়ী দুজন মাত্র থাকে। তারা সানন্দে আশ্রয় দিল ওদের। তাদের সামর্থ্য কম—আতিথেয়তার আয়োজন অবশ্যই বেদাধ্যায়ীর মতো নয়, মকাইয়ের ছাতু আর নুন লঙ্কা ভরসা। ক্ষুধা ও শ্রান্তির মুখে তা-ই অমৃত বোধ হ'ল। আগার একটু আশঙ্কা ছিল যে শাহ্‌জাদী এ খাবার খেতে পারবেন কিনা—কিন্তু বুড়ীর মুখে শুনল যে তিনিও খেয়েছেন। বুড়ী ছাগল পোষে, ছাগল-দুধও একটু দিল গরম ক'রে, শোওয়ার আগে। তাও এক ভাঁড় খেলেন শাহ্‌জাদী। আগা খেল না অবশ্য, তার আগেই পেটভরে ছাতু খেয়ে নিয়েছে সে।

পরের দিন ভোরে তাদেরই কিছু পয়সা দিয়ে গ্রামের দোকানে পাঠাল। আটা

ডাল কিনে এনে রুটি পাকিয়ে দিল বুড়ী। খেয়ে এবং কয়েকখানা রুটি ও কিছু গুড় গামছায় বেঁধে নিয়ে আবার রওনা হ'ল ওরা। চলতে চলতে ভারী হাসি পেতে লাগল মেহেরের, সম্রাট শাজাহান ও আলমগীরের বংশের কন্যা সে, তার উপযুক্ত যাত্রার আয়োজনই বটে!...

দীর্ঘ নিরানন্দ পথ। নির্জনও। দুটি মাত্র রাহী তারা সে-পথে। কখনও আগু-পিছু, কখনও বা পাশাপাশি চলেছে। কাছাকাছি আর কেউ নেই। দীর্ঘ সময় বাদে বাদে হয়ত কদাচিৎ অপর কোন রাহী বা স্থানীয় গ্রামবাসীর দেখা পায়। তারা অযাচিত দু-একটা কুশল প্রশ্ন করে, গন্তব্য স্থান জানতে চায়। কিন্তু বেশির ভাগই ওরা দুটি মাত্র প্রাণী—পরস্পরের সঙ্গী—দূর-বিসর্পিত পথের এই প্রায় অন্তহীন যাত্রায়। এ অবস্থায় যদি তারাও দুজন কথা না বলে তো চলে কী ক'রে?

অবস্থাটা অসহ্য লাগে দুজনেরই। কিন্তু মেহের বুঝতে পারে যে সে যদি কথা না শুরু করে তো আগা কোন দিনই ভরসা ক'রে কথা কইতে পারবে না। আজও কোন সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলার সঙ্গে কথা কইতে যাওয়া যে-কোন অনাত্মীয় পুরুষের পক্ষেই ধৃষ্টতা বলে গণ্য হয়—এ তো কতকটা চাকর-মনিবের সম্পর্ক।

সুতরাং—কথা যদি কইতে হয় তো ভয় ভাঙতে হবে প্রথমটা তাকেই।

তাতে অবশ্য কোন আপত্তিই ছিল না মেহেরের, অত মিথ্যা সম্ভ্রমবোধ তার নেই। আর রাস্তায় নামতে হয়েছে যে বাদশাজাদীকে, তার আবার অত সূক্ষ্ম ইজ্জতের প্রশ্ন হাস্যকর। বরং সে কদিনই মনে মনে ছটফট করছে আগার সঙ্গে কথা কওয়ার জন্যে।

তার আশঙ্কা অন্যত্র। তার গলার আওয়াজটা না চিনতে পারে আগা! এখনই ধরা দেবার ইচ্ছা তার নেই। তার মন একটা যেন মজার খেলা পেয়ে গেছে—এ এক-রকমের আড়িপাতার মজাও বটে। সে আরও কিছুদিন এমনি আড়ালে থাকতে চায়, আর কিছুদিন নাচাতে চায় আগাকে। আরও খানিকটা খেলাতে চায়। পথের এই সহস্র অভাবিত কষ্টের মধ্যেও সে এই খেলাতেই মেতে উঠেছে। তার এই পথ-চলাটাও বেশ লাগছে সেজন্যে। সে ইচ্ছে ক'রেই গতিটা কমিয়ে দিয়েছে আরও। পথের শেষে তার আগ্রহ নেই—বরং প্রবল অনাসক্তি ও নিরৌৎসুক্য আছে। তার আগ্রহ তার ঔৎসুক্য যা কিছু এখন এই পথেই—এই পথ চলাতেই। এই পথ যদি জীবনে না শেষ হয় তাহলেও আপত্তি নেই তার। এ যাত্রা অনন্ত হ'লেই বাঁচে সে। অন্তত তার পরমায়ু পর্যন্ত যেন বিস্তৃত হয়।

কিন্তু তবু এখনই ধরা দেওয়া চলবে না। অথচ ধরা না দিয়েই বা কথা বলা যায় কী করে! তার স্বাভাবিক গলাও হয়ত মনে আছে আগার, মনে না থাকলেও মনে পড়তে পারে ক্রমশঃ। অস্বাভাবিক যেটা অর্থাৎ শিরীণের গলা সে তো মনে আছেই। অন্য কী গলাই বা বার করবে সে! সে কিছু বেদের ভেল্‌কী জানে না যে মুহূর্তে মুহূর্তে গলা বদল করবে। অনেক ভেবে-চিন্তে সে একটা উপায় বেছে নিল। পথের ধার থেকে একটা ছোট্ট পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে ভাল জলে এক-সময়ে ধুয়ে নিল সে, তারপর সেটা মুখে পুরে ফিসফিস ক'রে চাপাসুরে দু-একটা কথা শুরু করল। একে সেই চুপি-চুপি গলা, তার মুখে একটা নুড়ি—তায় মাথা হেঁট ক'রে লজ্জা-জড়িত ভঙ্গীতে কথা বলা—সবটা জড়িয়ে বেশ অপরিচিত বলেই মনে হ'ল নিজের গলাটা। মেহের আশ্বস্ত হ'ল।

কথাটা শুরু হয় অবশ্য নিতান্ত প্রয়োজনের পথ ধরেই। 'তেষ্টা পেয়েছে' কিম্বা

'পায়ে লাগছে', 'আর চলতে পারছি না'—এই ধরনের কথাই দুটো-একটা। ক্রমশঃ সাহসও বাড়ে, সতর্কতা বা বিবেচনার বাঁধও ভাঙ্গে। অপ্রয়োজনেও শুরু হয় কথা। আরও কিছু পরে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ওঠে নিতান্ত অন্তরঙ্গ কথাও।

অবশেষে একসময় শাহ্‌জাদী ভরসা ক'রে প্রশ্ন করে বসেন, 'মিয়া সাহেবের মনটা এত ভারী ভারী ঠেকছে কেন? ভয় করছে?—না পথের কষ্টেই মুখ শুকিয়ে উঠেছে?'

'ও দুটোর কোনটাই নয়। এর চেয়ে অনেক বেশী কষ্ট আর অনেক বেশী বিপদে অভ্যস্ত আছি। তা না হলে আসবে কেন? কেউ তো জোর করে নি—সব রকম সম্ভাবনা জেনে—স্বেচ্ছাতেই নিয়েছি এ ভার।'

'তবে?'

'তবেটা নিতান্তই আমার তকদির!'

তখনই কোন প্রশ্ন করে না মেহের। আগার কথা বলার ধরনেই বোঝা যায় যে এসব প্রসঙ্গ তুলতে একান্ত অনিচ্ছুক সে।

কিছু পরে আগাই আবার কথা শুরু করে। একবার বাঁধ ভাঙ্গলে বন্যার জল ঠেকানো শক্ত। গল্‌গল্‌ ক'রে যে কথাগুলো বেরিয়ে আসতে চাইছে তাকে কৃত্রিম সৌজন্যের বাধায় আসলে রাখা যায় না। বিশেষ ক'রে অল্প বয়স অল্প বয়সের কাছে সান্ত্বনা খোঁজে সহানুভূতি চায়। মুখ দেখে নি, পরিচয় ঘটে নি—তবু বয়সটা যে অল্প তা বাদশার কাছে শুনেছে, ভাবভঙ্গী চলাফেরা দেখেও কতকটা অনুমান করতে পারে।

এই রকম আলাপের মধ্যেই হঠাৎ একসময় প্রশ্ন ক'রে বসে আগা, 'আচ্ছা—আপনি, আপনি শাহ্‌জাদী মেহের-উন্নিসা সাহেবাকে চেনেন?

ভাগ্যে তার দিকে চেয়ে ছিল না আগা! সেই মুহূর্তে সে তার আগে আগেই চলছিল—সরু আলের ওপর দিয়ে চলা, পাশাপাশি হাঁটবার কোন উপায় নেই, চলতে চলতে এদিকে ফেরাও সম্ভব নয়। নইলে চমকে ওঠাটা বুরখার মধ্যে দিয়েও টের পাওয়া যেত হয়ত। চমকে ওঠার জন্যই কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে না। এ প্রশ্ন নিতান্তই দৈবের যোগাযোগ—না কিছু সন্দেহ করছে আগা? ভয় নয়—ভয়ের কারণ কি!—বিস্ময় কৌতূহলেই যেন বুকের মধ্যেটা ঢিব্‌ঢিব্‌ ক'রে মেহেরের।

অবশ্য একটু পরেই বোঝে যে, এতটা ত্রস্ত হয়ে ওঠার কিছু নেই, আগার এ প্রশ্নটা নিতান্তই কাকতালীয় অঘটন। অপাঙ্গে একবার ওর মুখের দিকে চেয়েই বুঝতে পারে সেটা। ঠিক মেহেরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বা চেয়ে নেই—তবু এই উত্তরটার ওপর যেন ওর জীবন-মরণ নির্ভর করছে, এমনি একটা একান্ত অধীরতা ওর সমস্ত ভঙ্গীতে।

উত্তর পেতে দেরি হওয়াতে আগা মনে করে এ শাহ্‌জাদী সম্ভবত চিনতে পারেন নি মেহেরকে। সে বলে বসে, 'চেনেন না—মেহের, মানে মেহেরউন্নিসা সাহেবাকে? খুব—খুব সুন্দর দেখতে, প্রভাতের আলোর মতো, আশমানের চাঁদের মতো—?'

এবার আশ্বস্ত হয় মেহের, মুখে হাসিও ফোটে একটু। সে হাসি বুরখার বাইরে প্রকাশ পায় না অবশ্য। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বলে, 'চিনি বৈকি খুব চিনি। বেচারী মেহের!'

এবার চমকে ওঠার পালা আগার। তবে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের চমক। কথাটা শুনে একেবারে থমকে দাঁড়িয়ে যায় সে। সমস্ত আদবকায়দা ভুলে সোজাসুজি মেহেরের

দিকে তাকিয়ে ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করে, 'কেন? বেচারী বললেন কেন? কী হয়েছে তাঁর?...তাঁর কি কোন বিপদ ঘটেছে? কিছু জানেন আপনি—মানে তেমন কোন বিপদের কথা—?'

বলতে বলতেই মুখচোখের চেহারা পাল্টে যায় তার। নিমেষের মধ্যে ঘেমে ওঠে একেবারে, উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় বিবর্ণ হয়ে যায় যেন। মনে হয় তার সমস্ত নিশ্বাস, সমস্ত জীবন যেন ওষ্ঠাগ্রে এসে থেমে আছে, পড়বার পূর্ব মুহূর্তের পরিপক্ক ফলের মতো—এই প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায়।

এবার বেশ একটা শব্দ ক'রেই নিশ্বাস ফেলে মেহের।

বলে, 'বেচারী বৈ কি! তার বড় কষ্ট!'

'কষ্ট! কিসের কষ্ট? কী হয়েছে তার?'

প্রশ্ন করতে করতে দু-তিন পা এগিয়ে আসে আগা ওর দিকে। যেন মনে হয় সে দু হাতে ওর কাঁধ দুটো চেপে ধরতে চাইছে, প্রবল একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উত্তরটা বার ক'রে নিতে চাইছে এক নিমেষে। তার যেন আর এক নিমেষও তর্ সইছে না।

কিন্তু একেবারে কাছে এসে পড়ে বুঝি চৈতন্য হয় তার। বহু কষ্টে আত্ম-সম্বরণ করে শেষ পর্যন্ত। বাস্তব জ্ঞানটা ফিরে আসে।

'কষ্ট নয়?' মেহের বলে, 'ওখানে তার মুখ চাইবার মতো লোক তো একজনও নেই। তার দিকে কে চাইবে বলো! মা নেই বাবা নেই—বড় বেগমসাহেবা দেখতে পারেন না দুচোখে, অনাথা মেয়ে—তার জন্যে কে ভাববে! যেমন একা তেমনি অসহায়।...আর সত্যিই—এই বিপদে যে যার নিজের শির বাঁচাতেই ব্যস্ত, পরের কথা ভাববেই বা কেন?...শুনেছি—আমাকে বলেও ছিল মেহের—কিল্লাতে তার নাকি খুব অনুগত কে এক সিপাহী ছিল—সে থাকলে হয়ত নিজের জান কবুল ক'রেও মেহেরকে বাঁচাত! কিন্তু এমন নসীব মেয়েটার—সেও নাকি কিছুদিন ধরে নিপাত্তা। কে জানে কি হয়েছে, ইংরেজের গুলিতে মরেছে কি কয়েদ হয়েছে তাদের হাতে—কিম্বা গুণধর শাহ্জাদার দলই মেরে ফেলেছে তাকে—কেউ জানে না।...মেহেরের অদৃষ্টটা বড় খারাপ। ঐখানে পড়ে রইল দুশমনের মর্জির ভরসায়, যদি বা বাদশা-বেগম পালিয়েও থাকেন ওকে নিয়ে যান নি নিশ্চয়—ইংরেজ কিল্লা দখল করলে কী যে হবে! ভাবতেও বুক কাঁপে যেন। অশেষ লাঞ্ছনা আছে ওর ভাগ্যে। মরে—মরতে পারে তো সে ভাল, ইংরেজের হাতে পড়লে কী আর রক্ষা থাকবে!'

খুব আস্তে আস্তে, খুব করুণ কণ্ঠে কথাগুলো বলে মেহের, আন্তরিক সমবেদনাই ফুটে ওঠে তার কণ্ঠে।

আর শুনতে শুনতে মুখ বিবর্ণতর হয়ে ওঠে আগার, দুই হাত এমন মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ও'ঠে যে ভয় হয় বুঝি নিজেরই নখ নিজের করতলে চেপে বসে রক্তাক্ত ক'রে তুলেছে।...দেখতে দেখতে চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল হয়ে ওঠে—কপাল থেকে দুই রগ বেয়ে দরদর-ধারে ঘাম ঝরতে থাকে। ওর এমন মর্মান্তিক অবস্থা হবে জানলে কথা-গুলো হয়ত বলত না মেহের, তার এখন অনুশোচনা বোধ হতে থাকে।

কিন্তু তবু তখনও, খেলাটা ভাঙতে পারে না। ক্ষণিকের দুর্বলতা জয় ক'রে মায়াবিনী আবার স্ব-রূপে ফিরে যায়। নিতান্ত ভালমানুষের মতোই প্রশ্ন করে, 'আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে? অসুস্থ বোধ করছেন কিছু?...তাহ'লে না হয় একটু বিশ্রাম ক'রে নিন কোথাও বসে।...আপনার মুখচোখ বড্ড শুকিয়ে উঠেছে যে—'

'শরীর খারাপ! খারাপ হচ্ছে কই মেহেরবান!...এ শরীর আদৌ আছে কেন সেইটেই তো ভেবে পাই না। তাঁর বিপদের সময় যদি কাজে না লাগল—তাঁর খিদমতেই না উৎসর্গ করতে পারা গেল—তা হ'লে এ শরীর রেখেই বা লাভ কি!...ওঃ!'

আগা হতাশ ভাবে সেইখানেই, সেই মাঠের মধ্যেই বসে পড়ে। কোন গাছতলা কি একটু অন্তরাল খোঁজবারও উদ্যম নেই তার। রাজবংশের কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে —বা বসে থাকলেও—তাঁর বিনা অনুমতিতে বসা বা বসে পড়া যে নিতান্ত অশোভন ও রীতি-বিরুদ্ধ, তাও মনে পড়ে না সে সময়। মনে পড়ার অবস্থা আর নেই তার, পা ভেঙে আসছে বলেই বসতে হয়।

অতি সাবধানে, বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে মেহেরও মাঠের উপরই বসে পড়ে। মুখটা বুরখায় ঢাকা—তবু একটু ঘুরিয়েই রাখে আগার দিক থেকে। তারপর বলে, 'কিন্তু আপনি—? মানে, আপনি কি মেহেরকে চিনতেন নাকি?'

আগা ঘাড় নাড়ে শুধু। কথা কইতে পারে না। কপালের ঘাম গড়িয়ে চোখে পড়েই বোধ হয় চোখ জ্বালা করছে তার, দুই চোখ জলে ভরে উঠেছে। প্রাণপণে সে-জলটা গোপন করার বৃথা চেষ্টা করে সে।

তবুও করুণাহীনার মনে করুণা জাগে না। তবু দয়া হয় না নির্দয়াময়ীর। বরং সে একটা নিষ্ঠুর আনন্দ উপভোগ করে আগার এই দুর্দশা থেকে। প্রেমাষ্পদকে নিষ্ঠুর পেষণে পিষে সে জীবনের সার্থকতা আদায় করতে চায়—বিজয়িনী বিন্দু বিন্দু ক'রে চোখে চোখে আস্বাদ করতে চায় বিজয়গর্বের অমৃতরসসুধা।

সে আবারও নিতান্ত নিরীহ একটি প্রশ্ন করে, 'গুস্তাকি মাপ করবেন মিঞা সাহেব, যদি একটা কথা জানতে চাই। কৌতূহল চাপতে পারছি না বলেই—। আচ্ছা, আপনিই কি তার সেই বন্ধু—সি—সিপাহী?'

'আমি তাঁর দাসানুদাস হজরৎ, নিজেকে তাঁর বন্ধু মনে করব এতখানি হিমাকৎ আমার নেই। আমি সত্যিই তাঁর নৌকর। কিন্তু বেইমান নৌকর। আজ আমার চে'য় বেইমান সেবক বোধ হয় কেউ নেই তাঁর। তাঁর দয়াতেই বার বার প্রাণ ফিরে পেয়েছি কিন্তু তাঁর এই প্রয়োজনের সময় কোন কাজেই লাগলুম না।'

আর বেশী প্রশ্ন করতে হয় না, আগা নিজেই সব বলে। বলে বাঁচে যেন। এতদিন কাউকে বলতে না পেয়েই যেন কষ্ট হচ্ছিল তার। যে তার আশমানের চাঁদকে চেনে, তাঁকে দেখছে এবং তাঁর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন—এমন একজন মানুষকেই বুঝি খুঁজে বেড়াচ্ছিল তার মন। সেই মানুষক এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে পেয়ে যাবে তা একবারও ভাবে নি। একটি সহৃদয় কর্ণ যে এতটা তৃপ্তি দিতে পারে—তাও আগা এর আগে কখনও বুঝতে পা'র নি।

দীর্ঘ ইতিহাস—তবু ধৈর্য ধরেই শোনেন শাহ্জাদী নুরুন্নেসা, যথেষ্ট সমবেদনা প্রকাশ করেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বহু সংবাদ সংগ্রহ করেন, বহু অজানা তথ্য জানতে পারেন—বহু অকল্পিত সত্য উদ্ঘাটিত হয় এতকাল পরে। যা জানেন, যা জানতেন, তাও বার বার শোনেন প্রশ্ন ক'রে ক'রে। আর শুনতে শুনতে অনির্বচনীয় একটা তৃপ্তিতে ভরে যায় তাঁর মন। জানতেন—এ সবই জানতেন। তবু —প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা গুলোর মধ্যে ম'ধ্য যে শূন্য ছিল, যা অনুমান এবং মানব-চরিত্র-জ্ঞানের দ্বারা পুরিয়ে নিতে হত, তা এখন সাফাই সাক্ষ্যের দ্বারা সমর্থিত হ'ল, পূরণগুলো অনুমোদন লাভ করল বিচারকের।...বার বার শোনেন—মধুমক্ষী যেমন বার বার ফুলের মধুকোষটিতেই উড়ে বসতে চায়—তেমনি তাঁর মন ঘুরে ফিরে

সেই বিশেষ অনুভূতির কথাগুলোই শুনতে চায়। কান মাথা ও মনে মিলে চলে এক অপূর্ব স্মৃতি-রোমন্থন ও স্মৃতি-মৈথুন।

অবশেষে একসময় থামতে হয়। আগাই থামে। পরিশ্রান্ত হয়েই থেমে যায় সে। একই কথা বার বার বলেছে সেও। ভুলে নয়—আবেশ বা উৎসাহের প্রাবল্যেও নয়—তারও মন বলতে বলতে সেই বিশেষ দিন বিশেষ ঘটনাগুলির স্মৃতি নতুন ক'রে আস্বাদ করছিল ; সেই সব অনুভূতির মধ্য দিয়ে বিচরণ করছিল বার বার। স্মৃতি-সমুদ্র-মন্থিত কষায়-মধুর সুধার স্বাদ অনুভব করছিল সে। অর্থাৎ তারও ভাল লাগছিল বলেই বলছিল। তবু দেহের শক্তি তো সীমিত, মনের উৎসাহের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়, দৈহিক ক্লান্তিই বাধা দেয় তাকে শেষ পর্যন্ত বাধ্য করে থামতে।

দুজনেই চুপ ক'রে থাকে বহুক্ষণ।

নেশা যেন কাটতে চাইছে না। রসনায় লেগে থাকা উগ্র মিষ্ট রসের মতো, সুশ্রুত সঙ্গীতের মতো রিন্ রিন্ করতে থাকে বলা ও শোনার রেশটা। নেশার বিহ্বলতা দুজনকেই আচ্ছন্ন করেছে—

অবশেষে একসময় মেহেরই প্রকৃতিস্থ হয়। মনে পড়ে যায় যে এখনও সে মেহের-উন্নিসা নয়, এখনও নুরুন্নেসা সে। নুরুন্নেসার করণীয় করতে হবে তাকে।

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নড়েচড়ে বসে। বলে, 'শুনুন, আপনি একটা কাজ করুন। সামনের কোন গ্রামে আমাকে একটা ভদ্র আশ্রয়ে রেখে আপনি দিল্লী ফিরে যান।'

চমকে ওঠে আগা। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে শাহ্জাদীর দিকে। কথাটা তার মাথাতে ঢোকেই না বহুক্ষণ। বলে, 'তার মানে!'

'আপনি গিয়ে মেহেরকে কোন নিরাপদ জায়গায় রেখে আসুন—তা যদি সম্ভব না হয় তো তাকেও নিয়ে আসুন ; আমরা একসঙ্গেই যাবো না হয়!'

ফিরে যাবে ?

মেহেরের কাছে ফিরে যাবে? তার বিপদের দিনে পাশে গিয়ে দাঁড়াবে?

মুহূর্তের জন্য যেন দীপ্ত হয়ে ওঠে আগা।

উত্তেজনায় অস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে।

তারপরই অসহায় ভাবে বসে পড়ে আবার। ক্ষণে ক্ষণে তার মুখে প্রবল রক্তোচ্ছ্বাসের চিহ্ন দেখা যায়—পরক্ষণেই আবার বিবর্ণ হয়ে ওঠে তা। হাত দুটো বার বার খোলে আর মুঠো করে। তারপর কেমন একরকম কান্নার সুরে যেন বলে ওঠে, 'তা হয় না শাহ্জাদী, তা সম্ভব নয়।'

'কেন হয় না? খুব হয়।' কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক জোর দেয় মেহের, 'আমার জন্যে ভাববেন না—আমি ঠিক থাকব। আমার কোন ক্ষতি কেউ করতে পারবে না। আপনি তাকে দেখুন। সে বেচারী বড় অসহায়, বড় একা। সেই শত্রুপুরীতে নির্বান্ধব একটা মেয়ে—কী যে করছে সে, ভাবলেও যেন জ্ঞান থাকে না। হয়ত—হয়ত তাকে আত্মহত্যাই করতে হয়েছে আত্মরক্ষার জন্যে!'

এইটিই সবচেয়ে সাংঘাতিক এবং মর্মভেদী অস্ত্র, আর তা বেঁধেও ঠিক যথাস্থানে গিয়ে। যন্ত্রণায় যেন দুমড়ে মুচড়ে উঠতে থাকে আগা। তার সেই অবর্ণনীয় বেদনা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের ইতিহাস তার ব্যথা-পাণ্ডুর মুখে চাপা থাকে না। তবু সে আত্মসম্বরণই করে শেষ পর্যন্ত। বলে, 'না, সে হয় না। আমি বাদশাকে জবান

দিয়েছি, তাঁর কাছে সত্যবন্ধ। সে জবান আমি ঝুটা করতে পারব না। আপনাকে ধরমপুর পেঁাছে না দেওয়া পর্যন্ত ছুটি নেই আমার।'

'কিন্তু ততদিন কি মেহের বসে থাকবে আপনার জন্যে?'

'তা জানি না। তবে আমি ফিরে আসব। খোঁজ করব তাঁর। প্রয়োজন হয় তো দোজখের দোর পর্যন্ত যাব তাঁর খোঁজে। যদি তাঁর ওপর কোন অত্যাচার হয়ে থাকে শুনতে পাই—বা তাঁকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে শুনি, তাহ'লে তার শোধ নেব, যত বড় আর যত শক্তিশালী লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়—দাঁড়াব। আর যদি কোন খোঁজ না পাই—পরলোকে রওনা দেব তাঁকে স্মরণ করেই। তিনি না থাকলে এ দুনিয়ার কোন অর্থ থাকবে না আমার কাছে।'

ধীর শান্ত ভাবেই বলে কথাগুলো। হঠাৎ যেন আশ্চর্য প্রশান্তি ফিরে পায় একটা। মেহের বুঝতে পারে, এটা মরীয়ার প্রশান্তি, দৃঢ় প্রতিজ্ঞার স্থৈর্য। যে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, সে-ই শুধু এমন আবেগের মুখে এমনি শান্ত হয়ে ওঠে।

॥ সাতাশ ॥

অপমানিত মীর মর্দান খাঁ যে কেন দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে সেদিন দিল্লীর দিকেই ফিরেছিলেন তা তিনিও বোধ করি ভাল জানেন না। ভেবে দেখেন নি—তার কারণ ভাববার মতো মনের অবস্থা ছিল না। অনেক কথাই মনে এসেছিল তাঁর। অনেক চিন্তা। একবার ভেবেছিলেন সত্যিসত্যিই বাদশার কাছে গিয়ে আগার মিথ্যা দুষ্কৃতির একটা কাল্পনিক বিবরণ দিয়ে লিখিত হুকুম চাইবেন—শাহ্‌জাদীর পেঁাছে দেবার দায়িত্ব বাদশা মীর মর্দানকেই দিচ্ছেন এই মর্মে। আগার নামে লিখিত ফরমান্ বা খৎ নেবেন। আবার ভেবেছিলেন—শেষ পর্যন্ত সেই মতলবটাই পছন্দ হয়েছিল বেশী—যে নিজেই কিছু, অন্তত জনা-দশেক, সিপাহী যোগাড় ক'রে ফিরে আসবেন। জোর ক'রেই ছিনিয়ে নেবেন। বাদশার ক্ষমতা তো অস্তাচলগামী, তাঁর হুকুমের বা তাঁর বিরাগের কোন মূল্য নেই আর—এমনিই ছিল না, নামমাত্র যেটুকু ছিল, তাঁদের কাছেই—এতদিনে সেটুকুও গেছে। সুতরাং এ অরাজকতার দিনে বাহুবলই ভরসা, বাহুবলেই কেড়ে নেবেন তিনি। স্ত্রীলোক আর সম্পদ—এ বাহুবলেই নিতে হয়, বাহুবলেই রক্ষা করতে হয়, সকলেই জানে সে কথা। শাহ্‌জাদী ও তাঁর সঙ্গের সম্ভাব্য জহরতের পেটিকা—এ তিনি একেবারে বিনা আয়াসে বিনা চেষ্টায় ছাড়তে রাজী নন।

কিন্তু দিল্লীর কাছাকাছি পেঁাছে যে সব গুজব শুনলেন—গুজব কেন—দেশ-গাঁয়ের যে চেহারা নজরে পড়ল তাতে গুজবটা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্যই মনে হ'ল—তাতে উৎকণ্ঠার শেষ রইল না তাঁর। আজ হোক কাল হোক আংরেজ দিল্লীর মালিক হবে তা তিনি জানতেন, সে সম্ভাবনা একরকম দেখেই এসেছিলেন—কিন্তু সেটা এত তাড়াতাড়ি এত সহজে হয়ে যাবে তা ভাবেন নি। বাদশাহী আর নেই—দিল্লী পুরোপুরি এখন আংরেজদের হাতে। লালকিল্লার দিওয়ান-ই-খাশে বসে আংরেজ সিপাহ্‌সালাররা বড়া খানা খেয়েছে—সেখানকার শীশমহলে রসুই হচ্ছে তাদের। বাদশা নাকি পালিয়ে প্রথমে কুতুবে পরে হুমায়ুঁ বাদশার সমাধিতে গিয়ে লুকিয়ে ছিলেন। মীর মর্দানেরই ফুফেরা শালা রজব আলীর বেইমানীতে সে খবর পেতেও

দেরি হয় নি আংরেজদের—উইলসন না কে একজন সাহেব নাকি এখন ওদের ফৌজদার—তার হুকুমে কে এক বান্দার বান্দা হডসন গিয়ে ভাঁওতা দিয়ে বাদশাকে বার ক'রে এনে কয়েদ করেছে। বাদশা এখন তাঁরই প্রাসাদদুর্গের নহবৎখানায় বন্দী। পরের দিন সেই হডসনই নাকি আবার গিয়ে শাহ্জাদা মির্জা মোগল, মির্জা খিজির সুলতান আর মির্জা আবুবকরকে কয়েদ ক'রে দিল্লীর দিকে আনছিল, পথে ভীড় জমতে জমতে যখন আট-দশ হাজার লোক জমে গেল তখন আর কিল্লা পর্যন্ত নিয়ে যেতে সাহস হয় নি তার, শহরে ঢোকবার পথেই তাঁদের গুলি করে মেরেছে, আরও একুশ জন শাহ্জাদাকে নাকি ধরেছে ওরা—আজকালের মধ্যেই ফাঁসী দেবে কিম্বা গুলি ক'রে মারবে—

শাহ্জাদী আর তাঁর জেবর-জহরৎ স্বপ্নের মতো কোন দূর দিগন্তে মিলিয়ে যায়। প্রাণের প্রশ্নটাই বড়—সর্বাগ্রগণ্য। টাকাকড়ি কিছু আছে অবশ্য হাতে—কিন্তু তা আর এখন হাতছাড়া করতে রাজী নন মীর মর্দান। কতদিন বসে এই পুঁজি ভেঙ্গে খেতে হবে তার ঠিক কি? স্রেফ তলোয়ার দেখিয়েই এক গেরস্তবাড়ি ঢুকে নিজের সিপাহশলারের পোশাক খুলে তাদের এক প্রস্থ পোশাক পরে নিলেন, তারপর আর ঘোড়া ছুটিয়ে নয়—চুপিচুপি এক সব্জীওলাকে একআনা পয়সা ভাড়া দিয়ে তার সব্জী বোঝাই বয়েলগাড়িতে চেপে দিল্লীশহরে ঢুকলেন। তাঁর কাছে যা আছে তা কিছুই নয়—দুর্দিনের কথা ভেবে বেশ মোটা কিছু টাকা—মোহর আর চাঁদির টাকা এক রিস্‌সাদারের এক পুরনো ভাঙ্গাবাড়িতে পুঁতে রেখে গেছেন, সেটা হাতছাড়া করলে চলবে না। শাহ্জাদীর জেবরটা অনুমান—এটা নিশ্চিত।

কিন্তু দিল্লীতে ঢুকে শহরের যে চেহারা নজরে পড়ল তাতে মুখ শুকিয়ে গেল আরও। সমস্ত শহর শ্মশানের চেহারা ধারণ করেছে। শ্মশানে তবু মড়া পোড়ার গন্ধ পাওয়া যায় শুধু, এ আরও খারাপ অবস্থা—গলিত-শবের দুর্গন্ধে নিশ্বাস নেওয়াই প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। শুধু সিপাহী নয়—নাগরিকরাও মরেছে হাজারে হাজারে, সে সব মৃতদেহ পথে-ঘাটে, খালি জনহীন বাড়ির ঘরে-বারান্দায় রক-উঠানে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। শিখ সব্জীওয়ালা—শিখ বলেই নাকি তার ভরসা—পথেই এই অরাজকতার খবরটা দিয়েছিল, এখন চোখেও দেখলেন মীর মর্দান, কদিন ধরে যে অবিরাম লুণ্ঠন চলেছে তার চিহ্ন সর্বত্র সুস্পষ্ট। কোন বাড়িতেই বাজে কাঠ-কাঠরা ছাড়া কিছু পড়ে নেই—আলমারী-বাক্স ভাঙ্গা, বাসন-কোসন ঘড়ি সব নিশ্চিহ্ন, মায় সব বাড়িরই মেঝে খুঁড়ে খুঁড়ে দেখেছে কোথাও কিছু পোঁতা আছে কিনা টাকাকড়ি। দেওয়াল পর্যন্ত খুঁড়ে দেখেছে এক একটা বাড়িতে। অর্থাৎ একটা দামড়ি ছিদাম পর্যন্ত আর কোনখানে পড়ে নেই। এমন কি হিন্দুদের মন্দিরে বিগ্রহ পর্যন্ত বাদ যায় নি। সোমনাথের গল্প অনেকেই শুনেছেন, বিগ্রহ ভাঙ্গলেই নাকি মণিমুক্তা পাওয়া যায় রাশি রাশি।

মীর মর্দানের গোপন এবং পাপসঞ্চয় যেখানে লুকোনো ছিল সেখানে যেতে সাহস হ'ল না তাঁর; সেদিকটায় নাকি আংরেজদের বেশী আনাগোনা—সেখানেই ভরম্ভর করেছে তারা। তাদের সামনে কোন হিন্দু কি মুসলমান পড়লে—তা সিপাহীই হোক কি নাগরিকই হোক—কারুর রক্ষা নেই। সে টাকাকড়ি নিশ্চয়ই দুশমনদের হাতে গেছে এতদিনে—আর যদিই দৈবক্রমে রক্ষা পেয়ে থাকে, কদিন পরে গেলেও তা খুঁজে পাবে—মিছিমিছি এখন বেঘোরে জানটা দিয়ে লাভ কি?

মীর মর্দান দেখলেন একমাত্র শিখ আর গুর্খারাই নিরাপদ, তারাই নির্ভয়ে সর্বত্র

যাতায়াত করছে। তিনি সবজীওলাকে ছাড়লেন না। তাকে পুরো একটি সিক্কা টাকাই বার ক'রে দিলেন তিনি। কথা হ'ল যে সারাদিন তার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরবেন— সন্ধ্যায় তার বয়েল গাড়িতে ক'রে শহরের বাইরে চলে যাবেন আবার। সে তাঁকে নৌকর বলে পরিচয় দেবে—যদি দরকার হয়।

অবশ্য প্রথমটা সর্দারজীর গন্তব্যস্থানের কথা শুনে অস্বস্তি বোধ হয়েছিল একটু—সর্দারজী নাকি এ সবজী দিতে যাচ্ছে লালকিল্লাতেই, সাহাবলোগদের বাবুর্চিখানার ঠিকা আছে তার। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল তাঁকে যারা জানত, তারা নিশ্চয়ই কেউ জীবিত নেই, থাকলেও কয়েদখানায় বন্দী হয়ে আছে। কে আর চিনবে? বরং—এ সর্দারজীকে ছাড়লেই প্রাণে বাঁচা কঠিন হবে। একদিকে বিপদের একটা সুদূর সম্ভাবনা অন্য দিকে সুনিশ্চিত বিপদ, অবধারিত মৃত্যু। এক্ষেত্রে কপাল ঠুকে সম্ভাবনাটার সম্মুখীন হওয়াই ভাল। চেনার মধ্যে চেনেন এক খোদ বাদশা—তা তিনি তো আর বাদশার সামনে যাচ্ছেন না।...

কিন্তু কিল্লাতে পেঁৗছে কার্যগতিকে তাও যেতে হ'ল মীর মর্দানকে।

শুনলেন যে শয়ে শয়ে সাহাবলোগ দেখতে আসছে বাদশাকে, তিনি চিড়িয়াখানায় আবদ্ধ প্রাণীর মতোই কৌতুক-কৌতূহলের পাত্র হয়ে উঠেছেন, তামাশা দেখতে ও তামাশা করতে যাচ্ছে সবাই।

সবজীও'লা সর্দারজীর মাল মিলিয়ে দেওয়া ও দামের হিসেব কষা শেষ হ'তে খেয়াল চাপল সেও তামাশাটা একবার দেখে যাবে। ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠল মীর মর্দান খাঁর নতুন ক'রে। যদি বাদশা চিনতে পারেন, যদি সম্ভাষণ করেন তাঁকে নাম ধরে! অথচ এ বিপদের কথাটা সর্দারজীকে বলাও যায় না। সে অবশ্য একবার বলল, 'তোমার যেতে না ইচ্ছে হয় ভীড়ের মধ্যে—তুমি গাড়ির কাছে থাকো, আমি একবার চট ক'রে তামাশাটা দেখে আসি'—কিন্তু সেও ভরসায় কুলোল না তাঁর। কিল্লায় ঢুকে পর্যন্ত সাহেব আর গুর্খা সান্ত্রীরা যেভাবে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখ'ছ বার বার তাঁর দিকে—তাতে সর্দারজীর নিরাপদ সঙ্গ ছেড়ে একা থাকতে সাহস হয় না তাঁর এক লহমাও।

অগত্যা তাঁকেও যেতে হ'ল পায়ে পায়ে এগিয়ে।

ভীড় ছিল খুব। তবে তা না থাকলেও ক্ষতি হ'ত না বিশেষ।

যে দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে ক্ষণেকের জন্য মীর মর্দান খাঁর চোখেও জল এসে গেল। নহবৎখানার দোতলায়—বাইরে বারান্দায় একটা খাটিয়া বা চারপাইয়ের ওপর স্থির হয়ে বসে আছেন মহামান্য আবুল মুজাফ্ফর সিরাজুদ্দিন মুহম্মদ বাহাদুর শা জাফর বাদশা গাজী। চারপাইয়ের ওপর একটা তোশক পাতা, তাতে কোন চাদর কিম্বা জাজিম বিছিয়ে দেওয়ার কথাও মনে পড়ে নি কারও। একটা তাকিয়া অবশ্য আছে পিছনে, সেটাও তেল-চিটচিট ময়লা, হয়ত কোন সিপাহী কি সান্ত্রীর সম্পত্তি ছিল এককালে, কোথা থেকে কুড়িয়ে এনে দিয়েছে। সামনে একটা গড়গড়া আছে, তার নলটাও ধরা আছে বাদশার হাতে কিন্তু কল্কের আগুন নিভে গেছে বহুক্ষণ, সে কল্কে আর কেউ পালটে দেবার মেহনৎ স্বীকার করে নি।

বাদশা স্থির নত মুখে বসে আছেন সেই চারপাইতেই—যেমন স্থির ভাবে থাকতেন ইদানীং, তেমনিই। মীর মর্দান লক্ষ্য করলেন তাঁর ঠোঁট দুটো শুধু একটু একটু নড়ছে—না, আল্লার নাম করছেন না, মীর মর্দানের অভ্যস্ত চোখ বুঝল তিনি

মনে মনে স্বরচিত গজল কি কবিতাই আওড়াচ্ছেন। দুপাশে দুজন লালমুখো আংরেজ সিপাহী বন্দুক উঁচিয়ে এদিকে লক্ষ্য করে দাঁড়িয়ে আছে, বাইরে আরও জনা-কতক। হুকুম আছে বৃদ্ধ বাদশাকে মুক্ত করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা দেখলে আগে তাঁকেই গুলি ক'রে মারবে ওরা।

তবে সে আশঙ্কা একেবারেই অমূলক। তেমন কোন লোকই ধারে-কাছে কোথাও নেই, এ শহরেই আছে কিনা আর সন্দেহ। সাহেব মেমরাই ভীড় ক'রে দেখছে। ওরই মধ্যে যাঁরা একটু বড় দরের—তাঁদের জন্য কুর্সীও পড়েছে খান-কতক। তাঁরা কেউ কেউ কিছু প্রশ্নও করছেন মধ্যে মধ্যে কিছু বাদশাকে। মাত্র সেই সময়ই মুখ তুলে তাকাচ্ছেন বাদশা, অস্ফুট স্বরে কী জবাবও দিচ্ছেন হয়ত—কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই নিচে মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বসে আছেন।

অবশ্য এ কৌতুক-প্রদর্শনীর তামাশা থেকে বড় বেগম সাহেবা বা শাহ্‌জাদা জওয়ান বখ্‌তও বাদ যাচ্ছেন না। বেগমসাহেবা নাকি অসুস্থ, তবু মেমসাহেবেরা যখন মাঝেমাঝেই বিনা এত্তেলায় হুড়মুড় ক'রে ঘরে ঢুকে যাচ্ছেন, তখন তাঁকে উঠে বসতে হচ্ছে--কথাও কইতে হচ্ছে। জওয়ান বখ্‌তকেও—যখনই কোন 'বড়াসাহেব' গোছের কেউ দেখতে আসছেন তখনই তলব করা হচ্ছে, সে বেচারাকে এসে দাঁড়াতেও হচ্ছে ওঁদের সামনে। মীর মর্দান সেই সময়টা ভীড়ের পিছনে আত্মগোপন ক'রে ছিলেন, তবু শাহ্‌জাদার অপরিসীম শীর্ণতা ও মুখের অস্বাভাবিক বিবর্ণতা চোখে পড়তে কোন অসুবিধা হয় নি। ছোকরা সত্যই অসুস্থ--কিন্তু তার জন্য এদের কোন দয়ামায়া হবার কথা নয়—হয়ও নি।

মীর মর্দানের সৌভাগ্যক্রমে সর্দারজীরই এ দৃশ্য সহ্য হ'ল না বেশীক্ষণ। একটু পরেই 'চলো ভাইয়া' বলে বেরিয়ে এল সে ভীড় থেকে। একটু নির্জনে এসে একটা নিশ্বাসও ফেলল সে। বলল, 'ঈশ্বরের বিচার ভাইয়া। এতে বলবার কিছু নেই। বরং আমাদের তো উৎসব করারই কথা, গুরু তেগবাহাদুরকে খুন করার শোধ উঠল এতদিনে। আমরা জানতুম, ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি, গুরুর সে হত্যার শোধ দুনো উসুল করবে একদিনে সাদা চামড়ার লোক এসে, তবু—বড়ই খারাপ লাগে। হাজার হোক বাদশা, সেদিন পর্যন্ত কুর্ণিশ ক'রে সামনে যেতে হয়েছে। জয় ভগবান!'

মীর মর্দানের অবশ্য এসব দিকে কান ছিল না। তিনি ভাবছিলেন নিজের আসন্ন ও প্রত্যক্ষ ভবিষ্যতের কথা। কটা দিনের মধ্যেই এমন নিরাশ্রয় ও নিরবলম্ব হয়ে পড়বেন দিল্লী শহরে, তা ভাবেন নি। সর্দারজীর বাড়িতে কটা দিন স্থান হবে কিনা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন একবার—সর্দারজী সাফ বলে দিয়েছিল, এসব ঝামেলায় সে যেতে রাজী নয়। সারাদিন এই দায় বয়ে বেড়িয়েছে এইটেই অন্যায় হয়েছে। ভাগ্যের সঙ্গ বেশী চালাকি করতে নেই।—শহরের বাইরে বার ক'রে দিয়েই তার ছুটি, আর কোন দায়-দায়িত্ব নিতে পারবে না সে।...

কিন্তু এখন সন্ধ্যার মুখে শহরের বাইরে পেঁছে কোথায় নামাবে ওঁকে—সর্দারজীরও বোধহয় সে চিন্তা হ'ল একটু। যতই হোক করকরে একটা টাকা দিয়েছে, তাছাড়াও গাড়ি-ভাড়া বলে দিয়েছে কিছু। একেবারে মাঠের মধ্যে কিছু নামিয়ে দেওয়া যায় না। তা মিঞাসাহেব একটা কাজ করবে? এদিকে তো কোথাও কিছু নেই। চারিদিকের বসতি সব জনশূন্য। সামনে ঐ গাজী খাঁর গোরস্তানে শুনেছি আফগান মুলুকের আমির সাহেবের রিস্‌তাদাররা থাকেন—আমীর সাহেবের

দূতও আছেন একজন। আংরেজরা শহরে ঢোকবার আগেই ওঁরা এসে এখানে আস্তানা নিয়েছিলেন, তা অবশ্য আংরেজরাও কিছু বলে নি। পাঠানদের সঙ্গে ওদের কোন ঝগড়া-বিবাদ নেই তো। ঐখানে তোমাকে পৌঁছে দিতে পারি—দ্যাখো। আমি ওদের ওখানেও সব্‌জী ঘিউ বেচে আসি মধ্যে মধ্যে—ওদের সঙ্গে জানপছান আছে। আমি বললে ওরা হয়ত কিছুদিন আস্তানা দিতে পারে তোমাকে —ভেবে দ্যাখো!'

মীর মর্দান এতক্ষণ চোখে অন্ধকার দেখছিলেন একেবারে—মাঠের মধ্যে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় তো বটেই—আবার আশ্রয়ের খোঁজে কোথাও গেলে যদি ঐ হারামখোর আংরেজগুলোর সামনে পড়েন—সে তো নিশ্চিত মৃত্যু। এই উভয় সংকটে পড়ে গুরু বড়পীর বাবাকে ডাকছিলেন মনে মনে—এখন মনে হ'ল সাক্ষাৎ অনুগ্রহ নেমে এল সর্দারজীকে ভর ক'রে।

তিনি একেবারে সর্দারের হাত দুটো চেপে ধরে বললেন, 'আপনার বুহৎ মেহেরবানী সর্দারজী। আপনার ঋণ কখনও ভুলব না। যদি খোদা কখনও দিন দেন—আপনার কথা ইয়াদ থাকবে।'

'খোদা দিন দিলে আমি ছাড়াও ইয়াদ করার মতো অনেক লোক থাকবে বড়ে মিঞা—তা আমি জানি। তার জন্যে কোন আপসোসও নেই আমার। নাও চলো—ওঠো আবার গাড়িতে।' সর্দার মৃদু হেসে উত্তর দেয়।

সর্দার শুধু পৌঁছেই দিল না, ওখানকার একজন কর্তাব্যক্তিকে বলে জিম্মাও ক'রে দিল। তারপর দ্রুত গাড়ি হাঁকিয়ে নিজের বাড়ির দিকে রওনা দিল সে। অনেক পথ এখনও যেতে হবে তাকে, এই হাঙ্গামার সময়, আঁধেরাতে পথ চলা এখন ঠিক নয়।

যে ব্যক্তির জিম্মা করে দিয়ে গেল সর্দার, সে এবার মীর মর্দানকে পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল। এতক্ষণ অন্ধকারেই কথা হচ্ছিল, এখন ভেতরে এসে চিরাগের আলোতে দুজনেই দুজনকে দেখল—মুখের দিকে তাকিয়ে।

আর দুজনেই চিনল দুজনকে।

কাইয়ুম খাঁ—মীর মর্দানের চিনতে দেরি হ'ল না। এই লোকটাই না সেই বদবখ্‌ত্‌ সিপাহীটাকে খুন করার জন্য ঘুরত?

আল্লার অসীম অনুগ্রহ মীর মর্দান খাঁর ওপরে, আজ ভাল ক'রেই বুঝলেন তিনি।

শাহ্‌জাদী আর তাঁর জেবর-জহরৎ—হয়ত এখনও একেবারে দুরাশা নয়, স্বপ্নের মতো সুদূরও নয়। হয়ত এখনও—দুটোর না হোক, একটা পাওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে।

লোভে ও সম্ভাব্য প্রতিহিংসার আনন্দে মীর মর্দান খাঁর চোখ জ্বলতে থাকে।

সেই অবিরাম একঘেয়ে ক্লান্তিকর পথ চলা। সেই সদা সন্ত্রস্ত হয়ে সাবধানে থাকা। মেপে মেপে ফেলা প্রতিটি পদক্ষেপ। সেই জনবহুল জনপদ এড়িয়ে চলা। তফাৎ শুধু আগের নিঃসঙ্গতাটা আর নেই। যদিও স্বল্পভাষী আগা আগের চেয়েও স্বল্পবাক্ হয়ে উঠেছে, আগের চেয়ে ঢের বেশী ভ্রূকুটি-গম্ভীর হয়ে উঠেছে তার মুখ—ঢের বেশী হতাশা ও বিমর্ষতা পেয়ে বসেছে তাকে—তবু প্রথম কদিনের সেই একান্ত অপরিচয়ের কঠিন ব্যবধানটা চলে গেছে দুজনের মধ্যে থেকে। একটা অস্তিত্বহীন দুর্ভাগ্য তাদের দুজনকে এক প্রবল সহানুভূতির সূত্রে পরস্পরের নিকটবর্তী ক'রে তুলেছে। সেইজন্যই সর্বপ্রকার-পরিশ্রম-বিমুখ রাজান্তঃপুরিকার ঘন ঘন বিশ্রাম ও মন্থর কুর্মগতিও আগের মতো আগাকে অসহিষ্ণু বা বিরক্ত ক'রে তোলে না। ...তার অন্তর-আশমানের চাঁদকে যে ভালবাসে সে তার নিকট-আত্মীয়ারও বেশী—তার জন্য সব সহ্য করতে পারবে আগা।...

আত্মীয়তা-বোধ জন্মেছে বলেই মমত্ববোধও দেখা দিয়েছে। শাহ্‌জাদীর আহার ও বিশ্রাম সম্বন্ধে বেশী সচেতন হয়ে উঠেছে আগা। এখন সে অপরাহ্ণ হবার আগে থাকতেই রাত্রের আশ্রয় সম্বন্ধে চিন্তা করে, প্রত্যূষে যাত্রা শুরু করার আগেই মধ্যাহ্নের আহার্য সংগ্রহ ক'রে নেয়।

আর সেই সূত্র ধরেই কখন যে সতর্কতাটা একটু শিথিল হয়ে আসে, তা টের পায় না কেউই। যে কারণে সে এতকাল সযত্নে লোকালয় এড়িয়ে চলেছে—খাওয়া-শোওয়ার সকলবিধ কষ্ট সহ্য ক'রেও—সে কারণটাই ভুলে বসে বোধ হয়। ফলে তাদের প্রকাশ্য রাজপথ ছেড়ে এই বনপথ ধরে চলার উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যায়। আশপাশের গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে এই দুটি অল্পবয়সী ছেলেমেয়ের অভিযানের কথা। সে বার্তা বহুদূরে দুশমনের কানেও পৌঁছয়। আর তার ফলে এতকাল পরে আগার পুরাতন শত্রুরা আবার দেখা দেয় তার ভাগ্যের পথে।

সবে এই কিছুদিন হ'ল একটু নিশ্চিন্ত হয়েছিল আগা. ভাবতে শুরু করেছিল যে এই গদর তার অন্তত একটা উপকার করেছে—রাজমাকীদের তাড়িয়েছে এ অঞ্চল থেকে। তার মতো সামান্য একটা লোকের জন্যে রাজধানীতে বসে থেকে এই ঝঞ্ঝাট-ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়বে—এত নির্বোধ নিশ্চয়ই নয় তারা, হাঙ্গামার সূত্রপাতেই নিশ্চয় পালিয়েছে এখান থেকে। দিল্লীতে থাকলে কি আর গত তিন-চার মাসে একবারও একজনও দেখতে পেত না? আর যদি একবার ফিরে গিয়ে থাকে সেই সুদূর পাখ্‌তুনিস্তানে—তাহ'লে সহজে আর ফিরবে না, এটা ঠিক। বিশেষ ক'রে ইংরেজরাজই কায়েম হ'ল যখন—আরও ভয়ে ভয়ে থাকবে ওরা। ইংরেজ সরকার বরাবরই এসব ব্যাপারে অনমনীয়—এবার তো নিশ্চয় আরও দৃঢ়হস্তে সর্বপ্রকার গুণ্ডামি দমন করবে।

কিন্তু তার আশার প্রাসাদ ভাগ্যের এক ধাক্কায় ধূলিসাৎ হয়ে গেল। ধাক্কারও বোধ করি প্রয়োজন হ'ল না : তার বিদ্রূপের অট্টহাসিতেই সে তাসের প্রাসাদ ভেঙ্গে পড়ল। ভুল ভাঙ্গল একটা আকস্মিক রূঢ় আঘাতে—হঠাৎ যখন চার-চারজন অশ্বারোহী সেই নির্জন বনপথে, যেন মাটি ফুঁড়ে—একেবারে পথ রোধ ক'রে

দাঁড়াল সামনে এসে।

তখনও অপরাহ্ণ সেই অরণ্য-মধ্যে তার ছায়া বিস্তার করে নি, সূর্য তখনও মধ্যগগনে। সুতরাং পরিষ্কারই দেখা গেল, আর দেখে চিনতেও পারল—সামনেই কাইয়ুম খাঁ, তার চিরশত্রু।

কাইয়ুম খাঁও—বোধ করি শিকার এমন অসহায় ভাবে হাতের মধ্যে এনে দেবার জন্য ঈশ্বরকে অস্ফুটকণ্ঠে একটা ধন্যবাদ জানিয়ে—পিছনের কোন সঙ্গীর উদ্দেশ্যে বলে উঠল, 'না, মীর মর্দান খাঁ বাকতাল্লা দেয় নি দেখছি—খবর পাকা। এতদিনের দেনা উশুল হবে এবার—মায় সুদসুদ্ধ। ওর সেই হারামজাদা বোনটাকে পাওয়া গেল না এই যা—তবে তার বদলে আরও খানদানী ঘরের মেয়ে, হয়তো কোন বাদশাজাদীই হবে—মন্দ কি!'

পিছন থেকে আফজল বলল, 'সুদের ওপরও টেকে আছ নাকি মামা! ওটা যে মীর মর্দান বকশিশ চেয়েছে, এই খবরের দাম বা দালালীও বলতে পারো। ওটা গায়েব করা কি ঠিক হবে? তুমিও জবান দিয়েছ!'

'আরে রেখে দাও! বেইমানকে দেওয়া জবান রাখে বে-অকুফে। ও কথার কি দাম আছে কিছু?...আর তোমার মীর মর্দান খাঁই কি জিন্দা আছে ভাবছ! ইংরেজের গুলিতে কাবার হয়ে গেছে—নইলে লক্ষ্ণৌয়ের দিকে পালিয়েছে অন্তত। মেয়েমানুষের লোভ যতই হোক—জানের চেয়ে তো বড় নয়।'

অতি দ্রুত কথা হচ্ছিল। কথার সময়ও কেউ থেমে ছিল না। তৈরী হচ্ছিল আক্রমণের জন্যই। খোলা তলোয়ার দুজনের হাতে—বাকী দুজনের হাতে উদ্যত বন্দুক।

আগা এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে তার বেশ কিছুটা সময় লাগল ব্যাপারটা বুঝতে। ভাগ্যে তার আগেই ওরা গুলি ছুঁড়ে বসে নি! বোধ হয় জীবন্ত ধরতে চায় বলেই ছোঁড়ে নি, কিম্বা নিশ্চিত আয়ত্তের মধ্যে এসে পড়েছে শিকার--সেই জন্যই নিশ্চিন্ত ছিল।...

বিপদটা বুঝতে যেটুকু দেরি। তারপরই নিমেষ-মধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠল সে। সমস্ত ঘটনা--মায় ওদের কথাবার্তা উত্তর-প্রত্যুত্তর--এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটেছে যে ওরাও বেশী কাছে এগিয়ে আসতে পারে নি এর মধ্যে। তখন এবং তার পরেও—যা কিছু ঘটল, এত দ্রুত সব হয়ে গেল যে সবাই সব ঘটনা বুঝতেও পারল না।

আগা এ আক্রমণের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না--সেইজন্যই প্রথমটায় একটু বিহ্বল হয়ে পড়েছিল—কিন্তু তার পর কোন জড়তা কি দ্বিধা রইল না এবং অতি-সক্রিয়তার জন্যই সম্ভবত—প্রথমেই যা ক'রে বসল তাতে তার পূর্বপুরুষরা বেঁচে থাকলে তো বটেই—এখনও যাঁরা প্রাচীন বা বয়স্ক লোক আছেন—শিউরে উঠতেন। মুঘল অন্তঃপুরিকা, তা হোক না কেন পরস্যাপি পর কেউ, বাদশার বহু দূর-সম্পর্কের আত্মীয়েরও বহু দূর-সম্পর্কীয়া কোন মেয়ে—অনাথা, আশ্রিতা—তার গায়েও পরপুরুষের হাত দেওয়া কল্পনাতীত ঘটনা। কিন্তু আগা এই নিদারুণ আপৎকালে কোন দ্বিধা করল না, মিথ্যা সম্ভ্রম-বোধকে আঁকড়ে ধরে থেকে বিপদের বিজয়-লাভের পথকে সুগম করল না—সে সবলে একটা ধাক্কা দিয়ে মেহেরকে পাশের ঘন জঙ্গলের দিকে ঠেলে দিয়ে চাপা তীক্ষ্ণকণ্ঠে—যেন হিস্-হিস ক'রে বলে উঠল, 'পালান, পালান শাহজাদী—যেমন ক'রে হোক জঙ্গলের মধ্যে চলে যান—আমি এদের দেখছি ততক্ষণ—'

বলতে বলতেই কোমর থেকে পিস্তলটা খুলে নিয়েছে সে। কিন্তু বলা বাহুল্য শত্রুপক্ষও চুপ ক'রে নেই ততক্ষণ। কিছু দূরেই ছিল ওরা তখনও, হয়ত আগার কুর্তার নিচে যে পিস্তল আছে তা বুঝতে পারে নি। যখন এক নিমেষের মধ্যে সে পিস্তল বার ক'রে তুলে ধরল, তখন আর এগিয়ে এসে ওকে আঘাত করার সময় ছিল না। আগার সৌভাগ্য যে কাইয়ুম খাঁর হাতে তৈরী বন্দুক ছিল না—ছিল তলোয়ার, তাই রক্ষা। কাইয়ুম খাঁর বন্দুকের টিপ অব্যর্থ, সমগ্র পাখতুনিস্তানে সে বিখ্যাত তার লক্ষ্যের জন্য। কিন্তু যাদের হাতে বন্দুক ছিল তারাও, সম্ভবত আগাকে জীবিত বন্দী করার আশাতেই—বুক ও মাথা বাঁচিয়ে গুলি করতে গেল। আগাও এসবে অভ্যস্ত, তার ক্ষিপ্রতাও ওদের চেয়ে কম নয়—সে সেই অসাধারণ ক্ষিপ্রতার জন্যই গুলি দুটো বাঁচাল কিন্তু তার নিজের পিস্তলও ছোঁড়া হ'ল না। কাইয়ুম খাঁ এক লহমারও ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের মধ্যে হিসেব ক'রে নিল যে সে এগিয়ে আগাকে আঘাত করার আগেই আগা পিস্তলের ঘোড়া টিপবে। সে কিছুমাত্র ইতস্তত না ক'রে ভারী তলোয়ারখানাই বর্শার মতো ক'রে ছুঁড়ল এর দিকে।

কাইয়ুম খাঁর হাতের যা জোর আর তলোয়ারখানার যা ওজন এবং তীক্ষ্ণতা, তাতে আগার সেযাত্রা রক্ষা থাকত না, যদি না সেও—ব্যাপারটা চকিতের মধ্যে অনুমান ক'রে নিয়ে—হঠাৎ ডান দিকে হেলে পড়ত, (তখন আর সরবার বা বসবার সময় ছিল না) তার ফলেই তলোয়ারখানা কোথাও বিঁধতে বা কাটতে পারল না, তবে তার পিছন দিকটা এসে সজোরে আঘাত করল ওর বাহুমূলে—ফলে ক্ষণিকের মতো অবশ হাত থেকে পিস্তলটা খসে পড়ল।

উল্লাসে চিৎকার ক'রে উঠল দুশমনের দল। চারটে সশস্ত্র সুশিক্ষিত লোকের সামনে একটি নিরস্ত্র তরুণ, এ আর কী বা কতক্ষণ যুঝবে?—এই ছিল বোধ হয় সে উল্লাসধ্বনির মর্মার্থ। আগার কোমরে যে তলোয়ার ঝুলছে তা খুলে নিতে কিছু দেরি হবে, তার মধ্যেই তারা ওকে কাবু করতে পারবে। তা না হ'লেও—ওর তলোয়ার ছোট, এতটুকু—তা নিয়ে এত বড় বড় তলোয়ার-বন্দুকের সঙ্গে লড়তে পারবে না অবশ্যই। কিন্তু তাদের সে বর্বর জয়োল্লাসের শব্দ বাতাসে মিলোবার আগেই আগা বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে—পিস্তল নয়, কাইয়ুম খাঁর তলোয়ারখানাই কুড়িয়ে নিল এবং ওরা আক্রমণের কথাটা ভাল ক'রে ভাববারও আগে সে ছুটে গিয়ে আক্রমণ করল স্বয়ং কাইয়ুম খাঁকেই—

কাইয়ুম তখনও পিঠের বন্দুকটা খুলে নেবার অবসর পায় নি। বস্তুত তখন সে সম্পূর্ণভাবে হাতিয়ার-শূন্য। ঘোড়াসুদ্ধ পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করতে প্রাণটা বাঁচল কিন্তু দেহটা অক্ষত রইল না। একেবারে ডান হাতেই এসে আঘাত করল, নিজেরই ভারী তীক্ষ্ণধার তলোয়ারখানা! দেখতে দেখতে তাজা উষ্ণ রক্তে লাল হয়ে উঠল কুর্তার হাতা, 'অয়্ আল্লা!' বলে পিঠের বন্দুক খোলবার চেষ্টা ত্যাগ ক'রে বাঁ হাতে সেই ক্ষতস্থানটা চেপে ধরল তাড়াতাড়ি। শিক্ষিত ঘোড়া বোধ করি বিপদ বুঝতে পেরে নিজেই পিছিয়ে গেল খানিকটা।

কিন্তু ততক্ষণে আফজল নিজের ঘোড়াটা এগিয়ে দিয়েছে আগার সামনে, মামাকে রক্ষা করবার জন্যেই বোধ হয়। আসল লড়াইটা বাধল এবার এই দুজনেই। আগার অসুবিধা সে মাটিতে দাঁড়িয়ে, ওরা ঘোড়ার পিঠে; তবে একদিক দিয়ে তাতে সুবিধাও হ'ল কিছু। কারণ আগা যতটা ক্ষিপ্রগতিতে তার অবস্থান পরিবর্তন

করতে পারছিল আফজল ততটা সহজে পারছিল না। ঘোড়া যতই সুশিক্ষিত হোক —ইঙ্গিত পেলে সে হয়ত সব বুঝতে পারে, অথবা চরম বিপদও বুঝতে পারে হয়ত—কিন্তু কখন কী ভাবে আরোহীর সরা ফেরা দরকার তা বুঝতে পারে না, তার জন্য ইঙ্গিতটুকুর অন্তত প্রয়োজন। তাছাড়া তার অতবড় দেহটায় মানুষের মতো ক্ষিপ্রতা সম্ভব নয়।

আফজলের সঙ্গে যে দুজন বন্দুকধারী ছিল তারা ইতিমধ্যে টোটা ভরে নিয়েছে আবার। কিন্তু গুলি ছুঁড়বে কার ওপর? এরা দুজনে মুহূর্তে মুহূর্তে স্থান পরিবর্তন করছে—গুলি করতে গেলে আফজলকে বেঁধবার সম্ভাবনা প্রায় আগার সমানই। তারা বন্দুক উঁচিয়েও 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—সেটা দেখার সুযোগ ছিল না—অনুমান ক'রে নিয়েই 'বে-অকুফ' 'উল্লু' বলে গাল দিয়ে উঠল আফজল। তখন তারা বন্দুকগুলো আবার পিঠে ঝুলিয়ে তলোয়ার বার করল কোমর থেকে।

ততক্ষণে কিন্তু আফজলও ঘায়েল হয়ে এসেছে। তার শরীরের দু জায়গায় আগার তলোয়ারের খোঁচা লেগে জামা ভিজে উঠেছে রক্তে—তার বদলে আগার কাঁধের কাছে সামান্য একটা খোঁচা লেগেছে মাত্র। মোক্ষম চোট লেগেছে আফজলের ডান হাতের কনুইয়ে—তাতে রক্তপাত যত না হোক, অবশ হয়ে গেছে সারা হাতটা।...ঠিক সেই সময়ই এরা দুজন তলোয়ার বার করেছে—আগা তো প্রমাদ গুণেছিল প্রথমটায় —তবে দেখা গেল দৈব একেবারে বিরূপ নন তার প্রতি। ভাগ্য সহায় হ'লে বুদ্ধিও খুলে যায়। নতুন লোক দুটি যখন মানুষের কথাই ভাবছে শুধু, অর্থাৎ নিজেদের যথাসাধ্য নিরাপদে রাখা এবং আগাকে আহত করার কথা, তখন আগা তাদের ছেড়ে বিদ্যুৎগতিতে ওদের একজনের ঘোড়ার গলায় তলোয়ার চালিয়ে দিল। ঘোড়াটা যন্ত্রণায় লাফিয়ে উঠে অসতর্ক আরোহীকে ফেলে তীরবেগে ছুটল বনের মধ্যে, যদিও বেশী দূর যেতে পারল না—অন্ধভাবে ছুটতে গিয়ে একটা গাছে ধাক্কা লেগে পড়ে গেল, আর উঠতে পারল না।

যে ভাল অশ্বারোহী তার ঘোড়ার ওপর মমতা মানুষের চেয়ে বেশী। ঘোড়াকে ইচ্ছে ক'রে জখম করা সে পাপ বা অপরাধ বলেই মনে করে—আগারও অনুশোচনা ও দুঃখের সীমা রইল না—কিন্তু তার আর উপায় ছিল না তখন। আত্মরক্ষা মহাধর্ম, যেখানে তার নিজের জান এবং জানের চেয়েও বড়, মানের প্রশ্ন—বাদশার কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে না পারা তার কাছে চরম লজ্জারই কথা—সে দুটিই যেখানে বিপন্ন, সেখানে একটা ঘোড়ার প্রাণের কথা চিন্তা করা মূর্খতা।

তার এ উপস্থিত বুদ্ধির ফলও হাতে হাতেই ফলল অবশ্য। কাইয়ুম ও আফজল দুজনেই জখম হয়েছে যথেষ্ট—বাকী দুজনেরও একজন ভূপাতিত, কী পরিমাণ জখম হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না—এ অবস্থায়, মাত্র একজনের ওপর নির্ভর ক'রে এই 'সাক্ষাৎ শয়তানের বাচ্চা'টার সঙ্গে লড়াই করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করল না কাইয়ুম। সে একলাফে সেই মাটিতে-পড়ে-যাওয়া লোকটার কাছে এসে হ্যাঁচকা দিয়ে টেনে নিজের ঘোড়াতে তুলে নিয়ে পিছু হঠবার ইঙ্গিত দিল এবং সবাইকে নিয়ে দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল। সঙ্গীরাও মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণে বিলম্ব করল না।

ঘোড়া একটা থাকলে আগা ওদের অত সহজে ছাড়ত না, চিরকালের মতো আপদ

দূর করার সুন্দর সুযোগ মিলেছিল, কিন্তু এ অবস্থায় ওদের পিছু নিতে যাওয়া মূর্খতা। সে চেষ্টাও সে করল না। রক্তাক্ত তলোয়ারখানা (বেশ তলোয়ার—লোভ হচ্ছিল খুব কিন্তু দুশমনের জিনিস বিষবৎ পরিত্যজ্য) একটা বড় গাছের উঁচু মোটা ডাল লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ে দিয়ে--সেটা গাছের কাঠ ভেদ ক'রে প্রায় আধ হাত প্রমাণ বিঁধে ঝুলতে লাগল দেখে—নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের পিস্তলটা খুঁজতে প্রবৃত্ত হ'ল। তাড়া নেই আর, যারা পালিয়েছে তারা দলে ভারী না হ'য়ে আর ফিরবে না সে বিষয়ে আগা নিশ্চিন্ত। সে ধীরেসুস্থেই পিস্তলটা কোমর-বন্ধে গুঁজে চারিদিকে তাকাল।

তার বোধ হয় আশা ছিল শাহ্‌জাদী কাছেই কোথাও আড়াল থেকে লড়াই দেখছেন -এইবার নিজেই বেরিয়ে আসবেন অন্তরালের আশ্রয় থেকে। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না। আরও যেটা বিস্ময়কর—তাঁকে কোথাও দেখাও গেল না।...

তাহ'লে কোথায় গেলেন শাহ্‌জাদী?

সাধারণ বুদ্ধিতে যেখানে যেখানে পাওয়া উচিত বলে মনে হয়—আগে সেই সব জায়গাতেই দেখল -অর্থাৎ কাছাকাছি যেখানে কিছু লতাগুল্ম অন্তরাল-মতো সৃষ্টি করেছে--কিন্তু সেসব কোন জায়গাতেই নেই। একটা ঝোপের কাছে খানিকটা জায়গায় লতাপাতাগুলো একটু বিদলিত মনে হ'ল, হয়ত এখানে এসেছিলেন বা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েও ছিলেন—আবার এ অন্য কারও উপস্থিতিরও সাক্ষ্য হ'তে পারে। হয়ত কাল কোন রাহী এখানে বিশ্রাম করেছিল কিম্বা আজ সকালে—

অর্থাৎ মূল প্রশ্নটা নিরুত্তরিতই থেকে যায়।

কোথায় গেলেন ভদ্রমহিলা?

এদিক ওদিক অনেকটা পর্যন্ত দেখে এল, কোথাও নেই। একটা গাছে উঠে যতদূর দৃষ্টি যায় চারিদিকে তাকিয়ে দেখল—কিন্তু কোথাও সে গাঢ় সবুজ রঙের বুরখাটার চিহ্ন পর্যন্ত দেখা গেল না।

এবার রীতিমতো চিন্তিত হয়ে উঠল আগা। তার ললাটে গলায়—কিছু পূর্বের পরিশ্রম-জনিত ঘাম তো ছিলই, সেটা এখন স্রোতের আকার ধারণ করল। শুধু তাই নয়, চরম বিপদের ক্ষণেও যা হয় নি—এখন তাই হ'ল—কেমন যেন সামগ্রিক একটা দুর্বলতা বোধ করতে লাগল সে, পা দুটো যেন হঠাৎ অবশ বোধ হ'ল। সে অবসন্ন ভাবে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

তবে সে কয়েক মুহূর্ত-কালের জন্যই।

পরক্ষণেই মনে পড়ল যে এভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা তার চলবে না। এমন ভাবে ভাগ্যের কাছে হার মানার অভ্যাস তো নেই-ই, অধিকারও নেই তার। শেষ পর্যন্ত, মানুষের সাধ্যে যা সম্ভব সেই পর্যন্ত, না দেখলে তার দায়িত্ব থেকে, কর্তব্য থেকে, প্রতিশ্রুতি থেকে রক্ষা পাবে না। যতক্ষণ না সে শাহ্‌জাদীর দেখা পাচ্ছে—ততক্ষণই খুঁজে যেতে হবে তাকে, সে কর্তব্য শেষ না ক'রে তার স্বস্তিও নেই, বিশ্রামও নেই।

সে জোর ক'রে যেন হাত-পাগুলোকে সক্রিয় ক'রে তুলল। বল আনল পায়ে, নিশ্বাস আনল বুকে। আবার শুরু করল খোঁজা। দাগ দিয়ে দিয়ে, একদিক থেকে আর একদিকে—পরিক্রমা করার মতো ক'রে ঘুরতে লাগল। শুধু পরিধিটা বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হ'তে লাগল—এইমাত্র। এক বর্গহাত পরিমিত স্থানও না তার অনুসন্ধানী দৃষ্টি থেকে বাদ যায়।

কিন্তু আরও অনেকক্ষণ খোঁজার পরও যখন তাঁর চিহ্ন পর্যন্ত মিলল না, তখন ক্ষোভে দুঃখে অনুশোচনায় যেন চোখে জল এসে গেল আগার। আবারও অসহায় ভাবে বসে পড়ল সে একটা জায়গায়—

আর সেই বসবার সঙ্গে সঙ্গেই নজরে পড়ল, আরও খানিকটা দূরে ঢিপির মতো একটা ছোট পাহাড়। ঘন কতকগুলো কি ছোট ছোট গাছে বোঝাই—তাতে হলদে হলদে ফুল ফুটেছে—শিয়াকুল-কাঁটার মতোই গাছগুলো, হয়ত তাই হবে। ঢিপিটার তলার দিকে নিচু নিচু কাঁটা-গাছের ঝোপ, বুনো বেত জাতীয়। কিন্তু সেই ঢিপিরই পিছনদিক থেকে সামান্য একটা কি বস্তু বাতাসে নড়ছে—যেটা গাছ-পালা বা লতা নয়—অন্য কোন মানব-ব্যবহৃত পদার্থ। আগার মনে হ'ল ওর বিশেষ পরিচিত সেই গাঢ় সবুজ রঙের বুরখাটারই প্রান্ত।

পাগলের মতো উঠি কি পড়ি ক'রে দৌড়ল আগা। ঢিপির তলার দিকটা—কবির ভাষায় যাকে শৈলসানু বলা যায়—তাতে এত ঘন হয়ে আছে সেই বুনো কাঁটাগাছের গুল্ম যে আগারই কষ্ট হ'তে লাগল সে কাঁটা ডিঙিয়ে বাঁচিয়ে যেতে। কাঁটাগাছ পার হয়েও কষ্টের শেষ হ'ল না, আগাছা ঝোপগুলোর এত গাঢ় সম্বন্ধ যে পা ফেলারই জায়গা খুঁজে পাওয়া যায় না।...ঐ সবুজ পদার্থটা যদি সত্যিই শাহ্‌জাদীর বুরখা হয় তো তিনি গেলেন কী ক'রে?—এই পথ দিয়ে?

আসলে নিশ্চয় ভয়ে দিশাহারা হয়ে ছুটেছেন, কোথা দিয়ে কী ভাবে যাচ্ছেন অত বুঝতেও পারেন নি তাই। এ দাঙ্গালড়াই থেকে যতটা দূরে যেতে পারেন —সেই চেষ্টাই করেছেন শুধু।

অতি কষ্টে, গা-ছড়ে পা-কেটে যখন সেই বড় ঝোপটার পাশে গিয়ে পৌঁছল, তখন একই সঙ্গে একটা বিপুল উল্লাস এবং সুগভীর আতঙ্কে কিছুক্ষণের জন্য যেন অনড় হয়ে গেল সে। সেই বুরখা তাতে সন্দেহ নেই, বুরখার মধ্যে মানুষটাও আছে নিশ্চয়, কারণ দুটো পা বেরিয়ে আছে তা থেকে—সে তো দেখাই যাচ্ছে সামনে। কিন্তু অমন নিথর নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে কেন? বেঁচে আছে তো? ভয়ে পথকষ্টে মূর্ছাও যেতে পারে অবশ্য, তবে মূর্ছাই তো?

নাকি—নাকি—

নাকি যে আরও কী হ'তে পারে—সেটা নিজের মনেও স্পষ্ট উচ্চারণ করতে যেন বাধল তার। কিন্তু তাই বলে ভয়টা অস্পষ্ট বা মনের অগোচরে রইল না বেশীক্ষণ। কাছে বসে—দূর থেকে যতটা দেখা সম্ভব দেখল—কিন্তু নিজের মানসিক উদ্বেগ-উত্তেজনার জন্যই হোক বা মনে মনে আশঙ্কাটা প্রবল হয়ে উঠছে বলেই হোক—নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে বুকটা ওঠানামা করছে কিনা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না। একবার মনে হয় একটু একটু কাঁপছে বুঝি, আবার মনে হয় ওটা চোখের ভুল। চোখ রগড়ে ভাল ক'রে চেয়ে দেখেও সন্দেহের নিরসন হ'ল না।

আগা এবার যেন চোখে অন্ধকারই দেখল।

গা ঠেলে গায়ে হাত দিয়ে দেখবে?

অথবা বুরখার ওপরদিকটা খুলে মুখটাই দেখবে আগে, নাকে হাত দিয়ে দেখবে নিশ্বাস পড়ছে কিনা?—তেমন তেমন হ'লে অর্থাৎ শুধু মূর্ছা হ'লে মুখে মাথায় জল দিয়ে বাতাস ক'রে জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করবে?

কিন্তু সব কটাই যে সমান অপরাধ। প্রচণ্ড দুঃসাহস, চরম ধৃষ্টতা!

সংস্কার অনেক সময় মানুষের প্রাণের মূল্য ছাপিয়েও বড় হয়ে ওঠে। অথচ

সংস্কার ত্যাগও তো করতে পারে না! যুগে যুগেই এমন সংস্কার থাকে বা দেখা যায়—যাকে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না, অথচ যা এক-এক সময় মানুষের জীবনযাত্রার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করে। যুগে যুগেই আছে এরা, যুগে যুগেই থাকবে! রূপান্তর হবে হয় তো, নামান্তর ঘটবে—কিন্তু মূল জিনিসটা যাবে না কখনও, মানুষের জীবন ও জীবনযাত্রা থেকে।...আগার যুগে—তার জন্মাবধি, এইসব সংস্কারকেস সত্য বলে জেনেছে। বড় খানদানী ঘরের মহিলারা অসূর্যম্পশ্যা, সূর্যও দেখতে পান না তাদের—মানুষ কোন্ ছার! তাঁদের গায়ে কোন পুরুষের হাত দেওয়া প্রচণ্ড অপরাধ, মুখ দেখা গুনাহ্—বিশেষ ক'রে তার মতো সেবকশ্রেণীর পুরুষের পক্ষে।

ছেলেবেলায় দেশে থাকতে কাবুলের এক সর্দার পরিবারের গল্প শুনেছিল সে। এক সর্দারণীর বুরখার প্রান্তে আগুন ধরে যেতে তিনি ভয় পেয়ে ছুটে বাইরের প্রাঙ্গণে চলে এসেছিলেন। সেদিন সেখানে ছিল গ্রামের মজলিস বা পঞ্চায়েতের বৈঠক, এক উঠান পুরুষ উপস্থিত ছিলেন সেখানে। কিন্তু ঐ মহিলার স্বামী বা ছেলে কেউ উপস্থিত ছিল না বলে কেউ গিয়ে বুরখাটা খুলে নেবার কি আগুন নেভাবার চেষ্টা করল না। ফলে মহিলাটি পুড়েই মারা গেলেন শেষ পর্যন্ত।

সে যা হোক্—এ জনহীন স্থানে গভীর অরণ্যের মধ্যে চার দিন বসে অপেক্ষা করলেও কোন স্ত্রীলোকের দেখা পাবে কিনা সন্দেহ। কোনও লোকালয় খুঁজে কোন মেয়েছেলেকে সব বলে বুঝিয়ে ডেকে আনতে আনতে অচৈতন মানুষটাকে ধরে হয়ত শিয়াল-কুকুরে টানাটানি করবে—বাঘ-ভাল্লুকে খেয়ে ফেলাও বিচিত্র নয়। এমনি পড়ে থাকলেই বা কত দিন বাঁচবে—অনাহারে বিনা শুশ্রূষা কি চিকিৎসায়?

না, সে রকম শোচনীয় মৃত্যুর দায় সে মাথায় তুলে নেবে না নিশ্চিত। কিন্তু তা হ'লে, এখন কর্তব্য কি! গায়ে হাত দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কী ভাবে সেটা হবে তাই বুঝতে পারছে না যে! একবার পায়ে হাত দিয়েছিল অবশ্য, না দিয়ে উপায় ছিল না, খুবই বিপদে পড়ে দিতে হয়েছিল। ঠিক সে রকম না হ'লেও—এ বিপদও বড় কম নয়, এও তো জীবন-মরণ সমস্যা। সুতরাং—একবার যা করেছিল, আর একবার তা করতে দোষ কি?

আস্তে আস্তে, সসঙ্কোচেই তার সামনে প্রসারিত একটি পায়েই হাত দিল সে। কিন্তু পা-টাও যে ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে। খুব বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ত নয়—কিন্তু জীবন্ত, বিশেষ ক'রে তরুণবয়স্ক ছেলেমেয়ের, গা যেমন গরম হওয়া উচিত, তেমনও তো নয়!

তবে কি—?

মরেই গেলেন নাকি সত্যি সত্যি?

শুধু ভয়ে কি মানুষ মরে? মূর্ছা যায়—অজ্ঞান হয়ে যায়—এমন শুনেছে। কিন্তু তাতে কি এত ঠাণ্ডা হয় হাত-পা?

বনের মধ্যে দিয়ে আসতে আসতে সাপে কামড়ায় নি তো?...শেষ-শরতের দিন, এখনও বনেবাদাড়ে সাপখোপ থাকা বিচিত্র নয়।...

ভাবতে ভাবতে নিজেরই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে আগার।

আর ইতস্তত করা উচিত নয়। আর দেরি করলে সে আল্লার কাছে অপরাধী হয়ে থাকবে হয়ত চিরকালের মতো।

দেখা দরকার নিশ্চিত ক'রে যে এখনও দেহে প্রাণটা আছে কিনা।

তবু, একেবারেই মুখের কাপড় সরিয়ে দেখতে সাহসে কুলোল না। আন্দাজে আন্দাজে দেখে নিল হাতগুলো কোথায়। মনে হ'ল ডান হাতখানা বুকের ওপর এবং বাঁ হাতখানা পাশে মাটিতে পড়ে আছে—

আর দ্বিধা করল না সে। আস্তে আস্তে বুরখার প্রান্তটা তুলে বাঁ হাতখানা কব্জি সুদ্ধ অনাবৃত করল। তারপর সসম্ভ্রমে ও সন্তর্পণে হাতটা একটু উঁচু ক'রে নাড়িটা দেখতে গেল।

হাতে ঘাম রয়েছে বেশ, তালু পর্যন্ত ঘেমে উঠেছে, তবু একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা নয়। সেটা হাতে হাত দিয়েই বুঝতে পেরেছিল। অর্থাৎ—খুব সম্ভব এখনও বেঁচেই আছেন। তবে সেটা নাড়ি দেখলেই ঠিক ঠিক বোঝা যাবে।

কিন্তু নাড়িটা আর দেখতে হ'ল না।

মনে মনে একটা সাধু-সংকল্প ছিল যে যেটুকু অবশ্য-করণীয়—শুধু সেইটুকুই করবে সে, নাড়ি দেখতে হয় নাড়িই দেখবে—হাতের দিকে চাইবে না। কিন্তু সেটা সম্ভব হ'ল না। মানুষের পক্ষে এতখানি নিস্পৃহতা বুঝি সম্ভব নয় কিছুতেই—অধিকাংশ সময়ই কৌতূহল তার প্রভু হয়ে বসে—এক্ষেত্রেও তাই হ'ল। কি করছে সে সম্বন্ধে অবহিত হবার আগেই—তার অবাধ্য চোখ কখন গিয়ে পড়ল সেই হাতখানার দিকে। আর—

আর সঙ্গে সঙ্গেই, যেন ভূত দেখার মতো, চমকে উঠল সে। সাপের গায়ে হাত পড়ে গেছে বুঝতে পারলে যেমন হয়—তেমনিভাবেই হাতখানা ছেড়ে দিল তাড়াতাড়ি। যেন বিদ্যুৎ-ছোঁওয়ার মতোই সমস্ত স্নায়ুতে চমক লেগেছে তার—কী করছে তা বুঝতেও পারল না।

সেই কোমল শুভ্র পদ্মফুলের মতো হাতে চাঁপার কলির মতো একটি আঙুলে তোবড়ানো ক্ষয়-যাওয়া সামান্য একটা রূপোর আংটি!

আগারই আংটি!

খানিকক্ষণ স্তম্ভিত অভিভূতের মতো সেই শিথিল-হয়ে-এলিয়ে-পড়ে-থাকা হাতটার দিকে চেয়ে রইল সে। চোখে পলক পড়ছে না, জিভটা শুকিয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে, অসহ্য তৃষ্ণায় গলা কাঠ—তৃষ্ণার এমন যন্ত্রণা হয় তা সে এর আগে কোনদিন লক্ষ্য করে নি—কাটা জায়গাটায় ব্যথা করছে, ডান হাতটা অসহ্য রকমের আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে। আরও কত কি অনুভব করার চেষ্টা করল সে—যে অদ্ভুত অনুভূতিটি এমন ভাবে অনড় অবশ ক'রে দিয়েছে তাকে, সেটা ভোলবার জন্যে।

সবচেয়ে অবাক লাগছে তার নিজের বুকের অবস্থাটা দেখে। যেন সত্যি-সত্যিই কে একটা বড় হাতুড়ি দিয়ে ঘা মারছে। এতবার এত বিপদে পড়েছে, ভয়ও পেয়েছে বৈকি বেশ কয়েকবার—প্রিয়া-সন্দর্শন-প্রতীক্ষার যে হৃদ্‌স্পন্দন তার সঙ্গেও পরিচয় আছে—কিন্তু এ সেসব কিছু বা সে রকমের কিছু নয়। এ একেবারে আলাদা। এরকম সর্বাঙ্গ-শিথিল-করে-দেওয়া বুকের তোলাপাড়া সে কখনও অনুভব করে নি তো এর আগে। রক্তের সে উত্তাল উদ্বেলতার শব্দ যেন বাইরে থেকেই শোনা যাচ্ছে, সে নিজেই শুনতে পাচ্ছে।...

বিপুল আশা একটা—অসম্ভব, অবিশ্বাস্য, অবাস্তব আশা—সেই সঙ্গে সে বিরাট আশা ধূলিসাৎ হওয়ার প্রবল আশঙ্কা—এই বিপরীতমুখী দুই শক্তির দ্বন্দ্বেই

সে এত অস্থির, এত উত্তেজিত—এবং বোধ হয় এত দুর্বলও।

সমস্ত অনুভূতি, সমস্ত চিন্তাও যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে এসেছে—সমস্ত অংগ-প্রত্যংগ শিথিল। নিজের ইচ্ছা ব'লেও যেন আর কিছু অবশিষ্ট নেই তার। নইলে সামনের ঐ ঘাস ও শুকনো পাতালতার ওপর এলিয়ে পড়ে-থাকা ঐ শুভ্র সুন্দর হাতটা থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না কেন কিছুতেই? চোখও না, মনও না। যতই নিজের দিকে, নিজের শারীরিক অবস্থার দিকে মন ফেরাবার চেষ্টা করছে ততই যেন তা দুটি চক্ষুরিন্দ্রীয় থেকে বেরিয়ে এসে একান্তীভূত হ'তে চাইছে—ঐ হাত, আংগুল—এবং বিশেষ ক'রে ঐ তোব্‌ড়ানো ক্ষয়ে যাওয়া তুচ্ছ আংটিটার ওপরে।...

কয়েক মিনিট পাগলের মতো আচ্ছন্ন অভিভূত অবস্থায় বসে থাকবার পর হঠাৎ একসময় পাগলের মতোই যেন লাফিয়ে উঠল সে। কোনরকম দ্বিধাদ্বন্দ্বের কথা মনেও রইল না সে সময়ে। এক টানে বুরখাটা সরিয়ে দিল মুখের ওপর থেকে।

শাহ্‌জাদী মেহের!

তার বেহেস্তের হুরী, তার আশমানের চাঁদ!!

আর কোন সন্দেহ কি সংশয়ের অবকাশ নেই।

আশাভংগের আশংকাও না।

মেহের, মেহের?

যা অসম্ভব, যা অবিশ্বাস্য, যা অবাস্তব—যা সুদূর কল্পনারও অতীত—তাই ঘটেছে তার জীবনে।

যার জন্যে সে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে, যার জন্যে প্রাণ দিতে চায়—যার জন্যে প্রাণ দিয়ে আনন্দ—প্রাণের সার্থকতা, তাকেই ভগবান সঁপে দিয়েছেন ওর হাতে, রক্ষা করার জন্যে, তার যাত্রাপথ নিরাপদ নিষ্কণ্টক করার জন্যে—প্রয়োজন হয় তো প্রাণ দেবার জন্যে। মেহেরবান খোদা তার অন্তর বুঝে অন্তরের গোপনতম অথচ প্রবলতম বাসনাটিই পূর্ণ করার ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর করুণা না হ'লে এই আপাত-অসম্ভব যোগাযোগ সম্ভব হ'ত না!

কিন্তু—

প্রাথমিক আনন্দের উচ্ছ্বাসে আসল প্রশ্নটাই ভুলে বসেছিল সে। এখন আবার বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় শ্বাসরোধ হয়ে আসার উপক্রম হ'ল। সাংঘাতিক সন্দেহে মুহূর্তের জন্য একটা হিমশীতল হতাশা বোধ করল সে!

কিন্তু—খোদা কি তীরে এসে তরী ডোবাবার জন্যে এত কাণ্ড করলেন!

না না—তা সম্ভব নয়। আবার যেন মনে মনে বল পেল সে একটা, খোদার নাম করার সংগে সংগে।

ঝুঁকে পড়ে ভাল ক'রে দেখল, কান পেতে শুনল।

না, দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।

বেঁচেই আছে। বুরখা অপসারিত, এখন কামিজের নিচে বুকের ওঠানামা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। গলার কাছটাও ঈষৎ ধুক্‌ধুক্‌ করছে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সংগে।

বেঁচেই আছে, তবে মূর্ছা গেছে বেচারী। ভয়ে আর এতটা দৌড়ে আসার পরিশ্রমেই সম্ভবত—অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। আগে হয়ত কাছেই ছিল, ঐ ঝোপটার আড়ালে—রক্তারক্তি হ'তে দেখে আর থাকতে পারে নি, ভয়ে দিশাহারা হয়ে দৌড়েছে, এই টিলার ওপারে পৌঁছতে পারলে নিরাপদ ভেবেছে—সেই জন্যেই কোথাও থামে নি

হয়ত, একদৌড়ে বরাবর চলে এসেছে! পরিশ্রমে অনভ্যস্ত শরীর এতটা অত্যাচার বরদাস্ত করে নি।

আগা উঠে উদ্‌ভ্রান্তের মতো এদিক ওদিক তাকাল—একটু জলের জন্যে, কিন্তু কাছাকাছি কোথাও জল দেখতে পেল না। বর্ষার জল জমে থাকে কোন কোন নিচু জায়গায়—এখানে জল বলতে ঐ জলই—কিন্তু এদিকটা বেশ উঁচু, এ জায়গাটা তো পাহাড়ের মতোই, সে সম্ভাবনাও নেই।

—কী করবে, দূরে কোথাও জল আছে, কোনও লোকালয় আছে কিনা—খোঁজ করতে যাবে?

প্রশ্নটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই প্রবলভাবে ঘাড় নাড়ল। না, এ অবস্থায় ফেলে যাওয়া উচিত নয়।...তাহলে কী করবে সে? এক ওঁকে কোলে তুলে নিয়ে গেলে কোন ভাবনা থাকত না, কিন্তু ওর হাতের কাটা জায়গাটা যা টনটন করছে, বেশী দূর সেভাবে নিয়ে যেতে পারবে না।

বিপন্ন মুখে আবার কাছে এসে বসল, শাহ্‌জাদীর মুখের দিকে তাকাল আর একবার। আঃ, কিছুতেই সুস্থির হয়ে সেদিকে চাইতে পারে না কেন ছাই!...চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যেটা যেন কী রকম ক'রে ওঠে, মাথার মধ্যে সব তাল-গোল পাকিয়ে যায়, চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়—

এবার জোর ক'রেই তাকাল আগা, ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখল। পরিশ্রমে ও বুরখার গরমে ঘাম হ'য়েছিল প্রচুর,—হয়ত অজ্ঞান হয়ে পড়বার সেও একটা কারণ—এখনও সে ঘাম শুকোয় নি। ললাটের প্রান্তে, ভ্রূর ওপর, চোখের কোলে, চিবুকের খাঁজে—এখনও মুক্তার মতো স্বেদবিন্দু জমে র'য়েছে অজস্র। গলার খাঁজ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে এখনও ধারায় ধারায়। অতিরিক্ত ঘামে যেন বরং কেমন ফ্যাকাশে চোপ্‌সানো দেখাচ্ছে মুখখানা। কামিজটাও ভিজে সপসপ করছে।

আগা বুঝল জল না হ'লেও চলবে। ঈশ্বরদত্ত জলের ওপর বাতাস পড়লেই দেহ ঠাণ্ডা হবে, সুস্থ হয়ে উঠবে। সে এদিক-ওদিক চেয়ে উড়ে-এসে-পড়া একটা বড়গোছের শালপাতা কুড়িয়ে আনল এবং তাই দিয়েই জোরে জোরে বাতাস করতে লাগল মুখে—

প্রথমটা মনে হ'ল বুঝি এতেও কোন কাজ হবে না। কারণ বেশ খানিকক্ষণ হাওয়া করার পরও কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। হতাশায় উদ্বেগে এবার যেন কান্না পেতে লাগল তার। শেষে শালপাতাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মুখের কাছে মুখ এনে জোরে জোরে ফুঁ দিতে লাগল। তারও অসহ্য তৃষ্ণায় গলা কাঠ, জিভ শুকিয়ে আড়ষ্ট—কিন্তু তবু প্রাণপণ আয়াসে সে ফুঁ দিয়ে যেতে লাগল।

বোধ করি এতেই কাজ হ'ল। এইবার একটু একটু ক'রে প্রাণের লক্ষণ বা জ্ঞানের লক্ষণ দেখা দিল। প্রথম চোখের পাতা দুটো ঈষৎ কাঁপল একবার, প্রবল একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল—তার পর, আগার ফুঁ দেওয়া বাতাসটা প্রতিক্রিয়া হিসাবেই যেন, ভ্রূটা একটু কুঞ্চিত হ'ল—মুখটা সরিয়ে সে বাতাসটা যেন এড়াবার চেষ্টা করল একবার—তারপর একটু একটু ক'রে, প্রথম শরতের নীল পদ্মের মতো সেই আশ্চর্য সুন্দর চোখ দুটি উন্মীলিত হ'ল।

প্রথম সে দৃষ্টিতে ছিল একটা শূন্যতা, বিহ্বলতা। তারপর সে চোখেও ফুটে উঠল একটা সুগভীর বিস্ময় এবং অবিশ্বাস। তার পর কিছু লজ্জা, সেই সঙ্গে অসহ পুলক ও সুখের আবেশ—

তার পরই ধড়মড় ক'রে উঠে বসল মেহের। চারিদিকে তাকিয়ে বরখাটা তাড়াতাড়ি টেনে উঠিয়ে হাতে নিয়েও কিন্তু তখনই মুখে চাপা দিল না আবার, বরং কৃত্রিম কোপে গ্রীবা হেলিয়ে বলল, 'বেত্তমীজ! এতবড় সাহস তোমার! এত আস্পর্ধা! তুমি শাহ্জাদীর বুরখা খুলে তার মুখ দেখ, তার মুখে বাতাস দাও।... এমন অসভ্য বেসহবৎ লোক তুমি! না হয় আরও কিছুক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতুম! না হয় মরেই যেতুম!...যা হয় হ'ত—তা বলে তুমি আমার গায়ে হাত দেবে!

প্রথমটা আগাও ভুল বুঝল, অপমানে যত না হোক—অভিমানে কালো হয়ে উঠল তার মুখ। সে অপর দিকে মুখ ফিরিয়ে ছদ্মবিনত তিক্ত কণ্ঠে বলল, 'আমার ভুল হয়েছে শাহ্জাদী, খুবই ভুল হয়ে গেছে—। একজন নিষ্পর ব্যক্তি বিনাস্বার্থে তার জন্যে প্রাণ দিচ্ছে দেখেও যে মানুষের নিজের প্রাণের মায়াই বড় হয়ে ওঠে, এতদূরে পালিয়ে আসে প্রাণভয়ে—তাকে খুঁজে বার করা কি তার জন্যে চিন্তা করাই আমার বড় ভুল হয়ে গেছে, বাঁচাতে যাওয়া তো আরও।'

'নিশ্চয়ই। একশোবার।' দৃপ্তকণ্ঠে বলে মেহের, 'তোমাদের মতো নৌ—সাধারণ লোকের দয়ায়, তোমাদের হাতের ছোঁয়া লেগে প্রাণ বাঁচানোর চাইতে বাদশার ঘরের মেয়েদের আলতো আলাদা থেকে মরে যাওয়াও ভাল—এটা শিখে রাখো ভাল ক'রে। কেন, কেন তুমি আমাকে বাঁচাতে গেলে দয়া ক'রে তাই শুনি। তোমার দয়ায় বাঁচতে হবে আমাকে!'

এই নিষ্ঠুর অকৃতজ্ঞতায় ভেঙে পড়ারই কথা—কিন্তু কখন ইতিমধ্যে অবাধ্য চোখ দুটো, আনত মুখের সহস্র অসুবিধা সত্ত্বেও অপাঙ্গে দেখে নিয়েছে সেই দেবদর্শন-দুর্লভ দুরাশার ধন মুখখানার দিকে, লক্ষ্য করেছে আপাত-দৃপ্ত ক্রুদ্ধ ভঙ্গীর মধ্যে চোখের কোণে কৌতুকের আভাস—সে সহসা মুখ তুলে সোজা মেহেরের মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'বেশ ক'রেছি, খুব করেছি—আমার খুশি।'

অকস্মাৎ রজতঝরা কণ্ঠে খিলখিল ক'রে হেসে উঠে মেহের যেন আগার বুকের ওপর আছড়ে পড়ল ছেলেমানুষের মতোই, দুহাতে ওর গলাটা জড়িয়ে ধ'রে কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'হাঁদারাম, এই কথাটা আগে বলতে কী হয়েছিল? আর এই বেশ-করাটা এতদিন করতে পারো নি? বুরখার আড়ালে শাহ্জাদী সেজে থেকে কী কষ্টই না হয়েছে আমার বলো দিকি।'

॥ উনত্রিশ ॥

তারপর যে কী হ'ল তা আজও আগা জানে না, বলতে পারবে না কাউকে।

সে প্রচণ্ড উন্মত্ততার সীমা নেই, সতর্কতা নেই, তার বর্ণনা হয় না। বিশ্বাস হয় না—অবিশ্বাসও করতে পারে না। বার বার দেখে মুখখানা তুলে ধরে, সত্যিই আশমানের চাঁদ মাটিতে নেমেছে কিনা। আবার দেখতেও ভয় হয়। কণ্ঠলগ্না যে—তার গায়েও হাত দিতে, তাকে স্পর্শ করতে সমীহ হয়, ভয় হয়। সহজ হ'তে পারে না সে কিছুতেই।

কিন্তু যত দেখে, যত প্রমাণিত হয় ঘটনাটা, যত বাস্তব বলে বোধ হয় যে সত্যিই সেই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে, লালকিল্লার বাদশাজাদী মেহেরউন্নিসা পথের ভিখারী আগা মহম্মদের সঙ্গে পথে নেমেছে—নিরুদ্দেশের পথে না হোক, বহু দূরদেশের

পথে তারা দুজন অতৃতীয় যাত্রী—ততই যেন পাগল হয়ে ওঠে সে। হেসে কেঁদে লাফিয়ে চেঁচিয়ে—ক্ষেপার মতোই কাণ্ডকারখানা শুরু ক'রে দেয়। সে ক্ষেপামির হাওয়া বুঝি লাগে মেহেরকেও। সেও ওর সঙ্গে—লাফঝাঁপ না করুক—হাসিকান্নায় পাল্লা দিয়ে চলে। আর বকে অনর্গল, কণ্ঠস্বর গোপন করার কোন প্রয়োজন নেই, বহুদিনের নিরুদ্ধ বাক্যস্রোতের বাধা গেছে ঘুচে, তাই অবিরল ধারায় বেরিয়ে আসছে তা। কখনও সান্ত্বনা দিচ্ছে, কখনও শান্ত হ'তে বলছে ; কখনও করছে অনুযোগ, কখনও বা ভর্ৎসনা। ভাগ্যে সে জায়গাটা একেবারেই জনহীন, নয়তো হঠাৎ কেউ তাদের ঐ অবস্থায় দেখলে ভয় পেয়ে যেত। ভূতে-পাওয়া দম্পতি মনে করত ওদের, অথবা ভাবত ভূতই, আত্মহত্যার মড়া—দুই প্রেমিকের দানো।...

অবশ্য ধীরে ধীরে দাপাদাপিটা কমে আসে আপনিই, স্রেফ শারীরিক ক্লান্তিতেই হয়ত—কিন্তু মনের পাগলামিটা যায় না। দুজনেরই কত কি বলবার আছে, কত কি জানতে চায় দুজনেই। কত কি জানবারও আছে, তার মধ্যে ভালবাসার কথাটাই বেশী। স্পষ্ট ক'রে কেউই জানাতে পারে না তবুও। আগার সাহসের অভাবঃ সে জানে যে তার মতো লোকের এমন ভালোবাসা একটা দারুণ অনিয়ম, রীতিমতো দুঃসাহস। মনুষ্যত্ববিরোধী দস্তুরমতো বেইমানী এটা ! শাহ্‌জাদীরও সঙ্কোচে বাধে। একথা বুঝি পুরুষকে বলতে নেই কোন মেয়েরই স্পষ্ট ভাষায়। এটা পুরুষদের বুঝে নেবার কথা। বড় জোর আকারে ইঙ্গিতে বাক্যবিন্যাসে বোঝানো যেতে পারে। সেই চেষ্টাই করে দুজনে ; অথবা বুঝি চেষ্টাও নয়, স্বতঃ-উৎসারিত ভাব-স্রোতস্বিনী সেটা। কিন্তু পুরোপুরি স্পষ্ট নয় বলেই বুঝি যতটা বোঝে তাতে খুশী হ'তে পারে না। যা বুঝছে তা যে সত্য—সাহস হয় না বুঝি অতটা বিশ্বাস করতে। মন ভরে না তাই, আরও স্পষ্ট ক'রে শুনতে চায়, আশ্বস্ত হতে চায়। অতৃপ্তির কাঁটা একটা থেকেই যায় যৌবন-সরসী-নীরে প্রেমের এই বিকশিত শতদলটির মধ্যে।

কিন্তু এর মধ্যে প্রকৃতি থেমে নেই। এই পাগলামির স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃত হওয়া বিহ্বলতার মধ্যেই হেমন্তের বেলা ফুরিয়ে যায়। ওরা উঁচু টিলার ওপর ছিল—তাই প্রথমে অতটা টের পায় নি। যখন খেয়াল হ'ল তখন নিচে সন্ধ্যা নেমে এসেছে অনেকক্ষণ, গাছপালার ছায়ায় অন্ধকার জমাট হ'য়ে উঠেছে বেশ।

'এখন উপায় ?' বলে আগা।

'কিসের উপায় ?' নিশ্চিন্ত মনে একটা ঘাসের ডগা চিবুতে চিবুতে উত্তর দেয় মেহের। অথবা পাল্টা প্রশ্ন করে।

'যাবার ! যেতে হবে না ?'

'না-ই বা গেলুম ! রোজই যে যেতে হবে, চলতে হবে—তার কোন মানে আছে ?'

'তা না হয় নেই। কিন্তু কোন একটা আশ্রয় খুঁজতে হবে তো ? এ যা হ'ল—কোন পথই খুঁজে পাব না যে আর দেরি করলে !'

'পথ খোঁজবারই বা এত গরজ কি ? আশ্রয় ?...তাই বা কী দরকার, এই তো বেশ আছি !'

'এমনি কাঁটা-ঝোপের মধ্যে ? মাথায় চালা নেই, খাবার নেই, জল নেই—আপনি কি পাগল ?'

এর মধ্যে বহুবার 'তুমি' বলা হয়ে গেছে—কিন্তু সে তো অপ্রকৃতিস্থতার ভেতর,

কর্তব্য ও পরিবেশ সম্বন্ধে অবহিত হয়ে উঠতেই সম্পর্ক সম্বন্ধেও সচেতন হয়ে উঠেছে সে।

সেটা লক্ষ্য ক'রেও করে না মেহের। সে 'তুমি'-টাই বাহাল রাখে। বলে, 'কিছু দরকার নেই। একটা রাত না খেলে মরে যাবে না।'

'আমার কথা হচ্ছে না, আপনার কথা হচ্ছে। নিজের ভাবনাতেই তো ঘুম হচ্ছে না প্রায়!'

'আমাকে কি এই কদিন নিত্য দুবেলা খেতে দিয়েছ? না কি পেটে কিছু নেই বলে হাঁটতে কসুর করেছি কিছু?...উঃ, ভাগ্যিস আমি সত্যিকার শাহ্জাদী নুরুন্নেসা কেউ নই—অন্য মেয়ে হ'লে মরেই যেত। আমার জান বলেই এতটা সইল!'

সদ্য বর্তমানের চিন্তাটা সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যায় আগা।...কৌতূহলটাই বড় হয়ে ওঠে।

'আচ্ছা, সত্যিই তো, নুরুন্নেসা কেন? বাদশা নামটা গোপন করলেন কিসের জন্যে? তিনি তো আমাদের এ—ইয়ে—যোগাযোগটা জানতেন না!'

'না, গোপন তিনি করেন নি।'

'করেন নি? তবে? আমিই ভুল শুনলাম?'

'না, তাও না, তাহ'লে নুরুন্নেসার কথা উঠবে কেন নুরুন্নেসাই আমার আসল নাম। এখানে আসার পর—কে যেন, জিন্নৎমহল বেগম সাহেবার চাচী না কার ঐ নাম ছিল বলে তিনিই নাম দিয়েছিলেন মেহের। অবশ্য বাদশাও তাই ডাকতেন—কিন্তু সরকারী ভাবে নামটা বলতে গেলে সরকারী নামটা বলা উচিত; এই ভেবেই বোধ হয় বলেছেন।'

'ও, এই! আশ্চর্য! সামান্য নামের বদল—কিন্তু আমার কাছে কী কষ্টকরই ঠেকেছে এই কাজটা, আর কী বিরক্তিকর। যদি জানতে পারতুম ঐ নামটার মুখোশে কোন্ মুখ ঢাকা আছে—'

'কী করতে তাহ'লে এতটা পথ হাঁটাতে না? না কি কাঁধে ক'রে বইতে?'

'হয় তো তাই!' সাহস ক'রে বলে আগা।

কিন্তু মেহের গম্ভীর হয়ে যায়, 'না জেনে ভালই হয়েছে বোধ হয়। জানলে সত্যিই এতটা নির্মম ভাবে আমাকে হাঁটাতে পারতে না। তাতে ক্ষতিই হ'ত হয়ত—'

ওর গাম্ভীর্যেই আবার বাস্তব অবস্থাটা সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠে আগা, 'তা এখন ওঠো তাহ'লে, মেহেরবানি ক'রে গা তোল। আর একটুও দেরি করা উচিত নয়—'

'কোথাও উঠব না। কোথাও যাব না। আজ আর হাঁটব না এক পা-ও। এই বেশ আছি, এখানেই শুয়ে থাকব এমনি ক'রে। বেশ আকাশের নিচে—ঐ দ্যাখো কত তারা উঠে গেছে এরই মধ্যে, ওরাই শুধু আছে, আশপাশে—আর কেউ নেই, মানে কেউ দেখতে পাচ্ছে না, শুধু ঐ তারাগুলো চেয়ে থাকবে আমার দিকে, আমি চেয়ে থাকব ওদের দিকে—!'

'কেউ নেই মানে মানুষ নেই, কিন্তু শের, ভালু —এ'রা তো আছেন!'

'তেমনি তুমিও আছ। আমি ঘুমোব তুমি জেগে পাহারা দেবে, এ তো সহজ কথা।'

'বেশ, ভালো বন্দোবস্ত। বাঃ! হ্যাঁ, সহজ কথা তাতে আর সন্দেহ কি! আমার তো ঘুমের কোন দরকারই নেই। এতটা লড়াই ক'রে শরীর তো এখন তাজা, উচিত তো তিন রাত এখন জেগে থাকা!'

'আচ্ছা, আচ্ছা, তুমিও ঘুমিও, হ'ল তো! শেষ রাতে তুমি ঘুমোবে আমি পাহারা দেব—তোমার ঐ তলোয়ারখানা বাগিয়ে ধরে।'

'তবেই হয়েছে! হাতে তুলতে পারবে?'

বিদ্রূপটা প্রচ্ছন্নও নয়, বেশ স্পষ্ট। মেহের জ্বলে ওঠে নিমেষে, 'বটে! মনে রেখো বাদশার ঘরের মেয়ে আমরা, হাতিয়ার চালানো আমাদের শিখতে হয়। আগে তাতারী মেয়েছেলে রাখা হ'ত এইসব শেখবার জন্যে। এখন আর সে সামর্থ্য নেই, তবু শেখা হয় ঠিকই। নিজেরাই একে অপরকে শেখায়। আমি তো খাশ বাদশা-বেগমের কাছে শিখেছি, লাঠি চালাতে তলোয়ার চালাতে।'

'যাক! তাহ'লে তো কোন চিন্তাই নেই। তুমি তলোয়ারখানা ধরে একটু বসে থাকো জেগে, আমি একবার ঘুরে দেখি কোথাও কিছু খাবার বা জল পাই কিনা।'

খপ ক'রে ওর হাতটা চেপে ধরে মেহের।

'না, তা হবে না। একা আমি এই জঙ্গলে ছেড়ে দেব না তোমাকে।'

'আরে—আমার কাছে তো আর একটা হাতিয়ার আছে। পিস্তলটা না হয় হাতে ক'রেই এগোব। কী মুশকিল!'

'তা জানি। খুব মস্তান তুমি। কিন্তু আঁধিয়ারে আঁধিয়ারে গা ঢেকে এগিয়ে এসে যখন শের কি ভালু পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তখন পিস্তল ছোঁড়ার অবসর পাবে কোথায়?'

'আমি চারিদিক চাইতে চাইতে যাব, কোন ভয় নেই।'

সে উঠে দাঁড়াতে যায়। তখন অব্যর্থ অস্ত্র ত্যাগ করে মেহের।

'আমি এখানে একা থাকতে পারব না, সাফ কথা। কোথায় কতদূর লোকালয় তার ঠিক নেই—ফিরতে হয়ত একপ্রহর রাত হয়ে যাবে—সে আমার বিষম ভয় করবে!'

'সেই জন্যই তো বলছিলাম জনাবালি, যে আস্তে আস্তে এবার চলুন একটু। আচ্ছা, না হয় আমি কাঁধে ক'রেই নিয়ে যাব। হাতে আমার যত ব্যথাই হোক, তোমাকে বইতে পারব খুব!'

'আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে! আমি ও'র কাঁধে না চড়লে আর ইজ্জৎটা বজায় রইল কি?...বেশ, যাও, আমার ভাবনা ভাবতে হবে না, কোনদিনই না আর, তুমি খানাপিনা ক'রে শহরে ফিরে যাও। কেননা ফিরে এসে আর আমাকে দেখতে পাবে না। জীন আছে, দানো আছে, শের আছে, কেউ না কেউ দয়া করবেই। সব ভাবনার অবসান হয়ে যাবে!'

ঠোঁট-ফোলানোর মতো অব্যর্থ অস্ত্র আর মেয়েদের নেই বিশেষ যদি সে ঠোঁট কোন সুন্দর মুখের হয়।

সে অস্ত্র এক্ষেত্রেও ব্যর্থ হ'ল না, বলা বাহুল্য।

আগা হতাশ হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

'ত'বে থাকো অমনি, খালি পেটে কীল মেরে শুয়ে!'

'আচ্ছা, তুমি অত খাই-খাই করছ কেন বলো তো!' কৈ, আমি তো করছি না! মন যখন ভরে গেছে, পেট না হয় একদিন খালি রইলই।'

'আমার পেটের কথাই শুধু ভাবছি বুঝি? মেয়েছেলে জাতটাই এমনি বেইমান বটে।'

'তোমার কথা যখন ভাবছ না তখন আর ওকথা তুলে লাভ কি? আমি তো বলছি আমার কিচ্ছু দরকার নেই।'

শুয়ে থাকে দুজনেই। পাশাপাশি। একেবারে ছোঁয়াছুঁয়ি ভাবে নয়, তবু আশ্বাস আর নির্ভরতা বোধ করার মতো সান্নিধ্যে।

বেশ লাগছে সত্যিই। কেমন আবেশ-মধুর তন্দ্রার মতো অন্ধকারটা নামছে এদের চারিদিকে, কেমন স্বপ্নের মতো কায়াহীন আলিঙ্গনে ঘিরে ধরছে ওদের।......মাধুর্য। মাধুর্য। আকাশে-বাতাসে, চারিদিকের গাছে পাতায় লতায় এমন কি ঐ কণ্টক-গুল্মগুলো থেকেও যেন মাধুর্য ক্ষরিত হচ্ছে শুধু। আকাশের তারাগুলো যেন সজীব, তারা যেন টিপিটিপি হাসছে ওদের দিকে চেয়ে, কী বলছে ফিসফিস ক'রে—তাদের সে মাথা-নাড়াটা পর্যন্ত যেন দেখতে পাচ্ছে ওরা—

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে দুজনেই। এত কাছাকাছি, এমন ভাবে চুপ ক'রে শুয়ে থাকাটাও যেন একটা অভাবনীয় অভিজ্ঞতা, দুজনে সেইটেই অনুভব করতে চায় নিঃশব্দে।

কোথা থেকে যেন একটু শিরশির উত্তুরে বাতাস উঠে, চারিদিকের পত্র-পল্লবে শিহরণ জাগিয়ে চলে যায়। ভারী মিষ্টি লাগে ঠাণ্ডা বাতাসটাও।

'বেশ লাগছে, না?' প্রশ্ন করে মেহের।

'তা লাগছে। কিন্তু মনে হচ্ছে কতটুকুই বা স্থায়ী হবে এই বেশ-লাগাটা! যদি এইভাবে সারাজীবন কাটিয়ে দেওয়া যেত, অনন্তকাল পর্যন্ত না হোক—এ রাতটা যদি আমার জিন্দিগী অবধি দীর্ঘ হ'ত!'

আবার চুপ ক'রে থাকে খানিকক্ষণ। একটু পরে মেহের আস্তে আস্তে প্রশ্ন করে, 'তোমার—তোমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে বোধ হয়—না?...মেহনৎ তো কম করো নি!'

'ক্ষিদে? না, সেটা আর তেমন বুঝছি না। শুধু এক চুমুক জল পেলেই খুশী হতুম। পিপাসাটাই বড় লাগছে, মনে হচ্ছে বুকের মধ্যেটা পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে—'

'আহা রে।' নিমেষ অনুতপ্ত হয়ে উঠে বসে মেহের, 'ইস্—সত্যি, কথাটা আমারই ভেবে দেখা উচিত ছিল!...এতটা পথ হাঁটা, ঐ সর্বনেশে লড়াই, আবার আমার জন্য ছুটোছুটি দুর্ভাবনা—তেষ্টা তো পেতেই পারে।...আচ্ছা, এখন যাওয়া যায় না?'

'না।' বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে উত্তর দেয় আগা, 'তার চেয়ে শুয়ে কোনমতে ঘুমিয়ে পড়ো, আমি পাহারা দিই। শেষরাত্রে ডেকে দেব কিন্তু—তখন বুঝব তোমার তলোয়ারের তালিম। একটু ঘুমোতে হবে আমাকেও, নইলে কাল আর হাঁটতে পারব না।'

অগত্যা শুয়ে পড়ে মেহের। কিন্তু ঘুম তার মাথা থেকে বহু দূর চলে গেছে। আগার কথাটা তার ভাবা উচিত ছিল সর্বাগ্রে। বেচারী আগা! সাধারণ কোন মানুষ হ'লে তার মুখ দিয়ে কথা বেরোত না, ক্লান্তিতে পিপাসায়—এবং ক্ষুধাতেও। এ বয়সে ক্ষুধাও উপেক্ষণীয় নয় আদৌ। তার মস্তিষ্ক শুধু নয়, সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ ক'রে ভাবতে থাকে সে। কোন একটা উপায় করতেই হবে। সঙ্গে আগুন

জ্বালাবার ব্যবস্থা নেই যে, নইলে শুকনো পাতা কিছু জড়ো ক'রে জ্বেলে তা থেকে একটা গাছের ডাল ধরিয়ে মশালের মতো জ্বেলে হাঁটতে পারত।...

আর কোন উপায় নেই? কিছু একটা করা যায় না?...

ইন্দ্রিয়গুলো টান্ টান্ ছিল বলেই গন্ধটা পায় হঠাৎ।

'এই শুনছ—পাকা সরিফার গন্ধ পাচ্ছ না?'

'জাহাঁপনা এরই মধ্যে এক ঘুম সেরে ফেললেন, আবার খোয়াবও দেখা হয়ে গেল! বলিহারী!...এই কাঁটা-বনে এই সময়ে পাকা সরিফা!'

'বেত্তমীজ, জবান সাম্হারকে!' কৃত্রিম কোপে ধমক দিয়ে ওঠে মেহের, 'শাহ্জাদীর কথার ওপর কথা। তাঁর সঙ্গে দিল্লগী। যারা তরবিয়ৎদার নৌকর, তারা প্রত্যেক কথায় শুধু বলে—জী জনাব। যা বলছি শোন, শুঁকে দেখ ভাল ক'রে। সরিফার তো এই সময় এল, হয়ত বনের মধ্যে বলে আগেই পেকেছে!'

আগা উঠে বসে এবার। নানাবিধ লতা-পাতা বনৌষধির কটুতিক্ত গন্ধর মধ্যে থেকে আর কোন গন্ধই বেছে নিতে পারে না প্রথমটা। হেসেই উড়িয়ে দিত সে, কিন্তু মেহেরের বলার ভঙ্গীতে বুঝেছে যে কিছু একটা ঐ ধরনের গন্ধ পেয়েছে সে, একেবারে বাজে কথা বলছে না। তাই সে ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে আরও সজাগ ক'রে সেই কোন্ দূরাগত সুপক্ক আতাফলের মৃদু গন্ধ ধরবার চেষ্টা করে।

খানিকটা পরে পায়ও সে গন্ধ। মৃদু, খুবই মৃদু। তবু পাকা আতারই গন্ধ।

আরও একটু চেষ্টা ক'রে গন্ধটা কোন্ দিক থেকে আসছে, তাও বুঝতে পারে।

তখন উঠে অন্ধকারেই এগিয়ে যায়।

অবশ্য টিলার ওপর বলেই খুব অন্ধকার হয় নি সেখানটা। কিম্বা চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছে বলেই নিচের মতো ঘন কালো লাগছে না। নির্মেঘ আকাশে কোটি কোটি নক্ষত্র, তার আলোও এসে পড়েছে খানিকটা, পত্রবহুল কোন বড় গাছ না থাকায় সে আলো অবারিত।

তবু কাঁটা গাছে গা ছড়ে, পায়ে কাঁটা লাগে। এক একবার মনে হয় বে-অকুফের খবরে বিশ্বাস ক'রে অধিকতর বে-অকুফীই করছে সে। কিন্তু তারপর গাছগুলোর কাছে চোখ নিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ দেখার পর বড় বেতবনের পাশে একটা আতাগাছের ডাল দেখতে পায়। ক্রমশ বোঝে বেশ বড় আতাগাছ সেটা, হয়ত তার পিছনে আরও দু-চারটে আছে। ঈশ্বরের কী আশ্চর্য খেয়ালে এখানে এই আতাগাছগুলো বড় হয়ে উঠেছে, এবং তাতে ফলও ধরেছে।

ফল তখনও অধিকাংশই কাঁচা অবশ্য। এদিকে আরও পরে আতা পাকে। কিন্তু ওরই মধ্যে দু-চারটে—আবারও আল্লার মর্জি বা দয়ার কথাই মনে পড়ে—পেকে উঠেছে। তিন-চারটে ফল গাছের নিচে পড়ে ফেটে গেছে, হাতড়ে হাতড়ে কুড়িয়ে নিল আগা; গাছে যা ছিল তাও টিপে দেখতে দেখতে খাওয়ার মতো মিলল। কুর্তার খুঁটে বোঝাই ক'রে ফিরে এল সে।

'বন্দেগী এলেমদার আলি মির্জা! আমি তো বে-অকুফ, খোয়াব দেখছিলুম জেগে জেগে—এগুলো কি তাহ'লে?' সগর্বে বলে ওঠে মেহের।

'হাজার হোক বাদশাজাদীর বুদ্ধি আর তাঁর নাক। তার সঙ্গে কি আর সামান্য বান্দার তুলনা হয়—না তার বুদ্ধি অতদূর পেঁছনো উচিত! বান্দারা যদি এত ধারালো হবে, তা'হলে আর মালিকদের ইজ্জৎ থাকে কোথায়!'

'ফের, আবার ঐসব কথা!'

'বিলক্ষণ! শাহ্‌জাদীই তো একটু আগে শিখিয়ে দিয়েছেন নফর-নৌকরদের কী ভাবে চলতে হয়!' কৃত্রিম বিনয়ের সঙ্গে বলে আগা।

মেহের তার চম্পককোরকসদৃশ দুটি আঙ্গুলে ওর কানটা ধরে বলে, 'শাহ্‌জাদী বলেছেন যে বান্দারা শুধু মনিবের কথায় সায় দেবে জী জনাব বলে, মুখের উপর কথা কইবে না। ইয়াদ হ্যায় উল্লু?'

'জী, মালেকান!'

'ঠিক। এই হচ্ছে ঠিক কানুনমাফিক চাল। এখন যা হুকুম করছি শোন, এর মধ্যে থেকে ভাল পাকা আতাগুলো বেছে ফেল।'

'জী, মালেকান।' সেই ঝাপ্‌সা আলোতে যতটা দেখা যায় আর হাত দিয়ে যতটা অনুভব করা যায়—চার-পাঁচটা ভাল পাকা ফল বেছে এগিয়ে দিল মেহেরের দিকে। বাকী তিনটে নিজের কাছে টেনে নিল।

'উঁহু, হুকুমের আগে কাজ হয়ে গেল। তুমি একদম মুল্‌কী গাঁওয়ার একটি। যতটুকু হুকুম ততটুকু তামিল। তার বেশী নয়। তোমাকে বাছতে বলেছি, কাকে দিতে হবে তা তো বলি নি।'

'অন্যায় হয়ে গেছে। বান্দার গুস্তাকী মাফ করতে হুকুম হয় মালেকান। বান্দা একেবারেই আপনার চরণাশ্রিত, এই ভেবে কসুর মাপ করুন।'

মেহের আর কথা বাড়াল না। সেই ভাল আতাগুলো দুহাতে তুলে আগার কোলের কাছ নামিয়ে রেখে বলল, 'নাও—এবার খেয়ে ফেল এগুলো, জল্‌দি।'

ঠিক এতটা নৌকরগিরী আগার ধাতে পোষাল না, সে এতক্ষণের সব তালিম ভুলে হাঁ হাঁ করে উঠল, 'না না—সে হয় না, ওগুলো তুমি খাও, ভাল দেখে বেছে দিলুম যে। আমি তো এই তিনটে নিয়েছি—'

আবার প্রচন্ড এক ধমক দিয়ে উঠল মেহের, 'ফের? কী বলেছি? মুখে বলবে জী জনাব মালেকান মেহেরবান—কাজে করবে হুকুম তামিল। মনে রেখো, আমার নাম হুকুম, তোমার নাম তামিল।'

তবুও আগা ইতস্তত করতে লাগল, এতটা বুঝি তার সাধ্যের অতীত। মেয়ে-ছেলে, বিশেষত যে মানসীপ্রিয়া, তাকে সামনে রেখে তাকে বঞ্চিত ক'রে নিজে ভাল জিনিস খাওয়া—যে কোন পুরুষেরই দুঃসাধ্য—পৌরুষে বাধার কথা।

মেহেরও বুঝল তা, আর একটু কাছে সরে এসে একটা বড় পাকা আতা ভেঙ্গে খানিকটা ওর মুখের কাছে ধরে বলল, 'খাও দিকি, সোনা ছেলে, খেয়ে ফেল চোখ বুজে! আরে জেনারেল সাহাব, বেশী পাকা যেগুলো তাতে রস বেশী, বোঝ না কেন! ক্ষিদে শুধু নয়—তেষ্টাও যে মেটা দরকার!'

এমন হাতে মুখের কাছে খাদ্য তুলে ধরলে দরবেশ-ফকীরও তার প্রতিজ্ঞা ভুলে যায়, আগা তো কোন্ ছার। সে সুবোধ বালকের মতো একহাতে মেহেরের হাতটা নিচ থেকে ধরে খোসা রেখে শাঁসের অংশটুকু মুখে তুলে নিল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, বাকীটা মেহেরের অপর হাত থেকে তুলে নিয়ে তার মুখের সামনে তুলে ধরে বললে, 'নাও, খেয়ে নাও দিকি সোনা মেয়ে, মানিক মেয়ে!'

মেহের প্রতিবাদ করে না, বরং সেও আগার হাত থেকে সেটুকু খেয়ে নিয়ে বলে, 'তা মন্দ না। এ বন্দোবস্ত চলতে পারে, ভাল-মন্দ সবই যদি ভাগাভাগি ক'রে খাই—ঝগড়ার কোন কারণ থাকে না বটে!' তারপর মুখ টিপে হেসে বলে, 'সময়ে সময়ে

বান্দার বুদ্ধি শাহ্জাদীর মাথাকেও ছাপিয়ে যায় দেখছি! কী আফসোস!'

হেসে ওঠে দুজনেই। খাওয়াটাই একটা কৌতুক। অফুরন্ত আনন্দলীলা সে হাসির আর সে কৌতুকের বন্যায়—যৌবনের সে প্রাণোচ্ছলতায়। কোথায় ভেসে যায় বাস্তব, তার দুঃখ এবং দুর্ভাবনা নিয়ে—জীবনের পথের কাঁটা নয়, বাধা নয়, জীবনটাই বড় হয়ে ওঠে এই দুটি প্রাণীর কাছে সেই মুহূর্তে।

খাওয়ার পর্ব শেষ হ'লে যখন আর কাড়াকাড়ি হাসাহাসি করার মতো কিছুই থাকে না, তখন দুজনেই শুয়ে পড়ে।...পাশাপাশি, হাত দুয়েকের মতো ব্যবধান রেখে।

ক্লান্তি কারও কম নয়! অবসাদে শরীর ভেঙ্গে পড়ছে দুজনকারই। তবু ঘুম আসে না কারও চোখেই। কেউ কাউকে ছুঁয়ে নেই, কিন্তু এই সান্নিধ্যটুকুর ফলেই—দুজনের দেহ থেকে যেন একটা বিদ্যুৎশক্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, সে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হচ্ছে অপরের দেহে, তারই তড়িৎ-স্পর্শ ওদের স্নায়ুগুলোকে উত্তেজিত ক'রে রাখছে, তন্দ্রার শৈথিল্য নামতে দিচ্ছে না ওদের মস্তিষ্কে—

চুপ ক'রে থাকছে বেশির ভাগই। মন ভরে আছে, কথার প্রয়োজন গেছে ফুরিয়ে। মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো কথা উঠছে হয়তো, টুকরো টুকরো জবাব মিলছে। কখনও-সখনও জবাব দীর্ঘায়ত হচ্ছে প্রসঙ্গ অনুসারে।

একথা সেকথা। স্মৃতির টুকরো—বিস্মৃতির প্রান্ত থেকে কুড়িয়ে আনা। এই পথের কথাই বেশী, এই অস্বাভাবিক ও অভাবনীয় যাত্রার কথা। হাসির কথায় হাসে দুজনেই। নুরুন্নেসার ওপর বিরক্তি ও ঝাঁজের কথা উল্লেখ ক'রে যখন মেহের খোঁচা দেয়, তখন আগা অপ্রতিভ হয়ে পড়লেও মেহেরের সঙ্গে সমান তালেই হাসে। আবার চৌধুরীর হিংস্রতার কথা মনে পড়ে শিউরে ওঠে দুজনেই। ওঃ—কী ফাঁদই পেতে-ছিল লোকটা!

'মানুষ এমন শয়তান হয়! এত তুচ্ছ কারণে এমন শয়তানী করে?' প্রশ্ন করে মেহের, অথবা প্রশ্নের ছলে বিস্ময় প্রকাশ করে।

'আরও ঢের তুচ্ছ কারণে অনেক বেশী শয়তানী করে মানুষ।' আগার কণ্ঠে তিক্ততা উপ্‌চে ওঠে, বহুদিনের তিক্ততা আর অসহায় আক্রোশ।

মেহেরের মনে পড়ে যায় আগার দুর্ভাগ্যের ইতিহাস। চুপ ক'রে থাকে সে। বেচারীর ওপর দিয়ে কী ঝড়ই না ব'য়ে গেছে, মনে পড়ে বেদনায় টনটন ক'রে ওঠে ওর মন।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভাঙ্গে আবার আগাই। বলে, 'শিরীণ্ বেচারী কি করছে কে জানে! আহা—যদি জানতুম নুরুন্নেসাই আমার আশমানের চাঁদ—দিল কী রৌশন—তা হ'লে তাকেও সঙ্গে নিয়ে আসতুম!'

'তাকে নিয়ে এলে আরও বিব্রত হ'তে। কী লাভই বা!' নিস্পৃহ উদাসীনতার সঙ্গে বলে মেহের, 'বাঁদীর জীবন সর্বত্রই এক, সে কেটেই যাবে একরকম ক'রে। তা সে আংরেজের হাতেই পড়ুক বা কোন রইস আমীরের কাছেই চলে যাক! কারুর না কারুর গোলামি করা—এই তো!'

ওর এই ঔদাসীন্যে আঘাত পায় আগা। সে মেহেরের দিকে ফিরে শুয়েছিল, এখন বাঁ-হাতের কনুইয়ে ভর দিয়ে খানিকটা আধশোয়া অবস্থায় উঠে উত্তেজিত ভাবে বলল, 'না না, অমন কথা বলো না, ছি! শিরীণ্ সামান্য বাঁদী নয়!'

'বাঁদী আবার সামান্য আর অসামান্য! তুমি হাসালে দেখছি। বাঁদী বাঁদীই।... মরুক গে, ওসব কথা থাক, তুমি অন্য কথা বলো।'

গভীর আবেগে আগার গলাটা কেঁপে যায়—বলে, 'বেচারী শিরীণ্, বড় ভাল কিন্তু বড় দুর্ভাগিনী। সে বাঁদী ঠিকই—কিন্তু আমি তাকে সামান্য বাঁদী বলে উড়িয়ে দিতে পারব না। সে আমাকে ভালবাসে, আমার জন্যে অনেক করেছে। তার কাছে আমার ঋণের শেষ নেই, তার দয়াতেই প্রাণ পেয়েছি বলতে গেলে। অনেক—অনেক করেছে সে আমার জন্যে।'

মেহের কেমন একরকমের শীতল কঠিন কণ্ঠে বলে, 'এখন বুঝছি সত্যিই সামান্য বাঁদী সে নয়—। সে যে তোমার হৃদয়েশ্বরী, সেটা বুঝতে পারি নি। তা হলে তার সম্বন্ধে খুব শ্রদ্ধাভরে কথা বলতাম নিশ্চয়ই। অন্যায় হয়ে গেছে আমার!'

আবারও ভুল বোঝে আগা। মেহেরের এই ভাব-পরিবর্তনকে ঈর্ষা বলে মনে ক'রে দুঃখিত হয়, আবার মনের অবচেতনে কোথায় একটা সূক্ষ্ম বিজয়গর্বও অনুভব করে। আস্তে আস্তে বলে, 'সে যদি সত্যিই আমার হৃদয়েশ্বরী হ'ত, তাহ'লে আর তাকে অভাগিনী বলতুম না। সে তো তাহ'লে ধন্য হয়ে যেত। অবশ্য এতে ক'রে আমি গর্ব প্রকাশ করছি না, তার মনের কথাই বলছি। দুর্ভাগিনী বৈকি, নইলে আমার মতো তুচ্ছ একটা লোক—বান্দার বান্দা—তাকে ভালবেসেও প্রতিদান পেল না, অমন মধুর স্বভাবের মেয়ে, এ আল্লার অভিশাপ ছাড়া কী বলব! দিয়েই গেল শুধু দু হাতে মেয়েটা—তার বদলে পেল না এক কণাও। বড় ভাল মেয়ে শিরীণ্, বড় ভাল। যদি আগেই তুমি চোখ-ঝল্সে মন-ভুলিয়ে না দিতে—তাহ'লে ওর ভালবাসা সৌভাগ্য বলে মানতাম। অমন দিল আমি দেখি নি কোন মেয়ের! সে জানত যে তাকে আমি ভালবাসি না, কোনদিনই বাসতে পারব না—তবু সে আমাকে ভালবেসে গেছে—সাহায্য ক'রে গেছে—এমন কি তোমার সঙ্গে দেখা হবারও সুযোগ ক'রে দিয়েছে। কোন মেয়ে এমন পারে বলে আমি জানি না। যে মেয়েছেলে—সামান্য অশিক্ষিতা বাঁদী হয়েও ঈর্ষাকে জয় করতে পারে, সে তো মহীয়সী!'

শেষের দিক গলা আরও বেশী কেঁপে যায়,—শ্রদ্ধায়, স্নেহে, অনুকম্পায়, অনুশোচনায়।

কিন্তু মেহেরের করুণা হয় না বুঝি তবুও, 'কে বলে সে পায় নি কিছুই? পেয়েছে যে—এই তো তোমার গলার আওয়াজেই তার প্রমাণ। তোমার ব্যথা, তোমার সহানুভূতি, তোমার এই দীর্ঘনিশ্বাস—এই তো তার যথেষ্ট পাওয়া। ধৈর্য ধরে থাকলে, আর একটু অবসর মিললে বাকীটুকুও পেতে পারত সে অনায়াসে—তাতে কোন সন্দেহ নেই!'

'ছি শাহ্জাদী, তাকে তুমি ঈর্ষা করো?'

'বাঁদীকে ঈর্ষা করবে শাহ্জাদী! কেন, তার কি গলায় দেবার মতো এক গাছা দড়িও জুটবে না কোথাও!' তীক্ষ্নকণ্ঠে বলে ওঠে মেহের। কিন্তু তার পরই বেশ কয়েক পর্দা গলা নেমে যায় তার, কতকটা যেন স্বগতোক্তির মতোই বলে, 'আমি ভাবছি নকল শিরীণ্ যা পেল—আসল শিরীণ্ তা কোনদিন পাবে কি?'

'কী, কী বললে! উত্তেজনায় উঠে বসে আগা, 'নকল শিরীণ্, সে আবার কি? কি বলছ তুমি?'

'ঠিকই বলছি। শিরীণ বলে কোন বাঁদী ছিল না লালকিল্লায়, আজও নেই।'

'তবে—? তবে ও কে—? ও কে?' বিহ্বল ভাবে প্রশ্ন করে আগা। তার যেন

মাথা ঘুরেছে, কোন কথাই মাথাতে ঢুকছে না।

'তুমি যাকে শিরীণ্ বলে জানতে—সে—সে অভাগী এই তোমার সামনে। এই বাঁদীই শিরীণ্!

বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায় আগা, কিছুক্ষণ একটা কথাও বেরোয় না তার মুখ দিয়ে।

বিশ্বাস হয় না তার ; কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। কী বলছে মেহের পাগলের মতো যা-তা! ঈর্ষায় পাগল হয়ে গেল নাকি, তাই শিরীণের অস্তিত্বটা পর্যন্ত মুছে ফেলতে চায়?

অনেক—অনেকক্ষণ পরে বলে, 'কী বলছ, তুমি—তুমিই শিরীণ্! তুমি অত সেবা করেছ আমার! শিরীণ্ তোমার ছদ্মবেশ! অথচ আমি—আমি একটুও বুঝতে পারি নি!'

'তুমি কি এখন দেখলেই তাকে চিনতে পারবে? তুমি তো দেখেছ সেই পুরনো রংচটা বুরখাটা!...সেটা আমার বুড়ী ঝির! বিশ্বাস হচ্ছে না—না? দ্যাখো, পৃথিবীতে আমি যে আমিই—এটা বিশ্বাস করানোও কত শক্ত!'

সত্যিই শক্ত। কিছুতেই যেন বিশ্বাস হ'তে চায় না। আগা তেমনিই বিহ্বল ভাবে বলে, 'কিন্তু গলাটাও চিনতে পারলুম না?'

'বুরখার মধ্যে গলা গোপন করা এমন কিছু কঠিন নয়। ঐ বুরখাটা দাও, শিরীণের গলা শুনিয়ে দিচ্ছি।...আর, অত কথারই বা দরকার কি—এই তো কদিন নুরুন্নেসার গলা শুনলে, মেহেরের গলা টের পেয়েছিলে?'

তার পর কাছে সরে এসে ওর হাতের ওপর হাত রেখে বলে, 'তোমার কসম, এই তোমাকে ছুঁয়ে বলেছি—আমিই শিরীণ্। খোদা জামিন।'

অকস্মাৎ যেন হৃদয়াবেগের একটা প্রবল বন্যা এসে ভাসিয়ে দেয় ওর বিবেচনা-শক্তি ; ওর দেহ, মন, চিন্তা, অনুভূতি সমস্তর ওপর দিয়ে আবেগের সে প্রবল ঢেউটা বয়ে যায়। সমুদ্র কখনও দেখে নি আগা, নইলে ওর অবস্থাটার উপমা দিতে পারত অমাবস্যার জোয়ারের সঙ্গে! সে ঢেউ বুঝি তেমনিই উত্তাল, তেমনিই সর্বপ্লাবী।...

স্থানকালপাত্র কিছুই মনে থাকে না। চোখেও যেন দেখতে পায় না কিছু। সব ভুলে দু হাত বাড়িয়ে মেহেরকে টেনে নেয় নিজের দিকে, উন্মত্তের মতো প্রাণপণে বুকে চেপে ধরে। বহুদিনের নিরুদ্ধ বেগের বাঁধ ভেঙ্গেছে তার, আর কিছু মনে রাখা বা মনে পড়া সম্ভব নয়।

সেই লৌহকঠিন আলিঙ্গনে পিষ্ট হ'তে হ'তেও মেহের ওর কানের কাছে চুপি চুপি বলে—দম-আটকে-যাওয়া রুদ্ধ কণ্ঠে—'শিরীণই ভাগ্যবতী, এ উচ্ছ্বাস তার জন্যেই—এ কিন্তু আমার পাওনা নয়। অভাগিনী দেখছি বাঁদী নয়—শাহ্‌জাদীই।'

॥ তিরিশ ॥

সে রাতটা বিনিদ্রই কাটে দুজনের। কথা কারুরই শেষ হয় না। আরও, কথার অফুরন্ত একটা ভাণ্ডার খুলে গেছে আবার, বলার মতো প্রসঙ্গ শতগুণ বেড়ে গেছে। শিরীণ্ আর মেহের এক হয়ে যাওয়ার ফলে কত স্মৃতি ভিড় ক'রে এসেছে দুজনেরই মনে ; বহুদিনের বহু ঘটনা—তুচ্ছাতিতুচ্ছ তথ্য মিলিয়ে দেখছে—স্মৃতির সঙ্গে স্মৃতি, মনোভাবের সঙ্গে মনোভাব। তখন আর চোখে ঘুম আসা সম্ভব নয়।

কিন্তু মন যতটা সয়, দেহ ততটা সইতে পারে না। পরের দিন সকালে উঠে হাঁটতে শুরু ক'রেই সেটা বুঝতে পারে ওরা। অনাহারে আর অনিদ্রায় পা চলে না কারুই। বিশেষ ক'রে মেহের—সে আর পা মোটে ফেলতেই পারছে না। ব্যথা তো আছেই, অবসন্নও হয়ে পড়েছে অনেকখানি।

আগারও অবস্থা তথৈবচ, তবে তার আরও ঢের বেশী কষ্ট করা অভ্যাস হয়ে গেছে এর আগে, সে একেবারে ভেঙ্গে পড়ে নি। এবং সে সত্যি-সত্যিই একসময় প্রস্তাব করল যে মেহের ওর কাঁধে চড়ুক, ওকে সে বেশ বইতে পারবে। কোন অসুবিধাই হবে না ওর দিক থেকে।

মেহের মুখে এর কোন উত্তর দিল না, শুধু ওর গালে একটি ছোট চড় মারল। তবে কাঁধে না চড়ুক, তার কাছাকাছিটা করতে বাধ্য হ'ল। আগেই ওর হাত ভর দিয়ে চলতে শুরু করেছিল, ক্রমশ দেহের প্রায় সব ভারটাই এলিয়ে দিল আগার উপর। আগাকে একরকম টেনেই নিয়ে চলতে হ'ল, বোঝার মতো।

এ অবস্থায় লোকালয় খোঁজা ছাড়া উপায় নেই। বিপদের সম্ভাবনা যতই থাক, খাদ্য এবং খানিকটা জল ওদের চাই-ই। সবচেয়ে যেটা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে—গরম দুধের। এ অবসন্নতা, এ ক্লান্তি দুধ ছাড়া কাটবে না।

বনে পায়ে-চলা পথ অসংখ্য। তার মধ্যে যেটা একটু বেশী চওড়া সেইটেই বেছে নিল আগা। বহুলোক চলার ফলেই পথ চওড়া হয়েছে নিশ্চয়—আর বহুলোক যে পথে চলে সেইটেই জনপদের পথ। তার ধারণা সত্য প্রমাণিত হ'তেও খুব দেরি হ'ল না, খানিকটা চলার পরই ওরা একটা গ্রামের ধারে এসে পড়ল। খুব বড় গণ্ড-গ্রাম গোছের নয় অবশ্য, তবে নিতান্ত ক্ষুদ্রও নয়। দোকানপাট আছে কিছু, একটা মসজিদও আছে। দু-একটা হিন্দু দেবমন্দিরও দেখা গেল। মন্দির মসজিদ পাকা—বাকী সবই মাটি ও খাপরার চালের বাড়ি অবশ্য।

ওরা গ্রামের একেবারে ভেতরে ঢুকল না। তবে ভয়ের ভাবও দেখাল না। সে সম্বন্ধে আগেই সতর্ক ক'রে দিয়েছিল আগা মেহেরকে। সহজ ভাবেই এগিয়ে গিয়ে, প্রথমেই যে 'দুধদহি'র দোকান চোখে পড়ল, সেখানে থেমে কিছু 'কলাকন্দ' আর আধা আধা সের দুধ চাইল। পরিচয় দিল ইঙ্গিতে—মেহেরকে নিজের 'জরু' বলে। শ্বশুরের খুব অসুখ খবর পেয়ে ওরা আগার 'শ্বশুরাল' যাচ্ছিল ; পথে যা আংরেজের উপদ্রব শোনা যাচ্ছে তাতে আর বড় সড়ক ধরে যেতে ভরসায় কুলোয় নি, এমনি মেঠো পথ ধরে ধরে যাচ্ছে। তাও, বিবিজীর জন্যে একটা ডুলি নিয়েছিল, আংরেজ আসছে খবর পেয়ে ডুলিওলারা ডুলি ফেলে পালিয়েছে।

দোকানদার দুধে শক্কর মেলাতে মেলাতে ঈষৎ একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বলল,

'কিন্তু তোমাদের তো পাঠান মালুম হচ্ছে, তোমাদের অত ডর কিসের, তোমাদের সঙ্গে তো আংরেজের কোন ঝগড়া নেই।'

'আর ভাই রেখে দাও পাঠান আর মুঘল। ওরা অত চিনে বসে আছে কিনা! শুনেছি নওজোয়ান দেখছে আর ধরে সামনের গাছে ফাঁসী লট্‌কে দিচ্ছে! ওদের কাছে দিল্লীওয়ালা, লক্ষ্ণৌওয়ালা, কাবুলওয়ালা—হিন্দু মুসলমান সব সমান। ওরা চিনবেই বা কি ক'রে? তুমি এদেশী লোক তাই টপ ক'রে চিনলে!'

'তা বটে।' কুল্লড় ভরে দুধ আর কাঁচা পলাশপাতার দোনায় কলাকন্দ্ আলগোছে ভাবে ওদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'তবে কদিন যেন পাঠানদের আনাগোনাটা এদিকে খুব বেড়েছে—কী ব্যাপার কিছু বুঝছি না।'

দৃষ্টিতে শুধু নয়, কণ্ঠেও তার যথেষ্ট সন্দেহ।

বুকের মধ্যে ধক্ ক'রে ওঠে এদের দুজনকারই।

'আরও পাঠান কেউ এসেছে নাকি এর ভেতরে?' অনেক কষ্টে, দুধ খাবার ছুতোয় খানিকটা সময় কাটিয়ে, নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করে আগা। তবু তার উৎকণ্ঠা সবটা ঢাকা পড়ে না। মেহের একটু আবডালে গিয়ে বুরখা তুলে দুধ খাচ্ছিল, তার মুখভাবটা দেখা গেল না, তবে তারও যে হাত কেঁপে কুল্লড় থেকে চল্‌কে কয়েক ফোঁটা দুধ পড়ে গেল কামিজে, সেটা তার বাঁ হাত দিয়ে মোছবার ভঙ্গীতে আন্দাজ করল আগা।

দুধওয়ালা চুল্‌হাতে একটা বড় গোছের কাঠ ঠেলে দিতে দিতে বলল, 'এই তো হালফিল কালই এক দল এসেছে, গ্রামের জমিদারদের যে ধরমশালা আছে, সেখানে এসে বাসা বেঁধেছে। সে তো জোর-জবরদস্তি একেবারে—বাবুসাব নেই, তাঁর গোমস্তা আছেন—তা তিনি বললেন, বিনা হুকুমে তোমাদের আমি থাকতে দিতে পারব না, বিশেষ তোমাদের বাপু সব রক্তারক্তি কাণ্ড—এসব ভাল বোধ হচ্ছে না আমার।...ভাল কথাই বলেছে, কিন্তু ভাল কথার জমানা কি আছে আর, লোকগুলো একসঙ্গে বন্দুক তলোয়ার উঁচিয়ে এমন ভাবে তেড়ে এল যে সে বেচারা চাবির গোছা ফেলে পালাতে পথ পায় না একেবারে!...লোকগুলো যে বদ তাতে কোন সন্দেহ নেই, ডাকু হবে নিশ্চয়। ওদের মধ্যে দুজন কোথাও মারামারি ক'রে বেশ খানিকটা জখম হয়ে এসেছে। তাদের জন্যে রাতদুপুরে হাকিম খুঁজতে বেরিয়েছিল গ্রামে। তা আছেন, আমাদের গ্রামেও বেশ ভাল হেকিমসাহেব আছেন, আফজল-উল-হক সাহেব, রাতে বেরোন না কোথাও, কী করবেন গুন্ডাদের হাতে জান হারাবার ভয়ে নাকি কাঁপতে কাঁপতে উঠে গিয়েছিলেন।'

এক নিশ্বাসে সমস্ত ইতিহাস বিবৃত ক'রে একটু থামল সে আহীরনন্দন, নিতান্ত প্রয়োজনেই থামতে হ'ল তাকে। কারণ নতুন কাঠের গুঁড়িটা ধরছে না কিছুতেই। চারদিক থেকে আঙরাগুলো ঠেলে ঠুলে গুঁড়িটার ওপর জড়ো ক'রে ফুঁ দিয়ে দিয়ে আগুনটা বেশ জোর ক'রে আর এক ঘড়া কাঁচা দুধ কড়াইতে ঢেলে দিয়ে আবার বক্তৃতার অবসর মিলল তার। নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আগার কাঁধের কাছে শুকিয়ে-যাওয়া রক্তের দাগটার দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে আবার বলল, 'দেশেও হয়েছে তেমনি অরাজক, পুলিস নেই, চৌকিদার নেই—থানা খালি ক'রে পালিয়েছে সব আংরেজের ভয়ে, শালা ডাকু-লোকদের তো এই মওকা!'

দুধ এবং কলাকন্দ্ খেতে বেশী সময় লাগে না। এতটাও লাগত না—দুধ খুব গরম না হ'লে। এখন খাওয়া শেষ ক'রে কুল্লড়টা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দাম

মিটিয়ে ইশারায় মেহেরকে ডেকে আবার পথে নেমে এল।

মেহের চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করল, 'কি করবে, আবার জঙ্গলে ফিরে যাবে—?'

'উঁহু—সেটা ঠিক হবে না, ওরা খুঁজতে বেরোলে ওখানেই আগে যাবে। ওদের মাথায় অত বুদ্ধি না খেললেও এই দুধওয়ালাই সে বুদ্ধি যোগাবে। দেখছ না, এখনও চোখ পাকিয়ে কী রকম শকুনির মতো চেয়ে আছে! যতই ওদের শালা ডাকু বলুক, মজা দেখবার জন্যেই আমাদের সন্ধান দিয়ে দেবে ডেকে।...না, জঙ্গলে যাওয়া হবে না। হেঁটে তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাব, আমাদের কারুরই সে ক্ষমতা নেই আর। অন্তত তুমি তো পারবেই না। একমাত্র উপায় আছে আল্লার আশ্রয় নেওয়া—'

'তার মানে?'

হাত দিয়ে দেখিয়ে দেয় মসজিদটা। বলে, 'চলো গিয়ে ইমাম সাহেবের শরণ নেই। মসজিদে ঢুকে জুলুম করতে সাহস করবে না ওরা—আমার দেশের লোক, আমি চিনি।'

'ঠিক—কিন্তু বেরোতেও পারবে না তার পরে—সেটা মনে রেখো। একেবারে ইঁদুরকলে পড়বে। তার চেয়ে চলো জঙ্গলেই ঢুকে পড়ি, আর কিছু না হোক, কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকতে তো পারব!'

'তাই চলো তবে' বলল বটে কিন্তু এক পাও আর যাওয়া হ'ল না কোথাও। তার আগেই অত্যন্ত সুপরিচিত একটা শব্দ কানে এল ওদের। ঘোড়ার পায়ের শব্দ, এক নয়—একাধিক। এই গ্রামের মধ্যে নাল-বাঁধানো ক্ষুরের আওয়াজ একটিই সম্ভাবনা সূচিত করে। চকিতে একবার চোখ ফিরিয়ে দেখল—দুধওয়ালা, আসন্ন তামাশা দেখবার সানন্দ কৌতূহলে দোকানের টাট ছেড়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, উৎসুক চোখে চেয়ে আছে, যেদিক থেকে শব্দ আসছে সেইদিকে।

আর কিছু ভাবার সময় হ'ল না। অন্য কোন পথের কথা মনেও পড়ল না সেই দু-তিন মুহূর্তের মধ্যে।

আগা মেহেরের একটা হাত ধরে একরকম টানতে টানতে ছুটল মসজিদের দিকে। খুব দূরে নয় মসজিদটা—তবে একেবারে কাছেও নয়। ওরা ভেতরে ঢোকার আগেই কাইয়ুমের ঘোড়া বস্তির চালাগুলোর আড়াল থেকে বেরিয়ে একেবারে সামনে এসে পড়ল। পরস্পরকে দেখার কোন অসুবিধা রইল না কারুর।

তবে দুশমন এসে পড়ার আগেই ওরা ভেতরে ঢুকতে পেরেছে। সৌভাগ্যক্রমে ইমামসাহেব ভেতরেই ছিলেন—গোলমালটা কি হচ্ছে খোঁজ করার জন্যেই বোধ করি বাইরে আসছিলেন। আগা—বিস্মিত এবং কিছুটা ভীতও—ইমামের হাত দুটো ধরে বলল, 'আমরা আল্লার নামে আশ্রয় চাইছি বাবা, মসজিদে আমাদের একটু আশ্রয় দিন—'

ইমামের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। বিরক্তিটা চাপা রইল না মুখে। সেজন্য তাঁকে দোষ দেওয়াও যায় না খুব। খামকা হ্যাঙ্গাম-হুজ্জুতে কে জড়িয়ে পড়তে চায়! কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত আল্লার নামের দোহাই এড়াতে পারলেন না বৃদ্ধ, একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'পারো তো থাকো। এ খোদার জায়গা, আমি বারণ করবার কে?'

তখনকার মতো আসন্ন বিপদটাকে এড়ানো গেল বটে, তবে মেহের যা আশংকা

করেছিল তা-ই ঘটল। দেখতে দেখতে ওরা মসজিদের চারিদিক ঘিরে ফেলল। ছোট মসজিদ—সাধারণ গ্রাম্য মসজিদ যেমন হয়—ঘিরতে বেশী লোকও লাগে না। ওরা সম্ভবত প্রচুর টাকার লোভ দেখিয়ে স্থানীয় গ্রাম্য লোকও কিছু যোগাড় করেছে এ কাজের জন্যে, তারা লাঠিসোঁটা নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। ওখানেই খাবার এসে পৌঁছচ্ছে, পালা ক'রে শোবার জন্যে চারপাইও এসে গেছে খানকতক। নিতান্ত প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া নড়ছে না কেউ, সেও একজন একজন ক'রে। তার ফলে অবরোধ শিথিল হচ্ছে না এক লহমার জন্য, নিরন্ধ্র সতর্কতা এবার ওদের—কোনমতে না খাঁচার ইঁদুর পালাতে পারে।

ইমাম বেগতিক দেখে প্রায় তখনই সরে পড়েছিলেন। তাঁকে কেউ কিছু বলে নি, কিন্তু পরে যদি এদের দলের লোক ভেবে বেরোতে না দেয়?...সুতরাং আর কেউ নেই, মাত্র এরা দুটি প্রাণী ভেতরে। আশ্রয় বলতে, অবলম্বন বলতে, আশ্বাস বা পরামর্শ দেবার লোক বলতে পরস্পরের ঐ দুজনই। সব মসজিদের দরজা থাকে না, সৌভাগ্যক্রমে এর একটা মজবুত দরজা ছিল। তাও দু-একবার—নমাজের সময়ে সময়ে স্থানীয় লোকদের দ্বারা দুমদাম ঘা দিইয়েছিল—যেন তারা নমাজ পড়ার জন্যে আসতে চাইছে—কিন্তু আগা দরজা খোলে নি। সে বুঝেছিল, চারিদিকে সশস্ত্র পাঠান বসে থাকতে গ্রামের কোন লোক সহজে এদিকে নমাজ পড়তে আসবে না। এমনিতেই তারা ভয়ে মরছে।

ঢুকলও না যেমন কেউ—এরাও বেরোতে পারল না। অর্থাৎ আবার শুরু হ'ল উপবাস।

মসজিদের মধ্যে কলসীতে জল ছিল একটু, তাতে তৃষ্ণা নিবারণ হ'ল, ওজু করার চৌবাচ্ছাতেও জল ছিল, তাতে মুখ-হাত ধোওয়া গেল, কিন্তু খাওয়ার মতো কিছু খুঁজে পাওয়া গেল না। বিশেষ কারণ ছাড়া মসজিদে খাবার এনে রাখার কথা কেউ ভাবে না কখনও। সাধারণ দিনে তো নয়ই। এক কেউ মিলাদ-টিলাদ দিলে সে আলাদা কথা, অথবা কোন পরবের দিন হ'লে কাঙালী ভিখিরীর জন্য খিচুড়ি রান্না হয় হয়ত—এখন সেসব কোন উপলক্ষ নেই, খাবার থাকবেই বা কেন? ইমামের বাড়ি কাছেই, তিনি এখানে বাস করেন না, তাঁরও কোন প্রয়োজন হয় না খাদ্য সংগ্রহ ক'রে রাখার।

আহার নেই, নিদ্রাও নেই। এই ভাবেই পুরো দুটি দিন কাটল। শরীর তার সহ্যের শেষ সীমায় এসেছে। শুধু যদি একটু ঘুমোতেও পারত!...ভয়ে ঘুমোতে পারছে না। চোখের পাতা সীসার মতো ভারী হয়ে এসেছে—তবুও তা বুজতে পারছে না আতঙ্কে। আতঙ্ক অতর্কিত কোন বিপদ এসে পড়ার। নইলে ভয় জিনিসটা আগার কম। সে চেয়েছিল বেরিয়ে লড়ে দেখতে, মেহেরই অনেক বুঝিয়ে তাকে নিবৃত্ত করেছে। এতগুলো সশস্ত্র লোকের সঙ্গে একা লড়তে যাওয়া বীরত্ব নয়—মূর্খতা।

অথচ এভাবেই বা কদিন চলবে ভেবে পায় না ওরা। দুশমনদের কোন অসুবিধাই নেই, বরং তারা শিকারকে এমন খাঁচাকলে ফেলতে পেরেছে বলে বেশ উৎফুল্লই। তারা ধরেই নিয়েছে যে এরা ওদের মুষ্টিগত—আজ অথবা কাল—ধরা দিতেই হবে। বেশ গুছিয়েই বসেছে তারা। জলের মতো টাকা খরচ করছে বলে গ্রামবাসীরাও অনেকে ওদের দলে এসে গেছে। তাঁবেদারী করছে তারা চাকরের মতো। জালা জালা জল এনে যোগাচ্ছে—খাবার এনে দিচ্ছে, রসুই ক'রে দিচ্ছে

ওখানেই। মাংস রুটি ফল—কিছুরই অভাব হচ্ছে না। পালা ক'রে ঘুমাচ্ছেও ওরা এক-একজন।

এর মধ্যেই চেঁচিয়ে শুনিয়ে দিল পাঁচিলের ওপার থেকে যে, লাল কিল্লা ইংরেজদের হাতে এসে গেছে, এপক্ষের যারা পালাতে পেরেছে বেঁচে গেছে, বাকী সকলকে মেরে ফেলেছে ওরা। শাহ্‌জাদাদের একজনও নেই আর—কে এক গোয়েন্দা হডসন সাহেব কুকুরের মতো গুলি ক'রে মেরেছে হাজার হাজার লোকের সামনে! বাহাদুর শা বাদশা হুমায়ুনের গোরে পালিয়ে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে ধরে এনে খাঁচায় পুরেছে। লাল কিল্লাতেই বিচারের ব্যবস্থা হচ্ছে—তাঁরও ফাঁসী হবে নিশ্চিত। বাদশা আর তাঁর পেয়ারের বেগম জিন্নৎমহল সাহেবের দৈনিক খোরাকী বরাদ্দ হয়েছে দু আনা হিসেবে। সুতরাং ওদিক দিয়ে কোন সুবিধা কি সাহায্য পাবার আশা নেই। আগা যেন না মনে করে যে বাদশার নাতনীকে নিয়ে যাচ্ছে বলে পথে পথে বাদশার লোক ছুটে আসবে তাকে রক্ষা করতে। এখন বাদশার অনুগত লোক মানেই আংরেজের দুশমন। তাকে মারলে বা বন্দী করতে পারলে আংরেজ সরকারের কাছে বকশিশ মিলবে বরং।...

কথাটা শুনে মেহের কান্নায় ভেঙে পড়ে। মিথ্যা নয়, মিথ্যা বলে নি ওরা। এসব কথা মিথ্যা হওয়া যে সম্ভব নয়! এইটেই তো আশঙ্কা করেছিল সে, জেনেই তো এসেছিল। এমন যে হবে—সে তো জানতই। মিসেস লীসনের মুখেও তো এইরকম আঁচই পেয়েছে তারা।

শাহ্‌জাদারা কেউ নেই! মির্জা মোঘল, আবুবকর, খিজির সুলতান—কেউ নেই আর! কুকুরের মতো গুলি ক'রে মেরেছে কোন্ নফরের নফর, কুত্তীকা বাচ্ছা হডসন!...এইসব শাহ্‌জাদার দলকে দেখতে পারত না মেহের কোন দিনই—বিশেষ ক'রে আবুবকর, আবুবকর হামেশাই বিরক্ত করতো তাকে অশোভন প্রস্তাব আর ইঙ্গিত ক'রে—ইমানী বেগম সাহেবার বাড়ি লুঠ ক'রে যে নীচতার পরিচয় দিয়েছে আবুবকর, তাতে শাহ্‌জাদা পদবীটারই অসম্মান করা হয়েছে—তবু তারা ওর আত্মীয়। তাদের এমন শোচনীয় এমন অবমাননাকর মৃত্যুর কথা শুনে চোখে জল রাখবে কেমন ক'রে! আমীর তৈমুরের—চেঙ্গিজ খাঁর বংশধর, তাদের রক্তের হিস্‌সাদার বাবর-আকবর আলমগীরের উত্তরাধিকারী—তাদের এই মৃত্যু!

আর তার নানা! তার স্নেহময় নানা, তার আশ্রয়দাতা, তার হিতাকাঙ্ক্ষী—মহা সর্বনাশের সামনে দাঁড়িয়েও যিনি সর্বাগ্রে তার কথাই চিন্তা করেছেন—তার সেই নানা, তার বাদশা কোন্ অন্ধকূপে বন্দী হয়ে আছেন, একা, বান্দা নফর তো দূরের কথা, সহানুভূতি জানাবার একটা লোকও নেই কাছে! মাত্র দু আনা খোরাকী বরাদ্দ হয়েছে শাহানশা দিল্লীর বাদশার। দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা—এখনও যে লোকে বলে কথায় কথায়। হায় আল্লা, মেহেরবান খোদা—তোমার মনে এই ছিল? কার পাপের শাস্তি কে ভোগ করল। তার নানা যে বড় ভালমানুষ, বড় নেকদার মানুষ ছিলেন। সবাইকে স্নেহ করতেন, সকলের কল্যাণ চাইতেন। তিনি তো কোন পাপ করেছেন বলে জানে না কেউ। তবে তাঁর নসীবেই বা এমন হ'ল কেন!

হাহাকার ক'রেই কাঁদবার কথা। তাই কাঁদেও সে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদে আর মাথা ঠোকে। ধুলোয় ধূসর হয়ে ওঠে মুখখানা, কর্দমাক্ত হয়ে ওঠে, কপালটা ফুলে ওঠে মাথা-কোটার ফলে। শুধু—পাছে সে কান্নার শব্দ বাইরে দুশমনদের কানে গিয়ে ওদের উল্লাসের কারণ হয়—তাই মুখের মধ্যে ওড়নার প্রান্তটা গুঁজে

দেয়—যতটা সম্ভব।

প্রথমটা আগা বাধা দেয় না। তারও চক্ষু শুষ্ক নেই একেবারে। আশ্রয়দাতা, জীবনরক্ষাকর্তা, মালিক। তাঁর এই পরিণাম! কিন্তু আগার দুঃখ যতই হোক— মেহেরের শোকের সঙ্গে তার তুলনা চলে না। দুঃখের, বেদনার, শোকের এমন মর্মন্তুদ প্রকাশও সে দেখে নি কখনও। যার পায়ের সামান্য কাঁটাটি সরাতে সে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে—তারই অবর্ণনীয় দুর্দশা বসে বসে দেখতে হয় ; সেই অনিন্দ্য-সুন্দর মুখ দেখতে দেখতে ধূলি-ধূসরিত, স্বেদ-অশ্রু-ক্লেদাক্ত হয়ে ওঠে—আকুল কান্নায় মনে হয় বুকটা ফেটে যাবে বেচারীর—অথচ কোন প্রতিকারই সে করতে পারে না। কী বা করবে, কী বলেই বা সান্ত্বনা দেবে? এ শোকে কি মানুষ কোন সান্ত্বনা দিতে পারে?...বরং এই ভাল, এ বেদনা এমনি মর্মন্তুদ রোদনেই ধুয়ে যাওয়া ভাল—তাতে এর পর হয়ত অনেকটা হাল্‌কা হতে পারবে।

কিন্তু থাকতেও পারে না বেশীক্ষণ। এগিয়ে এসে বুকে তুলে নেয় মেহেরকে। কানের কাছে গালটা রেখে বলে, 'ছি! বহু বাদশা, বহু যোদ্ধার রক্ত আছে তোমার ধমনীতে, তোমার এমন ভাবে ভেঙ্গে পড়া কি সাজে! সব আঘাত, সব আনন্দ, সব পরাজয় সমান স্থৈর্যের সঙ্গে সইবে—এই তো রাজবংশের শিক্ষা শাহ্‌জাদী! শক্ত হও, দুঃখকে জয় করো, তার তলায় পিষে গুঁড়িয়ে যেও না।...বিশেষ এখন—বিষম শত্রু সামনে, তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে, ধৈর্য হারালে যে কোনক্রমেই চলবে না এখন। তা ছাড়া ওঁদের কথাও ভেবে দ্যাখো, রাজগী নিয়ে জুয়াই খেলতে গিয়ে-ছিলেন ওঁরা—তাই নয় কি? সর্বস্ব পণ ক'রে খেলা—সে জুয়ার বাজীতে হারলে, এমনি মূল্যই দিতে হয় কি!...পাপ বাদশা করেন নি ঠিকই, কিন্তু তাঁর নামেই হয়েছে। লীসন মেমসাহেবের কথাটা একবার ভেবে দ্যাখো দিকি। এমন কত লীসন মেম হাহাকার করছে আর নিত্য অভিসম্পাৎ দিচ্ছে বাদশাকে, বাদশার দলকে। তবু তো তিনি প্রাণে বেঁচেছেন, ইজ্জৎও হারান নি, কিন্তু তামাম হিন্দুস্তানে কত আংরেজ ক্রীশ্চানের নিরাপরাধ স্ত্রী-শিশু অকারণে প্রাণ দিয়েছে, ইজ্জৎ দিয়েছে ভাবো দিকি। তাদেরও এমনি আঘাতই লেগেছে, সকলেরই এক আঘাতে একই রকম ব্যথা লাগে। তাদের কথা ভেবে নিজের দুঃখ সহ্য করার চেষ্টা করো।'

তারপর সযত্নে ওর মুখটা নিজের দিকে ফিরিয়ে ওরই ওড়নার প্রান্ত দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে আবারও বলে, 'আর তাঁদের জন্যে শোক করার সময়ই বা কৈ, তোমারও জীবন আর ইজ্জৎ তো কম বিপন্ন নয়, সে কথা ভেবেও শক্ত হওয়া দরকার। নিজের ভবিষ্যতের আগে তোমার কথা ভেবেছেন বাদশা, যদি তোমাকে না নিরাপদে সেখানে পেঁৗছে দিতে পারি— সেইটেই হবে তাঁর কাছে সবচেয়ে মর্মান্তিক পরাজয়। তাঁর শেষ ইচ্ছাটা যাতে পূর্ণ করতে পারো—সেইটেই ভাবো সর্বাগ্রে।'

আরও অনেক কথা বলে যায় আগা। কিছু কানে যায় কিছু বা যায় না। কিন্তু দয়িতের বুকে মাথা রেখে, তার সস্নেহ কণ্ঠের গুঞ্জরণের মধ্যে, তার উষ্ণ ও আশ্বাসভরা বাহুপাশে নিজেকে এলিয়ে দিতে পেরে অনেকটা যেন সান্ত্বনা লাভ করে সে। একটু পরে আস্তে আস্তে উঠে মুখে হাতে জল দিয়ে, খালিপেটেই খানিকটা জল খেয়ে শান্ত হয়ে এসে বসে।

তবু ভাগ্যে এই জলটুকু ছিল! কিন্তু তাও তো শেষ হয়ে আসছে। এক কলসী জল আর কতটা!

দু দিন এবং দু রাত এই ভাবে কাটাবার পর আগা কতকটা মরীয়া হয়ে ওঠে। এবার যাহোক কিছু একটা করতেই হবে, নইলে ক্ষীণ যেটুকু আশা আছে মুক্তির, সেটুকুও থাকবে না।

তার কাছে পিস্তল আছে, গোটাছয়েক গুলিও আছে তার মধ্যে। ভেতর থেকে ছুঁড়লে একে একে সব কজন পাঠানকেই শেষ করতে পারে। কিন্তু তাতে মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট করা হয়, যে মুহূর্তে সে আল্লার আশ্রয়ের অমর্যাদা করবে, সেই মুহূর্তেই ওদেরও আর কোন দায় থাকবে না সে মর্যাদা রক্ষা করার। একটি গুলি কি একটি আঘাতের অপেক্ষাতেই আছে ওরা—চোখের নিমেষে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকবে।

না, সে কোন কাজের কথা নয়।

কাজের কথা যা, সেইটেই স্থির করে অনেক চিন্তার পর। মেহেরকে বলে, 'দ্যাখো, এমন ভাবে থাকলে একদিন না খেয়েই মরতে হবে আমাদের। এখনও তবু কিছু শক্তি আছে, আরও দু'দিন এভাবে কাটলে হাত-পা নাড়বারও ক্ষমতা থাকবে না। মরতে হ'লে মানুষের মতো মরাই ভাল—খরগোশ কি ইঁদুরের মতো ফাঁদে প'ড়ে মরা বড় লজ্জার। দু-দুটো নওজোয়ান মানুষ এমন ইঁদুরপচা হ'য়ে মরবই বা কেন? তার চেয়ে এক কাজ করি চলো, তুমি তো তলোয়ার চালাতে জানো বলছিলে, তুমি তলোয়ার নাও, আমি পিস্তল ধরি—বাইরে বেরুই, দাঁড়িয়ে লড়ব না, লড়তে লড়তে ওদের ব্যূহ ভেদ ক'রে বাইরে যাবার চেষ্টা করব—এই হবে আমাদের লক্ষ্য। তার পর, বেরোতে পারি তো ভাল, না বেরোতে পারি তো লড়তে লড়তে মরব—সেও ঢের বেশী গৌরবের। যদি দ্যাখো যে আর পারছ না, আমিও তোমার সাহায্যে আসতে পারব না—মানে যদি আমি তার আগেই পড়ে যাই—তা হ'লে ঐ তলোয়ার-খানাই সোজা নিজের বুকে বসিয়ে দিও। ওদের হাতে প'ড়ো না কিছুতেই।'

মেহের সানন্দে রাজী হয়। এমন অবস্থায়, নিষ্ক্রিয় হ'য়ে বসে থেকে তিলে তিলে মরার থেকে এমন কি আত্মহত্যার প্রস্তাবও বাঞ্ছনীয়—এ তো তবু লড়াই ক'রে মরা!

মুখ-হাত ধুয়ে, পোশাক-আশাক আঁট ক'রে বেঁধে প্রস্তুত হয়ে দুজনে নমাজ পড়তে বসে। সম্ভবত এই শেষ ভগবানকে ডাকার অবসর ওদের—সেই ভাবেই প্রার্থনা জানায় তাঁর কাছে। তাঁর মর্জিরই জয় হোক, যদি ওদের মৃত্যুই তাঁর মর্জি হয় তো ওদের দুঃখ নেই, তবে যেন এই এক প্রায়শ্চিত্তেই ওদের যত কিছু গুনাহ্ মাফ ক'রে দেন, এর জের সেই শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত টানতে না হয়।

ভগবানের মর্জির কাছে আত্মসমর্পণ করাতেই বোধ করি তাঁর মর্জি ঘুরে গেল —অথবা সে মর্জিটা অন্যরকম ছিলই বরাবর—তিনি ওদের পরীক্ষা করছিলেন মাত্র। ওদের নমাজ শেষ হবার আগেই বাইরে একটা প্রচণ্ড হৈ-হল্লা উঠল। অনেক ঘোড়ার পদশব্দ, বহুলোকের নানাধরনের চিৎকার, অনেকের দৌড়োদৌড়ি দাপাদাপির আওয়াজ, বহু বিচিত্র শব্দে তালগোল পাকানো একটা বিপুল কোলাহল, যার মধ্যে থেকে কোন্‌টা কিসের এবং কোন্‌টা আগে তা বেছে নেওয়া কঠিন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেলে যেমন মানুষের দৃষ্টি বা মন তার সব-গুলো গ্রহণ করতে পারে না—তেমনি দ্রুত বহুকাণ্ড ঘটে গেল এটা বুঝলেও ব্যাপারটা পরিষ্কার কিছু বুঝে উঠতে পারল না এরা। আর ঘটছে যা এদের দৃষ্টির বাইরে, মনও তখন ঈশ্বরাভিমুখী। মৃত্যু প্রায় প্রত্যক্ষ জ্ঞান ক'রে মানুষ যখন

ভগবানকে ডাকে, অনেকটা মন দিয়েই ডাকে।...

মসজিদের দরজায় বেশ বড় গোছের দু-তিনটে ফোঁকর ছিল, জীর্ণ দেওয়ালেও ছিল দু-চারটে সূক্ষ্ম ফুটো। সুতরাং উঁকি মেরে দেখার কোন অসুবিধা নেই! নমাজ সেরে উঠে দুজনে দু জায়গায় চোখ দিয়ে দাঁড়াল আর সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটা বুঝতে পারল। অস্ফুট কণ্ঠে ঈশ্বরকে ধন্যবাদও জানাল দুজনেই। তাঁর অসীম কৃপা ওদের উপর—অন্তত এই দুশমনদের হাত থেকে আরও একবার রক্ষা করলেন তিনি। ষাঁড়ের শত্রু বাঘে খাওয়ার প্রবাদ আছে, সেই প্রবাদই সত্য হ'ল ওদের জীবনে।

আসলে কোথা থেকে একদল ইংরেজ ফৌজ এসে পড়েছে। ইংরেজ সিপাহী—তাদের সঙ্গে কিছু সাদা পোশাকের সাহেবও আছে। বোধ হয় যারা সর্বস্ব হারিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল, তারাই বিজয়গর্বে ফৌজকে পথ দেখিয়ে আনছে, সাহায্যও করছে কিছু কিছু, ওদের সঙ্গে মিলে প্রতিশোধ নিতে নিতে আসছে। যাই হোক, দুই দল মিলিয়ে অনেক কজন ইংরেজ। সঙ্গে কিছু দেশী সিপাহীও আছে—গুর্খা বোধ হয়—আগা ঠিক জানে না, তবে শুনেছে যে কে এক জঙ্গ্‌ বাহাদুর রাণার গুর্খা সিপাহীরা এসেই নাকি ইংরেজের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছে —আরও শুনেছে যে তাদের নাকি নাক চ্যাপ্‌টা, হলদে রঙ, বেঁটে বেঁটে গড়ন—মিলিয়ে দেখল এরাও তাই! অদ্ভুত মানুষ এরা, মুখে কোন ভাব-পরিবর্তন হয় না—নির্বিকার প্রশান্ত অথচ কঠিন।

এই দলটি হঠাৎ এসে পড়ে—এতগুলো এদেশী লোক, বিশেষ সশস্ত্র, দেখেই বুঝে নিয়েছে যে এরা 'পাণ্ডে' অর্থাৎ বিদ্রোহী দলের লোক। প্রথম বিদ্রোহীর পদবী থেকে ইংরেজরা সাধারণ ভাবে সমস্ত বিদ্রোহীদেরই নামকরণ করেছে পাণ্ডে। সুতরাং বেশ বড় এক দল 'পাণ্ডে'কে ধরতে পেরেছে বলে সাহেবদের খুশির শেষ নেই। তারা উল্লাসে চিৎকার করছে, এরা প্রাণভয়ে চেঁচাচ্ছে। পাঠানদেরও মুখ শুকিয়ে গেছে, তবু তারা চুপ ক'রেই আছে ; বোধ হয় বুঝেছে যে চেঁচামেচি ক'রে কোন ফল হবে না এখানে।

ভয়ে দিশেহারা হয়ে গেছে এদেশী যেসব ভাড়াটে গুণ্ডারা এসে জড়ো হয়েছিল পাঠানদের দলে—কিছু টাকা এবং তামাশার গন্ধ পেয়ে। কেউ কেউ টাকা পাচ্ছিল, কেউ কেউ বা পরে পাবার আশায় এখন এমনি খিদমৎ খেটে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে অনেকে অবশ্য দূর থেকে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পেয়েই পালিয়েছে, তবে অনেকেরই শেষরক্ষা হয় নি, কারণ ঘোড়ার সঙ্গে মানুষের পায়ের পাল্লা দেওয়া কঠিন। ছুটতে দেখেই বেশী সন্দেহ হয়েছে এদের, এরাও ছুটেছে পিছনে, এখন তাদের কাউকে কাউকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে ঘোড়ার সঙ্গে।

কী হয় এখন দেখবার জন্য রুদ্ধশ্বাসে উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আগা আর মেহের। এতদিন কানেই শুনেছে শুধু আংরেজদের প্রচণ্ড উষ্মার কথা, আর সে উষ্মার ভয়ঙ্কর ফলাফলের কথা, চোখে দেখে নি এখনও পর্যন্ত। এইবার সেটা দেখতে পাবে এই কৌতূহলে নিজেদের ভবিষ্যৎ-চিন্তাও ভুলে গেল। ওরাও যে এই একই পাকচক্রে জড়িয়ে পড়তে পারে এখনই, তাও মনে রইল না।

বিচার করার সময় নেই, অথবা সে বিচার বহুপূর্বেই হয়ে গেছে। শুধু দণ্ড দানের কাজ এখন। কাজও খুব চটপট। ইতিমধ্যেই সবাইকে পিছমোড়া ক'রে বাঁধা হয়ে গেছে, গুর্খা সিপাহীরাই এতক্ষণ সে কাজটা সেরেছে, তারাই ধরে আছে

আসামীদের—বাকী কাজটা সাহেবরা নিজেরাই সারছে। বোধ হয় গুর্খারা ঠিক জল্লাদের কাজ করতে রাজী নয়, কিংবা এ কাজটা সাহেবরা নিজে হাতে করতে চায়, তাতে জ্বালা মেটে খানিকটা। অনেকগুলো আমগাছ, সম্ভবত মসজিদেরই আম-বাগান, পীরোত্তর জমি। সেই আম গাছেরই বিভিন্ন ডালে সার সার ফাঁস বাঁধা হচ্ছে, দ্রুত নিপুণ হস্তে ফাঁস বেঁধে যাচ্ছে ওরা। বহুদিনের অভ্যস্ত দ্রুততা ও নিপুণতা। অর্থাৎ এ কাজ এর মধ্যে বহুবারই করতে হয়েছ বা করেছে।

দেখছে এরা চেয়ে চেয়ে—মানে আসামীরা—তাদের মৃত্যুর আয়োজন কেমন পরিপাটী ভাবে হয়ে যাচ্ছে। সব চেয়ে শোচনীয় অবস্থা স্থানীয় গ্রামবাসী বা দেহাতীদের। তারা জানে না এ ঝগড়া কিসের, কেন বা কার সঙ্গে কার। সামান্য দু-চার আনা পয়সার লোভে, আর কিছুটা বা 'মজা' করবার জন্যে জুটেছিল তারা। অসহায় মানুষকে খুঁচিয়ে মারার মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ মজা পায়—সেই ধরনের 'মজার' লোভই বোধ করি প্রধান আকর্ষণ ছিল ওদের। এমন ভাবে চাকা ঘুরে যাবে, ওদেরই ওপর দিয়ে মজাটা ঘটবে শেষ পর্যন্ত—আংরেজদের ফাঁসে ঝুলতে হবে—তা একবারও ভাবে নি। তারা এখন কান্নাকাটি করছে, কাকুতি-মিনতি করছে, তারা যে সিপাহী নয় তা বোঝাবার জন্যে বিস্তর কসম খাচ্ছে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও বোধ করি বুঝছে যে তাতে বিশেষ কোন ফল হবে না। ইতিমধ্যেই হতাশা আর মৃত্যুর কালিমা নেমেছে ওদের মুখে—এই ক-মিনিটের ভিতরেই। নিরস্ত্র লোককেই যারা নাকি ধরে ধরে ফাঁসি দিচ্ছে—তারা যে এমন জমায়েৎবন্ধ সশস্ত্র হিন্দুস্থানী লোককে রেহাই দেবে না—এটুকু বোঝবার মতো স্বাভাবিক বুদ্ধি 'মুলুকী' গাঁওয়ারদেরও আছে। তবু নিমজ্জমান ব্যক্তির তৃণ অবলম্বনের মতোই শেষ চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে তারা, নানাবিধ কসম খাচ্ছে, কেউ বা খোদার দোহাই দিচ্ছে, কেউ বা মহাবীরজীর—কেউ কেউ আবার আংরেজদের খুশী করতে যীশুর নামেও কসম খাচ্ছে। দু-চারজন মসজিদের দিকটা দেখিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছে, তারা আংরেজ সরকারের বশম্বদ ভক্ত প্রজা, আসলে সরকারের যে দুশমন সিপাহী সে আছে ঐ মসজিদে লুকিয়ে, তাকে সরকারের হাতে সঁপে দেওয়ার জন্যেই তাদের এত আয়োজন; এখন যেকালে সরকার নিজেই এসে গেছেন সেকালে ঐ লোকটাকেই ধরে ফাঁসি দিয়ে দিন, তা হ'লেই যথার্থ সুবিচার হয়। মিছিমিছি এই নিরপরাধ অনুগত প্রজাদের প্রাণে মেরে সরকারের দুর্নাম—ইত্যাদি, ইত্যাদি। তার উত্তরে সাহেবরা মুচকি মুচকি হাসছে আর বলছে, 'হোগা হোগা, সব হোগা, কোইকো নেহি ছোড়েগা', আর চেঁচামেচি যখন খুব অসহ্য হচ্ছে, গুর্খারা পিছন থেকে সবুট লাথি মেরে চুপ করিয়ে দিচ্ছে।

সবচেয়ে যেটা আপসোস, এদের যারা নিকট-আত্মীয় তারা কেউ ধারে কাছে আসছে না—ওদের মৃত্যু অবধারিত এবং আসন্ন জেনেও। দূর থেকেও কেউ উঁকি মারছে না একবার। দুধের দোকানটা শূন্য—দোকানী তামাশা দেখার লোভ সম্বরণ ক'রে সরে পড়েছে কিম্বা ঐ আসামীদের দলেই আছে, কে জানে—কড়ার দুধ উনুনেই চাপানো, গুর্খারা কেউ কেউ গিয়ে কুল্লড় বা ভাঁড় ডুবিয়ে খাচ্ছে ও ভরে এনে 'বেরাদার'দের খাওয়াচ্ছে। সমস্ত গ্রামটা মনে হচ্ছে জনশূন্য অথবা মৃত। সত্যিই হয়ত গ্রামে আর কেউ নেই, পিছন দিক দিয়ে মাঠ পেরিয়ে অন্য কোন গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। যারা যাচ্ছে তারা তো যাবেই, কোনমতেই রোখা যাবে না যখন তাদের সে যাওয়া—তখন তাদের সহানুভূতি দেখাতে এসে বা তাদের হয়ে

ওকালতি করতে এসে একযাত্রায় যেতে রাজী নয় কেউ। সুতরাং অদৃশ্য কোন স্থান থেকে কেউ এদের দেখছে কিনা সেটা অনুমান বা বিতর্কের বিষয়—সত্য যেটা সেটা হ'ল এই যে—এরা কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। 'তাত-মাত-বন্ধুভ্রাত' সবাই বিপদের দিনে ভোজবাজীর মতো মিলিয়ে গেছে। বেদান্তের সত্য প্রত্যক্ষ-জীবনে মিলিয়ে পাচ্ছে এরা।

শুধু যেটা পারছে না—নিজেদের মৃত্যুটাকে মায়া বলে উড়িয়ে দিতে। এবং আরও যেটা করছে, যে আত্মজনেরা আপৎকালে নির্লজ্জ স্বার্থপরের মতো ত্যাগ করেছে—তাদেরই নাম ধরে ধরে আহাম্মকের মতো কান্নাকাটি করছে।

আগা অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখল—দণ্ড-দাতা ও দণ্ড-প্রাপকদের কাণ্ডকারখানা। এ তার কাছে অভিনব—এই ভয়ঙ্কর ও করুণ দৃশ্য —তার চেয়েও যেটা বেশী, কৌতূহলোদ্দীপক। তাকেও অচিরকাল মধ্যে এই আংরেজ ও গুর্খাদের মোকাবিলা করতে হবে তা সে জানে, কিন্তু তার জন্য খুব একটা চিন্তিত নয় সে। সে ভাবছে অন্যকথা। এ যা হচ্ছে তাতে তারই ভাল হবে সবচেয়ে বেশী, এও ঈশ্বরেরই করুণা হয়ত। শত্রুরা নির্মূল হয়ে যাচ্ছে এ জন্মের মতো, অন্তত এদের জন্য আর বিব্রত উদ্বিগ্ন থাকতে হবে না অহর্নিশি— জীবন-ভোর।...আনন্দেরই কথা। কিন্তু তবু আনন্দ বোধ করছে না কেন? কোথায় একটা কি কাঁটার মতো খচখচ করছে কেন মনের মধ্যে? বিবেক?...নিশ্চয়ই না, বিবেকের তো প্রশ্নই নেই এর ভেতর। সে তো এর কারণ নয়—ওদের পাপের জালেই ওরা জড়িয়েছে। ঘোরতর একটা অন্যায় অত্যাচার দীর্ঘকাল তার ওপরই বা উদ্যত হয়ে থাকবে কেন? এ খোদার ন্যায়বিচার। বরং আরও আগে এ বিচার ওদের মাথায় নামা উচিত ছিল। বিনা কারণে বিনা অপরাধে ঢের দিন দুর্ভোগ সহ্য করেছে সে।

না, বিবেকের তাড়না এটা নয়। এটা যে কী, তাও আগার বোঝার কথা নয়। অতটা শিক্ষা বা জ্ঞান তার নেই। কাঁটার মতো যেটা বিঁধছে তাকে সেটা হ'ল পৌরুষ। নিজের শত্রুকে নিজে নিপাত করতে পারলে তবেই পৌরুষ তৃপ্ত হয়, সুখী হয়। দৈবের সুযোগ নিতে তাই মনে বাধছে ওর।

পৌরুষ ছাড়াও আর একটা প্রশ্ন আছে অবশ্য। সেটা হ'ল আগার অতিরিক্ত ন্যায়-ও সত্যপরায়ণতা। সত্যিই এরা সিপাহী নয়, বিদ্রোহীদের সমর্থকও নয়, কস্মিনকালে কখনও হয়ত ইংরেজদের সঙ্গে কোন দুশমনি করেনি, অথচ সেই অপরাধেই এদের মারা হচ্ছে। হয়ত—হয়ত এখনও তেমন কোন ভাল লোক এগিয়ে এসে সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিলে এতগুলো লোকের জীবনরক্ষা হয়।...আর সেরকম লোক—এখানেই আছে। সে নিজেই আছে—

অনেকক্ষণ মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করল সে। মনের যে দিকটা বিষয়ী ও বিচক্ষণ সে বলছে যে, তোমার মাথার ওপরে অনেক দায়িত্ব, এ সুযোগ ছেড়ো না ; ভাগ্যকে তার নিজের পথে চলতে দাও, দুনিয়াসুদ্ধ মানুষের জিম্মাদার তো তুমি নও, তোমার এত মাথাব্যথা কিসের? এ ধর্মের গতি, ন্যায়ের গতি, দেরিতে এলেও আসতে বাধ্য এ। কিসের জন্যে সে গতিতে বাধা দিতে যাবে? তোমার বেলা এরা কেউ এত করুণা দেখিয়েছিল কি, না এত সূক্ষ্ম সত্যের হিসাব করতে বসেছিল?...আর একটা দিক, আদর্শবাদী দিক বলছে, 'ছি! এই কি একটা হ'ল? ওরা অমানুষ বলে তুমিও অমানুষ হবে? তোমার বন্ধু দিল মহম্মদ হ'লে কী করত, এমন ভাবে

দাঁড়িয়ে নির্বিকার চিত্তে দেখতে পারত এতগুলো নিরাপরাধ লোকের পাইকারী মৃত্যু?...' দুই মনের ঝগড়ার মীমাংসা হয় না, শুধু ভেতরে ভেতরে ছটফট করতে থাকে সে।

অবশেষে যখন এক ইংরেজ কর্পোরালের ইঙ্গিতে এক গুর্খা প্রথমেই আফজলকে ধরে নিয়ে একটা ফাঁসের নিচে দাঁড় করাল তখন আর স্থির থাকতে পারল না সে, মেহের কিছু বোঝবার কি বাধা দেবার আগেই দরজা খুলে এক লাফে বেরিয়ে পড়ল সে। সোজা সেই কর্পোরাল সাহেবের সামনে গিয়ে স্যালুট ক'রে দাঁড়াল, হিন্দুস্থানীর সঙ্গে কিছু ইংরেজী মিশিয়ে (ওর সেই হাবিলদার বন্ধুর কাছে শেখা সামান্য বিদ্যা তখনও কিছু মনে ছিল) বলল, 'সাহেব, এরা সিপাহী নয়, আংরেজের দুশমন নয়, এরা সত্যি-সত্যিই আমাকে মারতে এসেছিল, আংরেজের সঙ্গে কোন ঝগড়া নেই এদের।'

সাহেবের নীলাভ পিঙ্গল চোখে নিমেষে যেন প্রত্যাশার আগুন জ্বলে উঠল, শিকারীর চোখ যেমন শিকারের সন্ধান পেলে জ্বলে ওঠে। তিনি তাঁর ক্রূর কপিশ দৃষ্টিতে বার দুই আগার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে নিয়ে বললেন, 'And pray, who the devil are you—so self-important and self-assured? Another pandey no doubt! well, do not loose your heart my boy', ডারো মাৎ—তুমকো ভি তুরন্ত্ despatch করে গা!'

ইঙ্গিতেরও প্রয়োজন হ'ল না—দুজন গুর্খা এসে দুদিক থেকে দুটো হাত ধরল।

আগা কিন্তু একটুও বিচলিত হ'ল না, স্থির স্বরেই বলল, 'আমি পান্ডে নই সাহেব, ইংরেজের বন্ধু।'

ইংরেজের বন্ধু! হো-হো, হা-হা, হি-হি।

সাহেবরা হাসিতে ভেঙ্গে পড়লেন। হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল চারিদিকে।

ইংরেজের বন্ধু! বন্ধুই তো বটে। তাই তোমার জন্য খাসা দোলনার বন্দোবস্ত করেছি। বন্ধুত্বের পুরস্কার দিই এই—আর দেরি নেই।

তবুও আগা স্থির, অবিচলিত। আরও শান্তকণ্ঠে বলল,—'আমার কাছে প্রমাণ আছে স্যার। সঙ্গেই আছে, আদেশ করলে এখনই দেখাতে পারি—'

এবার হাসি থেমে গেল অনেক মুখেই। শুধু কথাটাতেই নয়, আগার এই প্রশান্ত স্থৈর্যেও সাহেবরা বেশ একটু বিস্মিত হয়েছেন। সাধারণ কান্নাকাটি-করা পায়ে-পড়া 'পান্ডে' তো নয়।

কর্পোরালের ললাটেও এই প্রথম—একটু সংশয়ের ভ্রূকুটি দেখা দিল। গুর্খারা হাত দুটো পিছন দিকে বাঁধতে যাচ্ছিল, ইঙ্গিতে নিরস্ত ক'রে বলে উঠলেন, 'What! প্রমাণ! You mean proofs of your fidelity? সেটা আবার কি বস্তু?'

আগা তেমনি শান্তভাবেই কুর্তার জেব থেকে চিঠিখানা বার ক'রে দিল। লীসন মেমসাহেবের চিঠি। এতক্ষণ মনে ছিল না ওর—ঠিক শেষ মুহূর্তটিতে প্রয়োজনের সময় মনে পড়ে গেছে বলে মনে মনে ওদের গ্রামের বড় পীরসাহেবকে ধন্যবাদ দিল।

বুকের কাছে উপরের জেব্এ থাকার দরুণ ঘামে ভিজেছে অল্প অল্প, কালি চুপ্সে গেছে দু-এক জায়গায়—তবুও মিসেস লীসনের পরিষ্কার হাতের লেখা পড়তে কোন অসুবিধা হয় না।

'By Jove! It's certainly an English woman's handwriting. Mrs. Agatha Leeson, who is she?'

'মিসেস আগাথা লীসন!' পিছন থেকে এক সাদা পোশাকের সাহেব লাফিয়ে সামনে আসেন, 'মিসেস লীসন! আমার এক শালা ছিল লীসন—চার্লস্ ফিলিপ লীসন—তার স্ত্রী নয় তো? দেখি দেখি—'

দেখার সঙ্গে সঙ্গে মুখ-চোখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাঁর, 'Oh! It's my sister-in-law alright! I know her hand-writing. Thank God, that she at least is still living.'

'Not so soon my lad, not so soon!...কে বলতে পারে যে এই লোকটা তাঁকে হত্যা করার আগে জোর ক'রে এই চিঠি লিখিয়ে নেয় নি? দাঁড়াও, চিঠিটা পড়তে দাও আগে ভাল ক'রে, তুমিও পড়ো—and then if you still believe it's genuine—there will be enough time for rejoicing and thanks-giving!'

বেশ মন দিয়েই পড়লেন কর্পোরাল সাহেব, চিঠির মধ্যে আগার বর্ণনা দেওয়া ছিল তাও মিলিয়ে নিলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে—মায় বাঁ ভুরুর সঙ্গে কাটা দাগটাও—তারপর চিঠিটা নিঃশব্দে এগিয়ে দিলেন সাহেবটির হাতে। ততক্ষণে আরও কজন সাহেব ভিড় ক'রে এসে দাঁড়িয়েছেন, লীসনের ভগ্নিপতির কাঁধের পাশ দিয়ে ঝুঁকে পড়ে সকলেই চিঠিখানা পড়ে নিলেন। পড়া শেষ হ'লে কিছুক্ষণ পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, অর্থাৎ কে কতটা বিশ্বাস করেছে তার সঙ্গে নিজের মনোভাবটা মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

'Hm!' খানিকটা পরে কর্পোরাল সাহেবই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন, 'After all, it seems genuine enough; she gave every bit of her history, and it is quite leisurely written too. There can't be any question of compulsion here. What do you say, boys?'

কর্পোরাল সাহেব তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিলেন, শেষ যেখানে দেখা হয়েছে মিসেস লীসনের সঙ্গে সে জায়গাটা ঠিক কোথায়, পণ্ডিতজীর গ্রামের নাম কি, কোথা দিয়ে যাওয়া যেতে পারে—ইত্যাদি। তারপর চিঠিখানা ওকে ফেরত দিয়ে বললেন, 'এটা রেখে দাও, ভবিষ্যতে আরও এমনি দরকারে লাগতে পারে। And please, pay our compliments to that Mughul lady accompanying you—রাজকন্যাকে অভিবাদন দিও, ওঁদের সঙ্গে, মুঘল জেনানাদের সঙ্গে আমাদের কোন বিবাদ নাই। Come on, boys, let those buggars go!'

গুর্খা সিপাহীদের বাঁধন খুলে দেবার ইঙ্গিত ক'রে কর্পোরাল আসামীদের দিকে চেয়ে হিন্দুস্থানীতে বললেন, 'এই ছেলেটির দয়ায় ও মহত্ত্বে তোমরা প্রাণ পেলে—মনে রেখো।...আর একেই মারবার জন্যে তোমরা এতগুলো লোক এত তোড়জোড় করছিলে!! ওর সঙ্গে তোমাদেরই একজন রাজকন্যা আছেন জেনেও!... তোমাদের ফাঁসি দেওয়াই উচিত ছিল, মানুষের সমাজে বসবাসের যোগ্য নও তোমরা!'

তারপর হাত বাড়িয়ে আগার সঙ্গে করমর্দন ক'রে বললেন, 'তুমি যদি দরকার মনে করো, আমাদের কাছ থেকে একটা রাইফেল নিতে পারো—'

'না স্যার। ধন্যবাদ। ভারী রাইফেল নিয়ে হাঁটা মুশকিল আর পিস্তল তো একটা আছেই—'

'All right—as you like. Good bye!'

সাহেব এবং গুর্খার দল চলে গেল। কে কোথায় মিলিয়ে গেল দেহাতীরাও—সাহেবের দল পিছন না ফিরতে ফিরতে। খানিকটা চোখের আড়ালে গিয়েই প্রাণপণে ছুটতে শুরু ক'রে দিল—ঘটনাস্থল থেকে যে যতটা দূরে যেতে পারে। কে জানে, বেটাদের মতলব ঘুরে যেতে কতক্ষণ। বলেই তো গেল যে—উচিত ছিল ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া, সেই শ্রেয় কর্তব্যটা সেরে যেতে চায় যদি শেষ পর্যন্ত!...

পাঠানের দল অনেকক্ষণ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মাটির দিকে চেয়ে। বোধ হয় আগা কোন প্রতিহিংসা নিতে চায় কিনা—সেই জন্যে। ওদের দেশের অলিখিত আইনে সে অধিকার আগায় বর্তেছে। কিন্তু আগা কিছুই বলল না দেখে আস্তে আস্তে নিজেদের হাতিয়ারগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ঘাড় হেঁট ক'রে চলে গেল সেখান থেকে। যাবার সময়ও কেউ আগার দিকে তাকাতে পারল না কিছুতেই। এ লজ্জার চেয়ে ওদের মৃত্যুও ভাল ছিল—ওদের সে মনোভাব আগা বুঝল।

মেহের প্রায় আগার সঙ্গে-সঙ্গেই বাইরে বেরিয়ে এসেছিল, হাতে তলোয়ার নিয়ে। আগাকে ফাঁসি দিলে সহজে ছাড়ত না সে, অন্ততঃ একটা দুটো সাহেবকে ঘায়েল করত, তারপর মরত আগার সঙ্গেই। সে উত্তেজনা ও মানসিক প্রস্তুতিটা কাটতে সময় নিল খানিকটা। এখন তলোয়ারখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে এসে আগাকে জড়িয়ে ধরল, 'তুমি কী! এই আমার ওপর টান তোমার, এই আমার জন্যে চিন্তা! এমন করে বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে আমার কথাটা ভাবলে না একবারও, ঐ দুশমনগুলোর প্রাণের মূল্যই বেশী হ'ল! তুমি অনায়াসে দুজনের মৃত্যু ডেকে আনলে ওদের জন্যে। এটা বেশ জানতে যে তোমার কিছু হ'লে আমিও বাঁচতুম না!'

অপ্রতিভের হাসি হেসে আগা বলল, 'পারলুম না যে কিছুতেই থাকতে, কী রকম কান্নাকাটি করছিল ওরা দেখ'লে তো! ...আর আমি জানতুম আমাদের কোন বিপদ হবে না—ন্যায় সত্য আমার দিকে যে, আল্লার দয়ায় বেঁচে যেতুমই শেষ পর্যন্ত!'

'কিন্তু কী দরকার ছিল এ বদান্যতার! দুশমনরা ওদের হাতে শেষ হয়ে যাচ্ছিল সেই তো ভাল ছিল। আমি কিতাবে পড়েছি—আগুনের শেষ, রোগের শেষ আর শত্রুর শেষ রাখতে নেই। সামান্য থাকলেও অসামান্য হয়ে উঠতে পারে যে-কোন সময়ে!'

'তুমি এখন বলছ—কিন্তু কতকগুলো লোক যে-দোষ-করে-নি সেই দোষের জন্য মরছে—এটা তুমিও দাঁড়িয়ে দেখতে পারতে না। এরা না হয় দুশমন, ঐ দেহাতী-দের কথা ভাবো দিকি, ওদেরও ঘরে স্ত্রী-পুত্র মা বোন আছে।'

'বেশ হয়েছে। খুব বীরপুরুষ আর মহাপুরুষ তুমি! আমি বেশ দেখতে পারতুম। আমার অত বেশী দয়ামায়া নেই। দেহাতীগুলোর জন্যে করুণা তো উথলে উঠল তোমার! আমরা কি করেছিলুম তাদের কাছে? ওরা আমাদের মারতে এসেছিল কেন? ওরা তো আমাদের দেখেও নি একবার চোখে! আমাদের জানোয়ারের মতো খুঁচিয়ে মারতে চেয়েছিল সকলে মিলে—সেকথা মনে রইল না তোমার।'

মেহেরের সেই ক্রুদ্ধ এবং তখনও কিছুটা উদ্বিগ্ন আরক্ত মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আগা বলল, 'তা মূর্খ, বুদ্ধিহীন,—ওদের শিক্ষাদীক্ষার কথাটা ভেবে তুমি ওদের ক্ষমা করার চেষ্টা করো শাহ্‌জাদী, ওরা কেউ তোমার উষ্মার যোগ্য নয়।

ওরা তোমার পিতৃপিতামহের সরল অজ্ঞ প্রজা, তুমি সেই ভেবে অন্তত ওদের দয়া করো!'

তার এই অনুনয়ের ভঙ্গীতে হেসে ফেলে মেহের, 'আমি দয়া না করলেও ওদের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না, তোমার অত কাকুতি-মিনতি না করলেও চলবে। তবে ওদের শিক্ষা হওয়াই উচিত ছিল কিছু!'

'কিছু কি বলছ! কিছুটিছু নয়—বিস্তর শিক্ষা হয়ে গেছে ওদের, এ শিক্ষা ওরা জীবনে আর ভুলবে না। প্রাণটা যে সত্যি-সত্যিই ওরা ফিরে পেয়েছে—এইটে বিশ্বাস করতেই ঢের সময় লাগবে। এখন বহু রাত্রি ধরে দুঃস্বপ্ন দেখবে ওরা।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, ওদের হয়ে ওকালতি ঢের হয়েছে। এখন আমাদের গতি কি হবে তাই একটু ভাবো দয়া ক'রে!'

'আমাদের গতি আর কি—গতিই, অর্থাৎ কি না চলতে হবে। তবে পেটে কিছু না পড়লে যে বিশেষ চলা যাবে তা মনে হয় না, সেই চেষ্টাই আগে কিছু দেখি—'

'সে চেষ্টা দেখবে কোথায়? গ্রামে যে কেউ আর আছে বলে তো মনে হয় না। দোকান-পাট কি খোলা আছে কোথাও? এরা যা দৌড়ল, বোধ হয় আরও দুটো গ্রাম পেরিয়ে না গিয়ে থামবে না। যদি কিছু মেলে—দ্যাখো ঐ দুধওয়ালার দোকানটাই। দুধ তো কুল্লড় কুল্লড় খেয়ে সব শেষ করেছে—যদি কোন কোণে-খাঁজে পেঁড়া কি বরফি কি এমনি মাওয়া পড়ে থাকে, সেইটেই খুঁজে দ্যাখো—'

কিন্তু অত কিছু দেখতে হ'ল না। তার আগেই স্বয়ং ইমাম সাহেব কোথা থেকে বেরিয়ে গুটিগুটি এসে দেখা দিলেন। একেবারে হাত দুটো চেপে ধরে বললেন, 'শাবাশ বেটা। শাবাশ মরদের দিল! সাচ্চা মরদ তুমি! তুমি আজ যা করলে, খোদার দরবারে লেখা রইল চিরকালের মতো।...কিন্তু বেটা, ওটা কী পুর্জা তুমি দেখালে যাতে অতগুলো জঙ্গী সাহেব একেবারে কেঁচোর মতো হয়ে গেল তোমার কাছে? কোন পীর কি দরবেশ ফকীরের দেওয়া কবচ নাকি?'

বোঝা গেল যে ইমামসাহেব তাঁর বাড়ির মধ্যে থেকে বা বাগানের পাঁচিলের বাইরে থেকে সবই দেখেছেন পূর্বাপর।

আগা গম্ভীর ভাবে বলল, 'হ্যাঁ, তবে আমি ছাড়া অপর কোন মুসলমান কি হিন্দুর কাজে আসবে না ও কবচ। ও এক ক্রীশ্চান দানো আমাকে দিয়েছে। আমি ছাড়া আর কেউ ও কবচ কাছে রাখলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মরবে। অবিশ্যি কেরেস্তান হ'লে আলাদা—ওদের কোন ক্ষতি হবে না!'

'তওবা তওবা! ও সর্বনেশে জিনিস তোমার জেবেই রেখে দাও, আমাদের দেখেও কাজ নেই।...তা এক কাম করো বেটা, আমি বলি কি, তোমাদের তো বিস্তর তকলীফ্ হ'ল, খানাপিনা তো কিছুই জোটে নি বোধ হয় এ দু দিন—এখন দুটো দিন এখানে থেকে খাওয়া দাওয়া ক'রে বিশ্রাম ক'রে যাও!'

এটা ওঁর নিছক পরার্থপরতা মনে ক'রে আগা তাড়াতাড়ি বলতে গেল, 'আজ্ঞে দুদিন অত লাগবে না, কিছু খাওয়া দাওয়া ক'রে একবেলা একটু ঘুমিয়ে নিতে পারলে আর কোন ভাবনা থাকবে না!'

'বাবা, তাতে তোমার তো কোন ভাবনা থাকবে না—কিন্তু আমার কিঞ্চিৎ থেকে যাবে যে! ঐ কেরেস্তান মামদোগুলোকে বিশ্বাস নেই, শুনেছি কাঁচা মাংস খায় ওরা—নওজোয়ান লেড়কা পেলে ধরে ধরে খাচ্ছেও নাকি! আমার ছেলে দুটো

দিল্লীতে ছিল, কোনমতে পালিয়ে এসেছে ; আজকালকার ছেলেদের তো বিশ্বাস নেই—কী করেছে না করেছে সেখানে—দুটো-চারটে আংরেজ খুন করেছে কি না, বলছে তো করে নি—আর না করলেই বা কি, কে অত দেখছে, কে অত বিচার করছে! ছেলেগুলো আবার যা তাগড়া দেখতে—লুকিয়েই রেখেছি অবিশ্যি, জানে নাও কেউ যে ওরা এখানে আছে, এক তুমিই যা জানলে, তা তোমাকে আমার ভয় নেই, দরাজ-দিল আদমি, তুমি কিছু আমার অনিষ্ট করবে না—তবে কি জানো বেটা, যদি মামদো-গুলো বাইরে কোথাও থেকে কিছু শুনে আবার ঘুরে আসে? একটা দুটো দিন না গেলে নিশ্বাস ফেলতে পারছি না!'

এই পর্যন্ত বলে খানিকক্ষণ উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠায় আগার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন ইমাম সাহেব, তারপর পুনশ্চ ওর হাত দুটো ধরে বললেন, 'বেটা, সেদিন আমি তোমাদের জান বাঁচিয়েছিলুম সেটা তো সত্যি কথা,—তুমি আমার এই উপকারটুকু করো। এ গ্রামের মধ্যে নয়, শয়তানগুলোর মুখ দেখলে তোমার গুস্সা হবে তা জানি—ঐ ওদিকে, রামগঙ্গার ওপর আমার একটা বাগানবাড়ি আছে, এক শিষ্য দিয়েছিল আমাকে—বিলকুল খালি পড়ে আছে বাড়িটা। সেখানে গিয়ে নিদেন দুটো দিন থাকো, কোন কিচ্ছু অসুবিধা হবে না। আমি আটা ডাল ঘিউ গুড়—এখনকার মতো কিছু ফল মিঠাই দুধ মাওয়া—পাঠিয়ে দিচ্ছি ; রসুই করবার বর্তন, চারপাই সব চলে যাবে। দুটো দিন—সির্ফ দুটো দিন থেকে যাও বেটা!'

পিতৃসম বৃদ্ধ ধর্মোপদেষ্টা, সেদিন আশ্রয় দিয়েছিলেন সেও সত্যকথা, তিনি 'না' বললে কারও কোন বাধা থাকত না ওদের মসজিদ থেকে টেনে বার করতেও। কৃতজ্ঞতা একটু আছে বৈ কি! তাছাড়া ওদের প্রয়োজন—শরীরের তাগিদও বড় কম নয়। উপবাসে রাত্রি-জাগরণে উৎকণ্ঠায় ওদের হাঁটবার ক্ষমতা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে, বিশ্রাম না করতে পারলে কোন একটা ভারী অসুখ হয়ে পড়াও অসম্ভব নয়, আর এ অবস্থায় সেটা একান্ত অনভিপ্রেত। বিশ্রাম, বিশ্রাম, কদিন হাত পা মেলে কোথাও পড়ে থাকা—সমস্ত শরীর মন চাইছে তাই।

তবু মেহেরের মুখের দিকে চাইল আগা। সে চোখেও একান্ত মিনতি, 'থেকে যাও, আর পারছি না গো!'

আগা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'তাই হোক তবে, আপনি আমাদের জীবন রক্ষা করেছেন বলতে গেলে, আপনার আদেশ অমান্য করতে পারব না।...কোথায় যেতে হবে বলুন, আমরা যাচ্ছি!'

॥ একত্রিশ ॥

এদের থাকার ইচ্ছা ছিল এক বেলা, বৃদ্ধ অনুরোধ করেছিলেন অন্তত দুটো দিন থেকে যেতে। তার বেশী থাকার কথা ভাবাই যায় নি তখন। কিন্তু কোথা দিয়ে কোন্ অদৃশ্য আনন্দের পাখায় ভর ক'রে পাঁচ-ছটা দিন কেটে গেল—এই দুটি অল্প-বয়স্ক নরনারী টেরও পেল না তা।

বস্তুত এমন আনন্দ ওদের জীবনে এই প্রথম। শৈশবের কথা মেহেরের ভাল মনে পড়ে না—কিন্তু লালকিল্লার কথা মনে আছে ওর। সেখানে মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্য ছিল ঠিকই, তবে সুখ—যদি ভোগবিলাসের আতিশয্যকে সুখ বলে ধরা যায়—তা

আদৌ ছিল না। শান্তি তো ছিলই না। । অশান্তির অসংখ্য কারণে ইদানীং জীবন বরং দুর্বহ হয়ে উঠেছিল। জিন্নৎ মহল দু চক্ষে দেখতে পারতেন না ওকে, বার বার অপদস্থ করবার চেষ্টা করতেন—বাদশার চোখে হেয় ক'রে তুলতে চাইতেন। শাহ্জাদারা বিরক্ত করতেন, সম্পর্ক-নির্বিশেষে। সুতরাং জীবনের আনন্দ কাকে বলে তা জানত না! আগাকে দেখার পর প্রেমের আস্বাদ পেয়েছে—তাতে শুধু বেদনাই বেড়েছে, জ্বালারই সৃষ্টি হয়েছে। অশান্তি ও দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে তা বেশী করে। ফলে আনন্দ বস্তুটাই এতকাল অপরিচিত ও অনাস্বাদিত থেকে গেছে ওর কাছে।

আর আগা! দেশে থাকতে সে সুখে ছিল, সাধারণ ভাবে আনন্দেও ছিল। প্রাচুর্য না থাক খুব একটা অভাব ছিল না, প্রয়োজনীয় সব কিছুই জুটত মোটামুটি। খাটতে হ'ত কিন্তু অল্প বয়সে সে খাটুনি নিরানন্দের কারণ হয় না—বরং পরিশ্রম করতে পারার একটা স্বতন্ত্র আনন্দ ও তৃপ্তি আছে, বিশেষ সবল সুস্থ মানুষের। সেটা উপভোগ করত সে ষোলো আনাই। সাধারণ নিরুদ্বিগ্ন পারিবারিক জীবনে যেটুকু আনন্দ থাকে—তা সে পেয়েছে। কারণ তখনও ওর বিবাহ হয় নি—যেসব কারণে সংসারে অশান্তি দেখা দেয়—তার একটাও ছিল না তার। তবু জীবনে যে এই ধরনের আনন্দ আছে, যা প্রাণের পাত্র উপ্চে চলকে পড়ে অকারণেই, যা এ পৃথিবীর বাইরেকার কোন অতীন্দ্রিয়লোকের স্বপ্ন বহন করে—জীবনকে চেখে চেখে আস্বাদন করার যে আনন্দ, প্রতিটি কথায় ও কার্যে, সুবিধা ও অসুবিধায় যে আনন্দ থাকে অব্যাহত, যে আনন্দ শুধু প্রথম যৌবনে দুটি ভালবাসার লোক একত্রে নিরিবিলি থাকলেই মাত্র বোধ করতে পারে—তার স্বাদ আলাদা। এ ধরনের আনন্দ আগারও অপরিচিত। বিশেষ ক'রে দীর্ঘকাল, প্রায় তিন বছরের নানা দুঃসহ দুঃখ ও দুরবস্থার পর তার সামনে এই আনন্দলোকের সিংহদ্বার অবারিত হয়েছে—তাই বাস্তবের সমস্ত হিসাবনিকাশ, কাজকর্ম, দিনক্ষণ—তারিখ-সময়, ভবিষ্যৎ-অতীত, বাদশা নবাব, তার নিজের মা-বোন—সমস্ত কোথায় ভেসে মিলিয়ে গেছে; একটা একটানা সুখ স্বপ্নে দিন কাটছে তার, সে স্বপ্নে ছেদ নেই বিকৃতি নেই—সে স্বপ্নের ঘোর তার চোখে, তার মনে, তার চিন্তাতেও।...

এরকম কখনও ভাবে নি তারা, এরকম কখনও জানত না।

বিস্ময়! বিস্ময়! বিস্ময়ের যেন শেষ নেই। জীবনে যে এত বিস্ময়ও আছে, বিস্ময় আর আনন্দ, তা কে জানত! নিজেদের ভুলভ্রান্তি নিজেদের অক্ষমতাতেও যে আনন্দ আছে, জীবনযাত্রার ঘোর অসুবিধাগুলোও যে এমন অমৃতপাত্র বহন ক'রে আনে—এ ওদের অভিজ্ঞতা কেন, ধারণা-কল্পনারও অতীত ছিল। প্রত্যেকটি অনুভূতিই যে নূতন অচিন্তিতপূর্ব—তাই তো আরও আনন্দ; এত মজা, এত তামাশা!

আনন্দের এ উন্মত্ত-উৎসব শুরু হয়েছে তো সেই প্রথম থেকেই।

ইমাম সাহেব তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেছিলেন অক্ষরে অক্ষরে। চারপাই বিছানা থেকে শুরু ক'রে জলের কলসী, যাবতীয় বাসন মায় তাওয়া ডেক্চি, চিমটে, হাতা—ওদিকেও যেমন সব পাঠিয়েছেন, তেমনি এদিকে আটা ডাল ঘিউ মশলা, নিমক, গুড়, দুধ সব খুঁটিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন। তার সঙ্গে কিছু তাজা ফল, পেস্তা, কিশমিশ, বরফি, মাওয়া—ইত্যাদি, তখনই জলযোগ করার মতো।

সে সব খাওয়াও হয়ে গেল তখনই—বলা নিষ্প্রয়োজন। তাতেই বা কত মজা, কাড়াকাড়ি ছড়াছড়ি ক'রে খাওয়া, পরস্পরকে মিথ্যা অনুযোগ বেশী খাচ্ছে বলে—

আর সত্য যেটা অপরকে বেশী খাওয়ানোর চেষ্টা। অবশ্য ইমাম সাহেব দিয়েছিলেনও প্রচুর, অনেক খেয়েও ঢের বাঁচল, পাকা গৃহিণীর মতো তুলে রেখে দিল মেহের, পরের দিন কাজে লাগবে বলে। তারপর এক পেট ক'রে জল খেয়ে দুজনেই এলিয়ে পড়ল দুখানা চারপাইতে। দেখতে দেখতে চোখে ঘুমও এল জড়িয়ে—বস্তুত তিন রাত্রির ঘুম।

একেবারে যখন সে ঘুম ভাঙ্গল তখন আশ্বিনের মধ্যাহ্ন বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, গাছপালার ছায়া দীর্ঘতর হয়েছে বাইরের বাগানে, নদীর জলে। হাই তুলে আলস্য ক'রে পরস্পরকে ডাকাডাকি ক'রে ভাল রকম জাগাতে আরও দুদণ্ড কেটে গেল। শেষে আগা কৃত্রিম ধমক দিয়ে বলল, 'আরে ও ঘরোয়ালী, বেশ তো শুয়ে আছ, বলি রসুই-বসুই হবে কখন? রুটি পাকাতে হবে না? নাকি ফল-মিষ্টির ওপর দিয়েই চলবে দুবেলা?'

'সে আমি কি জানি?' পরম নিশ্চিন্তে উত্তর দেয় মেহের, 'আমি তো আর রুটি পাকাব না!'

'ওমা, তবে কে পাকাবে?' এবার সত্যি-সত্যিই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে বসে আগা, 'ও আটার বস্তা তবে হবে কী?'

'বা রে! তুমি কি ভেবেছিলে আমি রুটি পাকাব আর তুমি খাবে? আমি রুটি পাকাবার কি জানি? কখনও কি শিখেছি, না পাকিয়েছি কখনও? অবস্থা যতই খারাপ হোক, লালকিল্লায় বাবুর্চি ছিল শেষ দিন পর্যন্ত, রসুই ক'রে খাওয়ার দরকার হয় নি শাহ্‌জাদীদের।'

'তা তো বুঝলুম—এখন উপায়?'

'তুমি—তুমিও জানো না বুঝি?' একটু ভয় ভয়ে সঙ্কোচের সঙ্গেই প্রশ্ন করে মেহের।

'জী নেহি জনাব! ক্ষেতি-উতি পারি, লড়াই-দাঙ্গা পারি, রুটি নিজে হাতে পাকিয়ে তো আমারও কখনও খাবার দরকার হয় নি মালেকান! বাবুর্চি না থাক—মা ছিল, বোন ছিল।'

অতঃপর কিছুক্ষণ দুজনেই দুজনের দিকে নিরুপায়ের মতো চেয়ে থাকে। তারপর দুজনেই হেসে ফেলে। হাসতে হাসতে হাসির বেগ বেড়েই যায়—যেন এর চেয়ে কৌতুকের ব্যাপার আর কিছু ঘটে নি কখনও।

'তা না-ই বা জানলুম', হাসি থামিয়ে গলায় জোর দিয়ে বলে মেহের, 'এত কাজ পারি আর এটা পারব না! খুব পারব। করি নি কখনও, তা বলে কি আর করতে দেখি নি কাউকে। তুমি বরং চল, দুজনে মিলে একটু চেষ্টা করলেই হয়ে যাবে। আর না হয় প্রথমবার একটু খারাপই হবে, করতে করতেই মানুষ শেখে।'

আগা তবু একবার বলে, 'দ্যাখো, পারবে তো? নাকি ইমাম সাহেবকে বলে দুখানা রুটি পাকিয়ে আনাবার ব্যবস্থা করব?'

'না না—ছি! কী মনে করবেন উনি! ভাববেন এদের বায়নাক্কার শেষ নেই। পায়ে হেঁটে এক দেশ থেকে আর এক দেশ যাচ্ছি, অথচ রুটি পাকাতে জানি না, এ কথা বিশ্বাসই বা করবে কে?...তার চেয়ে যা পারি নিজেরাই করব। চল চল, আগে আটাটা সেনে ফেলা যাক। জল দিয়ে মেখে খানিকটা রেখে দিতে হয়, এটুকু আমিও জানি।'

জল দিয়ে আটা সানতে হয় এটা আগারও জানা ছিল। সে বরং অনেক বেশী

দেখেছে মেহেরের চেয়ে। সে পরমোৎসাহে এসে বসল মেহেরকে সাহায্য করতে। শুধু—কতটা আটায় কতটা জল লাগে এবং দুজনের রুটি করতে কতটা আটা দরকার —সেইটেই কেউ জানত না। প্রথমত থালায় একরাশ আটা নিয়ে মাখতে বসল, তারপর তাতে এত জল দিল যে ঝোলের মতো পাতলা হয়ে গেল। তখন তাতে আরও সেরখানেক আটা মিশিয়ে তাকে কাজচলা গোছের করতে হ'ল। অতঃপর চপাটি বেলা হবে কী দিয়ে সে এক সমস্যা। আগা গম্ভীর ভাবে বলল, রুটি কেউ বেলে না, এক ডেলা নিয়ে এ-হাত থেকে ও-হাতে বার-দুই লোফালুফি করলেই আটার ডেলাটা বিস্তৃত হয়ে রুটির আকার ধারণ করে। সে বহুবার মাকে করতে দেখেছে— সব জানে, সুতরাং ওটা কোন সমস্যাই নয়। কিন্তু কার্যকালে বহুবার এ হাত থেকে ও হাতে লোফালুফি ক'রেও কোন সুরাহা হ'ল না, আটার ডেলা যেমন তেমনই রয়ে গেল ; লোফালুফির চেষ্টায় মাঝখান থেকে দু হাতেই সেটা জড়িয়ে গেল। তখন স্থির করল কার্যকালে থালার ওপর হাত দিয়ে চাপড়ে চাপড়ে যা হয় করা যাবে।

আসল সমস্যাটাই তখনও বাকী ছিল। আগুন। গন্ধকের দেশলাই উঠেছে শহরে বাজারে, সে নাকি ঘষলেই জ্বলে যায়। এসব গ্রামে সে পাট নেই। ইমাম সাহেবও সে ব্যবস্থা করেন নি। আগুন রাখা হয় প্রত্যেক বাড়িতেই ঘষি বা ঘুঁটে জেলে জেলে, তাই থেকেই উনুন ধরানো হয়। কোন কারণে আগুন নিভে গেলে এক বাড়ি থেকে আঙ্রা চেয়ে নিয়ে গিয়েও ধরায়। ইমাম সাহেবের অত হুঁশ ছিল না, অথবা কখন এরা উনুন ধরাবে তা জানতেন না বলেই সে চেষ্টা করেন নি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা কুলুঙ্গি থেকে চকমকি আর সোলা পাওয়া গেল। চকমকি ঠুকে সোলা ধরানোও হ'ল কিন্তু তা থেকে চুল্‌হার কাঠ কী করে ধরানো হবে তা বোঝা গেল না। আর বুঝবেই বা কে, প্রতিটি সমস্যা ও প্রতিটি অকর্মণ্যতার সূত্রপাতেই যদি মানুষ হেসে লুটিয়ে পড়ে—তা হ'লে কাজকর্ম চলে কেমন করে?...

আগা যখন অনেক চেষ্টার পরেও কোন সুবিধা না করতে পেরে হাসতে হাসতে শুয়ে পড়ল, তখন মেহেরের মাথাতেই একটা মতলব খেলে গেল। বাইরে বিস্তর শুকনো পাতা পড়ে থাকতে দেখেছে সে, শরতের প্রখর রৌদ্রে শুকিয়ে ঝন্‌ঝন্ করছে। দু হাতে যতগুলো ধরে কুড়িয়ে এনে উনুনে ফেলল। তখন সোলা থেকে পাতা এবং পাতা থেকে কাঠ ধরানো খুব একটা কঠিন হ'ল না। আগা সপ্রশংস দৃষ্টিতে মেহেরের দিকে চেয়ে বলল, 'না, লেখাপড়া শেখা তোমার সার্থক হয়েছে! সত্যিই, অনেক কিছু জানো তুমি!'

প্রশংসাটুকু অম্লানবদনে মেনে নিয়ে উদারভাবে উত্তর দেয় মেহের, 'মেয়েদের এসব জানতে হয়, নইলে কি আর ঘর-গেরস্তালি চলে? পুরুষ মাত্রেই তো তোমার মতো বুদ্ধু, যখন তখন ঝগড়া বাধাতে পারে আর গোঁয়ারের মতো বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে—ভালমন্দ কিছু না ভেবেই!'

চুল্‌হা জ্বালানোর পালা চুকতে চুকতেই সন্ধ্যা হয়ে এল, চিরাগ জ্বালানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ল। সৌভাগ্যক্রমে দুটো ঘরেই দুটো পুরনো চিরাগ ছিল, তাতে সলতেও ছিল ; অভাব কিঞ্চিৎ তেলের। ইমাম সাহেব সব পাঠিয়েছেন তেল ছাড়া। আবারও মেহেরের উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লাগল, তেলের বদলে ঘি দিয়েই একটা চিরাগ ধরিয়ে রসুইয়ের ঘরে আলোর ব্যবস্থা করল।

অতঃপর মহা আড়ম্বরে ডাল চাপানো হ'ল। সেও প্রায় সেরখানেক। ডাল সেদ্ধ হ'তে তার পরিমাণ দেখে দুজনেই মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করল খানিকটা। শেষে আগা

অপ্রতিভ মেহেরকে সান্ত্বনা দিয়ে (ডাল সে-ই মেপে চাপিয়েছে) জোর ক'রে বলে উঠল, 'ভালই তো, খানিকটা তুলে রেখে দিলেই হবে, কাল সকালে তো খেতে হবে আবার। ভোর হ'তে না হ'তে রান্নার ঝঞ্ঝাট নিয়ে বসতে হবে না—'

ডালে ঘিউ পড়ল যথেষ্ট, হাতায় ক'রে—যেমন দেখেছে আগা আর মেহের অন্যকে দিতে—রসুন জিরা সম্বরও দেওয়া হ'ল, শুধু খাবার সময় দেখা গেল যে লবণ নামক নিতান্ত তুচ্ছ বস্তুটিই পড়ে নি তাতে।

রুটি তৈরী করতে বসেও গোলমাল কম নয়। আটা অনেকক্ষণ মাখা হয়ে পড়েছিল, ডাল সেদ্ধ হ'তে হ'তে সে আবার এলিয়ে গেছে। তাকে কোনমতেই আর রুটির আকার দেওয়া যায় না। দুজনেই অপরকে বিদ্রূপ করে, নিজে সমারোহ সহকারে করতে যায়—কিন্তু কাজ কিছুই এগোয় না। তবু রাগ বা বিরক্তি বোধ হয় না কারুরই—ছেলেমানুষের মতোই রান্নারান্না-খেলার মজা পায় যেন। প্রত্যেকটি প্রচেষ্টার কিম্ভূতকিমাকার পরিণতি দেখে হেসেই খুন হয় বরং। খানিকটা পরে পরে এক-একটা বুদ্ধি মাথায় আসে এক একজনের—সে তখন লাফিয়ে ওঠে, 'দাঁড়াও, হয়েছে—দেখি, এবার আমি ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছি। ওভাবে হবে না, আমি যা বলছি করো দিকি—'

কিন্তু সব প্রচেষ্টাই সমান হাস্যকর এবং হাস্যেই পরিণতি লাভ করে।

যাই হোক—কোনমতে মোটাসোটা আধকাঁচা খানদশেক রুটি নামাবার পর দেখা গেল, তখনও যা আটা মাখা আছে, অন্তত চল্লিশখানা ঐরকম রুটি হবে। সে চেষ্টা করার আর উৎসাহ রইল না কারও, বলা বাহুল্য। রন্ধন-কার্যে নিজেদের সেই প্রথম প্রচেষ্টা—ফলভোগ করতে গিয়ে আবারও সেই হাসির হুল্লোড়। তবু সেই অখাদ্য রুটি এবং লবনহীন ডালই অমৃত মনে হ'ল।

আহারাদির পর দুজনে বেরিয়ে এসে নদীর ধারে বসল। কৃষ্ণপক্ষের রাত, তখনও চাঁদ উঠতে অনেক দেরি। তা হোক, অন্ধকারেও ওদের আপত্তি নেই। অন্ধকারেরও রূপ আছে। তারায় ভরা উজ্জ্বল আকাশ, নদীর স্থির কালো জলে সে তারার ছায়া পড়ে মনে হচ্ছে কালো সাটিনের জমিতে কে সলমা-চুমকির কাজ করেছে বসে বসে। নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে নদী, নিস্তরঙ্গ কিন্তু কূলে কূলে ভরা। স্রোত আছে যথেষ্ট, শুধু বাতাস নেই বলেই তরঙ্গ নেই, সামান্য লহর পর্যন্ত কাটছে না। বাতাস যেন ভারী হয়ে আছে কেমন, যেন কিসের একটা প্রত্যাশায় স্তব্ধ হয়ে আছে সমস্ত প্রকৃতি।

ওরা জলের কাছ ঘেঁষে বসেছে, ঘন সবুজ ঘাসের ওপর। পায়ের কাছেই জল ওদের, কোন শব্দ নেই জল বয়ে যাওয়ার কিন্তু একটা গন্ধ আছে। কেমন একটা ভিজে ভিজে গন্ধ। গন্ধ আরও আছে। ইমাম সাহেবের বাগানে যদিও ফলের গাছই বেশী, ফুলের গাছও কিছু আছে। বেলফুল বা চামেলির সময় এটা নয়—তবে দূরে হয়ত শেষ দু-চারটে জুঁই ফুটেছে—আর হেনা—তারই মিলিত উগ্র গন্ধ বাতাসকে যেন আরও ভারী ক'রে তুলেছে।

সবে প্রথম প্রহরের শিয়াল ডাকা শেষ হয়েছে। আর কোন শব্দ নেই। নিথর নিস্তব্ধ রাত্রি। রাতজাগা পাখী দু-একটা যা ডাকছে মধ্যে মধ্যে, সেও খুব দূরে কোথাও। জোনাকিগুলো নিঃশব্দে জ্বলছে আর নিভছে—আমপাতার ফাঁকে ফাঁকে—অন্ধকার কালো জলের ওপর। চাঞ্চল্যের মধ্যে ঐটুকু।

দুজনে বসেছে দুজনের কাছাকাছি। গায়ে গায়ে ঠেকে নেই— তবু দুজনেরই নিশ্বাসের শব্দ পাচ্ছে দুজনে। সে নিশ্বাস যে ক্রমশ দ্রুততর হয়ে আসছে—তাও অনুভব করতে পারছে এবং সেজন্য অস্বস্তি বোধ করছে।

সেই অস্বস্তিটা ভাঙ্গবার জন্যই বোধ হয়—অন্ধকার মোহিনী রাত্রির জাদু কাটাবার জন্যই—আস্তে আস্তে বলে আগা, 'একটা গান গাইবে শাহ্‌জাদী?'

'তুমি আমাকে মেহের বলে ডাকো না কেন?' তেমনি আস্তেই—প্রশ্ন ক'রে বসে মেহের।

'ডাকতে ইচ্ছে করে, মনে মনে ডাকিও—মুখে ডাকতে সাহস হয় না যে!'

'কেন সাহস হয় না? আমি রাগ করব বলে? কেননা এখানে তো তৃতীয় কোন মানুষ নেই যে আদবকায়দা বজায় রাখার দরকার হবে। এখানে ভয় কিসের?'

'ভয় আমাকে মেহের, ভয় আমার অদৃষ্টকে। ভয় আমার অবস্থাকেও। আমি সামান্য নৌকর, বান্দার বান্দা—সেটা না ভোলাই ভাল।'

'আবার ঐ কথা! ওটা ঠাট্টাতেই চলতে পারে—কিন্তু ঐটে যদি বিশ্বাস ক'রে বসে থাকো—তা হ'লে আর কোনদিন কথা কইব না। এত দিন এত কাণ্ডের পরেও কি ক'রে তুমি ভাবতে পারলে যে আমি তোমাকে নৌকর বা বান্দা বলে মনে করি!'

শান্ত অনুত্তেজিত কণ্ঠেই বলে আগা, 'তা ভাবতে পারি না বলেই তো এত ভয় মেহের। কিন্তু সে তুমি বুঝবে না।'

তারপর একটু থেমে ঈষৎ গাঢ় কণ্ঠে বলে, 'আমাকে তুমি বান্দা বলে মনে করলেই বোধ হয় ভাল হ'ত। তোমারও আমারও। আমার জন্যে আমি খুব ভাবি না অবশ্য। তুমি আমাকে যা দিয়েছ তা আমার সমস্ত দুঃখের ক্ষতিপূরণ হয়ে গিয়েও পাওয়ার পাল্লা ভারী হয়েছে।...এ আমি আশা করতে সাহস করি নি—স্বপ্ন দেখতেও সাহস হ'ত না কখনও। আল্লা জীবনের এক কূল ভাঙেন আর এক কূল গড়েন—এ আমার জীবনই প্রমাণ হয়ে গেল।...কিন্তু ওসব কথা থাক্, এমন রাত জীবনের তিক্ত ইতিহাস আলোচনা করার জন্যে তৈরী হয় নি। তুমি একটা গান গাও শুনি!'

মেহের বলল, 'গাইতে পারি কিন্তু গান শেখা যাকে বলে সেভাবে কখনও শিখি নি। আমি যখন কিল্লায় এসেছি, তার বহু আগে থেকেই ওস্তাদ রেখে গান শেখাবার পাট উঠে গেছে। যা শিখেছি দু-একখানা—অপরের মুখে শুনে শুনে—কিন্তু সে কি তোমার ভাল লাগবে?'

'খুব লাগবে। তোমার গলা দিয়ে যা বেরোবে তা কখনও খারাপ হতে পারে না।'

'বেশ, আমি গাইছি, তারপর তোমাকেও গাইতে হবে কিন্তু—'

'আমি!' আকাশ থেকে পড়ে আগা, 'গান তো আমি শুনিও নি কখনও। যা শুনেছি দেশে থাকতে চাষীদের জঙ্গলী গান, তাও পুস্তু ভাষায়—তুমি তো তার এক বর্ণও বুঝবে না।'

'না বুঝি—তবু সুরটা বুঝব, তোমার গলাও শুনতে পাব—সেও এক লাভ!'

'কিন্তু ভয় পাও যদি—বাঘের ডাক মনে ক'রে?'

'না, ভয় পাবো না। গাধার ডাক শুনেছি আমি এর আগে!'

দুজনেই হেসে ওঠে। কিন্তু আস্তে ক'রে। আপনিই যেন সতর্কতা লেগেছে এদের আচরণে—কথায়-হাসিতে। এ রাত্রির নিস্তব্ধতাকে আঘাত করতে যেন মনে

লাগে কোথায়।...

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে মেহের গান ধরল। প্রথমে প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে একটু সুর ভেঁজে নিল, তারপর গানটাই ধরল গুন্ গুন্ ক'রে—তারপর স্বাভাবিক ভাবে গাইতে লাগল। তবে খুব একটা গলা ছেড়ে নয় ; আস্তে আস্তে নিচু পর্দাতেই গাইল। রাত্রে গানের সুর বহুদূরে পর্যন্ত যায়, কৌতূহলী গ্রামবাসীর কানে গিয়ে তাদের অধিকতর কৌতূহলী ক'রে তোলার কোন প্রয়োজন নেই। সে সম্বন্ধে বরাবরই সচেতন আছে মেহের।

কিন্তু আগার অত-কিছু মনে ছিল না। কোন কথাই মনে ছিল না তার আর। বর্তমান ভবিষ্যৎ অতীত—কোন কিছুই না। অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। কথা বলার সময় গলার আওয়াজ থেকে অনুমান করেছিল যে মেহেরের গলা মিষ্টিই হবে—কিন্তু সে যে এমন মিষ্টি—তা একবারও ভাবে নি। আগা যে ওকে বেহেস্তের হুরী বলত, সেটা কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি নয়, মিথ্যা নয় এতটুকুও—এ সুর অপার্থিব, এ গলা বেহেস্তের।

প্রথম সুরের শুরু থেকেই বিস্ময়ের শেষ ছিল না। সুর ভাঁজার সময়ে মনে হ'ল যেন খুব মিঠে পর্দায় বাঁধা বীণা উঠল গুন্‌গুনিয়ে। এই রূপ-গন্ধ-স্বপ্নে ভরা রাত্রির উপযুক্ত সুর-গুঞ্জন। ক্রমশ একটু একটু ক'রে যখন গান শুরু হ'ল তখন মনে হ'ল অমর্ত্য সুরের একটি পরিপূর্ণ শতদল অল্পে অল্পে ক'রে উন্মীলিত বিকশিত হচ্ছে তার সামনে। এমন জিনিস—কিন্তু হায়, সে একা শ্রোতা, উপভোক্তা। দুখ হ'ল তার অনেকের জন্যই—সাধারণভাবে বিশ্ববাসীর জন্যই যেন তার দুঃখ বোধ হতে লাগল—এমন জিনিসে তারা বঞ্চিত রইল, সংগীত যে এমন হয় তা তারা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারবে না কেউ। এ যারা শুনল না, জানল না—তাদের চেয়ে হতভাগ্য আর কে আছে ?

গান কখন থেমে গেল আগা তা বুঝতেও পারল না। ওর কোন বাহ্যজ্ঞান ছিল না তখন। বাইরের সুর থামলেও, অন্তরে ওর সে সুর সমানেই বেজে চলেছে। সে সংগীতের মূর্ছনা ওর সমস্ত সত্তাকে, সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। এ যে কী অনুভূতি তা সে বোঝাতে পারবে না কাউকে।

গানের সুরমাধুর্য বোধ করি গায়িকাকেও আবিষ্ট ক'রে দিয়েছিল, সেও খানিকটা চুপ ক'রে বসে রইল। তবে তারই সম্বিৎ ফিরল আগে, সে বলল, 'কৈ, ধরো এবার!'

আগা জবাব দিল না, বোধ করি তার কানে গেলই না কথাটা। তার তখন দুই চোখ দিয়ে জল পড়ছে। মুগ্ধ আনন্দের অশ্রু। সে স্থির হয়ে বসেই রইল।

মেহের অত বুঝল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে ও তরফ থেকে সাড়া না পেয়ে একটু অবাকই হ'ল সে। সন্দেহ হ'ল—ঘুমিয়ে পড়েছে কি না! অভিমানও বোধ হ'ল একটু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। সে গান গাইছে আর আগা ঘুমিয়ে পড়ল! তা যদি হয় তো অমনি ঘুমোক ও এইখানেই বসে বসে, মেহের একাই উঠে ঘরে গিয়ে দরজা দিয়ে শুয়ে পড়বে।

সে গুঁড়ি মেরে কাছে এল। খুব কাছে এল, তখনও আগা নিস্পন্দ, চিত্রাপিতবৎ, স্থির। একেবারে মুখের কাছে মুখ এনে দেখল সে—বিস্ফারিত চোখে নদীর দিকে চেয়ে আছে আগা, দুই চোখ দিয়ে তার জলের ধারা পড়ছে গড়িয়ে।

'ও কি, তুমি কাঁদছ?' ব্যস্ত ও বিস্মিত মেহের তাড়াতাড়ি নিজের ওড়না দিয়ে

ওর চোখ মুছিয়ে দিল।

তখনও অভিভূত ভাব কাটে নি। সেই ভাবেই উত্তর দিল আগা, 'আমি—আমি এমন কখনও শুনি নি মেহের, গান যে এমন হয়, এমন হতে পারে, তা জানতুম না। আনন্দে চোখে জল এসে গেছে আমার। এ যে কী আনন্দ তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। আনন্দ যে এমন হয়—সব কিছু পার্থিব বোধ-শক্তির বাইরে একটা অনুভূতি—তাও জানতুম না। মেহের, আমাকে সত্যি ক'রে বলো তো, সত্যিই কি তুমি আমাদের মতো মানুষ—না আমি যা বলি তুমি তাই, বেহেস্তের হুরী, আশমানের চাঁদ? না কি খোদার প্রেরিত দেবদূতী, আমার ওপর অপার করুণায় নেমে এসেছে?'

অভিমান পুলক ও লজ্জায় রূপান্তরিত হয়। অপ্রতিভ মেহের আবার নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে বলে, 'যাও! ঢের হয়েছে, আর অত আদিখ্যেতা করতে হবে না।—এত তোষামোদ শিখলে কোথায়? এধারে তো বলো গাঁওয়ার? মুলকী—কথাতে তো গালিব সাহেব হার মেনে যায়।...এখন ধরো দিকি একটা গান তাড়াতাড়ি।'

'এর পর আমার গান! শাহ্‌জাদী, তুমি কি পাগল। না না, তুমি—দোহাই তোমার, তুমি আর একটা গান ধরো!'

'হ্যাঁ, তা আর নয়! আমি আর কিচ্ছু গাইব না—তুমি না গাইলে। বা রে, আমি মেহনত ক'রে যাব আর উনি আরাম ক'রে বসে বসে শুনবেন আর ঢুলবেন। ওটি হচ্ছে না।'

তারপর ওকে বুঝিয়ে বলে আবার, 'ওগো মশাই, এ গানে আর সুরে কি সত্যিই এমন একটা আহামরি কিছু আছে, কীই বা আমার শিক্ষাদীক্ষা যে তেমন গাইব, আসলে আমার গলা দিয়ে বেরিয়েছে বলেই তোমার অত ভাল লেগেছে, তেমনি তুমি গাইলেও আমার ভাল লাগবে। এ তো কোন রাজসভায় বা ওস্তাদের আসরে গাইছ না, শুধু একটি শ্রোতাকে শোনাবার জন্যে গাইবে, সে তো মুগ্ধ হয়েই আছে!'

'না না, মেহের, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, মিনতি করছি। কথা কয়ো না, এর পর আর কিছু সহ্য হবে না। অন্তত আর একটা গান গাও। আজকের এ রাত বেহেস্তের স্পর্শ নিয়ে আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে থাক। এর পর যদি জীবনভোর জাহান্নমের যন্ত্রণা সইতে হয় তো সেও সইতে পারব, আজকের এই রাতটার কথা মনে করে—'

মেহের আর কথা বাড়াল না। এমন মুগ্ধ ভক্ত—সে যদি আবার নিজের অন্তরের ভক্তির পাত্র হয় তো তাকে নিরাশ করতে পারে কে? একটু চুপ ক'রে থেকে তেমনি গুনগুনিয়ে আর একটা গান ধরল সে, এবার আর গালিবের গজল নয়, লক্ষ্ণৌয়ের এক নবাবের লেখা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের গান। গানের বাণীতে, সুরে, তানে, লয়ে—এ আরও অপূর্ব, আরও স্বর্গীয়।

এবারও গান থেমে যাওয়ার পর বহুক্ষণ পর্যন্ত চুপ ক'রে বসে রইল দুজনেই। আগার মুগ্ধতার ছোঁয়াচ বুঝি মেহেরকেও লেগেছে, সেও আবিষ্টের মতো বসে রইল গান থামিয়ে। বুঝল যে এর পর আগাকে গাইতে বলা তার প্রতি সত্যিই অবিচার করা হবে।

কথাও কইতে ইচ্ছা হ'ল না তার। আসলে সেও একটু অবাক হয়ে গেছে। তার গলা যে এত মিষ্টি এত সুরেলা তা সে নিজেও জানত না। কারণ কোনদিন

পরখ ক'রে দেখার সুযোগ মেলে নি। আপনমনে নিজের ঘরে গুন্‌গুন্‌ ক'রে গাওয়া এক জিনিস, আর অপর শ্রোতাকে শোনানোর মতো ক'রে গাওয়া আলাদা।

তা ছাড়াও, হয়তো এই পরিবেশ—নিশীথ রাত্রির মায়া, এই নক্ষত্রের-ছায়া-পড়া নদীর জল, ফুলের গন্ধ,—এরাই এই মোহটুকুর জন্য দায়ী, হয়ত এরাই অসামান্য অপার্থিব ক'রে তুলেছে তার সামান্য কণ্ঠ ও শিক্ষাকে।

কিন্তু কারণ যাই হোক, একটা ইন্দ্রিয়াতীত আবেশের সৃষ্টি হয়েছে ঠিকই। সেটাকে আঘাত ক'রে খান খান ক'রে ভাঙতে ইচ্ছা হ'ল না, সাধারণ নিষ্প্রয়োজন কথার আঘাতে।...

ইতিমধ্যে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছে আকাশে। তার ম্লান জ্যোৎস্না আরও রহস্যময় ক'রে তুলেছে নদীর নিবিড় কালো জলকে। রহস্যময় ক'রে তুলেছে ঘন-পল্লব বড় বড় আমগাছগুলোর ছায়াকে। আগে যা ছিল শুধুই মধুর, এখন তাতে এসেছে মদিরতা। হেনার গন্ধ আরও উগ্র হয়ে উঠেছে, যূঁইয়ের গন্ধ আরও করুণ—আরও কত কি অজানা ফুলের মিশ্রিত সুবাসের সঙ্গে নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে ওদের।...

চুপি চুপি একসময় বলল মেহের, 'স্নান করবে?'

চমকে উঠল আগা, 'স্নান? কোথায়?'

'কেন, এই নদীতে!'

'এই দুপুর রাতে—'

'দোষ কি, বহুদিন ভাল ক'রে স্নান করি নি—'

'কিন্তু পোষাক ভিজে যাবে না?'

'যাক গে। ঘরে গিয়ে ওড়না জড়িয়ে বুরখা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ব। সারারাতে শুকিয়ে যাবে—'

'তবে চলো, নামি।'

আস্তে আস্তে, ভয়ে ভয়ে নামে যেন। ভয়—পাছে জলের ছলাৎ-ছল শব্দ এই স্বপ্নময় রাত্রির শান্তি বিঘ্নিত করে। আগা কুর্তা মেরজাই খুলে রেখে খালি গায়ে নামে, মেহের শুধু ওড়নাটা খুলে রেখে কামিজ সালোয়ার সুদ্ধই নেমে যায় জলে।...

বহুক্ষণ ধ'রে স্নান করল দুজনে। আগা সাঁতার কেটে নিল খানিকটা। মেহের সাঁতার জানে না, সে গা ভাসিয়ে থাকার চেষ্টা করল—পারল না। হাসাহাসি করল তা নিয়ে। ক্রমশ সে হাসি সংক্রামক ব্যাধির মতো পেয়ে বসল ওদের। রাত্রির স্তব্ধতার কথা মনে রইল না, সব সতর্কতা সে হাসির ঝড়ে উড়ে চলে গেল কোথায়। হাসি আর তার সঙ্গে জলছোঁড়াছুড়ি, দুটি বালক-বালিকার মতোই খেলায় মেতে উঠল ওরা...

বোধহয় এই অবগাহনের প্রয়োজন হয়েছিল ওদের দুজনেরই। এ না হ'লে সহজ হ'তে পারত না সহজে। আগুন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের আগুন জ্বালিয়েছিল ওদের শিরায়, ওদের ধমনীতে। তার সঙ্গে প্রকৃতি যুগিয়েছিল নেশার উপকরণ। অধীর উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল ওরা ভেতরে ভেতরে। আত্মরক্ষার জন্যেই জলে নামতে চেয়েছিল মেহের।

অনেকক্ষণ জলে থাকার পর একসময় শীত করতে লাগল। শেষ কার্তিকের

রাত্রি শীতল হয়ে এসেছে এবার, গাছের পত্রপল্লবে, ঘাসের ডগায় ডগায় জমেছে শিশিরের বিন্দু। চাঁদ এসে গেছে প্রায় আকাশের মাঝামাঝি। আকাশের সেইসব জ্বলজ্বলে তারা কোথায় মিলিয়ে গেছে জ্যোৎস্নার উজ্জ্বলতর আলোয়—এখানে ওখানে দুটি একটি মাত্র দেখা যাচ্ছে।

কোথায় শিয়াল ডেকে উঠল, খুব কাছেই কোথাও। দ্বিতীয় কি তৃতীয় প্রহরের ডাক এটা—কে জানে!

আগা বলল, 'চলো উঠি এবার।'

'চলো।' বলে মেহের উঠে পড়ল।

দুটো ঘর, দুজনে দু ঘরে শুয়েছিল দুপুরেও। সেইভাবেই এখনও গিয়ে ঢুকল—নিজের নিজের ঘর হিসেবে। অন্ধকারে পোশাক নিংড়ে, সেই ভিজে পোশাকেই কতকটা গা-মাথা মুছে সেগুলো মেলে দিল মেহের। এর আগের কোন বাসিন্দা ঘরে কাপড় রাখার জন্যই একটা বাঁশের আলনার মতো ঝুলিয়েছিল—তাতেই আন্দাজে আন্দাজে শুকোতে দিল কামিজ আর সালোয়ার। তারপর ওড়নাখানা গায়ে জড়িয়ে চারপাইতে এসে শুয়ে পড়ল।

দুটো ঘরের মধ্যে একটা দরজা আছে। দুপুরবেলা সেটা বন্ধ করার কথা মনে পড়ে নি কারও। এখন আগাই সেটা ভেজিয়ে দিয়েছিল মেহের ঘরে এসে ঢুকতে, বোধ হয় নিজেরই কাপড় ছাড়ার প্রয়োজনে। মেহের শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে চেয়ে রইল সেই অন্তরালটার দিকে। উঠোনের দিকের দরজাটা আগে থেকেই অর্গলবন্ধ ছিল, বোধ হয় এটাতেও খিল দেওয়া উচিত মনে হ'ল তার। কী যে ঠিক মনে হ'ল তা বোধ হয় সেও জানে না। খানিকটা পরে পা টিপে টিপে উঠে গিয়ে খিলটা দেবার আগে—কী এক অজ্ঞাত কারণে দরজাটা টেনে দেখল, আগা ওদিক থেকে শিকল তুলে দিয়েছে। আঘাত পাবার কোনই কারণ নেই, যে শোভনতা বোধে সে খিল দিতে এসেছিল, সেই বোধেই আগা ওদিকে শিকল দিয়েছে—এইটেই সঙ্গত ও স্বাভাবিক—তবু কী এক দুর্বোধ্য কারণে একটা যেন আঘাতই পেল মেহের। খিল দেওয়া আর হ'ল না, সেইখানেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে নিচের ঠোঁটটাকে ওপরের দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে কী একটা গলার-কাছে-ঠেলে-ওঠা অনুভূতিকে সামলে নেবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু বোধ হয় পুরোপুরি সামলানো গেল না। বিছানায় এসে শোবার পর সেই অনুভূতিরই কয়েক বিন্দু উষ্ণ-প্রকাশ গড়িয়ে পড়ল চোখের কোল বেয়ে।

নদীর জলে কতটুকু আগুনই বা নেভে?

এইভাবেই একটির পর একটি দিন কাটে। সে রাত্রির ক্ষণিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছে দুজনেই। এখন শুধু নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে ওরা। আনন্দ আর জীবনের নবলব্ধ বিস্ময়।

কোথা দিয়ে দিন কাটে—বোঝেও না কেউ। ভগবান এক-একটি অর্ধজ্যোৎস্নাময় অপরূপ স্বপ্নভরা রাত্রির সঙ্গে একটি জ্যোতির্ময় উজ্জ্বল প্রভাতকে গেঁথে দেন, সে প্রভাত দীপ্ত মধ্যাহ্নে করে আত্মসমর্পণ—আবার সে মধ্যাহ্ন কখন রৌদ্র মাখানো অলস বেলায় গা এলিয়ে দেয়, তারপর দেখতে দেখতে আঁচলে তারার ফুল ছড়িয়ে সন্ধ্যা নামে! কিন্তু সেদিকে ওদের হুঁশ নেই। ওদের দিনরাত্রি প্রকৃতির দিনরাত্রি থেকে আলাদা হয়ে গেছে। কোন-কিছুরই হিসেব ধরে বসে থাকে না ওরা।

সকালে উঠে হয়ত মেহেরের মনে হ'ল ফুলের মালা গাঁথতে হবে, বাগানের —বাগানের বাইরেও নদীর পাড়ের—অসংখ্য গাছের অজস্র ফুল এনে জড়ো করল সারা সকাল ধরে। তারপর যখন পাহাড়ের মতো স্তূপীকৃত হ'ল তখন খেয়াল হ'ল ছুঁচ-সুতো নেই। তার জন্য আবার লোকালয়ে যেতে ইচ্ছে হয় না। তা ছাড়া বোঝে যে এত ফুল বাকী সারা দিনেও গেঁথে শেষ করা যাবে না। উপরন্তু সে ইচ্ছাও বোধ হয় ততক্ষণে চলে গেছে মন থেকে।

ফুল রইল পড়ে—তখন হয়ত গিয়ে ঘটা ক'রে রাঁধতে বসল। রান্না তো নয়—অকর্মণ্যতার ফুল ফোটানো আনন্দের শাখায় শাখায়—তবু সে রান্নাও এক সময় শেষ হয়, কিন্তু তখনই খেতে বসতে ইচ্ছা করে না। 'পরে খাবো' বলে চাপা দিয়ে রেখে এসে গল্প করতে শুরু করল, একজন হয়ত চারপাইতে, আর একজন সেইখানেই মাটিতে শুয়ে গল্প করতে করতেই ঘুমিয়ে পড়ল, একেবারে ঘুম ভাঙল হয়ত সন্ধ্যায়, কি সন্ধ্যারও পরে। রাত্রিটা যারা বেশির ভাগ জেগে কাটায়—দিন তাদের বেশির ভাগ ঘুমিয়ে কাটবে, এইটেই স্বাভাবিক। রাত্রে ওরা কেউই সহজে বাসায় ফিরতে চায় না, যতটা সম্ভব বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়, বাগানে, নদীতীরে, কখনও বা বাগানের বাইরেও, গ্রামের বাইরে মাঠে মাঠে। রাত্রিকে বড় ভয়, বড় সাংঘাতিক নেশা অন্ধকারের। অন্ধকার ঘর বুঝি আরও ভয়ানক।

তবু 'দুটো দিন' কখন সপ্তাহ পার হয়ে চলে গেছে, সত্যিই বুঝতে পারে নি ওরা।

বুঝতে পারল মূর্তিমান বাস্তবের মতো 'হুঁম' আর 'হেম্' করে গলাখাঁকারি দিতে দিতে যখন একদিন ইমাম সাহেব দেখা দিলেন।

ইমাম সাহেব প্রথম দিনেই যে সব খাদ্যবস্তু পাঠিয়েছিলেন, তাইতেই এদের এ কদিন চলে গেছে ; দু-একটা জিনিস ফুরিয়ে এলেও মোটা যেগুলো, অর্থাৎ আটা ডাল ঘি, এখনও যথেষ্ট আছে। সুতরাং বাজারে যাবার বা গ্রামে যাবার প্রয়োজন হয় নি একদিনও—আরও বোধ হয় সেইজন্যেই জগৎসংসার সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিল না এরা।

তা না থাক—এদের সম্বন্ধে ইমাম সাহেব যথেষ্ট অবহিত ছিলেন।

এদের খবর মোটামুটি নিত্যই নিতেন। গ্রামের অনেকেই নিত অবশ্য। বহু কৌতূহলী চোখ বাগানের পাঁচিলে উঠে বা বাইরেকার কোন উঁচু গাছের ডালে বসে লক্ষ্য করত এদের। এমন কি রাত্রেও এদের কান্ডকারখানা দেখার লোকের অভাব হয় নি, দিনের বেলায় বাজারে বা দোকানে বসে আলোচনা করার বহু খোরাকই যুগিয়েছে এরা।

গ্রামের লোকের ধারণা এবং মন্তব্য অবশ্য বহু ও বিভিন্ন। হিন্দুরা বলে ভূতে-পাওয়া, বলে ওদের ওপর 'অন্য দেবতা'দের ভর হয়েছে, বলে 'হাওয়া' লেগেছে। ওদের ধারে-কাছে যাওয়া উচিত নয়, তাহ'লে সে হাওয়া অপরের গায়েও লাগতে পারে। বিশেষ ক'রে অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে সামলাও সবাই।

মুসলমানরা বলে জীন-পরীর কান্ড। ওঁয়ারা নাকি এমন আসেন—মাটিতে নেমে মানুষ সেজে খেলা করেন। মাম্‌দো ঠিক নয়, তাহ'লে দিনের বেলায় ছায়া পড়তো না, বা হাতে করে ধরা যেত না, গুর্খা সিপাহীগুলো ধরেছিল যখন—তখনই চেঁচিয়ে উঠত, হাওয়া বা সব শূন্য দেখে। তা নয়। দানো হ'তে পারে। জীন হওয়াই বেশী সম্ভব। যা-ই হোক, দূর থেকে দেখা যেতে পারে কিন্তু কাছে যাওয়ার

দরকার নেই।

ইমাম সাহেব এসব ব্যাপারে সংস্কারমুক্ত। জীন-পরীটরী কিছু নয় তা তিনি জানেন। অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে—এমন সুযোগ পেয়েছে নিভৃতে লোকচক্ষুর অন্তরালে পরের পয়সায় বসে খাবার আর বেলেল্লাগিরি করার—আশ মিটিয়ে ক'রে নিচ্ছে। তা করুক। তিনি তো ঐজন্যেই ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন। ক্ষতি হয় নি কিছু তাঁর ; বাড়িটা তো পড়েই ছিল, সরকারী জমির কল্যাণে আটা-ডালের অভাব নেই, শিষ্য-যজমানদের দৌলতে ফল-ফুলুরি-মাওয়া-মিঠাই তো ঘরেই পচে নিত্য। সুতরাং ওদের রাখায় এমন কিছু খরচা হয় নি তাঁর—লাভই কিছু হয়েছে। একটা আশ্বাস বা স্বস্তি অনুভব করছেন, সেইটেই লাভ।

ছেলেগুলোর জন্যেই তাঁর এই বিপদ। দিল্লীতে সাহেবের দোকান লুঠ ক'রে যে সব মাল এনে ঘরে পুরেছে তা দেখলে কোন সাহেবই ইমাম ব'লে রেয়াৎ করবে না তাঁকে। ছেলেগুলোকে তো ফাঁসি দেবেই, সম্ভবত তাঁকেও এই বৃদ্ধবয়সে অপঘাতে প্রাণ দিতে হবে। অথচ সেসব এমনই লোভনীয় জিনিস, রূপোর বাসন, সোনার পকেটঘড়ি, পাথর বসানো নস্যদান—ফেলে দিতে যা নষ্ট করতেও মন সরে না তাঁর। আরও সেই জন্যেই ছোঁড়াটাকে ধরে রাখার তাঁর এত আকিঞ্চন। সেই গোরা মামদোগুলোর দল যদি ফিরে আসে বা অপর কোন দল এসে পড়ে তো ছোঁড়াটা হয়ত ঠেকাতে পারবে। কিছু একটা আছে ওর কাছে—সে তো তিনি নিজের চোখেই দেখলেন—কবচ বা ছাড়পত্র গোছের কিছু—হয়ত আংরেজ জঙ্গী-লাটের সই করা কোন চিঠি—যা দেখলেই আংরেজরা মান্য করতে বাধ্য। যেরকম বেমালুম সেদিন খালাস পেয়ে গেল তাতে তো তাই মনে হয় অন্তত।

কাগজটা যাই হোক, বাগিয়ে রাখতে পারলে মন্দ হ'ত না। তা হ'লে ও বেটাবেটিকে ঝেঁটিয়ে তাড়িয়ে দিতেন কবে, তাঁর বাড়ি বসে, তাঁর খেয়ে বেলেল্লাপনা করা বার ক'রে দিতেন একেবারে।...কিন্তু ঐ যে কী ছোকরা বললে, কেরেস্তান ছাড়া অপর জাত ছুঁলেই মৃত্যু, ঐখানেই যা একটু খটকা লেগে আছে। নইলে অপরকে দিয়ে তো বটেই—কবে ওর কুর্তার জেব্ থেকে নিজেও সরিয়ে নিতে পারতেন। যা আলগা লোক ওরা, দুপুরে তো দোর কপাট হাট ক'রে খুলে রেখে শোয় প্রত্যহ। চুরিই বা কেন—গ্রামবাসীদের যা মনোভাব—তাঁর ইঙ্গিত পেলে ডাকাতি ক'রেও সরিয়ে নিতে পারত তাঁর শিষ্যসবকরা। চিঠিটা বা কবচটা—আর ছোকরার হাতে যে চুনির আংটিটা আছে—দুটোই লোভনীয়। ইমাম সাহেব বহু-দর্শী লোক, দামী পাথর দেখলেই চিনতে পারেন।...

সবই ঠিক, মুশকিল করেছে ঐ খটকাটা। যদিই সত্যি হয় ছোঁড়ার কথাটা? মরণটা এত তাড়াতাড়ি আসা তাঁর পছন্দ নয়।

যাকগে, মরুকগে—দুটো দিনের জায়গায় চারদিনেও তত আপত্তি হয় নি তাঁর। খরচ যা হবার তা তো হয়েই গেছে, আর কিছু পাঠাবেন না তিনি, এটাও ঠিক। ঐতে যে কদিন থাকতে পারে থাক্। কিন্তু দু দিন যখন অষ্টাহ পর্যন্ত গড়িয়েও শেষ হ'ল না, না দিল ওরা বাড়ি ছেড়ে, না দিল একটা খবর যে কবে যাবে—তখন তিনি একটু উদ্বিগ্ন হয়েই উঠলেন। এ আবার কি! মৌরসী পাট্টা নিয়ে বসল যে দেখা যায়। বাড়িটা আর বাগানটা শেষ পর্যন্ত বেহাত হয়ে যাবে নাকি? নড়বার যে কোন গা-ই দেখাচ্ছে না!...না, তাঁরই ভুল হয়েছিল একেবারে অতগুলো জিনিস পাঠিয়ে দেওয়া! তখন চিন্তা ছিল চলে না যায়—এখন তার উলটো চিন্তা দেখা

দিয়েছে বলেই এ কথাটা ভাবছেন। তবু, কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখানো বোধ হয় উচিত হয় নি।...না কি, বাইরে থেকে খাবারদাবার আনাচ্ছে কাউকে দিয়ে? কাকে দিয়েই বা আনাবে? ও ছোঁড়া তো বাজারে গেছে বলে কৈ শোনা যায় নি। সত্যি-সত্যিই দানো-জীনের ব্যাপার নাকি, ইচ্ছেমতো আটা-ডাল বাড়িয়ে নিচ্ছে!...

নানা দুশ্চিন্তায় কণ্টকিত হয়ে অবশেষে তিনি অষ্টাহান্তে বড় পীর খাজাবাবাকে স্মরণ ক'রে রওনা হলেন বাগানের দিকে। যা হোক হেস্তনেস্ত একটা হয়ে যাওয়া দরকার।

ওদের সামনে এসে ইমাম সাহেব প্রসন্নতার প্রতিমূর্তি।

'এই যে বেটা, ভাল আছ? বেটি কৈ আমার? রাজী-খুশী আছ মায়ী? সব ভাল? কোন অসুবিধা হয় নি তো?...ভালই হ'ল সাত-আটটা দিন নিরিবিলিতে কাটিয়ে যেতে পারলে।...শরীরটা সুস্থ হ'ল তবু একটু। আমি তোমাদের আগেই বলেছিলুম যে খুব ভাল লাগবে এখানে—তুমি তো বেটা দুটো দিনই থাকতে চাইছিলে না। দেখলে তো, আমার বাগিচার গুণ—কেমন ধরে রাখল তোমাদের! হে-হে-হে!'

বিনা আমন্ত্রণেই একটা খাটিয়ার ওপর জেঁকে বসেন ইমাম সাহেব।

ওঁর আগমনটাই যথেষ্ট অস্বস্তির কারণ—তার ওপর 'সাত-আটটা দিন' কথাটা শুনে চমকে উঠল ওরা। সত্যিই কি এত দিন আছে নাকি এখানে? দুটো দিন বলে আট দিন? কোথা দিয়ে কেটে গেল সে আটটা দিন! ইমাম সাহেব বাড়িয়ে বলছেন না তো? কথার কথা?

আগার বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে আরও বেশী ক'রে হাসেন ইমাম সাহেব, ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে। বলেন, 'দিল্লীর খবর সব শুনেছ তো বেটা, বাদশার খবর?'

'কৈ, না! কী ক'রে শুনব বলুন! এ কদিন তো আর বেরুই নি, ওঁর শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না—'

'বটেই তো। বটেই তো। না বেরোলে আর খবর পাবে কি ক'রে! তা ধরো দুনিয়ার সঙ্গেই তো যোগাযোগ নেই তোমাদের বলতে গেলে। মায়ীর আমার তবিয়ৎ খারাপ নাকি? তা মা, এখন বর্ষায় নতুন জল নদীতে, যখন তখন তোমার স্নান করাটা উচিত নয় বাপু, যতই বলো!'

মেহের ওঁকে দেখেই বুরখা চাপা দিয়েছিল মুখে, তার মধ্যে সে ঘেমে নেয়ে উঠল। আগার কপালেও হেমন্তের সেই শিশিরস্নিগ্ধ প্রভাতে, বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল দেখতে দেখতে।

কী সর্বনাশ! এঁরা আড়াল থেকে তাহলে সব কিছুই দেখছেন নাকি!

ইমাম সাহেব ভারী খুশী, যতটা ভয়ঙ্কর ভেবেছিলেন, ততটা কিছু নয়। লজ্জা-শরম আছে যখন, তখন ভদ্রলোক। তিনি তেমনি আপন মনে হাসতে হাসতে বলেন, 'হে হে হে! তোমাকে আর কী বলব মা, নওজোয়ান লেড়কী মাত্রেরই এই এক দোষ। আমার চৌথা বিবি, বড় খুবসুরৎ আর অল্পবয়সী—অবিশ্যি তোমার চেয়ে বড় হবে—তা সেও, ফাঁক পেলেই দরিয়াতে চলে যাবে, নয় তো তলাওতে গিয়ে গা ডুবিয়ে বসে থাকবে! তেমনি ভোগেও বারো মাস সর্দি-কাশিতে। হে হে হে, বয়সের ধর্ম যে! অল্প বয়সে কিছুই মানতে চায় না কিনা—ভাবে কিছুই হবে না আমাদের কোনদিন! কিন্তু আল্লার কানুন সকলের জন্যেই—কী

বলো বেটা, অল্পবয়স বলে কি দুনিয়ার নিয়ম পাল্‌টে যাবে?...হে-হে-হে!'

তার পর, হাসির বেগটা একটু কমলে আবার বলেন, 'হ্যাঁ, তা যা বলছিলুম বাবাজী, দিল্লীর খবর। শুনছি বাদশার বিচার শুরু হচ্ছে—কেউ কেউ বলছে হয়ে গেছে।—বোঝ ব্যাপার, দুনিয়ার বাদশা, দুনিয়ার বিচারক—তাকে করবে ওরা বিচার—আংরেজ বান্দার বান্দারা! সেদিনও তাদের কুর্নিশ করতে করতে আসতে হয়েছে। কী জমানাই পড়ল! তবে শুনছি প্রাণে নাকি মারবে না। কেউ কেউ নাকি বলেছিল, ওঁকেও গুলি ক'রে মেরে ফ্যালো, সব ঝঞ্ঝাট মিটে যাক! তা বড়লাট নাকি রাজী হন নি—তিনি ভয় পাচ্ছেন যে, যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে, শাহ্‌জাদাদের ওপর দিয়ে গেছে—কিন্তু খোদ বাদশাকে অমন ভাবে মারলে আবারও লোক ক্ষেপে উঠবে হয়ত। এবার শুধু সিপাইরা ক্ষেপেছিল, তাতেই চোখে অন্ধকার দেখেছে—তাও সব সিপাইরা নয়—বাদশাকে মারলে হিন্দুস্তানের তামাম লোক ক্ষেপে উঠবে, মায় তেলেঙ্গী শিখ সবাই। এক ঐ নাক-চ্যাপ্টা গুর্খা দিয়ে কি গোটা হিন্দুস্তান সামলাতে পারবে?...তাই ঠিক হয়েছে যে ওঁকে কয়েদ ক'রে রাখবে কোথাও, বিচার তো তামাশা, নাম কা ওয়াস্তে। যা ঠিক করার হয়েই গেছে।'

একটু দম নিয়ে আবার বলেন, 'আরও শুনছি, এবার নাকি কোম্পানীর রাজত্ব আর থাকবে না। কোম্পানীর জুলুমের জন্যেই তো এত গোলমাল—তাই ঠিক হয়েছে যে বিলায়ৎ মুলুকে ওদের যে রানী আছে—বাদশাবেগম সাহেবা—বুঝে দ্যাখো বেটা কী মুলুক, একটা মরদ জুটল না দেশ শাসন করবার, একটা আওরৎকে ধরে বসিয়েছে তখ্‌তে, আর তার যে মরদানা—সে নাকি পোষা শখের জানোয়ারের মতো পেছু পেছু ঘোরে! তা সেই আওরৎই নাকি এখানকার বাদশা হবেন, তার খাসে চলে যাবে তামাম মুলুকটা। বড় বড় রাজা মহারাজা নবাব—এমন কি হায়দারাবাদের নিজাম বাহাদুরকেও খাজনা দিতে হবে ঐ বেগম সাহেবার খাজাঞ্চীখানায়। কুর্নিশ করতে হবে তাঁকে।...হয়ে গেল, আর কি, ফরসা সব! মুঘলদের বাদশাহী খতম, বাবরশাহী বংশেরও এই শেষ! অয় আল্লা! তোমার মরজি বোঝা ভার!'

পুরনো খবর, সেদিনই শুনেছে; জানতও তো এ পরিণাম—তবু মেহের আর সামলাতে পারল না নিজেকে, বুরখা সুদ্ধ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল।

'আরে আরে—ব্যাপার কি! মেহেরবান খোদা, কী হ'ল বেটা আমার মায়ীজীর?'

বৃদ্ধ স্বভাবতই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এটা তিনি কল্পনাই করতে পারেন নি—তাঁর সংবাদের এই প্রতিক্রিয়া।

আগা ঘাড় হেঁট ক'রে বলল, 'ইমাম সাহেব, আপনি জীবনদাতা, আশ্রয়দাতা—গুরুর মতো, আপনার কাছে গোপন করব না—উনি বাদশা শাহ্‌জাফরের নাতনী—ওঁকে ওঁর আত্মীয়দের কাছে পোঁছে দেবার ভার দিয়েছিলেন আমাকে শাহানশাহ্‌। পথে ডাকাত দলের পাল্লায় পড়ি—তাতেই ভয় পেয়ে ডুলিওলারা পালায়, তাই এ দুর্দশা ওঁর!'

'তওবা, তওবা! ইস্‌, তবে তো বড় অন্যায় হয়ে গেল বাবা, কথাগুলো বলা। আংরেজ সিপাহ্‌সালারটা সেদিন যখন বলল কথাটা, অত বিশ্বাস করি নি।...আমি, আমি খোঁজ করতে এসেছিলুম তোমরা কবে যাবে—এখন বলে যাচ্ছি বাবা, যত দিন খুশী থাকো। যা দরকার হয় বলো, সব পাঠিয়ে দেব। কোন তকলীফ না হয়,

তাড়া করার দরকার নেই। আমার ভাগ্য বাবা, যে ওঁকে দুদিন আশ্রয় দিতে পারলুম!'

ইমাম সাহেবের আন্তরিকতা সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না। বোঝা যায় যে তিনি খুবই বিচলিত হয়েছেন মেহেরের পরিচয় পেয়ে। কিন্তু আগাই আর রাজী নয় আতিথ্যের দিন বাড়াতে। সে বলে, 'না ইমাম সাহেব, আর দেরি করব না! এতটা দেরি করাই অন্যায় হয়ে গেছে। বড় বেশী কষ্টের পর এমন আরাম পেয়ে ভুলেই বসে আছি। খুব অপরাধ হয়ে গেছে আমার। বাদশাকে জবান দেওয়া ছিল আমার যে যত তাড়াতাড়ি হয় পেঁছে দেব ওঁকে।'

'না, তাহলে আর দেরি করতে বলব না। তা কতদূর যেতে হবে বাবা তোমাদের?'

'ধরমপুর।'

'ধরমপুর? সে তো এখনও বেশ খানিকটা দূর আছে। এভাবে তো যেতে পারবে না—'

'সেই তো বিপদ! খুব ভাল হয়—যদি দুটো টাট্টুঘোড়া বা খচ্চর পাই। মিলবে কি এখানে? আমার সঙ্গে কিছু টাকা আছে, বেশী দাম যদি না হয় তো কিনতে পারব—'

'মিলবে বৈ কি বাবা, মেলাতেই হবে যে ক'রে হোক। আমি যখন আছি তখন সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। আছে, আমার হাতেই দুটো ভাল টাট্টু আছে, খাবে কম দৌড়বে ভাল। মিলত না—আমার হাতে আছে বলেই, এসব গ্রামে টাট্টু খচ্চর থাকার কথা নয়। এ আমার ভাতিজার জিনিস বলেই—। তোমাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি, যা খুশী দাম দিও, তার জন্যে আটকাবে না। বেহেড বকা বেয়াড়া ছোকরা একেবারে! আমার ভাতিজাটার কথা বলছি। অনেক ছিল বিষয় আশয়—সর্বস্ব উড়িয়েছে জুয়া খেলেই। ঐ ঘোড়া দুটো পর্যন্ত বন্ধক রেখে আমার কাছ থেকে কুড়ি টাকা ধার করে! তারপর বলতে এসেছিল, আর কিছু দিয়ে কিনে নিতে—কিম্বা অপরকে বেচে বাকী টাকাটা ওকে দিতে। স্রেফ হাঁকিয়ে দিয়েছি। বলেছি, এক পয়সাও পাবে না, ঘোড়াও না। থানা আছে, আদালত আছে—যা পারো করো গে। আমি তখনই কটকোবলা ক'রে নিয়েছিলুম, অত কাঁচা ছেলে আমি নই!... দিতুম ওকে, হাজার হোক নিজের ভাতিজা, ঠকাতুম না। বড্ড চটে গিয়েছি একটা ব্যাপারে। ওরই মা, আমার ভাবী, তার অসুখ শুনলুম, ঘরে খাবার মতো কিছু নেই—আমি ডেকে পাঁচটা টাকা আর কিছু গম দিয়ে বললুম, যা করেছিস করেছিস —এটা যেন খোয়াস্ নি, সোজা গিয়ে মাকে দে। আমার কাছে কসম খেয়ে গেল, সোজা বাড়ি যাবে—ঠিক ঘুরে জুয়ার আড্ডায় গিয়ে সব, মায় গমগুলো পর্যন্ত উড়িয়ে দিলে। তারপর থেকে আর মুখ দেখি না। ভাবীকে কাছে এনে রেখেছি—সব সম্পর্ক চুকে গেছে।...আর যা করে করুক, পুরুষ মানুষ কসম খেয়ে কসম ভাঙবে, গুরুজনের কাছে জবান দিয়ে জবান ভাঙবে—সে কি মানুষ, সে তো জানোয়ার!'

ইমাম সাহেব অতঃপর মেহেরকে যথোচিত সান্ত্বনা দিয়ে, যত দিন খুশী তাঁর এ গরীব-খানায় থাকবার আমন্ত্রণ জানিয়ে—আর কিছু চাই কিনা খাদ্য-খাবার জিজ্ঞাসা ক'রে, আগার কাছ থেকে টাট্টুর দাম বাবদ চল্লিশটি টাকা গুণে নিয়ে, বড় পীর খাজা বাবার কাছে সাধারণ ভাবে ওদের জন্যে দোয়া মাগতে মাগতে বিদায়

নিলেন।

ইমাম সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে বাগানের ফটক পর্যন্ত গিয়ে তাঁকে সেলাম জানিয়ে যখন ফিরে এলো আগা, তখন মেহের বুরখা সরিয়ে ফেলেছে। তার অশ্রুধৌত স্তম্ভিত মুখের দিকে চেয়ে আগার বুকের মধ্যেটা করুণা ও বেদনায় উদ্বেল হয়ে উঠলেও, সে তখনই কোন সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল না, শান্তভাবে সামনে এসে বসল। ওর বুকের মধ্যে যে ঢেউ উঠেছে, তারও অভিঘাত বড় কম নয়—সেইটেই বোধ করি সামলাবার চেষ্টা করতে লাগল।

অনেকক্ষণ এমনিই বসে রইল দুজনে চুপ ক'রে। বহুক্ষণ। ওদের দুজনের মনে হ'ল এক যুগ। কত কি বলবার আছে পরস্পরকে—কত কথা ভিড় ক'রে ঠেলে এসেছে ওষ্ঠপ্রান্তে—বুঝি সেইজন্যেই, একটাও বলা যাচ্ছে না।...

একেবারে দুজনেই চমকে উঠল—সেই সুগভীর অন্তর্মুখী ধ্যানতন্দ্রা থেকে—বাইরে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ উঠতে। কিসের শব্দ কার ঘোড়া—প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই। ইমাম সাহেব পাঠিয়েছেন নিশ্চয়, ওদেরই টাট্টু। কথাই হয়েছিল—ভাল ক'রে এখনকার মতো দানাপানি খাইয়ে পাঠিয়ে দেবেন উনি, সে ঘোড়া বাঁধা থাকবে ওদের ফটকে। সহিস অপেক্ষা করবে, ওদের সঙ্গে খানিকটা গিয়ে ধরমপুরের রাস্তাটা ধরিয়ে দিয়ে বিদায় নেবে সে।

বিবর্ণ হয়ে উঠেছে দুজনেরই মুখ। ব্যাকুল হয়ে উঠেছে মেহেরের পদ্মপলাশ দুটি চোখ। না দেখেও সেটা অনুভব করছে আগা, চাইবার সাহস নেই, সে চোখে চোখ পড়লেই দুর্বল হয়ে পড়বে। তাই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'এবার তাহলে তৈরী হয়ে নাও শাহ্‌জাদী, খাওয়া-দাওয়া সেরে ফেল।...দুপুরে বেরিয়ে পড়তে পারলেও সন্ধ্যার আগে আমরা অনেকদূর পেঁছে যেতে পারব।'

'কিন্তু কোথায়—কোথায় যেতে চাও আগা? কোথায় যাবো আমরা?'

হঠাৎ যেন প্রশ্নটা বহুক্ষণের নীরবতার পর্দা ফেটে বেরিয়ে আসে। বহু চেষ্টাকৃত বলেই বোধ হয় কণ্ঠস্বর একই সঙ্গে আর্ত এবং কর্কশ শোনায়। হয়ত অশ্রুবিকৃতিও দায়ী খানিকটা তার জন্যে।

থতমত খেয়ে যায় আগা। এ ধরনের প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিল না সে। সে বিপন্নমুখে সামনের দেওয়ালটার দিকে চায়। বহুদিন আগে চুনকাম হয়েছে, বহুজনের ব্যবহারে তার শ্বেতমহিমা অবলুপ্তপ্রায়। অনেক পানের পিক্ দেওয়ালের গায়ে। কুলুঙ্গিতে চিরাগটার পলতে সুদ্ধ পুড়ে গেছে, গতকাল আর জ্বালাও হয় নি। আলো জ্বলার ফলে কুলুঙ্গির ভেতরটা শুধু নয়—বাইরেও অনেকটা উঁচু পর্যন্ত কালো দাগ পড়েছে। বাঁশের পর্দাটা খামকা দুলছে কেন? ও, ওদিক থেকে উত্তরের বাতাস এসে লাগছে। ঐ যে দরজাটাও কাঁপছে একটু একটু।...

ঘরটা নিরীক্ষণ করাও শেষ হয় এক সময়ে। আর্ত প্রশ্নটা তবু মুছে যায় না। মনে হয় এখনও সে কণ্ঠস্বর কাঁপছে এই ঘরের বদ্ধ বাতাসে। সেও একরকম মরীয়া হয়ে—একটু রুক্ষ ভাবেই বলে, 'কেন, ধরমপুর? সেইখানেই তো যাবার কথা!'

'এর পর ধরমপুর! তুমি কি পাগল! কী ক'রে ভাবতে পারলে যে এর পর গিয়ে নবাবের হারেমে উঠব আমি!'

মেহের ছুটে এসে আগার দুটো হতা ধরে, ওপর হাত—বাহুমূলের কাছাকাছি।

আবেগ-বিকৃত উত্তেজিত স্বরে বলে, 'ওদিকে মুখ ফিরিয়ে আছ কেন? আমার দিকে চাও, আমার মুখের দিকে চেয়ে বলো—তোমার কি এখনও ধারণা আমি ধরমপুরে গিয়ে নবাবকে বিয়ে করতে পারব?'

না, মুখের দিকে চাওয়া হবে না কিছুতেই। ও মুখে আছে তার চরম সর্বনাশ—সর্বপ্লাবী, সর্বগ্রাসী। পৌরুষের সমাপ্তি, মনুষ্যত্বের কবর ঘটবে ও চোখের দিকে চাইলে। মেহেরও জানে তা, তাই মুখের দিকে চাওয়াবার এত আকিঞ্চন তার। সে তেমনি একবগ্‌গা 'শরকষী' বায়নাদার ছোট ছেলের মতো ঘরের কড়ি-কাঠের দিকে চেয়ে উত্তর দেয়, 'সেই রকমই বাদশার হুকুম আছে শাহ্‌জাদী, আমি সেই রকমই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

'কিন্তু—' উদ্ধত অশ্রু সংযত করার প্রাণপণ চেষ্টায় গলা ভেঙে আসে মেহেরের, 'তা যে হয় না আগা। আমি যে আর কাউকে জানি নাতোমাকে ছাড়া—আমি অন্য কোন মানুষের কথা ভাবতে পর্যন্ত পারি না। তুমি কি বোঝ নি এত দিনেও? নইলে, নইলে কি আমি এমন ক'রে এখানে কাটাতে পারি তোমার সঙ্গে?...বহু বাদশার রক্ত আছে আমার দেহে—আমি বাজারের পণ্যা নাচউলী নই! তোমাকেই আমার মালিক বলে, মরদ বলে জেনেছি—তাই এমন ক'রে তোমার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি আমি!'

'বড় ভুল হয়ে গেছে শাহ্‌জাদী, আপনারও—আমারও।' মেহেরের মুঠির মধ্যে থেকে হাত দুটো ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে উত্তর দেয় আগা, যথাসাধ্য বিরস করার চেষ্টা সত্ত্বেও গলার কাঁপনটা চাপা থাকে না সম্পূর্ণ, 'কিন্তু সে ভুল সংশোধনের বাইরে চলে যায় নি আশা করি। আপনি এই সামান্য বান্দাকে যে অনুগ্রহ করেছেন, করতে চাইছেন তা যে কোন লোকের কাছেই অচিন্তিত সৌভাগ্য, অপরিমিত সুখ। কিন্তু সুখ-সৌভাগ্য বান্দাদের জন্যে নয়। আমি সামান্য নফর মাত্র, বাদশার হুকুমের দাস!'

'আগা, আগা—শোন, পাগলামি ক'রো না। বাদশা আমাকে সুখী করতে, ভেবেছিলেন ওখানে গিয়ে নবাবের বেগম হয়ে আমি সুখে থাকব—তাই পাঠাতে চেয়েছিলেন। আমার সুখই তাঁর লক্ষ্য—এ তুমিও জানো। আমি নবাবের ঘরে তাঁর বেগম হয়ে রত্নালঙ্কারে সেজে রাজভোগ খাওয়ার থেকে তোমার বাঁদী হয়েও ঢের বেশী সুখে থাকব। যাবো—আজই যাবো কিন্তু ধরমপুরে নয়। অন্য কোথাও আমাকে নিয়ে চলো, খুব দূরে কোথাও, এমনি সামান্য কোন গ্রামে, যেখানে আমার পরিচয় কেউ জানবে না, তুমি আমার মরদ, আমার মালিক—সেই হবে আমার একমাত্র পরিচয়। তুমি ক্ষেতি করবে কিম্বা মজুরী করবে—আমি তোমার ঘর দেখব। সেই হবে আমার বেহেস্ত্‌! আমি বলছি আগা, কথা দিচ্ছি, আমি কাজকর্ম সব শিখে নেব—তোমায় সেবার কাজ আমি যত্ন ক'রেই শিখব। তোমার বিছানা পাতব, রুটি করব, গম ভাঙব—তোমার সঙ্গে ক্ষেতে গিয়েও খাটব। তুমি দয়া ক'রে আমাকে নাও আগা, আমি বাদশাজাদী হয়ে তোমার কাছে এইটুকু ভিক্ষা চাইছি!'

আগার মনে হ'ল সে চিৎকার ক'রে ওঠে, নিজের গলার আওয়াজে ডুবিয়ে দেয় এই কথাগুলো। মনে হ'ল ডাক ছেড়ে কাঁদে সে খানিকটা। মনে হ'ল ছুটে পালিয়ে যায় কোথাও।...উপায় নেই, উপায় নেই—কিছুই করতে পারল না সে, শুধু নিষ্ফল ক্ষোভে তার মাথার মধ্যেটায় দপদপ করতে লাগল।...ঈশ্বর সুদ্ধ কি তার বিরুদ্ধে

ষড়যন্ত্র করলেন! এ কী বিপদ, এ কি উপায়হীনতা! জীবনের পরিপূর্ণ সুধা তার সামনে—ইচ্ছা করলেই আকণ্ঠ পান করতে পারে—অথচ কী এক সম্মানের রজ্জুতে বেঁধে রেখেছেন তাকে, সেটুকু ইচ্ছা করবারও শক্তি নেই।

সে বার-দুই ঢোঁক গিলে কোনমতে শুষ্ককণ্ঠে বলে, 'আমাকে ক্ষমা করবেন শাহ্জাদী, আমি নাচার!'

ভগ্ন-স্খলিত কণ্ঠে প্রত্যাখাতা নারী উত্তর দেয়, 'তুমি আমাকে ভালোবাস না আগা, কোনদিন ভালবাস নি। প্রতারণাই ক'রে এসেছ এতকাল। নইলে এমন কঠিন হ'তে পারতে না।...নাকি, এই দুদিন বাজিয়ে দেখেই শখ মিটে গেল, মনে হচ্ছে এ অসহ্য বোঝা জীবনভোর টানার মজুরী পোষাবে না!'

কঠিন ব্যঙ্গে আঘাত দিয়ে ওর পৌরুষ জাগাবার চেষ্টা করে হয়ত মেহের।

'ঈশ্বর জানেন, আল্লা সাক্ষী, তোমাকে ওখানে পেঁাছে দেওয়া মানে আমার জীবন—জিন্দিগী, আমার হৃদয় কবর দিয়ে আসা। আর আমার বাঁচার কোন অর্থই থাকবে না। তারপরও যদি বাঁচি তো শুধু একটা দেহই থাকবে, তার মধ্যেকার মানুষটা আর থাকবে না। প্রাণহীন মনুষ্যত্বহীন পৌরুষহীন একটা মানুষের ধ্বংসাবশেষ ঘুরে ঘুরে বেড়াবে পথের ঐ পাগলাটার মতো। আমার জীবনের আলো নিজের হাতে নিভিয়ে দিতে চলেছি আমি—এই বুঝে আমাকে দয়া করো।'

এবার আর অশ্রু চাপা থাকে না, দুই চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে।

'তবে কেন—কেন এ পাগলামি করতে যাচ্ছ, দুটো প্রাণের মৃত্যু ডেকে আনছ এমন ভাবে? এখনও সময় আছে—'

'না শাহ্জাদী, সেই সময়টাই আর নেই। যদি সম্ভব হ'ত বাদশার কাছে ফিরে যাবার তাহ'লে গিয়ে তাঁর পায়ে ধরে তাঁর আদেশ ফিরিয়ে নিতে বলতুম, আমার জবান আমি ফিরিয়ে নিতুম, কিন্তু সে তো আর সম্ভব নয়!'

'বাদশাই আর তো নেই, বাদশাহীই তো খতম। বাদশা যিনি ছিলেন, তোমার প্রতিজ্ঞা তো তাঁর কাছে!'

'বাদশা আছেন বৈ কি। আর না থাকলেও তাঁর আদেশটা থেকে যেত। কিন্তু তিনি আছেন—তাঁর বাদশাহী নেই বলেই তাঁর আদেশের এত মূল্য আমার কাছে। তিনি আমার আশ্রয়দাতা, অন্নদাতা, মনিব। আজ ভাগ্য তাঁর ওপর বিরূপ হয়েছে বলে কি আমরাও আমাদের বশ্যতা কৃতজ্ঞতা সব ভুলে যাব—তাঁর ঋণ অস্বীকার করব! তাঁর কাছে যে জবান দেওয়া হয়ে গেছে—সে জবান আমার কাছে শরীয়তের আদেশের মতোই পালনীয়। তাছাড়া—পুরুষের জবান দেওয়া মানে থুতু ফেলা—তা আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।...ইমাম সাহেব সত্যি কথাই বলে গেছেন, যে পুরুষের জবানের ঠিক নেই, যে কসম খেয়ে ভাঙ্গে—সে মানুষ নয়, জানোয়ার। এ কথা আরও পাঁচজনে বলবে শাহ্জাদী, অন্তত আমাদের দেশে আমাদের গুরুজন-দের কাছে এই শিক্ষাই পেয়েছি আমরা।'

আস্তে আস্তে মেহের ছেড়ে দেয় ওর হাত, যেন ক্লান্তপদে ফিরে গিয়ে বসে নিজের চারপাইটাতে। তারপর কতকটা যেন আপনমনে বলে, 'নানা জানতেন না, কিন্তু আমি শুনেছি ধরমপুরের নবাব লোক ভাল নয়, মাতাল লম্পট। বহু স্ত্রীলোক এনে পুরেছে তার হারেমে এই বয়সেই। তা ছাড়াও বহু গণিকা আসে নিত্য তার কাছে।...কোথায় পাঠানো হচ্ছে আমাকে তখন কেউ জানতে দেয় নি, নানার সঙ্গে দেখা করারও অবসর দেওয়া হয় নি। নইলে আমি তাঁকে এ কথাটা

বলতে পারতুম। এ খবর শোনার পর তিনি কিছুতেই ওখানে পাঠাতেন না। তিনি আমার মঙ্গল, আমার সুখের কথাই ভেবেছিলেন। একটা মিথ্যা সম্মানবোধকে আঁকড়ে ধরে আমার এই সর্বনাশ করছ তুমি ; এর ফল ভাল হবে না, ভাল হ'তে পারে না!'

মাটির দিকে চেয়ে উত্তর দেয় আগা, 'আমি নিরুপায় শাহ্‌জাদী, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি হতভাগ্য, আপনার আদেশ পালন করতে পারলুম না। কিন্তু বিশ্বাস করুন, সেইটেই আমার বড় শাস্তি, বড় প্রায়শ্চিত্ত হয়ে রইল!'

॥ বত্রিশ ॥

আরও দিন তিনেক পথ চলার পর হেমন্তের এক ম্লান অপরাহ্ণে ধরমপুর পৌঁছল ওরা। ধূলিধূসর, ক্লান্ত দুজনেই। তখনই প্রাসাদের দিকে যাবার চেষ্টা করল না তাই। আগা বেছে বেছে একটা ভাল সরাইখানা—ইংরেজরা এসে নাম দিয়েছে হোটেল—দেখে ঘরভাড়া করল, গোসলের জন্য জলের ব্যবস্থা করল এবং বাজারে গিয়ে আন্দাজে মেহেরের জন্য এক দফা নতুন পোশাক খরিদ করল। এক পোশাকে এতকাল কাটাবার ফলে শুধু যে সে পোশাক জীর্ণ হয়ে এসেছে সেই নয়—নিরতিশয় মলিনও হয়েছে। এ অবস্থায় কোন বাগ্‌দত্তা বধূকে তার ভাবী স্বামীর কাছে নিয়ে যাওয়া যায় না—রাজা নবাব না হলেও। আর বাদশার দেওয়া টাকা যখন কিছু আছে এখনও, তখন কৃপণতা করার দরকারই বা কি ? ও টাকার এক পয়সাও আগা রাখতে রাজী নয়। তার নিজের ভবিষ্যৎ ?—সে চিন্তা থাক এখন।...

মেহেরও বাধা দেয় না কিছু। এই কদিন সে কোন কিছুতেই বাধা দেয় নি। সেদিন ইমাম সাহেবের বাড়ি থেকে যাত্রা করা পর্যন্তই কেমন যেন কাঠের মতো হ'য়ে গেছে, শুধুই প্রাণহীন একটা পুতুল। আগা উঠতে বললে ওঠে, বসতে বললে বসে, ঘোড়া চালাতে বললে চালায়, বিশ্রাম করতে বললে হয়ত নেমে পথের ওপরই শুয়ে পড়ে। কথা কই'লে উত্তরও দেয়—কিন্তু নিজে থেকে কিছুই করে না। কথাও কয় না।

আগাও সর্বপ্রকার অন্তরঙ্গতা পরিহার ক'রে চলে। কথাও কয় না—বিশেষ প্রয়োজন না হ'লে। সেও নির্বাক হয়ে গেছে। আঘাত তার আরও বেশী, বুকের প্রদাহ অনেক বেশী বেদনাদায়ক। সে আগুন তাকে অন্তরে অন্তরে পুড়িয়ে মারছে। মেহের মুখে বা চলাফেরার ভঙ্গীতে প্রতিবাদ জানিয়ে, অনুযোগ ক'রে, গঞ্জনা দিয়ে যেটুকু সুখ পেয়েছে—সেটুকুতেও তার অধিকার নেই। উপরন্তু মেহেরের ভুল বোঝাটা আরও বেশী অসহ্য। অথচ তাকেই সব ব্যবস্থা করতে হচ্ছে, সব ভার তুলে নিতে হয়েছে নিজের কাঁধে। সবই ক'রে যাচ্ছে সে, মেহেরের চেয়ে অনেক সহজ ভাবেই করছে, শুধু নিজেই বুঝতে পারছে যে, এই দুটো তিনটে দিনে অন্তত বিশ বছর বয়স বেড়ে গেল তার।

স্নান ও বেশ পরিবর্তনের পর দুজনে একটু একটু গরম দুধ খেয়ে নিয়েই রওনা হয়ে যায়। মেহেরের তাতেও অনিচ্ছা—শুধু এ নিয়ে বাদানুবাদ আরও বেশী ক্লান্তিকর ব'লেই সামান্য একটু দুধ মুখে দেয় সে। আগা ইতিমধ্যে একটা তাঞ্জামের ব্যবস্থা করেছিল, তাইতে মেহেরকে চড়িয়ে নিজে হেঁটে যায় সঙ্গে

সঙ্গে।...

প্রাসাদের দেউড়িতে পেঁছে প্রহরীদের কাছে বাধা পাবে—নানা জবাবদিহি করতে হবে, হয়ত আজ দেখাই পাওয়া যাবে না নবাব বাহাদুরের—এমনি একটা আশংকা ছিল আগার। কিন্তু সেখানে, সম্পূর্ণ অপরিচিত সান্ত্রীদের কাছে যে অভ্যর্থনা লাভ করল সে—তাতে বিস্ময়ের সীমা রইল না তার। ফটকের সামনে তাঞ্জাম দাঁড়াতে না দাঁড়াতে একজন প্রহরী সামান্য একটু ঝুঁকে তাঞ্জামের মধ্যে বুরখাবৃত নারীমূর্তি দেখেই ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটা দিয়ে বাগানের দিক দেখিয়ে তাঞ্জাম-বাহকদের বলল, 'নিশাত গা—এই দিকে, জানো তো?'

আগা অবাক হয়ে তাড়াতাড়ি বলতে গেল, 'আমরা দিল্লী থেকে আসছি, নবাব বাহাদুরের কাছে—মানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

সে লোকটি মুচকি হেসে বলল, 'ওরে ভাই, দিল্লী থেকেই আসো আর কাশ্মীর থেকেই আসো—আসবার জায়গা তো বহুৎ, লেকিন যাওয়ার জায়গা ঐ এক। নবাব সাহেব এ সময়ে ঐখানেই থাকেন—আর তা সবাই, বিশেষ ক'রে তাঞ্জামওলারা ভাল রকমই জানে। তোমার কোন ভয় নেই ভাইয়া, তোমার কোন অসুবিধা হবে না, ঐ তাঞ্জামের সঙ্গে যাও, সিধা নবাবসাহেবের কাছে পেঁছে যাবে!'

এই বলে—আর মুচকি নয়—বেশ শব্দ ক'রেই হাসল সে।

কিন্তু তার কাছ থেকে বেশী আর কোন খবর আদায় করার মতো অবসর মিলল না, কারণ ততক্ষণে তাঞ্জামওলারা বাগানের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে, পাছে আবছা আলোয় হারিয়ে যায় তাঞ্জামটা তাই আগাকেও দ্রুত যেতে হ'ল তাদের পিছু পিছু।

বিশাল উদ্যান, মুঘল প্রাসাদের বাগিচার মতো সুন্দর ক'রে সাজানো নয়...কিন্তু লালকিল্লার হায়াৎবক্স বাগের চেয়ে ঢের বড়। এখানে একটা নতুন জিনিস দেখল সে—দিল্লীতে সাহেবদের দোকানে দেখেছে এমনধারা জিনিস—সম্ভবত তাদের কাছ থেকেই কেনা—সাদা পাথরের কতকগুলো উলংগ মূর্তি, অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ ভঙ্গীতে খোদাই করা হয়েছে, দেখে আগার গা ঘিন-ঘিন ক'রে উঠল।...

এপথ সেপথ ঘুরে, ফোয়ারার পাশ দিয়ে জলের নহর ডিঙিয়ে এক সময় একটা পাকা ইমারতের সামনে এসে পড়ল ওরা। মূল প্রাসাদ থেকে বিচ্ছিন্ন, চারিদিকে নহর দিয়ে ঘেরা একতলা কুঠী—প্রমোদ-ভবন সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সে ধারণা আরও দৃঢ়মূল হ'ল—কাছাকাছি পেঁছতেই সারেঙ্গ তবলার আওয়াজ ও একাধিক চরমের নূপুরনিক্কণ কানে যেতে!

এইখানে ভাবী মহিষী—সম্রাট-বংশের দুহিতার সঙ্গে দেখা করবেন নাকি নবাব বাহাদুর?—এই বিলাস-ভবনে?

এখানেও পাহারা ছিল কিন্তু সে প্রহরীরাও তাঞ্জামের মধ্যে একবার মাত্র উঁকি মেরে দেখে আর কোন প্রশ্ন করল না, বাধা তো দিলই না কিন্তু এবার আর আগা নিষ্ক্রিয় নীরব থাকতে পারল না, ছুটে এগিয়ে এসে তাঞ্জামের একটা দিক চেপে ধরে জলদগম্ভীর স্বরে বলল, 'এই রোকো, উতারো তাঞ্জাম!'

এবার বিস্মিত হবার পালা বাহকদের আর প্রহরীদের। এখানে স্ত্রীলোকসুদ্ধ তাঞ্জাম প্রতিরাত্রেই আসে প্রায়, সুতরাং বাধা দেবার বা প্রশ্ন করবার কোন প্রয়োজন নেই—তা ওরা সকলেই জানে। এ লোকটা মাঝখান থেকে এমন পাগলের মতো কান্ডকারখানা জুড়ে দিল কেন? এ কী দামটা আগাম নিয়ে নিতে চায় নাকি?

নাকি এখানেই ছেড়ে দিয়ে যেতে চায়—পয়সাকড়ি বুঝে নিয়ে?

জনাচারেক পাহারাদার ছিল এখানের দরজায়। তাদের মধ্যে যেটি সর্দার গোছের সেটি এগিয়ে এসে বেশ একটু উগ্রস্বরেই প্রশ্ন করল, 'কী হয়েছে কি? গাঁক গাঁক ক'রে চেঁচাচ্ছ কেন? নবাব বাহাদুর গুস্সা করবেন যে! সাহাব লোগে রয়েছেন ভিতরে...মৌজ চলেছে এখন!'

এতক্ষণে এখানকার এই অবারিত গতির অর্থ বুঝে নিয়েছে আগা, সেও বেশ দৃঢ়কণ্ঠেই জবাব দিল, 'একটু ভুল হচ্ছে তোমাদের, এ তাঞ্জামে বাজারের কোন গণিকা আসে নি, কোন বাইজীও নয়। বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারেনি ফটকের পাহারাদাররা!'

'উঁহু, উঁহু, কিচ্ছু ভুল হয় নি, ভুল হবার কোন উপায়ই নেই। এখানে পালকি বলো, ডুলি বলো, তাঞ্জাম বলো—ঢোকবার একটিই মাত্র অর্থ আছে আমাদের কাছে। আর শুধু রেণ্ডিমহল্লার মেয়েরা কি বাইজীরাই আসে এখানে, তাই বা তোমাকে কে বলল? ওতে বরং মালিকের বিষম অরুচি। বহু ভদ্র-ঘরের খানদানী ঘরের মেয়ে আসে এখানে—রাতের আঁধিয়ারে মুখ ঢেকে, আবার ভোর হবার আগেই ভদ্রতা বজায় রেখে বাড়ি চলে যায়। তাদের খসম কি বাপ-ভাইয়ারা টাকা গুনে বাজিয়ে নেয় বসে এখানকার এই আলাদা খাজাঞ্চিখানায়। জাত-ধর্ম-সতীত্ব সব বেঁচে যায় তাতে, মানে কেউ কাউকে কোন পরিচয় জিজ্ঞাসা করে না তো, কেউ সে পরিচয় দেয়ও না নিজের থেকে—তবে আর ভয়টা কিসের বলো?'

আগা তার কোমরের তলোয়ারে হাত রেখে বলে, 'আমি এখানে তোমার দিল্লগী শোনার জন্যে আসি নি, আমি যা বলছি তাই মন দিয়ে শোনো। তামাম হিন্দুস্তানের বাদশা, শাহানশা গাজী মুহম্মদ শা জাফর বাহাদুর শা'র কাছ থেকে নবাব বাহাদুরের নামে খৎ নিয়ে এসেছি, এই তাঞ্জামে আছেন শাহানশার দৌহিত্রী মহামান্যা শাহ্জাদী নুরুন্নেসা বেগম সাহেবা। এই খবরটা তোমারা কেউ নবাব বাহাদুরকে পেঁৗছে দাও।'

কিন্তু এত বড় জোরদার কথাতেও প্রহরীটি যে বিশেষ বিচলিত হ'ল বলে মনে হ'ল না। বরং সে বেশ স্পষ্ট বিদ্রুপের ভঙ্গীতেই বলল, 'তোমার ঐ তামাম হিন্দুস্তানের বাদশা শাহানশা বাহাদুর শা জাফর গাজী আজ লালকিল্লা নৌবৎখানায় কয়েদী—দৈনিক দু আনা খোরাকী বরাদ্দ হয়েছে তার। তার চেয়ে আমাদের মালিকের পয়সাই বলো আর প্রতাপই বলো—ঢের বেশী। তা ছাড়া তিনি চান উম্দা মাল, সে মালের যোগানদার কে তা নিয়ে তাঁর কোন মাথাব্যথা নেই। তাঁর কাছে বাদশার নাতনীও যা আর বুড়ো চাঁদমিঞার চার নম্বরের নেকার বিবিও তাই। যাই হোক্, সে তোমার মর্জি, কৈ কোথায় কি খৎ আছে দাও, তাঁকে পেঁৗছে দিয়ে আসি, শুনি তাঁর হুকুম।'

আগা ঘাড় নেড়ে বলে, 'তা হবে না। খৎ আমি তাঁর হাতেই দেব, তাঁর নিজের হাতে—বাদশার তাই হুকুম!'

'তোমার বাদশা তোমার কাছে। আমার কাছে আমার মনিব দুনিয়ার বাদশারও বড়। এ সময় কোন মর্দানাকে ঢুকতে দেবার হুকুম নেই—মানে কোন অচেনা মর্দানা। তবে হ্যা, বিবিসাহেবা যেতে পারেন, মাল পছন্দ হ'লে দাম দিতে কুণ্ঠিত নন আমাদের মালিক, আর অল্পবয়সী কাঁচা মাল হ'লে পছন্দও হবে—রুপেয়া

পয়সা নিয়ে কোন হুজ্জৎ হবে না, তবে ঐ বিবিসাহেবা পর্যন্তই, তোমাকে ঢুকতে দিতে পারব না, মাফ করো।'

আবারও হেসে উঠল সে, নিজের রসিকতায় নিজেই মশগুল হয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে হাসতে লাগল।

কিন্তু আগাকে তখনও চেনে নি ওরা কেউ। সে যে কখন বিদ্যুৎগতিতে কোমরবন্ধ থেকে তলোয়ারটা খুলে নিয়েছে তা কেউ ভাল ক'রে বুঝতেও পারে নি, এখন সেই তলোয়ার তেমনি তড়িৎগতিতেই সোজা সেই প্রহরীর বুকে ঠেকিয়ে বলল, 'খবরদার, মুখ সামলে! আমার বাদশা তামাম হিন্দুস্তানেরই বাদশা, তোমার মালিকেরও মালিক তিনি, তাঁর নাম নিয়ে ইতর রসিকতা সহ্য করব না কোন মতে।...আর এও শুনে রাখো, বেগম সাহেবার সঙ্গে আমিও ভেতরে ঢুকব, যদি সহজে না দাও, তোমাদের চারজনকে শেষ ক'রেই যাব—সামান্য একটু দেরি লাগবে—এই যা। তবে যাব আমি নিশ্চয়ই।'

বিলাসী নবাবের অলস সহচর, যাত্রার দলের সৈনিকের চেয়ে বেশী সাহস তাদের নেই। তারা চারজনেই ঘাবড়ে গেল দস্তুরমতো। আর তাদের সেই স্তম্ভিত ভাবের সুযোগ নিয়ে—ইঙ্গিতে তাঞ্জাম-বাহকদের শিবিকা তুলতে বলে আগা তাদের পিছু পিছু ভিতরে চলে গেল।—এবং তাকে কোন বাধা দেওয়ার উপায় এরা ভেবে ঠিক করার আগেই—সেই স্বল্পালোকিত পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একেবারে নাচঘরের সামনে এসে বেয়ারারা তাঞ্জাম নামাল। এই নাকি দস্তুর, ঐ ঘষাকাঁচের দরজার ভেতরে পালকি তাঞ্জাম ডুলি কোন শিবিকাই ঢোকে না। মেয়ে যারা আসে তারা এইখানে নেমে হেঁটে ভেতরে যায়। আগাও আর জোর করল না, তাঞ্জামওলাদের প্রাপ্য ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে মেহেরকে পিছু পিছু আসতে বলে কপাট খুলে ভেতরে ঢুকল।...

প্রমাদ-কক্ষে ঢুকছে তা জেনেই ঢুকেছে আগা, সেখান কী দৃশ্য দেখতে পারে তাও অনুমান করা ছিল কতকটা—তবু ঘরে ঢুকতেই যেন মুখের ওপর একটা চাবুক পড়ার মতো আঘাত অনুভব করল। এ কোথায় নিয়ে এল সে মেহেরকে, সামান্য একটা পৌরুষের অহঙ্কারে এ কী সর্বনাশ ক'রে বসল সে তার প্রিয়তমার!

ঘরের মাঝামাঝি কিংখাপের টানাপাখার নিচে ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সের ঈষৎ-স্থূল চেহারার যে মানুষটি বসে আছে—যাঁর সমস্ত মুখে লোভ আর লালসার ক্লেদ মাখানো—তিনিই নিশ্চয় নবাব বাহাদুর। তাঁর দু পাশে দুটি দামী কুর্সিতে দুটি ইংরেজ সামরিক অফিসার—কিল্লাতে থাকতে তার বন্ধুর কাছ থেকে এদের উর্দি দেখে পদবী চিনতে শিখেছিল সে—তাতে বুঝল যে এদের একজন লেফটেনাণ্ট কর্নেল আর একজন মেজর।...তিনজনের সামনেই তিনটে নিচু তেপায়া, তাতে বিভিন্ন ও বিচিত্র বর্ণের পানীয়। সেগুলো যে মদ তাতে কোন সন্দেহ নেই, সম্ভবত দামী বিলিতি মদ। ঘরের মেঝেতে মহার্ঘ্য কার্পেট, আসবাবপত্রও যথেষ্ট মূল্যবান কিন্তু দেওয়ালের গায়ে যে সব বড় বড় তেলরঙা ছবি টাঙ্গানো—তার অধিকাংশই অত্যন্ত কুরুচির পরিচায়ক। প্রায় সবই উলঙ্গ নরনারীর ছবি—তাদের বিভিন্ন ভঙ্গী যেমন কদর্য, তেমনি কুরুচিপূর্ণ।

এই তিনজন ছাড়াও ঘরে অনেক লোক ছিল। বেশীর ভাগই স্ত্রীলোক অবশ্য। নর্তকী শ্রেণীর মেয়ে তারা—হয়ত আরও নিম্নশ্রেণীর। সদ্য নাচগানের চিহ্ন চারিদিকে—সম্ভবত এইমাত্র এক পালা শেষ হয়েছে। সারেঙ্গী ও তবলচী কাঠ

হয়ে বসে আছে, আবার কী নতুন ফরমাশ হয় সেই প্রতীক্ষায়। মেয়েগুলো নানা-ভাবে আরাম করছে,—কেউ কেউ একেবারে নবাব ও সাহেবদের পায়ের কাছে এসে বসেছে।

লেফটেনাণ্ট কর্নেল বুটসুদ্ধ দুটি পা একটি মেয়ের কোলে তুলে দিয়েছেন—একহাতে আর একটি মেয়ের গাল টিপে আদর করছেন, রুমাল দিয়ে তার কপালের ঘাম মুছিয়ে দিচ্ছেন, আর এক হাতে একটা মদের গেলাস ধরে আছেন অপর একটি মেয়ের মুখে। নবাব বাহাদুরের হাতেও মদের পূর্ণপাত্র, চুমুকে চুমুকে খাচ্ছেন আর সাহেবের কাণ্ডকারখানা তারিফ করছেন।

আগার ঘরে ঢোকাটা তত লক্ষ্য করে নি কেউ, কারণ সুতৈলাক্ত-কব্জায় কপাট খোলার বিশেষ শব্দ হয় নি। কিন্তু ঘরের মধ্যে খানিকটা এগিয়ে আসার পর সকলেরই নজরে পড়ল। এক সাহেব ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করলেন, 'Who—who the devil are you—blundering in like a bull? কেয়া মাংতা উল্লু?'—এবং সম্ভবত আগাকেই লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়তে গিয়ে হাতে ধরা পাত্রের মদটা তবল্‌চির মুখে ছুঁড়ে দিলেন।

নবাব বাহাদুরের দৃষ্টিও ততক্ষণে কঠিন ও শাণিত হয়ে উঠেছে, তিনি ভ্রূকুটি ক'রে বার দুই ওদের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, 'কে তুমি? এখানে কেন এসেছ? কী ক'রে ঢুকলে তুমি? আজিজা উঠে দ্যাখ তো—বাইরে কেউ পাহারা নেই নাকি? যে সে রাস্তার লোক এমন ভাবে এখানে ঢুকে আসে কী ক'রে? পাহারাদাররা নতুন লোক নাকি সব—জানে না যে এমন গাফিলতির একটিই মাত্র সাজা নির্দিষ্ট আছে আমার—কুকুর দিয়ে খাওয়ানো?'

কিন্তু আজিজা মেয়েটি উঠে দাঁড়াবার আগেই আগা আর একটু এগিয়ে এসে বেশ সহজ অথচ দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিল, 'তাদের কোন দোষ নেই জনাবালি, আমাকে আটকানো ঐ চারটি লোকের সাধ্য নয়। আপনি বৃথা রাগ ক'রে মেজাজ খারাপও করবেন না, কারণ আমি জরুরী কাজেই এসেছি, কাজ সারা হ'লেই চলে যাবো, প্রয়োজনের বেশী এক মুহূর্তও থাকব না।'

'তোমার তো বড় হেমাকৎ দেখছি, আমাকে তালিম দিতে এসো! কে তুমি, শাহানশাহ্ এলে নাকি?'

নবাব বাহাদুর রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াতে যান—কিন্তু ক্রোধ ছাড়াও পা কাঁপবার আরও কারণ ছিল বোধ হয়, তাই ভাল ক'রে দাঁড়াতে পারেন না, বসে পড়তে হয় আবার।

'আজ্ঞে জনাব, শাহানশাহ্ আমি নই—তবে তাঁরই বান্দা। তাঁর কাছ থেকে খৎ নিয়ে এসেছি আমি, সে খৎ খোদ আপনার হাতে দিতে হবে, এই তাঁর হুকুম, সেইজন্যেই আপনার গুস্‌সা ও বিরক্তির কারণ হবো জেনেও এত কাণ্ড ক'রে এখানে আসতে হয়েছে।'

এই বলে, আর প্রত্যুত্তরের অবকাশ মাত্র না দিয়ে আগা তার ভেতরের জেব থেকে বাদশার মোহর-ছেপ্‌ৎ খৎখনা বার ক'রে নবাব বাহাদুরের দিক এগিয়ে দেয়।

আর যাই হোক, ঠিক এটার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না তিনি, বিস্ময়ে সত্যিই যেন নির্বাক হয়ে গেলেন কিছুকালের জন্যে। শুধু অভিভূতের মতোই হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিলেন এবং বাদশার মোহরটা নজরে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বহুদিনের অভ্যাসমতো মাথাতেও ঠেকালেন তা। অথবা বলা যায় অভ্যস্ত হাত আপনিই উঠে

গেল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাহেবদের ক্রুদ্ধ ও সন্দিগ্ধ মুখের দিকে চেয়ে সম্বিৎ ফিরে পেলেন আবার, মনে পড়ে গেল বাদশার মর্যাদাচিহ্নকে অভিবাদন জানানো সাধারণ অপরাধ নয়—রাজদ্রোহ। তাড়াতাড়ি খানিকটা জিভ কেটে, ভুলটা সংশোধনের জন্য—যেন চিঠিটার উদ্দেশেই ঘৃণাভরে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করলেন, যদিচ সেটা গিয়ে পড়ল কার্পেটেরই এক জায়গায়—তারপর যতটা সম্ভব তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে চিঠিখানা খুলে পড়লেন।

সাহেবদের নেশা কেটে গিয়েছে ততক্ষণে। গরিষ্ঠটি ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করলেন, 'What's the game, eh! I say, what's this letter-exchanging affair with that arch-traitor that faithless old fool of a King?...কিছু ষড়যন্ত্র চলছে নাকি, য়্যাঁ? A plot to instal him again? That won't do my boy, that won't do!'

নবাব সাহেব যেন ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠলেন একেবারে, 'না না, লেফটেনান্ট কর্নেল কীন, সে ব্যাপারই নয়, এই দেখুন না চিঠিখানা। দিল্লীর পতন আসন্ন বুঝে তিনি তাঁর এক নাতনীকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন, যদি আমি দয়া ক'রে আমার হারেমে স্থান দিই—ইয়ে, মানে যদি বিয়ে করি আর কি!'

'Oh, indeed! That girl in that black whats its name—your intending bride?...A fine choice of a bridegroom ! Ha ha ha! Yes, that old imbecile is certainly a fool and he proves it with vengence! Just imagine Phillips, to choose this swine for a bridegroom for his own grand-daughter! খুব ভাল পাত্র ঠিক করেছে! Ha-ha-ha!'

বলতে বলতেই কিন্তু তাঁর সুরারক্ত চক্ষুদুটি কুঞ্চিত হয়ে ওঠে, বুরখার মধ্য দিয়ে মেহেরের চেহারা ও বয়সটা অনুমান করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেও বেশীক্ষণ নয়, জিভ দিয়ে ঠোঁটের ওপরের গোঁফটা সুরাসারমুক্ত করার চেষ্টা করতে করতে বলে ওঠেন, 'But she must be handsome, eh! What?...Grand-daughter of a Mughal King! Would-be bride of a Nabob! নবাব সাহাব, would you please let us have a glimpse of her feature? এক নজর—Just a glimpse? ...Oh, please, please!'

নবাব সাহেবের দৃষ্টিও যথেষ্ট লালসাতুর এবং উৎসুক হয়ে উঠেছিল কিন্তু সাহেবের এই অনুরোধে সে ঔৎসুক্য ও লালসা মুছে গিয়ে সে জায়গায় ফুটে উঠল একটা দীন মিনতির ভাব।

'কিন্তু জেনারেল সাহেব, একটু—মানে আমাদের বংশের একটা মর্যাদা—মানে বাইরের লোকের সামনে—হাজার হোক আমার বাগ্‌দত্তা স্ত্রী—বহুদিন আগে থেকেই কথা চলছিল এ বিবাহের—'

'But won't you oblige your dear friend a little—a very very dear friend? প্রিয় বন্ধুকে একটুকু মেহেরবানি করবে না!'

ভাষা যাই হোক, কণ্ঠস্বর যে ক্রমশ শাণিত কঠিন হয়ে আসছে সাহেবের—সেটা কারও কাছেই চাপা থাকে না। এ অনুরোধ নয়—আদেশ। এখনও মৌখিক যেটুকু বিনয় আছে, সেটুকু ঘুচে যেতে বিলম্ব হবে না কিছুমাত্র। নবাবের মুখ বিবর্ণতর হয়ে ওঠে—এবার ভয়েই তাঁর মেদবহুল বসা-লিপ্ত ললাটে ঘাম দেখা দেয়। তিনি ইঙ্গিতে বাদক-তবলচীদের বাইরে যেতে নির্দেশ দিয়ে ঈষৎ কম্পিত-কণ্ঠেই আগাকে

বলেন, 'ওকে, ওকে বুরখাটা একটু খুলতে বলো তো!'

সাহেবের কথা সব না বুঝলেও মর্মার্থটা আগা বুঝতে পারছিল। তারও—সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে—কপালে ঘাম দেখা দিয়েছিল—এতক্ষণ টানাপাখার নিচে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও। হাত দুটো অসহায় রোষে মুষ্টিবদ্ধ হচ্ছিল বার বার, রগের কাছের ছোট মাংসপেশী দুটো ঘন ঘন ওঠা-নামা করছিল। তবু সে ঠিক এই আদেশের জন্য প্রস্তুত ছিল না। কিছুক্ষণ স্তম্ভিতভাবে নবাবের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সে মাথা নিচু ক'রে বলল, 'আপনিই বলুন জনাব। শাহ্‌জাদীকে এতগুলো অপরিচিত লোকের সামনে বুরখা খুলতে বলব—এমন ধৃষ্টতা আমার নেই!'

এবার যেন নবাবের সমস্ত ব্যর্থ ক্ষোভটা আগার ওপরই এসে পড়ে, কর্কশ-কণ্ঠে বলেন, 'তুমি তো ভারী বদখৎ ছোকরা দেখছি! তুমি বান্দা বান্দার মতো থাকবে—আমার হুকুম, তুমি তাকে কথাটা বলো!'

আগা এবার মুখ তুলে সোজা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'আমি আপনার বান্দা নই জনাব, আমি যাঁর নৌকর, তাঁর হুকুম তামিল করা আমার হয়ে গিয়েছে। আপনার কাছে পোঁছে দিলেই আমার ছুটি, এই কথাই তিনি বলে দিয়েছেন। এখন শাহ্‌জাদীর সমস্ত দায়িত্ব আপনার। আপনার ভাবী মহিষী, আপনার বংশের কুলবধূকে যদি বেইজ্জৎ করাতে চান তো সে হুকুম আপনিই দিন। সেইটেই উচিত।'

এবার যেন নবাব বাহাদুর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। প্রায় মুখ খিঁচিয়ে বলেন, 'আমার ভাবী মহিষী যদি একটা নৌকরের সঙ্গে এতটা পথ একা আসতে পেরে থাকে তো এখানে আমার বন্ধুদের সামনে একবার মুখ দেখালে এমন কিছু বেইজ্জৎ হ'বে না।...আর কুলবধূ, যে এইভাবে এসেছে—তাকে এ বংশের কুলবধূ করব কিনা সেটাও তো ভেবে ঠিক করতে হবে!'

তারপর একরকমের হিংস্র দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে ব'লন, 'তুমি আমার নৌকর কিনা—সে শিক্ষা সে জ্ঞান যাতে জীবনেও ভুলতে না পারো, সেই ব্যবস্থাই করব। ...এটা আমার হুন্দা, এখানে অপর কোন বাদশার পরোয়া আমি করি না এখানে আমিই বাদশা। কিন্তু সে পরে হবে, আগে এ মামলাটা মিটে যাক।...এই আজিজা, শাহ্‌জাদীর বুরখাটা খুলে নে তো!

ইতিমধ্যেই নবাব আড়ে দেখে নিয়েছিলেন—সাহেবের অসহিষ্ণু ভঙ্গী। সেইজন্যই, আগাকে শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে তাঁর কাছে এই মামলাটা বড় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার কোন ব্যবস্থা করার আগেই কীন এবার নিজেই উঠে দাঁড়ালেন, 'Oh rot/...You need not bother Nabob, I'll do it myself—and very gladly too!'

আজিজাও ততক্ষণে ক্ষিপ্রগতিতে নবাবের আদেশ পালনের জন্য শাহ্‌জাদীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সে এ মহলের প্রধানা বাঁদী, লোকে বলে সেও এককালে নবাব বাহাদুরের ভোগ্যা ছিল, অথবা এ ব্যাপারে সে-ই নবাবের আলেম বা শিক্ষা-গুরু। অসাধারণ বুদ্ধিমতী বলেই নিজের পদমর্যাদা নিয়ে কলহ-কেজিয়া করে নি, স'রে এসে বাঁদীর পদ নিয়েছে। এখন বাঁদীদের অধিনায়িকা ও স্ত্রীলোক-ঘটিত সমস্ত ব্যাপারের কর্মাধ্যক্ষা। কীন সাহেব আদর ক'রে বলেন 'মেট্রন'—'মেট্রন অফ দ্য ডেভিলস হাউসহোল্ড!'

কিন্তু সেই নরকাধিনায়িকা বা তার ভক্ত কীন—কেউ স্পর্শ করার আগেই এক আশ্চর্য কাণ্ড ক'রে বসল মেহের। বুরখার মধ্য থেকেই এক শান্ত মহিমময় কণ্ঠে শোনা গেল, 'আমার গায়ে কেউ হাত দিও না, আমি নিজেই মুখের আবরণ সরাচ্ছি।' এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে বুরখাটা উল্‌টে পিছন দিকে ফেলে দিয়ে সহজভাবে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

ফল হ'ল অদ্ভুত। নাচঘর—সুতরাং বাতির অভাব নেই। অসংখ্য ঝাড়ে কয়েকশত মোমবাতি ও তেলের 'শেজ' জ্বলছে। তার স্নিগ্ধ অথচ উজ্জ্বল আলোয় প্রায় দিনের মতো আলোকিত হয়ে আছে ঘর। সে আলোকে রূপসী মেহের তার রূপের পরিপূর্ণ জ্যোতি ও মহিমায় সহস্রদল শ্বেতপদ্মের মতোই বিকশিত হয়ে উঠল সেই বিস্মিত ও ক্ষুধার্ত দুজোড়া চোখের সামনে। নবাব বাহাদুর বিস্ময়ে একটা অস্ফুট শব্দ ক'রে যে নিশ্বাস টানলেন তা আর ছাড়তে পারলেন না বহুক্ষণ পর্যন্ত। সে শক্তি তাঁর রইল না, রইল না তাঁর বাহ্য-জ্ঞানও—অনেকক্ষণ পর্যন্ত।

আর কীন সাহেবও—যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো কিছুক্ষণ নিষ্পলক চোখে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন স্থির হয়ে। শুধু যে চোখে পলক পড়ল না তাই নয়—মুখটা যে ঈষৎ ফাঁক হয়েছিল বুরখা উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে—সেটাও আর বুজল না। বেশ খানিকটা সময়, প্রায় মিনিট-দুই তিন সেইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে, রুদ্ধনিশ্বাসে স্বগতোক্তির মতো চাপা গলায় বলে উঠলেন, 'My God! My God! It's ravishing! She's an angel!'

প্রকৃতিস্থ হ'লেন আগে নবাব সাহেবই। বিপদ বুঝতে পেরেছেন তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। নিজের নির্বুদ্ধিতায় ডেকে আনা বিপদ। তিনি তাড়াতাড়ি নিজেকে যথাসাধ্য সামলে নিয়ে বললেন, 'আজিজা, তুই শাহ্‌জাদীকে সসম্মানে অন্দরমহলে নিয়ে যা, আম্মাজানের কাছে। এঁর বিশ্রাম আর স্নানের বন্দোবস্ত ক'রে দে—রেশমের পোশাক আনিয়ে দে দু'তিন দফা, কী পছন্দ জেনে নিয়ে। অমনি আম্মাজানকে বলে দিস মোল্লাকে খবর পাঠাতে—আমি আজ রাত্রেই এঁকে শাদী করব, সেই রকম ব্যবস্থাই যেন ঠিক থাকে—'

দ্রুত কথাগুলো বলে গেলেন নবাব, কতকটা মুখস্থের মতো—বিপন্ন দৃষ্টিতে আজিজার দিকে চেয়ে করুণ মিনতি জানাতে লাগলেন বার বার—কোন একটা বুদ্ধি ক'রে এ বিপদ থেকে তাঁকে রক্ষা করতে। তবু কিছুই ফল হল না শেষ পর্যন্ত। জিভ ও তালুতে অদ্ভুত একটা শব্দ ক'রে কীন সাহেব আপন মনেই হেসে নিলেন খানিকটা। সে হাসির অর্থ বুঝতে নবাবের একটুও অসুবিধা হ'ল না। শাণিত অস্ত্রের মতোই তাঁর গায়ে যেন কেটে কেটে বসল তা। কীন বললেন, 'Take it easy my boy, take it easy, don't hurry, there's time enough to get married! এত তাড়া কিসের?'

কথাটা বলছেন নবাবকে উদ্দেশ ক'রেই—কিন্তু চোখ দুটো সরছে না মেহেরের মুখের ওপর থেকে একবারও। হিংস্র শ্বাপদের মতো সে দুটো জ্বলছে, লোভে ও কামনায়। কেঁপে কেঁপে উঠছে তাঁর সর্বাঙ্গ—নিরুদ্ধ আবেগে। দুলছেনও একটু একটু, গোক্ষুর সর্প যেমন তার শিকারের দিকে চেয়ে দোলে।

এক পা এগিয়ে গেলেন মেহেরের দিকে ; আরও অধীর হয়ে উঠছেন ক্রমশ।

ঘরের সকলে নিস্তব্ধ। নর্তকীরা যেন একটা আসন্ন বিপর্যয়ের আভাস পেয়ে, দেওয়ালের দিকে কোণের দিকে সরে গিয়েছে। লেফ্‌টেন্যাণ্ট ফিলিপসও উঠে

দাঁড়িয়েছেন কিন্তু তাঁর মুখ পাষাণে ক্ষোদিত মুখের মতোই ভাবলেশহীন ও নির্বিকার। নবাবই দুশ্চিন্তায় পাণ্ডুর হয়ে উঠেছেন, দরদর ক'রে ঘাম ঝরে পড়ছে তাঁর কপাল ও গালপাট্টা বেয়ে। অন্য সকলে নির্বাক, কৌতূহলী। দরজার কাছে পাহারাদাররা শুধু নয়—কীনের দেহরক্ষী ও সহচর কয়েকজন গোরা সিপাহীও এসে দাঁড়িয়েছে। তারা হাতের কাছেই ছিল, প্রত্যহই তাই থাকে তারা, পাশের ঘরে বসে নবাবের দাক্ষিণ্যে মৌজ করে। অরক্ষিত একক কোন ইংরেজ অফিসার এখনও কোন ভারতীয়ের বাড়ি আসতে ভরসা পান না—আশ্রিত বা মিত্রভাবাপন্ন জানলেও। এরা এখন—যেন বাতাসে একটা নাটকের আভাস পেয়ে, ঘনীভূত হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তারাও দেখেছে মেহেরকে, দেখছে তাদের সেনাপতিকেও, তাদেরও মুখে কথা নেই, শুধু বন্দুকগুলো প্রস্তুত হয়ে আছে হাতে। হয়তো কাজে লাগাতে হবে—কে জানে।

অবশেষে একসময় হিস্‌হিসিয়ে উঠলেন কীন, বললেন, 'নবাব, তোমার বিয়েটা আজ মুলতুবী থাক। সেটা কাল হ'তে পারবে, day-time is much better for the ceremony. Somehow I feel a strong attraction for this girl! আমি আজ একে নিয়ে যাচ্ছি আমার ঘরে, কাল সকালে তুমি তাঞ্জাম পাঠিয়ে আনিয়ে নিও। I don't think you'll disoblige an old friend for such a trifling matter—will you?'

নবাবের কথাটা বুঝতেই কিছুটা সময় লাগল। গলা কাঠ হয়ে উঠেছিল তাঁর, মাথার মধ্যে যেন রক্তের ভৈরব গর্জন শুনছেন নিজেই। আর কিছু শোনা বা কিছু বলা যেন সাধ্যাতীত হয়ে পড়েছে। তাঁরও লালসা কম নয়। জীবনে বহু নারী উপভোগ করেছেন, কিন্তু এ একেবারে আলাদা, এমন কখনও দেখেন নি, দেখবেন বলে কল্পনাও করেন নি। দেখা পর্যন্ত উদগ্র কামনায় অধীর উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন প্রায়। কিন্তু এই গত কয়েক মাসে এই ইংরেজ অভিভাবক বা প্রভুকেও চিনে নিয়েছেন ভালরকমই। এ তাঁর চেয়েও এক-কাঠি সরেশ, এ দানব। পারবেন কি ওর দুর্বার লোভ ঠেকাতে?

মাথাটা চুলকে মরীয়া হয়েই বলতে গেলেন, 'But sir, she is my would-be bride!'

'Oh rot! You have polluted so many people's would-be-bride, that I don't think you should bother about your own, you have no right too!......তাছাড়া তুমি আমাকে কথায় কথায় তোমার প্রিয় বন্ধু বলো, এবার প্রমাণ হইবে আমি তোমার কতো প্রিয়। Come on my beauty, come on with your own humble servant. নফরকে দয়া করিয়া তাহার সঙ্গে চলো রাজকুমারী,—তুমি ঠকিবে না।'

নবাব সাহেব হয়ত আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন, কীন এবার নিজমূর্তি ধরলেন।

'Shut up, you fool! Don't yon dare cross my desire at this moment, or I'll shoot you like a mad dog that you are!'

সে ভীষণ ভ্রূকুটি ও ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বরের সামনে নবাব যেন গুটিয়ে এতটুকু হয়ে গেলেন। একবার তবু, অসহায় ভাবে নিজের সিপাহীদের দিকে চাইলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়ল অনেকগুলি শ্বেতাঙ্গ মুখ। সশস্ত্র ও নির্মম। এ শহরে অন্তত তিনশ গোরা সিপাহী এসে বসে আছে, সম-সংখ্যক গুর্খা। কামান

বন্দুক সব মজুত। তিনিই তাদের রুটি মাংস যোগাচ্ছেন প্রত্যহ, সুতরাং সংখ্যাটা ভালই জানেন। হুকুম হ'লে তাঁর এই প্রমোদভবন, ঐ প্রাসাদ, এমন কি এই ধরমপুর শহরটাও ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে সমভূমি ক'রে দিতে এক ঘণ্টার বেশি সময় লাগবে না এদের। সুতরাং নিজের এবং বংশের প্রতি চরম অপমানও সহ্য ক'রে মাথা হেঁট করতে হল তাঁকে। সাহেবকে বাধা দেবার কথা চিন্তাও করতে পারলেন না।

কীনও তা জানেন, তিনি বেশ নিশ্চিন্তভাবে শিস দিতে দিতে আরও দু'পা এগিয়ে এসে একেবারে মেহেরের একখানা হাত ধরলেন, 'Come now deary, come with your own dailing baby boy!'

আগা এতক্ষণ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে। অনেকগুলো ভাবাবেগ—ক্ষোভ, বিরক্তি, উষ্মা, ঘৃণা, লজ্জা—সর্বোপরি এক সর্বপ্লাবী অনুশোচনা, মেহের'ক এই অপমান এবং সর্বনাশের মধ্যে এনে ফেলার জন্য বিপুল আত্মগ্লানি ও অনুতাপ—তাকে কিছুকালের জন্য এমনি পাথর ক'রে দিয়েছিল। বিস্ময়ও কম নয়, তার এতকালের অভিজ্ঞতায়—ইতর জীবের চেয়েও ইতর ও আত্মসম্মানশূন্য এমন মানুষ সে দেখে নি। তা'তেই যেন আরও অবাক হ'য়ে গিয়েছিল সে।

মেহের এতক্ষণের মধ্যে একবারও আগার দিকে তাকায় নি, উদ্ধত অভিমানে কঠিন হ'য়ে ছিল—কিন্তু কীন এসে হাত ধরতে আর সে কাঠিন্য বা অভিমান বজায় রাখতে পারল না ; ভীত আর্ত দৃষ্টি'ত তাকাল আগার মুখের দিকে। তার দুটি চোখে অসহায় আকুলতা ও একান্ত নির্ভরতা।

সেই দৃষ্টিরই বিদ্যুৎস্পর্শে যেন মুহূর্তে ওর সমস্ত সক্রিয়তা ফিরে পেল আগা। আর না, আর দ্বিধা করার সময় নেই। প্রিয়াকে ছেড়ে যে জীবন রাখার কোন অর্থ নেই সে জীবন উৎসর্গ করার এই তো সুযোগ।

কিন্তু সর্বাগ্রে ঐ নরপশুটাকে—

আগা ছুটে এসে প্রচণ্ড একটা চড় কষিয়ে দিল নবাবের গালে। তিনি সে আঘাতের আকস্মিকতা ও অভিঘাত সামলে ওঠার আগেই—তাঁরই কোমরবন্ধে ঝোলানো খাপ থেকে তলোয়ারখানা খুলে নিয়ে আমূল বিঁধিয়ে দিল কীনের বুকে।

সমস্ত ঘটনাটা ঘটে গেল দুই-তিন লহমার মধ্যে, ঘটনাটা কী ঘটছে তা কেউ বোঝবার কি অনুমান করার আগেই—ঠিক যেন বিদ্যুতের মতোই দ্রুতগতিতে। তীক্ষ্ণধার মূল্যবান ইস্পাতে প্রস্তুত তরবারি—কীনের বুক দিয়ে ঢুকে পিঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল খানিকটা. একটা অস্ফুট বিস্ময়সূচক শব্দ করা ছাড়া কোন প্রকার আর্তনাদ করার পর্যন্ত অবসর পেলেন না কীন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

বজ্রাহত স্তম্ভিত ভাবটা কাটতে যা দেরি, গোরা ও দেশী সিপাহীরা বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ল আগার ওপর, চারিদিক থেকে ঘিরে ধরল। দুজনে পিছমোড়া ক'রে ধরল ওর হাত দুটো, একজন পিছনে মারল এক লাথি, আর জনা-দুই ওর কোমর থেকে অস্ত্রগুলা সরিয়ে নিল।

আগা পালাবার আশা রেখে এ কাজ করে নি—ভবিষ্যতের কোন ভাবনাই ভাবে নি সে—সে চেষ্টাও সে করল না। স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে মৃত্যুরই অপেক্ষা করতে লাগল। মৃত্যু তো বটেই—নিশ্চয়ই যন্ত্রণাদায়ক, শোচনীয় কোন মৃত্যু। তা হোক,

প্রাণটা যে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনের সময় সর্বাধিক কাজে লাগাতে পেরেছে—এইতেই সে খুশী।

কিন্তু সে রাত্রির বিধাতা-প্রযোজিত নাটকের পঞ্চম অঙ্ক তখনও বাকী ছিল, তখনও শেষ হয় নি তাঁর অঘটন-ঘটন অভিনয়ের। তাই সকলকে চমকিত ও চমৎকৃত ক'রে দিয়ে আর এক অঙ্কের যবনিকা উঠল ধরমপুর নবাবকুঠির নিশাতগার এই নাচ ঘরে।

মেজর ফিলিপ্‌স্‌ এতক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে দেখে অনায়াসে মনে করা যেত পাথরের মূর্তি। এমন কি লেঃ কর্নেল কীনের মৃত্যুতেও এতটুকু নড়েন নি! এইবার কিন্তু তিনি এগিয়ে এলেন ওদের কাছে, নবাবের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে, যেন তাঁকে সম্পূর্ণ অবহেলা ক'রেই সিপাহীদের ইঙ্গিত করলেন আগাকে ছেড়ে দিতে। তারপর পরিষ্কার হিন্দুস্থানীতে বললেন, 'লেফ্‌টেনাণ্ট কর্নেল কীন মারা গেছেন, আমিই এখন এখানকার গ্যারিসনের কম্যাণ্ডিং অফিসার। আমি আদেশ করছি ওকে ছেড়ে দাও।'

তারপর আগার দিকে ফিরে বললেন, 'সব ইংরেজ যে সমান নয়, ইংরেজ মাত্রেই যে অমানুষ নয়—সেইটে প্রমাণ করার জন্যই আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম। তুমি স্বচ্ছন্দে ঐ মেয়েটিকে নিয়ে চলে যেতে পারো, যেখানে খুশি।...আমি ইংরেজ জাতির হয়ে, ইংরেজ সেনাবাহিনীর হয়ে ঐ মেয়েটির কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। বুঝতে পারছি তুমিও বীর এবং যোদ্ধা—তুমি এর মর্ম বুঝবে এবং ভদ্রমহিলাকে ক্ষমা করার জন্য অনুরোধ করবে।'

এই বলে তিনি আগার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আগা এতদিনে এ হাত বাড়ানোর মর্ম জেনে গিয়েছিল, সেও দু হাত বাড়িয়ে ওঁর হাত ধরে করমর্দন করল অনেকক্ষণ ধরে।

তবে বিপদ যে সম্পূর্ণ কাটে নি এটুকু বোঝার মতো হুঁশ তখনও ওর ছিল। মিঃ ফিলিপ্‌স্‌কে ধন্যবাদ দিতে যেটুকু দেরি, তার পরই ইঙ্গিতে মেহেরকে ওর অনুসরণ করতে বলে আগা দ্রুত দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু তারও আগে নবাব সাহেবের চোখের ইশারা পৌঁছে গিয়েছিল আজিজার চোখে, সে আরও দ্রুত গিয়ে ওদের পথ রোধ ক'রে দাঁড়াল। খুব বিনয়ের সঙ্গে মেহেরকে বলল, 'শাহ্‌জাদী, আপনি আর ওদিকে যাবেন না, দয়া ক'রে আমার সঙ্গে চলুন বাঈ-আম্মা বেগমের কাছে। আপনার বিশ্রাম ও স্নানের সব ব্যবস্থা নিশ্চয়ই এতক্ষণ প্রস্তুত হয়ে গেছে, আশা করছি কোন অসুবিধা হবে না।'

এবার মেহের নিজেই কথা কইল। পুরুষ মানুষ—বিশেষ অপরিচিত পুরুষের সামনে কথা কওয়া দোষের। কিন্তু এখানে পুরুষ কৈ? সবাই তো জানোয়ার, কেবল ঐ সাহেবটি ছাড়া। তা তিনি যে দেশের মানুষ, সে দেশে এমন পর্দা নেই, তিনি কিছু মনে করবেন না নিশ্চয়ই। সে বেশ স্পষ্ট এবং নবাবের শ্রুতিগোচর ক'রেই বলল, 'আর ওদিকে যাওয়ার প্রয়োজন নেই বাঁদী। তোমার নবাব সাহেব ও বাঈ-আম্মা বেগমকে অজস্র ধন্যবাদ, কিন্তু তোমাদের এ দোজখে আশ্রয় নেবার আর দরকার হবে না। মানুষের কাছে আশ্রয় নেবার জন্যে পাঠিয়েছিলেন শাহানশাহ্‌ কিন্তু মানুষ কাউকে দেখলাম না এখানে। যদি সাদী করার মতো কোন মানুষ না জোটে—তো বরং বনের পশুকেই জুটিয়ে নেব। তারা অন্তত নিজেদের আওরৎকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করে—!'

আগা ততক্ষণে প্রকাশ্যেই একহাতে মেহেরকে বেষ্টন ক'রে ধরেছে, সেও বলল, 'আমার কর্তব্য আমি নিঃশেষে পালন করেছি, নিমকের ঋণ শোধ দিয়েছি কড়ায়-গণ্ডায়। আমার ওপর নির্দেশ ছিল নবাবের কাছে পেঁছে দিতে—জান কবুল ক'রেও সে নির্দেশ পালন করেছি। আর কোন দায় বা দায়িত্ব নেই আমার। এ মেয়ে বীর্যশুল্কে, নিজের প্রাণের মূল্যে কিনে নিয়েছি—এ এখন আমার। নবাব কেন—স্বয়ং বাদশারও সাধ্য নেই আমার জান থাকতে একে কেড়ে নেয়।'

সে কৌশলে, নিজে স্পর্শ না ক'রে মেহেরকে দিয়েই আজিজাকে ঠেলে সরিয়ে এগিয়ে গেল। আজিজার আর সাহস হ'ল না বাধা দিতে—আর কারুরই নয়। সিপাহীরা চাইল নবাবের মুখের দিকে, নবাব চাইলেন গোরাদের দিকে। গোরারা চাইল তাদের অধিনায়ক মেজর ফিলিপ্স্-এর দিকে। তিনি গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়লেন, অর্থাৎ 'বাধা দিও না, যেতে দাও।' তারপর আর কারুরই সাহস হল না বাধা দিতে। আগা ও মেহের সশস্ত্র প্রহরীদের সামনে দিয়েই বেরিয়ে গেল অনায়াসে।

নাচঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে চোখটা অভ্যস্ত হ'তে সামান্য কিছু বিলম্ব হ'ল—কিন্তু সেও দু-এক মিনিটের বেশী নয়। তারপরই আগা মেহেরের হাত ধ'রে প্রায় দৌড়তে শুরু করল।

বড় ফটকের দিকে গেল না—বা প্রাসাদের অন্য কোন দোর আছে কিনা খোঁজ ক'রে সময় নষ্ট করল না। সোজা চলল পাঁচিলটা লক্ষ্য করে। অন্ধকারে সাদা পাঁচিলটা দেখতে কোন অসুবিধা নেই। আরও সুবিধা—অরণ্য নয় এটা, সুরক্ষিত বাগান। এখানে কাঁটা গাছ বা গুল্ম নেই, গাছ মাড়িয়ে যেতেও কষ্ট হয় না।

বেশ উঁচু পাঁচিল—কিন্তু আগাও তার জন্যে প্রস্তুত। সে প্রায় কাঁধে ক'রে মেহেরকে ওপরে তুলে দিলে, আর তারপর নিজেও এক লাফে উঠে ওদিকে নেমে পড়ল। তারপর সেই চৌধুরী সাহেবের বাড়ির মতো ক'রে নিজে পিঠ পেতে দাঁড়াল, তাতে পা দিয়ে অনায়াসে নেমে এল মেহের।

অতঃপর কী? অনুচ্চারিত এই প্রশ্নই দুজনের মনে।

কোথায় নামল একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল আগা। আর সঙ্গে সঙ্গেই বুঝল যে বেশ একটু অসুবিধার মধ্যেই এসে পড়েছে তারা। প্রাসাদটাই শহরের এক প্রান্তে, আবার তারা যেখানে এসে পড়েছে সেটা প্রাসাদের পিছন দিক। এদিকটায় ভদ্রবসতি নেই বললেই চলে। অতি নোংরা হতদরিদ্র কয়েকটা খাপরার ঘর এখানে-ওখানে। নীচজাতীয় লোকের বস্তি, পাঁক কাদা আবর্জনার স্তূপ চারি-দিকে। অসংখ্য শুয়োর ঘুরে বেড়াচ্ছে—এই বস্তিরই পোষা শুয়োর নিশ্চয়ই।

এ রকম জায়গায় ওদের মতো লোকের আত্মগোপন করা শক্ত।

মেহের ফিসফিস করে বলল, 'গোরা সিপাহী যখন এত রয়েছে, ওদের একটা ছাউনিও আছে নিশ্চয়, চলো সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিই। ঐ সাহেব তো এখন তাদের কর্তা শুনলুম, তিনি হয়ত অনুরোধ করলে, সঙ্গে গোরা দিয়ে এ নবাবের হদ্দো পার করে দিতে পারেন।'

'তার আগে সে ছাউনি খুঁজে পাওয়া আর সেখানে পেঁছনো দরকার!' সংক্ষেপে, প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সঙ্গে উত্তর দেয় আগা। ততক্ষণে সে মন স্থির ক'রে ফেলছে অবশ্য, যেমন ক'রে হোক শহরের দিকেই যেতে হবে। শহরের মধ্যে গিয়ে

পড়তে পারলে অনেকটা নিরাপদ। সেখানে আশ্রয় ও সাহায্য দুই-ই মিলতে পারে। চাই কি লোকজনকে জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে গোরা ছাউনিও খুঁজে বার করা যেতে পারে।

দূরে শহরের আলো দেখা যাচ্ছে। বড় শহর, অনেকখানি জায়গা জুড়ে অর্ধ-চন্দ্রাকারে প্রাসাদটাকে ঘিরে আছে। ওরই মধ্যে যেখানটার আলো উজ্জ্বল আর ঘনসম্বদ্ধ সেইদিক লক্ষ্য ক'রেই চলতে লাগল ওরা। ওটা নিশ্চয় চকবাজার হবে, তাই অত আলো। লোকের বসতি ওখানে বেশী। আর অনেক লোকের মধ্যে পৌঁছতে পারলে তবু খানিকটা নিরাপদ। আবার যখন কোম্পানীর রাজ কায়েম হয়েছে তখন খুব একটা গুণ্ডাবাজী করতে ভরসা পাবেন না নবাব।...

দ্রুত চলার মতো পথ নয়। শহরের যাবতীয় আবর্জনা ফেলার এটাই বোধ হয় জায়গা, সেই জঞ্জালের স্তূপ, পাঁক নালা ডিঙিয়ে যেতে পদে পদে বাধা আসে, দেরি হয়ে যায় কেবলই। আলো নেই—দূর শহরের আলো আর নক্ষত্রের আলো ভরসা। পূর্বদিকে একটু আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে—বোধ হয় চাঁদ উঠবে এবার। কিন্তু এখনও তার দেরি আছে। অসুবিধার অন্ত নেই। জায়গায় জায়গায় মেহেরকে কোলে তুলে নিয়ে পার করতে হচ্ছে। তবু যতটা সম্ভব জোরেই চলছিল ওরা। নতুন আশা আর উৎসাহ জেগেছে ওদের বুকে, নতুন বল ফিরে পেয়েছে ওরা। প্রসন্ন প্রসারিত জীবন ওদের সামনে— আর সামান্যই দূর আর দেরি, তার উপকূলে পৌঁছতে।

প্রাসাদের পিছন দিকটা বেড়ে এসে ডানদিকে মোড় নিতেই একটা বড় আমবাগান পড়ল। পাঁচিল ঘেরা বাগান কিছু নয়, কয়েক বিঘা জমি জুড়ে অনেক-গুলো আমের গাছ, এইমাত্র। আমবাগানে পড়ে বেশ কিছুটা সুবিধা হ'ল ওদের—পরিষ্কার গাছতলা অথচ অন্ধকারের আশ্রয়ও আছে। ওরা এতক্ষণে যেন একটু নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। এটা পেরিয়ে গেলেই সদর রাস্তা, তখনও টাঙ্গা এক্কা চলছে —কোনমতে এইটুকু পেরিয়ে গিয়ে যদি একটা গাড়ি ধরতে পারে, তাহলে সেই গাড়িই ওদের গোরা ছাউনিতে পৌঁছে দিতে পারবে।

কিন্তু দেখা গেল—নিশ্বাসটা ওরা কিছু আগেই ফেলেছে।

আমবাগানের মাঝামাঝি পৌঁছবার আগেই—কোথা থেকে, যেন মাটি ফুড়ে উঠল, নিঃশব্দে চারিদিক থেকে ওদের ঘিরে ধরল অন্ততঃ পনেরো-বিশজন লোক। আগা সেই অন্ধকারেই বুঝল—নবাবের লোক। হাতের শিকার কেড়ে নিয়ে চলে এসেছে সে নবাবের মতো মানুষের, সেটা হজম করা কঠিন বৈকি!

এদের প্রত্যেকের হাতেই খোলা তলোয়ার, বন্দুকও আছে কারও কারও সঙ্গে—কিন্তু অন্ধকারে বন্দুক চালাতে গেলে মেহেরকে আহত করার সম্ভাবনা আছে বুঝে সে চেষ্টা কেউ করল না। নবাব সাহেবের কড়া হুকুম, শাহ্‌জাদীকে অক্ষত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া চাই।

এইবার একটা হিম-হতাশা বোধ করল মেহের। একা একটা লোক—তা সে যত বড়ই দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হোক—কুড়িটা সশস্ত্র লোকের সঙ্গে—লড়াই করা তার সম্ভব নয়। তাছাড়া নবাবের যে কুড়িটা লোকই ভরসা—এমন মনে করারও কোন কারণ নেই। হয়ত আরও দু'শ লোক বাগানের বাইরে অপেক্ষা করছে, বাগানটা ঘিরেই ফেলেছে হয়ত—

সে কিন্তু আর ইতস্তত করল না এক মুহূর্তও। বুকের মধ্যে থেকে একটা

ছোট্ট ছোরা বার ক'রে আগার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ঐ নবাবের ঘরে আমি যাবো না কিছুতেই। এ ছোরা এই রকম চরম বিপদের জন্যেই এতকাল ধরে বহন করছি। তুমিই এটা আমার বুকে বসিয়ে দাও, তোমার হাতে মৃত্যু আমার ঢের বেশী বরণীয়, ঢের বেশী শ্রেয়। তুমি ছাড়া এ দেহ আর কেউ অশুচি হাতে স্পর্শ করবে সে আমি সইতে পারব না!'

আগা তলোয়ার বার করতে করতেই বলল, 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। দেখিই না আল্লার মনে কি আছে। আমার জীবন থাকতে তো তোমাকে কেউ নিতে পারবে না, যদি দ্যাখো যে সেটা সত্যিই যেতে বসেছে—আমার হাত চিরদিনের মতো থেমে গেছে—তখন তুমিই ঐ ছুরি তোমার বুকে বসিও। আর দরকার হয় তো আমার বুকেও—মরি সে অনেক ভাল, জখম হওয়ার সুযোগ নিয়ে না কেউ কয়েদ করতে পারে, এইটে দেখো।'

বলতে বলতেই লড়াই শুরু করতে হয় তাকে।

মেহের কিন্তু আশ্চর্য শান্ত হয়ে যায়। বেশ তো, জীবনে না হয়—মরণেই মিলিত হবে সে প্রিয়তমের সঙ্গে, সেখানে তো কেউ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না তারপর।

আগাও কেমন যেন একটা শান্ত নিশ্চিন্ত ভাব অনুভব করে। সে একা—সম্ভবত কুড়িখানা তলোয়ার উদ্যত তার ওপরে, এ অসম যুদ্ধে জয়ী হবার আশা সে করে না। মৃত্যুকেই সে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছে। তবে সবই তো আল্লার মর্জি। আল্লাকেই স্মরণ করে সে। জীবনে বা মরণে তাঁর ইচ্ছাই জয়যুক্ত হোক।

কিন্তু মনে হয়—জগদীশ্বর সে রাত্রে নাটকের খেলাতেই মেতেছিলেন। আরও একটি অভাবনীয় অঙ্ক সংযোজিত করলেন তিনি, আরও একবার যবনিকা উঠল সে দৃশ্যের উপর।

অকস্মাৎ কয়েকটি অশ্বপদশব্দ ধ্বনিত হল সেই নির্জন আম্রকাননে। চারিদিক এতই নিস্তব্ধ যে এদের তরবারির ঝনৎকারের মধ্যেও সে শব্দ কানে এসে পৌঁছল উভয় পক্ষেরই। তবে কি মেজর ফিলিপ্‌স্‌ই তাঁর গোরা সিপাহী পাঠিয়েছেন এদের বিপদ অনুমান করে? নাকি নবাবেরই ঘোড়সওয়ার এরা!...একই সঙ্গে অসম্ভব আশা ও প্রবল আশঙ্কায় মেহেরের বুকের রক্ত উত্তাল হয়ে উঠল।...

গোরা কি কালা কিছু বোঝা না গেলেও এরা যে আগার মিত্রপক্ষ সেটা বুঝতে পারা গেল আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই। প্রচণ্ড বিক্রমে নবাবের সিপাহী-দের আক্রমণ করল তারা পিছন থেকে। এরা কারা, মোট কজন, কেনই বা তাদের আক্রমণ করছে—কিছুই বুঝতে না পেরে ভয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ল সিপাহীরা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘায়েলও হল তাদের কয়েকজন, বাকী যারা ছিল তারা এবার যে যেদিকে পারল দৌড়ল। তারা চলে যেতে দেখা গেল মোট আট-নজন তাদের পড়ে আছে মাঠে, কেউ মৃত কেউ বা সাংঘাতিক ভাবে আহত।

এইবার এগিয়ে এল সাহায্যকারী আগন্তুকরা।

অস্পষ্ট আবছা আলোতেই চিনতে পারল আগা—আফজল ও কাইয়ুম খাঁকে। তারাও ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে এল—যদিও তলোয়ার তখনও বন্ধ করে নি কেউ।

আফজলই কথা বলল। বেশ স্পষ্ট এবং দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'আগা মহম্মদ, আমাদের আসল মামলা মেটে নি এখনও। তুমি সেদিন আমাদের প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলে

—আশা করছি সে ঋণ আমরা আজ শোধ করতে পেরেছি।...এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিলাম। মনে ক'রো না যে একদিনও তুমি আমাদের চোখের বাইরে যেতে পেরেছিলে এর মধ্যে। শুধু এই ঋণ শোধ না ক'রে আর দুশমনী করতে পারব না বলেই অপেক্ষা করেছি। এসো, এবার এ মামলাটা মিটিয়ে ফেলি। তুমিও তিক্ত-বিরক্ত, আমরাও ক্লান্ত। এবার দেশে ফিরতে চাই। কী বলো, এমনি বন্দীভাবে যাবে—না লড়াই ক'রে মরবে?'

আগা কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল। অনেক কিছুই ভেবে নিল সে এর মধ্যে। অনেক ছবি ভেসে গেল তার চোখের সামনে দিয়ে। অনেক সুখ-দুঃখের অসংখ্য ছবি। বহু দুঃসহ কষ্টের ইতিহাস।—

আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ আফজল খাঁ। শুধু তিক্তবিরক্তই নই—আমিও ক্লান্ত। এর একটা চূড়ান্ত ফয়শালা হয়ে যাওয়াই ভাল। শুধু একটা কথা আমি বলতে চাই—একটা প্রস্তাব। তোমাদের কিছু উপকারে তো লেগেছি, তার দোহাই দিয়ে বলছি—এসো, আমাকে এক-একজনের সঙ্গে লড়বার সুযোগ দাও। আশা করি এটুকু মনুষ্যত্ব দেখাতে তোমরা কুণ্ঠিত হবে না। আমি যে একে একে তোমাদের এই পাঁচজনকেই ঘায়েল করতে পারব সে আশা কম—ক্লান্ত হয়ে পড়ব একসময়ে নিশ্চয়ই। কারণ আমার হাত তো বিশ্রাম পাবে না একবারও। তবুও সেটাই মানুষের মতো মরা হবে। তোমরাও তোমাদের বিবেকের কাছে দায়মুক্ত থাকবে—নয় কি?'

খানিকটা চুপ ক'রে রইল ওরাও। তারপর কাইয়ুম খাঁই উত্তর দিল ওদের হয়ে। বলল, 'তার চেয়েও ভাল প্রস্তাব করছি আমি। আমরা একজনই শুধু লড়ব তোমার সঙ্গে, আমিই লড়ব। যে হারবে সে পক্ষই চিরকালের মতো হারল ধরে নিতে হবে। তবে আমি যদি তোমাকে জখম করতে পারি তো বন্দী করব, আর যদি মরেই যাও তো—সব মামলা খতম। আর যদি আমি জখম হই তো তুমি মেরে ফেলতে পারবে—তার জন্যে কেউ তোমাকে দায়ী করবে না, আর হয়রানও করবে না কেউ। ইচ্ছে করলে দেশেও ফিরতে পারবে—তোমারও ছুটি, ওদেরও ছুটি!'

আগা সোচ্ছ্বাসে বলে উঠল, 'এতটা মানুষ্যত্ব তোমার কাছ থেকে সত্যিই আমি আশা করি নি কাইয়ুম খাঁ। ধন্যবাদ তোমাকে। এর চেয়ে ভাল প্রস্তাব আর কিছুই হ'তে পারে না। শুধু আর একটি অনুরোধ, যদি আমি মরি—তোমরা শাহ্‌জাদীকে কোন নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিও—সম্ভব হলে দিল্লীতেই।'

'জরুর। সে তুমি না বললেও আমরা দিতাম। উনি আমাদের সম্মানীয়া, ওঁর কেশাগ্রও কেউ স্পর্শ করবে না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

আগা চুপি চুপি মেহেরকে বলল, 'দিল্লীতে পৌঁছে কোনমতে তুমি দিল মহম্মদের খোঁজ ক'রে চলে যেও—তাহলেই নিশ্চিন্ত!'

'অত ভবিষ্যৎ ভাববার তোমার দরকার নেই আগা মহম্মদ, আর কেউ তোমাকে আমার কাছ থেকে আলাদা করতে পারবে না—মানুষ তো নয়ই, স্বয়ং খোদাও নয়।'

সামান্য ক'টি কথা, পুরাতন—পরিচিত কয়েকটি শব্দ দিয়ে গঠিত একটি বাক্য—তবু তাই যেন নূতন বীর্য সঞ্চার করল আগার ধমনীতে, বুকে এনে দিল অমিত সাহস। বলকারক সালসা বা উগ্র সুরাসারের কাজ করল এই আশ্বাসবাণী। সে চাপা গলাতে শুধু বলল, 'খোদা হাফেজ। তোমার জন্যেই তাহ'লে আমাকে বাঁচতে হবে

যেমন ক'রে হোক।'

শুরু হ'ল তাদের এই সর্বশেষ শক্তিপরীক্ষা। লড়ছে দুজনে, বাকী সবাই নীরব নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র। মেহের নিশ্বাস রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরকে ডাকতে লাগল শুধু। ওর সমস্ত ভাগ্য নির্ভর করছে এই লড়াইয়ের ফলাফলের ওপর, ওর জীবনও।

লড়াই শুরু করার আগে একটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গা বেছে নিয়েছিল ওরা। ততক্ষণে চাঁদ উঠেছে আকাশে, ক্ষীণ আলো, তবু কিছু দেখা যাচ্ছে। শহরের আলোরও একটা আভাস এসে পড়েছে। অভ্যস্ত হাত দুজনেরই, পরস্পরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও পরস্পরের মোটামুটি পরিচিত—কোন অসুবিধা নেই বিশেষ কোন পক্ষেরই।

বহুক্ষণ ধরে চলল লড়াই। আগাই আহত হ'ল আগে—তবে সে খুব বেশী নয়। কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পড়ছে সে ক্রমশ। আরও খানিকটা পরে হাত তুলতেই কষ্ট হবে হয়ত। যা করতে হবে অতি দ্রুত। সে মরীয়া হয়ে উঠল এবার। আর তাতেই—এক অসতর্ক মুহূর্তে কাইয়ুম খাঁ সাংঘাতিক জখম হয়ে পড়ে গেল।

ওর দলের লোকেরা ছুটে আসতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে গেল। ন্যায়তঃ আগার ওকে বধ করবার অধিকার আছে। কিন্তু আগা তা করল না, বরং অস্ত্রসংবরণ ক'রে কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

'শত্রুর শেষ রেখো না আগা মহম্মদ, কাজ খতম করো তোমার'—হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে আহত কাইয়ুম খাঁ বলে।

'আর তুমি আমার শত্রু নও। তোমার প্রাণ এখন আমার, তা আমি উপহার দিলুম তোমাকে, তোমাদের। তোমার বংশের সঙ্গে গোষ্ঠীর সঙ্গে আমার গোষ্ঠীর দুশমনি এখানেই শেষ হয়ে গেল। আশা করছি তোমার কথা তুমি রাখবে। তোমাদের ওপর আর কোন বিদ্বেষ নেই আমার, জীবনের যা বড় লাভ, যা সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য তা পেয়ে গেছি, এবার ছোটখাটো লোকসানের কথা ভুলতে পারব।...তুমি বাঁচো, আমাকেও বাঁচতে দাও—মস্ত বড় দুনিয়া, যে যার সুখ-শান্তির বাসা খুঁজে নিক্, এই তো ভাল। কী লাভ তুচ্ছ তুচ্ছ কারণে কলহ কেজিয়া ক'রে অশান্তি ভোগ করার?'

তারপর সে হেঁট হয়ে কাইয়ুম খাঁকে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে বলে, 'আমরা যাই, তোমাকে সুস্থ করার কোন ব্যবস্থা ক'রে গেলে খুশী হতুম কিন্তু আর সময় নেই। আশা করছি সুস্থ হয়ে উঠতে পারবে শিগ্‌গিরই।'

'উঁহু, উঁহু'—হাঁপিয়ে হাঁপিয়েই আবার বলে কাইয়ুম, 'তুমি সবরকমে আমাকে ঋণী ক'রে রেখে যাবে সে আমি সইব না। আমাদের কানুনে বিজিতের সব জিনিসেই বিজয়ীর অধিকার—তুমি আমার ঐ ঘোড়াটা নিয়ে যাও। যদি বাঁচি ভাল ঘোড়া কিনে নিতে পারব আবার, কিন্তু তোমার ওটা খুব দরকারও। নবাবের লোক হয়ত আরও একবার কোশিস্ করতে পারে তোমাদের ধরবার, ঘোড়া থাকলে পারবে না।'

'ধন্যবাদ কাইয়ুম খাঁ, আবারও ধন্যবাদ। বিজয়ীর দাবীতে নয়, তোমার এ উদার উপহার দান হিসেবেই নিলাম মাথা পেতে। এ দয়ার কথা আমার মনে থাকবে।'

সে আর দেরি করে না। মেহেরকে চড়িয়ে দিয়ে নিজেও এক লাফে সেই ঘোড়াতেই উঠে বসে। তারপর পশ্চিম দিক অর্থাৎ দিল্লীর দিক লক্ষ্য ক'রে ঘোড়া

ছুটিয়ে দেয়। দেখতে দেখতে শহরের সীমানা পার হয়ে যায় ওরা। ধরমপুর শহরের আলো বহুদূর পিছনে মিলিয়ে যায় এক সময়।

যেন ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন একটা থেকে জেগে উঠে মেহের শিউরে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে আগাকে, 'আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি তাহলে?'

'আমার বন্ধু দরাজ-দিল দিল মহম্মদের বাড়ি—সোজা। পৃথিবীতে সে-ই একমাত্র লোক যার কাছে নিঃসঙ্কোচে গিয়ে দাঁড়ানো যায় সর্বদা।' তারপর হেসে বলে, 'আগে তো ওখানে পৌঁছে শাদীটা সেরে নিই—তারপর ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবব।'

জ্যোতিষী

শ্রীমনুজেন্দ্রনাথ ভঞ্জ

করকমলে—

হ্যাঁ, দেখলে ভক্তি না হোক, ভয় হয় বৈকি। লম্বা একহারা চেহারা, খাঁড়ার মত নাক, প্রশস্ত—এমন কি টাক বার করাও বলা চলে, এমন উঁচু কপাল, আর তার মধ্যে ছোট ছোট উজ্জ্বল চোখের তীক্ষ্ম দৃষ্টি, সবটা জড়িয়ে বরদাচরণ জ্যোতির্বিনোদ মহাশয়ের চেহারাটা সুশ্রী না হলেও অসাধারণ ছিল।

তেমনি কি তাঁর কণ্ঠস্বর!

মক্কেলদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে যখন চড়া এবং তীব্র কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ বিদ্রূপের হাসিতে ফেটে পড়ত, তখন মনে হত যেন তা একটা শান্ত স্নিগ্ধ স্তব্ধতাকে কেটে কেটে নিজের প্রচণ্ডতার বেগে কোন্ সুদূরে পেঁছে, গেল নিমেষে। সে হাসির শব্দের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যার সবটা যেন ইহলোকের নয়, তার মধ্যে জানা ও শোনার অতীত কিছু, দেখার বাইরের কিছুর আভাস আছে। সুতরাং প্রথম যারা আসত তাঁর কাছে, তারা তাঁর চেহারা, চাহনি, বুদ্ধি ও কণ্ঠস্বরের এই উজ্জ্বল তীক্ষ্মতায় অভিভূত হয়ে যেত। সে মোহের সঙ্গে ভয় মেশানো থাকলেও পরিণামে শ্রদ্ধারই সঞ্চার করত মনে মনে।

এই অসাধারণ এবং তীক্ষ্ম হবারই চেষ্টা করেছেন তিনি আজীবন। বরং সে চেষ্টাকে তপস্যা বলাই উচিত।

কিন্তু তার আগে ওঁর প্রথম জীবনের ইতিহাসে একটু চোখ বুলোনো যাক না।

বরদা জ্যোতিষীর ইতিহাস এ অঞ্চলে অনেকেই জানেন।

জ্যোতিষী উনি ছিলেন না—প্রথম বয়সে বি-এ ফেল ক'রে এক ইস্কুলে ঢুকে-ছিলেন অঙ্কের মাস্টার হয়ে। ছোট সংসার, মা আর ছেলে—ছোট্ট একটু বাড়িও ছিল মাথা গোঁজবার মত। তাই অভাব ছিল না,—পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনেতে সংসার চালিয়েও অনেক শখ মেটাতে পারতেন। এই সব শখের মধ্যে প্রধান ছিল পুরানো বই কেনা। বেশী দামের পুরানো বই কেনা সম্ভব নয়, তাই সারা বিকেল আর সন্ধ্যেটা ঘুরতেন পুরানো বইয়ের বাজারে, হাঁটকে হাঁটকে একটা দুটো ছেঁড়া জীর্ণ কীট-দষ্ট বই সংগ্রহ করে আনতেন। নিরীহ রোগা চেহারার এই ছোকরাটিকে বইওয়ালারা কৃপার দৃষ্টিতেই দেখত, তাই সারাক্ষণ ধরে বই ঘাঁটলেও তারা কিছু বলত না। তা ছাড়া লোকটি কিনতেন যত বাজে আর অকেজো বই (তাদের মতে)—সেজন্য তারা সস্তা করেও দিত অনেক সময়ে। মা অনুযোগ করতেন, বন্ধুরা ঠাট্টা-তামাসা করত, কিন্তু এ নেশা তাঁর কাটল না কিছুতেই—বিয়ে-থা ক'রে সংসারী হওয়া কিংবা আর একবার চেষ্টা ক'রে বি-এ পাস করার সম্ভাবনা হয়ে পড়তে লাগল সুদূরপরাহত।

এমনি করে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ বরদা পেয়ে যান খানদুই ফলিত জ্যোতিষের বই—প্রাচীন পুঁথি, খবর নিয়ে জানলেন যে, এ বই দুটি খুব বিখ্যাত এবং অধুনা দুষ্প্রাপ্য। পুঁথির আকারে ছিল বই দুখানা, বিবর্ণ নাগরী লিপিতে ছাপা—একেবারেই বাজে বই মনে করে দোকানদার মাত্র আনা ছয়েক পয়সাতে বই দুখানা দিয়েছিল।

ব্যস, এইবার লাগল তাঁর এক নতুন নেশা। প্রায় গলে-যাওয়া পুঁথির পাতা থেকে অতিকষ্টে উদ্ধার ক'রে ক'রে তিনি লিপিগুলো আর একটা খাতায় নকল করলেন।

অর্থ বোঝবার অসুবিধে হচ্ছে দেখে আবার সংস্কৃত পড়তে শুরু করলেন নতুন করে। নতুন করে ব্যাকরণ ও অভিধান খুলে বসলেন। যেমন করে হোক এর পাঠ উদ্ধার করতে হবেই—এর সম্পূর্ণ অর্থ উদ্ধার করা চাই-ই!

ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করেও ফেললেন সবটা। এ যেন এক নতুন দৃষ্টি খুলে গেল ওঁর। পুঁথির শ্লোকের বর্ণনার সঙ্গে নিজের ও মায়ের করেরেখা মিলিয়ে মিলিয়ে চিনতে শিখলেন, কোন্ রেখার কি অমোঘ নির্দেশ তাও ধীরে ধীরে বুঝতে পারলেন।

কিন্তু তবু ঠিক বিশ্বাস হয় নি। ছেলেবেলা থেকে অনেককে তিনিও হাত দেখিয়েছেন। তার কোনটা মিলেছে, কোনটা মেলেনি। ওঁর বিশ্বাস ছিল এগুলো অল্পবিস্তর আঁধারেই ঢিল ছোঁড়া হয়—যেটা লাগে দৈবাৎ। কিন্তু এবার শুরু করলেন নিজেই বন্ধুবান্ধবদের হাত দেখতে। একে একে বহুলোকের হাত দেখলেন তিনি, বিনা পয়সায় সেধে-সেধেই। আর সেই তাঁর প্রথম চমক লাগল। জ্যোতিষ-শাস্ত্র এমন শক্তিশালী—হিসাব এমন নির্ভুল তার! যা বলেন তাই যেন মিলে যায়, দৈববাণীর মত তাঁর করেরেখা বিচার সত্য হয়, যেন নির্ভুল অঙ্কের মত হিসাব করা সব ব্যাপারটা।

ফলে নেশা আরও বাড়ল। এদিক ওদিক খুঁজে আরও দু'একটা বই বার করলেন। ছুটলেন কাশীতে—গুধুড়ি বাজার থেকে পুরানো জ্যোতিষের বই সংগ্রহ করলেন, লুধিয়ানাতে গেলেন মাসিক শতকরা দু'টাকা সুদে টাকা ধার করে। সেখানে কোন্ পাঞ্জাবী জ্যোতিষীর কাছে ভৃগুসংহিতার সম্পূর্ণ পুঁথি আছে, তাই দেখবার জন্য। দু'শোটি টাকা প্রণামী দিয়ে তবে তা একবার নাড়াচাড়া করবার অধিকার পেয়েছিলেন।

এইসব করার ফলে ইস্কুলের চাকরিও বোঁটা শুকিয়ে খসে পড়বার মত হয়েছিল, তিনি নিজেই এবার সে সামান্য যোগসূত্রটি ছিঁড়ে দিলেন, এই বাড়ির বাইরে সাইনবোর্ড লাগিয়ে বসে গেলেন পেশাদারী জ্যোতিষীরূপে। নবদ্বীপে পাঁচটি টাকা দিয়ে জ্যোতির্বিনোদ উপাধি তার আগেই আনানো ছিল।

কিন্তু শখ করে হাত দেখানো এক জিনিস আর টাকা খরচ করে দেখানো আর এক। যে সব বন্ধুবান্ধবরা এতদিন উৎসাহ সহকারে ঘিরে থাকত তারা সরে পড়ল। তা ছাড়া তাদের কাজ তো হয়েই গিয়েছিল। এখন মক্কেল আর আসে না। দিনের পর দিন কাটে—রাত্রির পর রাত্রি। পাশে লেন্সখানা রেখে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় ঝুঁকে পড়ে দীর্ঘ-রাত্রি পর্যন্ত বরদা জ্যোতিষী পড়াশুনো করেন। সে পড়াশুনোয় ব্যাঘাত ঘটে না একটুও। এধারে বাড়িটিও বাঁধা পড়ল। মা অনুযোগ ক'রে ক'রে হাল ছেড়ে দিলেন—'এ আবার কি শখ বাপু? যা হয় একটা চাকরি-বাকরি দেখে নে! মাথা গোঁজবার এ স্থানটুকুও গেলে দাঁড়াবি কোথায়?'

কিন্তু বরদা জ্যোতিষী তাঁর নিজের ভাগ্য তখন দেখে নিয়েছেন।

এই-ই তাঁর বৃত্তি। এই বৃত্তিতেই তাঁর জীবনধারণ করতে হবে। অর্থ ও যশও কিছু কিছু পাবেন তিনি।

বহুদিন ধৈর্য ধারণ ক'রে থাকার পর একটি দু'টি ক'রে মক্কেল আসতে লাগল।

ক্ষুধার্ত বাঘ যেমন ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার খাদ্যের ওপর, তেমনি করেই বরদা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এরাই তাঁর বঁড়শীতে গাঁথা টোপ, যেমন ক'রে হোক এই টোপে মাছ ধরতে হবে।

ইতিমধ্যে বহু রাত্রি জেগে বরদা জ্যোতিষের একটা বিশেষ দিক আয়ত্ত করে-ছিলেন ইচ্ছে করেই। মিছে ক'রে ভাল ভাল কথা সাজিয়ে বলে আর পাঁচজন জ্যোতিষী যেমন ক'রে হাত দেখে তেমন ক'রে দেখতে গেলে পসার জমাতে বহু বিলম্ব—বুদ্ধিমান বরদা তা বুঝেছিলেন। তিনি সে চেষ্টা করেন নি। বিশেষ ক'রে চিনতে শিখেছিলেন দুর্ভাগ্যের রেখাগুলি—জন্মকুণ্ডলীর অমঙ্গলকর অবস্থান-গুলির অব্যর্থ ফলাফল আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি জানতেন অধিকাংশ হাতেই ভালর চেয়ে খারাপ বেশি। খারাপ ফলই সত্য হয় এবং এগুলো অন্য জ্যোতিষী বলে না। তিনি এই অস্ত্রে মক্কেলদের ধরাশায়ী করবেন—তাদের অমঙ্গলের মন্ত্রে নিজের মঙ্গল ডেকে আনবেন।

আর করলেনও তাই!

তাঁর তীক্ষ্ন দৃষ্টি অভ্যাগতদের বুকের মধ্যে কেটে কেটে বসত—তীক্ষ্নতর কণ্ঠের অশুভসূচক ভবিষ্যৎ-বাণী কানের মধ্যে আগুনের মত জ্বলন্ত। কিন্তু তবু তারা আসতে লাগল। মক্কেলের সংখ্যা বাড়তেই লাগল দিন দিন। তার কারণ বরদার কথা কখনও মিথ্যা হয় না। দৈবের মত অমোঘ, মৃত্যুর মত ধ্রুব। প্রত্যেক মানুষের মনে একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে নিষ্ঠুর সত্য সম্বন্ধে। যাতে সে যন্ত্রণা পায়, সেই আঘাত পেতেই বার বার এগিয়ে আসে। মুখে বলে, 'আগে জানতে পারলে তবু সাবধান হওয়া যায়—এ একরকম ভালই!' যদিচ কোন সতর্কতাই কাজে আসে না। বরদার ভবিষ্যৎ-বাণীকে কোন গ্রহযজ্ঞে বা কোন শান্তি-স্বস্ত্যয়নে এড়ানো যায় না। তবে নাকি মানুষ ঠিক নিজের অমঙ্গলে বিশ্বাস করে না, আশা করে শেষমুহূর্তে কোন না কোন উপায়ে সেটা খণ্ডিত হয়ে যাবে—তাই তারা শুনে মূর্ছিত হয়ে পড়ে না, কিম্বা আত্মহত্যা করে না। কারণ বরদার দয়ামায়া নেই—কোন সাংঘাতিক কথাই তাঁর মুখে এড়ায় না। মায়ের মুখের ওপর তার একমাত্র সন্তানের মৃত্যুর সম্ভাবনাটা তিনি অকম্পিত কণ্ঠে শুনিয়ে দিতে পারেন।

বরদা জ্যোতিষীর বাইরের অফিসঘর সেদিন লোকে লোকারণ্য। বরদা ভ্রূকুঞ্চিত করে বসে একখানা ঠিকুজি দেখছেন। চৌকীতে তাঁরই সামনা-সামনি ওঁর ছোট ডেস্কটার অপর দিকে বসে আছে সন্তোষ, তাঁর সহকারী ও ছাত্র। দূর সম্পর্কের কী একটা আত্মীয়তা আছে বরদার সঙ্গে। জ্যোতিষে অনুরাগ থাকায় শিক্ষানবিশী করছে ওঁর কাছে। ভারি কড়া এবং রাশভারি লোক বরদা। মক্কেলরা স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন ভয়ে।

এমন সময়ে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঘরে ঢুকল একটি ছোকরা। এত ব্যস্ত যে কোন দিকে লক্ষ্য করারই সময় নেই। বরদাকে তার নজরই পড়ল না। সন্তোষকেই জ্যোতিষী মনে করে হঠাৎ ওর সামনে হাত জোড় ক'রে বললে, 'এক মিনিট স্যার, ভেরি প্রাইভেট। দয়া করে যদি একটু আড়ালে আসেন।'

সন্তোষ একটু অবাক্ হয়েই ওর মুখের দিকে চাইলে। তারপর ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নিঃশব্দে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে জ্যোতিষীর দিকে। ছোকরাটি তৎক্ষণাৎ বরদার সামনে গিয়ে হাত জোড় করে বললে, 'স্যার, শুনছেন!'

বিরক্ত বরদা চোখ তুলে শান্ত কঠিন দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চাইলেন। বললেন, 'আমি তো আপনার অফিসের ছোট সাহেব নই—আমি জ্যোতিষী, পণ্ডিত, স্যার বলে সম্বোধন না করলেও চলবে।'

মুখ কাঁচুমাচু করে ছেলেটি বললে, 'আজ্ঞে স্যার—মানে পণ্ডিতমশাই—একটু-খানি টাইম যদি আমাকে দেন। ভেরি প্রাইভেট, বড্ড গোপনীয় আর জরুরী।'

'গোপনীয় কোন প্রশ্ন থাকলে আগে থেকে এনগেজমেণ্ট করতে হয়। বাইরে সাইন বোর্ডে লেখা আছে, দেখেন নি?'

অকস্মাৎ একেবারে ওঁর পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পায়ে হাত দেবার ভঙ্গীতে লোকটি বললে, 'একটুখানি সময় দিন স্যার! এবারের মত! জীবন-মরণ সমস্যা। আপনার পায়ে পড়ি।'

অগত্যা জ্যোতিষী উঠলেন। সদর থেকে বাড়ির মধ্যে ঢোকবার যে চলনটা সেটা এই ঘরেরই লাগোয়া। মধ্যে একটা দোরও আছে। সেই দোর দিয়ে চলনে ঢুকে দোরটা সাবধানে ভেজিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'বলুন।'

'আজ্ঞে স্যার, এই খেলার খবরটা—'

'খেলা?' অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকান বরদা।

'আজকের ম্যাচ। সেমি ফাইনাল স্যার। ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান—জানেন না? এইটেই বড় গাঁট। এটা পেরোলেই আর পায় কে! মোহনবাগানের শীল্ড নেওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না। কে জিতবে স্যার—দয়া করে যদি বলেন!'

কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বরদা বললেন, 'আপনি কি এই জন্যেই ডেকে আনলেন এখানে?'

'না স্যার, মানে পণ্ডিত মশাই, আরও একটু কথা আছে। যদি মনে করেন যে ইস্টবেঙ্গলের জেতবার চান্স মানে সম্ভাবনা বেশি তাহলে দয়া করে এমন একটা ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ওদের সেণ্টার ফরোয়ার্ড আর ঐ ব্যাকটার পা ভেঙে যায় —এই মানে গুরুতর কিছু না হ'লেও চলবে, খেলতে শুরু করে একটা স্প্রেন—পা-টা একটু মচকে গেল কি ফিক-ব্যথা ধরল, এমনি আর কি—। একটা যাগ-যজ্ঞি কিম্বা কবচ, কিছু একটা করে দিতেই হবে স্যার!'

ছেলেটি কথা বলতে বলতে উত্তেজনায় ওঁর পায়ের কাছে বসে পড়ে পায়ে হাত রেখে বললে, 'অনেক দূর থেকে এসেছি স্যার আপনার কথা শুনে। বাঁচান স্যার, নইলে মরে যাবো। পাড়ায় আর মুখ দেখাতে পারব না।'

বরদা শশব্যস্ত দু-পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, 'ফি জানেন কত আমার?'

'আজ্ঞে?'

'আট টাকা। টাকা এনেছেন?'

'এই যে স্যার, মানে ম্যাস্টার মশাই। আর যজ্ঞের খরচটা, সেটা কত বললেন না তো!'

আটটা টাকা ওর হাত থেকে নিয়ে নিঃশব্দে সদর দরজা দেখিয়ে দিয়ে বললেন বরদা, 'সিধে চলে যাও। ইয়ারকি করার আর জায়গা পাও নি? অতগুলো লোক বসে আছে, উনি আমাকে বাইরে ডেকে এনে ছেলেখেলা করছেন! যাও শীগ্‌গির, নইলে পুলিসে দেবো!'

'আজ্ঞে স্যার ফি-টা তাহলে—'

'ওটা আমার সময় নষ্ট করার ফি।'

ছেলেটি মাথা চুলকাতে চুলকাতে চলে গেল।

ওখান থেকে ফিরে বরদা আবার বাইরের ঘরে এসে বসলেন। চৌকীর পাশের চেয়ারে যে লোকটি বসেছিল সে হাতটা বাড়িয়ে দিলে তাড়াতাড়ি।

'কী জানতে চান?' তীক্ষ্ম কণ্ঠে প্রশ্ন করেন জ্যোতিষী।

'আজ্ঞে বড্ড টাইমটা খারাপ যাচ্ছে কিনা, কিছু টাকা কোথাও থেকে না পেলে চলছে না। তাই মনে করছি আসছে ভাইসরয়ের কাপে—হে' হে'—আপনারা তো সব জানেন ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান, কোন্ ঘোড়াটা জিতবে যদি দয়া ক'রে বলে দেন—'

'তাহলে তো ঘোড়ার হাত দেখতে হয়। কোন্ ঘোড়া রেসে জিতবে তা মানুষের হাত দেখে কি ক'রে বুঝব! ঘোড়ার হাত দেখতে শিখি নি। আপনার কি চাই?'

পাশের একটু সম্ভ্রান্ত চেহারার লোকটিকে লক্ষ্য ক'রে বললেন শেষের কথাটা।

কিন্তু তিনি উত্তর দেবার আগেই চৌকীর পাশের লোকটি আবার মাথা চুলকে বললে, 'কাইন্ড্লি অন্তত এটা যদি দেখে দেন—কোন অর্থপ্রাপ্তির যোগ আছে কিনা—'

বাধা দিয়ে বরদা বলে উঠলেন, একটু যেন অসহিষ্ণু ভাবেই, 'না, না, কোন অর্থ-প্রাপ্তির যোগ নেই। আপনার চেহারার মধ্যে কোথাও হঠাৎ টাকা পাওয়া নেই। বিশেষত ঘোড়া ধরেছেন যখন—মা-লক্ষ্মী আপনার ত্রিসীমানায় আর থাকবেন না। সন্তোষ, ওঁর ফি-টা নিয়ে নাও—'

তারপর আবার সেই সম্ভ্রান্ত লোকটিকে বললেন, 'হ্যাঁ, আপনার?'

লোকটি কাছে সরে এসে পকেট থেকে ঠিকুজি বার করে ওঁর সামনে রাখলেন। তারপর খুব বিনীত ভাবে বললেন, 'সময়টা বড্ড খারাপ যাচ্ছে ঠাকুর মশাই, একটু যদি দেখে দেন—এমন আর কতদিন চলবে।'

'হুঁ' বলে বরদা গম্ভীর ভাবে ওঁর ঠিকুজিটা একটুখানি খুলে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর কঠিন শান্ত দৃষ্টিতে ওঁর দিকে চেয়ে বললেন, 'আমার কথা আপনি কার কাছে শুনলেন?'

হতভম্ব মক্কেল বললেন, 'কেন বলুন তো?'

'যে বলেছে সে সবটা বলেছে কিনা আমার সম্বন্ধে, তাই জানতে চাইছি। আমি বড় দুর্মুখ। বুঝলেন? ঐ যারা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে একেবারে চাঁদ তুলে দেয় হাতে, আমি তাদের দলে নই। মিছে করে বানিয়ে বলতে পারব না যে, পরের সম্পত্তি হঠাৎ হাতে পড়বে কিম্বা অপুত্রকের ছেলে হবে। ওতে আমার বড় ঘৃণা বোধ হয়।'

তারপর সগর্বে একবার উপস্থিত মক্কেলদের ওপর চোখ বুলিয়ে আবারও বললেন, 'বুঝেছেন? হাতে যদি খারাপ লেখা থাকে তো মুখের ওপরই বলে দেব। সেটা সইতে পারবেন? না পারেন তো এখনও সময় আছে, সরে পড়ুন।'

মক্কেলের গলা শুকিয়ে এসেছে ততক্ষণে। তিনি কোনমতে ঢোঁক গিলে বললেন, 'আজ্ঞে, সে কি কথা! সত্যি কথাটা জানব বলেই তো এসেছি।'

তিনি তখন যেন কতকটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই মক্কেলের শিথিল হাতটা তুলে নিলেন নিজের হাতে। মিনিট খানেক তাঁর সেই ধারালো ছুরির মত তীক্ষ্ম দৃষ্টি হাতখানার ওপর বুলোতেই তাঁর মুখ আরও গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ বাঁ হাতে লেন্স্‌টা টেনে নিয়ে ভাল করে ভদ্রলোকের হাতখানা দেখলেন—পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে। হাতখানা ছেড়ে দিয়ে আর একবার ঠিকুজিটা দেখলেন। তারপর খানিকক্ষণ চোখ বুজে স্থির হয়ে বসে থেকে বললেন, 'এমনিই অদৃষ্ট, ভাল হাত কি একখানাও আসতে নেই আমার কাছে।'

ততক্ষণে মক্কেলের মুখ শুকিয়ে উঠেছে। বক্ষ-স্পন্দন থেমে যাবার যোগাড়। কী যেন একটা বলতে গেলেন, পারলেন না।

বরদা ওঁর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'শুনবেন আপনার ভাগ্যের কথা? ঠিক শুনতে চান? হাত আপনার মোটেই ভাল নয়। আরও খারাপ দিন আসবে আপনার।'

বিহ্বল মক্কেল বলবার চেষ্টা করেন, 'আজ্ঞে তাহলে—তবু ঠিক কি রকম—'

'তিন চারটি গ্রহ বিরূপ—আমি কি করব বলুন। সামনের এক বছরের মধ্যে অনেকগুলি দুর্ঘটনা ঘটবে। অর্থনাশ, স্বজনহানি—মানে বিশেষ কোন প্রিয়জনের মৃত্যু, তার ওপর স্বাস্থ্যের অবস্থা হয়ে পড়বে খুব খারাপ। আর কত বলব বলুন?'

অনেকক্ষণ চুপ করে হতভম্বের মত বসে রইলেন মক্কেল। তারপর শুকনো ঠোঁটের ওপর জিভটা একবার বুলিয়ে বললেন, 'তা এর কোন কি প্রতিকার নেই? গ্রহ-পূজা বা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন-টস্ত্যয়ন?'

'না মশাই, ওসব কথা দয়া করে এখানে বলবেন না। তাহলে যান ঐসব বুজরুকদের কাছে, যারা বোকা বুঝিয়ে আপনাকে আড়াইশ টাকার নবগ্রহ কবচ গছাবে কিম্বা যজ্ঞ করবার খরচা নেবে দেড়শ টাকা! আমি জেনেশুনে অমন করে ঠকাতে পারব না। আচ্ছা আপনার কমনসেন্স্ কি বলে? হাজার হাজার মাইল দূরে বসে যে সব গ্রহ এমন করে আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছেন, যার সুস্পষ্ট ও অভ্রান্ত নির্দেশ আপনার হাতের চামড়ায় রয়েছে আঁকা, তাঁদের হারিয়ে দেবেন তুচ্ছ একটা কবচ পরে কিম্বা আগুনে একটু ভেজাল ঘি ঢেলে? অতই সোজা!'

'আজ্ঞে, তাহলে—তাহলে কি কোন উপায় নেই?' ভগ্ন, স্খলিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন ভদ্রলোক।

'ঈশ্বরকে ডাকুন। তাঁর নাম জপ করুন। যদি দীক্ষা হয়ে থাকে তো ইষ্টনাম জপ করুন, হাজার, দশ হাজার, লক্ষ বার। জপতে জপতে ইচ্ছাশক্তি বাড়বে, পুরুষকার জাগবে। পুরুষকার দৈবকে লঙ্ঘন করে বৈ কি! কত স্বল্পায়ু লোককেও বেশিদিন বাঁচতে দেখলুম। দেখুন চেষ্টা করে। ক্ষতি কি?'

লোকটি কোনমতে একটা নমস্কার করে কয়েকটা টাকা ওঁর সামনে রেখে দিয়ে প্রায় টলতে টলতেই বেরিয়ে গেলেন।

তাঁর দিকে চেয়ে বিদ্রূপের হাসিতে জ্যোতিষীর মুখ ভরে গেল। তিনি বললেন, 'চল্‌ল আহাম্মকটা ছুটে, এখনই কোন বুজরুককে দু'শ আড়াইশ টাকা না দেওয়া পর্যন্ত ওর শান্তি নেই। অথচ একবার করে আমার কাছেও আসবে ঠিক। জানে যে এখানে সত্য কথাটা পাবে ঠিকই।'

অন্য একজন মক্কেলের দিকে চেয়ে বললেন, 'হ্যাঁ দেখি আপনারটা কি ব্যাপার। জন্মতারিখ এনেছেন?'

'না, আজ্ঞে দেখুন, ওটা খুঁজে পাচ্ছি না কিছুতেই।'

'আচ্ছা! তাতে আটকাবে না। গণনা করে বার ক'রে নিচ্ছি—বার তিথি তারিখ কত? কটা বাজল সন্তোষ?'

সন্তোষ ঘড়িটা দেখলে—এগারোটা। জ্যোতিষী ঘাড় গুঁজে অঙ্ক কষতে শুরু করলেন।

দেড়টা যখন বাজল তখনও বরদা বাইরের ঘরে বসে। মক্কেলরা আর নেই বটে,

কিন্তু কাজ আছে। সন্তোষ খাতায় হিসেব লিখছে—বরদা ঠিকুজি তৈরি করতে ব্যস্ত।

মা এসে দাঁড়ালেন।

'হ্যাঁরে, তোদের কি ব্যাপার? খাওয়া-দাওয়া কি ছেড়ে দিলি সব?'

'কেন মা? এরি মধ্যে আজ এত তাগাদা?'

'এরি মধ্যে কিরে? চেয়ে দেখ দেখি কটা বাজল। দেড়টা যে বেজে গেছে।'

'দেড়টা? বলো কি?'

'ঘড়িটার দিকে চেয়ে দ্যাখো না বাছা।'

'তাই তো! সন্তোষ চলো চলো। মার আবার আজ দ্বাদশী, ভুলেই গিয়েছিলুম। ইস—বড় অন্যায় হ'ল।'

ভিতরে গিয়েই ওঁরা মুখ হাত ধুয়ে খেতে বসে গেলেন। রান্নাঘরের সামনের বারান্দায় দুটো জায়গা হয়েছে। বরদা আর সন্তোষকে মা পরিবেশন করছেন।

মা পাতে ডাল দিয়ে ডালের কাঁসিটা নামিয়ে রেখে সস্নেহ তিরস্কারের সুরে বললেন, 'তোর না হয় পয়সা পয়সা করে আহার-নিদ্রা জ্ঞান নেই—ঐ দুধের ছেলেটাকে কি বলে টাঙিয়ে রাখিস এত বেলা অবধি!'

'কে, সন্তোষ?' খেতে খেতে বললেন জ্যোতিষী, 'ভুলে যাচ্ছ কেন মা, ও এখন ছাত্র। এখানে এসেছে ও শিখতে। সেকালে ছাত্ররা গুরুগৃহে কত কষ্ট করত তা ভুলে যাচ্ছ কেন? একালেও টোলে পড়তে হ'লে অনেক কিছু কষ্ট করতে হয়।'

তারপর আরও দু-এক গ্রাস খেয়ে বললেন, 'বুঝলে সন্তোষ, কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না। আমি কি ছিলুম? পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনের মাস্টারি করতুম বৈ তো নয়। নেহাৎ পৈতৃক বাড়িটা ছিল বলেই চলত। তাও পঁয়ত্রিশ টাকা কি ঘরে আসত? পুরানো বই কেনার বাতিকে যে কত পয়সা গেছে তার ইয়ত্তা নেই। তারপর? সব ছেড়ে দিয়ে যখন এই জ্যোতিষ নিয়ে পড়লুম, কম দুঃখ গেছে? পৈতৃক বাড়িটি পর্যন্ত বাঁধা পড়ল—আমার মাঠাকরুন সেজন্য উঠতে বসতে কথা শুনিয়েছেন। তবু হাল ছাড়ি নি। আর কী পরিশ্রমটা না করেছি, দৈনিক আঠারো ঘণ্টা, কুড়ি ঘণ্টা। কোমর বেঁকে গেছে, ঘাড় পিঠে অসহ্য যন্ত্রণা হয়েছে; ঐ বেঁকে বসে পড়াশুনা করার জন্য। তবেই না আজ এই ভিড় দেখছ।'

এই বলে একটু থেমে, আর কয়েক গ্রাস ভাত মুখে তুলে বললেন, 'বুঝলে সন্তোষ, সাধনা চাই। নইলে সিদ্ধি মেলে না।'

মা অম্বল দিতে দিতে বললেন, 'তা তো হ'ল বাছা, ভগবান যখন মুখ তুলে চেয়েছেন, মা-লক্ষ্মীও কৃপা করছেন একটু একটু ক'রে—তখন বাবা এইবার ঘরের লক্ষ্মী একটি নিয়ে আয়। আর কতকাল একা থাকব?'

'হুঁ।' নতমুখে আহার করে যান বরদা, মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে তাঁর।

'হুঁ কিরে? যখনই বলি তখনই হুঁ!'

'হবে হবে।' বরদা উঠে পড়েন, 'সন্তোষ, চটপট খেয়ে নাও। হাতের কাজটুকু সেরে না নিলে চলবে না।'

বাইরের ঘরে এসে কাজ করতে করতে সন্তোষ মাথা তুলে হঠাৎ একসময়ে বলে, 'যদি কিছু মনে না করেন তো একটা প্রশ্ন করি।'

বরদা বিস্মিত হয়ে তাকান মুখ তুলে। তবে চাহনিতে তাঁর স্নেহের আভাস লক্ষ্য করে সন্তোষ ভরসা পায়।

'আচ্ছা আপনি অত দুঃসংবাদ মানুষের মুখের ওপর শোনান কি করে? আপনার দুঃখ হয় না?'

'সত্য কথা জান-তেই ওরা আসে আমার কাছে। নইলে জ্যোতিষী তো ঢের আছে শহরে।'

'আর যত খারাপ ফলই কি আপনার নজরে আসে? অন্য জ্যোতিষীরা তো এমন বলে না! তারা জানে না এত, না—'

'ওটাই আমার বিশেষ শিক্ষা। অন্যরা বলে না বলেই আমার কাছে আসে তারা। দ্যাখো সন্তোষ, ওটাকে ছেলেখেলা বলে মনে করো না। বিশেষ সাধনা করে মানুষের হাতের অমঙ্গলকর রেখাগুলো, মানুষের জন্মকুণ্ডলীর অশুভ যোগাযোগগুলো চিনতে শিখেছি। ঐ হ'ল আমার টোপ। এত জ্যোতিষীর মধ্যে খুঁজে খুঁজে আমার কাছে আসে কেন তারা? আর প্রথম থেকেই কি এসেছিল? অনেক দুঃখ করতে হয়েছে—দিনের পর দিন আসর সাজিয়ে বসে থাকতে হয়েছে হাঁ করে। একটি লোকও কেউ আমার অফিসঘর মাড়ায় নি। ডেস্কের ওপর বাজে ঠিকুজির একটা কাঁপ খুলে দোয়াত কলম পুঁথি নিয়ে বসে থাকতুম—কান পাতা থাকত রাস্তার দিকে। কতদিন মনে হয়েছে জুতোর আওয়াজ বুঝি আমার দোরের সামনে এসেই থামল, সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে পড়েছি ঠিকুজির ওপর, যেন কতই কাজ—কিন্তু অভিনয় ব্যর্থ হয়েছে বার বার। কেউ আসে নি। তাই যখন একজন দুজন এসেছে তখন এমন করেই তাদের চোখের সামনে ভাবী অমঙ্গলের ছবি তুলে ধরেছি, এমন নিষ্ঠুরভাবে সর্বনাশের কথা শুনিয়েছি যে অনেকেই তা সইতে পারে নি, ছুটে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু তারাই আবার এসেছে, শুধু নিজেরা আসে নি, লোক টেনে এনেছে। মিষ্টি কথা তো অনেকেই বলে, কোনটা ফলে কোনটা ফলে না—এমন সাংঘাতিক কথা তো কেউ বলে না। তবে এর ভেতর জিনিস আছে, তাই মিষ্টি কথা বলে মন ভোলায় না—এই হ'ল তাদের বিশ্বাস! বুঝলে?'

সন্তোষ শুধু অস্ফুট কণ্ঠে বললে, 'আশ্চর্য!'

'ঐ থেকেই আমার পসারের সূত্রপাত। দুঃখ পায়, তবু আসে। জানে যে নিষ্ঠুর হলেও আসল সত্যটা শুনতে পাবে। অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করে, যদিও তার ওপর হাল ছেড়ে বসে থাকে না। তা থাকতে পারেও না।—তাহলে পাগল হয়ে যেত মানুষ।'

'কিন্তু তা যখন জানেনই, তখন ঐ মাদুলি বা যজ্ঞের টাকাটা হাতছাড়া করেন কেন?'

'না, না, ওতে আমার বড় ঘৃণা বোধ হয়। জানি যা দুর্লঙ্ঘ্য, যা কিছুতেই নিবারণ করতে পারব না—তার জন্য হাত পেতে টাকা নেব? ছিঃ! ও যে প্রবঞ্চনা।'

এই সময়ে ভেতরের দরজা দিয়ে ওদেরই দোকানঘরের ভাড়াটে মুদি প্রবেশ করল।

'কী ব্যাপার? হারাধন, এমন অসময়ে?'

'ঐ মাসকাবারিটা পৌঁছে দিয়ে গ্যালাম। এই বেলা ঝামেলা কম, বোঝেন না! আপনাদের তো ঘরের ব্যাপার, ধীরি-সুস্থে দিলি চুকে যায়।' তারপরই হাত পা

নেড়ে বললে, 'বাবু, আসছে মাস থেকে আর ভাড়া দেবো না তা বলে দ্যালাম। উল্‌টে আপনারা আমায় কিছু কিছু মাইনে দেবেন।'

'কেন কেন, কি হ'ল আবার তোমার?' হেসে প্রশ্ন করেন জ্যোতিষী।

'হবে আবার কি! দিন নেই রাত নেই ইদিকি যত লোক আসবে সবারে খবর দ্যাও জ্যোতিষী ঠাকুরের দরোজাটা কনে। কেন, আমি ছাড়া কি লোক নেই এ চত্তরি! লোকের ভিড়ি আমার কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে যেতি বসেছে!'

'ও, এই ব্যাপার! আচ্ছা আচ্ছা, হবে'খন্। কতোই বা লোক আসে, ওতেই অত ব্যস্ত হ'লে চল'ব কেন?'

'শুধু কি রাস্তা জিজ্ঞেসা করা? ওটা তো ছুতো। আসল কথা কেমন গোণেন জ্যোতিষী ঠাকুর, কত টাকা ন্যান—হ্যান্ ত্যান্ সাত সতেরো দু-ঝুড়ি কথা। অত কথার উত্তর দিতি গেলি চলে?'

'আচ্ছা আচ্ছা, তুমি যাও।'

হারাধন যাবার সময় বলে গেল, 'মা-ঠাকরুণ আপনারে ভিতরে ডাকে বাবু—যান গা একবার শীগ্‌গির।'

বরদা ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন। ভেতরে এসে ডাকলেন, 'মা?'

সাড়া নেই। মা বোধ হয় ওপরে। সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত উঠে গেলেন বরদা।

মা ছিলেন ঘরে। পাশের বাড়ির রায়-গিন্নী তাঁর কে একটি বিবাহযোগ্যা ভাগ্নীকে এনেছেন। ইচ্ছেটা এক ছুতোয় দেখিয়ে দেওয়া মেয়েটিকে। মাও তাই ডেকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু দৈবের নির্বন্ধ, হঠাৎ একটা দম্‌কা হাওয়ায় ঘরের কপাট-দুটো দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। মা তাড়াতাড়ি উঠে এলেন খুলে দিতে, এধারে সে কথা বরদা জানেন না—ঠেলে খুলতে গেলেন যেমন, সজোরে লেগে গেল মার কপালে। সঙ্গে সঙ্গে কেটে গিয়ে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত।

'উঃ!' বলে মা বসে পড়লেন সেইখানেই। রায়-গিন্নী তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন। মেয়েটাও এল।

বরদা নিঃশব্দে কিছুক্ষণ সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বজ্রাহতের মত। তারপর তুলো আর টিঞ্চার বেনজুইন তাকের ওপর থেকে পেড়ে দিলেন। চড়চড় করে খানিকটা ফরসা ন্যাকড়া ছিঁড়ে দিলেন। তারপর তেমনি নিঃশব্দে নেমে এলেন নিচে। কোন দিকে না চেয়ে বাইরের ঘরের পাশে ওঁর যে পড়বার ছোট ঘর, সেইখানায় ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

সে শব্দে এ-ঘরে সন্তোষ চমকে উঠল। একবার দরজা ঠেলে দেখল ভেতর থেকে বন্ধ। সে বিচিত্র একটা ভঙ্গী করে অস্ফুট স্বরে বললে, 'দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যা!'

সারা বিকেলটাই আর বরদা বেরোলেন না সে ঘর থেকে। ঘরে ঢুকে চৌকির ওপর বসে একটা বাক্স টেনে তা থেকে বার করলেন নিজের কোষ্ঠী। একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তাঁর নিজের হাতে শেষের দিকে ফলাফল লেখা। তার মধ্যে দুটি লাইন চোখের সামনে জ্বলতে লাগল, 'জাতক মাতৃঘাতী', 'জাতকের স্ত্রী কুলত্যাগিনী'।

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যতবার যেমন করে দেখেন—সে শব্দ দুটি তেমনিই তীক্ষ্ণধার ছুরির দীপ্তির মত তাঁর দৃষ্টিকে আঘাত করে।

এই তাঁর ভাগ্যলিপি! ভাগ্যের পরিহাসও বলা যায়!

তিনি যখন পরের হাতের অমঙ্গলকর রেখাগুলি পড়ার জন্য সাধনা করেছেন তখন বোধ করি একবারও এ সম্ভাবনার কথাটা তাঁর মনে আসে নি যে শিক্ষা একদেশদর্শী নয়—সিদ্ধি শুধু সম্পদই আনবে না—সর্বনাশও আনবে।

অর্থাৎ অমঙ্গলটা নির্ভুল ভাবে দেখা তাঁর পেশা থেকে নেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তাই পরের কররেখার ফলাফলের সঙ্গে নিজের ভাগ্যও তাঁর চোখের সামনে অ-দৃষ্ট ভবিষ্যতের অন্ধকার পরদা খুলে স্বচ্ছ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল।

তিনি মাতৃঘাতী, তাঁর স্ত্রী কুলত্যাগিনী।

দুটি সাংঘাতিক ফল। কঠিন, মৃত্যুঘাতী সে কথা।

বার বার বিচার করেছেন বরদা। কররেখায় বিশ্বাস হয় নি—জন্মকুণ্ডলী খুলে বসেছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। জন্মসময় সম্বন্ধে সংশয় হয়েছেন, গণনা করে বার করেছেন নিজের জন্মতারিখ ও সময়। ছুটে গিয়েছেন কাশীতে, গিয়েছেন কাশ্মীরে। ভৃগুসংহিতার সঙ্গে মিলিয়েছেন।

না, ভুল কোথাও হয় নি।

শুধু সময়ই নষ্ট হয়েছে। দিনের পর দিন। এমনি করে—আজ যেমন হচ্ছে।

এধারে বিকেলের দিকে যত মক্কেল আসে সন্তোষ সবাইকেই বলে, 'আজ আর দেখা হবে না ওঁর সঙ্গে। ঠাকুরমশাইয়ের শরীর খারাপ।'

সবাই হতাশ হয়ে ফেরে। ওরই মধ্যে যারা নাছোড়বান্দা এমন দু একজন পীড়াপীড়ি করে। একজন তো ফস করে পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোটই বার করে ফেললে, বললে, 'চাঁদ, এই নাও। আসল কথা এই তো? চাপরাশীকে ঘুষ না দিলে সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে না। তা নাও—এইবার দয়া ক'রে ডেকে দাও।'

'কী বলছেন আপনি এসব?' সন্তোষ চটে ওঠে, 'আমি ওঁকে আটকাবার কে? তা ছাড়া তিনি সুস্থ থাকলে তো এই ঘরেই বসতেন। কেন মিছিমিছি এসব বলছেন?'

'বাবা, তবে আরও কিছু চাও? বলে ফেলো চাঁদ চটপট! মোদ্দা দ্যাখা আমি করবই।'

সন্তোষ রাগ করে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। একটা কাগজ টেনে নিলে।

অদ্ভুত একটা মুখের ভঙ্গী করে লোকটি শিষ দিয়ে উঠল।

'বৌ মান করেছে! চলে যাবে বাপের বাড়ি!'

'যাক্ গে বাবা। যাই। দ্যাখা যখন হবেই না—' সে চলে গেল।

আর একজন ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, 'কী মনে করেন উনি নিজেকে? কলকাতায় কি আর জ্যোতিষী নেই? বারণ কোরো হে ছোকরা, অত দাম বাড়াতে গেলে এক সময়ে আর দাম থাকবেই না। হুঁ! যত সব!'

'যে আজ্ঞে। তাঁকে বলব।' বিনয়ের ভঙ্গি ক'রে বলে সন্তোষ।

কিন্তু কোন কথাই বলা হয় না। কারণ জ্যোতিষী আর বেরোননই না ঘর থেকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়—রাত্রি গভীর হয়ে আসে, তবুও না। সন্তোষ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। সে বার-দুই দরজা ঠেলে দেখেও আসে। মৃদু করাঘাতও করে একবার।

জ্যোতিষীর কানে কিন্তু সে শব্দ পৌঁছয় না—তিনি তখন একটা ম্যাগ্নিফাইং

গ্লাস দিয়ে নিজের হাতের কররেখা দেখছেন। দেখছেন একথা বোধহয় বলা যায় না—চেয়ে আছেন একদৃষ্টে। পাশে অসংখ্য কাগজ ছড়ানো—প্রত্যেকটাতেই ছক কাটা এবং নানাবিধ অঙ্ক কষা। অর্থাৎ বার বার হিসাব করেছেন সেই কথাই বোঝা যায়।

অনেকক্ষণ পরে অস্ফুট কণ্ঠে শুধু বলে উঠলেন, 'এক কথা—যেমন করেই দেখি না কেন। হে নারায়ণ! এ কী করলে!'

রাত যখন এগারোটা বাজল তখন সন্তোষ একাই খেতে বসল। মা ওকে খেতে দিয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার রে সনু? কোন জরুরী কাজ আছে নাকি?'

'কিছুই তো জানিনে মা। এমন কোন কাজের বরাত থাকলে অন্তত আমি তো জানব। সব কথাই তো আমার সামনে হয়।'

'তবে? বসেছে ঘরে, একবারও আর বেরোয় নি?'

'না মা।'

'আশ্চর্য! হ্যাঁরে—অসুখ-বিসুখ করে নি তো? সাড়া পাচ্ছিস?'

'তা পেয়েছি—একবার কাশির শব্দ। কিন্তু সাড়া দেন নি আমাকে।'

মা উদ্বিগ্নভাবে এগিয়ে এসে দোরে ঘা দিলেন। প্রথমে আস্তে, পরে বেশ জোরেই।

'কে ওখানে?' বিরক্ত রুক্ষ কণ্ঠে প্রশ্ন করেন বরদা।

'আমি রে! দোর খোল্।'

'ও! মা!' কণ্ঠস্বর শান্ত হয়ে এল। বরদা এসে দোর খুলে দিলেন।

'কী ব্যাপার খোকা! দুপুর থেকে দোর বন্ধ করে বসে আছিস্, করছিস কি? জলখাবার খেলি না—ভাতও খাবি না নাকি? সাড়া-শব্দ পর্যন্ত নেই, আমি ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছি যে! আয়, খাবি আয়!'

ঈষৎ অপ্রতিভের হাসি হেসে বরদা বললেন, 'একটা জটিল ব্যাপারে বড় ব্যস্ত ছিলুম কিনা। এই একটা নতুন রকমের হিসেব আমাদের জ্যোতিষেরই।'

'আচ্ছা, এখন চ দিকি—খাওয়া-দাওয়া করবি। হিসেব করে করে পাগল হয়ে যাবি যে!'

'আর একটুখানি মা—নইলে আবার সব গোলমাল হয়ে যাবে। তুমি আমার ভাতটা চাপা দিয়ে রেখে শুয়ে পড়গে, সন্তোষকেও শুতে বলে দাও।'

'জানিনে বাছা! আমার হয়েছে এক পাগলের ঘরকন্না!'

মা ভেতরে যাবার জন্য সবে পা বাড়িয়েছেন এমন সময় বরদা পেছন থেকে ডেকে বললেন, 'মা শোনো—তুমি তীর্থবাস করতে চেয়েছিলে, এখন যাবে? এখন যাহোক অবস্থা একটু সচ্ছল হয়েছে তো, কাশীতে গিয়ে থাক না!'

'তা বটে—তীর্থে থাকতে কার না সাধ! তবে—তোর একটা দেখাশুনো করার লোক হ'ল না! ঘরসংসারই বা দেখে কে? তোকে ভাত জল দেওয়া—'

একটু অসহিষ্ণু ভাবেই বললেন জ্যোতিষী,সে ভাবনা আর কতকাল ভাববে মা! তুমি মরে গেলে আমাকে কে দেখবে?'

'সে তখন আলাদা কথা। বেঁচে যতদিন আছি, না ভেবে কি করি বল্!'

'তাহলে তুমি যাবে না?'

'তুই একটা বিয়ে করিস তো যাই।'

'সে আমি পারব না।'

'তাহলে আমিও যাব না।'

'বেশ, তুমি বলেছিলে বলেই বলা!' বরদার কণ্ঠস্বরে একটু বিরক্তিই শোনায়।

মার কণ্ঠস্বরে এবার অভিমান ঘনিয়ে এল, 'এই বুড়ো বয়সে শরীর ভেঙে আসছে, এখন একা কোন্ নির্বান্ধব পুরীতে থাকব বল্ দেখি! বড় ভয় করে রে!'

'বেশ তো, সঙ্গে যদি লোক দিই?'

'কেন বল্ দেখি, আমাকে তাড়াবার জন্যে এত তাগিদ? আমি না বিদেয় হলে বুঝি বিয়ে করবি নি? বৌকে কষ্ট দেব ভাবছিস? লোকই না হয় দিলি, হঠাৎ যদি মরে যাই, এক ছেলে তুই, একটু জলও পাবো না?'

'তা বটে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন বরদা, 'আচ্ছা মা, তুমি শোওগে—এটুকু সেরে নিই আমি।'

আবার দোর বন্ধ করে দেন তিনি।

রাত ক্রমে গভীর থেকে গভীরতর হয়। বরদা একভাবেই বসে থাকেন। তাঁর মনের মধ্যে কে যেন বার বার মেঘমন্দ্রস্বরে বলতে থাকে—'তুমি তোমার মাকে হত্যা করবে, তুমি মাতৃঘাতী!'

একটা যেন অব্যক্ত যন্ত্রণায় তাঁর মুখের শিরা-উপশিরাগুলোর আকুঞ্চন হ'তে থাকে। ললাটে ঘাম দেখা দেয়।

বাইরের আকাশে তখন দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে বুঝি আরও দুর্যোগ।...

গভীর রাত্রে হঠাৎ মার ঘুম ভেঙে যায়। তিনি দেখলেন, বরদার শোবার ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। তাড়াতাড়ি ধড়মড় করে উঠে গিয়ে দেখলেন, ভাত তেমনি চাপা দেওয়া—লোক নেই।

দ্রুত নেমে এসে বরদার পড়ার ঘরের দোর ঠেলে খুলে ফেললেন, তেমনি কাগজ-পত্র চারিদিকে ছড়ানো, ডেস্কের ওপর টেবিল ল্যাম্পটাও তেমনি নিঃশব্দে জ্বলছে। তারই মধ্যে ক্লান্ত বরদা পেছনের দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুমন্ত মুখ থেকেও যেন দুশ্চিন্তার ছাপ মিলোয় নি।

জ্যোতিষী যেদিন মুটের মাথায় হোমের জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ি ফিরলেন, সেদিন সন্তোষের তো বিস্ময়ের সীমা রইলই না, মা-ও কম অবাক্ হলেন না।

বরদা বললেন, 'মা, হাত ধুয়ে বেশ ভাল জায়গা দেখে এগুলো তুলে রাখো তো।'

'কি রে, এগুলো? এ যে হোমের আয়োজন দেখছি!' তিনি অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন।

'হ্যাঁ মা, হোমেরই আয়োজন। তুমি তুলে রাখো।'

'কিসের হোম রে?'

'আগে কাজে বসি, তারপর বলব।'

'তা এ লোহার কড়া কেন একটা?'

'ঘি জবাল দেব।'

'ঘি?'

'হ্যাঁ—গরু আনতে বলেছি অযোধ্যাকে, দুধ দুয়ে নিয়ে সর পাড়িয়ে ঘি জবাল দেব। বাজারের গাওয়া-ঘিয়ে বিশ্বাস নেই মা।'

মা সব গুছিয়ে তুলে রাখলেন। সন্তোষ কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে শুধু প্রশ্ন করলে, 'আপনিও যাগ-যজ্ঞ মানেন তাহলে?'

হয়ত সে কণ্ঠে বিদ্রূপের সুর ছিল। জ্যোতিষীর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'মানব কিনা শেষ পর্যন্ত, তারই পরীক্ষা এটা। সেইজন্যই কোন খুঁত রাখব না—ঘি নিজে জবাল দেব। টোলে গিয়ে অধ্যাপকের কাছে উচ্চারণ শিখব। তন্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে যাগ করব—নিখুঁত করে। অনেকদিন উড়িয়ে দিয়েছি ওদের কথা—দেখাই যাক্ না।'

এই বলে এবার তিনিই একটু বিদ্রূপের হাসি হাসলেন; বললেন, 'মানুষকে কত কী যে করতে হয় তেমন তেমন পাকে পড়লে! কে জানে একদিন হয়ত আমিই এসবে ঘোর বিশ্বাসী হয়ে উঠব!'

কেমন একটা দুর্বোধ্য ভাব ফুটে ওঠে তাঁর মুখে।

জ্যোতিষীর যে কথা সেই কাজ। তিনি নিজে হাতে ঘি জবাল দিলেন। প্রত্যেকটি জিনিস নিজে গুছিয়ে নিলেন—উপবাস করে রইলেন আগের দিন, শুদ্ধ দেহে, পাঁজি দেখে সময় ঠিক করে হোম করতে বসলেন। হোম শেষ করে কবচখানা বিধিপূর্বক মায়ের বাঁহাতের বাহুমূলে বেঁধে দিলেন।

মা আরও অবাক্ হয়ে বললেন, 'এ আবার কী রে?'

'কবচ মা। তোমার যে ফাঁড়া আছে।'

'তুই যে এসব মানতিস না?'

'কে জানে—আমার না-মানার জন্য যদি তোমার কোন অনিষ্ট হয়! তোমার একটা বড় ফাঁড়া আছে মা, শীগ্‌গিরই।'

'এই এতবড় যাগটা করলি কি তুই আমার জন্যে? বলিস কি রে? কী পাগল রে তুই!' মা অবাক্ হয়ে গালে হাত দেন।

'কেন, পাগল কেন?'

'আমি তো বুড়ো হয়েছি—না হয় মলুমই। তার জন্যে এত?'

'সে তুমি বুঝবে না।'

এই বলে, কথাটা ঘুরিয়ে দেবার জন্যই, একেবারে আসন ছেড়ে বেরিয়ে এসে বললেন, 'এখন আমাকে কিছু খেতে দেবে বলতে পারো? কাল থেকে উপোস চলছে—'

অপ্রস্তুত হয়ে মা বললেন, 'এই যে বাবা, দিই।'

কিন্তু কথাটা এইখানেই মিটল না। মুখে মা যতই কথাটা উড়িয়ে দেন তুচ্ছ বলে—মনের মধ্যে কথাটা নিয়ে তোলাপাড়া চলতেই থাকে।

শেষে একদিন বরদাকে খেতে দিয়ে কথাটা পাড়লেন, 'বাবা, একটা কথা বলব তোকে, রাখবি?'

'বিয়ের কথা ছাড়া যা বলবে তুমি, তাই রাখব।'

কিন্তু তবু যেন কেমন সচকিত হয়ে ওঠেন বরদা।

মা বললেন, 'এই তো? কথা দিচ্ছিস?'

বরদা রাজী হয়ে ঘাড় নাড়তে বললেন, 'ফাঁড়ার কথা তো বাবা কিছু বলা যায় না—তাছাড়া এমনিও তো প্রায় ষাট বছর বয়স হ'ল, কবে আছি কবে নেই। তুই আমাকে নিয়ে একটু তীর্থ করিয়ে দে। তাছাড়া শুনেছি, তীর্থ-স্নানে অনেক সময় গ্রহফাঁড়া কাটে।'

বয়সের উল্লেখ করার সময় বরদা একবার চমকে উঠেছিলেন শুধু, তাছাড়া আর কোন ভাবান্তর দেখা গেল না তাঁর। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, 'যদি লোক দিই সঙ্গে?'

'না, সে হয় না। মরণের সময় তুমি কাছে থাকবে না—এ হ'তে পারে না! তোমাকে ছাড়া আমি যাবো না।'

'মরণের কথা কে বলছে মা—এরি মধ্যে?'

'জীবন-মরণের কথা কি বলা যায়? তা ছাড়া তুই-ই তো বললি ফাঁড়া আছে!'

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বরদা প্রশ্ন করলেন, 'বেশ, তাই হবে। তোমার কাছে কত টাকা জমেছে আজ পর্যন্ত?'

মনে মনে হিসেব করে নিয়ে মা বললেন, 'আটশো হবে।'

'ঐটেই নিও সঙ্গে।'

'ওটা তো দেনা শোধের জন্য রেখেছিলি!'

'থাকগে। আর তো মোটে হাজার টাকা দেনা, শোধ হবেই। মহাজনের দেনা থাক আপাতত, দেখি মায়ের ঋণ কিছু শোধ করা যায় কিনা!'

এই বলে একটু হাসলেন জ্যোতিষী।

'যাবে রে যাবে।'

মা সস্নেহে ওঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

এর পর সত্যিই ওঁরা একদিন বেরিয়ে পড়লেন বোঁচকা-বুঁচকি বেঁধে। ঘরে রইলো শুধু সন্তোষ।

ভারতবর্ষকে বামাবর্তে পরিক্রমা করলেন ওঁরা। কলকাতা থেকে পুরী, সেখান থেকে সিংহাচলম্, গোদাবরী, পক্ষীতীর্থ, রামেশ্বর হয়ে দ্বারকা, প্রভাস, পুষ্কর, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, কুরুক্ষেত্র, প্রয়োগ সেরে কাশী এসে নামলেন।

বেনারস স্টেশনের কাছাকাছি এসে বরদা বললেন, 'মোটামুটি তোমার সব সারা হয়ে গেল মা। বাকী রইল শুধু গয়া—যাবার পথে একবার গয়ায় নেমে বাবার পিণ্ডটা দিয়ে যাবো।'

'সে যা হয় করিস বাবা, এখন কাশীতে দুদিন বিশ্রাম করি। বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। বুড়োবয়সে এত ছুটোছুটি কি পারি?'

'তা থাকো, দুটো দিন কাশীতেই থাকো। আমিও একটু জ্যোতিষটা ঝালিয়ে নিই। আমার গুরু আছেন এখানেই।'

কিন্তু ধর্মশালায় গিয়ে উঠে শুনলেন যে, ওখানে তিন দিনের বেশি থাকতে দেয় না।

মাকে বললেন, 'মা, তুমি তো কাশীতে ক-দিন থাকবে বললে কিন্তু এখানে যে তিন দিনের বেশি থাকতে দেয় না।'

মা বললেন, 'তাই তো! তা এখানে যেসব যাত্রী-তোলা বাড়ি আছে শুনেছি

গঙ্গার ধারে—তারই একটা সন্ধান দ্যাখ্ না। দুটো দিন তবু গঙ্গার ধারে থাকি!'

'তাই দেখি না হয়। যা সব বদমাইস শুনেছি এখানের লোক!'

'কী আর বদমাইসি করবে বাবা! আমাদের কী আছে যে নেবে!'

অগত্যা বরদাকে যাত্রী-তোলা বাড়ির সন্ধানে যেতে হয়। বাঙ্গালীটোলার মোড়ে যে চায়ের দোকান, সেখানে গিয়েই প্রথমে খোঁজ করলেন, 'মশাই, এখানে কোথায় দু-চার দিনের জন্য ঘরভাড়া পাওয়া যায় বলতে পারেন?'

ঐ দোকানেরই একটা বেঞ্চে একটি ক্ষয়াঘষা লোক অর্ধনীমিলিত নেত্রে বসে বসে চা খাচ্ছিল, হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত ছিট্‌কে উঠে পড়ল, একলাফে বরদার সামনে এসে বললে, 'বিলক্ষণ! একে বলে যোগাযোগ। সবই বাবা বিশ্বনাথের কৃপা।' এই বলে উদ্দেশে একবার হাত তুলে নমস্কার করে বললে, 'সাধ করে কি আর বাবার চরণ-তলায় পড়ে আছি!'

বরদা অবাক্ হয়ে চেয়ে আছেন লক্ষ্য করে লোকটি মধুর হেসে বললে, 'বুঝলেন না? আপনি সকালে বেরিয়েছেন কোথায় একটা ঘরভাড়া পাওয়া যায় খুঁজতে আর আমিও সন্ধানে বেরিয়েছি কোথায় ঘরের ভাড়াটে পাওয়া যায়—একেবারে ঠিক দুটি লোকেরই হঠাৎ দেখা হয়ে গেল! বাবার যোগাযোগ বলব না তো কি বলুন?'

হাতে কাঁচের গেলাসে তখনও একটু চা বাকী ছিল, এক চুমুকে সেটা পান ক'রে নিয়ে ঠকাস্ করে গ্লাসটা ওদের টেবিলে বসিয়ে রেখে গামছায় মুখ মুছে বললে, 'চলুন—ঘরটা দেখিয়ে দিই।'

বরদা ওর বেশভূষা ও কথাবার্তায় একটু সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি এক পা-ও না নড়ে বললেন, 'আমি গঙ্গাতীরে বাড়ি খুঁজছি।'

'বিলক্ষণ। গঙ্গাতীর কি বলছেন? গঙ্গাগর্ভে বলতে পারেন। তোফা ঘর, দেখলেই আপনার পছন্দ হবে। জানালাটি খুলে ঘরে শুয়ে থাকবেন—মনে হবে যেন গঙ্গার ওপরেই আছেন। শুয়ে শুয়ে দেখবেন বাবুভাইরা কেমন সব নৌকো করে চলেছে!'

'ভাড়া কত আপনার ঘরের?'

'কিছু না, কিছু না। ঠিক যেমনটি চান। বামুনের গরু আর কি, অল্প খাবে, বেশি দুধ দেবে—আবার নাদবেও বেশি। দৈনিক চার আনা করে দেবেন, তাতেই আমি খুশি। ওটা কি আর ভাড়া নেওয়া—নামমাত্র, নামমাত্র!'

'দৈনিক চার আনা হলে তো মাসে সাড়ে সাত হয়—সে কি আর নামমাত্র হ'ল?'

'বিলক্ষণ! হ'ল বৈ কি। সে আপনার ধরুন মাসের হিসেব ধরলে তো আর চলবে না। এ হ'ল গে খুচরো। আজ আছেন, কাল নেই। বেশি একটু দিতে হবে বৈকি!'

তারপর বলতে গেলে বরদাকে একরকম ঠেলেই ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নামিয়ে এনে লোকটি প্রশ্ন করলে, 'মশায়?'

'আমরা ব্রাহ্মণ।'

'বিলক্ষণ! ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণো গতি। তাহলে তো আর কথাই নেই। উঠেছেন কোথায়? ধর্মশালায়? চলুন আপনার মালগুলো নিয়ে আসিগে—আর অমনি মা-লক্ষ্মীদের—'

'আগে আপনার ঘরটা দেখি।' অবাক্ হয়ে বলেন বরদা।

'কিছু না, কিছু না।' কোন দরকার নেই। বিলক্ষণ! সে ঘর দেখলে আপনার পছন্দ না হয়ে যায়! খাসা ঘর। বিশেষত যখন আপনিও ব্রাহ্মণ, আপনাকে কি আর ঠকাতে পারি। চলুন, চলুন!'

অবশ্য ঘরটা সত্যিই মন্দ নয়। মালপত্র নিয়ে এসে উঠে আটদিনের আগাম ভাড়া দুটি টাকা ওঁকে দিয়ে ঘর দখল নিলেন বরদা।

বাড়িওয়ালা ব্রাহ্মণ ছুটোছুটি হাঁক-ডাক যথেষ্ট করলেন। তারপর গামছায় ঘাম মুছে গামছারই খুঁটে হাওয়া খেতে খেতে বললেন, 'এই যে এসে উঠলেন—একবারে নিশ্চিন্ত। বাঘের পেটে রইলেন।'

বরদা সভয়ে বললেন, 'কী সর্বনাশ! বলেন কি?'

'বিলক্ষণ! তবে আর বলছি কি? আমার নাম উপেন চক্কোত্তী—কাশীসুদ্ধ লোকে চেনে। কে কোন ব্যাটা পান্ডা এসে ভোগা দিয়ে নিক্ দিকি একটি পয়সা! টুঁটি চেপে ধরব না? মা-ঠাকরুন নিশ্চিন্ত হয়ে বাজার করতে পারেন—কেউ যদি একটি পয়সা দাম বেশি চায় কি ভোগা দিয়ে নেবার ফিকির করে, অমনি উপেন চক্কোত্তীর নাম করবেন—দেখবেন জোঁকের মুখে নুন পড়বে একেবারে। হেঃ হেঃ!'

গর্বের হাসি হাসেন উপেন চক্রবর্তী।

বরদার মা এতক্ষণে প্রশ্ন করার সুযোগ পেলেন, 'আপনার আর কে কে আছে এখানে?'

'আমার মা?' উপেন একটু ম্লান হয়ে যান, 'সবাই ছিল—বাবা বিশ্বনাথের ইচ্ছা—আসল যে তাকেই টেনে নিলেন। আজ পুরো দু'বছর হ'ল পরিবার নেই। মা বাবা তো কবেই গত হয়েছেন—এখন আছে দুটি মেয়ে আর তিনটি ছেলে। তার মধ্যে বড় ছেলেটাকে দিয়েছি একটা মনোহারীর দোকানে—চাকরি করে। আর দুটো পড়ে এখানে চিন্তামণির ইস্কুলে। কোনমতে ফ্রি করে দিয়েছি হাতে পায়ে ধরে। আর ঐ বড় মেয়েটা—ও মা সরমা, কোথা গেলি! বলে হাঁক পাড়েন উপেন চক্রবর্তী কথার ফাঁকেই।

'এই যে বাবা আসছি—' বলে সরমা এসে দাঁড়ায়।

বরদা কৌতূহলী হয়ে মেয়েটির দিকে তাকালেন। বেশ সুশ্রী মেয়েটি, যৌবন ও স্বাস্থ্যে টলোমলো। ময়লা কাপড়ে ও নিরাভরণ অবস্থাতেও সে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'এই যে মা-ঠাকরুন, ইটিই আমার বড় মেয়ে। বড় লক্ষ্মী মেয়ে মা। কী বলব বড় গরীব আমরা, নইলে রাজরাজড়ার ঘরে পড়বার মত মেয়ে!'

সরমা চোখ নত করে দাঁড়ায় ওঁর কথা শুনে।

'পেন্নাম কর্, মা পেন্নাম কর্। ওঁরাও ব্রাহ্মণ।...হ্যাঁ, যা বলছিলাম—বড় লক্ষ্মী মেয়ে মা। উনি তো আজ দু'বছর নেই, তার আগেও প্রায় বছরখানেক ভুগেছেন—সংসারটার ভার সবই তো ওর মাথায় বলতে গেলে। ভাইবোনদের দেখা, আবার তেমন যাত্রী যদি আসে, খেতে চায় খোরাকী দিয়ে, সে সব রান্না-বান্না ওকেই করতে হয়—'

'বলেন কি?' বরদা বলে ওঠেন, 'ওকে দিয়ে হোটেলের রান্না রাঁধান?'

'কী করব বাবু, বড় গরীব আমরা বোঝেন তো, খোরাকী যা দেয় তা থেকেও দু'পয়সা বাঁচে। এমনি করে যোগেযাগে সংসার চালানো। নইলে এই তো বাড়িটুকু সম্বল, বারোমাস কিছু ভাড়াটে থাকে না। আমার আবার দুর্দান্ত

হাঁপানির ব্যায়রাম। শীতকালে অকর্মণ্য হয়ে পড়ি একেবারে। শুধু কি খাওয়া-চা জলখাবার, তার ওপর সতেরো রকম টাইস!...তবে শুধু বাসাড়ে বেটাছেলে ভাড়াটে দিই না। আর তেমন লোক দেখলে ওকে বেরোতেও দিই না তাদের সামনে। কিন্তু করতে ওকেই তো সব হয়।'

তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'ঐ তো ভাবনা হয়েছে মা-ঠাকরুন—গাছের মত মেয়ে হয়ে রয়েছে, আপনার কাছে বলতে কি বয়সও আঠারো উনিশ হ'ল—কী ক'রে যে পাত্রস্থ করব এই এখন ভাবনা। জানি না বাবা বিশ্বনাথের মনে কি আছে!'

'আহা! তা তো বটেই—ভাবনা হবে না? বাপমায়ের কী ঘুম হয়?' মা সহানুভূতির স্বরে বলেন, 'তা বাবা, তুমি ভেবো না—এই ছেলে আমার খুব বড় জ্যোতিষী, ও তোমার মেয়ের হাত দেখে দেবে'খন।'

'বিলক্ষণ! তাই নাকি, তাই নাকি! এ একেবারে সাক্ষাৎ বাবার যোগাযোগ।'

উপেন হাত তুলে উদ্দেশে নমস্কার করেন।

সরমা ততক্ষণে কাজে লেগে গিয়েছিল। মা বিছানা খুলছিলেন দেখে নিঃশব্দে তাঁকে সরিয়ে পরিপাটি করে দুজনের বিছানা বিছিয়ে দিলে। বরদা সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন। বোধহয় লক্ষ্য করছিলেন ওর কর্মনিপুণ সুডৌল ও সুগৌর হাত দুটি, সহসা চমক ভাঙল উপেনের কথায়। উপেন মেয়ের হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে ওঁর সামনে এনে বাঁ হাতখানা তুলে ধরে বললেন, 'দেখবেন বাবু একটু—আমি রাত্রে ঘুমোতে পারি না, মুখে অন্নজল ওঠে না ওর কথা ভেবে। যদি আজ চোখ বুজি তো কাল ওকে বাজারে নাম লেখাতে হবে হয়ত।'

মা বলে উঠলেন, 'ছিঃ ছিঃ, কী যে বলেন!'

বরদাও একটু বিব্রত বোধ করলেন। বললেন, 'এখনি কেন, এর পর ভাল করে দেখে দেব'খন।'

'সে তো ভাল করে দেখবেনই বাবু, এখন যদি একটু চোখ বুলিয়ে দেন।'

বরদা তবুও হাতটা ধরলেন না। একটু কঠিন দৃষ্টিতে উপেনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু আমি বড় দুর্মুখ—যা সত্যি তাই বলব হয়ত। সইতে পারবেন?'

'আজ্ঞে, বিলক্ষণ! এতই সইছি আর আপনার কথাটুকু সইতে পারব না?'

বরদা আর কথা না বলে সরমার হাতখানা তুলে ধরলেন চোখের সামনে, তারপর মিনিটকতক চোখ বুলিয়ে বললেন, 'না, এ হাত ভালই। সতী, সৌভাগ্যবতী হবে আপনার কন্যা।...আচ্ছা এর পর ভাল করে দেখব একদিন।'

এই বলে আর উপেনের দ্বিতীয় অনুরোধের অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে গেলেন বরদা বাজারের দিকে।

সরমা আবার কাজে লেগে গেল।

বিছানা বিছিয়ে বাক্স দুটি যত্ন করে দেওয়ালের দিকে সরিয়ে রেখে ঘরের আলনায় ওঁদের জামা, চাদর, এখনি পরবার মত কাপড়-চোপড়গুলি গুছিয়ে রেখে, বাসনকোসনগুলো রান্নার জায়গায় তাকের ওপর সাজিয়ে রেখে ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিট্‌ফাট করে ফেললে।

সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সস্নেহে মা বললেন, 'তা তোমার বাবা মিছে কথা

বলেন নি মা। সত্যিই তুমি লক্ষ্মী মেয়ে।'

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কোন্ শ্রেণী মা?'

উত্তর দিতে গিয়ে সরমার গাল দুটি লাল হয়ে উঠল। চোখ নত করে বললে, 'রাঢ়ী শ্রেণী।'

'আমরাও তাই।'

একটু পরে আবার প্রশ্ন করলেন, 'তোমাদের পদবী কি জান মা?'

একটু বিস্মিত হয়ে চোখ তুলে সরমা বললে, 'ঐ যে বাবা বললেন, চক্রবর্তী।

'পাগলী মেয়ে—ওটা পদবী নয়, ওটা উপাধি। চক্রবর্তী ভট্টাচার্য রাঢ়ী বারেন্দ্র সব শ্রেণীতেই থাকে—উপাধি ওটা। গোত্র কি মা তোমাদের?'

'শাণ্ডিল্য।'

'তবে বাঁড়ুযো। আমরা হলুম মুখুয্যে—ভরদ্বাজ গোত্র।'

তারপর একটু এগিয়ে এসে ওর মুখখানি তুলে ধরলেন আলোর দিকে। লজ্জায় সরমার চোখেব পাতা দুটি বুজে এসেছে। লজ্জা ও পরিশ্রমে মুখখানি লাল—ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। সেদিকে চেয়ে চেয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন মা, 'তোমার বাবা ঠিকই বলেছেন মা, এমন মেয়ে রাজারাজড়ার ঘরেই মানায়। তুমি গান গাইতে পারো মা?'

লজ্জিত হাসিমুখে উত্তর দিলে সরমা, 'সামান্য জানি মা, এই শুনে শুনে যেটুকু হয়। সে লোকের সামনে গাইবার মত নয়।'

'গাইবে মা একটা গান! আমি আবার গান বড্ড ভালবাসি। কে জানে কেন তোমাকে দেখেই মনে হ'ল তুমি গান গাইতে জানো—'

সরমা একটু ইতস্তত করে একটা গান ধরলে।

বিকেলের দিকে মা হঠাৎ এসে বললেন, 'একটু তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে দিকি বাবা, কেদারে যাবো আজ।'

'আজই?'

'আর কবে যাবো বাবা। ঐ করে রোজ রোজ হয়ে উঠছে না।'

'কাল সকালে না হয় যেও—'

'না, না। কাল শুক্রবার, সকালে সঙ্কটা মায়ের বাড়ি যাবো। আজই চ, বেড়াতে বেড়াতে ঘাট দিয়ে দিয়ে চলে যাই, ফেরবার সময় নৌকো করে ফিরব।'

'চলো তবে।' জামা আর চাদর নিয়ে বরদা বেরিয়ে পড়লেন।

কেদারে পৌঁছে মা বললেন, 'একটু বোস্ বাবা তুই এখানে, আমি একটা ডুব দিয়ে নিই—'

'এমন অসময়ে ডুব কি? সকালে তো স্নান করেছ। একটু জল স্পর্শ করে নাও।'

'হ্যাঁ, কী যে বলিস! এসেছি কেদার ঘাটে—একটা ডুব দেব না? আবার কবে হবে না হবে!'

তিনি সিল্কের চাদরটা খুলে রাখলেন। আর একটা কাপড়ও ছিল চাদরের

মধ্যে জ্যোতিষী লক্ষ্য করেন নি। অর্থাৎ প্রস্তুত হয়েই এসেছেন। বরদা আর কিছু বললেন না। আহ্নিক করবার একটা কাঠের পাটার ওপর চেপে বসলেন। সেইখান থেকেই একটু জল তুলে নিয়ে মাথায় ছিটিয়ে দিলেন।

ওধারে মা জলে নেমে দু পা এগিয়ে গিয়েই বলে উঠলেন, 'এ যে বড্ড পেছল রে, ও বাবা, ধর ধর আমাকে—'

তখন আর স্নানার্থী কেউ কাছে নেই। অপরে কেউ এসে হাত ধরবে এ সম্ভাবনা কম। তাছাড়া অত ভাববারও সময় ছিল না। বরদা জামাকাপড় সুদ্ধই নেমে পড়লেন জলে। কিন্তু তাড়াতাড়িতে তিনিও সাবধান হন নি, তাঁরও পা গেল পিছলে, সেই অবস্থাতে সামলাবার আগেই তিনি গিয়ে পড়লেন মার ওপরে। হাত ধরার আর অবসর হ'ল না। চোখ মেলবার আগেই মা কোথায় তলিয়ে গেলেন।

তারপর?

চেঁচামেচি, ছুটোছুটির অন্ত রইল না। আশপাশ থেকে লোকজন ছুটে এল, দূর থেকে মাঝিমাল্লারা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল—যা হবার সবই হ'ল। অনেক কষ্টে বহু চেষ্টায় দেহও উঠল কিন্তু সে মৃতদেহ।

বরদা কথা কইলেন না, কাঁদলেন না—চুপ করে পাথরের মত বসে রইলেন। শুধু একজন যখন এসে প্রশ্ন করলে, 'মশাই, এখানে কোথায় উঠেছেন, একটু বলুন? আপনার আত্মীয়স্বজনকে তো খবর দিতে হয়!' তখন শুধু বললেন, বেশ শান্ত-কণ্ঠেই বললেন, 'আত্মীয়স্বজন তো কেউ নেই সঙ্গে। তবে যে বাড়িতে আছি সে বাড়িওলাকে যদি দয়া করে খবর দেন। আমি তো এখানকার কাউকেই চিনি না—'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, সেই কথাই তো বলছি—তাঁর ঠিকানাটা?'

'চৌষট্টি যোগিনীর গলি—উপেন চক্রবর্তী মশাইয়ের বাড়ি জিজ্ঞাসা করলেই হবে। নম্বরটা আমার মনে নেই।'

চারিদিকে ভিড়, জনতা নানা কথা নানা আলোচনা করতে লাগল। তার মধ্যে বসে রইলেন বরদা নির্লিপ্ত নির্বিকার। চোখ তাঁর শুষ্ক, রুক্ষ। সে চোখে আছে শুধু জ্বালা। সেদিকে চেয়ে কৌতূহলী জনতার আরও কিছু প্রশ্ন করবার থাকলেও করতে পারলে না।

একটু পরেই ভিড় ঠেলে উপেন চক্রবর্তী এগিয়ে এলেন। সঙ্গে সরমা।

'বিলক্ষণ! কী করে এমন সর্বনাশ হ'ল বাবু। য়্যাঁ! এই যে দেখলুম মা-ঠাকরুন আমার সুস্থ মানুষ, কথাবার্তা কইছেন। য়্যাঁ!...হায় হায়, এ কী সর্বনাশ হ'ল! আমারই দুর্বুদ্ধি, যদি সঙ্গে আসি তো এমন কাণ্ডটা হয় না।—য়্যাঁ, হায় হায় হায়!'

সরমা কিন্তু ততক্ষণে একেবারে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে বরদার। কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ না করে সে আস্তে আস্তে বললে, 'আপনি উঠুন। এখন এমন বিহ্বল হ'লে তো চলবে না। মায়ের শেষ কাজ, আপনাকেই তো করতে হবে। এঁরা তো শুধু জটলা করছেন—আপনি না লাগলে তো কাজ কিছু হবে না।'

'তা বটে!'

এতক্ষণে বরদা বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন চারিদিকে। উঠে দাঁড়াতে গেলেন, মাথাটা কেমন টলে উঠল। সরমা ওঁর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিল, সে চট করে হাতটা ধরে ফেলতে সে-যাত্রা সামলে নিতে পারলেন। সরমাই হাত ধরে ওঁকে নিয়ে

গেল মায়ের মৃতদেহের কাছে।

ক্লান্ত, কম্পিত কণ্ঠে বরদা প্রশ্ন করেন উপেনকে, 'চক্কোত্তি মশাই, এ নিয়ে কি আবার পুলিস-হাঙ্গামা হবে! মায়ের মৃতদেহটা নিয়ে কাটা-ছেঁড়া হ'লে বড্ড আঘাত পাব।'

'বিলক্ষণ! আমার নাম উপেন চক্কোত্তি, কাশীতে আমার জন্মকম্ম—আটচল্লিশ বছর কাটল আমার এখানে। এটুকু কি আর ক্ষ্যামতা নেই? তবে বাবু, কিছু যে খরচ আছে—আমি তো গরীব জানেন—'

ইতস্তত করতে লাগলেন উপেন। বরদা ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন, কত দেব?'

'এধারেও তো খরচা আছে। খাটিয়া একটা কিনতে পাঠাতে হবে। এখন আপাতত দ্যান গোটা ত্রিশেক টাকা—দেখি কত লাগে। আপনার জামা আর গেঞ্জি খুলে মা সরমাকে দ্যান—আপনাকে তো ছুঁয়ে বসতে হয়। আমি একবার চট করে সতীশবাবু দারোগার বাসাটা ঘুরে আসি—'

যন্ত্রচালিতের মত বরদা জামা আর গেঞ্জি খুলে সরমার হাতে দিলেন। তারপর গিয়ে মায়ের পা দুটি কোলের ওপর তুলে নিয়ে বসলেন। কিন্তু মায়ের মুখের দিকে চাইতে পারলেন না। স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ওপারে, রামনগরের দিকে।

মণিকর্ণিকার ঘাটে নিয়ে যাওয়া হ'ল মৃতদেহ। উপেনবাবুর ব্যবস্থায় সব হাঙ্গামা নির্বিঘ্নেই মিটে গেল। চিতা সাজানো থেকে শুরু করে শবদাহ পর্যন্ত কিছুই দেখতে হ'ল না বরদাকে। মুখাগ্নি সেরে তিনি একটু দূরে এসেই বসে রইলেন। দৃষ্টি তাঁর শূন্য, যেন কোন্ এক নিঃসীম দূর দিগন্তে নিবদ্ধ।

ধূ-ধূ চিতা জ্বলছে। আস্তে আস্তে পাশে এসে বসল সরমা। একটু পরে খুব মৃদু কণ্ঠে বললে, 'আপনার কি কান্না পাচ্ছে না? কাঁদবারই তো কথা। মায়ের যেটুকু চিহ্ন ছিল তাও শেষ হয়ে যাচ্ছে—'

'কে বললে যাচ্ছে? গেলে তো ভাল হ'ত!' যেন অত্যন্ত রূক্ষকণ্ঠে বলে ওঠেন বরদা। সে কণ্ঠে যেন সুতীক্ষ্ন জ্বালা।

তারপরই অপ্রস্তুত হয়ে ওঠেন। চমক ভেঙ্গে যায়।

'ও!...তুমি? না, কান্না আমার পাচ্ছে না সরমা। কান্না পেলে যে ভাল হ'ত তাও বুঝি।'

তারপর একবার চিতার দিকে চেয়ে দেখলেন, উপেন চক্কোত্তি বাঁশ দিয়ে মৃতদেহ ভেঙ্গে ভেঙ্গে দিচ্ছেন। শিউরে উঠে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'তোমার বাবা বলছিলেন আজই সকালে যে তাঁর আর আমার দেখা হওয়াটা বাবা বিশ্বনাথের ইচ্ছা। এ তাঁর যোগাযোগ। কথাটার মূল্য এখন বুঝছি। ওঁর ঋণ শোধ হবার নয়।'

নতমুখে উত্তর দিলে সরমা, 'বিপদের দিনে মানুষকে যদি মানুষে না সাহায্য করে তো কে করবে বলুন? একে ঋণ কেন মনে করছেন? এটুকু না করলে আমাদেরই কর্তব্যে ত্রুটি থাকত।'

বাড়িতে ফিরে এসে বরদা প্রশ্ন করলেন, 'গঙ্গাগর্ভে মারা গেছেন কাশীধামে—এও কি অপঘাত ধরবেন? আমার ইচ্ছা আমি দশদিন অশৌচ পালন করি।'

এখনও তাঁর কণ্ঠস্বর তেমনি শান্ত, দৃষ্টি তেমনি শুষ্ক। শুধু আর যেন কোন জ্বালা নেই তাতে, আছে অবসাদ।

সরমা বিছানা সরিয়ে জানালার কাছে একটা কম্বল এনে পেতে দিয়েছে ততক্ষণে। তাইতেই বসে পড়লেন বরদা অবসন্ন হয়ে। তারপর আবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন উপেনের মুখের দিকে।

'বিলক্ষণ! সে আমি এখনই বিধেন নিয়ে আসছি পণ্ডিতদের কাছ থেকে।...এই তো আশেপাশেই সব রয়েছেন—অন্নদা তর্কচূড়ামণি, কৈলাস মীমাংসাতীর্থ, নিত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ, বৃন্দাবন তর্কবাগীশ—সবাই রয়েছেন হাতের কাছে, যাবো আর আসব।'

অকস্মাৎ মুখ তুলে বললেন, 'বরদা, আমার তো কেউ নেই। সেখানেও না—আমার ইচ্ছা কাশীতেই তাঁর কৃত্য যা কিছু সেরে যাই। সুবিধা হবে কি?'

একটু অসহায় ভাব ফুটে ওঠে ওঁর মুখে।

উপেন বললেন, 'হবে বৈ কি! বিলক্ষণ। যতক্ষণ এ হাড় কখানা আছে আপনার কোন চিন্তা নেই জানবেন। সব হয়ে যাবে। পয়সায় সাহায্য করতে পারব না বটে—বড়ই গরীব জানেন তো—কিন্তু গতরে যেটুকু করতে পারি তার কোন ত্রুটি হবে না জানবেন। বিলক্ষণ, এখানে সারবেন না তো কোথায় যাবেন, এসে যখন পড়েছেন বাবার কাছে তখন—মা সরমা, তবে আমি ঐ বিধেনটা নিয়ে আসি, তুমি বরং একটু জলখাবারের আয়োজন করে দাও—'

'আজ রাত্রে তো দুধ আর ফল ছাড়া কিছুই খাওয়া চলবে না বাবা—'

'না—না। আমাকে মাপ করবেন চক্রবর্তী মশাই। এখন আর আমাকে কিছু খেতে বলবেন না। সে যা হয় ওবেলা হবে—'

উপেন এবার বিপন্ন মুখে সরমার দিকে তাকালেন। সরমা বললে, 'তুমি যাও না বাবা কোথায় যাচ্ছিলে। আসবার সময় একটু ফলটল দেখে নিয়ে এসো। আমি আর সব ব্যবস্থা ঠিক করে রাখছি—'

'বিলক্ষণ! মা যখন রয়েছে—আচ্ছা আমি দৌড়ে ঘুরে আসছি।'

চার

পণ্ডিতদের সম্মতি নিয়ে বরদা দশদিন অশৌচ পালন করবেন স্থির করলেন। আসল কথা তাঁর শরীর ও মন দুই-ই অবসন্ন হয়ে এলিয়ে পড়েছিল। কিছুতেই মন ছিল না। একদিনে শ্রাদ্ধ করার কথা মনেও আনা যায় না।

বরদা উপেনবাবুর ও সরমার যত্নে মুগ্ধ হন। বিশেষ করে সরমা। অস্খলিত ও অতন্দ্র তার সেবা। কোথাও কোন খুঁত থাকে না—কোন ত্রুটি না। সে হবিষ্যির সব যোগাড় করে দেয়, বসিয়ে খাওয়ায়। রাত্রের দুধ ও ফল ঠিক করে রাখে। শ্রাদ্ধের বাজার করে দেন উপেনবাবু বরদাকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে, সরমা সব সাজিয়ে গুছিয়ে তুলে রাখে। একটি একটি করে তিল বাছে। যেন ওরই সব দায়—বরদা শুধু নির্লিপ্ত উদাসীনের মত বসে বসে দেখেন।

উপেন হয়ত এসে বলেন, 'বাবু—দানের সব জিনিস কিনে কি হবে? তার চেয়ে

পুরুতকে বলে দিলে তো হয়, সে একসেট গুছিয়ে নিয়ে আসবে'খন—তাকে মূল্য ধরে দিলেই হবে। সে তো মনে করুন বেচবেই, আর তখন তো আর পুরো দাম পাবে না, আধা কড়িতেই বেচতে হবে। মিছিমিছি আপনার পুরো দামটা লাগে কেন?'

বরদা ক্লান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'সে যা ভাল বোঝেন করুন।'

উপেন হয়ত আর একবার ঘুরে এসে বলেন, 'তাহলে লোক কজন নিমন্ত্রণ করব বলুন, দ্বাদশটি?'

'তাই বলুন।'

'হ্যাঁ—তার কম আর ভাল দেখায় না। নাকি আর কিছু বেশি বলবেন?'

'আপনি যা ভাল বোঝেন।'

'বিলক্ষণ, আপনার কাজ আপনি যা বলবেন তাই হবে। তা আমি বলি কি, দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ খাওয়ান আর দ্বাদশটি অধ্যাপক বিদায় দিন। ওটা কাশীর একটা রেওয়াজ। এমন বেশি কিছু খরচ নয়—ধরুন একটা করে পেতলের সরা, দুটো মিষ্টি, একটা পৈতে, একটা সুপুরি, আর এক সিকি দক্ষিণা। এ একেবারে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। কী বলেন?'

নিরাসক্ত কণ্ঠে উত্তর আসে, 'তাই করুন।'

শুধু বরদা মুখ খোলেন এক এক সময় সরমার কাছে।

একদিন সরমা খাবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করছে, 'না না—ওটুকু দুধ আপনাকে খেতেই হবে, কখনও ফেলে উঠতে পারবেন না। উঠুন দেখি—আমি অনর্থ করব বলে দিলাম।'

'কী অনর্থ করবে?' হেসে ফেলেন বরদা।

'সে তখন দেখবেন।' কৃত্রিম কোপের সঙ্গে সরমা জবাব দেয়।

'আচ্ছা খাওয়ার জন্যে কেন অমন করো বল তো?'

'আহা, চেহারাটা কি দাঁড়িয়েছে তা তো আর আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু আমাদের দেখতে হচ্ছে যে।'

'চেহারাটা আমার চিরদিনই ঐরকম সরমা। তা ছাড়া আজ না হয় তুমি জোর করে খাওয়ালে, কিন্তু এরপর? কলকাতায় তো রাঁধুনী বামুনের রান্না খেতে হবে, নয়ত স্বপাক। কোনমতে সেদ্ধপক্ক, ভাতেভাত! তখন কে খাওয়াবে অত যত্ন করে, চেহারার দিকেই বা কে নজর রাখবে?'

সরমার কে জানে কেন, হঠাৎ চোখে জল এসে গেল ওঁর ঐ অসহায় বলার ভঙ্গীতে। সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'যত্ন করে খাওয়াবার, নজর রাখবার লোক একটা নিয়ে এলেই পারেন। বয়স তো ঢের হয়েছে, অনেক আগেই আনা উচিত ছিল।'

'তা বটে!' একটা ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জোর করে বরদা পরিহাসের হাসি টেনে আনেন, 'এবার দেখছি তাই আনতে হবে। যা আরামের অভ্যাস তুমি করে দিলে! কিন্তু যাকে-তাকে ধরে আনলেই কি আর সে তেমন করে দেখবে তোমার মত?'

'আমি তো ছাই দেখছি।' লজ্জায় লাল হয়ে উঠে সরমা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

পরের দিনও আবার ওদের সেই ঝগড়া। সরমা কাছে বসে খাওয়াচ্ছিল। বরদা

হাত গুটিয়ে নেবার উপক্রম করতেই ব্যাকুল হয়ে বলে উঠল, 'না না, ঐকটা তো ফল, তা আর ফেলে রাখতে পারবেন না। সব সাপটে খেতে হবে। এটুকুও যদি না খান তো বাঁচবেন কি করে?'

তারপর একটু থেমে বললে, 'আর বাড়ি গিয়েও যা খুশি তাই করতে পারবেন না, ভাল করে খাবেন পেট ভরে। আমি মাথার দিব্যি দিয়ে দেব কিন্তু!'

'যদি সে দিব্যি না মানি?' কেমন একরকম তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চান বরদা ওর দিকে, 'তুমি গিয়ে পাহারা দেবে?'

'হ্যাঁ, দেব তো!' হঠাৎ বলে ফেলে সরমা ঝোঁকের মাথায়।

'তাই যদি যাও তো আর দিব্যি দেওয়ার দরকারটা কি? তুমিই গিয়ে খাইও। তোমার বাবার চাকরি ছাড়িয়ে আমার চাকরিতেই বহাল করা যাবে।'

সরমার দুই গালে কে যেন সিঁদুর লাগিয়ে দেয়। সে এক রকম ছুটেই পালায়।

কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই বরদা বহুক্ষণ ওর সেই চলে-যাওয়ার পথটার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। তারপর নিজেরই একটা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দে যেন চমক ভাঙে, তাড়াতাড়ি আচমন করে উঠে পড়েন।

যথারীতি এবং যথানিয়মে শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেল। অধ্যাপক বিদায় ব্রাহ্মণ ভোজন থেকে শুরু করে নিয়মভঙ্গ পর্যন্ত উপেনের তদ্বিরে কিছুই আটকাল না—সমস্তটা সুশৃঙ্খলে হয়ে গেল।

এবার বরদার বাড়ি ফেরার পালা। সরমা বিষণ্ণমুখে ওঁর জিনিসপত্র গুছিয়ে দিতে বসল, দুই চোখ ওর ছলো-ছলো।

বরদারও মনটা যেন খারাপ লাগে কিন্তু কতটা মার জন্য আর কতটা এদের ছেড়ে যাওয়ার জন্য বোঝেন না। তিনি আজ উপেনকে আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গেই প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলেন। বললেন, 'আপনাদের ঋণ শোধ করার নয়, তবু যদি কিছু করবার থাকে তো বলুন। আপনাদের সামান্য কিছু উপকার করতে পারলেও খুশি হবো।'

উপেন খানিকটা চুপ করে থেকে বললেন, 'সত্যি-সত্যিই উপকার করতে চান? করবেন?'

'নিশ্চয় করবো—অবশ্য সাধ্যে কুলালে।'

'কথা দিচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, দিচ্ছি।'

'তাহলে আমার কন্যাটিকে আপনি দয়া ক'রে গ্রহণ করুন। ও আপনার খুব অনুপযুক্ত হবে না।'

'সে কি?' শিউরে চমকে ওঠেন বরদা।

'বিলক্ষণ! ব্রাহ্মণের কন্যাদায়ের কাছে আর কি আছে বলুন! আর আপনিও ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণোগতি।'

'কিন্তু উপেনবাবু, বিবাহ যে আমি কখনই করব না স্থির করেছি।'

'ও, স্থির করেছেন? সেটা কোন বাধা নয়। আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন যে সম্ভব হলেই আপনি আমার অনুরোধ রাখবেন। এক্ষেত্রে অসম্ভব কোন বাধা তো নেই!'

'আপনি—আপনি সে-সব কথা বুঝতে পারবেন না উপেনবাবু, সে হবার নয়!'—ব্যাকুল হয়ে বলেন বরদা।

মধু-তিক্ত কণ্ঠে উপেন বলেন, 'হবার যে নয় তা তো জানি। তাই তো চুপ করেই ছিলাম। দরিদ্রের কন্যাকে কে আর নিতে চাইবে বলুন! নেহাৎ আপনি কথাটা তুললেন বলেই—'

অভিমানের সুর তাঁর কণ্ঠে।

বরদা চোখ বুজে একবার মাকে স্মরণ করবার চেষ্টা করলেন। নিজের কর-রেখার ছবিটা মনে আনতে চাইলেন। কিন্তু সেসব মিলিয়ে একাকার হয়ে গিয়ে জ্বলজ্বল করে ফুটে উঠল, একটি যৌবন-বিকশিত মুখের সরস পরিপূর্ণ ওষ্ঠাধর—এবং দীর্ঘ পক্ষ্মবেষ্টিত দুটি চোখের আবেশভরা চাহনি। সরমা!

অস্ফুট-কণ্ঠে বরদা বলে ওঠেন, 'নিয়তি!'

উপেন ব্যগ্র ভাবে প্রশ্ন করেন, 'কী বললেন?'

'না, কিছু না। তা হবার নয় উপেনবাবু, মাপ করবেন আমাকে।'

উপেনবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ম্লান মুখে চলে গেলেন। বরদা ঘরে ঢুকে দেখলেন সরমা তার জিনিসপত্র গুছাতে গুছোতে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে, চোখে তার জল, মুখ থমথম করছে।

বরদা অত বোঝেন নি। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকেই বললেন, 'রিক্সা তৈরি সরমা, তাড়াতাড়ি করো লক্ষ্মীটি।'

অকস্মাৎ সরমা উঠে দাঁড়িয়ে ঈষৎ তীক্ষ্ম কণ্ঠেই প্রশ্ন করলে, 'কিন্তু বিয়ে করবেন না কেন তাই শুনি? বিয়ের বয়স হয় নি আপনার?'

বরদা বিস্ময়ে কিছুক্ষণ যেন কথাই কইতে পারলেন না। তারপর বললেন, 'এ—এসব কথা তোমাকে আলোচনা করতে নেই সরমা।'

'আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দিন। আমার ঢের বয়েস হয়েছে, কী কথা আলোচনা করতে আছে না আছে তা জানি।'

বরদা তবু ক্রুদ্ধ হলেন না। বরং তাঁর চোখেমুখে একটা অপরিসীম ব্যথাই ঘনিয়ে এল। ধীরে ধীরে বললেন, 'বিয়ের বয়স আমার হয়েছে বৈ কি সরমা, হয়ত সে বয়স উত্তীর্ণ হয়েই গেছে।'

'তবে কেন বিয়ে করবেন না? আমি আপনার উপযুক্ত নই? আরও কত ভাল মেয়ে আশা করেন আপনি?'

'ছি সরমা! তুমি হঠাৎ বড় উত্তেজিত হয়েছ, কী বলছ তুমি তাই জানো না। তুমি আমার উপযুক্ত নও? তোমার মত মেয়ে পেলে যে কেউ তার জীবন সার্থক বোধ করবে।'

'তবে? তবে কেন আপনি রাজী হচ্ছেন না? বলুন, জবাব দিন?'

উত্তেজনায় তার চোখ জ্বলছে। পাগল হয়ে উঠলো নাকি সরমা?

বরদার তবু ধৈর্যচ্যুতি ঘটল না। বরং নিরতিশয় ম্লানমুখে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'তুমি বিশ্বাস করো, সে কারণ কাউকে জানাবার নয়। কিন্তু সত্যিই আমি অপারগ। আমাকে মাপ ক'রো।'

সরমার মুখ দিয়ে চরম নির্লজ্জতার কথাই বেরিয়ে গেল, 'তবে আপনি আমাকে আশা দিয়েছিলেন কেন? কেন আমাকে বলেছিলেন—'

'তোমাকে আশা দিয়েছিলাম? কী সর্বনাশ! কী বলেছিলাম তোমাকে?'

'জানি না, মনে করে দেখুন। সেরকম আশা না দিলে আমার বাবা কখনও উপযাচক হয়ে আপনার কাছে একথা পাড়তেন না। বাবা গরীব হতে পারেন,

ভিখারী নন। আমিও এমন কিছু তাচ্ছিল্যের জিনিস নই যে, দুদিন খুশিমত প্রয়োজনমত দু'টো মিথ্যে স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে খেলা করবেন, আর তারপর ছেঁড়া জুতোর মত ফেলে চলে যাবেন।'

'সরমা, সরমা—কী বলছ তুমি? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না!' ব্যাকুল হয়ে ও'ঠেন বরদা।

'থামুন!' বাধা দি'য় সরমা ব'লে ওঠে, 'আপনার ও মিষ্টি কথার ন্যাকামি ঢের শুনেছি। কী মনে করেন আমাদের? গরীব হতে পারি কিন্তু ব্রাহ্মণের মেয়ে। যান—আপনি বাড়ি চ'লে যান। কিন্তু এও ব'লে রাখছি আপনা'ক, যদি আমি সতী মায়ের মে'য় হই, আমার বাবা যদি এখনও পর্যন্ত প্রত্যহ গায়ত্রী জপ ক'রে জল খেয়ে থাকেন তো ছ-মা'সর মধ্যে এখানে এসে সেধে আমা'ক ঘরে নিয়ে যেতে হ'বে!'

স্তম্ভিত বরদাকে আর কথা কইবার অবকাশ না দিয়েই সুটকেসের ডালাটা জোর ক'রে বন্ধ করে দিয়ে সরমা ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

পাঁচ

বাড়ি ফিরলেন বরদা অত্যন্ত মনমরা হয়ে।

সন্তোষ একা বাড়িতে ছিল, ঠিকে-ঝি কাজ ক'রে দিয়ে যেত। ফলে ঘরের কোণে কোণে আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়ে উ'ঠছে।

মার হাতের সেই পরিচ্ছন্ন ঘরকন্না ম'নে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় সরমার নিখুঁত গৃহস্থালী। বড় অস্বস্তি বোধ ক'রেন। অপটু হাতে সন্তোষের সঙ্গে রান্না করতে যান—ডাল পুড়ে ও'ঠে—তরকারীতে এত নুন হয় যে মুখে করা যায় না।

মক্কেলদের সঙ্গেও ব্যবহারটা দিন দিন উগ্র হ'য়ে ওঠে।

একদিন একটি মক্কেল এসে কথায় কথায় আর একজনকে চুপিচুপি বল'ছ, 'হয় তো কচুপোড়া, কোনটাই মে'ল না শেষ পর্যন্ত। ও কত জ্যোতিষী দেখলাম!'

হঠাৎ যেন বাঘের মত গর্জন করে উঠ'লেন বরদা, যে কাজটা করছিলেন সেটা ফেলে এদিকে ফিরে বললেন, 'তাহলে এখানে এ'সছেন কন? কী করতে এসেছেন? আমাকে পরীক্ষা কর'তে?'

লোকটি থতমত খেয়ে আম্‌তা আম্‌তা করতে লাগল, 'না—মানে এই—তবুও—'

বরদা বললেন, 'আমি আপনার হাত দেখব না। যান্ আপনি চ'লে যান।'

লোকটির মুখ শুকিয়ে উঠল। সে বললে, 'না, না, আপনি রাগ করবেন না। ওটা কথার কথা।'

'বুঝেছি কিন্তু আমি আপনার হাত দেখব না।'

'আপনি মশাই টাকা নেবেন হাত দেখবেন। আমি কাকে কি বলছি সে খোঁজে আপনার দরকার কি?' সে লোকটিও বিরক্ত হয়ে ওঠে।

'আপনার টাকায় আমার দরকার নেই। আপনি বেরিয়ে যান।' বরদার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

'ও! আপনার মত জ্যোতিষী ঢের আছে। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব? দুটো পয়সার জন্যে হা-পিত্যেশ করে তো বসে আছেন—তার আবার এত তেজ কেন? কি

মিছে কথাই বা বলেছি, এই তো শুনলুম কাশীতে আপনার মা অপঘাতে মরেছেন—আপনি ভারি জ্যোতিষী, সেটা আগে গুণে দেখতে পেরেছিলেন?'

অকস্মাৎ যেন একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন বরদা। চৌকী থেকে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়েন হতভাগ্য লোকটির ওপর।

'যান, যান—এখনি বেরিয়ে যান বলছি!' প্রায় ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দিলেন তাকে। তারপর খানিকক্ষণ গুম খেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বাকী মক্কেলদের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমাকে মাপ করবেন, আজ আর আমি কাজ করতে পারব না। মনটা সুস্থ নেই।'

একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আপনার মশাই অমন আচরণটা করা ঠিক হয় নি। তারপর আবার আমাদের এমন করে ডিস্‌মিস্‌ করে দিলেন। আপনার এটা ব্যবসা, আমরা খদ্দের—এত মেজাজ দেখালে চলবে কেন?'

বরদা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বক্তার মুখের দিকে চেয়ে। যেন কথাগুলো তাঁর মাথাতেই ঢুকল না। তারপর একসময় ঘুম ভেঙে ওঠার মত ক'রে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, কাজটা অন্যায় হয়ে গেছে। আমাকে মাপ করবেন। সত্যিই মাথাটার আজ ঠিক নেই, কাজ করতে গেলে ভুল হবে। আমার অপরাধ নেবেন না।'

তিনি নিজের আসনে এসে বসলেন।

সবাই একে একে চলে গেলেন। কেবল রইলেন একটি বেঁটে টাকওয়ালা ভদ্রলোক। সন্তোষ তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইতে তিনি এগিয়ে এসে মাথাটাথা চুলকে বললেন, 'পণ্ডিত মশাই, শুনছেন?'

'কী?' বরদা ভ্রূ কুঁচকে চান।

'তিন-চারটে জমি বায়না করার কথা আছে। আজই বিকেলে।'

'বেশ, তা আমি কি করব বলুন?'

'জমি কি আমি ঘি দিয়ে ভেজে খাব? আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই!'

'আজ্ঞে, আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'তা কেন বুঝবেন! ন্যাকা! ভাজা মাছটি উল্‌টে খেতেও জানেন না!'

ধমক দিয়ে উঠলেন বরদা, 'যা বলবেন ভদ্রভাষায় বলুন। না বলতে পারেন তো চলে যান।'

জোঁকের মুখে নুন পড়ল যেন। লোকটি হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, 'না—না—এ মাপ করবেন, আমার মুখটাই ঐ রকম। সে কথা নয়, বলছিলুম কি, জমিতে কিছু স্পেকুলেশ্যন করব স্থির করেছিলুম, তারই তিনটে বায়না আজ। তা, ঐ মানে হাতটা যদি একটু দেখতেন—মানে সময়টা কি রকম যাচ্ছে, শেষে লোকসান না হয়। মানে আজই বায়না কিনা!'

'ও, হাত দেখতে হবে? মাপ করবেন, আজ আর দেখতে পারব না।'

'একটুখানি? স্লাইটলি? মানে এক চমক?' হাতখানা ঠিক চোখের সামনে মেলে ধরলেন, 'একটা গ্লান্‌স্‌ আর কি!'

'না, না, না, কেন বিরক্ত করছেন এমন করে?' গর্জন করে ওঠেন বরদা।

'ও বাবা! এ যে বগা ফোঁস!'

বরদা ততক্ষণে আবার সামলে নিয়েছেন।

'আপনারাই এমনি করে আমায় অপ্রকৃতিস্থ করে তোলেন। বলছি আজ মাথার ঠিক নেই। ভুল দেখব সেইটে ঠিক হবে?'

'আজ্ঞে না। তা কখনও হয়? ভুল আবার ঠিক হয় কি ক'রে? তবে তিনটে বায়না কিনা! শালারা কি আর শুনবে?' চিন্তিত মুখে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন।

বরদা শূন্যঘরে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন।

খানিক পরে সন্তোষ বললে, 'উনুনে কি আঁচ ধরাব?'

'আজ আর ভাল লাগছে না সন্তোষ, বরং—বরং কিছু চিঁড়েটিঁড়ের ব্যবস্থা দেখ।'

'আমিই না হয় চেষ্টা করি না? চিঁড়ে খেয়ে আর কদিন কাটবে? আপনার যা চেহারা হয়েছে! আমরা যে আর তাকাতে পারছি না!'

চমকে ওঠেন বরদা। সরমার কথাগুলোই মনে পড়ে যায়, যে কথাটা ভুলতে চেয়েছিলেন।

আপনমনে অস্ফুট কণ্ঠেই বলেন, 'এমন করে আর কদিন চলবে? তাই তো!'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই সন্তোষের দৃষ্টিতে যে অপরিসীম বিস্ময় ফুটে উঠেছে সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন। তাড়াতাড়ি ওর দিকে চেয়ে বলেন, 'আচ্ছা তাই যাও, সন্তোষ—দ্যাখো যদি পারো দুটি ভাতেভাত নামাতে—'

বসে থাকেন চুপ করে। কাশীর কথা মনে পড়তে থাকে। সরমার যত্ন। প্রতি-দিনের খুঁটিনাটি। শেষের কথাগুলো।

ভাত খেয়ে আঁচিয়ে উঠলে সরমা তার আঁচল দিয়ে হাত-পা মুছে দিয়েছে কতদিন। অশৌচের সময় দীর্ঘদিনের অব্যবহারে পাছে জুতো শক্ত হয়ে যায়, তাই কবে কখন নিজেই সে বাজার থেকে কালি বুরুশ আনিয়ে নিয়েছিল। প্রত্যহ পরিষ্কার করে রাখত।

সামান্য পরিশ্রমেও ওর ঠোঁটের ওপর মুক্তার মত ঘামের বিন্দু জমে উঠত। ওঁকে যখন ধমক দিত সে খাওয়ার সময়, তখন মুখের যে ভঙ্গীটি প্রকাশ পেত তাতে কী অনুপম লাবণ্যই ফুটে উঠত।

এমনি সব এলোমেলো—খাপছাড়া খাপছাড়া কথা।

বাতাসে ক্যালেণ্ডারের পাতা ওড়ে—তিন, চার, পাঁচ, ছ' মাস উড়ে উলটে যায়। বরদার জীবনেও ছ'মাস কেটে গেল।

বরদা আবার কাশীতে এসে উপস্থিত হলেন। একটু যেন কুণ্ঠিত ভাব, দ্বিধা ও সঙ্কোচের সঙ্গেই ওঁদের বাড়িতে এসে উঠলেন।

'বিলক্ষণ! আসুন আসুন, বাবু আসুন।' উপেনের চোখমুখে খুশি উপচে পড়ে।

সরমাও এসে ওঁকে প্রণাম করে। তার মুখেও অভিমান নেই, বিরক্তির আভাস নেই। ওঁর হাত থেকে স্যুটকেসটা নেয় তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে। ঘরে রেখে একটা পাখা নিয়ে আসে বাতাস করতে।

বরদা বেশি কথা না বলে একেবারে কথাটা পাড়েন, 'দেখুন আমি আজ আপনার কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছি। আপনার কন্যাকে প্রার্থনা করি।'

সরমা পাখা রেখে চলে যায়। কিন্তু ওর মুখে এবার খুশির হাসি, চোখে জল।

'বিলক্ষণ! এ তো আমার ভাগ্য। এমন কপাল কি আর হবে সরমা মায়ের!' আমার তো ভাবনায় ঘুম হয় না!'

'তাহ'লে তার আগে এই কটা মাসিক আর সপিণ্ডকরণ সেরে নিতে হবে। সে ব্যবস্থাটাও তো আপনাকে করে দিতে হয়।'

'হবে বৈ কি। সব হবে। আপনি কিছু ব্যস্ত হবেন না। মুখে-হাতে জল দিন, স্নানাহার করুন—সব ঠিক করে দিচ্ছি। কিন্তু বাবু, আমি বড় গরীব জানেন তো—বিবাহে কিছুই ব্যয় করার সংগতি নেই।'

'তা জানি। ব্যয় সব আমারই। আমার বংশ বা বাড়িঘর সম্বন্ধে যদি কিছু খোঁজ করাতে চান—'

'বিলক্ষণ! আমার নাম উপেন চক্কোত্তি। আটচল্লিশ বছর কাশীতে কাটল। মানুষ দেখ'লে চিনতে পারি। সেসব কিছু ভাববেন না বাবু, আপনি বিশ্রাম করে সুস্থ হোন।'

ঘরের মধ্যে ঢুকে বরদা ডাকলেন, 'সরমা?'

সরমা কাছে এসে দাঁড়াল। কিন্তু মুখ যেন আর কিছুতেই সে তুলতে পারে না—হাজার চেষ্টা করেও।

'তোমার কথাই সত্য হ'ল সরমা। আমি সেধেই এসেছি।'

'ওসব কথা আর তুল'বেন না। ওতে আমার অপরাধ হয়। তখন ঝোঁকের মাথায় পাগলের মত কি বলেছি—' অতিকষ্টে বলে সে।

'কিন্তু তুমি আমাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারবে তো? ভাল করে ভেবে দ্যাখো। বয়সে তোমার চেয়ে হয়ত অনেক বড় হবো—চেহারাও তো এই—'

'জানি না—যান!' সরমা ছুটে পালায়। ওর সেই লজ্জা-রাঙা মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন বরদা।

উপেন পাঁজিটা হাতে করে ঘরে ঢোকেন।

'বিবাহের দিনটিন কিছু দেখছেন কি বাবু? আপনি তো নিশ্চয় দেখেছেন—অতবড় জ্যোতিষী—আপনার মত আর কে দেখতে পারবে?'

'দিন? হ্যাঁ—দিন আছে এর ভেতর ঢের। কিন্তু তার আগে ওর জন্মলগ্নটা পেলে ভাল হ'ত। ঠিকুজিকুষ্ঠী কি কিছু ওর আছে? নিদেন জন্মের তারিখটা?'

উপেন একটু ইতস্তত করলেন। হয়ত ভাবলেন কি জানি, এই উপলক্ষ যদি বিয়েটা ভেঙ্গে যায়?

বললেন, 'জন্মের তারিখটা কোথায় একটা লেখা ছিল বটে কিন্তু সেটা আপাতত খুঁজে পাচ্ছি না। তা তাতে কি খুব অসুবিধা হবে?'

'থাকগে। এমনিই একটা দিন দেখে নেব। তার আগে কাল অমাবস্যাতে শ্রাদ্ধটা সেরে ফেলতে হবে যে।'

'বিলক্ষণ! এখনই বাজার করে ফেলছি আমি। ও আর কতক্ষণ! এ কাশী জায়গা, পয়সা ফেললে সব মেলে।'

যথাসময়ে বিয়ে হয়ে গেল। কুশণ্ডিকা বৌ-ভাত এখানেই সেরে বরদা বাড়ি ফিরলেন। ফুলশয্যার রাত্রে আবারও সেই প্রশ্ন করলেন বরদা, 'তাহ'লে তোমার জেদই বজায় রইল সরমা—কী বলো? কিন্তু এরপর অনুতাপ করবে না তো এই জেদের জন্যে? দেখো—'

তারপর বুকের মধ্যে থেকে জোর করে ওর মুখখানা তুলে ধরে বললেন, 'না না,

চোখ বুজে থাকলে চলবে না। ভাল করে চেয়ে দ্যাখো—ঘর করতে পারবে তো আমার সঙ্গে? ঘেন্না করবে না কোনদিন আমাকে?'

'ছি ছি! কি বলেন আপনি যা তা!'

'উহুঃ—আর বলেন নয়। এবার "বলো"—'

আরও রাঙ্গা হয়ে উঠে চুপিচুপি বলে সরমা, 'অনেক শিব-পুজো করে বিশ্বনাথের মাথায় জল ঢেলে তোমাকে পেয়েছি। এ সৌভাগ্য যে কোনদিন হবে, ভাবতেও পারি নি।' ওর গলা জড়িয়ে আসে আবেগে।

বরদা ওর সেই লজ্জারক্তিম মুখখানা বুকে চেপে ধরেন।

খবর পেয়ে সন্তোষ বধূ-বরণের আয়োজন করে রেখেছিল। গাড়ির শব্দে পাশের বাড়ি থেকে এক প্রবীণা ও দুটি তরুণী এলেন ছুটে। দু-একটি তরুণও।

প্রবীণা লতুর মা বললেন, 'এলি বাবা? বিয়ের ফুল ফুটল এতদিনে? বাঃ, এ যে দিব্যি বউ হয়েছে!'

তাঁর মুখ কালী হয়ে উঠল। তিনিও এর আগে একটি মেয়ে এনেছিলেন বরদাকে দেখাবার জন্যে।

'সবই হ'ল বাবা, কেবল দিদি বেঁচে থেকে ব্যাটার বউ দেখে যেতে পারলেন না।' তিনি আঁচলে চোখ মুছলেন। বরদা যেন একটা আঘাত পেলেন।

তাঁর মেয়ে লতিকা এতক্ষণ শাঁক বাজাচ্ছিল, সে এগিয়ে এসে ধমক দিয়ে বললে, 'ওসব কথা এখন থাক। তুমি বরণ করবে তো করো এসো—'

তারপর সরমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'এসো ভাই বৌদি। পাড়ায় আমার যা একটু রূপের দেমাক ছিল, তুমি আসাতে সেটুকুও গেল। কাজটা কি ভাল করলে ভাই?'

সরমা লজ্জায় মুখ নত করলে।

লতিকার দাদা বিমল এসে দাঁড়িয়েছিল, সরমার মুখের দিকে চেয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল, 'বাই জোভ! হায় বিধি, পাকা আম দাঁড়কাকে খায়!'

কথাটা সব না হোক খানিকটা বরদার কানে গেল। তিনি ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন অন্য দিকে।

বরণের পর মিষ্টিমুখ করে ওরা চলে গেলে নিরিবিলি পেয়ে সরমা স্বামীকে প্রশ্ন করলে, 'ও ছেলেটা কে গো?'

'কে ছেলে?' বরদা তীক্ষ্ন-দৃষ্টিতে চান সরমার দিকে।

'ঐ যে সিল্কের জামা পরা, সুন্দরমত দেখতে?'

'ও বিমল। লতুর দাদা।'

তারপরই প্রশ্ন করলেন বরদা, 'এত লোক থাকতে ওর কথা আগে জিজ্ঞাসা করলে কেন?'

'ছোকরা ভারি অসভ্য!' বলে সরমা জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

'লতিকা মেয়েটি কিন্তু বেশ।' একটু পরে বলে সে।

'হুঁ।' জামা খুলতে খুলতে বলেন শুধু বরদা।

'তোমার ঘরকন্নাগুলো বুঝে নিই এইবার, কি বলো! ঐ ছাত্রটির—কী নাম যেন তোমার? সন্তোষ?...ও সন্তোষবাবু, শুনছেন?'

সন্তোষ কাছেই কোথায় ছিল, ঘরে ঢুকে বললে, 'আমাকে কিছু বলছেন?'

'রান্নাঘরটা একটু দেখিয়ে দেবেন? চা করে আনি আপনাদের জন্যে?'

'চায়ের জল আমি চাপিয়ে দিয়েছি। আবার আপনি কেন এরই মধ্যে কষ্ট করবেন? লতিকাদিও আছেন নিচে এখনও—আপনি আর আজ এখন রান্নাঘরে যাবেন না।'

'তাও কি হয়—চলুন আমিও নিচে যাই—'

স্বামীর ঘর করতে এসে সরমার উৎসাহের আর অবধি নেই। এত দারিদ্র্যের মধ্যে সে মানুষ যে দুবেলা ভাল করে খেতে পাওয়াটাই ছিল একদিন সুদূর কল্পনা। কাজেই ওর একটা নিজস্ব বাড়ি হবে—ওর সংসারের ও-ই হবে গিন্নী, পয়সার বিশেষ অভাব থাকবে না এবং স্ত্রীর প্রতি নির্ভরশীল ও ভদ্রলোক স্বামী পাবে একটি—এ ওর কল্পনার ধারে-কাছেও ছিল না কোনদিন। কাজেই এ সংসার যেন ওকে নেশায় পেয়ে বসল। ঘর-দোর ঝেড়ে মুছে তকতকে করে ফেললে—বরদার বইগুলোয় এত-কাল হাতই পড়ে নি, সেগুলো উদ্ধার করে রোদে দিয়ে যতটা সম্ভব সাজিয়ে রাখার ব্যবস্থা করলে। ওঁদের খাওয়া-দাওয়া-যত্নেও ত্রুটি নেই। বরং বরদার মনে হয় এত স্বাচ্ছন্দ্য, এত পরিচ্ছন্নতা ওঁর মায়ের আমলেও ছিল না।

বরদা স্ত্রীর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলেন। ঘর-সংসার টাকাকড়ি সব ছেড়ে দিলেন ওর হাতে। এ একটা অদ্ভুত শান্তি। তা ছাড়া সরমার এই প্রাণ-প্রাচুর্য, ওর পরিশ্রম করার শক্তি এবং ওর সেই সুন্দর তনুলতাটি ঘিরে নিরবচ্ছিন্ন একটা আনন্দের পরিবেশ -সবটা জড়িয়ে সে যেন নিত্য নূতন বিস্ময় বরদার কাছে।

মাসকতক পরেই একদিন সরমা একঝলক দমকা হাওয়ার মত ঘরে ঢুকে বললে, 'হ্যাঁগো—শুনছ?'

হাতের কাজ থেকে মুখ না তুলেই বরদা প্রশ্ন করলেন, 'কী?'

'কাল আমি রাজমিস্ত্রীকে আসতে বলেছি।'

'ও, তা হবে।' সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ভাবেই বলেন বরদা।

'হ্যাঁ—হবে বৈ কি!' কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে সহসা দু হাতে বরদার মুখখানা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, 'ফের যদি ঐরকম অন্যমনস্কভাবে আমার সঙ্গে কথা কইবে তো দেখতে পাবে মজা!'

'কী, কী, ব্যাপার কি?' বিস্মিত ও বিব্রত বরদা বলে ওঠেন।

'কা-ল আ-মি রা-জ-মি-স্ত্রী-কে আ-স-তে বলেছি!' টেনে টেনে প্রতি শব্দটিতে জোর দিয়ে উচ্চারণ করে সরমা।

'রাজমিস্ত্রী? সে আবার কি?'

'সে মানুষ। তারা বাড়ি তৈরি করে।'

'তা জানি। কিন্তু তারা তোমার এখানে কি করবে?'

'বাড়ি সারাবে। চুনকাম করবে, তেতলার সিঁড়ির ঘরটা সারিয়ে উনুন পেতে দেবে—ওখানে রান্না করব এরপর। নিচের রান্নাঘরখানা নতুন করে বালি ধরিয়ে চুন দিয়ে দেবে। ওখানে আর রান্না করব না—সারা বাড়িতে ধোঁয়া হয় উনুনে আঁচ দিলে।'

'ও বাবা, সে যে বিস্তর টাকা খরচা!'

'তা হবে বৈ কি! বিয়ের সময় সবাই বাড়ি সারায়, চুনকাম করে। তুমি করেছিলে? দ্যাখো না, সব আমি বদলে ফেলব—সব নতুন চাই আমার। সন্তোষকে বলেছি জানলার জন্যে কাটা পর্দা আনবে নতুন। আলোর শেড্ চাই কটা। ছাদের জন্য ফুলগাছের টব। তোমার বাড়ির চেহারা পাল্টে দিচ্ছি, দ্যাখো না—'

বরদা হাসলেন একটু, বললেন, 'সবই তো পালটাবে, আমাকে তো আর পালটাতে পারবে না! তোমার ঝকঝকে নতুন এই সব গৃহসজ্জার মধ্যে বেচারা বৃদ্ধ পুরনো স্বামী তোমার—বেমানান ঠেকবে না?'

'যাও—সবতাইতে ওসব বিশ্রী কথাগুলো না বললে বুঝি আর হয় না? কিছু করতে হবে না তোমাকে—'

রাগ করে সরমা ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। বরদা খানিকক্ষণ ওর সেই অপস্রিয়মান মূর্তির দিকে চেয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার কাজে মন দিলেন।

কিন্তু একটু পরেই সরমা আবার ফিরে এল। কাছে এসে ওঁর গলাটা জড়িয়ে ধরে মুখখানা নিজের দিকে ফিরিয়ে বললে, 'তুমি তো আমার নিত্য নতুন গো! তোমাকে এই পুরাতনের মধ্যে মানাচ্ছে না বলেই তো সব নতুন করা।'

'সত্যি বলছ? এ তোমার মনের কথা?' একটু যেন অতিরিক্ত আগ্রহে প্রশ্ন করেন বরদা।

'সত্যি নয় তো কি তোমার সঙ্গে তামাসা করছি? কী ভাব তুমি আমাকে?'

'না, তা নয়।' অপ্রতিভ বরদা ঢোক নেন তাড়াতাড়ি, 'এমনিই বলছিলুম, তা এত খরচ কোথা থেকে করবে? টাকা কোথায়?'

'সে আমি বুঝব। তবে দেনা করব না আমি, সে বিষয় নিশ্চিন্ত থেকো।'

সত্যিই পরের দিন থেকে মিস্ত্রী লাগালে সরমা। জানলায় জানলায় নীল পর্দা ঝুলল। আলোতে শৌখীন শেড্ লাগানো হ'ল। ফুলগাছের টবে ছাদের ওপর ছোটখাটো বাগান তৈরী হয়ে গেল।

বরদা অবাক্ হয়ে যান এসব দেখে। কাজেকর্মে যেন নতুন করে উৎসাহ পান। অর্থ উপার্জনের প্রেরণা পান এর ভেতর থেকে। দ্বিগুণ উদ্যমে কাজে লাগেন।

কিন্তু সরমার সেজন্য উৎকণ্ঠার সীমা থাকে না। প্রায়ই অনুযোগ করে এ নিয়ে—জোর ক'রে টেনে তুলে নিয়ে যায় আহার ও বিশ্রামের জন্য। একদিন তাই নিয়ে আবার একটা-মান-অভিমানের পালা হয়ে গেল।

সকাল থেকে সেদিন মক্কেলের কামাই নেই। বেলা একটা বেজে গেল যখন সন্তোষকে ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন বরদা, 'তুমি স্নানাহার সেরে নাও, ওকেও সেরে নিতে বলো। আমার বোধ হচ্ছে আরও দেরি হবে।'

সরমা সন্তোষকে খেতে দিলে বটে কিন্তু নিজের মুখে ভাত রুচল না, বার-দুই বাইরে থেকে ওঁদের অফিসঘরে উঁকি মেরে গেল, কিন্তু এত লোক যে ভেতরে ঢোকা গেল না। অবশেষে আড়াইটা নাগাদ এসে দেখলে যে লোকজন সবাই চলে গেছে কিন্তু বরদা তখনও এক ঠিকুজি নিয়ে বসে কি সব হিসেব দেখছেন।

সরমা রাগ ক'রে ঘরে ঢুকে মারলে ঠিকুজিখানায় একটা টান—সেটা ঠিক বরদার শিথিল হাতে ধরা ছিল না—জখম হয়ে খানিকটা ছিঁড়ে গেল। 'হা—হা—করলে কি?

ওটা যে পরের জিনিস—ছিঁড়ে দিলে?'

সরমা অপ্রস্তুত হলেও দমল না, 'বেশ করেছি। কেবল কাজ আর কাজ—খেতে-দেতে বুঝি হবে না?'

'ও, হ্যাঁ—হ্যাঁ। এই যে যাই। এই জন্যে ঠিকুজিখানা জখম করে দিলে? কী বলব আমি তাদের?...কিন্তু তোমার মুখ অত শুকনো কেন? তুমি খাও নি?'

'হ্যাঁ, বয়ে গেছে আমার।'

'ছি-ছি-ছি, দ্যাখো দিকি কাণ্ড! তুমি ছেলেমানুষ এত বেলা অবধি শুধু শুধু উপোস করে আছ? আমি যে সন্তোষকে বলে দিলুম। কোথায় গেল সন্তোষ—সন্তোষ!'

'থাক। ঢের হয়েছে। আমার জন্যে আর অত ভাবতে হবে না। তোমার শরীরটা বুঝি শরীর নয়? তার জন্যে বুঝি আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই? চেহারাটা কি হয়েছে একবার চেয়ে দ্যাখো দিকি! আয়নায় কি মুখও দ্যাখো না!'

বরদা একটু ম্লান হেসে কাগজপত্রগুলো গুছোতে গুছোতে বললেন, 'সত্যিই আমি বিশেষ আয়নায় মুখ দেখি না। মুখ দেখলেই মনে হয় এই তো চেহারা! তোমার রূপের কথা মনে পড়ে মনে বড় সঙ্কোচ জাগে। মনে হয় কেনই বা তোমাকে বিয়ে করলুম—মিছিমিছি হয়ত তোমার জীবনটা মাটি হয়ে গেল প্রায় বৃদ্ধ একটা লোকের হাতে পড়ে—'

'আবার?' ধমক দিয়ে ওঠে সরমা, ঐ কথাগুলো না বললে বুঝি যথেষ্ট আদিখ্যেতা করা হয় না! কতদিন বলেছি না, এসব ছোটলোকমি কথা কইবে না আমার সঙ্গে?'

সে দুমদুম করে পা ফেলে চলে গেল ঘর থেকে।

বরদা স্মিতমুখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রইলেন—বোধ হয় সরমার প্রত্যাগমনের। তারপর পাশের কাগজপত্রের মধ্যে থেকে একটা আয়না বার করে খানিকটা চেয়ে রইলেন একদৃষ্টে নিজের মুখের প্রতিবিম্বের দিকে। একবার ডান হাতখানার কর-রেখার দিকে চাইলেন—তারপব একটা ছোট রকমের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে পড়লেন।

বরদা কাজে ব্যস্ত থাকে। সন্তোষও তাই। সরমার সময় আর কাটে না। ওর একমাত্র আশ্রয় হচ্ছে লতিকা আর লতিকার দাদা বিমল। ওরা প্রায়ই আসে মধ্যে মধ্যে। ওদের সঙ্গে গল্পগুজব হাসিঠাট্টা করে তবু দুদণ্ড সময় কাটে।

এই বিমল ছেলেটি সম্বন্ধে কিন্তু বরদার মনোভাব ভাল নয়। একদিন সরমাকে সাবধান করে দেবারও চেষ্টা করেছিলেন, 'দ্যাখো বিমল ছেলেটা কিন্তু ভাল নয়!'

'কেন? কি করলে ও?'

'কী করলে বলে নয়। বরং বলা যায় কী না করে বেড়ায়। ওর স্বভাবচরিত্র ভাল নয় শুনেছি।'

'কে বললে তোমাকে তাই শুনি? তুমি আবার এসব কথা নিয়ে আলোচনা করো নাকি?'

তারপর একটু থেমে যেন কী ভেবে বললে, 'আমার কিন্তু বাপু ছেলেটাকে বেশ লাগে। কেমন হাসিখুশি আমুদে!' আবারও খানিক বাদে বলে উঠল, 'তা জ্যোতিষী ঠাকুর, ওর হাতখানা তো দেখলেই পারো—স্বভাবচরিত্র সত্যিই খারাপ কি-না!'

'বয়ে গেছে আমার। ঐসব বাজে কাজ করে বেড়াবারই আমার সময় বটে।'
'তোমরা বাপু বড় মিছিমিছি দুর্নাম দাও লোকের ওপর।'

ঐ পর্যন্তই। বরদার সতর্কতা কোন কাজেই লাগে নি। কিন্তু বরদা যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করেন বিমল সম্পর্কে। একদিন অফিসঘরে বসে কাজ করছেন, হঠাৎ তাঁর কানে গেল বিমল আর সরমার কণ্ঠস্বর। দুজনেই কী একটা নিয়ে হাসাহাসি করছিল। কথাগুলো বোঝা গেল না, কিন্তু ওদের সেই হাসির শব্দ দোতলা থেকে নিজের অফিসঘর পর্যন্ত এসে পেঁছিল।

বরদা বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকোলেন। জোর করে কাজে মন বসাবার চেষ্টা করলেন, কপাটটা ভেতরদিকে বন্ধ করে দিলেন—কিন্তু কানে সেই হাসির শব্দটা ক্রমে ক্রমে যেন একটা তুমুল শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করলে। অবশেষে একসময় কাজ রেখেই উঠে পড়তে হ'ল। ভেতরে ঢুকে দেখলেন সরমা খুব খুশি-খুশি মুখে খাটের ওপর বসে আছে—বিমল ওর গা ঘেঁষে একটা চেয়ারে। হঠাৎ ওঁকে দেখে বিমল সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। সরমা অবাক হয়ে বললে, 'কী ভাগ্যি—এমন অসময়ে ওপরে যে!'

'এমনি।' গম্ভীর মুখে ঘুরে গিয়ে জানলার ধারে দাঁড়ান বরদা।

বিমল এক সময় 'আচ্ছা, আমি তবে আসি' বলে নিঃশব্দে সরে পড়ে।

সরমা স্বামীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে, 'কী হয়েছে গো? তোমার মুখ অত গম্ভীর কেন?'

'মেয়েদের হাসির শব্দ বাইরের বৈঠকখানা ঘর পর্যন্ত পেঁছিলে পাঁচটা ভদ্রলোক যাঁরা আসেন তাঁরা কি মনে করেন? আর কাজই বা করা যায় কি ক'রে? এত কিসের হাসি?'

নিমেষে সরমা লজ্জিত ও অপ্রতিভ হয়ে ওঠে, 'হাসির শব্দ নিচের ঘর থেকে পাওয়া গেছে? ছি ছি—ভারি অন্যায় হয়ে গেছে তো! সত্যি, ওঁরা কি মনে করলেন! অত বুঝতে পারি নি।...এমন সব আজগুবি আজগুবি কথা বলে বিমল! খেয়াল ছিল না যে হাসির মাত্রাটা অত বেশি বেড়ে গেছে।'

তবুও বরদা গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে সরমা আর একটু কাছে এসে ভয়ে ভয়ে বললে, 'তুমি আমাকে মাপ করো। আর এমন করব না।'

বরদা একটু সহজ হয়ে এলেন, 'ও ছোঁড়া আমাকে দেখেই অমন করে চোরের মত পালাল কেন?'

'কী জানি। তোমার যা মুখের চেহারা। ভয় পেয়ে গেল বোধ হয়।'

'হুঁ!' বরদা একটু হাসলেন কী ভেবে। তারপর দুহাত দিয়ে সরমার দুটো হাত ধরে টেনে নিলেন কাছে—'সরমা!'

'কী গো?'

একদৃষ্টে ওর মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বরদা বললেন, 'না, এমনি। তোমাকে কি মাঝে মাঝে ডাকতে সাধ যায় না?'

অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে সরমা বললে, 'যাও, যাও। ওসব কথা আর মুখে এনো না! ডাকেন তো কত বাবু!'

'আমি ডাকলে তুমি সুখী হও? সরমা!'

'না—খুব দুঃখিত হই! কথার ছিরি দ্যাখো না!'

বরদা ওর হাত ছেড়ে দিয়ে একটু গাল টিপে দিয়ে বললেন, 'একদিন তোমার

হাতটা দেখতে হবে ভাল ক'রে—'

'ওগো দ্যাখো না গো। তোমার দুটি পায়ে পড়ি—একবার দ্যাখো না—'

আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে সরমা। ওর বাঁ হাতখানা মেলে ধরে বরদার চোখের সামনে।

'এখনই কি? বা রে!' কিন্তু তবুও মিনিটখানেক সেদিকে চেয়ে থাকেন বরদা, তারপর 'কাজ আছে, নিচে যাই' বলে বেরিয়ে আসেন।...কিন্তু তখনই নিচে নামেন না। বাইরের চলনে দাঁড়িয়ে কিছুকাল নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে থাকেন নিজের ডান হাতখানার দিকে।

এরই দিন দুই পরে হঠাৎ একদিন বরদা সকালে কোথায় গিয়েছিলেন, ফেরবার পথে দেখলেন গলির মোড়ে তাঁর ঝি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে বিমলের সঙ্গে। ও বোধ হয় বাজারে গিয়েছিল—বাজারের ধামা হাতেই গল্প করছে। বিমল ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে যেন চুপি চুপি কী বলছে!

বরদা আর সেদিকে গেলেন না। ঐখান থেকেই ঘুরে কোথায় চলে গেলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি ফিরে এলেন এক বুড়ো চাকর সঙ্গে ক'রে।

বাইরের ঘরে সকাল থেকে বহু মক্কেল বসে থেকে থেকে চলে গেছে—কেউ কেউ বা তখনও আছে বসে। এত দেরি দেখে সরমাও চিন্তিত।

'ব্যাপার কী?' সরমা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বলে, 'গরমে এই রোদ্দুরে কোথায় ঘুরছিলে এতক্ষণ! ইস্—মুখ লাল হয়ে উঠেছে যে—একেবারে অগ্নিশর্মা। কোথায় ছিলে এতক্ষণ? ব'সো ব'সো, জামা খুলে ব'সো- বাতাস করি।'

'বসছি। গুপীর মা কোথায়?'

'কেন, হঠাৎ গুপীর মাকে খোঁজ? এখনই!'

'দরকার আছে। গুপীর মা!' গুপীর মা এসে দাঁড়াতে বরদা পকেট থেকে কয়েকটা টাকা বার করে বললেন, 'এই নাও তোমার দু মাসের পুরো মাইনে। এক মাসের মাইনে বেশিই দিলাম। তুমি খাওয়া-দাওয়া ক'রে ওবেলা বাড়ি চলে যাবে। অন্য কাজ খুঁজে নিও। এখানে আর সুবিধে হবে না।'

সরমা ও ঝি দুজনেই স্তম্ভিত।

'কেন বাবু, আমার কি অপরাধ হ'ল?' শেষে প্রশ্ন খুঁজে পায় গুপীর মা।

'না, এমনিই। আমার সুবিধে হচ্ছে না।' তারপর সরমার দিকে ফিরে বললেন, 'একটা চাকর এনেছি, ওকে সব কাজ বুঝিয়ে দিও।'

ঝি আরও অনেকক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে চলে গেল। বরদার সেই রক্তবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে আর কিছু বলতে সাহস করলে না।

কিন্তু সে চলে গেলে সরমা বললে, 'হ্যাঁ গো, কী হয়েছে? ওকে হঠাৎ তাড়াচ্ছ কেন?'

'আমার খুশী। আমার বাড়িতে কাকে ঝি রাখব না রাখব সে স্বাধীনতাও কি আমার নেই?'

সরমা আঘাত পেলে কিন্তু অভিমান করলে না। গুপীর মার করুণ মুখ মনে করে বরং অনুনয়ের সুরেই বললে, 'এতকালের ঝি তোমাদের—এক কথায় জবাব দিলে? কী করেছে কি? অন্যায় যদি কিছু করেই থাকে তো এবারের মতো মাপ করো। আমি তোমাকে মিনতি করছি!'

'হ্যাঁ, তা করবে বৈ কি! ও-না থাকলে বুঝি সুবিধে হয় না তোমার?' রূঢ়-কণ্ঠে বলে ওঠেন বরদা।

'কিসের সুবিধে? কী বলছ কি?'

'কিছু বলছি না। শুধু বলছি আমার বাড়িতে ও'কে আর রাখব না। আজ থেকে চাকর থাকবে। ব্যস, আর কিছু শোনবার আছে?'

ওঁর এই অকারণ রূঢ়তায় সরমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। সে আর কোন কথা না বলে ঘরের ভেতরে চলে গেল। বরদাও ঘরে ঢুকলেন জামা কাপড় ছাড়তে। সরমা তখন স্তব্ধভাবে ওধারে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে, চাপা কান্নার আবেগে চোখের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে, দৃষ্টি দূর মেঝেতে নিবদ্ধ।

ওর দিকে চেয়ে বরদা নিজের রূঢ়তার জন্য বোধ হয় কিছু লজ্জিত হলেন, কিন্তু ফলে আরও যেন চটে গেলেন সমস্ত কিছুর ওপর। ওধারে একটা রেকাবি পড়েছিল, ঘর থেকে বেরোবার সময় সেটাকে পা দিয়ে এমনভাবে সরিয়ে দিলেন যে সেখানা ঝনঝন করে গিয়ে উঠোনে পড়ে ভেঙে গেল। তিনি আর কোন কথা না কয়ে বাইরের ঘরে চলে গেলেন।

সাত

স্বামী স্ত্রীর মনোমালিন্য বেশি দিন থাকে না। আবার শুরু হয় ওদের সহজ জীবন-যাত্রা। কিন্তু সরমার কেমন যেন মনে হয় ওর স্বামী ক্রমেই ওর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন।

একদিন সরমা সোজাসুজি প্রশ্নই করে বসল। সেদিনটা বোধ হয় পূর্ণিমা। চাঁদের আলোতে দুজনে মাদুর পেতে ছাদে বসেছিল। সরমা দু হাতে বরদার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁধে মাথা রেখে বললে, 'তুমি যেন আজকাল কী রকম হয়ে গেছ! সত্যি আমার বরাতটাই ঐ রকম!'

'কেন, বরাতের কী দোষ হ'ল?' শুষ্ক হাসি হেসে বলেন বরদা।

'কী দোষ নয়?' সরমা কৃত্রিম কোপে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'একে তো তোমার দিনরাত কাজ আর কাজ--দুদণ্ড স্থির হয়ে বসবে তার যো নেই! তার ওপর যাও বা খেতে শুতে আসবার সময় দেখা পাই—কী রকম গম্ভীর হয়ে থাকো, আড়ো আড়ো ছাড়ো ছাড়ো ভাব—ভাল করে কথা কও না, হাসো না—আদর তো করই না। কী রকম যেন! আমি যে কী অপরাধ করলুম তাও বুঝি না। হ্যাঁগো, কেন অমন করো বলো তো? আমার বুঝি কষ্ট হয় না?'

'কষ্ট?' একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠেন বরদা, 'কষ্ট? আমারই কি কষ্ট কম?'

'তা কী তোমার কষ্ট তাও তো বলো না। বললেও তো কিছু একটা উপায় করতে পারি।'

'সে তোমাকে বলবার নয় সরমা, সে তুমি বুঝবে না।'

তারপর কিছুক্ষণ বাদে বললেন, 'বড় ভয় করে, বুঝলে!'

'কিসের এত ভয় তোমার?' উদ্বেগে কৌতূহলে সরমা উত্তেজিত হয়ে ওঠে,

'বলই না খুলে ছাই!'

'বড় সুখে আছি তোমাকে পেয়ে সরমা। ভাবি এত সুখ কি সইবে?'

'সইবে না কেন? তুমি কি ভাবছ এরি মধ্যে আমি মরে যাবো!'

তারপরই কথাটা বোধ হয় মনে পড়ে যায়, ঈষৎ ভীতকণ্ঠে বলে, 'তুমি কি আমার কিছু ফাঁড়া-টাঁড়া দেখেছ? সত্যি করে বল না গো? আমি কি মরে যাবো?'

'দূর পাগল! না না, আমি এমনিই বলছিলুম। তুমি বসো, আমি নিচে যাই—একটু কাজ বাকি আছে। সন্তোষ অপেক্ষা করছে।'

'না, তোমাকে বলে যেতে হবে কী ব্যাপার!' সরমা ওঁর কোঁচাটা চেপে ধরে।

'ব্যাপার আবার কি? ছাড়ো, ছেলেমানুষি করো না।' বরদা এক রকম জোর করেই চলে যান। নানারকম সম্ভাবনায় কণ্টকিত ও আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকে সরমা।

এর দিন কতক পরে বরদা আবারও একটা কবচ তৈরি করলেন। পাঁজি খুলে দিন দেখে শোধন করে নিয়ে বরদা উপরের ঘরে উঠলেন সরমাকে পরিয়ে দিতে। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শুনলেন সরমা কার সঙ্গে গল্প করছে।

কার সঙ্গে কথা কইছে সরমা? কে এলো? কৈ, কাউকে তো আসতে দেখি নি!—বরদার মনে নানারকম সংশয় জাগে। তিনি নিঃশব্দে পা টিপে টিপে এগোন। এই নিঃশব্দ তস্করগতির মধ্যে যে নীচতা আছে—তা কিছুদিন আগেও বরদার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল, কিন্তু আজ তিনি সহজেই মেনে নেন।

ঘরের দোরের কাছে দাঁড়িয়ে দেখলেন সরমা ঘরের জানলা থেকে কথা কইছে বিমলের সঙ্গে। বিমল আছে তার বাড়ির ছাদে—এই একটি জানলা থেকেই মাত্র সেটা দেখা যায়। এ সম্ভাবনাটা কোনদিনই বরদার মাথায় যায় নি।

বরদা শুনলেন বিমল বলছে, 'তা বলে বৌদি, চায়ের নেমন্তন্নটা আমার বাদ দিলে?—এটা খুব ভাল হ'ল না!'

সরমা জবাব দিলে, 'কী করব ভাই। বাড়িওয়ালার যা কড়া মেজাজ, অনুমতি চাইতেও সাহস হয় না।'

বিমল বললে, 'তোমরা হলে আজকালকার মডার্ন স্ত্রী—স্বামীকে এত ভয়? অত অনুমতি নিতে গেলে ঘর করা চলে না।...আচ্ছা, একদিন না হয় চুপি চুপি ডেকো—গোপনে গিয়ে খেয়ে আসবো।'

'এত লোভ চায়ে?'

'শুধু কি চা বৌদি, এ যে তোমার হাতের চা! ওর দাম ঢের বেশি।'

এমন সময় সহসা বিমলেরই বোধ হয় লক্ষ্য হ'ল দ্বারপথে বরদা দাঁড়িয়ে আছেন। তার দৃষ্টিতে লজ্জা ও আশঙ্কা ফুটে উঠতেই সেই দৃষ্টি অনুসরণ করে সরমা স্বামীকে দেখতে পেলে। যদিও তার নিজের মনে কোন অপরাধ বোধ ছিল না, তবু কে জানে কেন একটা সঙ্কোচের রক্তিমা ও জড়তা ফুটে ওঠে ওর মুখে-চোখে। সেটা লক্ষ্য ক'রে বরদার মুখের ভাব কঠিন হয়ে ওঠে।

ঘরে ঢুকে বরদা বলে ওঠেন, 'এটা কাশীর বাঙ্গালীটোলার হাফ্‌গেরস্ত বাড়ি নয়। এটা কলকাতার ভদ্রপল্লী এবং ভদ্রলোকের বাড়ি—ভবিষ্যতে মনে রাখলে খুশী হবো!'

সরমার মুখে নিমেষে কে আবির ছড়িয়ে তারপর যেন একেবারে রক্তশূন্য বিবর্ণ

করে দেয়। এ অপমানে ওর গলা দিয়ে কথা ফোটে না, শুধু একটা প্রাণপণ চেষ্টায় ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপে মাত্র!

কিন্তু ওর সেই অপরিসীম বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়েও বরদার কিছুমাত্র দয়া হয় না—নিজের রূঢ়তার বিষ ক্রমশ যেন ওঁর নিজের দেহেই সংক্রামিত হয়ে কণ্ঠস্বর ও মনকে আরও বিষাক্ত, আরও রূঢ় করে তোলে। তিনি আর এক পর্দা গলা চড়িয়ে বলেন, ঐ জন্যেই আমাদের বাপদাদারা বলতেন যে সমান ঘর থেকে আর বড় বংশ দেখে মেয়ে আনতে।...দয়া করে ভিখিরীর মেয়েকে কুড়িয়ে এনেছিলুম কাশী থেকে—এখন তার ফল বুঝছি হাড়ে হাড়ে!'

সরমা আর দাঁড়াতে পারলে না। ওর দুই চোখ জ্বালা করে জল ভরে এসেছে কিন্তু এই লোকটার সামনে যদি চোখের জল পড়ে তো সে আরও অপমান। সে যেমন পাশ কাটিয়ে চলে যেতে যাবে—পথ আগলে দাঁড়ালেন বরদা, কঠিনকণ্ঠে ধমক দিয়ে বললেন, 'শোন। দাঁড়াও চুপ করে।...কথার উত্তর দিলে না যে!' অদ্ভুত একটা জ্বালা, একটা হিংস্রতা ওঁর মুখে চোখে ফুটে ওঠে।

সরমা এতক্ষণে গলার স্বর খুঁজে পেলে, কোনমতে কথা কইলে, অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে ব্যঙ্গের সুর ফুটল না—শুধু অদ্ভুত শোনাল ওর গলাটা, 'যখন ভদ্রভাবে কথা কইবে তখন জবাব দেব। এখন নয়। ছাড়ো—'

'হুঁ। ভদ্রতার জ্ঞান তো খুব হয়েছে দেখছি। ভদ্রলোকের মেয়ে, ভদ্রলোকের বউ রাস্তার এপারে ওপারে দাঁড়িয়ে পরপুরুষের সঙ্গে ঢলাঢলি করা—এ আবার কোন্ দেশী ভদ্রতা!'

'ঢলাঢলিটা রাস্তার এপারে ওপারে হয় নাকি? জানতুম না!'

ওর এ ব্যঙ্গে যেন ক্ষিপ্ত হয়ে যান বরদা, কুৎসিত একটা ভঙ্গী করে বলেন, 'স্বামীর অনুমতি না নিয়ে কেমন করে রূপসী তরুণী পরস্ত্রীর হাতের বিশেষ মধুময় চা খেয়ে যাবে এক লম্পট ছোকরা, এ আলোচনাটাকে কি বলব বলতে পারেন মহাশয়া?'

অকস্মাৎ যেন সমস্ত রক্ত সরমার মাথায় চড়ে যেতে থাকে। চোখ দুটোতে আগুন জ্বলে ওঠে। সেও সমান রূঢ় স্বরে জবাব দেয়, 'রূপসী তরুণী পরস্ত্রীর যদি বৃদ্ধ আর কুৎসিত এবং অভদ্র স্বামী হয় এবং সে স্বামীরও যদি দর্শন দুর্লভ হয়ে ওঠে, তাহলে সে স্ত্রীর দিন কী করে কাটে বলতে পারেন মহাশয়? কাজেই তাকে পাড়ার লম্পট ছোকরা ধরে বেড়াতে হয়!'

জোর করে সে বরদাকে সরিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, বরদা ওর একটা হাত ধরে ফেললেন বজ্রমুষ্টিতে—চেপে ধরে বললেন, 'কীসের এত তেজ তোমার! বাপের তো ঐ অবস্থা—উদ্ খেতে ক্ষুদ নেই, চাটগেঁয়ে বড়াই! ওসব চলবে না—এই বলে দিলুম। আমার বাড়ি, এখানে আমার খুশীমত, আমার হুকুমমত ভদ্রলোকের মত চলতে হবে!'

যন্ত্রণায় সরমার চোখে জল এসে গিয়েছিল, সেদিকে চেয়ে এতক্ষণ পরে এই প্রথম বোধ হয় বরদার সম্বিত ফিরে এল। তিনি অপ্রস্তুত হয়ে ছেড়ে দিলেন ওর হাতখানা। কিন্তু ততক্ষণে সরমার সুডৌল শুভ্র হাতে ওঁর পাঁচ আঙুলের ছাপ রক্তরেখায় ফুটে উঠেছে।

একবার সেদিকে এবং একবার বরদার মুখের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সরমা।

॥ আট ॥

সংশয়ের বীজ একবার মানুষের মনে অংকুরিত হ'লে বহুদূর পর্যন্ত তা শিকড় সঞ্চারিত ক'রে শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হ'য়ে ওঠে। বরদার ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হ'ল না।

দু একদিনের মধ্যে সরমার মনটা যদি-বা একটু সুস্থ হ'য়ে উঠেছিল—বরদার একটা ব্যবহারে আবারও গেল বিগড়ে। একদিন বিকেলবেলা সরমা ছাদে পায়চারি করছে—বরদা ওঁর শোবার ঘরের সেই বিশেষ জানলাটি থেকে লক্ষ্য করলেন—বিমল তার ঘরের জানলা থেকে দূরবীন দিয়ে দেখছে সরমাকে। সরমার তাতে প্রশ্রয় ছিল কি না—এমন কি সরমা যে এটা একেবারেই জানে না, এমন কথা একবারও ওঁর মাথায় এলো না। চোখের সামনে সবটা যেন লাল হয়ে উঠল—খুন চেপে গেল মাথায়। আর সেই সঙ্গে অদৃশ্য কোন কণ্ঠস্বর মানসকর্ণে মেঘমন্দ্রস্বরে বলে যেতে লাগল, 'স্ত্রী কুলত্যাগিনী...স্ত্রী কুলত্যাগিনী...স্ত্রী...'

সেইদিনই বিকেলে বেরিয়ে গিয়ে ব্যবস্থা করে এলেন বরদা। পরের দিন ভোর থেকে মিস্ত্রী লাগল বাড়িতে, ইঁট এল গাড়ি ক'রে, বালি সিমেণ্ট চুন—সে এক হৈ হৈ ব্যাপার! সরমা তখনও স্বামীর সংগে কথা কয় না- সে মিস্ত্রীদেরই একজনকে ডেকে প্রশ্ন করলে, 'হ্যাঁ মিস্ত্রী, কিসের কাজ হবে, বাবু বলেছেন তোমাকে সব?'

'হ্যাঁ মা—বলেছেন বৈ কি!'

'কৈ বলো দিকি—দেখি কেমন মনে আছে তোমার!'

'কী যে বলেন মা-ঠাকরুন! ছাদের পাঁচিল গাঁথা হবে মানুষসমান উঁচু করে—আর দোতলায় আপনাদের শোবার ঘ'র ঐ পশ্চিমের জানলাটা খুলে গেঁথে দিতে হবে-এই তো? না, আর কোন কাজ আছে?'

'না, আর কিছু কাজ নেই।' সেখান থেকে সরে আসে সরমা নিঃশব্দে। অপমানে তার চোখ মুখ রাঙ্গা হয়ে উঠল, কানের মধ্যে কথাগুলো বিছের কামড়ের মত জ্বালা করতে লাগল কিন্তু সে একটি কথাও কইলে না প্রতিবাদ তো নয়ই। শুধু তার চোখের দৃষ্টি শ্বাপদের মতই হিংস্র ও কঠোর হয়ে উঠল। ওষ্ঠ-দুটি দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভঙ্গীতে চেপে বসল।

এরও দিন দুই পরে সন্তোষ গেছে রান্নাঘরে চা খেতে বিকেলবেলা—চা খাবার পরও কথায় কথায় একটু বেশিক্ষণ আটকে গিয়েছিল সে, হাসিঠাট্টাও একটু আধটু চলছিল। তার প্রধান কারণ সরমার আর কথা কইবার মত দ্বিতীয় লোক ছিল না এ বাড়িতে। কাজেই সন্তোষকে সে একবার কাছে পেলে দুটো একটা কথা না কয়ে ছাড়তে চায় না। অল্পবয়সের মন ওর—এই নিরবচ্ছিন্ন নীরবতায় হাঁপিয়ে ওঠে। আর সন্তোষেরও—রূপ এবং যৌবনের প্রতি সহজাত একটা আকর্ষণ তো আছেই, সে নিজের অজ্ঞাতসারেই আজকাল কাজে অকাজে রান্নাঘরের কাছাকাছি ঘোরে, গল্পের সুবিধে পেলে ছাড়ে না।

আজও প্রধানত সরমার জন্যই দেরি হয়ে গিয়েছিল বটে কিন্তু সন্তোষেরও তাতে সায় ছিল ষোল আনা।

'একটু ব'সো না ভাই সন্তোষ ঠাকুরপো, কাজ আর কাজ, দিনরাত সেই ঠিকুজি কুষ্ঠির হিসেব—ও তো আছেই!'

'তা যা বলেছেন বৌদি! আর মানুষগুলোও হয়েছে তেমনি—এক একজন এক এক অবতার!'

এই বলে সে বিস্তৃতভাবে গল্প করতে বসে মক্কেলদের রকমারী বায়নাক্কা। কথায় কথায় কত যে দেরি হয়ে গেছে তা খেয়াল ছিল না। হঠাৎ নিচে থেকে বরদার রুক্ষ ও রূঢ় আহ্বান আসে—'সন্তোষ!'

সে প্রচণ্ড ডাকে চকিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে 'পালাই বৌদি, কর্তা বড় রেগেছেন' বলে সন্তোষ দ্রুত নেমে যায়। কিন্তু ওপর থেকেই সরমা স্পষ্ট শুনতে পায় যে বরদার রাগ তাতেও কমে নি, তিনি অত্যন্ত কটুভাষায় সন্তোষকে তিরস্কার করছেন, 'এতক্ষণ ধরে কিসের চা খাওয়া তোমার তাই শুনি! আর অতই বা কিসের হিহি হাহা হাসি? এধারে এতগুলি ভদ্রলোক বসে, রাশি রাশি কাজ বাকি —সব ফেলে ওপরে বসে হাসি-ঠাট্টার' এতটুকু রেসপনসিবিলিটির জ্ঞান নেই! রাসকেল শুয়ার কোথাকার! এত বেইমান!'

সামান্য, হয়ত তিন কোয়ার্টার দেরি হওয়ার জন্য এত উষ্ণ হবার কথা নয় সরমা তা জানে। এর আসল কথাটা কি তা বুঝতে পেরে আজও ওর চোখ মুখ তেমনি অপমানে জ্বলতে থাকে। আজও চোখের দৃষ্টি তেমনি উগ্র ও সাংঘাতিক হয়ে ওঠে।

তার ওপর অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল, একটু পরে যখন সরমা নিচে নামতে নামতে শুনলে, একতলার সিঁড়ির কোণে দাঁড়িয়ে বুড়ো চাকরটাকে চুপিচুপি প্রশ্ন করছেন বরদা, 'পাশের বাড়ির বিমলবাবু তোকে ডেকে আজ কি বলছিল রে?'

'কৈ, কখন বললে বাবু?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করে ভৃত্য।

'ঐ যে সকাল বেলা, তুই যখন বাজার থেকে আসছিলি?'

'কৈ, বাজার থেকে আসবার সময় তো আমার সঙ্গে কারুর কোন কথা হয় নি বাবু!'

'ও, আমার যেন মনে হ'ল—আচ্ছা যা, তোর কাজে যা।'

সরমা পাথরের মত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওর মুখের রেখায় ফুটে উঠল কঠোর এবং হিংস্র একটা সংকল্পের আভাস।

সন্ধ্যার ঝোঁকে কী একটা জরুরী কাগজ নিতে সন্তোষ যেমন ভেতরের ঘরে ঢুকেছে, সরমা এসে পেছন থেকে ওর কাঁধে হাত দিলে।

সন্তোষ চমকে পেছন ফিরে ওকে দেখে আরও অবাক হয়ে গেল। এ যে অগ্নিশিখা! সরমা যে এমন সাজতে পারে—ওর রূপ যে এমন বিদ্যুৎলেখার মতই চোখ-ধাঁধানো, আজ যেন নতুন ক'রে চোখে পড়ল সন্তোষের। সে বিহ্বল হয়ে ওর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সরমা মুহূর্তকাল ওকে অভিভূত হবার অবকাশ দিয়ে নীরবে ইঙ্গিত ক'রে বললে, 'শোন।'

সন্তোষ স্বপ্নাবিষ্টের মত ওর পিছু পিছু গেল।

শোবার ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে সরমা ওর দুটো হাত ধরে প্রশ্ন করলে, 'এই, আমাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে?'

সন্তোষ স্তম্ভিত। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠল তার মুখ, নিমেষে ললাটে ঘাম দেখা দিলে। সে একবার শঙ্কিত হয়ে বাড়ির ভেতরদিকে চাইলে। সরমা বিদ্রুপের হাসি হেসে বললে, 'ভয় নেই—রাখালকে আমি মসলা আনতে বড়বাজার পাঠিয়েছি—দু'ঘণ্টার আগে ফিরবে না।'

তারপর ওকে আর একটু নিজের দিকে আকর্ষণ করে বললে, 'বলো বলো—সময় নেই। আমাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে?'

'কোথায়?' লোভে, আশঙ্কায়, আবেগে, উত্তেজনায় থরথর ক'রে কাঁপছে সন্তোষ।

'যেখানে হোক। খুব দূরে দেশে কোথাও! শুধু তুমি আর আমি—'

'চলবে কিসে?' তালু শুকিয়ে এসেছে সন্তোষের, কষ্টে ঢোঁক গিলে বলে সে।

'এই যে এত গয়না রয়েছে আমার। এখন তো কিছুদিন চলবে। তারপর কি আর কিছু রোজগার করতে পারবে না?'

'কিন্তু...কিন্তু উনি বড় অসময়ে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। কেউ ছিল না. বহু দূরে সম্পর্কের জ্ঞাতি বটে—তবু ওঁর কোন দায় ছিল না। যা করে শিখিয়েছেন—'

'তেমনি ভূতের মত খাটিয়ে নিয়েছেন তোমাকে। এখনও নিচ্ছেন। আর তার ওপরে গালাগালি। বিকেলের অপমানটা ভুলে গেলে?'

তা বটে! সন্তোষের মনে পড়ে যায় কথাটা।

তাছাড়া সরমার রূপের দীপ্তি তার মানসপতঙ্গকে তখন প্রবলবেগে আকর্ষণ করছে!

সে শুধু অতিকষ্টে বললে, 'কখন যাবে?'

'কখন কি, এখনি, এই মুহূর্তে। ও বাইরে ব্যস্ত আছে, ভেতরে চাকর নেই, এমন সুযোগ আর আসবে না।'

'জিনিসপত্তর?'

'কিচ্ছু দরকার নেই। হাতে কিছু নগদ আছে, তা থেকে কিনে নেব চলো।'

সন্তোষ যেন সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ওর কাছে আত্মসমর্পণ করলে, দুজনে নিঃশব্দে বাড়ির বাইরে এসে গলির অন্যপ্রান্ত দিয়ে বড় রাস্তায় পড়ল।

যাবার সময় শুধু সরমা কবচখানা খুলে দেরাজের ওপর রেখে গেল।

সন্তোষের আসবার দেরি দেখে বরদা মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিলেন। এত অন্যমনস্ক যে মক্কেলদের কথার জবাব দিতে গিয়ে কথাগুলো উলটো-পালটা হয়ে যাচ্ছিল।

একজন যে ওঁর সামনে হাত মেলে দিয়ে বসে আছে, সে প্রশ্ন করছে হয়ত যে, 'তাহলে রিষ্টিটা ক'বছর বয়সে দেখলেন?'

বরদা তার হাতের দিকেই চেয়ে আছেন যদিও, বললেন আনমনা ভাবেই, 'শনি তুঙ্গী, বলছি তো!'

'আজ্ঞে?' অবাক হয়ে সে প্রশ্ন করে।

চমকে ভাল করে ওর মুখের দিকে চান বরদা।

'রিষ্টি? বিয়াল্লিশে! বাঁচা শক্ত হবে। মহাদান করুন—কেউ মরছে দেখলে বাঁচাবার চেষ্টা করবেন। কীট পতঙ্গ যা হোক না কেন। পরমায়ু দান করলে পরমায়ু বাড়ে।'

পিওন এসে একটা চিঠি দিয়ে গেল। অন্যমনস্ক বরদা একখানা খাতার মধ্যে গুঁজে রাখলেন সেটা—খুলে দেখাও হ'ল না!

কান তাঁর পাতা আছে বাড়ির ভেতরদিকে।

আর একজন ঠিকুজিখানা ওঁর হাতে দিয়ে প্রশ্ন করলে, 'ছেলেটার কী হবে দেখে দিন না ঠাকুরমশাই। বড্ড লিভারের গোলমালে ভুগছে। কিছু হজম হয় না।'

বরদা ঠিকুজিখানার দিকে চেয়ে থাকেন স্তব্ধ হয়ে। উত্তর দেন না। সে ভদ্রলোক আবারও প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করেন—একটু অসহিষ্ণু ভাবেই।

বরদা তেমনি অন্যমনস্ক ভাবেই উত্তর দেন, 'ও, পেটের গোলমাল? কুমারেশ খাওয়ান না।'

'কি বললেন?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন ভদ্রলোক।

'ও, না। দেখছি।' অপ্রস্তুত হয়ে ওঠেন বরদা। জোর করে ঠিকুজিতে মন দেন।

অবশেষে শেষ মক্কেলটি চলে যেতে তিনি তাড়াতাড়ি রাস্তার দিকের দরজা বন্ধ করে ভেতরের উঠোনে বেরিয়ে এলেন।

সারা বাড়ি নিস্তব্ধ, থমথম করছে। বহু প্রতীক্ষিত একটা আশংকায় ওঁর মন কণ্টকিত হয়ে ওঠে।

জোরে ডাকেন একবার, 'সন্তোষ!'

সাড়া নেই।

'রাখাল!'

সাড়া নেই। শূন্যবাড়ি খাঁ-খাঁ করছে। হঠাৎ ওঁর লক্ষ্য পড়ল সদর দরজা খোলা। ছুটে গিয়ে বন্ধ করে দিলেন। তারপর অতিকষ্টে নামটা উচ্চারণ করলেন—'সরমা!'

তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলেন। সব ঘরেরই দোর খোলা। অথচ সব ঘরই খালি।

শোবার ঘরে ঢুকতেই নজরে পড়ল দেরাজের ওপর কবচখানা, আর সরমার চাবির গোছা। আর কিছুই জানবার দরকার নেই, যা জানবার সবই জানা হয়ে গেল—তবু আর একবার বরদা স্খলিত ভগ্নকণ্ঠে ডাকবার চেষ্টা করেন, 'স-সরমা!' সে আহ্বানের ব্যর্থতা তাঁকেই বিদ্রূপ করে যায়।

কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার পর 'হা-হা' করে প্রচণ্ড বেগে হেসে ওঠেন বরদা। সে হাসিতে শূন্যবাড়ির ঘর-দ্বার পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তারপর পাগলের মত নিজের ডান হাতের বাহুমূলে বাঁধা কবচখানায় মারেন এক টান, কবচখানা ছিঁড়ে আসে। নিজের ও স্ত্রীর কবচখানা ঘরের ভেতর থেকেই অর্ধ অন্ধকার উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবারও হেসে ওঠেন 'হা-হা' করে—তেমনি প্রচণ্ড বেগে।

॥ নয় ॥

সন্তোষ মোহগ্রস্ত অভিভূত হয়ে সরমার সঙ্গে সঙ্গে গৃহত্যাগ করলে বটে কিন্তু টিকিট কেটে ট্রেনে চড়া পর্যন্ত ওর অস্বস্তির সীমা নেই। আসলে সন্তোষ সৎ ছেলে—বরদা সম্পর্কে এতবড় চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা তাকে অন্তরে অন্তরে প্রায় প্রথম থেকেই পীড়িত করতে শুরু করেছিল। সে নিরতিশয় শুষ্ক ও ম্লান-

মুখে সরমার পাশে বসে রইল কাঠের পুতুলের মত। তার মুখ দেখে অন্তত এটা কিছুতেই অনুমান করা চলে না যে সে তার দয়িতার সঙ্গে প্রথম প্রণয়যাত্রা করছে।

ওরা যাচ্ছিল এলাহাবাদে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথম যে ট্যাক্সি পায় সরমা সেটাকেই ডাকে। প্রথম স্টেশনের নাম মনে পড়ে ওর হাওড়া।

হাওড়ায় নেমে সন্তোষ অত্যন্ত বিপন্ন ভাবে প্রশ্ন করলে, 'এখন আমরা কোথায় যাবো?'

'এলাহাবাদ। তুমি দুখানা টিকিট কেটে আনো। এই নাও টাকা।' বললে সরমা। কেন এলাহাবাদ নামটা মনে এল জানে না। বোধ হয় কাশীতে ওর জন্ম, পশ্চিমের এই বিশেষ লাইনটার সঙ্গেই ওর পরিচয় কাশী ছাড়া ও লাইনে এলাহাবাদ নামটাই প্রথম মনে আসে।

যাই হোক, সন্তোষ দুখানা এলাহাবাদ যাবার ইণ্টার ক্লাসের টিকিট কেটে আনলে এবং একটা কামরায় অপেক্ষাকৃত অন্ধকার কোণে জায়গা করে নিয়ে কোনমতে চোখকান বুজে সরমার পাশে এসে বসল।

কিন্তু সরমাও শান্তিতে নেই। বরদাকে ও ভালবেসেছিল। ঠিক এতটা যে বেসেছিল তা ও নিজেও এতদিন উপলব্ধি করেনি। প্রচণ্ড ক্রোধে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে এ কদিন শুধু প্রতিহিংসার কথাই ভেবেছে, তার ফলাফলটা ভাবে নি। দিক্‌দাহকারী বিদ্বেষে ওর সমস্ত অন্তর-দৃষ্টিটা ঝাপসা করে রেখেছিল—সামান্য দূরের ভবিষ্যৎও দেখতে পায় নি। ও যে এরই মধ্যে এতখানি গ্লানি ও অবসাদ বোধ করবে, এ সম্ভাবনা তাই কল্পনাও করে নি।

কিন্তু এখন মেল-ট্রেন যতই একটার পর একটা স্টেশন অতিক্রম করে হু-হু করে ছুটে চলতে লাগল, ততই অব্যক্ত এবং অপরিমেয় আত্মগ্লানি ও অনুশোচনার একটা স্তূপ জমে উঠতে লাগল ওর মনের মধ্যে। এ কি করলে সে? এ কী করলে!

সরমার মনে হতে লাগল স্বামী হয়ত এতক্ষণে ভেতরে ঢুকেছেন—এতক্ষণে হয়ত সবই টের পেয়েছেন। ওঁর নীচ সন্দেহটাই যে শেষ পর্যন্ত সত্য প্রমাণিত হ'ল এর জন্য যেমন আত্মপ্রসাদ অনুভব করছেন মনের মধ্যে, তেমনি ওকে ঘৃণাও করছেন। তাঁর সন্দেহটাকে সত্য বলে প্রমাণ করে যে সরমা নিজেকেই অপমানিত করলে! এ প্রতিশোধ তো ওর স্বামীর ওপর নেওয়া হ'ল না—নিজেকেই চরম আঘাত হানা হ'ল।

ছি ছি ছি!

ওর কানের মধ্যে বার বার নিজের সেদিনকার সেই দম্ভোক্তি ধ্বনিত হতে লাগল, 'যদি আমি সতী মায়ের মেয়ে হই, যদি আমার বাপ আজও পর্যন্ত গায়ত্রী জপ করে জল খেয়ে থাকেন—'

সে কণ্ঠস্বর যেন রুদ্রাণীর ভৈরব কণ্ঠের অসহ্য তিরস্কার! সরমা দু-হাতে কান ঢেকে যেন সে বজ্র গর্জন আড়াল করতে চায়। অব্যক্ত যন্ত্রণায় ওর কপালের শিরাগুলো ফুলে ওঠে, মাথায় যেন কে হাতুড়ি পিটতে থাকে।

এমনি করে দুটি তরুণ-বয়স্ক নরনারীর অভিসার যাত্রার প্রথম রাত্রি কাটল—পাশাপাশি ঘনিষ্ঠভাবে, অথচ পরস্পর থেকে কত দূরে দূরে।

এক সময় সন্তোষ আর থাকতে পারলে না আশেপাশের যাত্রীরা ঘুমোচ্ছে দেখে বলেই ফেললে চুপি চুপি, 'আমার এ অপরাধের আর মার্জনা নেই। আমার এ

পাপ ঈশ্বর কোনদিন ক্ষমা করবেন না!'

সরমার কণ্ঠস্বর চুপি চুপি হলেও কঠোর হয়ে ওঠে—'জেনেশুনে এ পাপ করলে কেন তাহলে? তুমি না এলে তো আর জোর করে টেনে আনতুম না!'

সন্তোষ অবাক! এতখানি অকৃতজ্ঞতা সে কল্পনাও করতে পারে না।

ক্ষোভে দুঃখে অনুতাপে এবং এই স্ত্রীলোকটির প্রতি অহেতুক একটা বিদ্বেষে ওর চোখে জল এসে গেল। সেও কথার আর জবাব দিলে না।

অবশেষে এমনি করে ঠায় জেগে বসে থাকবার পর ভোরের দিকে সন্তোষের তন্দ্রা এসেছিল। একসময় ধড়মড় করে জেগে বসে দেখে সরমা ওর গা ঠেলে ডাকছে, 'এই ওঠো ওঠো, আমাদের নামতে হবে।'

তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে ওরা। সন্তোষ স্টেশনের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখেও নি আগে। নেমে প্ল্যাটফর্মের একটা কল থেকে মুখে হাতে জল দেবার পর হঠাৎ সে চেয়ে দেখলে যে স্টেশনটা মোগলসরাই—এলাহাবাদ নয়।

সন্তোষ অবাক হয়ে বললে, 'এ আমরা কোথায় নামলাম, এ তো এলাহাবাদ নয়!'

সরমা বললে, 'এটা মোগলসরাই। এলাহাবাদ আরও পশ্চিমে।'

'তবে এখানে আমরা নামলাম কেন?'

'আমরা ফিরব।' ওয়েটিং রুমে যেতে যেতে বেশ সহজ ভাবেই বলে সরমা।

'ফিরব?' চলতে চলতেই থমকে দাঁড়িয়ে যায় সন্তোষ।

'হ্যাঁ, ফিরে যেতে হবে, তুমি তো তোমার ভুল বুঝতে পেরেছ, আমিও তাই। এক্ষেত্রে ভুল সংশোধন করাই শ্রেয়। তুমি বসে একটু চা-টা খাও, তারপর টাকা নিয়ে গিয়ে হাওড়ার দুখানা টিকিট কেটে আনো।'

কিন্তু সরমা যত সহজে কথাটা বললে সন্তোষ তত সহজে ব্যাপারটা গ্রহণ করতে পারলে না। বরদার ভয়াল রুদ্র চেহারাটা ওর মানসচক্ষে ভেসে উঠে ভয়ে শিউরে ঘেমে উঠল একেবারে।

'কিন্তু, কিন্তু সে কি করে হবে?' কেমন যেন ছেলেমানুষের মত অসহায়ভাবে বলে ফেলে সে কথাটা।

'কেন হবে না?' সরমা দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'এত ভয়ের কি আছে? ভুল করেছি আমরা কিন্তু অন্যায় তো করি নি। তুমি টিকিট কাটোগে কলকাতার।'

সন্তোষ মাথাটাথা চুলকে বিবর্ণ মুখে বললে, 'বেশ, তাহলে আপনি ওয়েটিং রুমের ভেতর বসুনগে, আমি টিকিট কেটে আনছি।'

সে হাত পেতে টিকিটের টাকাটা নিয়ে চলে গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর দুখানা টিকিট কেনা ওর হয় না। বরদার কাছে ফিরে গিয়ে দাঁড়াবার ওর সাহস নেই। সে একখানা নিজের টিকিট কিনে এলাহাবাদেরই একটা গাড়িতে চেপে বসল।

অপেক্ষা করে করে সরমা চিন্তিত হয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়। কেউ কোথাও নেই।

'টিকেট ঘর কিধার হ্যায় জী?' একজনকে প্রশ্ন করে সে। তারপর পোল পেরিয়ে সে সেখানেও যায়। কিন্তু সন্তোষকে দেখতে পায় না। ব্যাকুলভাবে ফিরে আসে সে আবার ওয়েটিং রুমে। ভয় হয় ওর—ও যখন যাচ্ছে তখন সে অন্য-পথে ফেরে নি তো? আবার খানিকটা বসে অপেক্ষা করে ওয়েটিং রুমে। তারপর

আবার ছুটে বেরিয়ে আসে প্ল্যাটফর্মে—তন্ন তন্ন করে খোঁজে। কিন্তু সন্তোষের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

দুশ্চিন্তা, উত্তেজনা, উপবাস, রাত্রিজাগরণ, তারপর এই একটা একান্ত অসহায়-বোধ ও অজানা আশঙ্কা—এতগুলো আর সরমা সইতে পারলে না। সে মাথা ঘুরে প্ল্যাটফর্মেরই একটা ধারে বসে পড়ল।

ইতিমধ্যে ওকে ঐ রকম একা একা বিহ্বল ভাবে ঘুরতে দেখে জন-দুই গুণ্ডা ওর সঙ্গ নিয়েছিল। এখন একজন অত্যন্ত আত্মীয়তা দেখিয়ে ওর হাত ধরে তুলতে গেল, 'কেয়া হুয়া বহিনজী? কী হয়েছে আমাকে বোলেন, আমি সব ঠিক করিয়ে দিব। চলেন চলেন—এই স্টেশনের বাইরে আমাদের বাসা আছে—কুছু ভাবনা নেই, চলেন—'

কিন্তু সরমা এত নির্বোধ নয়। সে কাশীর মেয়ে, বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পেরে নিমেষে সবল হয়ে ওঠে। এক ঝটকায় ওদের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কয়েকটি যাত্রী যেখানে ঘেঁষাঘেঁষি বসেছিলেন, সেইখানে গিয়ে দাঁড়ায় সে। তারপর একটি বৃদ্ধগোছের বাঙালী ভদ্রলোককে দেখে তাঁর কাছে গিয়ে বললে, 'বাবা দেখুন, আমার সঙ্গের লোকটি টাকাকড়ি নিয়ে কোথায় সরে পড়েছে। আমায় একখানা টিকিট কেটে দিয়ে যদি সঙ্গে করে একটু কলকাতায় নিয়ে যান। ভাড়ার টাকা অবশ্য আমিই দেব। বড় বিপদে পড়েছি।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি ভ্রূ কুঁচকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর মুখের পানে চাইলেন, 'সঙ্গের লোক? কী রকম লোক? সে কে হয় তোমার? কোথায় যাচ্ছিলে? তোমার কপালে তো সিঁদুর দেখছি—স্বামী কোথায়?'

উপর্যুপরি এতগুলি প্রশ্নে বিহ্বল হয়ে গেল সরমা। তাছাড়া তার পিছনে যে নীচ সন্দেহ আছে তা বুঝতে পেরেও ওর সঙ্কোচের সীমা রইল না ; ওর সেই আনত মুখের রক্তিমা লক্ষ্য করে বৃদ্ধ যেন বিজয়গর্বে বললেন, 'হুঁ, বাব্বা! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা খুঁজতে এসেছিলে! ওসব আমি বুঝি। আমারও ঢের বয়স হ'ল। এখান থেকে সরে পড়ো দিকি বাছা! ও চালাকি এখানে খাটাতে এসো না! আমাদের ঘাড় চাপতে পারবে না।'...তারপর অপেক্ষাকৃত নিচু সুরে অর্ধস্বগতোক্তি করলেন, 'বুড়ো মেরে খুনের দায়ে পড়ি আর কি! থানা পুলিস করবে কে বাবা? সাক্ষাৎ আগুনের খাপরা!'

সরমার মনে হ'ল ধরিত্রী দ্বিধা হয়ে তাকে গ্রহণ করলে সে বাঁচে। এতক্ষণের এত কষ্ট যদি বা সয়েছিল, এ অপমান ওর সহ্য হ'ল না। সে কেঁদে ফেললে।

একটি প্রৌঢ় হিন্দুস্থানী দূরে বসেছিল, সে সবই লক্ষ্য করেছে। কথা না বুঝলেও ব্যাপারটা অনুমান করতে আটকায় নি। এইবার এগিয়ে এসে বললে, 'বহিনজী, কেয়া হুয়া?'

সরমা চোখ মুছে বললে, 'আমার সঙ্গে এক কর্মচারী ছিল, কোথায় হারিয়ে গেছে খুঁজে পাচ্ছি না। আমি কলকাতায় যাব কেমন করে? বড্ড ভয় করছে আমার।'

'কুছ ডর নেহি বহিনজী। আপ আইয়ে, হামারে মাতাজী ভী যা রহী হৈঁ কলকাত্তা। আপ উনকি সাথ চলা যাইয়ে—বে ফিকর্!'

লোকটির চেহারার মধ্যে এমনই সসম্ভ্রম আন্তরিকতা ছিল, সরমা সত্যি সত্যি নির্ভয়ে গিয়ে ওঁর মায়ের সঙ্গে গাড়িতে চাপল।

॥ দশ ॥

বরদা একা সেইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন। তারপর একসময় তাঁর চমক ভাঙল। শূন্য বাড়িতে তাঁর ঐ ভয়াবহ হাসির বীভৎস রূপটা তাঁর নিজের কাছেও ধরা পড়াতে একসময় তিনি চুপ করলেন। তখন তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল। এই মর্মন্তুদ সত্যটা তিনি তো অনেকদিনই জানতেন, বরং বলা যায় প্রতিনিয়তই আশংকা করছিলেন। তবে এমন আঘাত কেন লাগল তাঁর তা তিনি বুঝতে পারলেন না। আঘাতের আকস্মিকতা নেই কিন্তু প্রচণ্ডতা আছে, তাতেই তিনি যেন বিহ্বল হয়ে গেছেন। সরমাকে তিনি কী এত ভালবেসেছিলেন সত্যিই? তাঁর এতখানি নির্ভরতা ছিল ওর ওপরে?

খালি বাড়িখানা হা-হা করছে। নির্জনতা ও নিঃসঙ্গতা যেন কণ্ঠরোধ ক'রে ধরে। তবু বরদা কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। দু'একবার অস্ফুটস্বরে ডাকলেনও 'সরমা' 'সরমা' বলে। কিছুতেই যেন বিশ্বাস হয় না তাঁর যে সরমা সত্যিই চলে গেছে। সরমা? সেই সরমা?

ওঁর মনের পটে সেই অপূর্ব সুন্দর মুখখানা স্পষ্ট ফুটে ওঠে। কৈ, সে মুখে তো পাপ নেই, বিশ্বাসঘাতকতা নেই। সরলতা ও নির্ভরতাই আছে। যে কুৎসিত সন্দেহ তাঁর দৃষ্টিকে, সরমার মধ্যে যা কিছু সৎ, যা কিছু পবিত্র ও নির্মল, সেদিকে ঝাপসা ক'রে রেখেছিল—আসলে ঘটনাটা যখন ঘটল তখন কিন্তু সেই কলুষিত সংশয়ের পর্দাখানা যেন নিমেষে সরে গেল, বরং এখন অন্তরের বেদনার আলোকে তিনি ওর ভাস্বর ও উজ্জ্বল এক মূর্তিই দেখতে পেলেন।

সরমাকে তিনিই হারিয়েছেন বরং—ইচ্ছে ক'রে ঠেলে দিয়েছেন পাঁকের দিকে।

ঘুরতে ঘুরতে বরদা একসময় নিচে নেমে বাইরের ঘরটিতে এসে দাঁড়ালেন।

সার সার তাঁর জ্যোতিষের বই ও ভৃগুসংহিতার পুঁথিগুলি সাজানো রয়েছে। কাগজপত্র, লেন্স্—নানারকমের ছক চারিদিকে ছড়ানো।

কী কুক্ষণেই তিনি এই বৃত্তি নিয়েছিলেন! কী কুক্ষণেই মানুষের জন্মলগ্নের অশুভ সংস্থানগুলো চিনতে শিখেছিলেন, এমন সাংঘাতিক অব্যর্থ ভাবে।

অকস্মাৎ একটা ক্রোধ—অসহ, প্রচণ্ড অথচ শক্তিহীন প্রতিকারহীন ক্রোধে যেন সমস্ত জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন তিনি।

ডেস্কের ধারের সমস্ত বই কাগজ খাতাপত্রে মারলেন এক টান, সবগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে গেল।

তারই মধ্য থেকে ঠকাস্ ক'রে একখানা চিঠি ঠিকরে পড়ল ওঁরই সামনে—পায়ের কাছে। বিকেল বেলার ডাকে আসা অপঠিত সেই চিঠিখানা!

যন্ত্রচালিতের মতই চিঠিখানা তুলে নিলেন। কৌতূহল বোধ হয় মানুষের অবচেতনে সবচেয়ে প্রবল, তাই এই রকম মানসিক অবস্থাতেও বরদা চিঠিখানা খুলে নিজের চোখের সামনে মেলে ধরলেন।

এ কি! এ যে একটা জন্মকুণ্ডলী! এ থেকে কখনও কোন অবস্থাতেই কী অব্যাহতি নেই?

কিন্তু তা হোক। এর সঙ্গে একটা চিঠিও রয়েছে—তাঁর শ্বশুরের হস্তলিপি। তিনি এতদিন পরে সরমার জন্মদিন, সময় ও জন্মকুণ্ডলীর ছকটা পাঠিয়েছেন।

একেই বলে বিধাতার পরিহাস।

তবু সেই মুহূর্তেই বরদা পাগলের মত কাগজ কলম নিয়ে হিসাব করতে বসলেন। বহুরাত্রি পর্যন্ত গণনা করলেন তিনি, গণনা করতে করতে রাত্রি শেষ হয়ে গেল। নানারকমে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিনি গণনা করে দেখলেন—তাঁর চকিতে দেখা সরমার কররেখা-বিচারই ঠিক। যার এই জন্মলগ্ন ও জন্মকুণ্ডলী, কোনদিন কোন মালিন্য তাকে স্পর্শ করবে না। সতী ও সৌভাগ্যবতী এ নারী, তাঁর যিনি গৃহলক্ষ্মী।

উদ্‌ভ্রান্ত ও বিহ্বল বরদা যখন আবার বাড়ির ভেতরে এসে দাঁড়ালেন, তখন যেন তাঁর বুদ্ধি বিবেচনা চিন্তাশক্তি, এতদিনের অধীত বিদ্যা আর কিছুই নেই, সব যেন তাঁকে ত্যাগ করেছে।

এ কি হ'ল তবে? এ কেমন ক'রে হ'ল?

সারারাত কোথা দিয়ে কেটে গেল বরদা টেরও পেলেন না। হঠাৎ একটা শব্দে চমক ভাঙল।

কে একজন কড়া নাড়ছে।

বরদা সদর দরজা খুলে তাকালেন বাইরের দিকে।

'এই কি বরদা জ্যোতিষীর বাড়ি?'

'আজ্ঞে না।'

'না কি মশাই, এই তো তাঁর সাইন বোর্ড!' লোকটি অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

'তা হবে, কিন্তু এখন তাঁর দেখা পাওয়া যাবে না।' সশব্দে তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেন।

এই তো সবে শুরু। এখনই আরও অসংখ্য লোক আসতে শুরু করবে। অথচ এই মানসিক অবস্থায় বসে বসে হাত দেখা অসম্ভব। রাখালকে ডেকে বললেন, 'এই, কেউ যদি ডাকে তো বলিস বাবুর শরীর খারাপ।'

রাখাল অবাক হয়ে বললে, 'আজ্ঞে বাবু কাল থেকে মাঠাকরুনকে দেখছি না কেন? কাল সারারাত আপনি খেলেও না, খেতে দিলেও না—কাজ করছে বলে আমিও আর ডাকি নি—ব্যাপারটা কি কও দিকি?'

'ও, ওদের কথা জিজ্ঞেস করছিস? আমার, আমার শ্বশুরের বড় অসুখ। তাই সন্তোষকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি ওদের কাশীতে। আমার জরুরী কাজ ছিল বলে যেতে পারি নি। ওরাও তাড়াতাড়ি টেলিগ্রাম পেয়েই চলে গেছ—রান্নাবাড়া করে যেতে পারে নি।'

'কে বললে বাবু, আন্নাঘরে সব থরে থরে চাপা দেওয়া রয়েছে—'

'তাই নাকি? তবে তুই খেলি না কেন?'

'আপনি না খেলে খেতি পারি?'

'দ্যাখ্—এখন যা পারিস খেয়ে নে—খাবার মত যদি থাকে কিছু!'

'আর আপনি?'

'আমার শরীর সত্যিই ভাল নেই—'

বরদা ওপরে শোবার ঘরে এসে বসলেন। কাশী? সত্যিই তো, সরমা নিশ্চয় কাশী গেছে। ভগবানই এ কথা ওঁর মুখ দিয়ে বলিয়ে নিলেন। সরমা আবিশ্বাসিনী

নয়—হ'তেই পারে না। সে কাশী গেছে, ঠিক। বরদা প্রায় চেঁচিয়েই বলে উঠলেন, 'সরমা কাশী গেছে, নিশ্চয় কাশী গেছে!'

তিনি যেন আঁধারে কূল পেলেন। সেই উত্তেজিত অবস্থায় তখনই নিচে এসে ডাকলেন, 'রাখাল!'

রাখাল তখন বাইরে ব্যস্ত। মক্কেলদের সঙ্গে রীতিমত ঝগড়া বাধিয়েছে, 'বলছি তেনার সঙ্গে দেখা হবে না, ঝামেলা করো নি—কী রকম ভদ্দরনোক বাবু আপনারা!'

'আ ম'লো—এ বুড়ো তো আচ্ছা ছোটলোক! বলছি ঠাকুর মশাই আমাকে আজকে আসতে বলেছিলেন!'

'দ্যাখো বাবু, ছোটনোক ছোটনোক করো নি বলছি। ভাল হবে না।' রাখাল রুখে উঠল।

বরদা এই সময় আবার ডাকলেন, 'রাখাল!'

'যাই বাবু।' দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে রাখাল ভেতরে এল।

'রাখাল, আমি এখনই কাশী যাচ্ছি। ফিরতে দিনতিনেক দেরি হবে বোধ হয়। তুই থাক, চাল ডাল যা আছে তুই রেঁধে খাস। এই দুটো টাকা রাখ আপাতত। যদি অন্য কোন খরচা করতে হয় তো করিস।'

'এখনই কোথায় যাবে বাবু! আগে চ্যান্‌ট্যান করো, যা হয় দুটো ফুটিয়ে নিয়ে মুখে দাও—'

'না রে। গাড়ির সময় হয়ে গেছে। তা ছাড়া বলছি না, শরীর ভাল নেই!'

বরদা আর দাঁড়ালেন না। ওপরের ঘরগুলোয় এবং বাইরের ঘরে তালা বন্ধ করে চাবিটা ওঁর ভাড়াটে মুদির কাছে রেখে দিলেন। সে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে, 'কী ব্যাপারডা হ'ল ঠাকুরমশাই?'

'শ্বশুরের বড় অসুখ। তার পেয়ে কাল ও চলে গেছে, আমিও যাচ্ছি আজ। দিনতিনেক পরে ফিরব।'

'এই রে! সেরেছ! এমনিই তো বাবু আপনার সব লোকজনের জন্যি আমার কাজকারবার হবার উপায় নেই, তার উপরি আপনি থাকছেন না—এত লোকজন তাড়াবে কেডা?'

'কেন, তুমি তো রইলে হারাধন!' বরদা হাসবার চেষ্টা করেন।

'আমিও কি আর থাকতি পারব? আমাকেও পালাতি হবে আপনার খদ্দেরের জ্বালায়। তা চাবিটা কেন দেচ্ছেন আমারে?'

'থাক্ চাবি, আমার যা মনের অবস্থা, হয়ত হারিয়ে ফেলব। চাকরটা নতুন, ওর কাছে তো সব চাবি রেখে যাওয়া যায় না। তুমি একটু দেখোশুনো, বুঝলে?'

অস্নাত, অভুক্ত, রাত্রিজাগরণে ক্লান্ত বরদা কোনমতে একখানা টিকিট কেটে দুপুরের এক্সপ্রেসে চড়ে বসলেন। খাওয়ার কথা তাঁর মনেও হ'ল না একবার। মনের যে কী শোচনীয় অবস্থা তাঁর তা ভগবানই জানেন।

শুধু রাত্রে কিউল স্টেশনে একবার নেমে মুখে-হাতে জল দিয়ে একটু কি মিষ্টি কিনে জল খেলেন। জল খেয়ে যখন আবার নিজেরা কামরায় ফিরে আসছেন তখন মনে হ'ল হাওড়াগামী যে ট্রেনটা এতক্ষণ ওধারের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থেকে এইমাত্র ছাড়ল, তারই একটা মেয়ে-কামরায় কে একটি মহিলা ওধারের দিকে চেয়ে বসে আছেন—তাঁর পিছনটা অনেকটাই সরমার মত দেখতে।

জ্যোতিষী আপন মনেই ম্লান একটুখানি হাসলেন। তিনি এখন তো জগৎসুদ্ধই

সরমা দেখবেন!

কিন্তু সেই গাড়িতেই সরমা ছিল, সত্যি সত্যি।

প্রথমত সে ক্লান্তভাবে অন্যদিকে চেয়ে বসেছিল, তাছাড়া এদিকে চেয়ে থাকলেও অন্ধকারে ওঁকে দেখা সম্ভব হ'ত না। বিধাতার এমনি বিড়ম্বনা যে, যে-দুটি নরনারী আজ একান্তভাবে পরস্পরের উদ্দেশেই যাত্রা ক'রেছে, তারা একই স্টেশনে এতক্ষণ রইল অথচ কেউ কারুর সন্ধান পেলে না।

হাওড়ায় নেমে হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকটি একটি রিক্সা ভাড়া করে দিলেন। কিন্তু বাড়িতে এসে অফিসঘরের দরজা বন্ধ দেখেই প্রথম ওর বুক কেঁপে উঠল। বরদার উগ্রমূর্তির ভয় ওরও ছিল বৈকি। কিন্তু আজ ও সমস্তরকম লাঞ্ছনার জন্যই প্রস্তুত হ'য়ে আছে—শত নির্যাতনেও আর বরদাকে ছেড়ে সে যাবে না।

কিন্তু অফিসঘরের দোর বন্ধ কেন? শরীর খারাপ করল নাকি? না মন খারাপ? পাড়ায় কোন খারাপ কথা র'টে যায় নি তো ইতিমধ্যে? নানা আশঙ্কা যেন একসঙ্গে ভিড় ক'রে এল ওর মাথায়।

কড়া নাড়তেই রাখাল এসে দোর খুলে লাফিয়ে উঠল, 'এই নাও কাণ্ড! কখন এলে মা? আপনার বাবা কেমন আছে, দাদামশাই?'

'আমার বাবা!' অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করে সরমা। কথাটা ধরতে পারে না।

'তবে যে শুনলুম আপনার বাবার খুব অসুখ, তার এয়েছেন আপনি আর সন্তোষবাবু গেছ।'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাই তো!' মৃতদেহে প্রাণ পায় যেন সরমা, 'ও সেই কথা বলছ? আমার আর কি মাথার ঠিক আছে। বাবা এখন একটু ভাল, তাই আমি চলে এলুম তাড়াতাড়ি, বাবুর অসুবিধা হচ্ছে এখানে খাওয়া দাওয়ার—আমি কি আর থাকতে পারি? একবার দেখেই যেমন বুঝলুম প্রাণের ভয় নেই, অমনি রওনা—'

'আর দ্যাখো, বাবু আবার ছুটল কাল। বাবুর সঙ্গে দেখা হয় নি, হ্যাঁ মা?'

'বাবু গেছেন? কোথায়?' সরমার কণ্ঠে যেন স্বর বার হয় না।

'বাবুও তো কাশী গেলেন। বললেন জরুরী কাজ ছিল, আমি তো আর কাল আত্তিরে যেতে পারি নি রাখাল, তা তুই রইলি, খাওয়া-দাওয়া করিস—আমি তিন দিনের মধ্যেই ফিরব।'

তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করলে, 'বাবুর সঙ্গে দেখা হয় নি, হ্যাঁ মা?'

'কেমন ক'রে হবে? আমি তো কাল রওনা হয়েছি ওখান থেকে।'

'তা বটে, এখন ছানচ্যান করো বাপু। আমি উনুনটায় আঁচ দিই।'

তারপরেই বোধ হয় তার কথাটা মনে পড়ে যায়—'তা হ্যাঁ মা, সন্তোষবাবু এল নি?'

'না-না—সন্তোষবাবু ওখানে রইল। দিনকতক পরে আসবে। ওদের ওখানে পুরুষমানুষেরই দরকার কিনা। আমার ভাইরা তো সব ছেলেমানুষ।'

তারপর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠ'তে বন্ধ দরজাগুলোর দিকে চেয়ে সরমা থমকে দাঁড়িয়ে গেল, 'হ্যাঁরে ওপরের চাবি?'

'আজ্ঞে সে মা-ঠাকরুণ, ধরো, বাবুর বুদ্ধি খুব। হারাধন মুদির কাছে চাবিটা থুয়ে গেছেন।'

সরমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'যা, হারাধনকে আমার নাম করে বলগে যা—না হয় ডেকে আন এখানে।'

নিশ্চিন্ত হয়েই সরমা ওপরে উঠে গেল।

ভোরবেলা বরদা যখন কাশীতে নামলেন তখন তাঁরও মানসিক অবস্থা অনেকটা শান্ত, এমন কি নিশ্চিন্ত হয়ে এসেছে। সরমা যে কাশীতে এসেছে এতক্ষণে এ সম্ভাবনাটা বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে যাওয়ার ফলেই মানসিক প্রশান্তিটা সম্ভব হয়েছে।

বরং দাম্পত্য কলহটা মিটে যাবার পর ঘটনাটা যে চিরকালের জন্য একটা কৌতুকের উৎস হয়ে থাকবে—এই কথাটা মনে হয়ে ট্রেন থেকে নামবার সময় তাঁর মুখে একটু মধুর হাস্যরেখাও ফুটে উঠল।

শ্বশুরবাড়িতে পা দিতেই প্রথম যাঁর সঙ্গে ওঁর দেখা হল, তিনি ওঁর শ্বশুর মশাই। কিন্তু জামাতাকে দেখে তিনি রীতিমত বিস্মিত হয়ে উঠলেন।

'বিলক্ষণ! বাবাজী যে—এমন হঠাৎ! মুখখানা এমন শুক না কেন বাবাজী, চোখের কোণে কালি, সারা দেহটাকে কালি মেড়ে দিয়েছে! খবর সব ভাল তো? সরমা ভাল আছে?'

অকস্মাৎ বরদা তাঁর মেরুদণ্ডে যেন একটা শৈত্য অনুভব করেন।

'সরমা—সরমা এখানে আসে নি?'

'সরমা? সরমা এখানে আসবে? বিলক্ষণ। কেন, কী হয়েছে? কার সঙ্গেই বা আসবে সে? কী বলছ বাবাজী, কিছুই যে বুঝতে পারছি না।'

বরদার চোখের সামনেটায় যেন সমস্ত আলো লেপে মুছে একাকার হয়ে গেল সব। তিনি কোনমতে সেই সিঁড়িটার ওপরই বসে পড়লেন।

'সরমা তাহ'লে আসে নি এখানে?'

উপেনের কণ্ঠস্বর আর্ত শোনাল কতকটা, 'সরমার কী হয়েছে বাবাজী খুলে না বললে তো কিছুই বুঝতে পারছি না! তুমি এমন ধুলোর ওপর বসেই বা পড়লে কেন? এমন চেহারাই বা কেন তোমার? সরমা বেঁচে আছে তো?'

কঠিন বিদ্রূপের হাসিতে বরদার মুখ রঞ্জিত হয়ে উঠল, 'সে ভয় নেই আপনার, বেঁচে আছে বৈ কি! ওসব মেয়ে মরে না—'

'কিন্তু ব্যাপারটা কি তাই খুলে বল না! কী করলে সরমা?'

'না, বিশেষ কিছু করে নি। সন্তোষের সঙ্গে সে গৃহত্যাগ করেছে।'

'কী—কী করেছে বললে?'

'গৃহত্যাগ করেছে। বাংলা বোঝেন না? সন্তোষের সঙ্গে।'

'সন্তোষ কে?'

'আমার দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি। অসময়ে আশ্রয় দিয়েছিলুম, জ্যোতিষ শাস্ত্র শেখাচ্ছিলুম যত্ন ক'রে।'

উপেন কিছুক্ষণ হাঁ ক'রে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর অতিকষ্টে বললেন, 'আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল, না তোমার হ'ল—বাবাজী, সেইটেই বুঝতে পারছি না। আমার মেয়ে সরমা গৃহত্যাগ করেছে—পরপুরুষের সঙ্গে? এ যে অসম্ভব!'

'তা হবে।' নির্লিপ্ত শুষ্কস্বরে উত্তর দেন বরদা।

অকস্মাৎ ওঁর হাত-দুখানা চেপে ধরে উপেন বলেন, 'দোহাই বাবাজী, ঠিক করে বলো—এ কি সত্যি বলছ?'

'নইলে কি তামাসা করছি? এসব কথা নিয়ে অন্তত গুরুজনের সঙ্গে কেউ

তামাসা করে না।'

'কিন্তু, কিন্তু তা কেমন করে হবে বাবাজী! আমার মার পায়ের ধুলো কাশী শহর সুদ্ধ লোক মাথায় নিত। স্ত্রী আমার সতী-সাধ্বী ছিলেন—এ কথা যাকে জিজ্ঞেস করবে সেই বলবে। আমিও গরীব বটে বাবা, কিন্তু এখনও ত্রি-সন্ধ্যা আহ্নিক করি—জ্ঞানত কারুর অনিষ্ট করি নি। আট বছর বয়স থেকে শিবরাত্রি করছি; বাবা বিশ্বনাথ মা অন্নপূর্ণা বুড়ো বয়সে এমন আঘাত দেবেন! তাঁদের রাজত্বে তো কোন অপরাধ করি নি বাবা!'

উপেনের চোখে জল এসে গেল।

'মা সরমাকেও আমি জানি বাবা, সেও তো তেমন মেয়ে নয়। ঝগড়াঝাঁটি করে কোথাও যায় নি তো?'

'কোথায় যাবে বলুন। সেই ভরসাতেই কাশী এসেছিলাম। যাবার মত আমার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। আপনার আছে কিনা জানি না।'

উপেনও ধীরে ধীরে সেই সিঁড়িরই একটা ধাপে বসে পড়লেন।

'সন্তোষের সঙ্গে তাদের বাড়ি-টাড়ি যায় নি তো?'

'তাদের বাড়ি বলতে কিছু নেই।'

'তাহ'লে মা আমার নিশ্চয় আত্মহত্যা করেছে। আমি বলছি বাবাজী, কোন নীচ কাজ সে কখনও করবে না।'

বরদার দৃষ্টি আরও প্রখর হয়ে উঠল। তিনি ওঁর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'আমি কেন প্রথমে আপনার কন্যাকে বিয়ে করতে চাইনি জানেন? যেজন্যে আপনি এবং আপনার মেয়ে দুজনেই আমাকে অকৃতজ্ঞ ভেবেছিলেন!'

উপেনের মাথায় যেন কোন কথাই ঢুকছিল না। তবু তিনি বললেন, 'কেন বাবা, তা তো জানি না।'

'আমার জন্মকোষ্ঠীতে ঐ যোগই ছিল—স্ত্রী কুলত্যাগিনী হবে!'

'হা ভগবান!' উপেন ললাটে আঘাত করলেন, 'কিন্তু বাবা, তুমি তো ওর হাতও দেখেছিলে? তাতে কি লেখা ছিল?'

কিছুকাল অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইলেন বরদা, তারপর বললেন, 'না, ওর হাতে তেমন কিছু পাই নি বটে, কিন্তু হ'ল তো তাই!'

তারপর সহসা তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি তাহ'ল যাই এখন!'

মুহূর্তে সম্বিৎ ফিরে এল উপেনের, 'বিলক্ষণ! এখনই যাবে কি? সে না হয় অপরাধ করেছে বাবাজী, তার অপরাধে আমাকে দণ্ড দিও না। এই শরীর তোমার, স্নানাহার করো আগে—সুস্থ হও—চলো চলো, ওপরে চলো।'

তিনি ওঁর হাত ধরে একরকম জোর করেই ওঁকে ওপরে নিয়ে গেলেন।

কিন্তু কাশীতে বরদা বেশিদিন থাকতে পারলেন না। এই বাড়ির প্রতিটি কোণে ওঁর পক্ষে মর্মান্তিক স্মৃতির আভাস আছে। মার কথা মনে পড়ে যায়, সরমার কথা মনে পড়ে। সরমা তাঁকে যে সব কথা বলেছিল—তার সেবা, তার সেই ঐকান্তিক যত্ন মনে পড়ে যায়। তাঁর নিজের দোষেই হয়ত এমন রত্ন হারালেন।

পরের দিনই বরদা বেরিয়ে পড়লেন ওখান থেকে।

ছলো-ছলো চোখে উপেনবাবু বললেন, 'কী আর বলব বাবাজী, এখানে তোমাকে বেশি দিন ধ'রে রাখব সে জোর আর কৈ! তবে একটা কথা রাখ বাবা, তোমার জীবনটা নষ্ট করো না। ঘরে ফিরে যাও, আর একটি বিবাহ করো। আমার কন্যার

অন্য ঢের দুঃখ পেলে, এবার যেন সুখী হতে পারো, বাবা বিশ্বনাথের কাছে এই প্রার্থনাই করি।'

বরদা কেমন একটা অবসাদখিন্ন শূন্যদৃষ্টিতে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, 'কে জানে হয়ত আমারই অন্যায়, হয়ত আমিই তাকে এই পথে ঠেলে দিলাম—'

'বিলক্ষণ! এমন কথা বলো না বাবাজী। তোমার আবার অন্যায় কি? তুমি যদি বা কিছু রূঢ় ব্যবহার করো—তা বলে সে কি বেরিয়ে যাবে? না না, তুমি তাকে ক্ষমা করলেও আমি তার সেই আচরণ ক্ষমা করব না। কাশী শহরে সবাই আমাকে চেনে বাবাজী, সবাই আমাকে সদ্ ব্রাহ্মণ বলে জানে। সেই মুখটা আমার সে পুড়িয়ে দিলে চিরকালের মত!'

বরদা আর দাঁড়ালেন না।

কিন্তু তিনি বাড়িও ফিরলেন না। আবারও তীর্থভ্রমণে বার হলেন, সঙ্গে কিছু টাকা ছিল, এলাহাবাদ পৌঁছে একটা চেক দিয়ে পরিচিত ভদ্রলোকের কাছ থেকে আর কিছু টাকা সংগ্রহ করে নিলেন। তারপর নৈমিষারণ্য, চিত্রকূট প্রভৃতি সেবারের না-দেখা তীর্থ সেরে হরিদ্বারে গিয়ে পৌঁছলেন। স্থির করলেন এখানেই কিছুদিন থাকবেন।

এখানে বড় শান্তি; সকাল সন্ধ্যা গঙ্গাতীরে গিয়ে বসেন। একবেলা এক সাধুদের আখড়ায় প্রসাদ পান, আর একবেলা দুধ মিষ্টান্ন খেয়ে কেটে যায়। কোন কাজ নেই এখানে তাঁর, অন্য কোন পার্থিব ব্যাপারের সঙ্গেই যেন আর যোগাযোগ নেই।

এমনি কর্মহীন উদ্দেশ্যহীন জীবনযাপন করতে করতে হঠাৎ একদিন কুশাবর্ত ঘাটে স্নান করতে গিয়ে ওঁর জ্যোতিষশাস্ত্রের গুরু স্বরূপানন্দ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রথম যৌবনে এঁর কাছ থেকেই উনি কাশীতে ভৃগুসংহিতার পাঠ নিয়েছিলেন—পুঁথিও অনেক পান এঁর কাছে।

'আরে বরদা যে! কী ব্যাপার, এখানে? দাড়ি ফাড়ি কামাও নি! তুমিও সন্ন্যাসী হয়ে গেলে নাকি?'

ওঁকে পেয়ে বরদার মনে হ'ল যেন হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেলেন। তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে প্রণাম করে বললেন, 'আপনি এখানে?'

'আছি কিছু কাল। এই কন্‌খলে থাকি। আর বয়স হচ্ছে তো, মধ্যে মধ্যে কিছুদিন নির্জনে থাকতে ইচ্ছা করে। নইলে পরকালের কাজ কিছুই হয় না। বড় ঝামেলা কাশীতে—তারপর, তুমি কি করছ, শুনেছি তুমি খুব বড় জ্যোতিষী হয়েছ —খুব নাকি দুর্মুখ জ্যোতিষী—লোকে যেতে ভয় পায়!' স্মিতহাস্য করলেন স্বরূপানন্দ।

'এসব কথা আবার কোথা থেকে শুনলেন?'

'আছে হে, আছে। সোর্স আছে বৈকি। কলকাতার লোক কি আর কাশীতে আসে না, না কাশীর লোকের কাছে হাত দেখায় না? আমাদেরও মক্কেল আছে হে দু-চারজন!' প্রসন্ন হাস্যে উত্তর দিলেন তিনি।

'কী যে বলেন আপনি! আপনি তো জ্যোতিষ-সম্রাট! কিন্তু আমারও যে আপনাকে দরকার। আমি বড় বিপন্ন।'

'কেন হে, কী আবার হ'ল?'

'সে দীর্ঘ ইতিহাস। পথে দাঁড়িয়ে হবে না। আপনার বাসায় যাবো, কখন

যাবো বলুন দেখি? ঠিকানাটা কি?'

'এখনই চলো না! হাতে তো এখন আর কাজ নেই কিছু। চলো ঐখানেই আহারাদি করবে আজ।'

সমস্ত ইতিহাস শুনে স্বরূপানন্দ চিন্তিত মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'দেখি ওর জন্মকুন্ডলী!'

বরদা তাড়াতাড়ি পকেট থেকে কাগজপত্রগুলো বার করে দিলেন।

কিছুক্ষণ মনে মনে গণনা করে স্বরূপানন্দ বললেন, 'তুমি তো জন্ম-সময় তিথি তারিখ হিসেব করে বার করতে পারো। এ তিথি-নক্ষত্রের সঙ্গে মিলেছে?'

মাথা হেঁট করে বরদা বললেন, 'হ্যাঁ, তা মিলেছে।'

'এই মেয়ে অসতী? বরদা, তুমি কি পাগল? এ মেয়ে যদি কুলত্যাগিনী হয় তাহলে সতীরানী নিজে কুলত্যাগিনী হবেন।'

'কিন্তু আমার হাতটা, আমার ঠিকুজি?'

'এমন হয় বরদা। বিধাতা মানুষের জীবন নিয়ে এমনি বিচিত্র রসিকতাও করেন। এসব ক্ষেত্রে যার গ্রহের জোর বেশি তার ভাগ্য অপরের ভাগ্যকে লঙ্ঘন করে। তোমার স্ত্রীর ভাগ্যের জোর নিঃসংশয়ে বেশি। তোমার এই যে সংশয়, এই যে বেদনা, তাতেই তোমার কররেখার জন্মকুন্ডলীর নির্দেশ কেটে গেছে। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ফিরে যাও—'

'কিন্তু কুলত্যাগিনী না হোন, গৃহত্যাগিনী হয়েছেন এটা তো ঠিক!'

'না-না না! তা হতে পারেন না। তুমি যতদিন তাঁর সন্ধানে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছ, ততদিন তিনি তোমারই ঘরে বসে তোমার পথ চেয়ে আছেন।'

'কিন্তু আমি যে—'

'এর ভেতর কিছু কিন্তু নেই বরদা। তিনি এখন এই মুহূর্তে তোমার গৃহেই আছেন। না হলে জ্যোতিষ-শাস্ত্র মিথ্যা। এ যদি না হয় তো আমি আর জীবনে কোন গণনাই করব না।'

বরদা আর একটি কথাও কইলেন না। কোনমতে ওঁর পায়ের ধুলো নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

'আরে, আরে—ট্রেন তো সেই সন্ধ্যায়। কোথা যাও, কোথা যাও, ও বরদা! খাওয়া-দাওয়া করে যাও! বৌ বৌ করে এ ছোকরার মাথাটা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে দেখছি!'

বরদা ততক্ষণে একটা চলতি টাঙ্গায় উঠে বসেছেন।

॥ এগার ॥

সরমা প্রথমটা ভেবেছিল যে সেইদিনই কিম্বা তার পরের দিন বরদা এসে পড়বেন। কিন্তু আরও তিন-চার দিন যখন কেটে গেল, না বরদা এবং না তাঁর খবর—কোনটাই পাওয়া গেল না—তখন সে রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

এধারে তার হাতে যা নগদ টাকা ছিল যাওয়া-আসাতেই চলে গেছে। রাখাল টাকা চায় খরচের। বাজার বন্ধ করে দিলে সরমা—তাতেও সে অসন্তুষ্ট, গজ গজ

করে, 'জানিনে বাপু, তোমাদের কী ব্যাপার তা তো বুঝিনে! আপনিই কোথায় বা চলে গেলে চুপি চুপি, বাবু তো পাগলের মত। তারপর আবার বাবু চলে গেল, বলে গেল দু-তিন দিনে ফিরব আজও তার পাত্তা নেই, আপনিই বা কোথা থেকে এক কাপড়ে হুপ্ ক'রে এলে জানি না—না, এসব ধরণ-ধারণ আমার ভাল লাগে না। আমার মাইনে মিটিয়ে দাও বাপু, আমি বাড়ি চ'লে যাই।'

একদিন হারাধনও বিদ্রোহ ক'রে বসল, রাখাল এসে খবর দিলে, 'ঐ লাও! দোকানি জিনিস দিলে নি!'

'কেন রে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করে সরমা।

'ট্যাকা চায় সে! ট্যাকা! নগদ দাম ছাড়া মাল দেবে নি। ব'লে যা আমার কাছে ভাড়া পাওনা তার চেয়ে ঢের বেশি মাল দিয়েছি। আর আমি পারব নি। অকম-সকম নাকি ওর ভাল লাগছে না।'

সরমা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে বসে থেকে বললে, 'হারাধনকে একবার আমার নাম করে ডেকে দিবি বাবা রাখাল!'

'তা আর দুব নি কেন, এ আর এমন কি শক্ত কাজ—তবে সে আসবে কিনা তা বলতে পারব নি।'

হারাধন এসে মুখখানা অন্ধকার করে দাঁড়াল।

অপমানে সরমার মুখ লাল হয়ে উঠল, তবু শেষ পর্যন্ত মিষ্টি ক'রেই ওকে কথা কইতে হ'ল, 'হারাধনবাবু, আপনাকে আর দুটো দিন সবুর করতেই হবে—বাবু না আসা পর্যন্ত!'

হারাধন বললে, 'সবুর আর আমি করতি পারব না মা-ঠান্। আর কত সবুর করব? টাকা না হয় না নিলাম কিন্তু মাল আর আমি বাকিতে দিতে পারব না।'

সরমা কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থেকে বললে, 'বেশ, তাহলে আমার একটা গহনা বিক্রী করিয়ে দাও, তোমাদের টাকা চুকিয়ে দিচ্ছি।'

'বাপ্‌রে! ও সব হাঙ্গামে যাবে কেডা! সে আমি পারব না। তাছাড়া এসব কী যে ব্যাপার তা তো বুঝি না। পাড়ার লোকে নানা মন্দ বলছে। বলছে আপনি নাকি কে এক ছোঁড়ার সাথে কোথা চলে গিইছিলেন। তাইতি বাবু পাগল হয়ে দেশান্তরী হয়েছে। বাবু চাবি দিয়ে চাবিডা আমার কাছে রেখে গেল, আপনি তো এসে জেঁকি বসলেন! এখন যে বাবু কি বলবেন তা তো বুঝি না!'

সরমার চোখে আগুন জ্বলে উঠল, 'এত বড় আস্পর্দ্ধা তোমার! কী যা-তা বলছ? তুমি আমার বাড়ির ভাড়াটে, একথা ভুলে যেও না!'

'না না, তা বলছি না। আপনাকে তাড়ায় কেডা। তা তা—আমি তো মা-ঠান্ মুখ্যু মানুষ—হ্যাঙ্গাম-হুজ্জুতির বড় ভয় আমার। যাই আজ্ঞে, কিছু মনে করবেন না—দণ্ডবৎ হই।'

হারাধন একরকম পালিয়েই গেল সরমার সে দৃষ্টির সামনে থেকে।

সরমা নিজেকে একটু সামলে নিয়ে রাখালকে ডেকে বললে, 'রাখাল, তুই কোন পোদ্দারের দোকানে আমার দুগাছা চুড়ি বাঁধা দিয়ে কি বিক্রী ক'রে কিছু টাকা আনতে পারিস?'

এতখানি জিভ কেটে রাখাল সভয়ে পিছিয়ে গেল, 'সে আমি পারব না মা। ওসব বড় গোলমেলে ব্যাপার আমি শুনেছি। এর পর যদি থানা-পুলিস হয়?'

'অ, আচ্ছা থাক।'

সেদিনটাও অপেক্ষা করে সরমা। যদি বরদা আসে। সে তো খাওয়া ছেড়েই দিতে পারে কিন্তু রাখাল শোনে না যে!

বাবাকে একটা চিঠি লিখলে শেষ পর্যন্ত। এইটেতে ওর ঘোরতর অনিচ্ছা ছিল। যদি বাবার কাছে বরদা না গিয়ে থাকেন তো মিছামিছি কথাটাকে জানাজানি করা— তাঁকেও উদ্বিগ্ন করা। কিন্তু এখন আর যেন কোন দিকেই কোন কূল-কিনারা পাচ্ছে না। অগত্যা তাঁকে সে লিখলে—

শ্রীচরণেষু—

বাবা, অনেকদিন আপনাদের কোন খবর পাই নি। আশা করি ভালই আছেন। আপনার জামাই কয়েকদিন হ'ল কাশী যাচ্ছি বলে বেরিয়েছেন, কিন্তু এতদিন হয়ে গেল তাঁর কোন খবর নেই, তিনি ফেরেনও নি। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছি। তিনি ওখানে গিয়েছিলেন কিনা এবং এখনও আছেন কিনা-পত্রপাঠ লিখে জানান। আপনি আমার প্রণাম জানবেন। তনু দীপু শম্ভুকে আমার ভালবাসা দেবেন। ইতি—

সেবিকা—সরমা

চিঠি দিয়েও আবার সেই উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষা। যেখানে যত পয়সা ছিল—মায় লক্ষ্মীর কৌটোর টাকা পর্যন্ত, খরচ হয়ে গেল। কিন্তু তাতে কোনমতে কদিন ভাতে-ভাত খাওয়া চলল। রাখাল এবার স্পষ্টই বিদ্রোহ করেছে, 'এত কষ্টের খাওয়া খেয়ে থাকতে পারব নি বাপু। আমার মাইনেপত্তর চুকিয়ে দেওয়া হোক—এ বাড়ির কাজ আর করব নি।'

সরমা এবার সত্যিই অন্ধকার দেখলে।

এখানে এসে প্রতিবেশীদের সঙ্গে তার দেখা হয় নি। দেখা করার ইচ্ছাও ছিল না—উপায়ও ছিল না। কারণ ছাদে উঁচু পাঁচিল—জানলা বন্ধ। সামনের বাড়িতে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সঙ্গে খুব ভাব ছিল না কোনকালেই। কিন্তু এখন যাকে হোক ওর চাই-ই।

শেষে মরীয়া হয়ে উঠল। না হয়ে উপায়ও ছিল না—রাখাল সত্যি-সত্যিই মাল-পত্র নিয়ে সরে পড়ল একদিন। একেবারে একা এই বাড়িতে—ঘরে একদানা চাল নেই, একটা আলু কি এক ছটাক নুনও আর নেই।

ভয়ও করে এত বড় বাড়িতে একা থাকতে।

একদিন বিকেলে ছাদেই উঠল। কাটারি দিয়ে ঘা মেরে মেরে ছাদের পাঁচিলের কতকগুলো ইট সরিয়ে ফেললে। যাতে দাঁড়িয়ে অন্তত নজর যায় বিমলদের বাড়ির দিকে।

প্রথমেই চোখে পড়ল, বোধ হয় ইটভাঙার শব্দেই, বিমলের মা উগ্র কৌতূহলে এইদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু আশ্চর্য এই, চোখোচোখি হওয়া মাত্র তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছাদের শুকনো কাপড় তুলতে লাগলেন।

সরমা একটু বিস্মিত হ'ল বটে। কিন্তু তার তখন অত তলিয়ে ভেবে দেখার সময় নেই। সে ব্যস্ত হয়ে ডাকলে, 'মাসিমা!'

সাড়া নেই। মাসিমা কাপড় কুঁচোতেই ব্যস্ত।

'ও মাসিমা, শুনছেন?'

এবারে এমনই আর্ত শোনাল ওর কণ্ঠস্বর যে মাসিমা আর না-শোনবার ভান করতে পারলেন না। মুখে স্পষ্ট বিরক্তির ছাপ টেনে এনে ঝঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠলেন, 'কেন বাছা অত হাঁকাহাঁকি করছ? অত বড় পণ্ডিত লোকটা তো তোমার জ্বালায় দেশান্তরি হ'ল, আবার আমাদেরও কি এপাড়া ছাড়াতে চাও? তোমার গুণ জানতে আর কার বাকী আছে বলো, দেশসুদ্ধ তো ঢি-ঢিক্কার! আমাদেরও বাছা সোমত্থ ছেলে নিয়ে ঘরকন্না—ভয় করে তোমার বাতাস গায়ে লাগাতে। তাছাড়া এমনিও তোমার মত নষ্ট মেয়েমানুষের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখলে পাড়ার লোক যে আমাদের গায়ে কাদা ছিটোবে!'

তিনি এক নিশ্বাসে সমস্ত বিষ উদ্গার করে মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন।

সরমা একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছিল। বহুক্ষণ তেমনি একভাবে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে নিচে নেমে এল। ওর দীর্ঘনিশ্বাসও যেন ফুরিয়ে গিয়েছিল—চোখের জল তো বটেই।

নিচে নেমে দেখলে পিওন সদর দরজার ফাঁক দিয়ে একটা চিঠি ফেলে দিয়ে গেছে। দূর থেকেই ঠিকানা লেখার ভঙ্গী দেখে মনে হ'ল ওর বাবার লেখা। ছুটে গিয়ে তুলে নিল। একটা পোস্টকার্ডে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত চিঠি—

তোমার মত পাপিষ্ঠার সহিত কোন সম্পর্ক আমাদের নাই, থাকিতে পারে না। তোমার মাতা, পিতামহী সকলেই সতী সাধ্বী ছিলেন, তুমি তাঁহাদের নাম ডোবাইয়াছ, তাঁহাদের সুনামে কালি দিয়াছ। তাঁহারা স্বর্গ হইতে অভিসম্পাত করিতেছেন তোমাকে। আমার তো কথাই নাই। অমন দেবতার মত তোমার স্বামী, তোমার এই ব্যবহারে পাগলের মত কে জানে কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। যাহা হউক এই আমাদের শেষ চিঠি তোমাকে। ভবিষ্যতে আর সংবাদ আদান-প্রদানের চেষ্টা করিও না। তোমার কোন খবর না আমাদের কানে পেঁছায়, এখন শুধু বাবার কাছে এইটুকু প্রার্থনা করি। ইতি—

সরমার হাত থেকে চিঠিখানা খসে পড়ে গেল। শুষ্ক চোখে ওর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। আপন মনেই অস্ফুট কণ্ঠে সে শুধু বারকতক বললে, 'আমি তাঁদের নাম ডুবিয়েছি? তাঁরা স্বর্গ থেকে অভিসম্পাত করছেন? কিন্তু কেন, কী আমি করেছি?'

আর একটু পরে আবারও ব'লে উঠল, 'কিন্তু সে? সেও এই কথা বিশ্বাস করলে? তাই এমন করে শাস্তি দিচ্ছে আমাকে? সে না জ্যোতিষী, সে না ভূত-ভবিষ্যৎ সব দেখতে পায়? এই তার জ্ঞান, এই তার শিক্ষা?'

চোখের দৃষ্টি ওর প্রখর থেকে প্রখরতর হয়ে উঠছে ক্রমশ। ওষ্ঠের প্রান্তে বক্র, ক্রূর হাসি কেমন এক রকমের।

সে ছুটে বরদার বাইরের ঘরে গেল। পাগলের মত ওঁর জ্যোতিষের পুঁথি আর বইগুলো নিয়ে ছিঁড়েখুঁড়ে গাটিতে ফেলতে লাগল। তার মধ্যে একখানা ছিল বরদার নিজের রচিত একটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি—করকোষ্ঠী বিচারের ওপর এই বই-খানা লিখেছিলেন তিনি—সেটার দিকে চোখ পড়াতে সরমা পাগলের মত কুটি কুটি করে সেখানা ছিঁড়তে লাগল—প্রতিটি টুকরোকে অণুপরমাণুতে ভাগ না করতে পারলে যেন শান্তি নেই।

সে কাজও এক সময় শেষ হয়ে গেল, তবু সরমা শান্ত হ'তে পারল না। ওর মাথায় যেন খুন চেপে গেছে—দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে আপন মনেই বললে, 'খুন করব ওদের—সবাইকে খুন করব।' তারপর হঠাৎ ছুটে সে রাস্তায় বেরিয়ে গেল

গলি ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় পড়েও ওর জ্ঞান হ'ল না। কোনদিকে না চেয়ে একদিক পানে ছুটতে লাগল সে পাগলের মত।

॥ বার ॥

বরদা ওধারে হাওড়ায় নেমেই ট্যাক্সি করে ছুটলেন বাড়ির দিকে। বাড়ির সামনে এসে দেখলেন সদর দরজা খোলা, হা-হা করছে। বাড়ি যেন নির্জন, নিস্তব্ধ।

'রাখাল!'

বাইরে থেকেই ডাকলেন তিনি। ভেতরে এসে ডাকলেন, 'সরমা!'

কোনও সাড়া নেই। এ কি হ'ল আবার?

উদ্‌ভ্রান্তের মত অফিসঘরে ঢুকলেন দরজা খোলা দেখে। এ কি! এমন ক'রে এসব ছড়াল কে? তাঁর অত সাধের বইটা—এমন করে ছিঁড়েছে কে? এত কুটি-কুটি ক'রে?

মুহূর্তকাল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেই ব্যাপারটা অনুমান করতে পারলেন তিনি। উপেনের চিঠিটা সামনে পড়েছিল।

ছুটে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

'হারাধন, তোমার—মানে আমার স্ত্রী কোথায় গেছেন জান?'

'আজ্ঞে না। তিনি তো বাড়িতেই ছিলেন। আমার কাছ থেকে ঘরের চাবি তিনি নিলেন একরকম জোর করেই, না বলতি পারলুম না। তবে কদিন তাঁর বড়ই কষ্টে যাচ্ছিল, একদিন ডেকে বললেন একটা গয়না বিক্রী ক'রে দিতি, তা সে বাবু আমি সাহস পেলাম না। এর পর যদি আপনি আমারে মন্দ বলেন! থানা-পুলিস করবে কেডা? রাখালটাও চলে গেছে কি না—মায়না পায় না। থাকবে কেন?'

বরদা অগ্নিদৃষ্টিতে তার দিকে চাইলেন, 'মাল পত্র দিয়েছিলে তাকে?'

'পাগল হয়েছেন? সেই চীজ আমি? নেহাত বাড়িতে ঢোকালেন জোর করে, তাও তখন আমি অত কথা জানিনে তাই—নইলে কি আর ঢুকতি দিই—'

'তা দেবে কেন? তার বাড়িতে ভাড়াটে আছ মনে নেই? অসময়ে দুটো চালডাল দিলে মরে যেতে? কটা পয়সা খেত সে? ভাড়া থেকে কাটা যেত না এর পরে? বেইমান নিমকহারাম কোথাকার! যাও দূর হও—কালই ঘর ছেড়ে দেবে আমার! বেচারীর হয়ত উপোস করেই কেটেছে, হায় হায়! সে কি আর আছে? হয়ত গঙ্গায়—'

বরদা আর দাঁড়ালেন না, তিনিও ছুটলেন গঙ্গার দিক লক্ষ্য ক'রেই।

হারাধন খানিকটা অবাক্ হয়ে চেয়ে থেকে থেকে বললে, 'ঐ লাও, এ আবার এক কান্ড! ব'লে যার জন্যি চুরি করা সেই বলে চোর!'

বরদা খানিকটা উদ্‌ভ্রান্তের মত ছোটবার পর দেখলেন কিছুদূরে দারুণ এক জনতা। খানকতক ট্রাম পর্যন্ত জমে গেছে পর পর। এক জায়গায় যেন অনেকগুলো লোক জটলা করছে—কী সব গোলমাল।

বরদা পাশ কাটিয়েই চলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ কানে গেল, একটি ছোকরা আর একজনকে বলছে, 'এ আবার এক অদ্ভুত পাগলী, যত রাগ জ্যোতিষীর ওপর!'

নিমেষে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন বরদা।

'কী হয়েছে ভাই ওখানে?' হাত ধরে ফেললেন ছেলেটির।

'হবে আবার কি!' সে বিরক্ত হয়ে ওঠে, 'এক পাগলী, রাস্তার ধারে যে-সব জ্যোতিষীরা বসে থাকে না, খড়ি পেতে পুঁথি আর পাখিটাখি নিয়ে?—তাদের এক-ধার থেকে ইঁট মারছে, পুঁথি ধরে ছিঁড়ে ফেলছে—পাখিগুলোকে খাঁচা থেকে উড়িয়ে দিচ্ছে—'

তারপর তার বন্ধুর দিকে ফিরে বললে, 'কী জোর দেখেছিস্ পাগলীর গায়ে, পুলিস সুদ্ধ হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।'

'পাগলের গায়ে জোর হয় যে!'

ওপাশে আর একজন কে বলে উঠল, 'বেশ দেখতে মাইরি ভদ্দরঘরের মেয়ে বলে মনে হয়!'

বরদা আর দাঁড়ান নি। ততক্ষণে তিনি প্রাণপণে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেছেন। লোককে মাড়িয়ে, ধাক্কা দিয়ে, তাদের গালাগালি খেয়ে যখন কাছে পৌঁছলেন তখন দেখলেন তাঁর অনুমানই ঠিক—এ সরমা! একটা কনেস্টবলের হাত ছাড়িয়ে সে ছুটে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে!

'আরে এ কী কান্ড? কই যান ও মশয়?' সবাই প্রতিবাদ ক'রে ওঠে।

বরদা তখন কাছে এগিয়ে গেছেন অনেক কষ্টে। সরমাকে ধরে ফেলে কাঁধ-দুটো ধরে ঝাঁকুনি দিলেন তিনি, 'সরমা! সরমা! আমায় চিনতে পারছ না, আমি?'

'কে তুমি? তোমাকে চিনি না, যাও!'

উদ্‌ভ্রান্তের মত তার শূন্য বিহ্বল চাহনি। অনাহারে ও দুশ্চিন্তায় শীর্ণ মুখে অদ্ভুত এক রকমের হাসি। সে হাসিতে একটা চরম উপেক্ষা ফুটে উঠেছে যেন।

সে ওঁর হাত ঠেলে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলে।

কিন্তু বরদা তখন বজ্র কঠিন হস্তে ওকে ধরেছেন। কোন ক্রমেই ওঁর হাত ছাড়াতে না পেরে সরমা আর একবার চেয়ে দেখল ওঁর দিকে। বিহ্বল দৃষ্টিতে ধীরে ধীরে একটা পরিচয়ের দীপ্তি ফুটে উঠল ওর, সঙ্গে সঙ্গে একটা সুগভীর ক্লান্তি ও অবসাদে এলিয়ে পড়ল স্বামীর বুকের ওপরই অজ্ঞান হয়ে।

গভীর রাত্রে স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে আস্তে আস্তে সরমা বলল, 'তোমার এতদিনের সাধনা আর পরিশ্রম আমি নষ্ট হতে দেব না। কুচিগুলো জুড়ে জুড়ে আবার তোমার বই ঠিক ক'রে দেবো—তুমি দেখো।'

'আমি ওগুলো ফেলে দিয়েছি সরমা। ওতে আর আমার দরকার নেই। যা অদৃষ্ট তা অ-দৃষ্ট থাকাই ভাল।'

হায়নার দাঁত

উৎসর্গ

শ্রীমতী মীরা মুখোপাধ্যায়

ডাঃ শ্রীমতী সান্ত্বনা রায়

করকমলে

জীবনে ছোট ছোট তুচ্ছ ঘটনা দিয়েই বৃহৎ নাটকের শুরু হয়। মনীষীরা বলেন, একটি সুতোকে কেন্দ্র ক'রে যেমন মিশ্রীর কুঁদো দানা বাঁধে, নাটকও তেমনি একটি প্রধান ভাবকেন্দ্রে লক্ষ্য স্থির রেখে অল্পে অল্পে দানা বেঁধে উঠবে। সেই কেন্দ্রটি বা সুতোটি থাকে নাট্যকারের হাতে। জীবনেও তাই। তফাতের মধ্যে এর সুতোটা ধরে থাকেন ভগবান বা অদৃষ্টদেবতা—যা-ই বলুন না কেন, বিরাট একটা শক্তি—তাই সে নাটক আরও জমাট হ'য়ে ওঠে।

এমনটা আর কার জীবনে কতটা হয় কে জানে, নলিনাক্ষর জীবনে অন্তত বার-বারই ঘটছে। তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা, সামান্য দু-একটা কথার টুকরো দিয়েই শুরু। কিন্তু তার পর? কী বিপজ্জনক নাটকই না অভিনীত হ'তে থাকে!

সেদিনের কথাটা আজও মনে আছে ওর।

দুপুর বেলা আপিস যাচ্ছিল। দুটোয় পৌঁছবার কথা, আড়াইটেয় পৌঁছলেও দোষ নেই। খবরের কাগজটা বড় ঠিকই, তবে তার বৃহত্তর কর্মকাণ্ডর সঙ্গে ওর কোন যোগ নেই। অর্থাৎ খবর অনুবাদ করতে হয় না। এমনিতেই কাজ কম, পৃষ্ঠা-সংখ্যা কমেছে অনেক, যা আছে তারও সবটাই মূল্যবান বিজ্ঞাপনে ভরে যায় : অসার সংবাদ দিয়ে ভরাতে হয় না। নলিনের কাজ কলম লেখা—এখন সম্প্রতি একটু প্রমোশন পেয়েছে। এক-আধ দিন সম্পাদকীয় লেখারও ভার পড়ে। দমকা এক-আধটা ফীচার লেখার হুকুম হয়—'বাঁকুড়ার মাটির ঘোড়া' কিংবা 'মৃতপ্রায় কাঁসার বাসনশিল্প'—এই ধরনের। তেমন দরকার পড়লে, বড়জোর 'কভারেজ' যাকে বলে সে ভারও নিতে হয়। তবে সেরকম দরকার মোট আড়াই পৃষ্ঠায় আর কত বা কত-বার পড়ছে! তাই বার্তা বা সম্পাদকীয় বিভাগে কোন কর্মচারী কখন যাচ্ছে না যাচ্ছে তা নিয়ে কর্তারা মাথা ঘামান না।

গ্রীষ্মের কামড় বেশ চেপে বসেছে কলকাতায়। বাতাসে আগুনের হল্‌কা। রাস্তারও পীচে আর পাথরে খর রোদ প'ড়ে তার তাপ বিকীর্ণ হচ্ছে চারদিকে, সে তাপ এই বাস পর্যন্ত এসে আরোহীদের মুখচোখ ঝলসে দিচ্ছে। বাস এ বসে যেন আরও চিংড়ি-মাছ-ভাজা অবস্থা। এক-একবার নলিনাক্ষর মনে হচ্ছে, নেমে বাকি পথটুকু হেঁটেই যায়—কিন্তু পথচারীদের মুখচোখের অবস্থা ও ঘামে ভেজা জামা দেখে সাহস হচ্ছে না।

রাস্তার দিকেই চেয়ে আছে, হঠাৎ চোখে পড়ল ছেলেটা। সুরেন বাঁড়ুয্যে রোডের মোড়ে, দুদিকের ট্রাফিককেই এখানে অন্তত মিনিট পাঁচ-ছয় অপেক্ষা করতে হয়। গরমে এই দাঁড়িয়ে থাকাটাই অসহ্য, আরও যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। কিন্তু উপায়ই বা কী। অন্যমনস্ক হবার জন্যই বেশী ক'রে পথের দিকে মন দিয়েছিল নলিনাক্ষ। তাইতেই চোখে পড়ল—একটা খোঁড়া ছেলে এই দাঁড়িয়ে থাকা বাস-ট্যাক্সি-লরীর ফাঁকে ফাঁকে ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্ছে। বছর তেরো-চোদ্দ বয়স হবে। নিতান্তই ছেলেমানুষ। এই বয়সেই কিন্তু দুর্গতির শেষ নেই যেন। খোঁড়া বললেও ঠিক বলা হয় না। একটা পা গোড়া থেকেই কাটা। তার ওপর ক্রাচও জোটে নি বেচারার। একটা লাঠির মতো জিনিসের ওপর ভর দিয়েই কতকটা লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে।

আর একটু কাছে এলে দেখল শুধু পা-ই নয়, ডান হাতের তিনটে আঙুলও কাটা। বাকি দুটো আঙুলে একটা ভাঙা য়্যালুমিনিয়ামের বাটি আটকে ধরে ভিক্ষে করছে।

ভারী মায়া হ'ল নলিনাক্ষর। কালো—মানে কুচকুচে সাঁওতালী রঙ নয়, শ্যামবর্ণ বলতে ঠিক যা বোঝায় তাই। কিন্তু কালো রঙেও সুন্দর হ'তে বাধে না; আমাদের দেশের মহাকবিরা ও পুরাণকাররা তা জানতেন, তাই আমাদের দুই মহানায়ক- সৌন্দর্যের প্রতীক রাম ও কৃষ্ণ—দু'জনেই কালো। এরও মুখখানি ভারী সুন্দর, লাবণ্যে ভরা। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, বড় টানাটানা দুটি চোখ, টিকলো নাক, সাজানো সাদা দাঁত (এই শ্রেণীর ভিখিরীদের এই বয়েসেই বিড়ি খেয়ে দাঁতে ছোপ ধরে, এর তা ধরে নি)—এমন কি দুটি ঠোঁটের গঠনও ভারী সুঠাম। ভদ্রঘরের ছেলে হ'লে বহু মেয়ের মনে আগুন জ্বালাত।

কে জানে কাদের ছেলে! কী ক'রে এমন দুর্গতিই বা হ'ল! এর কি আর কেউ নেই যে একে দেখে!

অবশ্য ঐ মুখখানা ছাড়া আর কোন বৈশিষ্ট্য নেই। যেমন আর পাঁচটা হয়—মার্কামারা ভিখিরী। ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জি, একটা ছেঁড়া তালি-দেওয়া হাফ প্যান্ট—ওর অনুপাতে অনেক বেঁটে ভাঙা লাঠি একটা। বস্তুত লাঠিটা কোন কাজেই আসছে না—ঐ এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে। চারিদিকের দৈত্যাকার বাস ট্রাম গাড়ির ফাঁক দিয়ে এই ভাবে চলা। কোন্‌দিন মরবে ছেলেটা! কষ্টই কি কম হচ্ছে, এই গরমে এই ভাবে লাফিয়ে চলা—দরদর ক'রে ঘামছে, মনে হচ্ছে কে বালতি ক'রে জল ঢেলে দিয়েছে সর্বাঙ্গে—

কাছে আসতে হাতে যা উঠল দিয়ে দিল নলিনাক্ষ। বোধ হয় সিকি আধুলি কিছু ছিল। ছেলেটার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, মুখ তুলে ওর দিকে চেয়ে বাটি সুদ্ধ হাতটা কপালে ঠেকাল। তবে তার দাঁড়াবার সময় নেই তখন, এদিকে সবুজ বাতি জ্বলায় সব গাড়িই একসঙ্গে চলতে শুরু ক'রে দিয়েছে; তাদেরও আর অপেক্ষা করা কিংবা ঐ সব ভিখিরীরা ঠিক-মতো রাস্তা পার হ'তে পারছে কিনা সেদিকে নজর দেওয়া সম্ভব নয়। ভিখিরীও অসংখ্য, আর ঐ চলন্ত গাড়ির মধ্যেই তাদের জীবিকা উপার্জন করতে হবে। ছেলেটাও ঐ গাড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে এঁকেবেঁকে, আশ্চর্য কৌশলে চাপা পড়ার সম্ভাবনা বাঁচিয়ে ঐভাবেই লাফাতে লাফাতে চলে গেল। নলিনাক্ষই বরং যেন নিঃশ্বাস রোধ ক'রে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল—ছেলেটা নিরাপদে পার হতে পারে কিনা।

ভয়টা একেবারে অমূলকও নয়। ওদিকের একটা বাস থেকে কে একজন পাঁচ নয়ার মতো—তিনও হ'তে পারে, এত দূর থেকে ঠিক দেখা সম্ভব নয়—ছুঁড়ল, বাটিতে না পড়ে সেটা পড়ল রাস্তায়। একটা ঠোঁটকাটা গন্নাখ্যাঁদা ভিখিরী তীরবেগে সেটা লক্ষ্য ক'রে আসছে, ছেলেটাও পয়সা ছাড়তে রাজী নয়। সে তার মধ্যেই লাঠিটা ফেলে একরকম হামাগুড়ি দিয়েই গিয়ে বাঁ হাতে পয়সাটা তুলে নিল। পিছন থেকে যে মিনি বাসটা আসছিল সে কোনমতে বেঁকে গিয়ে ওকে বাঁচাল বটে কিন্তু লাঠিটা বোধ হয় বাঁচল না। মড়মড় করে আওয়াজ হ'ল—ভেঙেই গেল খুব সম্ভব।

সেই এক মুহূর্তের 'টেনশ্যন' যাকে বলে—তারই জের হিসেবে বহুক্ষণ পর্যন্ত বুক ঢিবঢিব করতে লাগল নলিনাক্ষর।

আপিসে এসেও ছেলেটার মুখ আর ঐ কষ্টের, প্রাণসংশয়-করা উপার্জনের কথা

ভুলতে পারল না নলিনাক্ষ। বরং নিজের নিরিবিলি ঠাণ্ডা ঘরে বসে—সারা তেতলাটাই ওদের 'বাতানুকুলিত', ঠাণ্ডা এবং আরামদায়ক—কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা করতে লাগল ওর কথাটা মনে হয়ে।

কাজ কিছু ছিল না, মানে টেবিলে কোন নির্দেশ ছিল না। কাজে মন দিলে এই অস্বস্তির ভাবটা কেটে যাবে ভেবে বেরিয়ে পড়ল নলিনাক্ষ, সহযোগী সম্পাদক জয়ন্তবাবুই কাজ বিলি করেন, তাঁর সন্ধানে। তিনি হেসে সুসংবাদ দিলেন—'কাজ কিস্‌সু নেই, সময়টা কাটিয়ে চলে যান, আব কি! ছ'পাতার কাগজ, সাড়ে তিন পাতা বিজ্ঞাপন। থাকে আড়াই পাতা, অন্তত দুটো পাতা নিউজ না দিলে লোকে গাল দেবে যে!...চা খাবেন?'

তাঁর ঘর থেকে ফেরার পথেই নিউজের হলটা পড়ে। সেখানেও তখন কাজ কম, নিউজ আসতে থাকে সন্ধ্যার পর থেকে, তাই সবাই এক জায়গায় বসে আড্ডা দিচ্ছে। নলিনাক্ষর তখনই নিজের ঘরে যেতে ভাল লাগল না, সেও এসে সেখানেই একটা চেয়ার টেনে বসল।

কিন্তু বসতে বসতেই চোখে পড়ল ধীরেনের টেবিলে একখানা ছবি পড়ে, ছবি আর বিজ্ঞাপনের 'ম্যাটার' একটু। ওরই কে পরিচিত লোক বিজ্ঞাপন পাঠিয়েছে, টাকা আর 'ম্যাটার' ধীরেন বিজ্ঞাপন বিভাগে পাঠাচ্ছে—চিঠি দিয়ে।

অলস কৌতূহলেই ছবিটা তুলে নিল নলিনাক্ষ। সাত বছরের একটি মেয়ে হারিয়েছে, তার বাবা বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। ভারী সুন্দর ফুটফুটে দেখতে মেয়েটি, দেখলেই কেমন মমতা হয়। খবরের কাগজের ছাপায় অবশ্য এর কিছুই বোঝা যাবে না—কিন্তু ওর ভারী মন-কেমন করতে লাগল। আহা, যাদের মেয়ে তাদের না-জানি কী অবস্থায় দিন কাটছে, এই মেয়ে হারিয়ে!

ওর মুখ দেখেই বোধ করি মনের ভাবটা বুঝতে পারল ধীরেন, বলল, 'ভারী মিষ্টি মেয়েটি, না?...কী যে হয়েছে আজকাল, দেখেছ পর পর কতগুলো নিরুদ্দেশ খবর বেরোল? আর এই এক এজগ্রুপ—ছ-সাত থেকে দশ বারো। ছেলে মেয়ে দুই-ই। আশ্চর্য, এত হারায় কী ক'রে।'

ভবেশ বলে উঠল, 'কী ক'রে, আবার! আজকালকার ইরেসপনসিব্‌ল্‌ মা-বাপ। বিশেষ ক'রে মায়েরা। বেরুবে তো একেবারে বেহুঁশ—বিশেষ যদি বাজার করতে বেরোল তো কথাই নেই। শুধু যে শাড়ি কিনতে গেলেই পাগল হয় তাও নয় মশাই, আমি দেখেছি—যে কোন জিনিস কিনতে গেলেই ঐ রকম। ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাওয়াও চাই—অথচ সেদিকে নজর রেখে বাজার করবে সে ক্যালিবার নেই।'

নলিনাক্ষ বলল, 'আচ্ছা, পুলিস কিছু করতে পারে না! মিসিং স্কোয়াড্‌ তো খুব ভাল কাজ করে শুনেছি—'

'সে তো একটু বড়, যারা পালায় তাদের ধরে,' ভবেশ বলল, 'এ হারানো, আর এইটুকু বাচ্ছা। তাও ধরে বৈকি। সেই মনে আছে, একটা বাচ্ছাকে চুরি ক'রে নিয়ে তার পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বার ক'রে চোরাই হীরে পাচার করছিল—? সেটা খুব ধরেছিল কিন্তু।...এমনি তো বাচ্ছাদের ধরার কোন প্রশ্ন নেই, হারিয়ে যায় যারা—পথেঘাটে কেউ দেখল তো থানায় জমা দিয়ে গেল। তা করে, দুধ খাওয়ায়, ভাত খাওয়ায়, অনেক সময় অফিসাররা বাড়ি নিয়ে যান, একটা কেস তো জানি, থানার সিপাইরা চাঁদা ক'রে মানুষ করছে।'

'সে তো দুগ্ধপোষ্য, দু-তিন বছরের ছেলেমেয়ে। এই এজগ্রুপের কেউ থানায়

গেছে দেখেছেন? কৈ, আমার তো তেমন কোন খবর চোখে পড়ে নি।' ধীরেন উত্তর দিল।

সন্তুবাবু এতক্ষণ ওদিকে বসে কাগজ পড়ছি'লন, এখন নাকটা একবার জোরে রগড়ে নিয়ে (এটা ওঁর মুদ্রাদোষ) যেন হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, 'আচ্ছা, এই যে সব এত বিজ্ঞাপন দেয়—এতে কি কোন কাজ হয়? খুঁজে পায় কেউ? সে খবর তো কেউ দেয় না আর! য়্যাঁ?'

'হ্যাঁ, তুমিও যেমন! আবার এত পয়সা খরচ ক'রে সে কথা জানাতে যাচ্ছে—ওগো তোমরা সব শোন, বিজ্ঞাপন দিয়ে আমার খুব কাজ হ'য়েছে—আমি বাচ্ছাকে খুঁজে পেয়েছি। কার উদ্বেগ দূর করার জন্যে করবে বলো। এত কার মাথাব্যথা! যা রেট হয়েছে তোমা'দের কাগজে বিজ্ঞাপনের। কুনাল দত্ত তো আর মুফ্‌ত ছাপবে না!'

কে একজন ওদিক থেকে বলে উঠল, 'রেট এই রকম না হ'লে তোমাদের মতো গবেট'দের এত মাইনে দিয়ে পুষত কী ক'রে? মাইনের রেটটাও মনে করো! এখন নিউজ ট্র্যান্‌স্‌লেট করা সাবএডিটররা যা পাচ্ছ শুনলে সেকালের নামকরা এডিটর —পাঁচকড়ি বাঁড়ু'য্যের মতো ভেটারানরাও পাগল হয়ে যেত।'

নলিনাক্ষ আর সেখানে বসল না। তার মনের খাতায় সেই আঙুল-কাটা পা-কাটা ছেলেটার ছবি তো উঠেই ছিল, তার পাশে এই মে'য়টার ছবিও যোগ হ'ল। কী যেন নাম? পূর্ণিমা সমাদ্দার। বেচারী!...আবারও ঐ কথাটা মনে হ'ল। অমন সন্তান হারিয়ে গেল—ওর বাবা মার কী অবস্থা! গলা দিয়ে কি এর পর ভাত নামছে?

॥ দুই ॥

বাড়ি ফিরে রাত্রে খেতে ব'সছে—অন্যমনস্ক হয়েই খাচ্ছিল, কা'ন গেল বৌদি বলছেন, 'আচ্ছা, আমাদের এই সামনের বাড়ির মিস্টার চাকলাদার—এত পয়সা পায় কোথায় বলতে পারো?'

অন্যমনস্ক ভা'বই নলিনাক্ষ জবাব দিল, 'কেন? এত পয়সা দেখলে কী ক'রে? খুব কি খাওয়াচ্ছে তোমাদের?'

'আহা, আমাদের খাওয়াতেই বুঝি অনেক খরচ হয়? কথার ছিরি দ্যাখো! আমি দেখব কি, তোমাদের চোখ নেই? ঐ ঢাউস গাড়ি কিনেছে কোন কন্‌সা'লটের, ছিয়াত্তর হাজার টাকা নাকি দাম, জানি নে বাবু—বৌ তো বলে বেড়ায়। তাতেও কুলোয় না, স্ত্রীর, ছেলেমেয়েদের সব আলাদা গাড়ি। স্ত্রীর গাড়িও অস্টিন কেম্ব্রিজ, পুরো এয়ার-কন্ডিশান করা।......আর খাওয়া'নোর ব্যাপারই বা কম কি! এই তো ছোট মেয়ে অঞ্জুর জন্মদিনে কেটারার ডেকে পাঁচশো লোক খাওয়ালে! ঐ ডিশ, কোন্‌ না ষোল টাকা ক'রে নিয়েছ ওরা! তাছাড়াও ধর, দৈ-মিষ্টি আছে! নাৎনীর পুতুলের বিয়ে হ'ল—সানাই বাজিয়ে যজ্ঞি ক'রে। এতখানি বয়সে শুনি নি কখনও!...এই তো জানলা থেকে দেখতে পাই, যখনই পকেট থেকে টাকা বার করে—গোছা গোছা একশো টাকার নোট বেরিয়ে আসে!'

বৌদি বেশ শব্দ ক'রেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়েন। আবারও একটু পরে

বলেন, 'আচ্ছা, লোকটা করে কী? কৈ, সেকথা তো কখনও শুনি নি?'

'কে জানে!' নলিনাক্ষ জবাব দিল, 'আমি কি ক'রে জানব! ও নিয়ে মাথা ঘামানোর আমার দরকারই বা কি?... করে একটা কিছু নিশ্চয়—ব্যবসা-ট্যবসা। চাকরিতে অত পয়সা হয় না।'

সত্যিই, কথাটা কিন্তু এতদিন ওর মাথায় যায় নি। কী করে—কিসের ব্যবসা যে, এত পয়সা? প্রায়ই তো বাইরে যায় দেখা গেছে। এই তো কিছুদিন আগেই সবাইকে নিয়ে সিমলে গিছল! এখান থেকে প্লেনে চণ্ডীগড় গিছল, সঙ্গে তিন-চারটে ঝি চাকর সুদ্ধ। সে খবরটা অবশ্য ওকে মিঃ চাকলাদারই দিয়েছেন, সেই সঙ্গে জ্ঞানও দিয়েছেন একটু, 'না মশাই, মিডল্-ক্লাস মেণ্টালিটি আমি বুঝি না। আফটার অল, এভারীথং কন্সিডারড্ অ্যাণ্ড রেকন্ড্—প্লেনেই সস্তা পড়ে। তিনদিন ধরে গাড়িতে গেলে এতগুলো লোকের খাওয়ার খরচাই কত পড়ত! তাছাড়া শরীরের ওপর দিয়ে ধকল যেত কতখানি, ভাবুন তো! তাছাড়া, আফটার অল, আমাদের সময়ের তো মূল্য আছে! বেকার কি লোফার তো নই!'

খানিকক্ষণ ভেবে নিয়েই যেন নলিনাক্ষ বলে, 'কে জানে, বোধ হয় ফাটকা-টাটকা খেলে। শেয়ার মার্কেট ছাড়া অত পয়সা কিসে হবে?'

বৌদি ধিক্কার দেন, 'কে জানে আর কে জানে! অত বড় খবরের কাগজে কাজ করছ -এই খবরটুকু বার করতে পারো না?'

নলিনাক্ষ উত্তর দেয়, 'কে কি দিয়ে ভাত খাচ্ছে, কে ফাটকা কি রেস খেলে টাকা রোজগার করছে—এই সব খবর খুঁজে বার করাই বুঝি খবরের কাগজের কাজ! এমন তো লাখ লাখ লোক রোজগার করে। কাগজের কী এত গরজ সে খবর বার করা!...খবর আসে যেটা সেটা ছাপা হয়।...আর আমি তো কলম লিখি, রিপোর্টার তো নই, নইলে না হয় একদিন ইন্টারভিউ নিতাম একটা! আর, অফটার অল—আমার গরজই বা কি?'

মিঃ চাকলাদারের কথাটা মনে ক'রেই 'আফটার অল' বলে নলিনাক্ষ, ঐ শব্দটা না বলে উনি থাকতে পারেন না।

ব'লে নিঃশব্দে খানিকটা হেসে নেয়—কথাটা মনে পড়ে।

অপিসে যাতায়াতের পথে ঐখানটায় এসে প্রায়ই চেয়ে চেয়ে দেখে নলিনাক্ষ। ছেলেটাকেই খোজে। কিন্তু এর পর বেশ কদিন আর দেখতে পেল না। বোধ হয় জায়গা বদলে বদলে ভিক্ষে করে, হয়ত এখানে চেষ্টা ক'রে দেখেছে—প্রতিযোগিতা বেশী। হয়ত আর এদিকে আসবেই না।...না দেখতে পেয়ে একটু যেন হতাশই হয়। ছেলেটাকে ওর দেখতেই ইচ্ছে করে—এমনি শুধু মাত্র কৌতূহল নয়।

দেখা মিলল একেবারে দিনসাতেক পরে। সেদিনটাও তেমনি অসহ্য গরম। তেমনি কেন—আরও বেশী। বেরোবার আগেই খবর পেয়েছে—১১০° উঠেছে, আগেকার হিসেবে। বেলা দেড়টা তখন। তাপটাও সেই সময়ই সব চেয়ে বেশী। ফলে রাস্তা কলকাতার হিসেবে জনবিরল। গাড়িতে-বাসে বসেও যেন খাবি খাচ্ছে লোক—রাস্তায় পীচ গলে তলতল করছে, গাড়ির চাকা আটকে আটকে যাচ্ছে। রিক্শাওলারা যাহোক ক'রে জুতা যোগাড় ক'রে পরে নিয়েছে বেশির ভাগ, যে যা পেরেছে। একজন তো—লক্ষ্য ক'রে দেখল নলিনাক্ষ, একজোড়া ছেঁড়া কেড্স বোধ হয় কুড়িয়ে পেয়েছে কোথাও থেকে, তার পায়ের চেয়ে অনেক বড়—সে দাঁড়

দিয়ে সে-দুটো পায়ের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে—পাছে খুলে খুলে যায়—এত কাণ্ড করেছে ঐ জন্যেই—তবু কোনমতে পায়ের তলাটা তো বাঁচবে।

এরই মধ্যে চোখে পড়ল ছেলেটা।

সেই জ্বলন্ত আঙরার মতো রাস্তায় খালি পায়ে তেমনি লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে, আজ লাঠিও নেই একগাছা, এক পায়েই—যাকে ইংরিজীতে 'হপ্' করা বলে—সেই ভাবে চলছে। গলা পীচ লেগে পায়ের তলাটা জুতোর মতো হয়ে গেছে, তবু তাতে যে গরমটা লাগছে না তা নয়। সেদিনের মতোই দরদর ক'রে ঘামছে। চুলগুলো রুক্ষু, নইলে মনে হ'ত চান ক'রে এসেছে কোথা থেকে। ছেঁড়া জিনের হাফ প্যান্টটাও ভিজে উঠেছে ; আজ গায়ে গেঞ্জি নেই, তার বদলে একটা ছেঁড়া ঝলঝলে জামা গায়ে—সেটা গায়ের সঙ্গে লেপটে গেছে।

ভারী মায়া হ'ল নলিনাক্ষর। বাসটা দাঁড়িয়েই ছিল, এখন সিগন্যাল পেয়ে স্টার্ট দিতেই চট ক'রে নেমে পড়ল। কোনমতে তিন-চারটে গাড়ির ফাঁক দিয়ে গলে পশ্চিম দিকের পেভমেন্টে উঠে, ওরই মধ্যে একটু ছায়া খুঁজে নিয়ে ইশারা ক'রে ডাকল ছেলেটাকে।

সাগ্রহেই ছুটে এল ছেলেটা। নলিনাক্ষর আগে মনে হয়েছিল, একটা পুরো টাকাই দেবে ওকে অবাক করে দিয়ে, বলবে, এই রোদে আর ভিক্ষে করতে হবে না, ঘণ্টাখানেক কোন গাছের ছায়ায় গিয়ে বসে থাক। কিন্তু পকেটে হাত দিতে গিয়েও দিল না। চোখে পড়ল একটা আইসক্রীমের ঠেলাগাড়ী। কী ভেবে বলল, 'এই, আইসক্রীম খাবি ?'

ছেলেটার সুন্দর চোখ দুটো লোভে জ্বলে উঠল। সেই সঙ্গে একটু অবিশ্বাসের ছায়াও যেন ফুটে উঠল—তার পাশাপাশি। তবে তার মধ্যেই প্রবল ঘাড় নাড়ল—খাবে।

আইসক্রীমওলাটাকে ডেকে স্টিক নয়, একটা কাপই দিতে বলল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনে হ'ল, এই গরম, এত ঘামের মধ্যে আইসক্রীম খাওয়া কি ঠিক হবে ? যদি সর্দিগর্মি হয়ে যায় ? গরিবের ছেলে, ভিক্ষে ক'রে খেতে হয়—জ্বর হয়ে পড়ে থাকলে এক ফোঁটা ওষুধও জুটবে না তো। খেতেই বা দেবে কে ? ছেলেটা বোধ হয় ওর মুখের সেই ভাবান্তর, সেই সামান্য ইতস্তত ভাবটাও লক্ষ্য করেছিল। তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, 'না না, আমার কিছু হবে না। এই তো—এই অবস্থায় গিয়ে ঠাণ্ডা জল খেয়ে এলুম এক জায়গা থেকে—'

নলিনাক্ষ দাম চুকিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করল, 'তোমার নাম কি খোকা ?'

'নাম !' একটু যেন ভুরু কোঁচকাল একবার। তার পর বলল, 'আপনি তো হিন্দু, না ? আমার নাম প্রফুল্ল। আসলে আমাকে ডাকে কেলো ব'লে।'

'তা হিন্দু কিনা জিজ্ঞেস করলে কেন ?' নলিনাক্ষর কৌতূহল বেড়ে গেল।

'না, আমাকে বলে দিয়েছে, মুসলমান কেউ জিজ্ঞেস করলে হামিদ নাম বলতে। তাহলে তারা ভিক্ষে বেশী দেবে।'

'কে এসব ব'লে দেয় ? তুমি থাকো কোথায় ? কে আছে তোমার ?'

এবার স্পষ্টই বোঝা গেল ওর বিপন্ন ভয়ার্ত ভাবটা। মুখ শুকিয়ে উঠেছে, হাতের মধ্যে অতবড় আইসক্রীমের কাপটা থাকা সত্ত্বেও।

বললে, 'থাকি ? ঐ বেনেপুকুরের কাছে একটা বস্তিতে।'

'তা তোমার এমন হ'ল কি ক'রে ?'

'য়্যাক্সিডেণ্ট।' সংক্ষেপে বলল ছেলেটা। সাবধানেই উচ্চারণ করল শব্দটা। যেন কেউ শিখিয়ে দিয়েছে। মনে করে করে বলল।

নলিনাক্ষ বলল, 'তা তাতে তো সব কটা আঙুলই যাবে। কিংবা এক ধার থেকে। এমন মাঝের তিনটে আঙুল কাটল কি ক'রে?'

কোন জবাব দিল না ছেলেটা। ঘামছে তেমনি দরদর ধারে, মনে হ'ল বড় বড় ফোঁটায় ঘাম ঝরে পড়ছে আইসক্রীমের ওপর।

'তা তোমার কে আছে বাড়িতে? মা বাপ নেই? তোমাদের মতো ছেলেদেরও তো কাজকর্ম শেখাবার ব্যবস্থা আছে—সে সব শিখ'লে আর এত কষ্ট করতে হয় না! শিখবে? দ্যাখো, তাহ'লে আমি ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি।'

ছেলটা যেন পাঙাস হয়ে উঠল একেবারে। একবার ভয়ে ভয়ে ওদিকের ফুট-পাথটার দিকে চেয়ে—বাকি সবটা আইসক্রীম এক সঙ্গে মুখে পুরে যেন এক লাফে একটা দোতলা বাসের আড়ালে চলে গেল। ঠিক সেই সময়ই উত্তর দিকের লাইন ছেড়েছে। পর পর কতকগুলো বাস, মিনি-বাস, গাড়ি, কোম্পানীর ভ্যান--সার সার চলল—গিয়ে খোঁজা সম্ভব নয় সে অবস্থায়—আবার কখন গাড়ি দাঁড়াবার পালা এল, তখন আর কোথাও দেখা গেল না ছেলেটাকে। ভিক্ষেও করছে না, যেন বাতাসে উবে গেছে।

বেশ একটু অবাক হয়ে গেল নলিনাক্ষ। হঠাৎ এত ভয় পেয়ে গেল কেন ছেলেটা? ওদিকে চেয়ে কী দেখল? কোন লোককে দেখেই ভয় পেল নাকি? সে শুনেছে এই সব ভিখিরীদের 'মেট' থাক—তারাই এনে ছেড়ে দেয়, আবার বিকেলে ফিরিয়ে নিয়ে যায় ডেরায়, এও সেই ব্যাপার নাকি?

যেদিকে চেয়েছিল ছেলটা, নলিনাক্ষও ভাল ক'রে চেয়ে দেখল। কৈ, কেউ তো কোথাও নেই, পুব দিকের ফুটপাথটাই তো ফাঁকা। শুধু পানওলার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে একটা লোক বিড়ি টানছে। সাধারণ চেহারার, হিন্দুস্থানী মজুর বা দুধওলা—এই রকম শ্রেণীর লোক। সে এদিকে চেয়েও নেই, ঐদিকেই ফিরে বোধ হয় পানওলার সঙ্গে গল্প করছে। আর কোন লোকই তখন চোখে পড়ল না, ছেলটা যাকে দেখে এত ভয় পেতে পারে।

আর মেট থাকলেই বা কি? তার জীবনের উন্নতিও বুঝল না ছেলেটা? নলিনাক্ষর ঠিকানাটাও তো জেনে নিতে পারত। কিংবা আবার কবে এখানে আসবে সেটা জানিয়ে দিতে পারত। কী বোকা ছেলেটা!

একটু ক্ষুণ্ণই হ'ল নলিনাক্ষ। আসলে ছেলেটার কোন উপকার করতে পারলে ভাল লাগত ওর। সেই জন্যেই কেমন যেন একটা অবুঝ অভিমানও বোধ হতে লাগল। তার আর কি, ও যদি নিজের ভাল না বোঝে নলিনাক্ষর কী এত মাথা-ব্যথা? গোল্লায় যাক!—এই কথাটা নিজেকে বার বার বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল।

একেবারে বাসে উঠে লক্ষ্য করল—ওধারের ঐ লোকটা পানওলার আয়নার দিকেই চেয়ে আছে একদৃষ্টে। আয়নাটা বেশ বড় আর উঁচু; রাস্তার এদিকটা তাতে প্রতিবিম্বিত হ'তে কোন বাধা নেই।

॥ তিন ॥

বৌদির শরীর খারাপ, অনেকদিন ধরেই বলছেন। মৃদু অনুযোগই করছেন বলতে গেলে, দেবরের হৃদয়হীনতায়। এবার আর কিছু না করলেই নয়। তাঁর ইচ্ছা ছিল দার্জিলিঙ। কিন্তু সেখানে পাঠানোর অসুবিধা অনেক। কাছাকাছি কোথায় পাঠানো যায় ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা যোগাযোগ হয়ে গেল। ওর আপিসের নগেনবাবুর কে এক আত্মীয় বারো মাস পুরীতে বাস করেন। রিটায়ার্ড সরকারী কর্মচারী। অকৃতদার। একটি চাকর নিয়ে শুধু থাকেন। তিনি এবার তীর্থে যাবেন। বাড়িতে কাকে রেখে যান এই চিন্তায় পড়েছেন। লীজ নেওয়া বাড়ি। বারোমাস থাকেন বলে দুটো-একটা জিনিসও করেছেন। কেউ যদি না থাকে তো দরজা ভেঙে চুরি হয়ে যাবে। বুড়ো মানুষ—চাকরকে নিয়ে যেতে হবে। একা যেতে পারবেন না। তিনি ভাল একটি পরিবার খুঁজছেন, যারা মাসখানেক থাকবে অন্তত, আর ঘরবাড়ি নোংরা করবে না। ভাড়া তিনি চান না, তবে কেউ যদি দিতে চায় তো আপত্তিও করবেন না, যে যা দেয় খুশী মনেই তাই নেবেন। মোদ্দা ঐ দুটি শর্ত, বাড়ি পরিষ্কার রাখা চাই, আর কাচের বাসন ব্যবহার করা চলবে না। কাটগ্লাসের দামী জিনিস তাঁর, বিলিতী প্লেট, জিনিসপত্র নষ্ট না হয়। কেউ কি তেমন লোক আছে নলিনাক্ষর সন্ধানে? নগেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

নলিনাক্ষর কাছে এটা দৈবপ্রেরিত বলেই মনে হ'ল। তৎক্ষণাৎ কথা দিয়ে দিল একেবারে। তারপর বাড়িতে এসে বৌদিকে খবরটা বলল। রাত্রে কন্‌ফারেন্স বসিয়ে স্থির হ'ল, নলিনাক্ষ বৌদিকে পৌঁছে দিয়ে প্রথম দিকে দিন দশেক থেকে আসবে, দাদা মাঝে দিন দশ-বারো গিয়ে থাকবেন, শেষের দিকে বৌদির ভাই গিয়ে আর দশ-বারো দিন থেকে সবাইকে নিয়ে ফিরবে। মাসখানেক লাগবার কথা নগেনবাবুর সেই পিসেমশাইয়ের ; কুণ্ডু স্পেশ্যাল গেছেন, মাপা দিন ওঁদের—তবু যদি দৈবাৎ কলকাতায় এক-আধদিন আটকে যান, তাঁর ফেরা পর্যন্ত বৌদি থাকবেন এই বন্দোবস্ত আছে।

বৌদির তো উৎসাহের অবধি নেই। তিনি কখনও পুরী যান নি। এমনিও গত দু বছরে নাকি কোথাও বেরাতে পারেন নি—তিনি ছেলেমানুষের মতো খুশী হয়ে উঠলেন। নলিনাক্ষরও খারাপ লাগছিল না, চক্রতীর্থে প্রথম সারিতে বাড়ি। সোনার গৌরাঙ্গ আর রামকৃষ্ণ মঠের কাছে—বেশ জনবসতিও আছে, একেবারে নির্জন নয়।

কিন্তু পুরীতে পৌঁছে বৌদির আনন্দ যেন একটু স্তিমিত হয়ে গেল। ওদের বাড়ি মাঝারি কেন, ছোটই, ওপরে দুটা নিচে দুটো ঘর। পিসেমশাইয়ের আর ওর চেয়ে বেশী লাগবেই বা কেন? নিচের ঘরটা তো অব্যবহার্যই পড়ে থাকে ; কিন্তু ঠিক পাশেই এক বিরাট বাড়ি—কোন্ এক মারোয়াড়ির—দেখা গেল তার পিছনে অতি পরিচিত এবং বৌদির চোখের বালাই খানতিনেক ঢাউস ঢাউস গাড়ি দাঁড়িয়ে। অর্থাৎ মিঃ পরেশ চাকলাদাররা ইতিমধ্যেই সপরিবারে এসে গেছেন। দিন-চারেক

আগে মোট-মাটারি নিয়ে রওনা হ'তে দেখেছে বটে—কিন্তু ওঁরা যে এত দেশ থাকতে এখানেই আসছেন তা কে ভেবেছিল? সাহব মানুষ, অত ধনী—কাশ্মীর, নিদেন-পক্ষে দার্জিলিঙ শিলং যাবেন এই-ই ভেবেছে।

বৌদি মুখ বেঁকিয়ে বললেন, 'আ গেল যা! মড়ারা এখানেও এসে জুটল! কোথায় ভাবলুম কটা দিন ওদের আর মুখ দেখতে হবে না, নিশ্চিন্তি থাকব—তা নয়, ঠিক এসে হাজির হয়েছে! ঐ যে আমার মা ছড়া কাটেন না—ওরে ও শাক-অম্বুলি কোন ঘাটে তুই পা ধুলি, আমি না আসতে তুই এলি! তা এও হ'ল তাই। আপদ এসে একেবারে ঘাড়ের ওপর পড়ল!'

নলিনাক্ষ হেসে বলল, 'তা তোমারই বা অত রাগ কেন ওদের ওপর? কী করেছে তোমার?'

'না বাপু, ওদের ঐ অত চাল আমার সহ্য হয় না। তা যাই বলো আর যাই ভাবো।'

গাড়ি থেকে নেমে মালপত্র নিয়ে থিতিয়ে বসে বাজারের দিকে যাচ্ছি—পরেশ চাকলাদারের সঙ্গে দেখাও হয়ে গেল, 'এই যে, বা! আপনারাও এসে গিয়েছেন! খুব ভাল হ'ল। কদিন আছেন তো! তবু চেনাশুনো লোক—একটু গল্পস্বল্প করা যাবে। ভগবানের ব্যাপার দেখুন মশাই, ওখানেও প্রতিবেশী, এখানেও কেউ জানি না অপরে কোথা যাচ্ছে—ঠিক পাশাপাশি বাড়িটি হয়ে গেল। আসবেন অতি অবিশ্যি। বিকেলের দিকে আসুন না, এখানেই চা খাবেন। বৌদি ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে আসুন—প্লীজ!'

তখনকার মতো 'হেঁ-হেঁ, দেখি, আসব বৈ কি—অবিশ্যি আসব—তবে আজ হবে কিনা—হেঁ-হেঁ—' ব'লে কাটিয়ে চলে গেল নলিনাক্ষ।

বৌদি শুনে মুখ বাঁকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তা আর নয়! এলুম দুটো দিনের জন্যে জিরুতে, আজই গিয়ে ওঁদের দরবারে হাজরে দিতে হবে! আসলে ওর গিন্নী চালের কথা শোনাবার লোক পাচ্ছে না বোধ হয়, পেট ফুলে মরে যাচ্ছে। দু'চোখের বালাই—এই সব হঠাৎ-বড়লোক লোকগুলো।'

বিকেলে বেরিয়ে মন্দির ও বাজার ঘুরে এসে বৌদি আর কোথাও বেরোতে চাইলেন না। সমুদ্র তো এখান থেকেই দিব্যি দেখা যাচ্ছে, কাছে গিয়ে বেশী কি হাত বেরোবে? তা ছাড়া এই ঘোর কৃষ্ণপক্ষ—কী এমন দেখবেই বা মাথামুণ্ডু! চাঁদনী রাত হলেও না হয় কথা ছিল। ছেলেমেয়েদেরও ছাড়তে রাজী নন তিনি, সমুদ্রের ধারে অনেক কিছু থাকে, পোকামাকড়—আর এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে কীই-বা বুঝবে সমুদ্রের?

কিন্তু নলিনাক্ষর ধারণা অন্য। সে এর আগে বহুবার পুরী এসেছে, গোপাল-পুর ওয়ালটেয়ার গেছে, সমুদ্র সম্বন্ধে নিজেকে সে অথরিটি ভাবে। তার বিশ্বাস, চাঁদনী রাতের শোভা বরং কিছুটা একঘেয়ে, অন্ধকার রাত্রের বৈশিষ্ট্য বেশী। বিশেষ যদি একটু মেঘলা থাকে, তাহলে তো কথাই নেই। বিদ্যুৎ-চমকের সঙ্গে ঢেউ ভাঙার ফসফোরাস-দীপ্তি যখন সেই অন্ধকারের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে অগ্নিময় সর্পের মতো ছড়িয়ে পড়ে—তখন তাকে ঈশ্বরেরই এক ভয়ঙ্কর রূপ মনে হয়।

বৌদি অবশ্য ওকে যেতে বাধা দিলেন না, এক পেয়ালা চা খেয়েই টর্চ হাতে বেরিয়ে পড়ল নলিনাক্ষ।

সমুদ্রতীর তখন একেবারেই জনবিরল। কেউ থাকবে তা সে আশাও করে নি অবশ্য। তার মতো পাগল কে আছে যে এই অন্ধকারে বসে বসে সমুদ্র দেখবে! আর তাতে সে দুঃখিতও নয়, এ গম্ভীর রূপ একা বসেই উপভোগ করতে হয়। তার কাছে কিছুই নেই, হাতঘড়িটাও বুদ্ধি ক'রে খুলে রেখে এসেছে। চোর ডাকাত ধরে কোন ক্ষতি করতে পারবে না! এক এই টর্চ—তা তার জন্য কেউ রাহাজানি করবে বলে মনে হয় না।

তন্ময় হয়ে চেয়ে আছে সমুদ্রের দিকে, মন এটা ওটা ভাবতে ভাবতে সেই ভিখিরী ছেলেটা—প্রফুল্লর কথায় চলে গেল। নিত্যই উৎসুক হয়ে চেয়ে দেখে, কিন্তু এর মধ্যে আর একদিনও দেখতে পায় নি তাকে। কে জানে কেন—ছেলেটা যেন তাকে কি মায়ায় আচ্ছন্ন করেছে!

খুবই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল—এলোমেলো চিন্তায়। পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে কোন হুঁশও ছিল না। দূরে মধুপুর হাউসের জোর আলোটার আভা এসে পড়েছে—তবে সেটা ওর এই শোভা উপভোগে খুব ব্যাঘাত করতে পারে নি। বরং ওর চারপাশের অন্ধকারটাকে যেন আরও গাঢ় ক'রে তুলেছে। বসবার সময় বেছে বেছে এই দিকটায় এসে বসেছে, রাঠোর-নিবাসের সামনের ঝাউগাছগুলোর আড়ালে। গাঢ় অন্ধকার চারিদিকে, মনে হচ্ছে সে অন্ধকার যেন তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে, সে ডুবে গেছে তার মধ্যে। এই সময় হঠাৎ মধুপুর হাউসের আলোটাও কে নিভিয়ে দিলে, আরও গাঢ় আরও নিঃসীম হয়ে উঠল চারিদিক।

অকস্মাৎ, যেন সেই অন্ধকারেরই একটা অংশ—অন্ধকার মহাশূন্য থেকেই কায়া সংগ্রহ ক'রে যাকে বলে মেটিরিয়ালাইজ করা—একেবারে তার পাশে ঝুপ ক'রে পড়ল।

কোন জীবিত প্রাণী? মানুষ? খুনে ডাকাত?

এসব কোন কিছু ভাববারও অবসর ছিল না। নিদারুণ চমকে উঠল নলিনাক্ষ, ভয়ই পেয়ে গেল সে, অজানা অথবা দেহের সহজাত একটা আতঙ্ক। আর সেই ভয়ে তার গলা দিয়ে শুধু একটা অব্যক্ত জান্তব আর্তস্বর বেরিয়ে এল আপনা-আপনিই।

যে এসে বসেছে, সে বোধ করি এ অবস্থাটা আগেই অনুমান ক'রে নিয়েছিল। জানত এটা হবে। মানবমনের এ স্থূল অনুভূতিটা তার জানাই। সে ওর এই স্বর বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় বলে উঠল, 'চুপ, আমি এককড়ি।'

এককড়ি! হ্যাঁ, গলার আওয়াজটা সেই রকমই বটে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—ধড়ে প্রাণ আসা যাকে বলে—আশ্বস্তও হ'ল একটু। কটা মুহূর্তেরই ব্যাপার, কিন্তু কখনও কখনও শুধু ব্রহ্মারই নয়, মানুষেরও এক পলকে এক যুগ কেটে যায়, যুগান্তের অভিজ্ঞতা লাভ হয়।

এবার ভরসা ক'রে তাকিয়ে দেখল, অন্ধকারেই যতটা দেখা সম্ভব—কারণ যে এসেছে সে আগেই—নিজের পরিচয় দেবার সঙ্গে সঙ্গেই চাপা গলায় বলে দিয়েছে, 'টর্চ জ্বালবেন না, দোহাই।'—সি. বি. আই. ইনস্পেকটর দেবীবাবু, দেবীপদ বসু। মাত্র কিছুদিন আগেই নলিনাক্ষর প্রাণরক্ষা করেছিল, সেদিনের সে দুঃখস্মৃতি মনে পড়লে আজও—কী হ'তে পারত ভেবে—ভয় যেন হিম হয়ে যায় বুকের মধ্যেটা। সেই থেকেই, সেই উপলক্ষ ক'রেই একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে দুজনের মধ্যে।*

* লেখকের 'তৃতীয় রিপু' গ্রন্থে সে ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে।

এককড়ি নামটার মধ্যেও একটা রহস্য আছে। সেই ঘটনারই রহস্য। এখন সেটা কৌতুক রহস্যে পরিণত হয়েছে। ওর বন্ধু বরুণ এক স্মাগলারদের চক্রে পড়ে গিয়েছিল। সেই সূত্রেই এক লেডী-ডাক্তারের সঙ্গে বিয়ে হয়—এই দেবীপদ বোস ভেতরের খবর নেবার জন্যে এককড়ি নাম নিয়ে বরুণের বাড়ি চাকরের কাজ নেয়। সেই থেকেই এককড়ি নামটা ওদের মধ্যে চালু হয়ে গেছে। উভয়পক্ষই সেটা উপভোগ করে। বরুণ সম্প্রতি চূড়ামণি বলে সাঁওতাল মেয়েটাকে বিয়ে করেছে—তাতে দেবীপদ উপহার দিয়েছে—'দাস শ্রী এককড়ি' এই সই ক'রে।

চিনতে পারার পরই নলিনাক্ষ জড়িয়ে ধরেছিল দেবীপদকে, সেইভাবেই ধরে রেখে বলল, 'বাপ্‌রে, এমন ভাবে ভয় পাইয়ে দিতে হয়? তা এখানে? আর এই অন্ধকারেই বা কেন, এমন ভূতের মতো?'

দেবীপদ বলল, 'কাজেই এসেছি। একটা খোঁজে। সেটা দিবাভাগে দৃশ্য নয়, আলোতেও নয়। তাই এই প্রেতাত্মার মতো অন্ধকারে ঘোরা।'

'কিন্তু যাদের দেখার জন্যে এত কাণ্ড—তারা জানে না আপনি পিছনে লেগেছেন?'

'জানে বৈকি। এখনও আমরা এত সতর্ক হ'তে পারি নি যে তাদের কাছে খবর পৌঁছবে না। সর্বত্রই পেড-ম্যান আছে ওদের। জানেন না, জহরলাল নেহরুর টাইপ-রাইটারের ব্যবহার করা কার্বন পেপারও চুরি যেত? তারাও আছে, আমরাও আছি। আমাদের পেছনে তারা আছে কিনা তাও দেখার ব্যবস্থা আছে। ঐ রামকৃষ্ণ মঠের ছাদে একজন আছে। এদিকের এক বাড়ির ছাদে আর একজন। তাদের কাছে পাওয়ারফুল দূরবীন আছে। এই অন্ধকারেও আমাকে ফলো করছে তারা দূরবীন দিয়ে।...তা আপনি হঠাৎ পুরীতে? বৌদিও তো এসেছেন দেখছি।'

বলল নলিনাক্ষ কারণটা। বৌদির চেঞ্জ দরকার, একটা বাড়িও পাওয়া গেল—ফার্নিশড—এসে পড়েছি। দিন দশেক থেকে ও চলে যাবে। দাদা আসবেন।

বলতে বলতেই মনে পড়ে গেল কথাটা। সেদিনেরই কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে, মানে কলকাতায় আগের দিন দেখে এসেছে- ছবি দেওয়া বিজ্ঞাপন—কপালে কাটা দাগ, থুতনিতে একটা তিল আছে, সাত বছরের মেয়ে, ডাকনাম পারুল - আরও কী সব বিবরণ—খবর দিলে পাঁচশো টাকা পুরস্কার পাবে। এখানে এসে সেই কথাটাই ভাবছিল। সেই প্রসঙ্গেই ভিখিরী ছেলেটার চিন্তায় চলে গিছল। কথার মধ্যেই তাই হঠাৎ বলে উঠল, 'আচ্ছা দেবীবাবু, আজকাল প্রায়ই যে এত ছেলেমেয়ে হারাচ্ছে—এর ব্যাপারটা কি বলুন দিকি? খবরের কাগজ খুললেই একটা না একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। সুনীতিবাবুর ভাষায়—হোয়াট ইজ বিকজ অফ ইট? ডঃ সুনীতি চাটুজ্যের রসিকতা এটা—কোন দক্ষিণ দেশীয় ভদ্রলোক বলতেন —শিক্ষিত ভদ্রলোক।'

অন্ধকারেই যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখল এককড়ি। তারপর তেমনি হিস-হিসে গলায় বলে উঠল, 'এই মরেছে! আবার বাঘের গর্তে পা দেবার তালে আছেন নাকি? এ কিন্তু আরও সাংঘাতিক। খুব সাবধান! আপনি বুঝি ফ্যাসাদ না বাধিয়ে থাকতে পারেন না?'

'না না, সে সব কিছু নয়। এমনি, পর পর বিজ্ঞাপনগুলো চোখে পড়ে কিনা —তাই হঠাৎই মনে এল কথাটা। আপনিই বা ওসব ভাবছেন কেন?'

এবার নলিনাক্ষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখটা দেখার চেষ্টা করে।

কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা কথা মনে পড়ে যায় আবারও, 'আচ্ছা দেখুন—আপনি তো ঘোরেন-টোরেন খুব, চৌরঙ্গী আর সুরেন বাড়ুয্যে রোডের মোড়ে যেসব ভিখিরী ট্রামে বাসে গাড়িতে ভিক্ষে করে—তাদের মধ্যে কালো মতো একটা ছেলে ছিল, তার নামও কেলো, তেরো চোদ্দ বছর বয়স হবে—একটা পা কাটা, ডান হাতের তিনটে আঙুল নেই—তাকে আর মোটে দেখতে পাই না, আসা যাওয়ার পথে চেয়ে চেয়ে দেখেছি—দু-তিন দিন নেমে খোজও করেছি অন্য ভিখিরী-দের কাছে, কেউই বলতে পারে না। আপনার চোখে পড়েছে কখনও? মনে পড়ছে এমন কারও কথা?'

দেবীপদ অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। মনে হ'ল যেন স্থির হয়ে গেল প্রসঙ্গটায়। হয়ত কিছুই না, মনে করারই চেষ্টা করছে। কিন্তু নলিনাক্ষর কেমন মনে হতে লাগল—এ নীরবতাটা ঠিক স্বাভাবিক নয়, দেবীপদ হঠাৎ চিন্তিত হয়ে উঠেছে কথাটা শুনে।

প্রায় মিনিট দুই-তিন পরে সত্যিসত্যিই গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল দেবীপদ, 'কেন বলুন তো? তার সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক? শেষ কবে দেখেছেন তাকে? জানাশুনো ছিল, না এই পথেই দেখেছেন? নামই বা জানলেন কেমন ক'রে?'

'বাবা! আপনি যে পুলিসের লাইনে চলে গেছেন এক কথায়। রীতিমতো জেরা। এর মধ্যেও কোন ভয়ানক কথা আছে নাকি? আপনাদের স্বভাবটাই খারাপ হয়ে যায় এই কাজ ক'রে ক'রে—না? সবেতেই সন্দেহ জাগে?'

এই বলে নিজেই যেন প্রসঙ্গটা হালকা ক'রে নিয়ে খুলে বলল সব। প্রথম দিন দেখে মায়া হওয়ার কথা, শেষের দিনে আইসক্রীম খাওয়ানো, তার হঠাৎ পালিয়ে যাওয়া—সব। ইতিহাস শেষ হ'লে বলল, 'অন্য কোন ইনটারেস্ট নেই আমার, জাস্ট হিউম্যান ইনটারেস্ট। ছেলেটাকে দেখলে আপনিও বোধহয় ব্যস্ত হতেন তার কিছু ভাল করার জন্য!'

'আপনিও বলার মানে? কথাটায় অত জোর দিলেন কেন? পুলিসে কাজ করলে কি ইনহিউম্যান হয়ে যায় বলে আপনাদের ধারণা?' হেসেই বলল দেবীপদ, কিন্তু তার পর আবারও গম্ভীর হয়ে রইল অনেকক্ষণ। তার পর আস্তে আস্তে বলল, 'হেস্টিংস-এর কাছে গঙ্গায় কাদার মধ্যে তার ডেড্ বডি পাওয়া গেছে দিন-দশেক আগে। কেউ গলা টিপে মেরে জলে ফেলে দিয়েছিল। কারণটা কি, ঐ রকম ছেলেকে কে খুন করল ভাবছিলুম, এবার বুঝলুম। আপনিই কারণ!'

যেন গরম একটা কিছু ছ্যাঁকা দিল কে নলিনাক্ষকে। সে প্রায় চাপা আর্তস্বরে বলে উঠল, 'আমি! আমি তার মৃত্যুর কারণ!'

'হ্যাঁ, ঐ আইসক্রীম খাওয়ানো আর পরিচয় জিজ্ঞাসা করাই কাল হয়েছে বেচারার। কেন যে আপনারা এত পরোপকার করতে যান।' তার পরই বেশ একটু তীক্ষ্ন কণ্ঠে বলল, 'বলছিলেন জড়ান নি। এই তো বেশ জড়িয়েছেন দেখছি। বাঘের গর্তে শুধু নয়, তার চোয়ালের মধ্যে পা দিয়েছেন একেবারে।...না, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না।'

'তার মানে?'

কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর আর পাওয়া যায় না। খুব চাপা, সামান্য একটা কুকুরের ডাক শুনতে পাওয়া যায় কাছাকাছি কোথাও থেকে। সঙ্গে সঙ্গে যেন অশরীরী কোন প্রাণীর মতোই অন্ধকারে মিলিয়ে যায় দেবীপদ।

যেমন ভাবে হাওয়া থেকে মূর্তি পরিগ্রহ করার মতো এসেছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই যেন হাওয়া হয়ে যায় আবার।

॥ চার ॥

ইংরেজীতে bewilderment বলে একটা শব্দ আছে—তার মানেটা যেন এতদিনে ঠিক বুঝতে পারল নলিনাক্ষ।

সে রাত্রের সেই অভিজ্ঞতার বিহ্বলতা বা বিভ্রান্তি কিছুটা কাটতেই তিন চার দিন সময় লাগল প্রায়। যত সেকথা ভাবে, ততই যেন আরও গুলিয়ে যায় মাথাটা অবিশ্বাস্য, অসম্ভব, অবাস্তব মনে হয়। সত্যিই কি এককড়ি এসেছিল, না সারা দিনের ঘোরাঘুরি খাটুনির পর ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখেছে সে?

ঐ ছেলেটার কথা যে ব'লে গেল? সেটা?...আহা বেচারী!

আচ্ছা, সত্যিই কি তার মৃত্যুর জন্যে নলিনাক্ষই দায়ী? ইস, কেনই বা দয়া করতে গিছল! কিন্তু তার সঙ্গে ওর এ বিপদের কী সম্পর্ক অনেক ভেবেও বুঝতে পারে না। ওকে কোন কাজ দিলে ভিক্ষে ছেড়ে দেবে এই জন্য? ভিক্ষেতে কি এত রোজগার হয় সত্যি-সত্যিই?

অনুতাপও হয়—আবার ভাবে, যদি সত্যিই তাই হয়—এমন কষ্ট ক'রে ভিক্ষের খাওয়া খেয়ে বাঁচবে, তার ভেতরও এত শাসন, এত নিষ্ঠুরতা, এত চক্রান্ত থাকে তো তার মরাই ভাল হয়েছে, রেহাই পেয়েছে সে। এভাবে বেঁচে থেকে কী পেত সে জীবনে আর?

মুশকিল হয়েছে এই—কথাটা যে খোলসা করতে পারত সেই দেবীপদরও কোন পাত্তা নেই আর। পথেঘাটে, মন্দিরে বাজারে, সমুদ্রতীরে—কত চেয়ে চেয়ে দেখে—কোথাও চিহ্নমাত্র দেখতে পায় না। সেই যে অন্ধকারে এসে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, সেই কুকুর কাঁদার শব্দে চমকে উঠে—একেবারেই যেন প্রেতমূর্তির মতোই মিলিয়ে গেল, লোক ও লোকালয় থেকে। কিছু বুঝিয়ে বলল না, পরিষ্কার করল না বক্তব্যটা—বরং আরো খানিকটা রহস্যেরই সৃষ্টি ক'রে গেল। চাপা গলায় হিস হিস করার মতো শব্দে, ধমকের ভঙ্গিতেই বলে গেল, 'বাড়ি চলে যান এখনই। আর কোন দিন এমন ভাবে রাত্রে একা বেরোবেন না। উঠুন, উঠে পড়ুন। বেশীক্ষণ আপনাকে প্রোটেক্শ্যান দিতে পারব না আর।'

এই কথাগুলো নিয়েই আরও বেশী ভাবছে। বাঘের চোয়ালের মধ্যে পা দিয়েছ বলে গেল। সে ব্যাপারটাই বা কি? যাই হোক, সাবধানও হয়েছে, সমুদ্রের ধারে গেলেও বেলা থাকতে থাকতে ফিরে আসে। একাও যায় না আর।...

কিন্তু দিন পাঁচ ছয় কেটে যেতেও যখন দেবীপদর কোন খবর পেল না—তখন ব্যাপারটা একটু হাস্যকর বলেই মনে হ'ল। হয় সে স্বপ্ন দেখেছিল, নয় তো দেবীপদই একটু তামাশা ক'রে গেল, অন্ধকারে বসে ছিল বলে একটু মজা ক'রে গেল ভয় দেখিয়ে। আর সেও এমন বুদ্ধু—এই কদিন ভয়ে ভয়ে সিঁটিয়ে আছে, কত কি ভাবছে। ছোঃ!

কিন্তু ঠিক যখন কথাগুলোকে নিতান্তই অবাস্তব, স্বপ্নদৃষ্ট বলে ভাবতে শুরু করেছে, সেই সঙ্গে মনের প্রশান্তি ফিরে পাচ্ছে একটু একটু ক'রে, একটি নিদারুণ

খবর এসে আবার সব ওলটপালট ক'রে দিল।

বৌদির ভাইঝি দোলাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দিনপাঁচেক আগে স্কুল থেকে হারিয়ে গেছে। ইস্কুলের গাড়ি ছাড়ার সময় তাকে পাওয়া যায় নি, ইস্কুলের ঝি ভেবেছে কোন বন্ধুর সঙ্গে তার গাড়িতে আগেই চলে গেছে। এমন নাকি এক আধ দিন গেছেও—বিশেষ বিপাশা বলে এক ব্যারিস্টারের মেয়ের সঙ্গে খুব ভাব, তার বাবা যেদিন নিজে নিতে আসেন তখন তিনিই ওকে ডেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যান—এর মধ্যে যে একটা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্রশ্ন আছে, সেটা কারুরই মাথায় যায় না।

এদিকে বৌদির দাদা রথীনবাবুরা ভাবছেন গাড়ির কোন গোলমাল ঘটেছে—চাকা ফুটো হয়েছে বা স্টার্ট নিচ্ছে না—ফিরতে দেরি হচ্ছে। শেষে যখন সে সব সম্ভাবনার সময়ও কেটে গেছে তখন মেয়েরা পুরুষদের খবর দিয়েছে, তাঁরা আপিস থেকে ফিরে ইস্কুলে গিয়ে খবর নিয়েছেন—কর্তৃপক্ষ কেউ নেই, দারোয়ান কিছু বলতে পারে নি। তার পর অবশ্য প্রিন্সিপ্যালকে পাওয়া গেছে, তিনি তখনই ইস্কুলে এসে ঝিকে ড্রাইভারকে ডেকে পাঠিয়েছেন—কিন্তু কেউই কোন খবর দিতে পারে নি, তাদের ধারণার কথা জানিয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে গেছে। অতঃপর পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এ পর্যন্ত কোন খবর পাওয়া যায় নি। এতদিন তাঁরাও ব্যস্ত ছিলেন, তা ছাড়া শরীর খারাপ, চেঞ্জে এসেছে, মিছিমিছি উদ্বিগ্ন ক'রে কোন লাভ নেই বলেই সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন নি, কিন্তু আর দেরি করা উচিত নয় ভেবেই এই খবর পাঠাচ্ছেন। ইত্যাদি—

নলিনাক্ষর মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। দশ-এগারো বছরের মেয়ে দোলা। সুন্দর দেখতে, তেমনি বুদ্ধিমতী। পড়াশুনাতেও ভাল। ভারী মিষ্টি স্বভাব। বৌদির বাপের বাড়ির সব ছেলেমেয়ের মধ্যে এই দোলাই ওর সব চেয়ে প্রিয়। কতদিন এসে থেকে গেছে। যখন আরও ছোট ছিল, ওর বিছানাতেই এসে শুত, বলত, 'গপ্প বলো না একটা নলিনকাকু, তুমি তো কত গপ্প লেখো, নতুন গপ্প বলতে হবে কিন্তু—' গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ত।

সে অস্থির হয়ে উঠল। বৌদি কান্নাকাটি করছেন। সেজন্যও যত না হোক—নলিনাক্ষর নিজের মনের তাগিদও কম নয়। অথচ কীই বা করবে তাও ভেবে পায় না। বৌদি বলছেন, 'তুমি একবার যাও, তোমার কত জানাশুনো, তুমি গিয়ে চেষ্টা করলে পুলিস আরও য়্যাক্‌টিভ হয়ে উঠবে।'

কিন্তু সে ধরনের চেষ্টায় কতটুকু বেশী ফল হবে তা বুঝতে পারে না নলিনাক্ষ। এদের ফেলে যাওয়াই কি ঠিক হবে! আঃ, এই সময় যদি দেবীপদকে পাওয়া যেত—

ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল কথাটা। একটা কথা বলেছিল, 'দিবাভাগে দৃশ্য নয়। রাত্রেই ঘোরে সেজন্যে।' যদি এখন পুরীতে থাকে রাত্রেই দেখা পাবে। আর, মুখে যাই বলুক, তেমন বিপদ বুঝলে ওর দিকেও নজর রেখেছে নিশ্চয়। বিপদে গিয়ে পড়লে অন্তত ধমক দিতেও সামনে আসবে।

সেদিন অমাবস্যা, আকাশে মেঘের ভাবও আছে, যাকে কবিরা সূচীভেদ্য অন্ধকার বলেন তাই। মূর্তিমান ব্যাঘাত হচ্ছে শুধু ঐ মধুপুর হাউসের আলোটা। নলিনাক্ষ ওদিকটা এড়িয়ে, ছোট মন্দিরটাকে ডাইনে রেখে, একটা হেলে-পড়া বাড়ির পাশ দিয়ে নামল সমুদ্রের দিকে। টর্চ হাতে ছিল কিন্তু ইচ্ছে ক'রেই জ্বালে নি।

বিপদ যদি সত্যিই কিছু থাকে টর্চ জেবলে নিজের উপস্থিতি না জানানোই ভাল।

দেখা গেল ওর হিসেবে বা অনুমানে কিছুমাত্র ভুল হয় নি।

বাড়িটার সবটা হেলে-পড়া নয়, শেষের দিকে একটা আউটহাউস মতো ছিল, সেইটেই হেলে পড়ে আছে দীর্ঘকাল, বসবাসের অযোগ্য হয়ে—কিন্তু ভেঙেও পড়ে যায় নি। বাড়িটা মাঝে মেরামত করিয়েছেন মালিক, এটায় হাত দেন নি। ওরা যেদিন প্রথম আসে সেদিন এ বাড়িতে আলো জবলতে দেখেছিল, আজ সৌভাগ্যক্রমে অন্ধকার। বোধ হয় কেউ নেই, যারা ছিল কলকাতায় ফিরে গেছে।

ওদিক দিয়ে নেমে ঠিক খোলা জায়গায় পড়েছে—সেই হেলে-পড়া ঘর থেকেই কে একজন নিঃশব্দে অথচ তীব্রবেগে বেরিয়ে এসে ওর হাত চেপে ধরল।

ভয় পাবার কথা নয়, এইটের জন্যেই তো বলতে গেলে আসা—তবু বুকের মধ্যে একটা কাঁপুনি লাগে বৈ কি! সেটা বুঝেই যেন সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রায়-অদৃশ্য মূর্তি বলে ওঠে, 'আবার বেরিয়েছেন এইভাবে! বারণ করেছিলুম না!' অর্থাৎ দেবীপদ।

বিপদের মুখে 'আপনির' দূরত্বটা আপনিই চলে যায়, ওকে একেবারে জড়িয়ে ধরে নলিনাক্ষ বলে ওঠে, 'তোমার খোঁজেই এসেছি ভাই। বাঁচালে। যেভাবে খুঁজেছি আর ভেবেছি তোমার কথা, জগন্নাথই দয়া ক'রে বুঝি মিলিয়ে দিলেন।'

'শান্ত হোন, শান্ত হোন। বসুন এদিকটায়। পিছনে আমার লোক আছে, এখানে কিছু হবে না। ব্যাপারটা কি?'

খুলে বলল নলিনাক্ষ। দোলার হারানোর বিবরণ, এ পর্যন্ত যা যা খবর পাওয়া গেছে।

দেবীপদ চুপ ক'রে বসে শুনল সব, কেবল দারোয়ান ঝি আর ড্রাইভারের এজাহারগুলোর বেলায় দু'একটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করেছিল, আর ইস্কুলের নামটা জেনে নিয়ে বলেছিল, 'ও, মিস দাসগুপ্ত? তাকে আমি জানি, অত্যন্ত রেসপনসিবল্ মহিলা!'—তার পর নলিনাক্ষর কথা শেষ হতে শুধু বলল, 'এগারো বছর বয়েস, সুন্দর দেখতে? তবু ভাল। কুয়ায়েট কি ঐ রকম কোন আরব কান্‌ট্রির আমিরের হারেমে চালান হয়েছে, নইলে বিক্রী ক'রে দিত ক্রীতদাসী হিসেবে। আফ্রিকা কি ইটালীর কোন ক্ষেতে বিনা মাইনেয় সারাদিন ভূতের মতো খাটতে হ'ত—পাহারা আর চাবুকের মধ্যে—রাত্রে কর্মচারীদের সঙ্গে শুতে হ'ত।'

'সে কি! কী সব বলছ মাথামুণ্ডু? এখনও ক্রীতদাস কোথাও আছে নাকি?'

'আপনি না খবরের কাগজের লোক? ময়রারা সন্দেশ খায় না শুনেছি, তা এও সেইরকম দেখছি যে!'

'তুমি বড্ড হেঁয়ালি করো ভাই।'

'আমি সত্যি আর স্পষ্ট কথা বলি, আপনাদের মন তৈরী নয় বলে বুঝতে দেরি হয়। আই অ্যাম পসিব্‌লি এ লিট্‌ল্ য়্যাহেড্ অফ ইউ। যা হোক, যা দরকার সব শুনে নিয়েছি, আপনি বাড়ি যান। আপনার জীবন আদৌ নিরাপদ নয়, এ জেনে রাখবেন। কে জানে দোলাকে অপহরণ আপনাকে শিক্ষা দেবার জন্যেই কি না! কেলোকে হারানোর শোধ।...যান, উঠুন।'

আর বসতে সাহস হ'ল না নলিনাক্ষর। দেবীপদর সঙ্গেও কথা বলার সময় হ'ল না। সে আগের দিনের মতোই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল চোখের নিমেষে।

সমুদ্রের ধার থেকে উঠে আসবার পথটা চাকলাদারদের বাড়ির সামনে দিয়ে। বাড়িটা পরিক্রমা ক'রে নলিনাক্ষদের বাড়ি ঢুকতে হয়। উঠে আসতে আসতেই দেখতে পেল চাকলাদারের বড় ঢাউস গাড়িখানা বেরিয়ে যাচ্ছে শহরের দিকে। এত রাত্রে আবার কোথায় যাচ্ছে? নাইট-শো সিনেমায় নাকি? বাজারহাট তো এতক্ষণে সব বন্ধ হয়ে গেছে। মন্দিরেও তো যেতে দেখে না বিশেষ—তবে?

গাড়িখানা দূরে চলে যাচ্ছে, নলিনাক্ষও নিজেদের বাসার দিকে মোড় ফিরছে—আর একটা ব্যাপার খেয়াল হল। মনে হ'ল অনেকক্ষণ ধরেই শুনছে, কানে আসছে, অত লক্ষ্য করে নি—কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ। চেনা চেনা, কিসের শব্দ এটা। শব্দটা দূরে সরে যাচ্ছে, একটু পরে আর শোনা গেল না। গাড়ির সঙ্গে সঙ্গেই যেন যাচ্ছে শব্দটা...তবে কি গাড়িরই কোন শব্দ উঠছে? ইঞ্জিনের—? আশ্চর্য, মনে হয় ঠিক যেন মানুষ গোঙাচ্ছে।

নিজেদের বাড়ি ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে গেল নলিনাক্ষ।

কথাটা ভাসা-ভাসা ভাবেই মনে এসেছিল, কিন্তু সহজে ভেসে গেল না।

মানুষ? গোঙানি? সেই রকমই কিন্তু। চাপা গোঙানি একটা। মনে হচ্ছে যেন, গাড়ির কেরিয়ার থেকেই শব্দটা আসছিল।

না—বাতাসের শব্দ?

সমুদ্রের বাতাস বন্ধ দরজা জানলায় বাধা পেয়ে এই রকম গোঙানির শব্দ করে বটে। এখানে ঠিক বোঝাও যায় না ছাই।

বাতাসেরই শব্দ নিশ্চয়।

কিন্তু, কিন্তু থেমে—যেন মিলিয়ে গেল কেন?

দরজায় ধাক্কা খেয়ে বাতাসের শব্দ যদি হয়, সমুদ্রের হাওয়া তো এখনও সমান বেগে বইছে। দরজাও তো বন্ধ আছে, যেগুলো ছিল!

আর—মনে হচ্ছিল যেন ঐ গাড়িটার সঙ্গে সঙ্গেই দূরে সরে যাচ্ছিল।

কে জানে! অত আর মাথা ঘামাতে পারে না। আসলে এই সব ভেবে ভেবেই মাথা গরম হয়ে উঠেছে। নিজেরই ছায়াকে ভূত দেখছে। বাতাসের শব্দে গোঙানি শুনছে। হয়ত সাইলেন্সার পাইপে ফুটো হয়েছে কোথাও, তারই শব্দ ওটা। মনটা ঠিক প্রকৃতিস্থ থাকলে আগেই বুঝতে পারত।

দেবীপদটা এমন ভয় দেখায়! মজা দেখে—নাকি?

॥ পাঁচ ॥

পরের দিন বাজার থেকে ফিরে দেখল দাদা কমলাক্ষ পৌঁছে গেছেন। সেদিন ওঁর আসবার কথা নয়, এই জন্যই এসেছেন, দোলার ব্যাপারেই। তাঁরও বিশ্বাস, ভাইয়ের লেখক হিসেবে একটু নাম-ডাক হয়েছে, অত বড় কাগজে চাকরি করে—সে চেষ্টা করলে পুলিস একটু বেশী মনোযোগ দেবে, আরও সক্রিয় হয়ে উঠবে।

স্বামীকে দেখে বৌদি আরও কান্নাকাটি করছেন। 'এত দিন হয়ে গেল, সে কি বেঁচে আছে! দ্যাখো গে যাও, কোথায় কে মেরে পুঁতে দিয়েছে!'

কমলাক্ষ বারকতক বৃথা বোঝাবার চেষ্টা করলেন, 'খামকা তাকে মেরে ফেলে কার কি লাভ বলো। গায়ে এক-গা গহনাগাঁটি থাকলেও বা কথা ছিলো। বরং ঐ

নলিনের বন্ধু যা বলেছে সেই সম্ভাবনাই বেশী। কাবুলে কি জর্ডানে কি ইরানে চালান ক'রে দিয়েছে—'

'সে তো মরারই সামিল হ'ল, সে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল।'

বৌদির কান্না বেড়েই যায়।

সেদিনই রাত্রের গাড়িতে যাবে কিনা নলিনাক্ষ সেই আলোচনা হচ্ছে—হঠাৎ বাইরে মধুবাবুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, 'নলিনাক্ষবাবু, আছেন নাকি?'

বিরক্ত হ'লেও বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানাতে হ'ল। কারণ 'আছেন নাকি'টা কথার কথা, জানলা থেকে দেখেই ডেকেছেন ভদ্রলোক।

মধুবাবু ও'দের পিছন দিকে গাঙ্গুলীবাবুদের বাড়ি ভাড়া এসেছেন। নিজে যেচে আলাপ করেছেন সেই প্রথম দিনটিতেই। তারপর থেকে প্রায় রোজই আসেন। সুবিধর মধ্যে বেশীক্ষণ থাকেন না। দুটো চারটে কথা ব'লে—খুব দ্রুত ওদের হাঁড়ির খবর নিয়ে চলে যান—আর, কখনও নিজের বাড়িতে যেতে বলেন না এদের। বৌদি বলেন, 'বলব কি! গেলে যদি চা খাওয়াতে হয়! লোকটা হাড়-কিপটে। আমি দেখেছি নুলিয়াগুলো মাছ নিয়ে যায়, দেখলেই ডাকে—কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনদিন নিতে দেখলুম না। ঐ দর ক'রেই সুখ!'

মধুবাবু ভেতরে এসে বিনা আমন্ত্রণেই চৌকীটায় বসলেন। বললেন, 'ইনি কে? দাদা বুঝি? মুখ দেখেই বুঝেছি। আজকের গাড়িতে এলেন? তা হ্যাঁ মশাই নলিনবাবু, শুনলুম আপনাদের নাকি একটি মেয়ে হারিয়েছে?'

'হ্যাঁ। তা আপনি কোথা থেকে শুনলেন?' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করে নলিনাক্ষ।

'বাড়িতে এঁয়ারা বলছিলেন। কোথা নাকি শুনেছেন। তাই বলি একবার সঠিক জেনে আসি।'

অগত্যা বলতে হ'ল কথাটা। মধুবাবুর জেরায় সবই জানাতে হ'ল—হারানোর পূর্ণ বিবরণ।

'সর্বনাশ! হারানো কি বলছেন! এ তো চুরি। চুরি করেছে মশাই। নাকে ক্লোরোফরম্ বা অমনি কিছু দিয়ে অজ্ঞান ক'রে নিয়ে গেছে, কিংবা তোমার কাকু দাঁড়িয়ে আছে—গাড়ি নিয়ে এসেছে—এমনি কিছু বলেছে। তার পর মুখ চেপে ধরে জোর ক'রে কোন গাড়িতে তুলেছে।...শুনেছি হিপনোটাইজ ক'রেও নিয়ে যায় অনেক সময়। মনে আছে—একটা ষোল বছরের ছেলে কলকাতা থেকে উধাও হয়, তাকে বর্ধমান ইষ্টিশানে পাওয়া গেছল? কিছুই বলতে পারে না কি ক'রে এল সেখানে! এ একটা বিরাট গ্যাঙ হয়েছে মশাই।...তা হারিয়েছে তো কলকাতায়—না কি? কোথায় থাকত এরা?'

'এরা বৌদেলের কাছে থাকত।' নলিনাক্ষকে বলতে হয়। ভাল লাগছে না কারুরই এই সব বকবকানি, কিন্তু উপায়ই বা কি?—'হারিয়েছে ইস্কুল থেকে, মানে ইস্কুল এসেছিল, পুরো ক্লাসও করেছে। ইস্কুলটা ওর বালিগঞ্জে—দেশপ্রিয় পার্কের কাছে।'

'তাহলে সে এখনও কলকাতাতেই আছে হয়ত। হৈ-চৈ খোঁজখবরটা যাকে বলে, থিতিয়ে না গেলে ওরা বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে না। জানে তো, এখন চারদিকে চোখ রেখেছে পুলিস। লুকিয়ে রাখতে গেলে মশাই নিরাপদ জায়গা এই কলকাতাই। আপনি যান নলিনবাবু, আপনি গেলে কাজ হবে।...অতবড় কাগজে

তো কাজ করেন—দিন খানকতক চিঠি ছেপে, নামে বেনামে—দেখেন না, একজন এক কলম লিখলেন অমনি তার পোঁ ধ'রে পঁচিশখানা চিঠি অমনি ছাপা হয়ে গেল! কার এত গরজ মশাই? ওসব ঐ আপিসে বসেই লেখা হয়, ওসব আমাদের জানা আছে। তা আপনিই বা সে য়্যাডভাণ্টেজ নেবেন না কেন? চিঠি ছাপুন, কলম লিখুন, এডিটোরিয়াল লেখান—ঠিক পুলিসের টনক নড়বে। বড় খবরের কাগজকে মশাই বোধ হয়, ভগবান কেন—ভূতও ভয় করে। হ্যা—যা বলছি, ভেবে দেখুন। কাগজ—ও বড় সাংঘাতিক জিনিস!'

আশ্চর্য! কাল থেকে নলিনাক্ষও ঠিক এই কথাগুলোই ভেবেছে। মধুবাবুকে প্রথম প্রথম যতটা 'ফোরটোয়েন্টি' সব-জান্তা দাদা মনে হ'ত—এখন তো ততটা মনে হচ্ছে না। জানেন অনেক কিছুই। কী করেন কে জানে। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, 'কী করি? কি না করি তাই বলুন। যখন যা পাই—দু পয়সা রোজগারের ধান্ধা। জ্যাক অফ অল ট্রেড মাস্টার অফ নান—সেই অবস্থা আর কি!'

অবশ্য সে সব কথা এখন আর উঠিয়ে লাভ নেই। নলিনাক্ষ বলল, 'আমিও তো আজই যেতে চাই। কিন্তু টিকিট? যা ভীড় এখন চেঞ্জারবাবুদের। রিজার্ভেশান পাওয়া যাবে সদ্য সদ্য?'

মধুবাবুর অদম্য উদ্যম। বললেন, 'চলুন না দুজনেই স্টেশনে যাই। গিয়ে সিচুয়েশানটা বুঝিয়ে বলি স্টেশন মাস্টারকে। তাতেও না পান—একটা রাত না হয় আনরিজার্ভড্ কামরাতেই চলে যাবেন। কী হয়েছে, ইয়ংম্যান্, দাঁড়িয়ে গেলেই বা কি ক্ষেতি? সন্ধ্যের বাস হয়েছে একটা—তাতেও যেতে পারেন। তাতে অবিশ্যি বসে যেতে পারবেন।'

সত্যিসত্যিই তিনি একরকম টানতে টানতে নিয়ে গেলেন স্টেশনে। বিশেষ সুবিধে হ'ল না। রিজার্ভেশান ক্লার্ক ঘাড় নাড়লেন। কোন বার্থ এমন কি সীটও নেই। মধুবাবু তাতে দমবার পাত্র নন, হুড়মুড় ক'রে স্টেশন মাস্টারের ঘরে ঢুকে গেলেন। বেশ একটু উত্তেজিত ভাবে ইংরেজী বাংলা মিশিয়ে একটা লেক্‌চার দিলেন—যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এ যখন একটা জীবনমরণ সমস্যা, তখন তাদের উচিত অন্য কারও রিজার্ভেশান ক্যানসেল করিয়ে নলিনাক্ষকে দেওয়া।

স্টেশন মাস্টার খুব সহানুভূতি জানালেন, কিন্তু তাতে আসল কাজের কিছু হ'ল না। বললেন, 'দিন-কাল বড় খারাপ পড়েছে, কোথায় কোন্ প্যাসেঞ্জারকে বঞ্চিত করব—সে হয়ত দেখুন কোন্ রাজ্যের কোন্ মিনিস্টার কিংবা এম-এল-এ'র আত্মীয়। এক কথায় আমার সাজা হয়ে যাবে। আমার এক বন্ধু মশাই, বাবুলাল, সে জেনেশুনে মিছে বলে নি, দেখতেই ভুল হ'য়েছিল, এক প্যাসেঞ্জারকে বলে দিয়েছে স্লীপার বার্থ খালি নেই, তারপর বুঝি সেই প্যাসেঞ্জারেরই চেনা কে এসে পেয়েছে—এই কেস। লোকটি বুঝি কোন্ মিনিস্টারের কে, সইয়ের বৌয়ের বকুল-ফুলের বোনপো বোয়ের বোনঝি-জামাই, এক কথায় ডিমোশন হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ট্রান্‌স্‌ফার—লোকটার কেরিয়ারটাই ডুম্‌ড্।...সে সব পারব না। দেখি লাস্ট মোমেণ্টে যদি কেউ আসে ফেরত দিতে, আমি আপনাকে খবর পাঠাব।'

তিনি সামনের ব্লটিং প্যাডে নলিনাক্ষর নাম ঠিকানা লিখে নিলেন।

মধুবাবুর উৎসাহ কিন্তু তবুও স্তিমিত হ'ল না। তিনি বেরিয়ে এসে বললেন, 'না মশাই, এ কোন কাজের কথা নয়। উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ, যা হোক একটা জোড়াতালি দিয়ে বুঝিয়ে দিলে আমাদের। চলুন একবার বাসটা দেখে যাই—'

বাস-এ সীট ছিল। তবে রিজার্ভ করতে চাইল না। আসলে ওরা নাকি এত আগে রিজার্ভ করে না। সাতটায় বাস ছাড়বে, পৌঁছাবে সকাল ছটায়। ছাড়বার এক ঘণ্টা আগে টিকিট দেওয়া হয়। যারা আগে এসে 'কিউ' দেবে তারাই পাবে।

সেই মতোই চলে আসছিল নলিনাক্ষ, না হয় চারটেতেই আসবে বাস-স্ট্যাণ্ডে—কিন্তু মধুবাবু ছাড়বার পাত্র নন। অনেক বড় বড় বুলি ছেড়ে, স্পেশ্যাল কেস, এই রকম ক্ষেত্রে আইন শিথিল করা উচিত বুঝিয়ে দিয়ে—তারপর, এসব মন্ত্রেও যখন কাজ হ'ল না, তখন মধুবাবু ব্রহ্মাস্ত্রটি ছাড়লেন। 'কতবড় খবরের কাগজে কাজ করে তা জানেন? এডিটার। সম্পাদকীয় লেখেন। জরুরী কাজ, যদি আপনারা একটু কো অপারেশন মানে সহযোগিতা না করেন—পরে পস্তাবেন। উনি হুড়ো দিলে তখন দেখবেন কলকাতা ভুবনেশ্বরের গভর্ণমেণ্ট আপনাদের নভুতো নচ্ছুতো করবে!'

তাতেই কাজ হ'ল। মধুবাবু নিজের পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বার ক'রে জমা দিয়ে দিলেন, কথা রইল ছটার মধ্যে এসে বাকী টাকা জমা ক'রে দেবে নলিনাক্ষ।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য তা করতে হ'ল না। চারটের সময় স্টেশন থেকে পোর্টার এল, 'এখনই কেউ টাকা নিয়ে আসুন—একটা স্লীপার বার্থ পাওয়া গেছে।'

এ খবরটা আর মধুবাবুকে দিল না নলিনাক্ষ। এতক্ষণের সাহচর্যেই অস্থির হয়ে উঠেছে। ভারী নাছোড়বান্দা লোকটা, সব দিক দিয়েই। যেন কাঁঠালের আঠার মতো গায়ে লেপ্‌টে থাকে। আর—উনি যা বলবেন তাই করতে হবে, আর কেউ যেন কিছু বোঝে না! সেইটেই আরও অসহ্য। ওয়েলমিনিং হয়ত—কিন্তু ওয়েল-মিনিং ফুল।

ভাগ্যিস শেষ মুহূর্তে ট্রেনের ব্যবস্থাটা হয়ে গেল। পরের দিন আপিসে গিয়ে খবর পেল পুরী থেকে কলকাতা আসার নাইট-বাস ভদরকের কাছে য়্যাক্‌সিডেণ্টে পড়েছে। কে বা কারা এক জায়গায় রাস্তায় খানিকটা খুঁড়ে রেখেছিল—সেটা একটা বাঁকের মুখ, একেবারে সামনে গিয়ে পড়ে সেটা দেখতে পায় ড্রাইভার, তাড়াতাড়ি গাড়ি ঘোরাতে গিয়ে পাশে ধানের ক্ষেতে গড়িয়ে পড়ে যায়। তিনজন মারা গেছে, এগারোজন জখম—তার মধ্যেও তিনজনের অবস্থা আশংকাজনক।

মনে হচ্ছে জগন্নাথই তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন, স্টেশন মাস্টারের শুভবুদ্ধির উদ্রেক করিয়ে।

॥ ছয় ॥

বাড়ি ফিরে স্নানাহার সেরে একটু সকাল সকালই আপিসের দিকে রওনা দিল নলিনাক্ষ। এখন গিয়ে অনেক কিছু করতে হবে—ম্যানিপুলেশন যাকে বলে। দোলাকে যদি বাঁচাতে হয়—মৃত্যু বা তারও অধিক শোচনীয় ভাগ্যের হাত থেকে—তাহলে এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে পুলিসকে আরও সক্রিয় ক'রে তোলা। আর তা করতে হ'লে খবরের কাগজে 'আন্দোলন' করা ছাড়া কোন উপায় নেই। দেবীপদ সব জেনেছে ঠিকই, কিন্তু তারও নিজস্ব কাজ আছে—খুবই বিপজ্জনক কাজ, তার কথার ভাবে যা মনে হ'ল—সে আর এদিকে কতটুকু মনোযোগ দিতে পারবে?

বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে—দেখল সামনেই মিঃ চাকলাদারের গাড়ি—গাড়িতে মালিক স্বয়ং। সেটাও ছাড়ছ তখন।

একটু অবাকই হ'ল নলিনাক্ষ। তার পরই মনে পড়ল সেদিনের কথা। গাড়িটা বেরিয়ে চলে আসা। ঠিক তো—কাল তো একবারও চোখে পড়ে নি। তার মানে তখনই কলকাতা ফিরেছে।

চোখোচোখি হ'তে বলল, 'এ কি, আপনি? পুরী থেকে চলে এসেছেন বুঝি? কবে এলেন, টের পেলুম না তো!'

'না না', ভদ্রতার প্রতিমূর্তি মিঃ চাকলাদার সৌজন্যে গলে গেলেন যেন, 'সেভাবে এলে আপনাকে বলে আসতুম বৈ কি। মাই ফ্যামিলি ইজ স্টিল দেয়ার। আমি একটা জরুরী কাজে এসেছিলুম। এই এখনই আবার ফিরে যাচ্ছি। তা আপনি যে এরই মধ্যে ফিরলেন?'

বলতে গিয়েও কারণটা বলল না নলিনাক্ষ। বলল, আমার অল্পদিনেরই মেয়াদ ছিল। আজ আপিসে জয়েন করতে যাচ্ছি। অবিশ্যি বৌদিরা এখনও থাকবেন কিছুদিন।'

আপিসে গিয়ে অনেক কাজ করল। ওর ওই বিপদের কথা শুনে সকলেই যথেষ্ট আনুকূল্য করল। তিন-চারজনে ব'সে তিন চারখানা চিঠি লিখে ফেলল, সেগুলোর লেখকের নামটামও দিয়ে দিল নিজেরাই। ওদের যে সাপ্তাহিক, তার সম্পাদককে বলতে তিনি এই নিয়ে একটা ফীচার করবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। নলিনাক্ষ নিজের কলমও লিখল। সেদিন সম্পাদকীয় যাঁর লেখবার কথা, বরুণ চক্রবর্তী, তাঁকেও অনুরোধ ক'রে এল। তিনি বললেন, 'আজ যদি নাও যায়, কাল ঠিক যাবে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

সকাল সকাল আপিসে গিছল কিন্তু সকাল ক'রে ফেরা হ'ল না। দু-একটা টেলিফোন সেরে—সে খবরটা কোনমতে দাদাকে পাঠানো যায় যাতে, সে ব্যবস্থা করতে সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল।

বাড়ি ফিরে দেখল বাইরের ঘরে এক কনস্টেবল। দেখে অবাকও যেমন হ'ল, একটু আশাও জাগল মনে। তা'হ'ল কি কোন খবর পাওয়া গেছে দোলার?

'কী ব্যাপার বলো তো? কোন্ থানা থেকে আসছ?'

সে কথার উত্তর না দিয়ে লোকটা বলল, 'আপনার নামই তো নলিনাক্ষবাবু?'

'হ্যাঁ—কেন? কোন খবর আছে?'

হাতের তালুটা এতক্ষণ আধমুঠো করা ছিল সিপাইটির। সে এবার সেটা মেলে ধরল ওর সামনে, তাতে নলিনাক্ষরই একখানা ছোট ফটো।

মুখে বলল, 'দেবীবাবু আজ রাত বারোটার সময় কলকাতা পৌঁছবেন। আপনাকে একবার ওঁর আপিসে যেতে হবে সেই সময়। উনি গাড়ি পাঠাবেন, ড্রাইভারের কাছে এই ফটো থাকবে, দেখে তবে সে গাড়িতে উঠবেন।'

'দেবীবাবু—হঠাৎ?'

'তা জানি না। আমার ওপর যেটুকু হুকুম হয়েছে—আমি জানিয়ে গেলাম। তবে যা শুনলুম, আন্দাজ হয় আপনারই কোন কাজে যাওয়া নাকি দরকার। নমস্কার।'

মুখে নমস্কার বলেও স্যালিউট ক'রে চলে গেল সে—পুলিসী কেতা-মতো।

লোকটা চলে যেতে নলিনাক্ষ দরজা বন্ধ ক'রে ভেতরে এসে বসল। আশাও

একটু হচ্ছে বৈ কি।

দেবীবাবু যদি ওর কাজেই আসছে বলে থাকে—তাহলে দোলার ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়। তার আর অন্য কি কাজ ?...কিন্তু দেবীপদ এখানে না এসে ওখানে ডেকে পাঠাল কেন ? আপিসেই বা ওকে ডেকে নিয়ে যাবার দরকার ? কাউকে সনাক্ত করতে হবে ?

ওদের কম্‌বাইন্‌ড্‌-হ্যান্ড রঘু চা দিয়ে গেল। 'আউর্‌ অ কুছ় খাইবে বাবু' প্রশ্ন করল। 'কিছু খাবে না' শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে রান্নাঘরে ফিরে গেল আবার।

চা খেতে খেতে মনে পড়ল পুরীতে একখানা চিঠি লেখা দরকার—টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে বটে—তবে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া যায় নি কিছু—কী কী করেছে সে, কতদূর—। তার চেয়েও যেটা দরকার, ব্লেড নেই একখানাও। তাড়াতাড়ি আসার সময় ব্লেডের প্যাকেটটাই আনা হয় নি। আগে সেটা আনাতে বা আনতে হবে। নইলে দোকান বন্ধ হয়ে যাবে এখনই, কাল আটটার আগে পাওয়া যাবে না। এই এক উৎপাত হয়েছে আজকাল, সাড়ে সাতটা না বাজতে বাজতে ঝাঁপ ফেলা শুরু হয়ে যায় দোকানে দোকানে। তবু ওদের মোড়ের দোকানটা দোর ভেজিয়ে সাড়ে নটা পর্যন্ত বেচা কেনা করে, তাই রক্ষা।

অন্য দিন হলে রঘুকে পাঠাত। কিন্তু বৌদিরা কেউ নেই, রঘুই রান্না করছে। যেতে হলে ওকেই যেতে হবে। ভাগ্যে ধরাচূড়ো ছাড়ে নি এখনও। বাইরের কাজটা সেরে এসেই একেবারে জামা-প্যান্ট ছেড়ে স্নান ক'রে নিশ্চিত হবে—

ব্লেড কিনে ফিরছে, অন্ধকারে একটা গাড়ির আলো এসে পড়ল সামনের বড় রাস্তায়—বহুদূর পর্যন্ত। আর তাতেই চোখে পড়ল আগে আগে যাচ্ছে চাকলাদারের বড় গাড়িখানা—যেটা আজই পুরী চলে যাবার—এবং এতক্ষণে সেখানে পৌঁছে যাবার কথা।

তবু সন্দেহ থাকতে পারত একটু—কিন্তু পিছনের গাড়িখানা আর একটু এগিয়ে গেছে। আরও জোর আলো গিয়ে পড়েছে সামনের গাড়িতে। না, ভুল হবার কোন সম্ভাবনা নেই। সেই গাড়িই। এমন কি ভেতরে পরেশ চাকলাদারের টাকাভর টাকটাও দেখা যাচ্ছে দিব্যি।

সকালেই যে পুরী যাচ্ছিল সে এখনও এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে! তার মানে যাওয়ার কথাও ছিল না, ইচ্ছাও না। জেনেশুনেই মিছে কথা বলছে লোকটা।

না, লোকটার চালচলন ক্রমশই যেন কেমন কেমন হয়ে উঠছে।

বৌদির ধারণা দেখা যাচ্ছে একেবারে অমূলক নয়। মেয়েরা মানুষ চেনে অনেক বেশী সহজে, নিজেদের সহজ বুদ্ধিতে চেনে বলে চেনাটাও সোজা—পুরুষেরা অনেক বিবেচনা ভদ্রতার পাকে বাঁধা থাকে বলেই দেরি হয়।

কিন্তু বাড়ির দরজা পর্যন্ত এসে ওর একটা খটকা লাগল। গাড়ির নম্বরটায় তখন তত নজর দেয় নি, মনেও হয় নি কথাটা—কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এটা চাকলাদারের সে গাড়ির নম্বর তো নয়! তবে কি সে ভুলই দেখল ? পরেশবাবুর গাড়ি নয় ওটা ?...তাই বা কেমন ক'রে হবে! ডান দিকে ঐ যে একটু রং-ওঠা দাগ, মিঃ চাকলাদারের টাক—সবই তো মিলে যাচ্ছে। নম্বরটাই হয়ত কি দেখতে কি দেখেছে। অত তাড়াতাড়ির মধ্যে, তাছাড়া নজরটা ছিল আরোহীর দিকেই—।

বাড়ি ফিরে স্নান ক'রে ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে বসতেই যেন রাজ্যের ঘুম

জড়িয়ে এল চোখে।

চোখেরও অপরাধ নেই, কাল রাত্রে ট্রেনে একটুও ঘুম হয় নি। স্লীপার নামেই, সারারাত দুটি মহিলা বকর বকর করতে করতে এসেছেন, নিজেদের বাপের বাড়ির ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি, জামাইরা মেয়েদের কত বাধ্য, আর বৌগুলো ছেলেদের পর ক'রে নিচ্ছে—মোটামুটি এ-ই বক্তব্য। এছাড়া একজনের ছেলের অসুখ; বাচ্ছাটা সারারাত কেঁদেছে প্রায়।

একটা লোক—বোধ হয় তার ঘুম হয় না রাত্রে—প্রত্যেক স্টেশনে দরজা খুলে নামছিল। কোন কিছুই কেনার নেই। দেখারও না, অত রাত্রে কীই বা দেখবে? অথচ ট্রেন থামামাত্র সে এত ব্যস্ত হয়ে নামছে, যেন কী প্রচণ্ড দরকার। পাছে অবাঞ্ছিত কেউ উঠে পড়ে সেই ফাঁকে—নলিনাক্ষকেই ঘাড় তুলে লক্ষ্য রাখতে হচ্ছিল, কারণ তারই ভয়ের কারণ ছিল—দেবীপদর সতর্কবাণী তামাশা কিনা সেটা তো ঠিক বুঝতে পারছে না। এই ভাবেই কেটেছে সারারাত, তার ওপর আজ সকাল থেকে একটানা নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে, বিশ্রাম দূরে থাক, এক মিনিট স্থির হয়ে বসতে পারে নি।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল নটা বেজে গেছে। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে —স্থির হয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গেই। যতক্ষণ মানসিক উত্তেজনা আর উদ্বেগ ছিল, সেই টানে কাজ ক'রে গেছে, এখন মনের রাশ একটু আলগা হতেই স্নায়ু শিথিল হয়ে আসবে—সেটা স্বাভাবিক। এর ওপর পেটে খাবার পড়লে আর কোনমতেই জেগে থাকা যাবে না।

ঘুমনো উচিতও—কিন্তু ঐ এক ঝঞ্ঝাট রইল, রাত বারোটায় দেবীপদর গাড়ি। গাড়ি কেন তাও তো বোঝা যাচ্ছে না। তাকে বললে সে-ই তো যেতে পারত।...কী যে ব্যাপার—সত্যিই কি তার এত বিপদের ভয় আছে? নইলে ড্রাইভার ছবি দেখালে তবে সে গাড়িতে উঠবে—এত সাবধান হবে কেন দেবীপদ? আশ্চর্য! সে কার কি অনিষ্ট ক'রে বসল এত যে, তার প্রাণ নেবার জন্যে এত আয়োজন চলছে! দেবীপদর আবার একটু বেশী বাড়াবাড়ি—

তন্দ্রায় দেহের সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতিগুলোও শিথিল হয়ে আসছে। চিন্তাগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে তাই। আধ ঘুমে আধ সচেতনতাতেই দেবীপদর সতর্কতা থেকে মনটা চ'লে গেল ছবিখানায়। সিপাইর হাতের ছবি। কবেকার ছবি। খুঁজে বারও করেছে বটে দেবীপদ—

অকস্মাৎ যেন একটা ইলেকট্রিক শক্ খাওয়ার মতো কথাটা আঘাত করল ওকে। মুহূর্তে মনটা সক্রিয় হয়ে উঠল আবার। সোজা হয়ে উঠে বসল চেয়ারে।

সত্যিই তো, এ ছবি দেবীপদ কোথায় পেল? নলিনাক্ষর নিজের কাছেও তো নেই। একটা স্টুডিওতে তোলা। ও আর ওর এক বন্ধু সুরঞ্জন, একসঙ্গে তুলেছিল। সুরঞ্জনই টেনে নিয়ে গিয়েছিল, তার কে এক আত্মীয়র স্টুডিও, তারই শখ নলিনাক্ষর সঙ্গে ছবি তুলে রাখবে।

স্টুডিওতেই ছিল এক কপি, সেটা মনে আছে, অনেক ছবির সঙ্গে একটা শো-কেস মতো ফ্রেমে বাঁধানো, ওদের কৃতিত্বের নমুনা-স্বরূপ। এমন কিছু ছবি না, সুরঞ্জনের আগ্রহে ও অনুরোধেই তাঁরা টাঙিয়ে রেখেছিলেন। ওকেও দিয়েছিল সুরঞ্জন এক কপি, সে কোথায় কবে হারিয়ে গেছে, খেয়ালও নেই।

ছবিটা মনে পড়ছে ঐ জামাটার জন্যে। বড় বড় স্ট্রাইপ দেওয়া শার্ট, মা কিনে

দিয়েছিলেন, তাঁরই পছন্দ করা। তাঁর জীবদ্দশায় ওর জন্য ঐ শেষ জিনিস কেনা তাঁর। জামাটা তারপর বৃন্দাবনে বানরে ছিঁড়ে দেয়, ওর খুব আঘাত লেগেছিল তাতে, মায়ের স্মৃতিটা নষ্ট হয়ে গেল বলে।

সেই নেগেটিভ থেকে সুরঞ্জনকে বাদ দিয়ে কেউ ছবিটা প্রিণ্ট করিয়েছে। নেগেটিভটা তারা এখনও রেখে দিয়েছিল তার মানে। কিংবা ছবিটা থেকেই কেউ নতুন ক'রে নেগেটিভ করিয়েছে—

কিন্তু দেবীপদ এত কাণ্ড করতে যাবে কেন?

পরশুই তো তার সঙ্গে দেখা হ'ল। সে তো কখনও ওর কাছে ছবি চায় নি। এত কাণ্ড করার কি দরকার ছিল। এসব করলই বা কবে?

আর—আবারও বিদ্যুৎচমকের মতোই মনে পড়ে গেল, দেবীপদই তো গত বছরে ওর ছবি তুলেছে একখানা। তার কপিও দিয়েছে, বেশ ভাল ছবি। সেটা না পাঠিয়ে এত ক'রে এ ছবি যোগাড় করার মানে কি?

না, ব্যাপারটা গোলমেলে মনে হচ্ছে।

তবে কি দেবীপদর আশঙ্কাটাই ঠিক? এটাও ওকে ধরে নিয়ে যাওয়ারই একটা ষড়যন্ত্র?

শুধু দেবীপদর নাম করলে যদি ওর সন্দেহ হয়, তাই আর একটু বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তোলা? বেশী আটঘাট বাঁধবার চেষ্টা- এত কাণ্ড ক'রে একটা ফোটো যোগাড় করা!

এই 'বেশী'টাই ভুল হয়ে গেল ওদের। জামাটা যে চিনতে পারবে, অত হিসেব করে নি।

ঘুম ছুটে গেল একেবারেই। খাওয়াদাওয়ার পর হাত পা মেলে বিছানাতেই শুয়ে পড়ল, কিন্তু তখন আর কিছুপূর্বের সে তন্দ্রার জড়তা কি ক্লান্তির লেশমাত্র নেই। একটা বই পড়ার চেষ্টা করল, কিন্তু তার একটা বর্ণও মাথায় ঢুকল না। ওর বিপদটা যে সত্যি—দেবীপদর কল্পনা নয়—এইটে বুঝে উত্তেজনা ও অস্বস্তি, সেই সঙ্গে একটু যেন নিজের সম্বন্ধে একটা বর্ধিত মূল্যবোধ—ইংরেজিতে যাকে বলে 'সেনস্ অফ সেল্ফ ইম্পর্টেন্স'ও বোধ করছে। সে অবস্থায় ঘুমনো কি অন্য কিছুতে মন দেওয়া সম্ভব নয়।

॥ সাত ॥

এমন কি সেই তথাকথিত পুলিস-গাড়ি চলে যাবার পরও ঘুমোতে পারল না আর। কেমন যেন একটু ভয়-ভয়ও করতে লাগল—গা-ছমছম করা যাকে বলে।

ভাল ক'রে দরজা জানালা বন্ধ ক'রে দিলে নিজে হাতে, ছাদের দোর, সদর দরজা ভেতর থেকে তালাবন্ধ করল। নিজের ঘরের দরজাও বন্ধ ক'রে তাতে একটা ভারী চেয়ার ঠেকিয়ে রাখল, যাতে কেউ বাইরে থেকে কোন কৌশলে খিলটা খুলে নিঃশব্দে না ঘরে ঢুকে পড়তে পারে। সকাল হ'লে রাত্রের এই ভয় পাওয়ার কথা মনে পড়ে লজ্জা করবে—তা জানে, কিন্তু এখন এই ভয়ের কাছে আত্মসমর্পণ না করলে যে বিন্দুমাত্র ঘুমের সম্ভাবনা থাকবে না, সেও সত্য। সহজ সত্যকে সোজাসুজি মেনে নেওয়াই ভাল।

গাড়ি ঠিক রাত বারোটায় এসেছিল। একজন পুলিসের উর্দিপরা ড্রাইভার

এসে দরজার বেল টিপে স্যালিউট ক'রে দাঁড়িয়েছিল, তার হাতে সেই ছবি। নলিনাক্ষ যথেষ্ট অমায়িক ভাবেই তাকে এসে ভেতরে বসতে বলেছিল। ইচ্ছে ছিল ভেতরে ঢুকলেই দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে পুলিসে খবর দেবে। সি. বি. আই. অফিসেও খোঁজ করবে দেবীপদ এসেছে কিনা।

কিন্তু ড্রাইভারটি খুব হুঁশিয়ার, বোধ হয় এ সমস্ত পরিস্থিতি অনুমান করেই তাকে সতর্ক ক'রে দেওয়া হয়েছিল। সে আর একটা স্যালিউট ক'রে বলেছিল, 'আজ্ঞে না, গাড়িতে কেউ নেই, গাড়ি ছেড়ে যাবার হুকুম নেই আমাদের। আমি আপনাকে জানিয়ে দিয়ে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করব—এই রকম ইন্সট্রাকশ্যান আছে আমার ওপর।'

তখন ভদ্রভাবেই বলতে হয়েছিল নলিনাক্ষকে, 'আমার শরীর খুব খারাপ, এত রাত্রে যেতে পারব না। সেই কথাটাই জানিয়ে চিঠি লিখে দিতাম। তা তুমি যখন বসতে পারবে না, মুখেই বলে দিও।'

না, লোকটা অতঃপর রিভলভার কি ক্লোরোফর্ম প্যাড্ বার করে নি, অভিনয় সম্পূর্ণ করতে আর একটা স্যালিউট ক'রে চ'লে গিছল শুধু।

আরও সেই জন্যেই ঘুম আসে নি চোখে। কে এরা, তাকে জালে জড়াতে চায়, কী এদের মতলব, কতদূর পর্যন্ত তারা যেতে প্রস্তুত—সত্যিই তাকে খুন করবে কিনা। এই সব এলোমেলো গা-সিরসির-করা চিন্তাতেই রাত কেটে গিছল।

সকালবেলার জন্য আর একটি বিস্ময় অপেক্ষা করছিল।

চা খেয়ে দাড়ি কামিয়ে স্নান করতে যাবে—ইদানীং-অতি-পরিচিত একটি কণ্ঠের ডাক এসে পৌঁছল, 'ভাই নলিনাক্ষবাবু, বাড়ি আছেন নাকি? আমি মধুসূদন সমাদ্দার।'

অগত্যা দোর খুলে অভ্যর্থনা জানাতে হ'ল। তবে খুশি যে হ'ল না কিছুমাত্র, সেটাও মুখভাবে গোপন করার চেষ্টা করল না। শুষ্ক বিরস কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'আপনি হঠাৎ? হাতে ব্যাগ, স্টেশন থেকে সোজাই নাকি?'

ওর মুখভাবের বা কণ্ঠের বিরসতার মতো তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাবেন, মধুবাবু তেমন দুর্বলচিত্ত মানুষ নন। ঘরে ঢুকে ব্যাগটা সাবধানে এক পাশে রেখে একটা চেয়ারে বসে পড়ে 'ফোঃ' ক'রে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন, 'আর বলবেন না। আপনার বৌদি যা কান্নাকাটি করছেন, আর স্থির থাকা যায় না। হ্যাঁ, স্টেশন থেকে সোজাই, অন্য কোন কাজ তো ছিল না। শুধু আপনার সঙ্গে দেখা করতেই —আজই আবার ফিরব— হেঁ হেঁ, ও ব্যাগে একটা গামছা ও লুঙ্গি, একখানা বিছানার চাদর আর একটা ফুলনো বালিশ—হেঁ হেঁ, একটু চা বলুন বরং, সোজাই আসছি তো—আজকাল এত ভোরে পৌঁছয়—পথেও কোথাও দাঁড়ায় না গাড়িখানা, চা-ফা আর জোটে নি—'

'তা বৌদিই বা পাঠালেন কেন? আপনি এসে আর কি করবেন? এত দিনে যা কেউ পারল না, আপনি এসে তাই ক'রে দেবেন?'

বিরক্তিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে আরও।

'না না। পাগল, তাই কখনও পারি। হেঁ হেঁ, এ তো আর ম্যাজিক নয় যে টুপির মধ্যে থেকে মেয়েটাকে বার ক'রে দেবো! না না, বৌদিও পাঠান নি ঠিক। ইন্ ফ্যাক্ট্ আমিই এসেছি। আসলে আমি বড় টেন্ডার-হার্টেড—বুঝলেন না,

মেয়েদের কান্না-ফান্না—।'

একটু অপ্রতিভভাবে হাসলেন মধুবাবু। কিন্তু তখন নলিনাক্ষর হাসিও ভাল লাগছে না। বিশেষ তার তখন মনে হচ্ছে সবটাই কৃত্রিম। সে আবারও তেমনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আসল প্রশ্নে ফিরে এল, 'তা আপনি কি করতে চান এখন? আপনার কোন প্ল্যান আছে?'

'কিছু না। কিছু না। আমার এমন কি বিদ্যাবুদ্ধি বলুন যে আপনারা এত মাথা মাথা-লোক যা পারছেন না, আমি অমনি একটা চটপট প্ল্যান বাৎলে তাই করব, আপনাদের ওপর টেক্কা দেব!...আমি জাস্ট—যদি কিছু না মনে করেন, একটা টিপ্‌স্ দিতে চাই। বেনেপুকুর এরিয়া জানেন তো? কখনও গেছেন? ঐ যে গ্যাস-ক্রিমেটোরিয়ামটা আছে—পার্ক সার্কাসেরই দিকটা আর কী—যান নি কখনও? ধ্যুস মশাই, গেছেন নিশ্চয়, খবরের কাগজে কাজ করেন, সাহিত্যিক লোক—কত ঘোরেন।...ঐখানে কিছু ট্যাশ ফিরিঙ্গি আর মুসলিম ব্রাদারদের বাস। আছে বৈকি, ভাল লোকও বিস্তর আছে, যত ভাল মিস্ত্রী সবই তো ঐখানে। খুব বিশ্বাসী আর বিশ্বস্ত—তা নয়, ঐখানেই কোথাও মশাই এই ছেলে চালানের কারবার হয়, আমি জানি। পারেন একটু তলে তলে খবর নিতে? মানে খবর যে নিচ্ছেন তা যেন না কেউ জানতে পারে। গোখরো সাপ নিয়ে খেলা, মনে রাখবেন—'

অসহিষ্ণুভাবে তাঁর বক্তৃতায় বাধা দিয়ে নলিনাক্ষ বলল, 'এ খবরটা আপনি জানেন, অথচ পুলিস জানে না? আশ্চর্য তো!'

কণ্ঠের ব্যঙ্গটা প্রচ্ছন্ন থাকে না বলাই বাহুল্য।

'ঐ তো ব্রাদার! অবিশ্বাস করছেন, ভাবছেন আমি গুল ঝাড়ছি। আরে মশাই, মহাভারত পড়েছেন? ইট্‌স্ এ গ্রেট বুক। পৃথিবীর আর কোন ভাষায় লেখা হয় নি এমন বই—হোলি স্যাংসক্রীটে যা হয়েছে—পড়েছেন তো? চক্রব্যূহ করে কৌরবরা রেডী—এসো লড়ে যাও কে আসবে, বেগতিক দেখে অর্জুন ভায়া সরে পড়েছেন একদিকে—তা হোক, বলি এদিকেও তো মহা মহা রথীরা ছিল, কৈ, কেউ পারল? শেষে কার শরণাপন্ন হ'তে হ'ল—না অভিমন্যুর, এ মিয়ার ল্যাড অফ সিকসটিন! দো ম্যারেড—হিজ নাথিং বাট এ বয়। তাই না? করেক্‌ট্ মি ইফ আই য়্যাম রং! বলুন ঠিক কিনা?'

'তা বেশ তো, পুলিসকেই এ সাজেসশ্যানটা দিয়ে আসি।'

'ক্ষেপেছেন! পুলিসের চোদ্দগুষ্টিকে চেনে ওরা। সাদা পোশাকেই যাক আর খাকিতেই যাক,—পুলিস ও পাড়ার ত্রিসীমানার মধ্যে গেলেই ভোজবাজির খেলা হয়ে যাবে—উধাও। স্রেফ ইভাপোরেট করবে। বুঝলেন না?...না না, এ হ'ল লখীন্দরের আয়রন রুম, সরু সুতোর মতো সেঁধুতে হবে, বড় বড় কেউটে গোখরোর কাজ নয়। বলি পড়ছেন তো বেউলোর ফেব্‌ল্‌স্?...মনে আছে পরীক্ষিতের কথা—এগেন আই রেফার টু দ্য গ্রেট বুক—চারদিকে কড়া পাহারা, ফলের মধ্যে ঢুকে বসেছিল তক্ষক, কে ধরবে?...না মশাই, শিশুর মতো ইনোসেন্ট অথচ ইনকুইজিটিভ—এইভাবে য়্যাপ্রোচ করতে হবে। পুলিস-ফুলিসের কম্ম নয়, পারলে আপনি পারেন। কাউকে বলবেন না। জানাবেন না। মনসা চিন্তিতং কর্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ—চন্দ্রগুপ্ত নাটক দেখেছেন? গ্রেট ম্যান চাণক্য—তারই কথা। মন-মন কাজে খোঁজ করতে শুরু করুন। তবে ঐ যা বললুম, খুব সাবধান। ডেঞ্জারাস গ্যাঙ। সাপের চেয়ে সাংঘাতিক। শুনেছি ওর মধ্যে ইংরেজ আছে, ইহুদী আছে, মোসলমান, মারোয়াড়ী,

বেহারী, জাপানী সব আছে। মনে রাখবেন--ইউ হ্যাড্ বীন ওয়ার্ণড্, ডোণ্ট সে দ্যাট আই ডিড নট এক্স্প্লেন্ড্ টু ইউ দ্য পসিবিলিটি অব ডেঞ্জারস্।'

এবার নলিনাক্ষ একটু নরম হ'ল। লোকটা যা-ই বলুক, একটু যে জানে তাতে সন্দেহ নেই। সে বলল, 'বেশ তো, চলুন না, দুজনেই যাই?'

'আমি?' যেন আঁৎকে উঠলেন মধুবাবু, 'না মশাই, আমি ছাপোষা লোক, জেনেশুনে ও বাঘের গর্তে পা বাড়াতে রাজী নই। বাপ রে! না না, ও কাজে আমি নেই। ইয়েস, আই য়্যাম এ কাওয়ার্ড, স্বীকার করছি। না না, আমার গন্ধও না পায়। দোহাই আপনার—প্লীজ! উপকার করতে এসেছিলুম বলে আমার আবার নামটি ক'রে বসবেন না। কারও কাছেই না—খুব আপনার লোকের কাছেও না। বাতাসে কান পেতে থাকে ওরা। টের পেলেই গলাটি কচ্। কাটথ্রোট! কাটথ্রোট! ওরা কি মানুষ? ওরা সব পারে।...'

তার পর একটু থেমে, অকারণেই রুমালে মুখ মুছে নিয়ে আবারও একটা 'ফোঃ' শব্দ ক'রে বললেন, 'শোনেন নি, এই কালকের কাগজেই বেরিয়েছিল, প্রতাপগড়ের কাছে এক জায়গায় একটা লোক হায়নার চামড়া প'রে—? দেখেন নি? বাচ্ছাদের রক্ত বার ক'রে নিয়ে বিক্রি করত! তারপর কামড়ে খিমচে এমন ক'রে রেখে যেত—সবাই ভাবত হায়নাই মেরে রক্ত খেয়ে গেছে। দাঁতের দাগ পর্যন্ত ক'রে রাখত।... এইখেনে যতীন দাস রোড আমার জানাশুনো এক পেয়ার—বোথ দ্য হাসব্যান্ড য়্যান্ড ওয়াইফ, দুজনেই আপিস যেত- এই এক মেয়েদের আপিস করা হয়েছে মশাই, হোম লাইফ ফ্যামিলি লাইফটাই নষ্ট হয়ে গেল—হ্যাঁ, যা বলছিলুম, বাচ্ছাটা থাকে ঝিয়ের কাছে, দিন দিন রোগা হ'য়ে যায়। এরা বোঝে না, কেবল ভাল ভাল টনিক খাওয়ায় খাবার খাওয়ায়—কিছুতেই কিছু হয় না। শেষে পাড়ার এক তেতলা বাড়ির ছাদ থেকে এক বুড়ী লক্ষ্য ক'রে যে এরা বেরিয়ে গেলে দু-একদিন অন্তর এসে রক্ত বার করে নিয়ে যায়, বিক্রি করে। সামান্য কটা টাকার জন্যে—কী পিশাচ এরা ভাবুন তো! কাইন্ড-হার্টেড—চোর-ডাকাতেরা এদের কাছে মহাপুরুষ! আমেরিকায় শুনেছি আগে এক রক্তচোষা বাদুড় ছিল, তা তাদের খাদ্যই ঐ, এরা মশাই টাকার লোভে—বুঝলেন না। এরা আরও খারাপ, আরও খারাপ।'

'তা জেনেশুনে আমাকে একা যেতে বলছেন?'

'সে আপনার রিস্ক। সেইজন্যেই তো সাবধান ক'রে দিচ্ছি। হ্যাঁ, বাঘের গর্তেই পা দেওয়া, বাঘের চোয়ালের মধ্যেও বলতে পারেন। আমি কিন্তু একা পুলিস ছাড়া যেতে বলছি না। মাইন্ড্ ইউ—তবে এও বলছি, পুলিস নিয়ে গেলে কিচ্ছু হবে না, পাত্তাই পাবেন না কারও। আচ্ছা, চলি ভাই।'

শেষ মার যাকে বলে তাই দিয়ে—এই 'শেভিয়ান' হেঁয়ালিটি ক'রে বিদায় নিলেন মধুবাবু। এতক্ষণ এত বকছিলেন বসে বসে—কিন্তু এখন উঠেই চট ক'রে ব্যাগটি হাতে নিয়ে অতি দ্রুত বাস-রাস্তার দিকে চ'লে গেলেন, একবার ওর দিকে আর তাকালেনও না।

দরজা বন্ধ ক'রে ফিরতে ফিরতে মনে পড়ল, এসেই চা চেয়েছিলেন ভদ্রলোক, সেটাই খাওয়ানো হ'ল না।

স্নান করতেই যাচ্ছিল বটে, মধুবাবু যখন ডাকলেন, কিন্তু এখন আর সে কথা মনে রইল না। রঘুকে ডেকে এক কাপ চা দিতে বলে স্থির হয়েই বসে রইল কিছুক্ষণ।

ও লোকটা রীতিমতোই ভাবিয়ে দিয়ে গেছে তাকে।

সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষীও হ'তে পারে। এক-একজনের স্বভাব থাকে গায়ে পড়ে মানুষের উপকার করা। উপকার ক'রেই নিজের যে কিছু দাম আছে এ সংসারে, সেইটে নিজে অনুভব করে, খুশি হয়। আবার এক শ্রেণীর 'সবজান্তা দাদা' থাকেন, তাদেরও সে জ্ঞানটা লোককে জানানো দরকার. আর গায়ে প'ড়ে না জানালে তাদের উপায় কি?

এও কি তাই, এই মধুসূদন সমাদ্দারের ব্যাপারটা?

কিন্তু সেই জন্যে পয়সা খরচ করে পুরী থেকে ছুটে আসবে? উঁহু, তা সম্ভব নয়। কোন বিশেষ মতলব ছাড়া মানুষ গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে পরোপকার করে না।

সে মতলবটা কি তাহ'লে?

ওকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া? সেদিন উনি জোর ক'রে যে বাসের টিকিট কাটা'লন, সেই বাসটাই দুর্ঘটনায় পড়ল। কে বা কারা পাকা বাঁধানো রাস্তায় নালা কেটে রেখেছিল। ঐ বাসটাই আসবে ব'ল এই কাজ করেছিল কিনা কে জানে! সাধারণ লুটেরারা, গাড়ি বা লরী এই গাড্ডা দেখে থামলে লুটপাট করার জন্যেও করত পারে. কিন্তু কৈ, আর তো কোন গাড়ির কোন ক্ষতি হয়েছে বলে খবর বেরোয় নি কোন কাগজে!

আবার, এই যে খবর দিতে এসেছে--হ্যাঁ, ও পাড়ায় ক্রিমিনালদের আড্ডা থাকা সম্ভব, তেমনি ওখা'ন সন্ধ্যার পর একা গিয়ে পড়লে, যদি তেমন কারও মতলব থাকে--সাবাড় করাও সোজা। একটা বিশেষ পাড়ার সন্ধান দিলে--চার ছড়িয়ে টোপ ফেলার মতো--ধরার সুবিধেও হয়। হয়ত সেই জন্যেই, ঐ ফাঁদে ফেলার জন্যেই, এমন গায়ে-পড়ে খবর দিতে আসার গরজ। লোকটা হয়ত ওর সেই অদৃশ্য (এবং অকারণ, ও কার কি করেছে?) শত্রুদ'লের চর।

অনেক ভাবল, অনেক তোলাপাড়া, হিসেব করল মনে মনে। যতই ভাবে ততই এই শে'ষর দিকের পাল্লাটাই ভারী বোধ হয়। গোড়া থেকেই লোকটাকে ভাল লাগে নি। অথচ এড়াবারও পথ পায় নি খুঁজে। খুব অভদ্রতা কি রূঢ় ব্যবহার করবে এমন অজুহাতও খুঁজে পায় নি ওর আচরণে। কিন্তু এবার যে রীতিমতোই সন্দেহজনক হয়ে উঠ'ছ ব্যাপারটা—তাতেও কোন সন্দেহ নেই। উনি এত কথা জানলেন কি ক'রে, সেই'টই জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল! খুব ভুল হয়ে গেছে।

অপ্রসন্নতা ও অস্বস্তি বেড়েই যায়। ঘরের মধ্যে কোথাও বিষাক্ত সাপ আছে একটা, অথচ তাকে দেখা কি মারা যাচ্ছে না—এই অবস্থায় সেই ঘরে বাস করতে গেলে যেমন একটা সভয় অস্বস্তি থাকে—সেই রকম। অথচ কি করবে তাও ভেবে পায় না।

যথাসময়েই আপিসে গেল বটে, কিন্তু কে জানে কেন, এতটা হেঁটে গিয়ে বাস ধরতে যেন সাহস হ'ল না। রঘুকে দিয়ে ট্যাক্সি ডাকিয়েই গেল। আপিসে পেঁছে ধন্যবাদ দিতেই সময় কাটল। সহকর্মীরা অনেক করেছেন—চিঠিগুলো বেরিয়েছে সব, সম্পাদকীয়ও লেখা হয়েছে। ফলে একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার দেখা করতে এলেন ওর সঙ্গে, আপিসেই। তাঁরা যে কী পরিমাণ সক্রিয় হয়েছেন—তারই একটি বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে জানালেন, 'কলকাতার বাইরে চালান করার কোন পথ রাখা

হয় নি আর, অবিশ্যি যদি সেদিন সেই বিকেলের মধ্যেই চলে গিয়ে থাকে তো আলাদা কথা—এখন প্রত্যেকটি স্টেশন—শুধু এখানকারই নয়, ওদিকে আসানসোল এদিকে খড়্গপুর পর্যন্ত—এরোড্রোম, সব ওআচ করা হচ্ছে, প্রত্যেক ট্রেনে লোক যাচ্ছে। আপনি তো আবার সি. বি. আই-কেও অ্যালার্ট করেছেন—'

বাধা দিয়ে সাগ্রহে প্রশ্ন করল নলিনাক্ষ, 'কী রকম? সেটা কে বললে?'

'আমরা স্যার সব খবর পাই। আপনার বন্ধু দেবীবাবু কোথা থেকে একটা নোট পাঠিয়েছেন এখানের আপিসে, টপ প্রায়োরিটি দিতে ব্যাপারটাকে। আরও বলেছেন, আপনার বাড়িতেও একটু নজর রাখতে—কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা অর্থাৎ আপনার ওপর কোন হামলা না হয়—'

নলিনাক্ষ তখন আগের রাত্রের ঘটনাটা বিবৃত ক'রে বলল, 'এটা আপনারা জানেন?'

ভদ্রলোক মুখে একটা 'ফিউ' ধরনের আওয়াজ ক'রে বললেন (বোধহয় বিলেত থেকে শিখে এসেছেন এ মুদ্রাদোষটা), 'আমার রিপোর্ট হচ্ছে, গাড়ি একখানা এসেছিল বটে, তা থেকে পুলিসের উর্দিপরা একজন লোকও নেমেছিল, তবে এক মিনিট কথা বলেই চলে গেছে। আমরা ভেবেছি সি. বি. আই. থেকে কেউ এসেছিল।...বাই জোভ! আপনি তো ভাবিয়ে দিলেন দেখছি! হাউএভার, এটা বলে ভাল করেছেন। আমি চেক করছি ব্যাপারটা।'

তিনি যথারীতি নমস্কারাদি ক'রে বিদায় নিলেন।

সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরবে বলে তৈরি হচ্ছে, লালবাজার থেকে আবার একটি ফোন।

'হ্যালো, নলিনাক্ষবাবু! আমি লালবাজার থেকে বলছি। মধুসূদন সমাদ্দার বলে কাউকে চিনতেন?'

'কেন বলুন তো? চিনতুম মানে—অল্প দু-চারদিনের আলাপ। আমরা পুরী গিছলুম, পিছনের বাড়িতেই উনি ছিলেন। সেই সূত্রেই আজ সকালেও একবার দেখা করতে এসেছিলেন। কোন বিশেষ পরিচয় ছিল না। কেন, কী ব্যাপার জানতে পারি না?'

'পারেন বৈকি। সল্ট লেকের যে জমিগুলো রিক্লেমড্ হয়েছে, তারই একটা মাঠের মধ্যে তাঁর ডেড বডি পাওয়া গেছে, একটু আগে। পকেটে একটা সাধারণ ধরনের নোটবই ছিল। তারই মধ্যে একটা কাগজের টুকরোতে আপনার নাম-ঠিকানা লেখা—'

'হ্যাঁ, আমিই লিখে দিয়েছিলুম পুরী থেকে আসার আগে। উনিই চেয়েছিলেন। তা ডেড বডি—মানে অ্যাকসিডেন্ট?'

'না, সেখানে অ্যাকসিডেন্ট হওয়ার কোন কারণ নেই। এক যদি হবার পর কেউ এনে ফেলে দিয়ে না থাকে। মার্ডার বলেই সন্দেহ হচ্ছে।'

॥ আট ॥

অতঃপর আর মধুবাবুর আন্তরিকতা—'বোনাফাইডি'তে সন্দেহ করার কোন কারণ থাকে না। যে বাঘের গর্তের কথা অত ক'রে ব'লে সাবধান ক'রে দিয়ে গেলেন ভদ্রলোক ওকে—তাঁরই ভাষায়—টিপ্‌স্ দিতে এসে—সেই গর্তে নিজেই যে পা দিচ্ছেন তা জানতেন না।

ওকে বাঁচাতে গিয়েই নিজের জীবনটি দিলেন হয়ত।

আসলে উনি কিন্তু সেই মেয়েটার কথাই ভেবে এসেছিলেন। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরোবে তা জেনেও।

সেই কারণেই, তাঁর ইঙ্গিত দেওয়া পাড়ায় যেতে একটু ভয় করে। অমন ঘাগী লোকই ঘায়েল হ'য়ে গেল, তার মতো আনাড়ীকে তো ছারপোকা মারার মতো মেরে ফেলবে। সব চেয়ে বড় কথা—শত্রু কে, কেন শত্রু, সেটা জানা থাকলেও সাবধান হওয়া যায়, সেইটেই যে বুঝতে পারছে না।

এধারে একটির পর একটি দিন কেটে যাচ্ছে, না ফিরছে দোলা, না পাওয়া যাচ্ছে তার কোন খবর। রথীনবাবুর স্ত্রী নাকি পাগলের মতো হয়ে গেছেন একেবারে।

অনেক ভেবে আবার একদিন চৌরঙ্গী তালতলার মোড় নেমে পড়ল বাস থেকে। আজকাল কোন কোন দিন ট্যাক্সি করে আসে, এলেও খানিকটা এসে নেমে পড়ে, আবার বাস ধরে। কোনদিন বা সবটাই বাসে আসে। আজও তাই এসেছে।

বাস থেকে নেমে নিজের অজ্ঞাতেই একবার যেন উৎসুক ভাবে চায়, বুঝি সেই খোঁড়া ছেলেটাকে খোঁজে—বেঁচে নেই জেনেও। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রাস্তায় নেমে আসে, চারিদিকে চেয়ে দেখে। পুরনো, মানে আগে দেখা ভিখিরীদের মধ্যে সেই গন্নাখ্যাঁদা লোকটা আছে আজ। নাকের কাছে বিরাট একটা গর্ত, ওপরের ঠোঁটও কাটা, বড় বড় কটা দাঁত বেরিয়ে আছে সামনে—বীভৎস দৃশ্য। একটা হাতও কাটা লোকটার, কনুই থেকে। বাকী হাতটায় লোহার বালা এক গাছা, মাথাতে সামান্য একটু চুল চুড়ো-বাঁধা, গালে অল্প অল্প দাড়ি। দেখলে মনে হয় শিখ সাজারই চেষ্টা আছে একটা।

সেও অমনি আধা-চলতি বা দাঁড়ানো গাড়ির ফাঁকে ফাঁকে ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্ছে।

নলিনাক্ষকে একটু নিরাপদ জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে হ'ল। তার ফল হ'ল এই যে লোকটা এদিকে আর চায়ই না, তার সব নজরটাই গাড়ি আর গাড়ির আরোহী-দের দিকে। যাই হোক, নলিনাক্ষও পকেট থেকে একটা দশ পয়সা বার ক'রে প্রস্তুত ছিল, একবার এদিকে চাইতেই সেটা দেখিয়ে ইশারা করল।

ছুটেই এল লোকটা। পয়সাটা হাত থেকে নিয়ে আবার ওদিকে ফিরছে, নলিনাক্ষ বলল, 'দাঁড়াও, আরও পয়সা দেব।'

একটু অবাক হয়েই এদিকে তাকাল লোকটা, এবার দৃষ্টিতে একটু সন্দেহের ছায়াও। অন্তত নলিনাক্ষর তাই মনে হ'ল। সে এবার একটা টাকা বার ক'রে দেখাল। বলল, 'এইটে দেব। তুমি আমার কটা কথার জবাব দেবে?'

সে একটু যেন বিরক্ত হয়েই বললে, 'আমাদের বাবু ছুটোছুটি ক'রে ভিক্ষে করতে হবে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনার সঙ্গে বেশীক্ষণ তো কথা কইতে পারব না। কী বলবেন, চটপট বলুন।'

'এইখানে একটা কালো মতো খোঁড়া ছেলে ভিক্ষে করত, কেলো নাম—সে কোথায় গেল বলতে পারো?'

লোকটার বীভৎস মুখ ভয়ংকরতর হয়ে উঠল। বলল, 'জানি না।' বলে চলেই যেত, কিন্তু একটা টাকার মায়াও কম নয়। তাই যেতে গিয়েও ইতস্তত করতে লাগল।

সময় নেই বেশী তা নলিনাক্ষ বুঝল। সেও সোজা আসল প্রশ্নে চলে এল: 'তোমার এমন হাল হ'ল কেন? কেউ করেছে, না য়্যাকসিডেন্ট!

'ছোটবেলায় ঘা হয়েছিল। ডাক্তার কেটে দিয়েছে।'

'সে না হয় নাকে হ'তে পারে। হাতটা?'

'গাড়িতে কাটা গিছল।'

তারপরই হিসহিসিয়ে উঠল লোকটা, 'সরে পড়ো দিকি। এখান থেকে চলে যাও। আর এমন ধারা শয়তানী করতে এসো না। নিজেও মরবে—আমাদেরও মারবে।'

সে আর পুরো ঐ একটা টাকার মায়াও করল না, প্রায় ছুটতে ছুটতে গিয়েই ভিড়ে মিশে গেল।

অর্থাৎ সেই একটা আকারহীন পরিচয়হীন বিপদের ইঙ্গিত।

ভয় নয়—আজ যেন বিরক্তিই বোধ করতে লাগল নলিনাক্ষ। এমন করে ছায়ার সঙ্গে লড়াই করার থেকে বিপদকে চ্যালেঞ্জ করাই ভাল। তা-ই করবে সে।

আপিসে আসতে দেরি হয়ে গিছল এমনিতেই, তবু তখনই নিজের ঘরে যেতে ইচ্ছে করল না। জানে কিছুই কাজ নেই। থাকলেও সে এক ঘণ্টার ব্যাপার। ঘুরতে ঘুরতে নিউজ-রুম বা নিউজ-হলেই গিয়ে পড়ল।

সেখানে যে মুখরোচক বা উত্তেজক কোন প্রসঙ্গের আলোচনা চলছে—তা বাইরে থেকেই টের পেয়েছিল, এখন ও ঢুকতেই সকলে মিলে সেদিনের মতো 'এই যে!' বলে একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

নলিনাক্ষ জোর ক'রেই হালকা হতে চেষ্টা করে। বলে, 'দেখি ধীরেনদা, একটা আপনার ঐ গাঁজা-মার্কা সিগারেট! কিন্তু ব্যাপারটা কি?'

গৌরীবাবু বললেন, 'আরে বাবা, আমরা জানতুম স্মাগলারদের রাঘব বোয়ালরা সব শহর বোম্বাইমে রহতা হ্যায়। এখানে থাকলেও চুনোপুঁটি, বড় জোর খলসে। তুমি বাবা তোমার পাড়াতে এই চীজ জাইয়ে রেখেছিলে এতদিন ছিপায়কে ছিপায়কে—তাও রাঘব বোয়ালও নয়, একেবারে তিমি মাছ...হোয়েল।'

'কী রকম? সে আবার কি? তাও বলি, তিমি মাছ জাইয়ে রাখা যায় না—কৈ-মাগুরই থাকে।'

'না বাবা। তিমি না হ'লেও হাঙ্গর কুমীর তো বটেই।'

'কিন্তু মানুষটা কে—তাই যে শুনলুম না ছাই!'

'বলি পরেশ—পরেশ চাকলাদার, তোমার পাড়ায় থাকে তো—না কি?'

'তা থাকে। কিন্তু সে আবার কি করল?' এবার আর তামাশার সুর বজায়

রাখতে পারে না নলিনাক্ষ। হুমড়ি খেয়ে ঝুঁকে পড়ে টেলিপ্রিন্টারের কাগজটার ওপর।

দেখল কথাটা ঠিকই। পরেশ চাকলাদার ধরা পড়েছে। ওই পরেশ চাকলাদারই যে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঠিকানাও মিলে যাচ্ছে, তাছাড়া অ্যারেস্ট করা হয়েছে পুরী, চক্রতীর্থের কাছ থেকে। সেখানেই তার শোবার ঘরে তিন লাখ টাকার মতো সোনা পাওয়া গেছে, সোনার বিস্কুট, বিদেশী ছাপ মারা। তা ছাড়াও পাওয়া গেছে গাড়ির লাইনিংয়ের মধ্যে নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য। চাকলাদারকে আপাতত ভুবনেশ্বরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেখান থেকে সম্ভবত কলকাতায় আনা হবে।

লোকটাকে দেখতে পারত না, এ ঐশ্বর্য সোজা-রাস্তায় আসে না তাও জানে—তবু নলিনাক্ষ যেন একটা প্রচণ্ড হতাশা বোধ করে।

আসলে, যে সন্দেহটাকে এতদিন মনে মনে লালন করছিল, যেটাকে কেন্দ্র ক'রে ওর তাবৎ জল্পনা-কল্পনা, সেইটেরই মূলোচ্ছেদ হয়ে গেল। আবার নতুন ক'রে সমস্ত প্রশ্নটা ভাবতে হবে।

দুটি লোককে সন্দেহ করছিল—দুটিই গেল। এখন কে?

শত্রু জানা থাকলে, দৃশ্য হলে তবু বোঝা যায়, অলক্ষ্য থাকলেই ভয় বেশী।

দেবীপদটাও যদি এখানে থাকত। হয়ত সে-ই ধরাল পরেশবাবুকে। কিন্তু এখন ও কি করছে সেখানে? আরও কেউ বাকী আছে? যাবে নাকি আর একবার পুরীতেই? সেখানে অন্ধকারে বিপদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালে যদি সে ছুটে আসে। এখানেই বা কে থাকে, সেও তো একটা সমস্যা। রঘুর ওপর ভরসা ক'রে যাওয়া চলে না। তাছাড়া দাদাকে জরুরী খবর দিয়ে না হয় আনানো চলত—দাদা এলে তাঁকে রেখে সেইদিনই রওনা দেওয়া চলত—কিন্তু এ তো শুক্লপক্ষ চলছে। অত আলোয় দেবীপদ বেরোবে না।

কী করবে কিছুই যেন ভেবে পায় না।

শূন্য ক্লান্ত মনেই বাড়ি ফিরল সে। সত্যিই কেমন একটা বিমূঢ় অবস্থা তার। কিছু ভাবতেও পারছে না গুছিয়ে। পরামর্শ করবে এমনও তো কেউ নেই। সকলকে সব কথা বলা যায় না।

শুধু এইটে বুঝতে পারছে—কোন জ্ঞাত তথ্য থেকে নয়, যাকে ষষ্ঠানুভূতি বলে তাইতেই—যে, সময় আর মোটে নেই। যেন চারিদিক থেকে একটা জাল গুটিয়ে আনছে কে।

অদৃশ্য অথচ অনুভূতিগোচর চক্রান্ত ও অনিষ্টের জাল। হয়ত বা মৃত্যুরই ফাঁদ সেটা।

রাত্রে দাদা ফোন করলেন, তাঁর ছেলে অর্থাৎ নলিনাক্ষর আপন ভাইপোকে সেইদিনই সন্ধ্যায় মন্দির থেকে কে একজন সরিয়ে নিয়েছিল।

ওঁরা বিমলার মন্দিরে ঢুকেছেন, সে যে যায় নি ভেতরে অত কেউ লক্ষ্য করে নি—বেরিয়ে এসে দেখল—নেই। চেঁচামেচি কান্নাকাটি পড়ে গিছল, একটা আধ-পাগলা ভিখিরি আনন্দবাজারে ঢোকার মুখে বসে ছিল, আপন মনে বিড়বিড় ক'রে বকছিল—সেই-ই হঠাৎ উঠে একটা অশ্রাব্য গালাগাল দিতে দিতে এসে ওর দাদার হাতটা ধরে ইঙ্গিত করে—অতিরিক্ত অসংখ্য যে সব ছোট ছোট মন্দির আছে বড় মন্দিরের প্রাঙ্গণে পাঁচিলের ধারে—তারই একটার দিকে।

ছোট, মনে হয় বহুদিনের পরিত্যক্ত মন্দির। পান্ডার হুড়িদার যেতে চাইছিল না, ওর দাদা ছুটে গিয়ে দেখলেন একটা রোগামতো লোক ছেলেটাকে নিয়ে ঐ মন্দির আর পাঁচিলের মধ্যে গুটিসুটি হয়ে ঘাপ্‌টি মেরে রয়েছে। এর মধ্যেই ছেলেটাকে অজ্ঞান ক'রে দিয়েছে। অতঃপর মারধোর, পুলিসে দেওয়া, যা করবার সবই করা হয়েছে কিন্তু ওর বৌদি খুব ভয় পেয়ে গেছেন, তিনি আর একা থাকতে চাইছেন না দাদা'ক ছেড়ে। তাঁর যে ভাইয়ের যাওয়ার কথা ছিল, তার আর যাওয়া অবশ্যই সম্ভব নয়। অথচ গুহবাবু না এলে সকলে বাড়ি ছেড়ে আসাও উচিত মনে হচ্ছে না, 'ইট ইজ হেলড্ ইন ট্রাস্ট' দাদা বললেন।

অগত্যা দাদা আপিস টেলিগ্রাম করছেন, ডাঃ দত্তকে দিয়ে একটা সার্টিফিকেট দিয়েও পাঠাচ্ছেন, 'সিক রিপোর্ট' যাকে বলে—অতিরিক্ত ছুটির জন্যে। নলিনাক্ষ ওঁদের জন্যে বেশী না ভা'ব, যেন সাবধানে থাকে, যদি আপিস থেকে কোন দারোয়ানকে কিছু দিয়ে রাত্রে বাড়িতে রাখতে পার তো আরও ভাল। ইত্যাদি—

বক্তব্য শেষ ক'রেও আর একটি কথা বলেন দাদা। সেই পাগলটাকে বকশিশ স্বরূপ দশটা টাকা দিতে গিয়েছিলেন, সে নেয় নি, গালাগাল দিয়েছে, ওঁর দি'ক চেয়ে থুথু ফে'লছে—কিন্তু তার মধ্যেই এক ফাঁকে বলেছে, 'ছেলেমেয়েদের নিয়ে এমন ভাবে বেরোও কেন, লজ্জা করে না! ঘরে রেখো, রাত্রে বেরিও না আর।'

সময় ছ মিনিটও পার হয়েছে, আর কিছু না বলে দাদা রিসিভার রেখে দিয়েছেন। নলিনাক্ষর কোন প্রশ্ন করা কি আর কিছু জানার সময় হ'ল না আর।

তার দাদা যতই অবাক হোন, সে হয় নি। সে বুঝছে। আশ্বস্তও হ'ল একটু।

এ দেবীপদরই কাজ। ওদের পাহারা দেবার ব্যবস্থা করেছে।

দেবীপদর কাছে জীবনের ঋণ বেড়েই যাচ্ছে দিনের পর দিন।

॥ নয় ॥

পরের দিন সত্যি সত্যিই আপিস থেকে বেরিয়ে ইলিয়ট রোডের ট্রাম ধরল সে। মধুবাবু গে'ছেন কিন্তু তাঁর উপদেশটা আছে ; মধুবাবু মরে প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন যে তিনি ওর দলের লোক। অর্থাৎ ওর কল্যাণাকাঙ্ক্ষীই ছিলেন। তাই, কোন-দিকেই যখন কিছু করা যাচ্ছে না—তাঁর কথাটা শুনতে দোষ কি ? অবশ্য হুঁশিয়ার ক'রেও দিয়ে গেছেন যথেষ্ট, বাঘের গর্ত বলে গেছেন—সে যতটা সম্ভব সাবধানেই এগোবে—তবে এ রকম অনিশ্চিত অনির্দেশ্য বিপদের ভয়ে দিন কাটানোর চেয়ে বিপদের দিকে এগিয়ে যাওয়া অনেক ভাল।

ট্রাম থেকে নেমে আস্তে আস্তে হাঁটছে—ঠিক কোন্ দিক দিয়ে কি ভাবে যাবে ; কী খুঁজতে এসেছে, কাকে কি জিজ্ঞাসা করবে তাও তো জানে না—বেনেপুকুরের মোড়ের মাথায় হঠাৎ বরকত আলীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

নলিনাক্ষর মনে হ'ল, এ ঈশ্বরেরই যোগাযোগ, মনে হ'ল ঠিক এই রকম একটি লোককেই খুঁজছিল সে।

বরকত আলী লোকটিকে দেখলে আগেই যে জীবটির কথা মনে আসে, সে

হ'ল শকুনি। রোগা, লম্বা, কালো, শকুনির ঠোঁটের মতোই ধারালো বাঁকা নাক, দুটি ছোট ছোট তীক্ষ্ন চোখ। মুখের ভাব নির্বিকার, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে ঠোঁটের যে ভঙ্গী প্রকাশ পায় তাতেই বোঝা যায় যে লোকটি নির্মমভাবেই নির্বিকার। মায়া-মমতা-দয়া প্রভৃতি দুর্বলতা বা চিত্তদোষ কখনই ওর স্বার্থসিদ্ধিপথে অন্তরায় হ'তে পারবে না কোন দিন।

বরকত আলীর প্রাথমিক পরিচয় অবশ্য রাজমিস্ত্রী হিসেবেই। মেদিনীপুর জেলায় বাড়ি, ভাল রাজমিস্ত্রী। বুদ্ধিমান বলেই সেই সংকীর্ণ কর্ম-গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে নি। বুদ্ধিমান—এবং অত্যন্ত ফিকিরবাজ, যোগাড়েও খুব। এখন ঠিকেদারী ক'রে, অনেক বড় বড় কনট্রাক্টারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদের কাছ থেকে ভাল কাজ কেড়ে নেয়। তার কারণ যারা ওকে একবার কাজ দেয় তারা আর অন্য লোককে দিতে চায় না। কোন জিনিসের জন্যে তাদের আর ভাবতে হয় না, কোন কারণে, কোন অবস্থাতেই বাড়ির মালিককে বিরক্ত করে না। আপনি রাতারাতি একটা গোটা ঘর বদলে অন্য রকম অন্য ছাঁদে করবেন? তাই হ'ব, বরকত আলী তো আছেই। শুধু টাকাটা ঠিকমতো দিয়ে গেলেই আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

এইটেই হচ্ছে বরকত আলীর চরিত্রের প্রধান দোষ বা গুণ। টাকার জন্যে না পারে এমন কাজ নেই, টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। কেউ যথেষ্ট টাকা দিলে নিজের হাতে পায়খানা সাফ করবে ও, অম্লান বদনে। টাকা না দিয়ে একটু সামান্য কাজও করানো যাবে না। তবে একবার হাত পেতে টাকা নিলে সে কাজ—ততটুকু টাকার মতো কাজ—ক'রে দেবেই সে।

নলিনাক্ষ ওকে দিয়ে বহুবার টুকরোটাকরা বহু কাজ করিয়েছে। আত্মীয়-স্বজনদেরও অনেককে ওর কথা বলে দিয়েছে। ফলে ওর সঙ্গে এতদিনে একটু বন্ধুত্বর মতোও হয়ে গিয়েছে। ঠাট্টা তামাশা রসিকতাও চলে দেখা হ'লে। যেখানে টাকার প্রশ্ন নেই, সেখানে বরকত আলী সহৃদয় সহজ মানুষ, রস রসিকতা সেও করে এবং বোঝেও।

প্রাথমিক বিস্ময় প্রকাশ ও কুশল প্রশ্নের পর নলিনাক্ষ হাত ধরে টানতে টানতে একপাশে নিয়ে গিয়ে একেবারে একশো টাকার একখানা নোট পকেটে গুঁজে দিল। কী দিল তা খুলে দেখার প্রয়োজন নেই বরকত আলীর, ও যেন গন্ধতে বুঝে নেয় কে কত টাকা দিচ্ছে। নলিনাক্ষ কত দিল সে কথা না বলে 'আরও দেবো আমার কাজ উদ্ধার হলে' বলল শুধু।

বরকত আলীর প্রশান্ত মুখে একটি রেখাও ফুটল না। যেন সে নলিনাক্ষকে এবং এই প্রস্তাব আশাই করছিল, এমনি ভাব তার। শুধু প্রশ্ন করল, 'কাজটা কি?'

বলল নলিনাক্ষ। ভরসা ক'রে বলেই ফেলল। কাউকে না কাউকে তো বলতেই হবে, যদি খোঁজ করতে হয়। বরকত তো তবু পরিচিত লোক। টাকা নিয়ে কারও সঙ্গে বেইমানী করেছে এমন শোনে নি আজও। আর যাকে বলবে সে কেমন হবে তা কে জানে।

সব শুনে বরকত কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অন্য দিকে চেয়ে। তারপর বলল, 'কাজ ক'রে দিলে আরও দেবেন বলছেন ; এ যা কাজ—যদি বা আমি ক'রেও দিই, করার পর আমি নেবার জন্যে বা আপনি দেবার জন্যে জিন্দা থাকবেন কিনা

জানি না। নগদটাই বুঝি আমি। এ যা বলছেন একটা আড্ডা নয়, একটা দলও নয়। এমন অনেক। দুনিয়াময় ছড়িয়ে আছে। অবশ্যি এদের একটা আড্ডা আমি জানি, দেখিয়েও দোব কিন্তু টাকা আগাম চাই।'

বরকত আলীর চক্ষুলজ্জা আছে—বা প্রয়োজনের সময় অপরের মনে তার কোন্ কথার কি প্রতিক্রিয়া হবে—তা বিবেচনা ক'রে মোলায়েম 'চিনি মণ্ডিত' ক'রে কথা বলবে—এমন অপবাদ তাকে শত্রুতেও দিতে পারবে না।

নলিনাক্ষও তা জানে, ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে, 'কত টাকা?'

'এক হাজার টাকা। এক হাজার টাকার আমার খুব দরকার। কালকের মধ্যে চাই। আমি আমার জামাইকে পাঠাব ধার চাইছি বলে, আপনিও সেই ভাবেই তার সঙ্গে কথা কইবেন, ভেতরের কথা বলার দরকার নেই। তারপর কাল এমনি সময় এখানে আসবেন, আমি ঐ গলিটার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকব। আপনার দিকে চাইব না, আপনিও আমার সঙ্গে কথা বলবার বা কিছু ইশারা করার চেষ্টা করবেন না—তাহলে আপনিও মরবেন, আমিও মরব। আপনি এলেই আমি ঠিক দেখে নেব, ভাববেন না। আমার কাঁধে একটা ছাতি থাকবে, আমি গলিতে ঢুকব, আপনি একটু দূর থেকেই আমার পিছু নেবেন। যে বাড়ির সামনে গিয়ে ছাতিটা নামিয়ে আবার তুলব কাঁধে—ছাতির ডগাটা হেলিয়ে দেখিয়েও দোব—সেই বাড়ি জানবেন।'

তার পর একটু থেমে, মুখের আনত অবস্থাতেই আশ্চর্য কৌশলে কপিশ শ্যেন দৃষ্টিতে চারদিক দেখে নিয়ে গলাটা আর একটু নামিয়ে বলল, 'কিন্তু আপনিও থামবেন না, আমিও থামব না। ওদিক খানিকটা গিয়ে আমি ডাইনে চলে যাবো, আপনি আর কিছুটা গেলে বড় রাস্তায় পড়বেন। তখনই সে বাড়িতে যাবার কি খোঁজখবর করার চেষ্টা করবেন না, ফিরেও আসবেন না। বাড়ি ভুল হবার কোন কারণ নেই। পরের দিন কেন, অমন পাঁচ-সাত দিন পরে এলেও চিনতে পারবেন।'

আরও একটু থেমে হুঁশিয়ারির সুরে বলল, 'তবে আগেই বলে দিচ্ছি, আমার কোন দায়দায়িত্ব নেই। আমি নিজের চোখে কিছু দেখি নি, এ ধরনের কারবারের কথা শুনেছি, আর কিছু জানি না। আমার মামা সওকৎ ঐ বাড়িতে একবার কাজে গিছল, সামনে একটা বাড়ি, এটা দোতলা, পিছনে তেতলা বাড়ি আছে একটা, এ-বাড়ি দিয়েই সে-বাড়ি যেতে হয়—। সামনের বাড়িতেই কাজ ছিল, ওর তো সবতাতে নাকগলানো অভ্যেস—একবার এক ফাঁকে ভেতর-বাড়িটায় ঢুকে গিছল—একটা ফুটো দিয়ে দেখেছে, একটা ঘরে অনেকগুলো বাচ্ছা, সার সার ঘুমাচ্ছে। ও অত বুঝত না। কিন্তু যে ডেকেছিল ওকে, তার কী রকম সন্দেহ হয় একটা, অনেক জেরা করে যে ভেতরের ঐ বাড়িটার দিকে কখনও কোন সময় গিছল কিনা। সওকৎ বলে, বাপরে, সে যা জেরা, উকিলের বেহদ্দ। তাতেই আমার কেমন মনে হয়েছিল—এখন আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ওগুলো সেই সব চোরাই বাচ্ছা। ঘুম নয়—আফিং ইঞ্জেকশন দিয়ে অজ্ঞান ক'রে রেখেছে।'

তারপর একটু থেমে হঠাৎ যেন বাড়ি মেরামতের হিসেব দিতে লাগল, 'ইট ধরুন তিন হাজার, মাটি এক টন—এ তো লাগবেই। তা ছাড়া ধরুন, বালি আছে লোহা আছে, দরজা জানলা—পুরনো কিনলেও এক একটা একশ' টাকার কম নয়। আপনি যতই যা বলুন, চার হাজারের কমে ও ঘর নামবে না।'

নলিনাক্ষ অবাক হলেও এক্ষেত্রে যে বিনা মতলবে বরকত কিছু বলছে না—সেটুকু বোঝার মতো উপস্থিত-বুদ্ধি তার নষ্ট হয় নি। অনেক কষ্টে, মনোযোগ

দিয়ে হিসাবটা বোঝার চেষ্টা করছে, সেই ভাবটা বজায় রেখে আড়ে চেয়ে দেখল একটা মোটা মতো লোক হেলতে দুলতে একেবারে ওদের পাশ দিয়েই চলে গেল। অকারণেই—ওদিকে ঢের জায়গা পড়ে থাকা সত্ত্বেও।

সে লোকটা চলে গেলে আবার তেমনি প্রশান্ত মুখেই—পিছন ফিরে কি এপাশ-ওপাশ না তাকিয়েই আগের কথার খেই ধরল বরকত, 'বাড়িটাতে বেশী লোক থাকে বলে কেউ জানে না, একটি লোক—নিয়মিত যেন কাজে বেরোয়, কাজ থেকে ফেরে, হিন্দুস্থানী লোক, মধ্যে মধ্যে—মধ্যে মধ্যে কেন বেশির ভাগই—পুলিসের পোশাক পরে বেরোয়। তাতেই সকলে ধরে নিয়েছে পুলিসে কাজ করে। মধ্যে মধ্যে সিপাইয়ের পোশাক পরা লোকও আসে, হেঁটে, সাইকেল ক'রে—আপিসের চিঠি নিয়ে যেমন আসে সাধারণত তেমনিই। কিন্তু আমার ভাগ্নে বাহার বলেছে আমাকে, একবার তার সামনে একদিন পড়ে গিছল, দুজন এসেছিল, তার মধ্যে একজনকে বাহার চেনে—তার চোদ্দ-পুরুষে কেউ পুলিস নয়, চোরাই ভাঙ-গাঁজা-কোকেনের কারবার করে। আরও আছে, অনেক ব্যাপার। বাহার সামনের বাড়িতে যায়, ওর সব অনেক রকম কাজকাম আছে—সে থাক, ও লক্ষ্য করেছে অনেক জিনিস। বাজারহাট আসে, লোকে মাথায় ক'রে নিয়ে আসে। অনেক মাল আসে এক-একদিন কিন্তু তবু গাড়ি আসে না। বাড়ির মেয়েদের কেউ দেখে নি, তবে এক-আধ দিন গভীর রাত্রে মাথায় কাপড় দিয়ে বেরোতে কি ঢুকতে দেখেছে মেয়েছেলে। একদিন শেষরাতে নাকি অনেক কে সব এসেছিল, ঐ মোড়ের মাথায় গাড়ি রেখে—আবার পরের দিন শেষরাত্রে বেরিয়েছিল। বাহারকে কাজে পড়ে দু-তিন দিন ঐ সামনের বাড়িতে থাকতে হয়েছিল—তাতেই দেখেছে।...যাই হোক, যা বললুম, ঠিকমতো তাই করবেন, যদি উলটোপালটা কিছু করেন—আমিও উলটো গাইব, আমার কাছে সাফ কথা।'

॥ দশ ॥

নলিনাক্ষ মন স্থির করেই ফেলল।

এটুকু সে বরকতকে এতদিনে চিনেছে, সে যা বলেছে, তার নড়চড় হবে না, টাকাও এক পয়সা কমাবে না। ওরও যখন এটা জানা দরকার—টাকার মায়া করলে চলবে না।

সে একটি নশ' টাকার সেলফ চেক লিখে পিছনে সই ক'রে বরকতের জামাই পেয়ার আলীকে দিয়েছিল।

পেয়ার আলী এসেছে সকাল আটটায়—তখন অত নগদ টাকা কোথায় পাবে? সইসাবুদের কোন দরকার নেই, পেয়ার আলীকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছিল সেটা, কোন ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে পড়তে হবে না তবু সন্দেহ ছিল বরকত যে ধাঁচের লোক, হয়ত এ চেক সে নেবে না, কাজও করবে না।

কিন্তু নির্দিষ্ট স্থানে ট্রাম থেকে নামতেই তার চেককাটা লুঙ্গি, আদ্দির শার্ট আর কাঁধে ছাতাটা দেখা গেল। এদিকে ফিরে নেই, ওর সামনে কোন পানের দোকানও নেই যে আয়নায় দেখবে—তবু নলিনাক্ষ নামামাত্র সে চলতে শুরু করল। ধীরেসুস্থে, মন্থর গতিতে। পিছন থেকে যা মনে হ'ল ইতিমধ্যে একটি জর্দা দেওয়া

পান সংগ্রহ করেছে—বেশ মৌতাতের আমেজে চিবাতে চিবোতে যাচ্ছে সেটা।

যথাস্থানে গিয়ে ছাতা একদিকে হেলে কাঁধ-বদল হ'ল। নলিনাক্ষ বাড়িটা আড়ে দেখে নিল। দোতলা পুরনো বাড়ি। যেমন এ-পাড়ার বাড়ি হয় জানলায় পর্দা ঝুলেছে, বাইরে নিচ এক দিকে এক লনড্রি, এক পাশে কোন একটা কি গুদোম মতো, চাবি দেওয়া রয়েছে। আর একটু চওড়া গলি হলে সেটাকে গ্যারেজ ভাবা চলত। কিন্তু এখান সাধারণ মাপের গাড়ি ঘুরিয়ে ওখানে ঢোকানো শক্ত।

পিছনের তিনতলা বাড়িটা এখান থেকে দেখা যায় না। তার একটা সরকারী পথ নিশ্চয়ই আছে আগমন-নির্গমনের—হয়ত সেদিকটা বন্ধ থাকে কিংবা এমন কোন ভাড়াটে বসানা আছে, যাদের সে ভাড়া নেওয়াটা নিতান্তই আবরণ মাত্র।

তখন আর দাঁড়ানো উচিত নয়। দাঁড়ালও না। ঠিকই বলেছিল বরকত, ভুল হবার কোন কারণ নেই। উলটো দিকের বাড়িটাও দেখে নিয়েছে, সদর দরজায় কে চকখড়ি দিয়ে 'চারশ বিশ' লিখে রেখেছে। তার বাইরের একটা ঘরে সামান্য মুদির দোকান একটা, তার সঙ্গে চিঁড়ে মুড়ি ডিমও পাওয়া যায়।

কোনমতে রাতটা কাটিয়ে পরের দিন সকাল দশটা নাগাদ আবার বেরিয়ে পড়ল। সারা রাত ঘুমই হয় নি ভাল ক'রে—উত্তেজনায় ও আশঙ্কায়, শুধু এপাশ-ওপাশ করেছে। এ ধরনের কাজ, গোয়েন্দাগিরি কখনও ক'রে নি, কীভাবে করবে তাও জানে না। বরুণের বেলায় যেটুকু করেছিল—না জেনে। এ যে কোন্ বিপদের মধ্যে পড়ছে কে জানে! বার বারই মনে হচ্ছে—পুলিসের কাছে সব কথা জানিয়ে সঙ্গে নিয়ে এসে বাড়িটা দেখিয়ে দেয়। কিন্তু তখনই আবার মনে পড়ছে মধুবাবুর কথাটা। 'পুলিসের কম্ম নয়।' মধুবাবু তাকে টিপ্‌স্ দিতে এসে প্রাণটা দিলেন। তাঁর কথার মূল্য অনেক।

ওখানে যখন পৌঁছল তখন সাড়ে দশটা। গলিটা যেন কালকের সে গলি নয়, রীতিমতো কর্মব্যস্ত, জনমুখর রাস্তা। বহু লোক নানা কাজে যাতায়াত করছে, ফিরিওলা হাঁকছে। এর মধ্যে কে কোন্ বাড়িটা লক্ষ্য করছে কিংবা কার দিকে চেয়ে আছে—তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না।

বেড়াতে বেড়াতেই যাচ্ছিল, কাছাকাছি একটা পানের দোকান দেখে সিগারেট কেনার জন্যে দাঁড়াল। দু-একটা দামী সিগারেট চাইল ইচ্ছে ক'রেই—যা এ-পাড়ায় পাবার কথা নয়। পানওলা লোকটির মনে সম্ভ্রম জাগাবারই চেষ্টা এটা। কাজও হ'ল, লোকটি বেশ খাতির ক'রে—সাজা পান থাকা সত্ত্বেও আলাদা ক'রে একখিলি পান সেজে দিলে, প্যাকট খুলে টাটকা সিগারেট বার ক'রে দিলে। তার পর প্রশ্ন করল, 'বাবু কি এ-পাড়ায় থাকেন? আপনাকে তো কৈ দেখেছি বলে মনে পড়ছে না—?'

নলিনাক্ষ ধীরেসুস্থে পানটা একটু চিবিয়ে কায়দা ক'রে নিয়ে ওরই দড়ির আগুনে সিগারেটটা ধরাতে ধরাতে বলল, 'না, আমার এক বন্ধু—অনেক দিন দেখি নি, সিংগাপুরে চাকরি ক'রে—ছুটিতে এসে এইখানে কোথায় উঠেছে। আমার জন্যে একটা ভাল বেতের ব্যাগ আনার কথা। চিঠি দিয়েছিল—সেটা হারিয়ে ফেলেছে। ঠিকানাও তাতেই ছিল। তার নাম তপন ভৌমিক, কে এক ডিসুজার বাড়িতে উঠেছে এসে, ঐখানেরই পরিচয়—এইটুকু মনে আছে।'

'ডিসুজা?' ভুরু কুঁচকে নামটা মনে করার চেষ্টা করল পানওলা। তারপর

বলল, 'রাস্তার নাম মনে আছে?'

'তাহলে তো গোল চুকেই যেত। কিচ্ছু মনে নেই। এই পাড়া, এমনি একটা ধারণা আছে শুধু—'

'তাহলে তো বাবু বলা শক্ত। অনেক গলি, অনেক লোক। ডিসুজা অবিশ্যি ছিল একজন, এই গলিতেই, তা সে তো বহুত রোজ কাবার হয়ে গিয়েছে—ফৌৎ, মানে মারা গিয়েছে। সে পনেরো-ষোল বছরের ওপর হবে তো কম নয়। আর তো কৈ, ফিরিঙ্গি যা দু এক ঘর এ গলিতে আছে—ডিসুজা কেউ না। ফার্নাণ্ডেজ আছে, টমাস, ডিমেলো—না ডিসুজা কেউ নেই।'

'যে ডিসুজা ছিল বলছ—সে কোন্ বাড়িতে থাকত?'

'ঐ যে—' আঙুল দিয়ে সেই বাড়িটাই দেখিয়ে দেয়—যেটা কাল বরকত আলী ইশারা ক'রে গেছে।

'তা ওখানে তার কেউ—মানে ছেলেমেয়ে ফ্যামিলি নেই?'

'না বাবু। কিরায়ার বাড়ি তো। তার পর বহুত হাত বদল হয়েছে। ডিসুজার বিবি বুড়ো বয়সে আমাদেরই এক মোসলমানকে শাদী ক'রে আলিগড় চলে গিয়েছে। সে ছোকরা টাকার লোভেই বুড়ীটাকে নিকে করেছিল—শুনেছি টাকা-পয়সা কেড়ে-কুড়ে নিয়ে বুড়ীকে তাড়িয়ে দিয়েছে, সে এখন আগ্রায় না টুণ্ডুলায় ভিক্ষে ক'রে খায়। মেয়েটার আগেই শাদী হয়ে গিয়েছিল—দুটো ছেলে, তারা সব কে কোথায় চাকরি-বাকরি করে—জানি না।'

'তা ও বাড়িতে কে আছে এখন?' খুবই স্বাভাবিক প্রশ্ন, তবু মনে হয় পানওলার চোখে একটু সন্দেহের ছায়া পড়ে। তাড়াতাড়ি বলে, 'মানে, ঐখানেই এসে উঠেছে কিনা—'

'না না, ও-বাড়ি তারপর বহুত হাত বদল হয়েছে। এক উড়িয়া কিনেছে। সে সব ভাড়াটেদের উঠিয়ে দিচ্ছে টাকা দিয়ে দিয়ে। শুনছি হোটেল করবে। বুঝেছেন তো, হোটেল আজকাল বহুত মুনাফা। এই সব গলি-ঘুঁজিতে হোটেল তো নামেই—আসলে দেদার রেন্ডীর কারবার চালাবে।'

'অ।' আর দাঁড়িয়ে থাকার কোন কারণ নেই। একটা ভুলই ক'রে বসল। আনাড়ীর কাণ্ড। মনে মনে নলিনাক্ষ জিভই কাটল একবার। এত কথা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বলা ঠিক হয় নি। এর পর এখানে বেশী ঘোরাঘুরি করলে কি খোঁজখবর করলে এই লোকটারই সন্দেহ হবে।

এর মধ্যে আর একটি খদ্দেরও এসে দাঁড়িয়েছে, পান ও বিড়ির। এ-পাড়ারই লোক মনে হয়, লুঙ্গির ওপর নাইলনের গেঞ্জি পরা। রোগা কালোমতো—মুখে 'মার অনুগ্রহের' দাগ। সেও আড়ে চাইছে ওর দিকে।

এক রকম মরীয়া হয়েই বলে উঠল নলিনাক্ষ, 'এ পাড়ায় বাড়িটাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়?...কী রকম ভাড়া?...আমাদের ওদিকে যে ভাড়া হয়েছে—আমাদের ক্ষমতায় আর কুলোয় না।'

সেই রোগা লোকটিই আগু বেড়ে কথা বলল। পান খাচ্ছিল, খানিকটা পিচ ফেলে এসে বলল, 'বাড়ি আপনার দরকার? কেতো ভাড়া দিবেন? কখানা ঘর চাই আপনার? আমার নাম সোলেমান, আমি বাড়ি ভাড়ারই দালালি করি। হেঁ—হেঁ—'

'কী রকম ভাড়া এ-পাড়ায় তাই জিজ্ঞেস করছি। আমি এখন যে বাড়িতে আছি

বাগবাজারে, অনেক দিন আছি—ভাড়া কমই দিই অবিশ্যি, নতুন নিলে ওর চেয়ে বেশী দিতেই হবে, আশি টাকায় পুরো দোতলা নিয়ে থাকি—তিনখানা ঘর, রান্না-ঘর। তার কমে আমার কুলোবে না।'

'এতো সোস্তায় বাড়ি কোথা পাবেন! সে বাড়ি ছাড়ছেন কেনো?'

'বড্ড পুরনো হয়ে গেছে, বাড়িওলা সারিয়ে দেয় না। তারা চাইছে আমরা উঠে যাই। তখন ঐ ফ্ল্যাট সারিয়ে ভাড়া দিলে কমসে কম দুশো টাকা পাবে।'

'সো তো ঠিক বাত আছে বাবু। জাস্তিই পাবে। তা আপনি কেতো কিরায়া দিতে চান?'

অভিনয়টা নিখুঁত করারই চেষ্টা ক'রে নলিনাক্ষ, 'আমি তো চাইব যত কম দিয়ে হয়। সে কথা নয়—সওয়া শো'র বেশী দিলে আমার কষ্ট হবে। বোনের বিয়ে বাকী, একা রোজগার করি—বুঝলে না?'

'হাঁ, সো বাত বোলেন। সোওয়া শোতে মিলবে এ-পাড়ায়। লেকিন আর কোথাও মিলবে না। বালিগোঞ্জ, ভোয়ানীপুর চোলেন—তিন কামরা ফিলাট্ সাড়ে তিন শো মাংগবে—কোম সে কোম।'

'কিন্তু—কিছু মনে ক'রো না—এ-পাড়াতে কি আমরা থাকতে পারব? সেই থেকে যা দেখছি, তোমাদের সব বিহারী মুসলমান, ফিরিঙ্গি, চীনে এই সবই তো দেখছি। আমরা হিন্দু—মেয়েছেলে নিয়ে বাস করতে পারব কি?'

'খুব খুব। বহুত শৌখ্‌সে। এ পাড়ায় কোন দাঙ্গাহাঙ্গামা কি চোরির কথা শুনেছেন? আখ্‌বারে পড়িয়েছেন? এখানে কেউ কারও কথা নিয়ে থাকে না বাবু, যে যার আপনার আপনার কাম করে—খায় দায়, থাকে—।'

'তা—বাড়ি, মানে তোমার সন্ধানে আছে? এখন দেখাতে পারবে?'

'এখোন তো পারব না বাবু, একঠো জরুরী কাম আছে, এখনই মাটিয়াবুরুজ যাতে হোবে! আপনি যদি মেহেরবানী ক'রে সন্ধ্যায় আসেন—বড্ড ভাল হয়।'

'বেশ, তাই আসব। কোথায় আসব বলো।'

'এই মোড়ে আমি থাকব বাবু। কিংবা এই দুকানে। রাত সাড়ে সাতটার মধ্যে পঁহুছিয়ে যাবো, জরুর। ঠিক আছে?'

'আচ্ছা, তাই হবে।'

ঝোঁকের মাথায় কাজটা ক'রে ফেলে একটু ভয়-ভয়ই করতে লাগল।

কি রকম লোক, কি মতলব কে জানে!

একবার ভাবল, গিয়ে কাজ নেই। আবার মনে হ'ল, এখানে এ-পাড়ায় যদি খোঁজখবর করতে হয়, এ ঝুঁকি তো নিতেই হবে। নইলেই তো বরং—শুধু শুধু ঘুরলে—সন্দেহ করবে লোকে। যদি সত্যিই শত্রুর দৃষ্টি তার দিকে থাকে—সে তো বুঝেই নেবে। এ তবু বাড়ি ভাড়ার নাম ক'রে—এ-বাড়ি পছন্দ হ'ল না, ও-বাড়ি—অনেকবার যেতে পারবে এই ছুতোয়। চাই কি এই উপলক্ষে আরও দু-চার জনের সঙ্গে আলাপ হলে ঐ বিশেষ বাড়ির খবরও বার করতে সুবিধে হবে। সোলেমানকে সুযোগ বুঝে কিছু কবলালে, সেও খবর দিতে পারবে।

বিকেলে আপিস থেকে বেরোবার সময় মনে হ'ল এখানে কাউকে কিছু বলে যাবে কিনা, অথবা বলে পরামর্শ চাইবে কিনা। কিন্তু তেমন কারও কথাই মনে পড়ল না। এখানে বন্ধু বলতে কেউ হয় নি এখনও। ছোকরা যারা—মদ হৈ

হল্লা—এই নিয়েই আছে, 'বৃদ্ধ স্তাবৎ চিন্তামগ্ন' শঙ্করের ভাষায়, যে যার উন্নতি, কিসে কি সুবিধা আদায় করা যায়—রিটায়ার করার আগে কতটুকু রস নিংড়ে বার ক'রে নিতে পারে কুনাল দত্তর, এই চিন্তাতেই মগ্ন। ছেলে ভাইপো ভাগ্নের চাকরির জন্যে ব্যস্ত।

সুতরাং কাউকেই কিছু বলা হ'ল না।

যাবার সময় আপিস-ক্যাণ্টিন থেকে একটু চা ও খাবার আনিয়ে খেয়ে নিল শুধু। যদি ফিরতে দেরি হয়, ও-পাড়ায় চা খাওয়ার কোন জায়গা নেই।

বেরিয়ে ট্রামে উঠতে উঠতে একটা কথা মনে পড়ল—'ঢাল নেই তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার।' ওরও অবস্থা তাই। যাচ্ছে গোয়েন্দাগিরি করতে—একটা কোন রকম হাতিয়ার নেই সঙ্গে। অথচ দেবীপদ বন্ধু ছিল, ধরে পড়'ল একটা রিভলভারের লাইসেন্স পাওয়া কঠিন হ'ত না। এমনিও যে চেষ্টাচরিত্র করলে পাওয়া যেত না তা নয়—'চোরাই মাল লুকিয়ে-চুরিয়ে বিস্তর বিক্রী হয়।...কিছুই করা হ'ল না, কথাটা মনেই পড়ে নি, অথচ যাচ্ছে, মধুবাবুর ভাষায়, বাঘের গর্তে পা দিতে! বাঘের চোয়ালের মধ্যে, কে যেন বলেছিল না—দেবীপদই তো। এককড়ি। সে যদি থাকত, তাকে জানালেই আর এত কাণ্ড করতে হ'ত না ওকে। কী যে হ'ল ছোকরার।...

মোড়ের মাথায় পৌঁছতেই দেখল সোলেমান, প্রসন্ন মধুর অমায়িক হাসিতে মুখটি রঞ্জিত ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। তফাতের মধ্যে এ-বেলা গায়ে একটা জামা উঠেছে, হাফ শার্ট একটা।

'আসুন বাবু। সালাম। ওঃ, কী যে করেছি আপনার জন্যি! মাটিয়াবুরুজ গিয়ে তো আটকে গিছলাম, আমার এক বুনের বর বহুত বদমাশ আ'ছে, তারই তালাকের জন্যে ঘুরছি—সব ঠিক, আজ গিয়ে দেখি নানান্ ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে রাখছে। সেই মামলার কেজিয়া করতে করতে দেখি পাঁচটা বাজে। কী করব, বলি ভোদ্দোর-লোককে কোথা দেওয়া আছে—ইনগেজমেণ্ট—খেলাপী হলে তো আমাকে জানোয়ার ভাববেন। তাতেই- যা কখনও করি নি, টাক্সি মটর নিয়ে চলে এলাম। বাড়ি তো খোঁজে ছিল না, দু ঘণ্টায় কত খুঁজব বোলেন। যাই হোক দুটো ফিলাট্ দেখেছি, চলুন দেখিয়ে দিই—বাড়ি, বিশোয়াস রাখবেন, কালকের মধ্যে আউরো চার-পাঁচটা পাইয়ে যাবো। আজ তো ই-দুটো দেখাই। একটার ভাড়া একশো তিশ, একটার কিছু কম হোবে। লেকিন—' গলা নামিয়ে বলে—'উপরে কেরেস্তান থাকবে বাবু। দেখেন- আউরো দেখবো। ইটা তো দেখেন—'

খুশী হল নলিনাক্ষ। সে তো এখানে বার বার আসারই সুযোগ খুঁজছে। সে বললে, 'বলো তো কালই না হয় আসব—আজই যে ঠিক করতে হবে কোথাও একটা, এমন তো তাড়া নেই—। জলে তো পড়ি নি একেবারে।'

গলিতে ঢুকতেই সেই পানওলা লম্বা একটা সেলাম ঠুকল, 'আসুন বাবু, একখিলি পান? সেজে রেখেছি আপনার জন্যে। আর সেই সিগারেটও, সকালে যা চাইছিলেন—'

লোকটাকে হতাশ করতে মন চাইল না। এ হাতে থাকলে বিস্তর খবর পাবে। এসব জায়গায় এই পানওলারা অনেক খবর রাখে পাড়ার। সেও এগিয়ে গিয়ে বলল, 'দাও। সোলেমানের দেরি হয়ে যাচ্ছে না তো? বেচারার তো বোধ হয় খাওয়াও হয় নি—'

'কুছু না, কুছু না। একঠো পান খাইবেন, কেতো দেরি হোবে? আমিও একঠো বিড়ি ধরিয়ে লিই।'

পান মুখে দিয়ে সোলেমানের সঙ্গে সেই গলি দিয়েই এগোল। বরকতের দেখিয়ে দেওয়া সে বাড়িটা ছাড়িয়ে গিয়ে একটা চার ফুট কানাগলি পড়ে। তার ভেতর নাকি বাড়ি—কিন্তু সেইখানটায় গিয়েই নলিনাক্ষর মাথাটা প্রচণ্ডভাবে ঘুরে গেল। মনে হ'ল বিরাট ভূমিকম্প হচ্ছে, গলির নিচটা তার দিকে অর্থাৎ উপর দিকে উঠতে চাইছে। তার পরই সব অন্ধকার হয়ে গেল চোখের সামনে। সোলেমান তার অবস্থা বুঝে ধরে না ফেললে মাটিতে প'ড়ে যেত বোধ হয়।

মনে হ'ল যেন আরও কে ঐ কানাগলিটা থেকে বেরিয়ে এসে ওর আর একটা হাত ধরল। টানছে যেন ঐ দিকেই। সোলেমানও। তারপর আর কিছু মনে নেই। আর কিছু জানে না। সব অন্ধকার। গভীর সুষুপ্তি।

॥ এগার ॥

মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা, বমি-বমি জ্ঞান হবার—তার পর প্রথম যে অনুভূতি হ'ল নলিনাক্ষর, তা এই।

কিছুই বুঝতে পারে না, কেন এমন যন্ত্রণা সেইটেই ভাবতে চেষ্টা করে শুধু। চোখ খুলতে কষ্ট হয়—কিছুতেই যেন চাইতে পারে না, গভীর ঘুমে যেমন চোখের পাতা এ'টে থাকে, তেমনিই। হেমন্তের বা শীতের দিনে দুপুরে ঘুমোলে অনেক সময় এই রকম অবস্থা হয়, চেতনা থাকে, ওঠা উচিত এবার বোঝে —উঠতে চেষ্টাও করে কিন্তু চোখ থেকে ঘুম যেতে চায় না ; চোখ খুলতে পারে না।

কেন এমন হচ্ছে ভাবতে গিয়ে মাথার যন্ত্রণা আরও বেড়ে যায়। সেই বমির ভাবটাও। চোখ বুজে স্থির হয়ে পড়ে থাকে আরও খানিকটা। পরে তার আস্তে আস্তে কেমন একটা দৈহিক অস্বাচ্ছন্দ্যের অনুভূতি হতে থাকে। বড় কষ্ট। মনে হচ্ছে কোন কঠিন জায়গায় শুয়ে আছে। আর আছেও বোধ হয় অনেকক্ষণ এক ভাবে। নইলে এমন কষ্ট হবে কেন? তার বিছানাটা এত শক্ত হয়ে গেল কী ক'রে? বৌদি নেই, কেউ রোদে-টোদে দেয় না। রঘুটা কি করে? বকতে হবে ওকে—

কিন্তু এটা বিছানা কি! কি রকম যেন লাগছে!

উঃ—কী গরম! যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

মনে হ'ল ঘামই গড়িয়ে চোখে পড়েছিল—অন্তত জ্বালাটা সেই রকম—বন্ধ পাতার মধ্যে দিয়ে গিয়ে জ্বালা ক'রে উঠল চোখটা। তাতেই হাতটা যেন আপনিই উঠে এল চোখের দিকে, (হাত এত ভারী বোধ হচ্ছে কেন? যেন অবশ হয়ে গেছে! প্যারালিসিস হ'ল নাকি? হাতের উল্টো পিঠ ক'রে চোখটা মুছতে গিয়ে আরও খানিকটা ঘাম গেল বোধ হয় চোখে—আরও জ্বালা—যার ফলেই বোধ হয় ঘুমের সেই আচ্ছন্ন করা ভাবটা কেটে গেল, একটু একটু চোখ পিটপিট করতে করতে—চোখ জ্বালা করলে যেমন একবার খোলে আবার বন্ধ করতে বাধ্য হয়—সেই ভাবেই একসময় চোখটা খুলে ফেলল।

কিন্তু চোখটা পুরোপুরি যখন খোলা গেল—তখন বিহ্বলতা আরও বাড়ল।

সে কোথায় এসেছে, কোথায় আছে? এ কোন্ জায়গা? সে কি জেগে আছে —না ঘুমুচ্ছে এখনও? কিছুই বুঝতে পারছে না কেন? পাগল হয়ে গেল নাকি?

আবারও ক্লান্তভাবে চোখ বুজল সে। নিজেই। ইচ্ছে করেই। মাথার যন্ত্রণা তো আছেই, সেই গা-বমি ভাবটাও। এই বিহ্বলতা ও অনিশ্চয়তাতে যেন মাথার যন্ত্রণা আরও বেড়ে গেছে।

চোখ বুজে পড়ে থাকতে থাকতেই একটু একটু ক'রে মনে পড়ল সব। রঘু, রঘু কোথায়? সে চা দিচ্ছে না কেন?

এই রঘুর সূত্র থেকেই বৌদি, পুরী, দোলা, তার আপিস, মধুবাবু—একটা চেনে বাঁধা মটরমালার দানার মতো একটার পর একটা মাথায় এসে গেল। যন্ত্রণা তীব্রতর হয়ে উঠছে, অনুভূতি বা চেতনা পরিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় —তা হোক, সবই মনে পড়ছে এবার। বরকত আলী, পানওলা, সোলেমান। পান খাওয়া, তার পরই সব অন্ধকার হয়ে যাওয়া।

অর্থাৎ সে বাঘের গর্তেই পা দিয়েছিল, বোকার মতো, আহাম্মুকের মতো। মধুবাবু দেবীপদ কারও সতর্কবাণীতে কোন কাজ হয় নি—বর্তমানে সে বাঘের চোয়ালের মধ্যেই, দাঁতটা শুধু যা বসাতে বাকি।

এবার ভাল ক'রে চেয়ে দেখল। একটা নিশ্ছিদ্র নিরেট দেওয়ালওলা ঘরের মেঝেতে সে পড়ে আছে। বিছানা নেই, কোন আসবাব নেই। কোথাও জানলা বা দরজা নেই। এক কোণে একটা মাটির গামলা, বোধ হয় প্রাকৃতিক কাজের জন্যে, আর এক পাশে একটা টিনে—বোধ হয় খানিকটা জল।

জানলা নেই তবে সে দেখতে পাচ্ছে কী ক'রে? নিঃশ্বাসের জন্যে বাতাসও তো দরকার?

ছাদের দিকে চাইতে সে রহস্যটাও পরিষ্কার হ'ল। ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস কামরায় যেমন ছাদে কতকগুলো ফুটো থাকে—তেমনিই আছে, মনে হয় ছাদটাও লোহারই। আর তেমনিই এক কোণে একটা ফুটো দিয়ে আলো এসে পড়েছে দেওয়ালে, সাদা দেওয়ালে পড়ে সেটা প্রতিফলিত হয়ে একটা আলোর আভাস সৃষ্টি করেছে। আলো খুবই কম, বোধ হয় দশ বাতি কি পনেরো বাতির বালব আছে—কিন্তু নীরন্ধ্র অন্ধকারে তাই যথেষ্ট।

নিঃশ্বাস নেওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও বাতাস নেই। অসহ্য গুমোট, তাতেই যেন যন্ত্রণা বেশী মনে হচ্ছে। ঘামে জামা প্যাণ্ট ভিজে জলের ধারার মতো মেঝেয় গড়াচ্ছে। এগুলো খোলা দরকার।

ওঠবার চেষ্টা করল—সমস্ত দেহ যেন কেমন ভারী আর অনড় হয়ে গেছে— পারল না প্রথমটায়। আরও অনেক পরে, অনেক চেষ্টায়, প্রথমে পাশ ফিরে তার পর একটা হাতে ও আর একটা কনুইতে ভর দিয়ে শেষ অবধি উঠে বসল।

কাল যে সাংঘাতিক বিষ খাইয়েছিল—তারই ফল নিশ্চয় এটা। সবাই সব জানে, শত্রুদলের (শত্রুই বা কেন, সে প্রশ্নটাও থেকেই যাচ্ছে) পয়সা-খাওয়া লোক। পানওলা জেনেশুনেই নিশ্চয় পানে বিষ মিশিয়েছে। অজ্ঞান-অচৈতন্য করার জন্যে। কী বিষ কে জানে? তার আরও কি কুফল ভোগ করতে হবে! এ মাথার যন্ত্রণা, এই বমি-ভাব—এও নিশ্চয় সেই জন্যেই।

কিন্তু ঘটনাটা কাল ঘটেছে, তাই বা ভাবছে কেন? কাল কি কদিন আগে— তাও তো জানে না। দিন না রাত্রি এটা?

কে জানে, কে বলবে! এ কী অদ্ভুত অবস্থা! কী ওদের মতলব কে জানে! এরা কারা তাও তো জানে না! হায় রে তার বুদ্ধির অহঙ্কার! অন্ধকার যেমন ছিল তেমনিই রইল—মাঝখান থেকে প্রাণটাই গেল। দোলা কিন্তু তার আপন মেয়ে নয়, আপন ভাইঝিও নয়—মিছিমিছি কেন যে তার এত মাথাব্যথা পড়ল! আসলে সেই ছেলেটা, ভিখিরী ছেলেটাই যত নষ্টের গোড়া।

হাত-পা আর একটু নাড়বার মতো হতে জামা গেঞ্জি সব খুলে ফেলল। হয়ত এই ভিজে জামা গায়ে থাকাতেই—ক' ঘণ্টা আছে এইভাবে কে জানে—সর্বাঙ্গে এত ব্যথা হয়েছে। আর এই মেঝেতে পড়ে থাকা। কে জানে মাটির নিচের ঘর কি না, মেঝেয় তো জল উঠছে। তবে খুব পুরনো নয়—বোধ হয় নতুনই তৈরী হয়েছে ওদের জন্যে।

অসহ্য যন্ত্রণা মাথায়। যন্ত্রণায় ভয়ে ক্ষুধায় তৃষ্ণায়—'ওঃ' বলে একটা শব্দ ক'রে উঠল নলিনাক্ষ। আবার বলে উঠল, 'মা, মাগো! আর যে পারছি না!'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি অতি-পরিচিত চাপা কণ্ঠে শব্দ এল, 'আরে! নলিনীবাবু নাকি!'

দেবীপদ! এককড়ি!

কিন্তু শব্দটা আসছে কোথা থেকে? কোথাও তো ফাঁক নেই একটাও! এক ওপরে ছাড়া। মনে হচ্ছে সেইটেই যাতায়াতের পথও। সেকালের চাপা দরজার মতো।

'দেবীপদ? তুমি কোথায়? কোথা থেকে কথা কইছ?'

'চুপ। আস্তে কথা বলুন। ঐ যে গামলা দেখছেন, ওটা সরান, দেখবেন একটা ছোট্ট নর্দমা। আমি আপনার পাশের ঘরে ঐ নর্দমায় কান পেতে আছি। ঐ দিকের দেওয়াল ঘেঁষে সরু নালার মতো কাটা আছে মেঝেতে, জল বেরোবার পথ। গামলাটায় ঢাকা আছে নর্দমাটা। চলে আসুন, এইখানে মুখ দিন, কথা বলার অসুবিধা হবে না।'

আশ্চর্য মানুষের মনের গতি, পরে ভেবে নিজেরই অবাক লাগে নলিনাক্ষর। সে প্রথম প্রশ্নই ক'রে বসল, 'আচ্ছা এখন কটা বাজে বলতে পারো, দিন না রাত? আমি কতকাল আছি এখানে?'

'কেন, আপনার হাতে ঘড়ি নেই?'

'না, দেখছি না তো।'

'তাহলে যে ব্যাটা ধরেছিল আপনাকে, সেই নিয়েছে। আমারটা আছে। তবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আন্দাজে চালিয়েছি। মোদ্দা কুড়ি ঘণ্টা হয়ে গেছে। আপনি কটায় এসেছিলেন? সাড়ে সাত পৌনে আট? তাহলে এখন বিকেল চারটে বাজে।'

'তুমি কি ভাবে এলে এখানে? কত দিন আছ?'

'তা হ'ল বৈকি! সেই যে ভাঙা বাড়িটার পাশে দেখা হয়েছিল মনে আছে? পুরীতে? যেই আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দেওয়ালটার এ পাশে এসেছি, একটা চট দিয়ে আমার মাথাটা ঢেকে মুখে দড়ি বেঁধে দিলে—তার পর তিন-চার জন ধরে এনে নিমেষের মধ্যে চাকলাদারের গাড়ির ক্যারিয়ারে পুরে বন্ধ ক'রে দিলে! ভেরী নীট ওআর্ক।...সব সুদ্ধ বোধ হয় এক মিনিটও না। আমার গাড়োলগুলি পাহারা দিচ্ছিলেন, মানে দেবারই কথা, নজর রাখার কথা অন্তত—কেউ টের পেল না।...আপনি ঐ পথেই বাড়ি যাবেন জানি, তখনই উঠবেন—তাই যতটা

পারি গোঁ গোঁ ক'রে চেঁচাবার চেষ্টা করলুম—কিন্তু আপনিও শুনতে পেলেন না।—'

'শুনতে পেয়েছিলুম ঠিকই—কিন্তু এ ধরনের ব্যাপার যে কল্পনাই করতে পারি নি। আপনার সঙ্গে অত পুলিসের লোক! আমি ভেবেছি বাতাসের শব্দ।'

নলিনাক্ষ খুলে বলল ওর অভিজ্ঞতা। তার পর থেকে কি কি ঘটেছে তাও সংক্ষেপে বলল। মধুবাবুর কথা। ওর ভাইপো-চুরির কথা। পরেশ চাকলাদারের কথা। দেবীপদর নাম ক'রে গাড়ি পাঠাবার কথা। কেন ও কি ভাবে এখানে এল, তাও।

দেবীপদ চুপ ক'রেই শুনে গেল। তারপর বলল, 'হুঁ। ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। আমিও এসব শুনেছি—তবে ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। মানে সত্য, না কি আমি কান পেতে আছি জেনেই বানিয়ে বলছে, সেইটেই ঠিক করতে পারছিলাম না।'

'তুমি শুনলে কি ক'রে? তোমার বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ আছে নাকি? এ তো সেই মধ্যযুগের ডানজন।'

'তা বটে। তবে তত ভয়ানক নয়। আলোটা দিয়েছে দয়া ক'রে আর এখনও ইঁদুর তাড়া করে নি। মনে হয় এটা অপেক্ষাকৃত নতুন।'

একটু অসহিষ্ণু হয়েই নলিনাক্ষ পুনশ্চ বলে, 'কিন্তু তুমি শুনলে কি ক'রে তা তো বলছ না?'

'ঠিক এই ভাবেই। এটা আমরা আছি মাটির নিচের ঘরে। ওপর থেকে সিঁড়ি ফেলে নামিয়ে দেয়; আবার যদি কোন দিন আমাদের তুলতে হবে মনে করে তাহলে ঐ ভাবেই তুলে নেবে। তবে আমার এ পাশের ঘরে মনে হচ্ছে একটা সিঁড়ি আছে। ঘরটাও বড়, ওদের কথার ভাবে যা মনে হয়—কারণ অনেক মাল আছে এতে। এটাই ওদের কনফারেন্স রুম-মতো, অনেক আলোচনা হয়, যেগুলো প্রকাশ্যে করা যায় না, মানে সামান্য দু-একজনের বাইরে যা কাউকে জানাবার নয়। নিরেট দেওয়াল মধ্যে, এই ভেবেই ওরা নিশ্চিন্ত আছে, নর্দমার কথাটা কারও মাথাতে যায় নি। তাতেই শিখলাম অনেক।'

'তা তুমি বেঁচে আছ কি ক'রে? তোমাকে খাবার দেয়?'

'এখন দিচ্ছে। বোধ হয় তোমাকেও দিত, জ্ঞান হয় নি ভেবেই নিশ্চিন্ত আছে।'

'কি ভাবে দিচ্ছে?'

'ওপরের চাপা দোর খুলে একটা তারের ট্রের মতো নামিয়ে দেয়। তাতে দুটি বস্তু থাকে একসঙ্গে—জল আর খাবার। আর একটু পরেই একটা গামলা নেমে আসে, সেটা নামিয়ে ঘরের গামলাটা তাতেই তুলে দিতে হয় নিজের হাতে। খুব সায়েন্টিফিক আর মেথডিক্যাল। তবে বেশীদিন খেতে দেবে না আর।'

'তার মানে?'

'মনে হয় তোমার—মানে আপনার জন্যেই—'

'তোমারই হোক না, আমি তো তুমি ক'রে নিয়েছি, তুমি এখনও দূরত্বটা রাখছ কেন?'

'তা বটে, মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে ওসব ফর্মালিটির দরকার নেই আর।...যা বলছিলুম, ওরা তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিল, এবার নাকি এখান থেকে সবাই

চলে যাবে, ভেকেট করবে। মাল, মানুষ—যা নিয়ে যাবার সব সরে গেলে তালা বন্ধ ক'রে রেখে সরে পড়বে। আমরা এইখানে শুকিয়ে মরব। দীর্ঘকাল পরে কেউ হয়ত যদি দোর ভেঙে ঢোকে—সে সম্ভাবনা কম, কারণ পরেশ চাকলাদারই এর মালিক—ঢুকলেও মাটির নিচের এ মহলের সন্ধান পেতে দিরে হবে—আর যদিই পায়, দুটো কঙ্কাল থেকে কে কী বুঝবে?'

দেবীপদ খুব সহজ ভাবেই, যেন একটু কৌতুক ক'রেই বলল, কিন্তু কল্পনায় দৃশ্যটা দেখে—এই মাটির নিচে হয়ত পঞ্চাশ কি একশ' বছর পড়ে থাকবে কঙ্কাল-গুলো, কেউ জানতেও পারবে না—নলিনাক্ষ শিউরে উঠল। এই প্রথম, তার যেন কান্না পেয়ে গেল। কেন মরতে এ কাজ করতে এল সে! এই শোচনীয় ভাবে তিলে তিলে পলে পলে শুকিয়ে মরা!

'কী, ভয় পেয়ে গেলে নাকি?'

'তোমার ভয় করছে না?'

'যেদিন থেকে এ কাজে এসেছি সেদিন থেকেই তো মৃত্যুর হাত ধরেছি। কত-বার মরতে মরতে বেঁচেছি। এবার না হয় বাঁচতে বাঁচতে মরব। শুধু শুধু ভয় ক'রে লাভ কি বলো?'

'কিন্তু পরেশ চাকলাদার তোমাকে ধরল কেন? সে তো—সে তো শুনলুম অন্য ব্যবসায় ছিল।...হ্যাঁ, সেও ধরা পড়েছে জানো? স্মাগলিং-এর জন্যে, বমাল ধরা পড়েছে।'

'ধরা পড়ে নি, ধরা দিয়েছে।'

'তার মানে?'

'তার মানে এই দায়, মধুবাবুকে খুনের দায়—এতগুলো থেকে বাঁচতেই ধরা দিয়েছে। কে জানে মধুবাবুর জন্যে ওর দলের লোকই নারাজ হচ্ছিল কিনা, প্রাণের ভয়েই আরও ধরা দিয়েছে। এসব কাজ করার পর বাঁচতে গেলে পুলিসের ঘরে থাকাই সুবিধা।'

'মধুবাবুকে ও-ই খুন করেছে, না? লোকটাকে আমরা কিন্তু আগাগোড়া সন্দেহ করছিলুম—'

'কিচ্ছু ভুল করো নি। মধুবাবুই পালের গোদা। অর্থাৎ মানুষখেকো ব্যবসা তারই।'

'তার মানে? একই প্রশ্ন বার বার করছি—কিন্তু আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। এত যন্ত্রণা হচ্ছে মাথার—'

'একটু জল খেয়ে নাও।' মাথাতে একটু জল থাবড়ে দাও। জল কাল তোমার সঙ্গেই নেমেছে তা টের পেয়েছি। শুধু কাকে ধরে আনা হ'ল সেটা ওদের কথা-বার্তার মধ্যে ঠিক বুঝতে পারি নি।'

নলিনাক্ষ একটু সুস্থ হয়ে আবার নর্দমায় কান পাতলে দেবীপদ সংক্ষেপে—যতটা জানে—এই রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করল।

জানার দিক থেকেও একটু সুবিধা হয়ে গেছে। যে লোকটা খাবার দিতে আসে, ভবানী হালদার নাম, এর আগে একটা ডাকাতি মামলায় জড়িয়ে পড়েছিল, প্রমাণ সাক্ষী সবই ওর বিরুদ্ধে, দেবীপদই শেষ মুহূর্তে বাঁচিয়ে দেয়—আসল যারা যারা ছিল খুঁজে বার ক'রে। এর আগে এ কাজ অনেকবার করলেও সে ডাকাতিতে ভবানী

ছিল না—কিন্তু হাতের কাছে একটা দাগী আসামী পেলে কে আর অত গরজ ক'রে তার প'রও তদন্ত চালিয়ে যায়! সেই ডাকাতিতে মানুষ খুন হয়েছিল, যারা শেষে ধরা পড়ল তাদের সকলেরই 'লাইফ সেন্টেন্স' হয়েছে—যাবজ্জীবন কারাদণ্ড যা'ক বলে। তাতেই ভবানী হালদার ও লাইন ছেড়ে দিয়েছে, এদের চাকরি করে। জা'তে নমঃশূদ্র, বলে, 'ডাকাতিই আমাদের জাত ব্যবসা, তা বুড়ো হয়েছি, এখন একটুকু ভয় ধরে'ছ প্রা'ণ। এখানে আমি তো হাতে-কলমে কিছু করি না, যদি দৈবে ধরা পড়িও, বড়জোর কিছুদিন জেল হবে—ফাঁসির দড়ি তো আর পরতে হবে না গলায়।'

সেই ভবানীই কিছু কিছু বলেছে। আর কিছু কিছু নর্দমার ফুটোয় কান দিয়ে শুয়ে শুয়ে শুনেছে দেবীপদ।

মানুষ চালান ব্যবসাটা দু রকম হয়। বয়স্কা মেয়ে চালান হয়, বয়স্ক পুরুষও চালান হয়—তেরো-চোদ্দ থেকে উনিশ-কুড়ি পর্যন্ত—এদের বিক্রি ক'রে দেওয়া হয় বাইরে। পুরুষরা ক্রীতদাস হিসাবে কাজ করে, মেয়েদের দুরকমেই খাটতে হয়। তবে এর চাহিদা এত নেই, আর ঝুঁকিও বেশি। অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ওয়াকিবহাল লোক ছাড়া এসব কাজ পারে না। মধুবাবুর এই ব্যবসাই বেশি ছিল। কেরালা থেকে গুজরাট, ওদিকে পাঞ্জাব, রাজস্থান—সর্বত্রই তার অংশীদার ছিল, মিলেমিশে কাজ করত। অর্গানাইজ করা যা'ক বলে, সে ক্ষমতা নাকি মধুবাবুর ছিল অসাধারণ। তাই লেখাপড়া তেমন না জানলেও সকলে তাঁকে কেন্দ্রশক্তি হিসেবেই দেখত।

এছাড়া আর একটা ব্যবসা—ছোট ছেলেপুলে এনে বিকলাঙ্গ ক'রে তা'দর দিয়ে ভিক্ষে করানো। এরা ছোট বয়স থে'কই ওদের মনে এমন ভয় ঢুকিয়ে দেয়—এমন সব পদ্ধতি আছে ভয় দেখানোর যে—আতঙ্কটা বদ্ধমূল হয়ে পড়ে, ভিক্ষার সব টাকা এনে মালিককে ধরে দেয়, পালাবার বা এ অধীনতা ছিন্ন করার চেষ্টামাত্র করে না। তাছাড়া অনেকে জানেও না যে তা'দর ইচ্ছে ক'রে নৃশংসভাবে এই রকম করা হয়েছে—কাউকে কানা, কাউকে খোঁড়া, কাউকে গন্নাখ্যাঁদা : কারও বা হাত কেটে দেওয়া হয়েছে, কারও বা আঙুল। তারা জানে দৈবদুর্বিপাকেই এমন অবস্থা হয়েছে তা'দের, এরা দয়া ক'রে না বাঁচালে বাঁচত না, তাদের কেউ কোথাও নেই, কেউ দেখার ছিল না, এরাই আশ্রয় দিয়েছে তাই বে'চে আছে।

অবশ্য তা সত্ত্বেও কড়া নজর রাখ'তে হয়। অন্ধকার কালো পথে উপার্জনের নিয়মই এই। অহরহ সতর্ক সজাগ থাকতে হয়। দু-চারজন যে মাঝেমধ্যে বিদ্রোহ করার চেষ্টা না করে এমন নয়—সেক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবেই কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। সেই রকমই দেওয়া হ'য়ছিল কেলোকে—প্রফুল্ল বা হামিদ—সেই খোঁড়া ছেলেটিকে। অবশ্য তার দোষ ছিল না, কিন্তু এরা ভেবেছিল নলিনাক্ষ আসলে পুলিসের স্পাই, টাকা দিয়ে আইসক্রিম খাইয়ে ওর কাছ থেকে খোঁজখবর আদায় করছে। কে'লার পরিণাম দেখেই এখন বহুদিন পর্যন্ত বাকী ভিখিরীরা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে।

মুশকিল হয়েছে এই, এই সব ব্যবসা 'ইন্টারন্যাশনাল গ্যাঙ' চালায়, এমনি একটা আবছা ধারণা আছে সকলের। পুলিসেরও। বিরাট ব্যাপার, সে কি আর আমাদের ধরা সম্ভব, এই ভেবে হাল ছেড়ে দিয়েছেন অনেকেই। কিন্তু দেবীপদ যেটুকু জেনেছে, আসলে বহু দল, আলাদা আলাদা ব্যবসা। ব্যবসার সম্পর্ক হিসেবেই কেরালার দলের সঙ্গে আসামের, রাজস্থানী দলের সঙ্গে তেহরাণের, বাংলার দলের

সঙ্গে মার্কিন দলের যোগাযোগ। নিছক ব্যবসা। একটা দল হ'লে কবেই ধরা পড়ত। অনেক দল, আর এরা নিজেদের স্বার্থেই ব্যবসার একটা মোটামুটি সততা বজায় রেখে যায়—দু-একজন চালাকি করতে যায় না তা নয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাকী সকলে নিপুণভাবে তাকে 'খতম' ক'রে দেয়, সেই ভয়ে আবার কিছুদিন সবাই ঢিট্ থাকে। আর নিজেদের স্বার্থেই মন্ত্রগুপ্তিটা রক্ষা করে, কেউ কারও কথা ফাঁস ক'রে না।

মধুবাবুর শক্তিও বেশি, উচ্চাশাও বেশি; তিনি মানুষের ব্যবসা থেকে কোকেন মারিজুয়ানা, সোনা-হীরের চোরাকারবারে লিপ্ত হবেন সেটা স্বাভাবিক। মধুবাবু আসলে বহু দলের অভিভাবক উপদেষ্টা ছিলেন। সে হিসেবেও কিছু কিছু পেতেন। কিন্তু লেখাপড়া, বিশেষ ইংরেজীটা কম জানতেন। সেই জন্যেই পরেশ চাকলাদারকে তাঁর দরকার হয়েছিল। চাকলাদার একটা বড় ব্যাঙ্কে কাজ করত, সেখান থেকে লাখ তিনেক টাকা সরাতে গিয়ে ধরা পড়ে। আলিপুর না নিউ আলিপুর ব্রাঞ্চে—ডাকাতির আয়োজন করে। আয়োজন নিখুঁত। ভুল হয়েছিল একটা আনাড়ী লোককে দলে নেওয়ায়। দলের সুপারিশেই নাকি নিতে হয়েছিল তাকে। তাতেই শেষ মুহূর্তে ধরা পড়ল।

সেই সময় এলেন মধুবাবু। নিজে যেচে তাকে বাঁচিয়ে দিলেন। কিছু মোটা টাকারও দরকার হয়েছিল—সেও মধুবাবু পকেট থেকে খরচ করেন। সেই সঙ্গে একটি নিজের হাতে লেখা স্বীকারোক্তি লিখিয়ে নেন পরেশকে দিয়ে—ভবিষ্যতে হাতে থাকবে বলে। সে স্বীকারোক্তি কোন ব্যাঙ্কের ভল্টে আছে। কোন চালাকি করতে গেলেই সেটি পুলিসের হাতে চলে যেত। পুলিসকে গুলি করেছিল নিজের হাতে, সে জখম হয়েছিল—মরে নি, তবু 'য়্যাটেম্পট্ টু মার্ডার' আর সরকারী লোককে কর্তব্যপালনে বাধা দেওয়া, ডাকাতির চেষ্টা—এতগুলো চার্জে শাস্তি বড় কম হ'ত না।

পরেশ চাকলাদার চলনেবলনে পাক্কা সাহেব। ইংরেজী ছাড়াও ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান শিখে নিয়েছিল। ওদের ব্যবসার জন্যে এগুলো দরকার। মধুবাবু ওকে প্রথমে নিজের সহকারী হিসেবে নিলেন, শেষে অংশীদার ক'রেছিলেন। টাকাকড়ির ব্যাপারে খুব সাফ ছিলেন তিনি, শতকরা ত্রিশ টাকা দেবার কথা—পাইপয়সা পর্যন্ত হিসেব ক'রে দিয়ে দিতেন। কিন্তু পরেশ চাকলাদার চাইত যেমন উপার্জন তেমনি ভাবে থাকতে—ধনীর মতো থাকার বড় শখ তার, আসলে সেই জন্যেই ব্যাঙ্ক লুঠ করতে গিয়েছিল। কিন্তু মধুবাবু জানতেন এইভাবে পয়সা খরচ করতে থাকলে একদিন না একদিন লোকের চোখে পড়বে, তাদের চোখ টাটাবে। আর তাহলেই পুলিসেরও নজরে পড়বে।

তাই পড়েও ছিল, দেবীপদ আসলে পরেশ চাকলাদারেরই পিছু নিয়েছিল। পরেশ যেমন নির্মম তেমনি বেপরোয়া, তাই দেবীপদ খুব সাবধানেই ছিল—তবু শেষরক্ষা হ'ল না।

নলিনাক্ষর এ-জালে জড়াবার কথা নয়, সে নিজের অজ্ঞাতসারেই এসে পড়েছিল। প্রথম ঐ ভিখিরী ছেলেটার প্রতি অতিরিক্ত স্নেহ, ওরা ভুল বুঝে তাকে মারল। আর তার ফলটা অন্যভাবে এসে পড়ল নলিনাক্ষর ওপরই। ছেলেটা চেহারার জন্যেই বেশি রোজগার করত, সে উৎসটা বন্ধ হয়ে যেতে ওদের জাতক্রোধ হল নলিনাক্ষর ওপর।

পরেশের সামনের বাড়িতে থাকে ও, ক্রমশ প্রকাশ পেল দেবীপদর বন্ধু। এর আগে বড় স্মাগলার গ্যাঙ একটাকে খতম করার মূলেও এই নলিনাক্ষই ছিল—অবশ্য সেও অজান্তে—কিন্তু কে আর অত খবর রাখছে—ওরা দুই আর দুইয়ে চার ধরে নিল। তারপর পুরীতে গিয়ে পড়া—এরা গিয়ে পড়ল দৈবাৎই। কিন্তু মধুবাবু ও পরেশ ধরে নিল যে দেবীপদর চর হিসেবেই গেছে নলিনাক্ষ। দেবীপদ যে পুরীতে আছে তা জানত—সুতরাং এটা ধরে নেওয়া খুবই স্বাভাবিক। বিরাট একটা সোনার চালান ডেলিভারী নিতেই গিছল পরেশ, পরেশকে সামলাতে মধুবাবু।

মধুবাবু দেবীপদ আর নলিনাক্ষর উপস্থিতির কার্যকারণ ভেবে নিয়ে পরেশের ওপর চটে গেলেন খুব। তিরস্কার করলেন। ওর জন্যেই এদের চোখ পড়ল, নইলে এতদিন তিনি এত কারবার করছেন, কেউ তো সন্দেহ করে নি।

পরেশের যুক্তি হচ্ছে, যদি ভোগই না করলুম তো এত কাণ্ড কষ্ট ক'রে, এত ঝুঁকি নিয়ে রোজগার ক'রে লাভ কি? চিরদিন গর্তের মধ্যে থেকে ছুঁচোর জীবন যাপন করা—সে তো একটা দুশো টাকা মাইনের কেরানীও পারে। মধুবাবু বলেন, যথেষ্ট টাকা ক'রে নিয়ে তুমি বিলেত আমেরিকা যাও না, রিভিয়েরাতে গিয়ে ফুর্তি করো, এখানে ওসব চাল দেখাবার দরকার কি?

দোলাকে যে ধরে সে নিতান্তই দৈবের যোগাযোগ। নলিনাক্ষর আত্মীয় বলে জানত না ওরা। জানার কারণও ছিল না। যখন জানল—পরেশ চেয়েছিল ফিরিয়ে দিতে, মধুবাবুই নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'দ্য মিস্‌চীফ্ ইজ অলরেডী ডান—এখন ফিরিয়ে দিলে আরও ঝুঁকি নেওয়া। মেয়েটা কতটা কি লক্ষ্য করেছে কে বলতে পারে! ছোটদের অবজার্ভেশন অনেক তীক্ষ্ণ, কি বলবে তা কে জানে। আর ঘাঁটিও না।'

সে রাত্রে বাস অ্যাক্সিডেন্ট মধুবাবুরই ব্যবস্থা। শেষ মুহূর্তে যে নলিনাক্ষ ট্রেনে আসবে তা ভাবেন নি। নিরাপদে কলকাতায় পৌঁছে গেছে—একথা শুনে তিনি স্থির থাকতে পারেন নি। দেবীপদকে ধরা হয়েছে, এখন নলিনাক্ষকেও যদি এই খাঁচায় এনে পোরা যায় তাহলে অনেকটা নিশ্চিন্ত। এখান থেকে কাঠের বাক্স ক'রে অনেক মাল ওরা চালান করে, তখন স্থির ছিল এদের দুজনকে সেইভাবে পাঠাবে। মাঝ-সমুদ্রে গিয়ে বাক্স ডুবিয়ে দেবে তারা।

সেই সঙ্গে মধুবাবু আর একটি নির্দেশ দিয়েছিলেন পরেশকে। এখানের 'অ্যাক্‌টিভিটি' কাজকর্ম কিছুদিনের জন্যে বন্ধ রাখতে। পরেশকে বলেছিলেন উটকামণ্ড গিয়ে একটা য়্যান্টিক জিনিসের দোকান খুলতে। মধুবাবু নিজে চলে যাবেন বাংলাদেশে, পাসপোর্ট করানোই আছে, তাতে বাধবে না। সেটাই পরেশের পছন্দ হয় নি। এখানে বিস্তর কাজ—'বিজনেস' ওদের ভাষায়। অনেক টাকা আমদানি হচ্ছে, সব এদের হাতে ছেড়ে চলে যাবে, যদি এর পর ফিরে এলে পাত্তা না দেয়!

কিছুদিন ধরেই মধুবাবুর কর্তৃত্ব পরেশের অসহ্য লাগছিল, তা ছাড়াও, তার মনে হয়েছিল কাজকর্ম সব সে-ই করছে, মাঝখান থেকে সিংহভাগ নিচ্ছেন মধুবাবু। পরেশ চিরদিনই বেপরোয়া, সে দুম ক'রে মধুবাবুকে খুন ক'রে বসল। করল—মানে করালো। সেও আর একটা ভুল। এ বিষয়ে মধুবাবুর নীতি ছিল খুব পরিষ্কার: 'খুব দরকার না পড়লে মানুষ মেরো না। বিশেষ যাদের পিছনে অনেক আত্মীয়

বান্ধব আছে তাদের একেবারে নাচার না হলে মারবে না। আর, মারতে হলে অনেককে জড়িয়ে মারবে, যাতে কেউ ব্ল্যাকমেল করার সুযোগ না পায়।'

পরেশ নিজেকে খুব চতুর ভাবত। মধুবাবু নলিনাক্ষকে এই পাড়ায় এনে ফেলার জন্যে—পাড়ায় এলে খাঁচায় পুরতে আর কতক্ষণ—আত্মীয়তার ঐ অভিনয়টা করতে গিছলেন, অনেকটা সফলও হয়েছেন—এটুকু মনস্তত্ত্ব তাঁর জানা ছিল—কিন্তু সে খবর পাবার পর পরেশের মনে হয়েছে যে মধুবাবু সবটা বাংগলিং করছেন, তাঁর আর বাঁচার প্রয়োজন নেই। তার নিজের ভাষাতেই—পাশের ঘরে বসে বলেছে পরেশ, নিজে কানে শুনছে দেবীপদ—'ভদ্রলোক বড় বেশি ওভারবিয়ারিং হয়ে পড়েছিলেন, এসব কাজে এ-ধরনের লোকের আর থাকা উচিত হত না।' এ পাড়ায় নলিনাক্ষ এলে কি করতে হবে তা মধুবাবু আগেই ঠিক ক'রে রেখেছিলেন। পরেশের মনে হয়েছিল এই দুজন এবং মধুবাবু মরে গেলেই সে নিশ্চিন্ত।

কিন্তু মধুবাবুর মরার পর এদের এই জগতে খুব বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এতটা আশঙ্কা করে নি পরেশ, কল্পনাও ক'রে নি। এদের ভালবাসা স্বার্থের ভালবাসা অবশ্য, মধুবাবু তাদের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন, কেন্দ্রমণি। তিনি এভাবে হঠাৎ চলে যেতে এরা খুব অসহায় বোধ করল। তাদের ক্ষোভ ক্রমশ রুদ্র রূপ ধারণ করছে দেখে পরেশ ভয় পেয়ে গেল, চোরাই মাল এনে ঘরে তুলে পুলিস খবর দিয়ে সাধ ক'রে ধরা দিলে পুলিসে। একটা গোলমাল ক'রে এ দায় থেকে বছরখানেকের মধ্যে বেরোতে পারবে এ ভরসা ওর আছে, ততদিনে এদিকটা ঠান্ডা হয়ে যাবে।

সেও ভুল পরেশের, সে গোলমাল মধুবাবুই করিয়ে দিতে পারতেন, তাঁরই যোগাযোগ বেশি ছিল। এসব বুঝতেনও ভাল। তাঁরই পরামর্শে ও বন্দোবস্তে পরেশের সব কটা গাড়ির তিন-চারটে ক'রে নম্বর করানো ছিল, পুরী থেকে যখন নলিনাক্ষকে নিয়ে আসে তখন নির্জন রাস্তায় পড়ে অন্য গাড়িতে তুলে দেওয়া হয় ওকে—সে-গাড়িতে পুলিসের ইউনিফর্ম পরা লোক ছিল—দেখলেও কেউ সন্দেহ করত না। পরেশ সোজা এসে এ বাড়িতে উঠেছে—ওর গাড়ি যারা লক্ষ্য করেছে এখানে, তারা কিছুই সূত্র পায় নি।

এই পর্যন্ত ব'লে বোধ হয় ক্লান্ত হয়েই চুপ করল দেবীপদ।

নলিনাক্ষ বলল, 'তারপর? আমাদের কি উপায় হবে?'

'বোধ হয় কিছুই হবে না। মধুবাবুর মৃত্যু পরেশ চাকলাদারের ধরা পড়া—এ দুটোতে এরা খুব যেন শেকী হয়ে গেছে। এখানের চাটিবাটি গুটোচ্ছে। ছেলে-মেয়েগুলো—গোটা কুড়ি এখনও এ-বাড়িতেই আছে, আপনার দোলাও—তাদের ডিস্‌পোজ্ ক'রে এরা সরে পড়বে, আমাদের এখানে ফেলে। ইনক্রিমিনেটিং যা কিছু সব নষ্ট করা হচ্ছে কাল থেকে। কাগজপত্র পোড়ানো হচ্ছে। প্রত্যেক গাড়িতেই দু-তিনটে ক'রে নাম্বার প্লেট ছিল, সেগুলো অ্যাসিড দিয়ে নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে। এখানের ম্যানেজার একটি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান—য়্যান্টনী, তার সহকর্মী মঞ্জুর হোসেন—দুজনেই খুব শান্ত টাইপের লোক, কিন্তু একেবারেই নির্মম। তাদের কাছ থেকে কোন হিউম্যান কনসিডারেশান আশা করা নির্বুদ্ধিতা। এখন ভরসা শুধু দৈব—এক ভগবান যদি বাঁচিয়ে না দেন তো আর আমাদের বাঁচার কোন আশা নেই। আজও আমার খাবার দিয়ে গিছল, চারখানা রুটি আর একটি আলুসিদ্ধ—কিন্তু তখনই হালদার জানিয়ে গেছে—আর বোধ হয় দেওয়া যাবে না।'

॥ বারো ॥

এর পর দুজনেই চুপ ক'রে গেল। দেবীপদ শ্রান্তিতে, নলিনাক্ষ অন্য কারণে। মৃত্যুদণ্ড শোনার পর আসামীর কি অবস্থা হয়—আজ নলিনাক্ষ কিছুটা বুঝল। জীবন্ত সমাধি কথাটা শোনাই ছিল এতকাল, কথার-কথা হিসেবে। তার জীবনেই যে এই অবস্থা হ'বে, এই বয়সেই—কে জানত!

সে নর্দমার কাছ থেকে সরে এসে ক্লান্ত হয়ে চোখ বুজল।

না, ঘুম আসার কোন সম্ভাবনা ছিল না। মানসিক অবস্থা ঘুমের অনুকূল নয়। অন্য কারণও দেখা দিল। দুজনেই স্থির হয়ে আছে, এখানে অন্তিমকালের নীরবতা যা'কে বলে—কাজেই মাথার উপরের সামান্য শব্দও কানে আসছে। কিছু কিছু আগেও পাচ্ছিল, এখন যেন কাজকর্ম, বহু লোকের চলাফেরা, মালপত্র টানাটানি করার শব্দ আরও বেড়ে গেল। ভারী ভারী জিনিসপত্র, কাঠের প্যাকিং বাক্স গোছ—সরাচ্ছে, টেনে নিয়ে যাচ্ছে মেঝের ওপর দিয়ে—মনে হ'ল। খিদেতে বিষের প্রতি-ক্রিয়ায় সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করছে, তবু এই সব শব্দের অর্থ বুঝেই নলিনাক্ষ আরও যেন সেদিকে কান পেতে থাকে।

হিসেবমতো—মানে দেবীপদর ঐ কুড়ি ঘণ্টার হিসেব যদি ঠিক হয়, রাত আটটা নাগাদ এই কর্মচঞ্চলতা চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠল। তার পর আস্তে আস্তে আবার যেন স্তিমিত হ'য়ে এসে সব নিথর হয়ে গেল। এ নৈঃশব্দ্যের একটিই অর্থ হয়—এরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

আরও কিছুক্ষণ পরে—রাত এগা'রটা নাগাদ পাশের ঘরে খুট ক'রে একটা শব্দ হল। যেন লোহার চাপা দোরটা খুব সন্তর্পণে খুলেছে কেউ। নলিনাক্ষ প্রায় গড়িয়ে এসে আবার নর্দমায় কান দিল।

'বোসবাবু, বোসবাবু।' চাপা গলায় কে ডাকছে।

'হালদার? বলো।'

দেবীপদ তো বেশ সহজভাবেই কথা কইছে, ওর কি একটুও ভয় হয় নি—সত্যিই? মনে মনে বলে নলিনাক্ষ।

'বাবু, কী বলব, আমরা চলে যাচ্ছি। সব মাল চলে গেছে, ওপরতলায় চাবি দিচ্ছে—এখনই নিচে এসে পড়বে। মেন সুইচ্‌ অফ করা হবে, আর আলোও পাবেন না। আমার কাছে একটা বাড়তি টর্চ ছিল, আর দেশলাই। রাখুন—কী-ই বা হবে এতে, তবু ইঁদুর কি সাপখোপ এলে দেখতে পাবেন। আর এই এক প্যাকেট বিস্কুট। কিছু মনে করবেন না বাবু, আমি চললুম!'

'তুমি, তুমি কি কিছুই করতে পারো না? কোনমতে বার ক'রে দিতে—? এখন তো সবাই ব্যস্ত। অন্তত ওপরেও যদি রেখে যেতে পারতে! একদিন না একদিন এদের সকলকেই জবাবদিহি করতে হবে হালদার, সেদিন আমি তোমার দিকে হতে পারতুম।'

'সব জানি বাবু—কিন্তু চারদিকে কড়া পাহারা। আণ্টুনী সায়েব নিজে এই সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে। আমার ঘাড়ে একটাই মাথা বাবু। আপনাদেরও বাঁচাতে

পারব না, আমি নিজেও যাবো—'

সে সরে গেল, চাপা দোরটা আবার বন্ধ ক'রে দিয়ে।

আর একটু পরে হঠাৎই আলোটা নিভে গেল।

গাঢ়, নিঃসীম অন্ধকার। অন্ধকার যে এমন নিশ্ছিদ্র হতে পারে তা কে জানত!

নলিনাক্ষ না অন্ধকার দেখতে গিছল সমুদ্রের ধারে—শখ ক'রে? মনে আছে—প্রথম যেদিন নামছে সমুদ্রের দিকে, সেই রাত্রিবেলা—ঐ পরেশ চাকলাদারের মেয়েটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, শাখী বুঝি নাম মেয়েটার—বলেছিল, 'অন্ধকার দেখতে যাচ্ছেন? শখ বটে বলিহারী আপনার! অন্ধকার আবার কি দেখার আছে, ওটা মরবার জন্যে রেখে দিন না! আলো আর ক'দিনের, যে কটা দিন বাঁচি আলোতেই যেন কাটিয়ে দিতে পারি—আমি তো এই বুঝি! তখন ডেঁপোমি মনে হয়েছিল। আজ কথাগুলোর অর্থ বুঝছে।

নলিনাক্ষ আর সামলাতে পারল না, সত্যিই হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল। অনর্থক বুঝেই দেবীপদ ওঘর থেকে কোন সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল না।

* * *

ক্লান্তি তো ছিলই, অপরিসীম ক্লান্তি, অনাহারের দুর্বলতা। তার ওপর এই বুকফাটা কান্না। ফলে অবসন্ন হয়েই এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল নলিনাক্ষ। গভীর স্বপ্নহীন ঘুম, দীর্ঘ উপবাসের পর ঘুমোলে যেমন গাঢ় ঘুম হয়—তেমনিই। সেই জন্যেই ঘুম ভাঙতেও দেরি হল। শব্দ পাচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকেই বোধ হয়, প্রথম সেটা স্বপ্ন বলেই মনে হয়েছিল, তারপর এক সময় কথাটা মনে পড়ল—যে স্বপ্ন দেখে তার তো স্বপ্ন মনে হয় না। তবু তখনও চোখ খুলতে পারে না, চোখের পাতা যেন জুড়ে আছে। শেষে এক সময় প্রচণ্ড কী একটা শব্দ, কে যেন কোন দরজায় লাথি মারছে, চমকেই চোখ চাইল—

দেখল ঘরে আলো জ্বলছে আবার।

সত্যি? না স্বপ্ন দেখছে?

আশার আলো? জীবনের আলো?

মাথার ওপর বহু লোকের পায়ের শব্দ না? খুব চেঁচামেচি—সে শব্দ এখানেও কিছুটা এসে পৌঁচচ্ছে। দরজায় লাথির পর লাথি মারছে কে। তার পর যেন পাশের ঘরে ওপরের চাপা দোর খোলার শব্দ, 'দেবীদা, দেবীদা—দেবীদা জেগে আছেন?'

দেবীপদ সাগ্রহে সাড়া দিল, 'কে, প্রবীর? তোমরা এসেছ? তাই তো বলি—'

'হ্যাঁ দেবীদা, আমরা সবাই এসে পড়েছি। কমিশনার নিজে এসেছেন, আমাদের বড়সাহেব। আর ভয় নেই।'

'পাশের ঘর প্রবীর, আগে পাশের ঘর দেখ। নলিনাক্ষবাবুকে রেখেছে ওখানে, বড় কাতর হয়ে পড়েছেন।' দেবীপদ বলল, 'প্রায় ত্রিশ ঘণ্টা ওঁর পেটে কিছু পড়ে নি।'

'এই দরজাটা—না? তাও তো বটে। এই তো দরজা একটা। খোলো খোলো মোহন, চাড় দাও, চাবি খুঁজে খুলতে অনেক দেরি হবে। সিঁড়িটা ফেলে নেমে যাও দুজন, যদি অজ্ঞান হয়ে থাকেন তো ধরাধরি করে তুলতে হবে। শৈলেন, তুমি

যাও, ব্র্যাণ্ডি আছে তোমার কাছে—। অফ কোর্স, আজ নলিনাক্ষবাবু শুড বি আওয়ার ফার্স্ট কনসিডারেশ্যন্। হি ডিজারভ্‌স্ ইট। দেবীদা, সেবার আপনার জন্যে উনি বেঁচেছিলেন। এবার ওঁর জন্যে আপনি বাঁচলেন!'

এ সব কি সত্য, না স্বপ্ন দেখছে নলিনাক্ষ?

ওপরে এসে বসে চা, খাবার ও ক'চামচ ব্র্যাণ্ডি খেয়ে একটু সুস্থ হলে দেবীপদ জিজ্ঞাসা করল, 'তার পর? তখন যে কথাটা বললে প্রবীর—'

'আপনাকে আপনার সঙ্গীরা মিস করেছিল অন্ধকারে। আপনি কোথাও ঘাপ্‌টি মেরে আছেন ভেবে পরের দিন সকাল পর্যন্ত কোন খোঁজ করে নি। তার পর সন্দেহ হতে, চাকলাদারের গাড়ির কথা এখানে ফোন ক'রে জানায়—এখানে আগেই নজর রেখেছিল, কিন্তু সন্দেহজনক কিছু পায় নি। অর্থাৎ ইউ ওয়ার লস্ট!...আপনি হেরে গেলেন কিন্তু আপনার নির্দেশ হারে নি। আপনি বলেছিলেন নলিনাক্ষবাবুর ওপর নজর রাখতে, আমরা ফেথফুলি সে নির্দেশ পালন করেছি। তাতেই—ওঁর এ-পাড়ায় য়্যামেচার গোয়েন্দাগিরির চেষ্টা, সন্ধ্যাবেলা সোলেমানের হাতে ধরা পড়া—সব খবরই পেয়েছি। যে পিছু নিয়েছিল সে একা, সে যখন খবর দিলে তখনও আমরা এখানে এ বাড়িতে এসে হানা দিতে সাহস করি নি, যদি খুন ক'রে গুম্ ক'রে দেয় ধরা পড়ার ভয়ে! তক্কে তক্কে ছিলাম, সোলেমান শেষরাত্রে ওখান থেকে বেরিয়ে ওর মেয়েমানুষের বাড়ি যাচ্ছিল, সেখান থেকে অতর্কিতে তাকে গাড়িতে তুলে নিয়েছি। রাত চারটের সময় জনমানব নেই, কেউ দেখে নি।'

'বাহবা! ঠিক করেছ। তার পর?'

'তার পর সোলেমানকে নিয়ে পড়া। সে কি সোজা, ভেরী হার্ড নাট টু ক্র্যাক। তখন দাদা, এই বড়সাহেবরা আছেন তাঁদেরও জানাচ্ছি, আমার চাকরিটা খাবেন না—উপায় ছিল না দেখেই থার্ড ডিগ্রি প্রয়োগ করলুম। তাও একটুতে হয় নি, লোকটার কি অসীম সহ্যগুণ কী বলব, শেষে যখন কুড়ি আঙুলে কুড়িটা পিন ফুটিয়ে বুকে বাঁশ দিয়ে ডলছি—কম্বলের ওপর দিয়ে অবশ্য, এই মোহন হাতটা একটু একটু ক'রে মোচড়াচ্ছে, তখন কাজ হ'ল। সবই বলল। কিন্তু এই করতে করতে সন্ধ্যে হয়ে গেছে, যখন শুনলুম সমস্ত মাল ওরা আজই পাচার করবে, দুটো রোডওয়েজের লরীতে পুরে চট চাপা দিয়ে নিয়ে যাবে ভাইজাগ, মানে তাই বলে বেরোবে, তার আগেই—এদিকে জাহাজ রেডী আছে, এখান থেকে সে মাল নিয়ে ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করবে মোহানায়—এরা লরী থেকে নৌকোয় চাপিয়ে নিয়ে গিয়ে সেখানে তুলবে, তখন একটু অপেক্ষা করাই ঠিক বিবেচনা করলুম। এতক্ষণই গেছে, একটুতে কি এসে যাবে! ওদের মাল পেরিয়ে গিয়ে রোডওয়েজের লরীতে উঠেছে, দুটো লরীতে এদের লোক, পিছনে মঞ্জুর মিঞা একটা ট্যাক্সিতে—ঠিক জায়গা বুঝে আমরা ঘিরে ধরেছি। তাই কি পারতুম, আমাদের এস. আই. আমেদ—সে বুদ্ধি ক'রে রাইফেল চালিয়ে আগেই চাকাগুলো ফুটো ক'রে দিয়েছিল তাই। সে সব ব্যবস্থা ক'রে এখানে আসছি—'

'ছেলেমেয়েগুলো?' সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে নলিনাক্ষ।

'সেফ অ্যান্ড সাউন্ড। তবে সে পর্যন্ত থাকতে পারি নি, এখানে ছুটে এসেছি। অবশ্য একটু আগেই ফোন পেলুম, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, বেশির ভাগই বেঁচে যাবে।'

তার পরই প্রবীর বলল, 'কিন্তু নলিনীদা, এর মধ্যে একটু রোম্যান্সও আছে। আপনারই ভাগ্য।'

কী রকম? কী রকম?' দেবীপদও ঝুঁকে পড়ে।

'আজই সন্ধ্যার পর একটি নারীহস্তের চিরকুট আমাদের কমিশনার সাহেবের ঘরে পৌঁছয়, তাতে এই বাড়ির ঠিকানা দিয়ে লেখা আছে—নলিনাক্ষবাবু এখানে মাটির নিচের ঘরে মৃত্যুমুখে—এখনই যেন তাঁক উদ্ধার করা হয়।'

'তাই নাকি? কিন্তু সে আবার কে?' নলিনাক্ষ বিহ্বল হয়ে পড়ে, 'যাঃ! তুমি ঠাট্টা করছ!'

'না না', কমিশনার বলে ওঠেন, 'ঠিকই বলছে। সে চিঠি আছে। কাল দেখবেন, হাতের লেখা যদি চিনতে পারেন। তবে আমার যা সারমাইজ—যা শুনলুম সব কেসটা—পরেশ চাকলাদারের মেয়েই হবে।'

পরেশ চাকলাদারের মেয়ে? শাখী?

শাখী খবর দিয়েছে?

শাখী?

শাখী, নলিনাক্ষকে—নিজের বাবার শত্রুকে—বাঁচাবার জন্যে পুলিস চিঠি দিয়েছে!

না না, সে কেমন করে হবে?

এ যে অসম্ভব!

অথচ এঁরাও যে ভাবে বলছেন, তামাশা বলেও তো মনে হচ্ছে না।

কিন্ত কেন? কী তার এত গরজ?

আবারও যেন মাথা গুলিয়ে যায় নলিনাক্ষর। আবার সেই যন্ত্রণাটা চাড়া দিয়ে ওঠে। আর সেই যন্ত্রণা ও বিহ্বলতার মধ্যেই মন মনের ভেতর হাতড়ে বেড়ায়, কারণটার সূত্র খুঁজতে চেষ্টা করে। ধাঁধা বা হেঁয়ালির মতো দেখতে দেখতে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে রহস্যটা—ক্রশওয়ার্ড পাজল-এর সূত্রের মতো অস্বস্তিকর। কোথায় যেন সমাধানের একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে, অথচ ঠিক ধরা যাচ্ছে না, সেই রকম।

এ কাজ যে জন্যে করে মেয়েরা—কৈ শাখীর সঙ্গে ওর তো তেমন কোন রোম্যান্সের—প্রেম তো দূরে থাক, অনুরাগেরও সম্বন্ধ ছিল না! কোন পূর্বরাগের ভূমিকা-মাত্রও দেখা দেয় নি।

অন্তত নলিনাক্ষর তরফে দেয় নি।

তবে—এখন যা একটু একটু মনে পড়ছে—দু-একদিন শাখীর আচরণটা ওর কাছে দুর্বোধ্য ঠেকেছে।

একদিন নিজেই এসেছিল সে, সেই প্রথম: বৌদির কাছে বোনার প্যাটার্ন-বই চাইতে। বৌদি সাধারণ ভাবে সোয়েটার ইত্যাদি বোনেন বটে কিন্তু তাঁর কাছে কোন বই নেই, এমন কিছু অসামান্য কারিগরও নন। এ আসাতে তিনি খুশিও হন নি, তাঁর নিজেরই ভাষায়—'বড়লোকের মেয়ে, ঐশ্বর্য্য দেখাতে আসা! হাড়-পিত্তি জ্বালা করে। তা নয়—জাঁকের গল্প যেমন মা করে যায়, তেমনি ওরও করবার লোক চাই তো! কিংবা ছুতো করে খবর নিতে আসা, আমরা গরিব মানুষরা কেমন খাই দাই—'

এ সবই বৌদির রাগের কথা।

তবে ছুতোর কথাটা সত্যি। সেটা বোঝা গিছল দিনসাতেক পরেই।

বৌদিই নিয়ে ওপরে উঠেছিলেন, ওর ঘরে ঢুকে বলেছিলেন, 'ঠাকুরপো, এই সামনের বাড়ির পরেশবাবুর মেয়ে এসেছে একটু, তোমার সঙ্গে দেখা করতে।'

'আমার সঙ্গে? কেন?'

একটু বোধ করি রূঢ়ই শুনিয়েছিল নলিনাক্ষর গলা। সে তখন সবে কাগজ কলম নিয়ে একটা গল্প ফেঁদে বসেছে—এই অকারণ ব্যাঘাতে বিরক্ত হয়ে উঠবে—সে তো স্বাভাবিক।

'নাও, অত মেজাজ দেখাতে হবে না (বৌদি বিবেচনা বুদ্ধির—যাকে 'ট্যাক্‌ট্' বলে ইংরেজিতে—কিছুমাত্র ধার ধারেন না), ঢের লেখক হয়েছ! এও লেখে, ওর ইচ্ছে তুমি ওর দু-একটা লেখা একটু দেখে দাও। এখন না পারো, রেখে দাও, ধীরেসুস্থে দেখে দিও।'

লাল হয়ে উঠেছিল শাখী, ঘেমে উঠেছিল সেই হেমন্তের দিনেও। হাত কাঁপছিল থরথর করে—লেখাটা টেবিলে রাখার সময় সেটাও নজরে পড়েছে। কিন্তু তার ভেতরও অস্বাভাবিক কিছু খুঁজে পায় নি, নবীন লেখকের সহজ লজ্জা বলে ধরে নিয়েছে। বিশেষ অল্পবয়সী মেয়ের পক্ষে এ একটা নিদারুণ অবস্থা বৈকি!

লেখা কিছুই হয় নি, দেখে মনে হচ্ছে সে সম্বন্ধে ধারণাও খুব স্পষ্ট নয় মেয়েটার। কিন্তু সে কথা বলাও কঠিন। তাই কদিন পরে যখন লেখার খবর নিতে এসেছে তখন মিষ্টি ক'রে অনেক ঘুরিয়ে বলতে হয়েছে, দু-একটা মামুলি উপদেশও দিতে হয়েছে।

তবে সেই সময়ই লক্ষ্য করেছে নলিনাক্ষ—ব্যর্থতাটা সহজেই মেনে নিয়েছে মেয়েটা এবং তখনই উঠে পালাবার চেষ্টা করে নি। একথা সেকথার পর হঠাৎই অত্যন্ত ব্যক্তিগত একটা প্রশ্ন করেছে, 'আপনি বুঝি রোজ ব্যায়াম করেন?'

চমকে উঠেছে নলিনাক্ষ, ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করেছে, 'আপনি কি ক'রে জানলেন? কেউ বলেছে? বৌদি বুঝি?'

'না না, কেউ বলে নি। আমাদের ছাদের ঐ কোণটা থেকে আপনার ঘরটা দেখা যায় যে একটু একটু। তাতেই— এতে কিছু দোষ আছে নাকি?'

'না, দোষ নেই। তবে এ দেখার বা এ নিয়ে আলোচনা করারই বা কি আছে, বিশেষ খালি হাতে করা—।'

'দেখার আছে বৈকি। দেখেন নি ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বিকেলে ব্যায়াম সমিতির ছেলেরা যখন ব্যায়াম করে কী রকম ভীড় জমে যায়। সুগঠিত দেহ তো খুব সুলভ নয়।'

এই পর্যন্তই।

সেদিন তখনই চলে গিছল। আর আসে নি। তবে দেখার ব্যাপারটা পরেও লক্ষ্য করেছে। ছাদ নয়, চিলেকোঠার ঘর থেকেই দেখে, দূরবীন দিয়ে। বিরক্ত হয়ে জানলা বন্ধ ক'রে ব্যায়াম করেছে তার পর থেকে।

এর পর দু-একদিন পাড়ায় কোন কোন ক্রিয়াকর্ম-বাড়িতে দেখা হয়েছে, ওদের বাড়িতেও এসেছে, দু-একবার। তবে অন্তরঙ্গ হবার কোন চেষ্টা করে নি বিশেষ, হয়ত নলিনাক্ষর কঠিন অনমনীয় ভাবভঙ্গি দেখেই সাহস হয় নি। শুধু একদিন, ওদের পুরী যাবার আগে পথে একদিন দেখা হয়েছিল—হাঁটতে হাঁটতেই আসছিল, নলিনাক্ষও বাকী সামান্য পথটুকু পাশে পাশে এসেছিল, কতকটা বাধ্য হয়েই।

সেই সময়ই একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করেছিল, 'আচ্ছা নলিনদা, বাইবেলে আছে শুনেছি, 'সিন্স্ অফ দি ফাদার্স উইল ভিজিট টু দেয়ার চিলড্রেন"—ঠিক হয়ত বলতে পারছি না, এই রকমই কথাটা—আপনি তো জানেন—কিন্তু কেন? বাপ যদি পাপ করে সেজন্যে ছেলেমেয়েরা দায়ী হবে কেন? কেন তাদের সেই ভাবে বিচার করা হবে? আমাদের শাস্ত্র তো একথা বলে না, রত্নাকরের মা বাপ স্ত্রী পুত্র তো সাফ জবাব দিয়েছিল, আমরা কি জানি তুমি কোথা থেকে কী ভাবে রোজগার করছ! তবে কেন আমাদের সমাজ বাপ-মায়ের কাজ দেখে ছেলেমেয়েদের বিচার করবে!

বিস্মিত হয়েছিল নলিনাক্ষ ওর উত্তেজনা দেখে। শুধু তাই নয়—মেয়েটা যে এত লেখাপড়া করে, এত ভাবে—তা দেখেও। ওদের বাড়ির পক্ষে যেন এটা বেমানান। সে উত্তর দিয়েছিল, 'না, বাইবেলের ও কথাটার মানে এ নয় যে তাদের দায়ী করা হয়—ওর অর্থ এই যে, বাপ-মায়ের পাপের ফল এদের ওপরও এসে পড়বে খানিকটা, এদের ভুগতে হবে।...সামাজিক ধিক্কার—সেও সেই ভোগারই অংগ একটা, নয় কি!'

আর কিছু বলে নি শাখী, মুখটা যেন অন্য দিকে ফিরিয়ে নিঃশব্দেই হেঁটেছিল বাকী পথটুকু—অবশ্য পথও বিশেষ আর বাকী ছিল না তখন।

আজ মনে হচ্ছে কে জানে, হয়ত বা চোখে জল এসে গিয়েছিল মেয়েটার, সেটা চাপতেই অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েছিল।

এর পর পুরীতে দেখা হয়েছে এক আধ বার। সাধারণ স্বাভাবিক ভাবেই কথাবার্তা হয়েছে। সকলের সামনেই। কেবল একদিন মাত্র মিনিটখানেকের জন্যে নির্জনে দেখা হয়েছিল। সন্ধ্যার সময়, নলিনাক্ষদের বাসার সামনেই, একা দাঁড়িয়েছিল, মনে হ'ল সেখান থেকেই বেরিয়ে আসছিল, ওকে দেখে দাঁড়িয়ে গিছল—যদিচ এখন মনে হচ্ছে ইচ্ছে ক'রেই, ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিল—বলে উঠেছিল, চাপা কেমন এক রকমের ভাঙা গলায়—'রাত্রে বেরোন কেন সমুদ্রের ধারে? অন্ধকারে একা যাওয়া বড় বাহাদুরী—না? বালির মধ্যে কত কী থাকতে পারে? জানেন এখানে খুব বিষাক্ত সাপ আছে, সন্ধ্যের পর তারা বেরোয়?'

নলিনাক্ষ বিস্মিত হয়ে জবাব দিয়েছিল, 'সাপ! কৈ, শুনি নি তো! তাছাড়া আমি তো আলো নিয়ে যাই। আর ঐ একদিনই তো—'

কিন্তু সে উত্তর নেবার জন্যে বোধ হয় শাখী অপেক্ষা করে নি—কারণ বলতে বলতেই নলিনাক্ষ লক্ষ্য করেছিল, সে শূন্যকে উদ্দেশ ক'রেই বলছে, তার সামনে কেউ কোথাও নেই আর। যেন অন্ধকারেই মিলিয়ে গেছে শাখী।

মন নিমেষে বহু দূরে পৌঁছে যায়। এত দ্রুত গতি আলোরও নয়!

সমস্তটা ভেবে নিতে বোধ হয় এক মিনিটও লাগে নি। ফিল্মের চেয়ে অনেক দ্রুত ছবিগুলো সরে সরে গেছে স্মৃতির পর্দায়।

তার মধ্যেই কানে গেল, প্রবীর বলছে, 'বাই দ্য বাই, দেবীদা, আর একটি স্টার্টলিং নিউজ অপেক্ষা করছে আপনার জন্যে, পরেশ চাকলাদার খুন হয়েছে।'

'য়্যাঁ!' দুজনেই একসঙ্গে লাফিয়ে উঠল—দেবীপদ ও নলিনাক্ষ, 'সে তো হাজতে ছিল!'

'হ্যাঁ, হাজতেই খুন হয়েছে। এই একটু আগে খবর পেয়েছি।'

'শুনে না আত্মহত্যা?'

'শুনেই তো শুনছি। এখনই যাচ্ছি আমরা। আপনাদের উদ্ধার করাটা আগে দরকার বলে এখানেই এসেছি। এবার আপনারা বাড়ি গিয়ে বিশ্রামের চেষ্টা করুন — আমরা ওখানে যাই।'

দেবীপদ বলল, 'আমার বিশ্রাম লাগবে না। চলো, আমিও যাচ্ছি।'

শ্রান্ত নলিনাক্ষ চোখ বুজেই শুধু বলে দিল, 'মেয়েটার দিকেও একটু নজর রেখো দেবীপদ। সেও না আত্মহত্যা ক'রে বসে! কিম্বা পারো তো কোন নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে দাও।'

'সে আমারও মনে হয়েছে।' যেতে যেতেই উত্তর দিল দেবীপদ।

———